সৌরভ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—সম্পাদক—
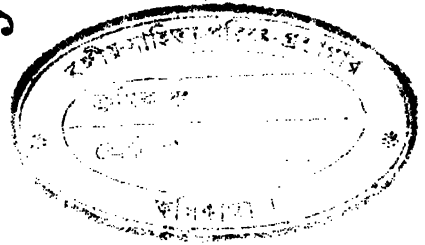
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

—চতুর্থ বর্ষ—

কার্ত্তিক ১৩২২ হইতে আশ্বিন ১৩২৩।

ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য—দুই টাকা।

PUBLISHED FROM
RESEARCH HOUSE—MYMENSINGH.

Printed by—Satish Chandra Rai,
Jagat Art Press, 26, Becharam Dewri, Dacca.

বিষয় সুচী।

চিত্র সূচী।

বর্ত্তমান বর্ষের লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম. এ. বি. এল.
শ্রীযুক্ত অতুলবিহারী গুপ্ত বি. এ. বি. এস সি.
শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী
শ্রীযুক্ত অনুপমচন্দ্র রায় বি. এল.
শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত
মাননীয় বিচারপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শাস্ত্র বাচস্পতি এম এ ডি.এল. সি. আই. ই.
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ. বি. এল.
শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী
শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী
শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ.
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ
শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর তরফদার বি. এ.
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম. এ.
শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ সিদ্ধান্তরত্ন
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা
কুমার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম. এ.
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি. এল.
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী
শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম. এ. বি. এল.
শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন, জ্যোতিঃ-সিদ্ধান্ত
শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন
শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য
শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
শ্রীমতী বিভাবতী সেন
শ্রীযুক্ত বিমলানাথ চাকলাদার বি. এ.
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রমোহন সেন
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এল.
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি. এ.
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় বি. এ.
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন
শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর সেন
শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত
শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ
৺ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী
শ্রীযুক্ত সুখেন্দুমোহন ঘোষ
সুরেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী
কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি. এ.
শ্রীযুক্ত সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
ও
সম্পাদক প্রভৃতি।

কার্ত্তিক মাসে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিবে।

৫ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা সৌরভ শ্রেষ্ঠ লেখকগণের প্রবন্ধ মালায় ও সুন্দর চিত্রে পরিশোভিত হইয়া আগামী—

১০ই আশ্বিন বাহির হইবে।

১। যে সকল সহৃদয় গ্রাহক ও পৃষ্ঠ পোষকগণের স্নেহে ও অনুগ্রহে সৌরভ ৫ম বর্ষে পদার্পণ করিতেছে, আমরা তাঁহাদের নিকট আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমাদের বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন সৌরভকে পূর্ব্বের মত স্নেহের সহিত গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অনুগ্রহের উপরই সৌরভের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

২। বর্ত্তমান যুদ্ধে কাগজের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায় পত্রিকা পরিচালন বহু ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে; ছবি ছাপিবার কাগজও নাই; তথাপি আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমরা মাতৃ ভাষার সেবা দ্বারা গ্রাহকগণের মনস্তুষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। আমাদের এইরূপ চেষ্টা সত্বেও অনেক গ্রাহক সারা বৎসর পত্রিকা লইয়া বৎসর শেষে যখন ভিপি যায় তখন নিসঙ্কোচে সেই ভিপি ফেরত দিয়া আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকেন। অবশ্য অনেক সময় গ্রাহকগণের অজ্ঞাতে পোষ্টাফিসের গোলযোগেও ভিপি ফেরত আসিয়া থাকে। যাঁহারা সে সময় ভিপি রাখা একান্ত অসুবিধা বলিয়া মনে করেন তাঁহারা আমাদের কার্ড পাইয়াই যদি আমাদিগকে লিখিয়া জানান, তবে তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করা যাইতে পারে। আমাদিগকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

৩। **সৌরভ প্রতি মাসের প্রথম তারিখে বাহির হয়।** এবং যাঁহারা অগ্রিম টাকা দিয়া থাকেন তাঁহাদের সৌরভ মাসের প্রথম সপ্তাহেই ডাকে দেওয়া হইয়া থাকে। তারপর ভিঃ পিঃ র পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয় ও অবশেষে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য গ্রাহকের পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহাতে কোন কোন গ্রাহকের পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হয়। যাঁহারা মাসের প্রথম সপ্তাহেই সৌরভ পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্ব স্ব বার্ষিক মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

৪। বহু স্কুল-লাইব্রেরীতে সৌরভ গৃহীত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশে স্কুল বন্ধ থাকার দরুণ ঐ সময় পত্রিকা পাঠাইলে হারাইয়া যাইতে পারে; সুতরাং ঐ ঐ সংখ্যাদ্বয় ছুটীর পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকার সহিত একত্রে পাঠান হইয়া থাকে। ছুটীর মধ্যেই যাঁহারা পত্রিকা পাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিবেন।

৫। সৌরভের বার্ষিক মূল্য সহ ডাকমাশুল দুই টাকা মাত্র। অপরিচিত স্থলে অগ্রিম মূল্য ব্যতীত 'সৌরভ' প্রেরিত হয় না। নমুনার জন্য এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে যে কোন সংখ্যা নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইয়া থাকে।

কার্য্যাধ্যক্ষ

সৌরভ কার্য্যালয়—ময়মনসিংহ।
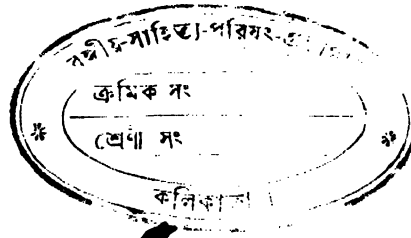
সৌরভ

চতুর্থ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩২২। { প্রথম সংখ্যা।

মনের উপর দেহের প্রভাব।

'আকাশস্থ, নিরালম্ব, বায়ুভূত, নিরাশ্রয়,'—এইরূপ আত্মার অস্তিত্বে সন্দেহ করিলে কাহাকেও ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা যাইতে পারে না, কারণ, এরূপ আত্মা থাকিলেও উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাহিরে। এই কথাটাই সকলের মতে ঠিক যে, আমরা যে আত্মা চিনি, তাহা সর্ব্বদাই দেহস্থ,-- আকাশস্থ নহে। এই খানে আগে হইতেই একটু টিপ্পনী না করিয়া উপায় নাই। আমরা বাংলায় সংস্কৃত দর্শনকারদের আত্মা ও মনের প্রভেদ মানিয়া চলি না, আমাদের ভাষায় আত্মা ও মন একার্থ বোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে---'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।' এই দেহস্থ আত্মা বা মন, দেহের সঙ্গে একত্র অবস্থান করে বলিয়াই দেহের প্রভাব কতকটা অনুভব না করিয়া পারে না। কিন্তু এই প্রভাব যে কতটুকু, পণ্ডিতেরা এখনও তাহা খানাপুরি ও গুজারত করিয়া—ঠিক ঠিক রেখা টানিয়া সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া, চূড়ান্ত রূপে বাদ প্রতিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তবে, কতকগুলি স্থূল সত্য আমাদের জানা আছে এবং তাহা হইতে মোটামুটি কয়েকটা সাধারণ সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির বিষয় একটু ভাবিলে উপকার দর্শিতে পারে; কারণ যাঁহারা দেহটাকে নিতান্তই একটা অনাবশ্যক খাঁচা মনে করিয়া তাহাকে পীড়িত ও সংকুচিত করিয়া নিজের বন্ধন মোচনের উপায় করেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে এরূপ করায় নিজের হানি বই লাভ নাই। উপকথার রাক্ষসীর পরাণপাখী ফটিকের খাঁচায় আবদ্ধ হইয়া জলগর্ভে নিমজ্জিত ছিল; মানবসন্তান যখন তার সন্ধান পাইয়া রাক্ষসীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঐ পাখীর একটী একটী করিয়া অবয়ব ছিন্ন করিতেছিল, রাক্ষসীরও তখন সেই সেই অঙ্গ খসিয়া পড়িতেছিল; অবশেষে ঐ পাখীর বিনাশের সহিত রাক্ষসীরও কণ্ঠমুক্তি ঘটিয়াছিল। মানবাত্মার সহিত তার দেহেরও ঐরূপ একটা সম্বন্ধ নাই, বলিতে হইলে সত্যের প্রতি অন্ধ হইতে হয়।

বাহ্য বস্তুর ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যে আমাদের দেহের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে, এ কথাটা যে না জানে, তাহার এখনও চোক ফুটে নাই। রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি জ্ঞান যে আমরা লাভ করি, সেত কেবল আমাদের চক্ষুরাদি দৈহিক ইন্দ্রিয় রহিয়াছে বলিয়া। অন্ধের যে দুগ্ধের রূপ-জ্ঞান হয় না এবং বধির যে সঙ্গীত ভোগে বঞ্চিত, সেত কেবল তাহাদের দেহের বৈকল্য-নিবন্ধন। মলয়ানিলের সুখস্পর্শ ত্বক্ না থাকিলে আমরা কিরূপে যে ভোগ করিতে পারিতাম, কল্পনা করা কঠিন; কাকলি শুনিয়া কবিরা যে কোকিল কে ভালবাসেন, সেটা ঠিক; কিন্তু কাণের প্রতি ও তাঁহাদের কিছু প্রেম থাকা উচিত। পেটুক যে রসগোল্লা ভালবাসে, যারা পেটুক না, তারাও একথা জানে; কিন্তু রসনাকে ভাল না বাসিলে তার

প্রতি যে পেটুকের অন্যায় আচরণ করা হয়, একথা সকলে মনে রাখে কিনা সন্দেহ। এই সমস্ত ব্যাপারে যে জ্ঞান ও যে ভোগ মনের ভাগ্যে জোটে, তার জন্য সে দেহের নিকট ঋণী।

এটা একটা অতি মোটা কথা। কিন্তু ইহার মধ্যেও একটু সূক্ষ্মত্ব আছে! গায়ক বলিলে আমরা এক বিশিষ্ট শ্রেণীর মানুষ বুঝি; তেমনই বাদক বা নৃত্যকর বলিলেও আমরা এক বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন মানুষ বুঝি; ইহাদের একটা বিশিষ্ট শক্তি আছে, যদ্দারা ইহারা অন্য হইতে পৃথক্। কিন্তু এই শক্তির আশ্রয় দেহ না মন? আওয়াজ ত সকলের গলা দিয়াই বাহির হয়; কিন্তু সকলের গলার গঠন একরূপ নয় বলিয়াই, স্বরের ও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বাজনার তাল মান শ্রবণশক্তির সাহায্যেই ঠিক করিতে হয়; এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের গঠন অনুসারে এই শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে, এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই; কারণ, যদিও চেষ্টাদ্বারা প্রায় সকলই এই শক্তিলাভ করিতে পারে, তথাপি সকলের যে এই শক্তি সমান হয় না, তার,—একমাত্র না হইলেও প্রধান কারণ,—শ্রবণেন্দ্রিয়ের গঠনে তারতম্য। সুতরাং মনের যে সমস্ত শক্তি বা গুণদ্বারা ব্যক্তির বিশিষ্টতা সম্পাদিত হয়, সেগুলি যে তার শারীরিক গঠনের বিশিষ্টতার উপর নির্ভর করে, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে। অবশ্যই ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীরের কোন্ স্থানের কোন্ স্নায়ুটী কিম্বা স্নায়ুকেন্দ্র কিংবা শিরা বা ধমনীটী, কোন্ ভাবে অবস্থান করিলে, কিংবা কিরূপ গঠনের হইলে, কোন্ বিশিষ্ট শক্তি বা গুণের সৃষ্টি হয়, তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। তবে, মোটামুটি আমরা ইহা জানি যে শরীর-গঠনের বিশিষ্টতার সঙ্গে মনের শক্তি বা গুণের বিশিষ্টতার অতি নিকট সম্বন্ধ।

ইহার আরও সূক্ষ্মতর প্রমাণ আছে। আমাদের মেজাজ, আমাদের চরিত্র, আমাদের ধার্ম্মিকতা কিংবা আমাদের পাপ-চিকীর্ষা—এ সমুদয়ও যে শরীরের উপর নির্ভর করে, তাহারও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। গ্রহণী কিংবা বদ্‌হজমি রোগ যাহাদের আছে, তাহাদের মেজাজটা যে একটুকু রুক্ষ হয়, তাহা প্রায়ই দেখা যায়। দময়ন্তী হংসকে দৌত্য কর্ম্মে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন—"পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি তিক্তায়তে হংসকুলাবতংস"—পিত্তদুষ্ট রসনায় শর্করাও তিক্ত বোধ হয়। কেবল শর্করা নয়, পিত্ত প্রধান ধাতু যাহাদের তাহাদের নিকট সমস্ত দুনিয়াটাই তিক্ত বোধ হয়। ক্ষুধার সময় যে সহজেই রাগ হয়, তাহা অতি অনায়াসে পরীক্ষা করা যায়। ক্ষুধা অবশ্যই একটা সাময়িক উত্তেজনা; কিন্তু যাঁহারা অতি সহজেই চটিয়া যান, তাঁহাদের যে ক্ষুধার কারণ পিত্তটা একটু প্রধান, তাহা বিজ্ঞান সম্মত কথা। আবার, কফ প্রধান ধাতুর লোকের মেজাজটা চটিবার সময়ও একটু অলস ভাবাপন্ন,—অন্ততঃ সহজে চটিয়া যাওয়াটা এরূপ লোকের অভ্যাস নয়, এরূপ প্রায়ই দেখা যায়।

দেখিতে দিব্যি পুষ্ট, সবল ও সুস্থ ছেলেদের মধ্যেও অনেক সময় কোপন-স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন যে, এরূপ ছেলে প্রায়ই কঠিন, শস্য-প্রধান খাদ্য, রুটি, ভাত ইত্যাদির পক্ষপাতী; ইহাদের মেজাজটা নরম করিবার জন্য শর্করাদি যুক্ত, তরল ও কোমল খাদ্যের ব্যবস্থা কেহ কেহ দিয়া থাকেন। আমাদের যোগশাস্ত্রেও কটু, অম্ল, অত্যধিক লবণ সংযুক্ত খাদ্য যোগ সাধনের অন্তরায় বিবেচিত হইয়াছে। মাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য লেখক এই এক যুক্তি দিয়াছেন যে, মাংসের জন্য পশুকে হনন করার সময় তার স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হয়; এবং তার ফলে, তাহার শরীরের একটা বিশিষ্ট অবস্থা উপস্থিত হয়; এই ক্রুদ্ধ দেহের মাংস আহার করিলে ভোক্তার দেহেও ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে, এবং কাজেই তিনিও কোপন হইবেন। হত হইবার সময় জন্তুর ক্রোধ হয়, না, ভয় হয়, তাহা বিবেচ্য; সুতরাং এই সিদ্ধান্ত কতটুকু ঠিক তাহা বলা যায় না। তবে, এই খাদ্যাখাদ্য বিচার হইতে ইহা পাওয়া যায় যে, খাদ্য বিশেষ দ্বারা মনের প্রবৃত্তি বিশেষের জন্ম হয়; কিন্তু খাদ্য হইতে দেহেরই বৃদ্ধি আগে, সুতরাং দেহের উপর মনের নির্ভর প্রমাণিত হইতেছে।

ভবিষ্যৎ বাতরোগের বীজ যাহাদের দেহে উপ্ত রহিয়াছে, রোগ প্রকাশ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক সময় তাহাদের নাকি অত্যন্ত কর্ম্মপটুতা ও শ্রমশীলতা লক্ষিত হয়। এই কারণে যাহাদের দেহে যকৃতের ক্রিয়া তত ভাল নহে, তাহাদের প্রকৃতি পৃথক্; তাহাদিগকে চিন্তায় ও কাজে প্রায়ই একটু মন্থর গতি দেখা যায়। কিন্তু বাতের বীজ যে শারীরিক ও মানসিক শ্রম পটুত্ব বাড়াইয়া দেয়, সে কেবল রোগ প্রকাশ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই; রোগ প্রকাশ্যে আক্রমণ করিলে পর প্রায়ই রোগীর অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। বাত রোগীর একান্ত কর্ম্ম পটুত্বের একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত ইংলণ্ডের ইতিহাসে পাওয়া যায়; প্রধান মন্ত্রী প্রথম পিট্ প্রায় জন্মাবধিই বাত-প্রপীড়িত ছিলেন।

কোন কোন স্থলে ভবিষ্যৎ-বাত-রোগীর মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ দেখা যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, স্ত্রীলোকদের কোপন স্বভাবের ইহাই একমাত্র না হইলেও প্রধানতম কারণ। প্রথম বয়সে কোপন-স্বভাবা রমণী মাত্রেই শেষ বয়সে বাত গ্রস্ত হন কিনা, বর্ত্তমান লেখক তাহা বলিতে পারেন না, কিন্তু এই নিয়মের সত্যতার পক্ষে দুই চারিটী দৃষ্টান্ত তাঁহারও জানা আছে। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক সক্রেটিসের পত্নী লক্ষ্মীবতী জেন্থিপ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। স্বামীর যেমন ঠাণ্ডা মেজাজ ও গম্ভীর প্রকৃতি ছিল, ইঁহার তেমনই প্রচণ্ডা প্রকৃতি ছিল। অনেক রকমে একাধিকবার তিনি স্বামীকে শাসন করিয়াছিলেন, ইতিহাস তার দুই একটী দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখিয়াছে। একদা সক্রেটিস দর্শনের কোন্ কূট প্রশ্নে নিমগ্ন ছিলেন; তখন পারিবারিক কোনও এক বিষয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক হইয়াছিল; জেন্থিপ্ তার স্বভাব সিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বার বার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, ঘর পরিষ্কার করিবার জন্য হাতে যে এক বাল্তি জল ছিল, তাহাই নিঃশেষ করিয়া সক্রেটিসের চিন্তাশীল মস্তকে ঢালিয়া দেন। সক্রেটিস্ যে পত্নীর বাগ্মিতা পূর্ব্বে শুনিতে পান নাই, তা নয়; কিন্তু উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। এবার কিন্তু আর বাক্যব্যয় না করিয়া পারিলেন না। 'এরূপ গর্জ্জনের পর কিঞ্চিৎ বর্ষণ আমরা আশা করিয়াই থাকি'—বলিয়া সক্রেটিস মাথাটী মুছিয়া ফেলিলেন। এমন যে বদ্ মেজাজ, তার কারণ, কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, জেন্থিপের শরীরে বাতের বীজ স্বরূপ একপ্রকার অম্লাত্মক উষ্মা বর্ত্তমান ছিল।

দেহের রোগ হইতে যে স্বভাব ও মেজাজের পরিবর্ত্তন হয়, তাহার আরও প্রমাণ আছে। যাহাদের অনিদ্রা রোগ আছে, প্রায়ই যাহাদের নিদ্রাহীন-রাত্রি যাপন করিতে হয়, তাহারা প্রায় সর্ব্বদাই এক দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করে, এবং একটা বিষাদের ঘন ছায়া তাহাদের সমস্ত প্রকৃতিটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। লেস্‌নি উইল্‌সন্ নামক একব্যক্তি মনে করেন যে পৃথিবীতে যত আত্মহত্যা হয়, তাহার অর্দ্ধেকই ভোরের বেলা সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশই প্রায়িক নিদ্রাহীনতার ফল। ডাক্তার হেইগ নামক একব্যক্তি বলিয়াছেন যে বদ্‌হজমির দরুণ মানসিক আবিলতা হইতে যত আত্মহত্যা ঘটে অন্য কোন কারণে তত নয়। প্রায়শঃই যাহারা রোগে ভোগে, তাহাদের মনের এমনই একটা বিকৃত অবস্থা উপস্থিত হয় যে, অনেক সময় তাহার ফলে তাহারা খুন খরাবীও করিয়া ফেলে, এরূপ দেখা যায়। সহজে উত্তেজিত হওয়া যাহাদের প্রকৃতি, প্রায়িক রোগ তাহাদের মনে কি ভীষণতা আনয়ন করিতে পারে। ফরাসী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা কুপ্রসিদ্ধ ম্যারাটের জীবনে আমরা তাহা দেখিতে পাই। বাল্যকাল হইকেই একগুঁয়ে ম্যারাট্ যৌবনে প্রতি কার্য্যেই একটা উদ্দাম উন্মাদনার অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। একান্ত আত্মাভিমানী তিনি তাঁহার প্রত্যেক অকৃতকার্য্যতার জন্য কল্পিত এক শত্রুপক্ষকে দোষী করিতেন, এবং ক্রমে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। ডাক্তারী তাঁহার ব্যবসায় ছিল; ব্যবসায়ের অনুরোধে যে একটু আধটু রক্তপাত করিতে হইত, তাহাতেই তাঁহার কষ্ট বোধ হইত। কিন্তু এই ম্যারাটই বিদ্রোহের সময় রক্তের প্লাবনে সাঁতার দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক, দুশ্চিকিৎস্য চর্ম্মরোগ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার মানসিক সোয়াস্তি হইতে

বঞ্চিত রাখিয়াছিল। সোজা হইয়া হাঁটা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর ছিল, এবং হাঁটিবার সময় প্রতিপদেই তিনি তাঁহার দেহটাকে যেন ছুঁড়িয়া ফেলিতেন। এ সমস্তই রোগের ফল, এবং রোগের ফলেই তাঁর এই প্রচণ্ড শোণিত পিপাসা জন্মিয়াছিল।

ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতিকে একপ্রকার সাময়িক মানসিক রোগ মনে করা যাইতে পারে। ক্রোধের জন্য কোন প্রকার পাঁচন বা বড়ি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই বটে, কিন্তু সকলেই জানেন যে ক্রোধের সময় এক সহজ-দৃশ্য শারীরিক অবস্থা উপস্থিত হয়; চক্ষু রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ কম্পমান, করতল মুষ্টিবদ্ধ, এবং কখনও কখনও সমস্ত শরীরে এক কম্প, প্রভৃতি ক্রোধের শারীরিক লক্ষণ। আমেরিকার প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ উইলিয়ম জেমস্ বলেন, এগুলি যে কেবল লক্ষণ, তাহা নহে; ইহারাই ক্রোধের উৎপাদক। কেবল ক্রোধের বেলায়ই যে ইহা সত্য, তাহা নহে; ভয়, দুঃখ, প্রভৃতি সমস্ত মানসিক উত্তেজনারই হেতু পূর্ব্ববর্ত্তী শারীরিক উত্তেজনা। দুঃখ হয় বলিয়াই যে আমরা কাঁদি তা নয়; কাঁদি বলিয়াই দুঃখ নামক মানসিক অনুভূতিটী জন্মে; আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, ভয় পাইয়া দৌড়িল; কিন্তু বাস্তবিক জেম্‌সের মতে লোকে দৌড়ে বলিয়াই ভয় পায়। অর্থাৎ রোদন বা পলায়ন প্রভৃতির বেলায় যে শারীরিক উত্তেজনা ও ক্রিয়া উপস্থিত হয়, তারই ফলে দুঃখ বা ভয় প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনা জন্মে। জেম্‌সের এই মতের পক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, ঐ সকল মানসিক উত্তেজনা কখনও সেই সেই শারীরিক উত্তেজনা ছাড়া দেখা যায় না; অথচ যদি চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল শারীরিক উত্তেজনা রুদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মানসিক উত্তেজনাও অন্তর্হিত হয়;—যাঁহারা অন্তরের ক্রোধ দমন করিতে চায়, তাহাদের প্রথমেই চেষ্টা করিতে হইবে, চোক যাহাতে রক্তবর্ণ না হয়, ঠোঁট যাহাতে না কাঁপে ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ যদি ঔষধ প্রয়োগ কিম্বা অনুকরণ কিম্বা অন্য কোন উপায়ে শারীরিক উত্তেজনাটী উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে তার অনুযায়ী মানসিক উত্তেজনাও না আসিয়া পারে না; শুনা যায় একজন প্রসিদ্ধ নট রঙ্গমঞ্চে মৃতাবস্থার অনুকরণ করিতে গিয়া সত্য সত্যই মরিয়া গিয়াছিল। মনে আনন্দ হইলে আমরা হাসি, কিন্তু সুরসুরি কিম্বা ঔষধ বিশেষ দ্বারা যদি হাসি উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে মনের আনন্দও যে কিছু না পাওয়া যায়, এমন নহে। জেম্‌সের এইমত বিদ্বৎ সমাজে এখনও সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট সত্য নিহিত রহিয়াছে। এবং ইহা দ্বারাও মনের উপর শরীরের প্রভাবই প্রমাণিত হইতেছে।

উন্মাদ একটা মানসিক রোগ। কিন্তু ইহা সব জায়গায় না হইলেও প্রায়শঃই শারীরিক, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের বিকৃতি হইতে জন্মে। উন্মাদ রোগ যে সব সময় চিকিৎসা-সাধ্য তা নয়; চিকিৎসায় যখন ফল না পাওয়া যায়, তখনই উহাকে একান্ত মানস বিকার মনে করা হয়; কিন্তু সেখানেও যে উহা শরীরের বিকারের জন্য নয়, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই;—চিকিৎসাশাস্ত্র এখনও সব রকম শারীরিক বিকার অপনীত করিতে পারে না। ঔষধ প্রয়োগে যেখানেই উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়, সেখানে উহাকে শরীর বিকার-জন্য মনে করিবার প্রবল হেতু এই যে, ঔষধ আপাততঃ শরীরেরই পরিবর্ত্তন সাধন করে। অধিকন্তু অনেক জায়গায়ই উন্মাদরোগের সৃষ্টি গাঁজা প্রভৃতি নানা প্রকার নেশা হইতে হয়; এ সকল যে শরীরের কি প্রকার পরিবর্ত্তন সাধন করে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে, এবং অন্যেও সহজেই অনুমান করিতে পারেন। এখানেও আমরা মনের উপর দেহের প্রভাবের প্রমাণ পাইতেছি।

মদ্যপায়ীকে প্রায়ই সরলান্তঃকরণ হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ যখন নেশার আমল হয়, মদ্যপায়ী তখন অত্যন্ত দেল-খোস হইয়া যায়, কুটিলা নীতির অনুসরণ তাহার পক্ষে তখন অসম্ভব হইয়া পড়ে; দুনিয়াটা তাহার কাছে তখন অত্যন্ত সরল বোধ হয়, আনন্দ ছাড়া আর কিছু যে মানুষের অভিজ্ঞতায় আসিতে পারে, সে জ্ঞান তাহার প্রায়ই থাকে না। ইহাও মনের উপর দেহের প্রভাবের আর একটা দৃষ্টান্ত। তান্ত্রিকেরা যে মদ্যপানকে সাধনের সহায়ক মনে করিতেন,

তাহারও মূলে দেহ ও মনের মধ্যে এই সম্বন্ধে বিশ্বাস রহিয়াছে

দেহের রোগ হইতে মনের যে কেবল বিকারই উপস্থিত হয়, এমন নহে। শিশুদের মধ্যে অনেক সময় একটা অকাল পক্কতা দৃষ্ট হয়; সুপ্রসিদ্ধ মাষ্টার মদন তার একটি দৃষ্টান্ত। বুদ্ধি শক্তি বা মনের অন্যবিধ শক্তি কখনও কখনও সময়ের পূর্ব্বেই পক্কতা লাভ করিতে দেখা যায়। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ তিন বৎসর বয়সে গ্রীকভাষা শিখিয়াছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত যে একান্ত বিরল তাহা নয়। এই অকাল পক্কতা অনেক সময় শারীরিক ব্যাধি হইতে জন্মে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই ব্যাধির স্বরূপ সব সময় নির্দ্ধারণ করা কঠিন; কিন্তু প্রায়শঃই এই রূপ ছেলের শারীরিক দুর্ব্বলতা স্পষ্ট লক্ষিত হয়; এবং কোন কোন স্থলে এই অসাময়িক পক্কতার ফলে অকাল মৃত্যু ঘটিতেও দেখা গিয়াছে।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হইতে যে একটী মানসিক অবসাদ জন্মে। তাহা বর্ত্তমান যুগে কাহারও অবিদিত নহে। যাহাদের স্নায়ু অত্যন্ত দুর্ব্বল,তাহাদের মধ্যে কখনও কখনও এমনও দেখা যায় যে একদিন অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্যম আবার পরদিন সেই পরিমাণ অবসন্নতা তাহাদের প্রতিকার্য্যে অঙ্কিত রহিয়াছে। এইরূপ রোগীর শরীরে ব্যাধির স্পষ্ট চিহ্ন প্রায়ই কিছু দেখা যায় না; কিন্তু ইহাদের মেজাজ খিট্‌ খিটে, মতি অস্থির, আত্মীয় স্বজনের প্রতি ব্যবহার হেঁয়ালির মত— কখনও একান্ত অনুরাগ, কখনও আবার অকারণে বিরাগ—এইরূপ প্রায়ই দেখা যায়। অনেক সময় এক দুরপণেয় খেয়াল ইহাদের মস্তিষ্ক চাপিয়া বসে, এবং তার ফলে কঠিন সুকর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্ম করা ইহাদের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। ইহাও মনের উপর দেহের প্রভাবেরই ফল।

কোন কোন ডাক্তারের মতে এই স্নায়বিক শক্তির হ্রাস রক্তের তেজঃক্ষয় হইতে জন্মে, এবং রক্তের তেজঃক্ষয় আবার আহারের দোষে ঘটে। অম্লাক্ত খাদ্য স্নায়ুর পক্ষে হানিজনক, এবং ক্ষীয়মান স্নায়ু হইতে আবার একপ্রকার বিষ উৎপন্ন হইয়া স্নায়ুর ধ্বংসের গতি বাড়াইয়া দেয়। আহারে অবিবেচনা—পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব—প্রায়ই উত্তেজক দ্রব্য গ্রহণে ইচ্ছা জন্মায়। অত্যধিক চা, কাফি, মদ্য, তামাক, এমন কি লবণ, কেবল উত্তেজক নয় স্নায়ুর পক্ষে বিষতুল্য। বর্ত্তমান সময়ের স্নায়বিক রোগের প্রাচুর্য্য এই সমস্তের অসংযত ব্যবহার হইতেই প্রায় ঘটে, এরূপ কেহ কেহ মনে করেন। ফরাসী নায়ক ম্যারাট একজন ভয়ানক কাফিখোর ছিলেন।

শারীরিক রোগ হইতেই সব সময় মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি না ও হইতে পারে; কখনও কখনও মানসিক ব্যাধিও পৈত্রিক হইতে পারে; কিন্তু শারীরিক ব্যাধি সর্ব্বদাই মানসিক বিকৃতির সহায়ক। আত্মসংযম দ্বারা কখনও কখনও মানস বিকারের দিকে রোগের ক্রিয়া স্থগিত রাখা যায় বটে, কিন্তু রোগের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত পতনের আশঙ্কা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিবে।

যাহাদের চিত্ত একান্ত পাপ প্রবণ, যাহারা ডাকাত বা খুনী বা চোর, সহস্র শাসন সত্ত্বেও যাহাদের এই কুপ্রবৃত্তি দমিত হয় না, তাহাদের এই পাপচিকীর্ষা শারীরিক ব্যাধিমূলক, এরূপ মতও আজকাল অনেকে পোষণ করেন। অর্থাৎ পাপ প্রবৃত্তি একটা জ্ঞেয় অথবা অজ্ঞেয় শারীরিক ব্যাধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেক সময় এই ব্যাধি পাপীর নিজের না হইয়া বংশানুক্রমে সংক্রান্ত ব্যাধিও হইতে পারে; কিন্তু এই পাপ চিকীর্ষার কারণ যে দৈহিক অস্বাস্থ্য, তাহা মনে করিবার হেতু এই যে, প্রায়ই দেখা যায় পাপপ্রবণতা নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যেই বেশী; অর্থাৎ যাহারা ভাল খাওয়া পায় না, ভাল খাওয়ার পায় না, অস্বাস্থ্য কর গৃহে বাস করে, তাহারাই প্রায় পাপের দিকে ঝুকিয়া পড়ে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে ভাল ভাল ছাত্রাবাস নির্ম্মানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার মূলেও এই বিশ্বাস রহিয়াছে। ছাত্রেরা অল্প পয়সায় যেমন তেমন গৃহে বাস করে, যা তা খায়, ফলে শরীর অপুষ্ট থাকায় মানসিক বিষাদও তাহা হইতেই প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে এবং অন্যবিধ পাপের দিকে ঝোক উৎপন্ন হয়। ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিলি জোলা এবং কতক অংশে ভিক্টর হিউগো প্রভৃতির উপন্যাসে যদি কিছু তথ্য থাকে, তবে তাহাও বোধ হয় এই যে, সমাজ নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে একটা আবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া তাহাদের পাপ

প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় এবং ফলে নিজেরই অনিষ্ট করে।

কেবল রোগ উৎপাদনের বেলায়ই মনের উপর দেহের প্রভাব লক্ষিত হয়, এমন নহে। যোগ শাস্ত্রে যোগ সাধনের সহায় স্বরূপ দেহকে উন্নীত করিবার ব্যবস্থা আছে। বিবিধ প্রকার আসন, প্রাণায়াম, প্রভৃতির যে ব্যবস্থা হঠযোগে পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা প্রথমতঃ শরীরেরই অবস্থা বিশেষ আনীত হয়; এবং তারই ফলে মানসিক উৎকর্ষ উৎপন্ন হয়।

আরব্য উপন্যাসে এক বাদসাহের কাহিনী আছে; তিনি ক্ষয় রোগ গ্রস্ত ছিলেন। রাজ্যের সমস্ত চিকিৎসকের চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল, তখন এক হাকিম আসিয়া বলিল 'আমার প্রণালী মতে চিকিৎসিত হইলে- আপনি ভাল হইবেন।' বাদশাহ সম্মত হইলে হাকিম তাহাকে একটী লোহার গোলা ও একটী যষ্টি দিয়া কহিয়াছিল, 'আপনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যা বেলায় ঘোড়ায় চড়িয়া এই গোলাটী যষ্টী প্রহারে কিছু দূর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া নিবেন এবং আবার ফিরাইয়া আনিবেন; ক্রমে আপনাকে এই দূরত্ব বাড়াইতে হইবে। এই গোলায় ঔষধ আছে।' বাদশাহ করার নিলেন. একমাস মধ্যে আরোগ্য না হইলে হাকিমের প্রাণদণ্ড হইবে। মাসান্তে আরোগ্য লাভ করিয়া যখন বাদশহ হাকিমকে ঔষধটি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হাকিম তখন বলিয়াছিল, ইহা দ্বারা আপনি যে ব্যায়াম করিয়াছেন, ইহাই ঔষধ, অন্য কোন ও ঔষধ আমি দেই নাই।' ব্যয়াম দ্বারা যে শরীরের স্ফূর্ত্তি এবং সেই হেতু অনেক ছোট খাটো ব্যারামের বিনাশ হয়, এবং তার ফলে মনের ও স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয়, তাহা কে না জানে? সুতরাং শুধু মনের বিকার নয়, তার স্বাস্থ্যও শরীরের উপর নির্ভর করে।

আমেরিকার মনস্তত্ত্ববিদ্ উইলিয়ম জেম্‌সের নাম পূর্ব্বেই আমরা করিয়াছি। লোকের প্রচণ্ড ধর্ম্মভাব যে শারীরিক অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে, ইহা তাঁহার আর একটী অভিনব মত। মোটামুটি ইনি বলিতে চান যে যাঁহারা একান্ত ধার্ম্মিক তাঁহাদের স্নায়ুগুলি কিঞ্চিৎ পীড়িত। অবশ্যই ইনি বার বার বলিয়াছেন যে কোনও একটা বিশ্বাস বা মতের মূল্য তাহার উপকারিতা ও কার্য্যকারিতা দ্বারাই নিরূপণ করিতে হইবে, উৎপাদক কারণ দ্বারা সে মূল্য নিরূপিত হইতে পারে না। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হইতে ধার্ম্মিকতার জন্ম হইলেই যে ইহার মূল্য কমিয়া যাইবে এমন তিনি বলিতে চান না, কারণ, হইতে পারে কতকগুলি সত্য যাহা স্নায়ুরোগ গ্রস্ত তাহারাই দেখিতে পায়। রোগের স্বরূপ— যে ভোগে, সেই জানে ভাল; তাই বলিয়া রোগ সম্বন্ধে জ্ঞানের মূল্য কমিয়া যায় না। সেইরূপ আধ্যাত্মিক সত্য ও স্নায়ুরোগ গ্রস্তের নিকট সহজে আবিষ্কৃত হইলেই যে ইহার মূল্য কমিয়া যাইবে, এমন নহে। এই সত্যের যদি উপকারিতা থাকে, তবে ইহা মূল্যবান বলিয়া গৃহীত না হইয়া পারিবে না।

তথাপি যেমস্ ইহা অবিশ্বাস করেন না যে সমাধি, মোহ, ঈশ্বরের বা তাঁহার দূতের সহিত সাক্ষাৎকার, মৃত আত্মার সহিত কথোপকথন, বিবিধ স্বপ্ন, দৈববাণী প্রভৃতি ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ঘটনা যাহাদের জীবনে ঘটে, তাহাদের স্নায়ু অত্যন্ত দুর্ব্বল, এবং সেই জন্য সহজেই উত্তেজিত হয়। জর্জ্জফক্স খ্রীষ্টান ধর্ম্মের এক প্রসিদ্ধ উপশাখা কোয়েকর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি এক জন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং ইহার আধ্যাত্মিক শক্তি সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি ইনি প্রায়ই যে সমস্ত জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেন, যে ভাবে ঘন ঘন যীশুর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতেন, তাহা হইতে জেম্‌স্ মনে করেন, ইহাঁর স্নায়ুর অবস্থা ভাল ছিল না। এই অনুসারে, সেণ্ট্ পল, কার্লাইল প্রভৃতির একান্ত ধর্ম্ম প্রবণতা মৃগী ব গ্রহণী রোগ হইতে জাত, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। একথা সত্য যে কার্লাইলের পরিপাক যন্ত্রের রোগ ছিল, এবং ইহাও সত্য যে সেণ্ট্ পলের মৃগী ছিল।

সুইডেনবর্গ এক বিখ্যাত ধর্ম্ম প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অনেকবার ঈশ্বরের মুখের কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের দূত ও পারিষদ বর্গের সঙ্গে যে তাঁর কতবার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁর অন্ত নাই ইনি মূর্খ ছিলেন না, তখনকার বিজ্ঞানে ইনি পারদর্শী ছিলেন। তথাপি যে ইহার এরূপ, ঘন ঘন জিন পরীর

সহিত সাক্ষাৎ ঘটিত, তার কারণ, কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার দুর্ব্বল স্নায়ুর অকারণ উত্তেজনা। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে খৃষ্টান সমাজে যে সমস্ত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ছিলেন, শরীরকেই সকল পাপের উত্তেজক কারণ মনে করিয়া তাঁহারা উহাকে এতই নিপীড়িত করিতেন যে ফলে এমন এক দৈহিক অবস্থা উপস্থিত হইত যে বিবিধ প্রকার দিবা স্বপ্ন তাঁহাদের জীবনের নিত্য ব্যাপার ছিল। তাঁহারা প্রায়ই দেখিতেন যে ঈশ্বর স্বয়ং কিংবা যীশু কিংবা অন্য কোন অনুচর বা সেবক তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং নানাপ্রকার আদেশ করিতেছেন; এই সমস্ত আদেশ তাঁহারা এত তেজের সহিত প্রচার করিতেন যে, লোকে শ্রদ্ধার সহিত না শুনিয়া পারিত না। স্বাভাবিক আহার বিহারে পুষ্ট সাধারণ লোকের ভাগ্যে যে এরূপ অতীন্দ্রিয় দর্শন ঘটে না, তাহা হইতেই অনেকে মনে করেন যে একান্ত উপবাসাদি-জনিত স্নায়বিক ব্যাধিই এই মানসিক ব্যাধির নিদান।

আমাদের দেশেও নবযুগে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তক মুনি ঋষির আবির্ভাব হইতেছে, মোহ বা সমাধি তাঁদের একটী নিত্য ব্যাপার। জেম্‌সের মতাবলম্বী ডাক্তারদের হাতে পড়িলে ইঁহাদের স্নায়বিক ব্যাধি নির্ণীত হইত কিনা বিবেচ্য।

মূলকারণ সম্বন্ধে জেম্‌সের এই মত হইলেও তিনি এই সকল আধ্যাত্মিক ব্যাপারের প্রতি স্পষ্ট অসম্মান দেখান নাই; আমরা অস্পষ্ট অসম্মান দেখাইতেও অনিচ্ছুক। আমাদের প্রামাণ্য বিষয় মনের উপর দেহের প্রভাব—এই সমস্ত ব্যাপারে যে তাহা প্রমাণিত হইতেছে, এইটুকু স্বীকৃত হইলেই আমরা যথেষ্ট মনে করিব।

রোগ প্রভৃতির জন্য শারীরিক যন্ত্রনায় মনের ভাবান্তর, এবং শরীরের স্ফূর্ত্তিতে মনেরও স্ফূর্ত্তি, এই সাধারণ বিষয়টী সকলেরই জ্ঞানে আসে। বিবধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারাও তাহা স্থিরীকৃত হইতেছে। কিন্তু এইখানে আমরা আর একটী বিষয় না ভুলিয়া যাই যে, মনেরও দেহের উপর প্রভুত্ব আছে। ইচ্ছাকৃত অঙ্গচালনা প্রভৃতি ব্যাপারে যে মন দেহের চালক ও কর্ত্তা, তাহা সকলেই জানে। তাহাছাড়া অনেক শারীরিক ব্যাধিও মনের অবস্থা হইতেই উৎপন্ন হয়; যাঁহারা সর্ব্বদাই মনে করেন, তাঁহাদের কোন রোগ আছে, নীরোগ হইলেও তাঁহারা শীঘ্রই রোগের আমলে আসিয়া পড়েন। আবার, অনেক শারীরিক—বিশেষতঃ স্নায়বিক ব্যাধি, মনের চিকিৎসায় সারিয়া যাইতে দেখা যায়; বাস্তবিক ব্যাধি রহিয়াছে, অথচ মন যদি ভাবে ব্যাধি নাই, আমি ভালই আছি, এবং সেই অনুসারে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিমান্ থাকিতে পারে, তাহা হইলে শীঘ্রই ব্যারামও নিরুদ্দেশ হয়।

জড় ও চেতনের মধ্যে এক অলঙ্ঘ্য ব্যবচ্ছেদ কল্পনা করিয়া প্রতীচীর দর্শন মন ও দেহের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দিতে বড়ই মুস্কিল বোধ করিয়াছেন। একটা অতি-জড়, অতি-চেতন সত্তাবিশেষের কল্পনা করিয়া স্পেন্সর প্রভৃতি কেহকেহ এই মুস্কিল এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন; সে চেষ্টা সকলের মনোমত হয় নাই বটে, কিন্তু সত্তাবিশেষের কল্পনা দ্বারাই হউক কিংবা অন্যকোন প্রকারেই হউক, জড় ও চেতনের মধ্যে প্রভেদ টুকু কমাইয়া না আনিলে ইহার ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। ইহার অধিক এখানে বলিতে চেষ্টা করিতে পারি না; কারণ প্রবন্ধের কায়বৃদ্ধি হইলে সম্পাদকীয় ছুরিকাঘাতে তাহা ক্ষত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সন্ন্যাসী প্রসঙ্গ।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

বিগত গ্রীষ্মাবকাশে একজন সন্ন্যাসীর সহিত আমার কয়েকটী বিষয়ে আলোচনা হয়, কথা প্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "অনেকের মুখে শুনিতে পাই, সাধু সন্ন্যাসীরা নাকি অনেক সময় অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। আপনি তো বহুদিন হইল এ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আপনি স্বচক্ষে এমন কিছু দেখিয়া থাকিলে তাহা বলিয়া আমার কৌতুহল নিবারণ করিবেন কি? শুধু কৌতুহল নিবারণ করাই যে উদ্দেশ্য তাহা নহে, বাস্তবিক আমরা আজ কাল সমস্ত মন দিয়া অনেকেই

সাধু সন্ন্যাসীদিগের এই অঘটন সঙ্ঘটন করিবার শক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, যাঁহারা এই সব কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা অনেকেই এক প্রকার ভেল্কিদার, স্বীয় স্বার্থ সাধন করিবার জন্য নানা প্রকার কল কৌশল জাহির করিয়া বেড়াইয়া থাকেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "না, আমি ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারি না। তাহা হইলে হিন্দুর শাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টানের বাইবেল পর্য্যন্ত সকলই অবিশ্বাস্য এবং অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। সঙ্গলাভ হইলেও আমরা অনেকেই তাঁহাদিগকে চিনিয়া উঠিতে পারি না। শ্রীচৈতন্য যখন নদীয়ায় প্রথম প্রেমের বন্যা বহাইবার সুরু করিয়াছিলেন, তখন কয়জন তাঁহাকে চিনিয়াছিল ? খ্রীষ্ট যখন স্বর্গীয় সুধা লইয়া মানুষের ভবক্ষুধা মিটাইতে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলেন, তখন কয়জন তাহার প্রকৃতস্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন ? তবে আজ কাল হাটে-পথে, ঘাটে-মাঠে আমরা যে সকল সাধু দেখিতে পাই, ইহারা অনেকেই স্বার্থের কাঙ্গাল, প্রকৃত সাধুপদ বাচ্য হইবার অযোগ্য। চর্ব্বি-ঘি খারাপ প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া যে ঘি মাত্রেই খারাপ, এমন নহে। অনেক সাধু বিষয়ী মানুষের চিত্ত উচ্চতরদিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কখন কখন অতিলৌকিক কার্য্যাদির অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। বস্তুত: কার্য্য অসাধারণ হইতে পারে কিন্তু তাহা হইলেই যে তাহা অসম্ভব হইবে, এমন কিছু নয়। আমি যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আমরা সম্ভবের বেষ্টনীকে যতটা অবিস্তৃত বলিয়া মনে করিয়া থাকি প্রকৃত পক্ষে তাহা ততটা নহে। কর্ম্মী যতই আপনার পথে স্থিরলক্ষ্যে অধ্যবসায়ের সহিত অগ্রসর হইতে থাকেন, বিষয়ীয় সম্ভবের সংকীর্ণ বেষ্টনী তাহার নিকট হইতে ততই দূরে সরিয়া গিয়া তাহার পুরুষত্বের প্রসার-ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়। মহাপুরুষের কার্য্যাবলী তাঁহাদের পথ ধরিয়া কিছু অগ্রসর হইলে, তবে আমাদের বিচার করিবার শক্তি জন্মে। নিজের জায়গায় বসিয়া নিজের দৃষ্টির সীমার বাহিরের খবর আমরা কেমন করিয়া পাইব ? অগ্রসর হও, দেখিবে, কত অসম্ভব সম্ভব বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমার নিজের কথা, আমি যাহা জানি, তাহা হইতে তোমাকে কিছু বলিতেছি, শোন।

"গত অর্দ্ধোদয় যোগের সময় আমি আমার পূজ্য গুরুপাদসহ ৺কাশীধামে ছিলাম। একদিন গুরুদেবের সহিত ব্যাসকাশীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম ; বোধ হয়, আমার হৃদয়ের কয়েকটী অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হেতু আমার প্রতি গুরুদেবের সে দিন এ বিশেষ অনুগ্রহ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, আমরা দুই জনে গঙ্গার পর পারে সুদূর বিস্তৃত চড়া ভূমিতে—তখন যে বিপুল জন সমাগম হইয়াছিল—অচিরে তাহার মধ্যে মিশিয়া গেলাম। দেখিলাম, জনতার অধিকাংশই সাধু সন্ন্যাসী, কেহ আসন বদ্ধ, কেহ জপ পরায়ণ, কেহ নগ্নদেহ—স্বচ্ছসরল বালকের মত, কাহারও মুখমণ্ডল তপঃ—প্রবৃদ্ধ পবিত্র তেজে উদ্ভাসিত। কিছুকাল পরে গুরুদেব একজন সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে হিন্দিভাষায় অনেক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়া গেলে গুরুদেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় আমাকে উক্ত সাধুটির নিকট হইতে কিছু উপদেশ গ্রহণ করিতে বলিয়া গেলেন। আমি ভীতি-সঙ্কুচিত চিত্তে সেইখানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জানি না কেন, সেদিন একটু একটু ভয় ভয় করিতেছিল। বোধ হয়, সেই বিরাট সাধু সমাগম সন্দর্শনে আমার নিজের অহমিকা একটু দমিয়া গিয়াছিল, বুঝিতে পারিয়া ছিলাম, এ জগতে আমি কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ ও কিরূপ কীটাদপি কীট। আমি অনেক্ষণ হইল বসিয়া আছি, সন্ন্যাসী অভীষ্টে তন্ময়, নিমীলিত নেত্র। কিছুক্ষণ পরে একটু চোখ মেলিলেন, তাঁহার সকরুণ স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের ভাবই প্রকাশ করিতেছিল। আমি দণ্ডবৎ প্রণত হইলাম। সন্ন্যাসী—বলিলেন "আপনি কিজন্য এতক্ষণ এখানে বসিয়া আছেন ?" কথায় বুঝিলাম, তিনি বাঙ্গালী। একটু ঘেসিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া বসিলাম। ধীরে ধীরে বলিলাম, 'আপনার আদেশ পাইলে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই।' সন্ন্যাসী বলিলেন "করিতে পারেন, কিন্তু সময় বড় অল্প।"

সাহস পাইয়া আমি বলিলাম। "আপনার জীবনের কোন্ কার্য্য আপনার মনে এ তীব্র অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার উপযোগী ব্যাকুলতা আনিয়া দিয়াছিল, জানিতে ইচ্ছা হয়।" সন্ন্যাসী বলিলেন—"সে অনেক কথা, সংক্ষেপে বলিতেছি, শুনুন"—

"আপনি অবশ্য বুঝিতেই পারিয়াছেন, আমার নিবাস বঙ্গদেশে। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, আজকাল যেখানে বড়লাটের এক প্রকার প্রধান আস্তানা সেই সিমলা হিল্‌সে আমি ডেপুটীগিরি চাকরী করিতাম। বলা বাহুল্য পাশ্চত্য শিক্ষার যে সমস্ত অমোঘ দান—আমাদিগের সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া গড়িবার নবীন আকাঙ্ক্ষা দেশের ভিতর জাগাইয়া দিয়াছে, আমি তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলাম না।

"যুক্তি বাদ সিদ্ধ জ্ঞান আমার দৃষ্টি সংকীর্ণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্যের অনুকরণ চিকীর্ষা আমার মনে প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল। শাস্ত্র, পুরাণ, দেব দ্বিজে ভক্তি এবং অন্যান্য হিন্দুর বিশিষ্ট গুণাবলীর প্রভাব যাহাতে আমার সাহেব সাজিবার পথে বাধা হইয়া না দাঁড়াইতে পারে, সে জন্য আমি যথা সম্ভব ইহা হইতে দূরে থাকিতাম। কিন্তু এ হেন নিরীশ্বর বাদির উপরও তাঁহার কৃপাকটাক্ষ কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিয়া পড়িল, ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। ধন্য তাঁহার কৃপা, মুহূর্ত্তে অসম্ভব সম্ভব হইয়া পড়ে।

"ইংরাজীতে একটা কথা আছে "যেমন কর্ত্তা তেমনি চাকর জোটে"—বোধ হয়, আমার চাপরাসী গুলির উপর এ প্রবাদ বাক্যটী অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যকরী হইয়াছিল। আমার বাসার ত্রি-সীমানা দিয়া গরীব কাঙ্গাল এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য আসিতে সাহস পাইত না। আমার চাকরেরা তাহাদিগকে "নিকাল" হইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিতে সকল সময়ই প্রস্তুত থাকিত। সন্ন্যাসী দেখিলে তো আমার গা জ্বলিয়া যাইত; সুতরাং আমার কর্ত্তব্য-প্রিয় অনুচর বৃন্দ যাহাতে আমি এ উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জ্ঞানহীন না হই, তাহার জন্য সর্ব্বদা তৎপর থাকিত। কিন্তু কেমন করিয়া অসম্ভবও সম্ভব হইয়া গেল, শুনুন।

"আমার ছেলেটী একদিন বৈকাল বেলা পাহাড়ের উপর ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে গিয়াছিল; কেমন করিয়া একটা উচু জায়গা হইতে পড়িয়া যাইয়া তাহার হাতের হাড়টা ভাঙ্গিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে কয়েকজন ভদ্র লোক গাড়ী করিয়া তাহাকে আমার বাসায় পৌঁছাইয়া দিলেন; তখন সে অজ্ঞান। এই আকস্মিক বিপৎপাতে আমাদের সংসারের উপর বিষাদের একটা ঘনীভূত ছায়া আসিয়া পড়িল। আমার ছেলে জীবনসংশয় কাতর।

"সিমলার তিন চারিজন বড় বড় ডাক্তার সাহেবের উপর শ্রীমানের চিকিৎসার ভার অর্পণ করা হইল, কিন্তু তাহার অবস্থা ক্রমশ ভাল হইবার দিকে না যাইয়া মন্দের দিকেই যাইতে লাগিল। ডাক্তারেরা তাঁহাদের ক্ষমতায় যাহা করা যাইতে পারে, তাহা করিবার কিছুই বাকী রাখিলেন না; কিছুতেই কিছু হইল না। আমরা তাহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলাম।

"ইহার মধ্যে একদিন একটী সন্ন্যাসী আমার বাসার কাছে আসিয়া উপস্থিত। সম্ভবত, তিনি আমার প্রকৃতি অবগত ছিলেন না কিংবা আমার প্রকৃতি অবগত হইয়াই উপযুক্ত সময়ে আমার প্রতি বিশেষ কৃপাপরবশ হইয়া আসিয়াছিলেন। সেদিন ও চাপরাসীরা তাঁহাকে সহজে আমার বাসার কাছে আসিতে দেয় নাই। কিন্তু তিনি বহু বাধা সত্বেও রেলিং পার হইয়া ভিতরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে আমাকে কিছু খাইতে দাও।"

"সন্ন্যাসী ঠাকুর যখন একেবারে 'নাছোড় বন্দা' হইয়া বাসার ভিতরের দিকে উঁকি মারিতে উদ্যত হইলেন, তখন একজন চাপরাসী তাঁহাকে জানাইল, বাবুর ছেলের অসুখ তাহাকে বিরক্ত করিলে তিনি বড়ই রাগ করিয়া উঠিবেন, অন্যস্থানে যাও। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কি অসুখ হইয়াছে? আমাকে জানাও, আমি আরাম করিয়া দিতে পারি।"

"আমার স্ত্রীর কাণে ক্রমে এ সংবাদ যাইয়া পৌঁছিল। আমি তাঁহাকে হাজার করিয়া বিবি সাজাইবার চেষ্টা করিলেও তিনি এদেশের স্ত্রী-স্বভাব-সহজ ধর্ম্মানুরাগ

হইতে তখনও সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছিলেন না। আজ এ আকস্মিক বিপদে তাঁহার এ ভাবটা আরও যেন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি চাপরাসীকে বলিলেন – "সন্ন্যাসী ঠাকুরকে লইয়া আয়।"

"চাপরাসী তাহার মাতা ঠাকুরাণীর হুকুমের কথা আমাকে জানাইল, আমি ত শুনিয়া চটিয়াই লাল। আমার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির সহধর্ম্মিণীরও যে এ সমস্ত কুসংস্কার আজও দূর হইল না. এ কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি যুগপৎ লজ্জায় ও অনুতাপে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। চাপরাশীকে কড়া হুকুম দিলাম, সন্ন্যাসীকে দূর করিয়া দাও। এমন সময়, আমার স্ত্রী পর্দ্দা সরাইয়া সহসা আমার কামড়ায় আসিয়া উপস্থিত! তাঁহাকে দেখিয়া আমি বলিলাম –'তোমার আবার এ খেয়াল হইল কেন?' তিনি বলিলেন—'সন্ন্যাসী কোন ওষুধ না করিলেই ত হইল, সে কেবল মাত্র দেখিবে, ইহাতে তোমারই বা এত আপত্তি কেন? কার ভিতর কি গুণ আছে, তাহা কি সহজেই বুঝা যায়?' আমি দেখিলাম, তাঁহার এ রোখ সহজে ঘুরিবার নয়; ইহার মধ্যেই তিনি সন্ন্যাসীকে রাস্তা হইতে ডাকিয়া ফিরাইয়াছেন।

"আমার স্ত্রী নিজেই পথ প্রদর্শক হইয়া সন্ন্যাসীকে বাসার ভিতর লইয়া গেলেন। রুগ্ন ছেলেটীকে তাঁহাকে দেখান হইল। সে তখন তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছিল। তাহার প্রতি চীৎকার আমার মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়া আমাকে যে কি ভীষণভাবে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। সন্ন্যাসী আমার ছেলের হাতের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দিতে বলিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, তাহা হইলে তিনি উহা তৎক্ষণাৎ নিরাময় করিয়া দিতে পারিবেন।

"নিরক্ষর, অশিক্ষিত কোথাকার একটা বর্ব্বর আসিয়া কিসে কি করিয়া আমার ছেলেটীকে জীয়ন্তে মারিয়া ফেলিবে এ চিন্তায় আমি তখন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার স্ত্রীকে বলিলাম, আমি ডাক্তার আনিতে চলিলাম, তাঁহাদিগকে লইয়া না আসিলে যেন ব্যাণ্ডেজ্ কিছুতেই খোলা না হয়। আমার স্ত্রীর আর তখন আমার কথার দিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি সন্ন্যাসীকে লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। অচিরাৎ সন্ন্যাসীর আদেশক্রমে কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ লইয়া আসিয়া ধুনী জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। আমার মনটা তখন যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছিল; আমাকে ডাক্তার ডাকিতে হইবে, একথা আমি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম, একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর কাণ্ড কারখানাই দেখিতে লাগিলাম।

"যখন আমার বাসার উঠানের ভিতর সন্ন্যাসীর ধুনী রীতিমত জ্বলিয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহার নিকট যাইয়া আসন করিয়া বসিলেন এবং তাঁহার হস্তস্থিত চিম্‌টাটী আগুনের ভিতর দিয়া চোখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। আমরা ব্যাপারটা কি হয়, দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিলাম।

"প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এই ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সন্ন্যাসী আগুনের ভিতর হইতে সেই অনল-দগ্ধ চিমটা টানিয়া বাহির করিলেন। দূর হইতে সেটা লাল টক্ টক্ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী আস্তে আস্তে সেই জ্বলন্ত চিমটা নিজের বিস্তারিত জিহ্বার উপর দিয়া টানিয়া লইলেন। আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

"সন্ন্যাসীর কোন চাঞ্চল্য নাই। আবার পূর্ব্বের ন্যায় চিমটাটী আগুনের ভিতর দিয়া তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকালে পরে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন –'মাই! লেড়কে ক্যয়সে হোই। বস্তুতঃই আমার ছেলেটীর আর এখন সে হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ নাই। সে যে কথঞ্চিৎ ব্যাধির উপশম বোধ করিতেছিল, তাহার মুখ চোখ্ হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। চাহিয়া দেখি আমার স্ত্রী তাহার হাতের ব্যাণ্ডেজ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন ন্যাকড়াটা তাহার বিছানার পার্শ্বে পড়িয়া আছে।

"অর্দ্ধঘণ্টা পরে আবার সন্ন্যাসী তাঁহার চিমটা উঠাইয়া পুনরায় নিজের জিহ্বার উপর দিয়া টানিয়া লইলেন, এবং কিছুক্ষণ চোখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মাই! লেড়কে ক্যায়সে হোই?' আমার ছেলে তখন বেশ কথা বলিতে পারিতেছে, তাহার অবস্থার এমন দ্রুত পরিবর্ত্তনে আমরা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম।

আবার সেই পূর্ব্ববৎ চিমটা পোড়া ও জিহ্বার উপর দিয়া তাহা টানিয়া লওয়া—যখন সন্ন্যাসী প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া বিস্তৃত জিহ্বার উপর দিয়া সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়া করিতেছিলেন, তখন আমার গায়ের ভিতর যে কেমন সক্‌সক্ করিতেছিল, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। সে দৃশ্যের চিন্তা করিতে ও যেন গা কাঁপিয়া উঠে। আবার সেই মৌনাবস্থান এবং কিছুকাল পরেই জিজ্ঞাসা "মাই লেড়কে ক্যায়সে হোই!"

"এবার আমরা ছেলেকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইয়াছি। তাহার মুখে ব্যাধির বিশেষ কোন অভিব্যক্তি নাই। সে বলিতেছিল, বেশ একটু শক্তি বোধ করিতেছে ও তাহার একটু বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে!

"আবার সেই প্রক্রিয়া। এবার আমার ছেলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার হাতে কোন আঘাতের চিহ্ন নাই—বেশ্ সবল; সরলভাবে সে দুই হাতই চারিধারে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারিতেছে। আমরা যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম, লোক জন সকলেই ভিড় করিয়া আসিয়া আমার ছেলেকে দেখিতে লাগিল। আমার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহা হর্ষে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গোল ক্রমে মিটিয়া গেল, বাহিরেরদিকে চাহিয়া দেখি সন্ধ্যার সঞ্চরমান অন্ধকার উজ্জ্বল করিয়া ধুনি পূর্ব্বের ন্যায়ই জ্বলিতেছে। কিন্তু কই? সন্ন্যাসী কোথায়?

"সারা সহরে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গেল। চৌকিদার কনেষ্টবল হইতে আমার বাসার পাচক বামুন পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর খোঁজে ছুটীল। কিন্তু হায়! আর তাঁহার দর্শন পাইলাম না। তিনি আমাকে শিখাইতে আসিয়াছিলেন, শিক্ষা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর এ জীবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিনা, কে জানে?"

(২)

"আর একদিন বৈকাল বেলায় সিমলায় বেড়াইতে বেড়াইতে সহর ছাড়িয়া একটু দুরে গিয়া পড়িয়াছি; মনে রহিয়াছে—সেই সন্ন্যাসীর চিন্তা। বাস্তবিকই তাহার পর হইতেই আমার মনটা আর পূর্ব্বের মত নাই। ঐশী শক্তি যেন একটু একটু করিয়া আমার বজ্রসার পশুর হৃদয়ের তামস স্তর ভাঙ্গিয়া দিতে ছিল তাঁহার কর্ম্মের সাড়া আমি অবিরত বোধ করিতে ছিলাম। এক একটা করিয়া অসুর—দেবতার কাছে পদানত হইতে ছিল।

"আমি যে স্থানে আজ বেড়াইতে ছিলাম, তাহা একটা ঝরণার ধার। ঝরণার দক্ষিণে একটা অল্প পরিসর গভীর ফাটল, তাহার দক্ষিণে আমি; সূর্য্যদেব তখন অস্তাচল গমনোন্মুখ। একটু একটু রোদ আছে; এমন সময় দেখিলাম, একটী লোক একটা মৃত দেহ আনিয়া জলে ছাড়িয়া দিয়া গেল। মৃত দেহটা বেশ মোটা সোটা। সেটা স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমি স্রোতের অনুকূলে যাইতে ছিলাম, কাজেই মৃত দেহটা আমার নিকট হইতে বেশ সুস্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল।

"কিছু দুর চলিয়া আসিয়াছি, চিন্তা-রত চিত্তে কতটা পথ যে ছাড়াইয়া আসিয়াছি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। দেখিলাম, একজন শীর্ণ দেহ সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে জলের দিকে আসিতেছেন। তখন আঁধার হইয়া আসিয়াছে, আমি আকুল আগ্রহে দেখিতে লাগিলাম। সন্ন্যাসী দেখিতে দেখিতে মরাটীকে আসিয়া ধরিয়াছেন ও টানিয়া উপরে উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমার গা কাঁটা দিয়া উঠিল। কৌতুহল বড় বাড়িয়া গিয়াছিল; ভাবিলাম, ঘুরিয়া ওপারে যাইয়া দেখি, কিন্তু তাহা হইলে প্রায় মাইল খানেক হাটিতে হয়, পাছে সন্ন্যাসীর কার্য্য না দেখিতে পারি এই আশঙ্কায় ঘুরিয়া না যাইয়া এ পার হইতেই দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সন্ন্যাসী মোটা লাসটাকে টানিয়া উপরে তুলিয়া শয়ন করাইলেন ও তাহার বুকের উপর উঠিয়া আসন করিয়া বসিলেন। তাহার বার্দ্ধক্য-নত দেহ যথা সম্ভব ঋজু করিয়া স্থির লক্ষ্যে শবের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার চোক দুইটী যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে ছিল। দেখিতে দেখিতে তিনি অবশ হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং মৃত দেহটী উঠিয়া বসিল। রুগ্ন দেহটী জলে টানিয়া ফেলিয়া সেই নব লব্ধ-জীবন প্রাণিটী আস্তে আস্তে উত্তরদিকে চলিয়া গেল।

"অদৃষ্ট পূর্ব্ব এবং অশ্রুতপূর্ব্ব এই ব্যাপার দেখিয়া আমি একেবারে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ চিত্র পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। কত ভাবের তুমুল আলোড়ন যে আমার ভিতরে তখন যুগপৎ ক্রীড়া করিতেছিল, তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা এখন আমার নাই, ধীরে ধীরে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন বেশ রাত হইয়াছে। সেই হইতে আমার কর্ত্তব্য কার্য্যে আর তেমন মন লাগিত না। নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতাম, ভাবিতাম, এবং সময়ে সময়ে পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম। চিন্তার অবিরাম স্পন্দন আমাকে বিষয় কার্য্য হইতে ক্রমশঃ সরাইয়া লইতে লাগিল। তখন যে কি শূণ্যতা ও কি ব্যাকুলতা লইয়া জীবন যাপন করিতেছিলাম, তাহা আর কি বলিব!

"ভগবানের কৃপায় গুরুজীর দর্শন লাভ ঘটিল। আজ-কাল আমি সপরিবার তাহার সেবার ক্ষমতা পাইয়াছি, এবং আজ তাঁহারই আদেশ ক্রমে এখানে আসিয়াছি।"*

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

হিন্দুর কথা।

সেন্‌সাস্ রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, গত ১৯১১ সনে ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২১৭০৩ মিলিয়ন, অর্থাৎ ২১ কোটী ৭০ লক্ষ। ইহার সঙ্গে ব্রাহ্ম ও আর্য্যদিগের সংখ্যা যোগ করিলে আরও তিন লক্ষ বাড়িবে। তাহা হইলে ভারতবর্ষের মোট লোক সংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দশ আনি হিন্দু, বাকী ছয় আনি মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য জাতি।

এখন এই হিন্দু কাহাকে বলে? ইহা লইয়া মস্ত গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই হিন্দু নামে না বুঝায় এমন জিনিষ নাই। ইহা বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্ম বিশ্বাসের এক অপূর্ব্ব মিশ্রণ। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া হাড়ি মেথর চামার পর্য্যন্ত সকলেই হিন্দু। আবার একদেববাদী, বহুদেববাদী, বিশ্বদেববাদী এমন কি ভূতপ্রেতবাদী পর্য্যন্ত সকলেই হিন্দু। যাহারা শিবশক্তি বিষ্ণুর উপাসনা করে তাহারা হিন্দু, আবার যাহারা গাছপাথর নদীগিরিগুহাবাসী ভূতপ্রেতগণের পূজাকরে তাহারাও হিন্দু। যাহারা পাঁঠা মহিষ ভেড়া হাঁস মুরগী পারাবত বলি দিয়া দেবতার আরাধনা করে তাহারা হিন্দু, আবার যাহারা "কুমড়া কোটা" না বলিয়া "কুমড়া কাটা" বলিলে তাহা জীবহিংসা সূচক অপবিত্র জ্ঞানে ত্যাগ করে, তাহারাও হিন্দু। যাহারা ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি ও পাদোদক গ্রহণ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে তাহারা হিন্দু,—আবার যাহারা ব্রাহ্মণ দেখিলে লাঠি নিয়া তাড়া করে তাহারাও হিন্দু। ভারতবর্ষের কোন ২ সম্প্রদায় হিন্দু নামে গৌরব বোধ করেন, আবার এরূপ কেহ কেহ আছেন যাঁহাকে হিন্দু বলিলে তিনি ভয়ানক চটিয়া যান। শিখ্ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ইহার পূর্ব্ব লোক গণনায় হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, এবার তাঁহারা শিখ নামে অধিক গৌরব বোধ করিয়াছেন।

তবে মোটের উপর দেখা যায়, অনেক হিন্দুভাবের সঙ্গে হিন্দু নামটা ও ক্রমে অসম্প্রদায়িক হইয়া উঠিতেছে। একজন বাঙ্গালী গ্রন্থকার লোক গণনার বড়কর্ত্তা মিঃ গেট (Gait) কে লিখিয়াছিলেন—

"আমি শিবের প্রীতির জন্য শিবরাত্রি উপবাস করি, বিষ্ণুর প্রীতিকামনায় একাদশী করি, আমি যেমন শিবের প্রসাদ লাভার্থে বেল গাছ লাগাইয়াছি, তেমন আবার বিষ্ণুর পরিতোষের জন্য তুলসী গাছও রোপণ করিয়াছি। অধিকাংশ হিন্দুর মধ্যেই এখন আর সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি নাই। যে কয়েকজন লোক ইহা লইয়া বেশী লেখা লেখি করে, তাহাদের সংখ্যা অতিকম। তাহারা কেবল গোলমালই করে।"

অনেক তর্কবিতর্কের পরে লোকগণনার সুবিধার জন্য ঠিক করা হইল—হিন্দু বলিব কাহাদিগকে? না যাহারা মুসলমান নয়, খ্রীষ্টান নয়, বৌদ্ধ নয়, জৈন নয়,

---

* উপরে যে ২য় ঘটনাটী বলা হইয়াছে উহা যোগ শাস্ত্রে পর কায়ঃ প্রবেশ বলিয়া উক্ত আছে। কথিত আছে আচার্য্য শঙ্কর এই প্রক্রিয়া অবলম্বনে দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া ছিলেন এবং একবার কুকুর দেহ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনৈক ভক্তের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন।

শিখ নয়, ভূতোপাসক (animist) নয়, তাহারাই হিন্দু। বলা বাহুল্য ব্রাহ্ম এবং আর্য্যগণকেও হিন্দুর মধ্যে ধরা হইয়াছে, তবে তাহাদিগকে পৃথক সম্প্রদায় (sect) বলিয়া গণনাকরা হইয়াছে। সার এলফ্রেড ল্যায়াল (Sir Alfred Lyall) হিন্দুর যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা অনেকটা ঠিক। "When a man tells me he is a Hindu, I know that he means all three things taken together—religion, parentage and country......Hinduism is a matter of birthright and inheritance......it means a civil commcunity as well was religions association. A man does not become a Hindu, but he is born into Hinduism".

অর্থাৎ একজন যদি আমার নিকট হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় তবে আমি তিনটী জিনিষ বুঝি—তাহার ধর্ম্ম, তাহার বংশ, ও তাহার দেশ। হিন্দুত্ব জন্ম সাপেক্ষ। ইহার মধ্যে ধর্ম্ম ও জাতি দুইই আছে। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ না করিলে কেহ হিন্দু হইতে পারে না।

সেন্‌সস্‌ কমিশনার মিঃ গেট (Gait) বলেন, ঐ যে ধর্ম্ম, বংশ ও দেশের কথা বলা হইল উহার সঙ্গে আরও একটী চতুর্থ জিনিষ যোগ করিতে হইবে সেটী হইতেছে জাতি ভেদ। যে ব্যক্তি হিন্দু সমাজে পরিচিত কোন বিশেষ জাতির অন্তর্গত নহে, সে হিন্দু হইতে পারে না।

তাহা হইলে কথাটা এইরূপ দাঁড়াইল। তুমি রামচন্দ্র, তুমি এমেরিকায় গিয়াছ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তুমি কি?" তুমি বলিলে—"আমি একজন হিন্দু।"

প্রঃ। তাহার প্রমাণ?

উঃ। আমি ভারতবাসী।

প্রঃ। ভারতবাসীত মুসলমানও আছে?

উঃ। আমি ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের সন্তান, এই আমার গলায় যজ্ঞোপবীত দেখ।

প্রঃ। বেশ দেখিলাম। তোমার ধর্ম্ম কি?

উঃ। আমি শৈব।

প্রঃ। আচ্ছা বেশ। তুমি জাতিভেদ মান?

উঃ। তা—তা মানিব না কেন? আমি দেশে গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব।

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম আবদুল কাদের নামক এক ব্যক্তি আমেরিকায় গিয়া কোন অপরাধে বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ বাহির হইয়াছিল—"A Hindu named Abdul Kadir was accused of theft &c" (আবদুল কাদের নামক একজন হিন্দু চুরি মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছিল) এস্থলে হিন্দু মানে ভারতবাসী বুঝিতে হইবে। শুনা যায়, ভারতবর্ষের মুসলমান আক্রমণকারিগণ সিন্ধু নদীর পূর্ব্ব পারবর্ত্তী বলিয়া অবজ্ঞা ভরে ভারতবাসী দিগকে হিন্দু বলিত, হিন্দুরা যেমন ম্লেচ্ছ বা যবন শব্দ ব্যবহার করিতেন। তাহারা কি তখন জানিত যে তাহাদের এক বংশধর আমেরিকায় গিয়া সেই হিন্দু নামে পরিচিত হইবে?

যাহা হউক নামে কিছু আসে যায় না, আসল জিনিষটা ঠিক থাকলেই হইল। কিন্তু তাই বা ঠিক থাকিতেছে কোথায়? লোকগণনা দ্বারা জানা গিয়াছে, হিন্দুর সংখ্যা অতি অল্প মাত্র বাড়িয়াছে। ১৯০১ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৭, শিখের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৩৭, বৌদ্ধের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ১৩, আর হিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র ৫ জন। হিন্দুদের এই অল্প বৃদ্ধির নানা কারণ আছে। তাহার প্রধান কারণ হইতেছে হিন্দুদের মধ্যে বাল্য বিবাহ থাকা এবং বিধবা বিবাহ না থাকা। হিন্দু বালিকা গণের অল্প বয়সেই বিবাহ হয়; যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হয় তাহারা বয়সে অনেক বড়, সুতরাং তাহারা অনেক আগে মরে, পরে বিধবাদের আর বিবাহ হয় না। মুসলমানদের সে সব বালাই নাই। তাহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহত আছেই, তাহা ছাড়া এক এক জন পুরুষ যে চারিটা পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে তাহাতে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না। কিন্তু এতগুলি সুবিধা সত্ত্বেও শুধু এই কারণে মুসলমানের বৃদ্ধির পরিমাণ হিন্দুর চেয়েও বড় বেশী নহে! ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক প্রতি ১০০ লোকের মধ্যে পাঁচ বৎসর

ও তাহার নিম্ন বয়স্ক শিশুর সংখ্যা মুসলমান দিগের মধ্যে ৩৭, আর হিন্দুদিগের মধ্যে ৩৩।

হিন্দুদিগের অল্প বৃদ্ধির আরও কারণ আছে। যে সব অঞ্চলে অধিকাংশ হিন্দুদিগের বসতি, সেই সব স্থানে এই দশ বৎসরে প্লেগ, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা গিয়াছে। পাঞ্জাবে পূর্ব্ব ২ গণনায় যে সকল লোক হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, এবার তাহারা শিখ বলিয়া লেখাইয়াছে। সেই জন্য শিখের সংখ্যা শতকরা ৩৭ হইয়াছে, হিন্দুর সংখ্যা সেই পরিমাণে কমিয়াছে। ইহাদের মোট সংখ্যা পাঁচ লক্ষ।

আবার আর এক কারণে ও হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছে। হিন্দু জাতি জন্মগত, যাহারা হিন্দু আছে তাহারা মুসলমান কি খৃষ্টান হইতে পারে, কিন্তু একজন মুসলমান বা খৃষ্টান হিন্দু হইতে পারে না। অন্ততঃ দেশে যত দিন থাকে। যাহারা হিন্দু ধর্ম্ম একবার ত্যাগ করিয়া মুসলমান কি খৃষ্টান হইয়াছে, তাহারাও আবার হিন্দু হইতে পারে না। তবে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর মধ্য হইতে মুসলমান হওয়াটা অনেক কমিয়াছে, যদি কেহ হয় তবে সে ধর্ম্মের খাতিরে নয় প্রেমের খাতিরে।

মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়িয়া হিন্দু পুরুষের মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করা, কিম্বা মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃত হিন্দু রমণীর মুসলমান হওয়ার ঘটনা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। তবে সেরূপ ঘটনা আর কয়টা হয়? বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর মুসলমান হওয়া অপেক্ষা খ্রীষ্টান হওয়াতেই সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে।

এই দশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৫, মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৭, আর খ্রীষ্টানের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৩২ জন। সমগ্র ভারতবর্ষে এক হাজার লোকের মধ্যে এখন ১২ জন করিয়া খৃষ্টান। ১৯১১ সনে মোট খৃষ্টানের সংখ্যা ছিল ৩৮৭৬২০৩ অর্থাৎ প্রায় ৩৯ লক্ষ। ইহার মধ্যে ৩৫৭৪৭৭০ অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ দেশীয় খৃষ্টান, বাকী ৩ লক্ষ ইয়ুরোপীয়ান ও ইয়ুরেসিয়ান। খৃষ্টানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাড়িয়াছে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে, তাহার পর মান্দ্রাজ, তাহার পর পাঞ্জাব, তাহার পর বিহার-উড়িষ্যা, তাহার পর যুক্তপ্রদেশ, তাহার পর ব্রহ্মদেশ। বঙ্গদেশে মোট খৃষ্টানের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার তাহার মধ্যে ৮৩ হাজার ভারতবাসী। দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা শতকরা ৩০টী বাড়িয়াছে। ঢাকা বিভাগের মধ্যে এবার অনেক নমঃশূদ্র খৃষ্টান হইয়াছে। তবে বঙ্গদেশ অপেক্ষা ছোট নাগপুরের অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে খৃষ্টান হওয়ার সংখ্যাটাই খুব বেশী। মি ব্লানট (Blunt) বলেন হিন্দু মুসলানেরা সমাজের ভয়ে খৃষ্টান হইতে চায় না কিন্তু অসভ্য জাতিদের সে ভয় নাই। আসামের খাসিয়া ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ও ওরাওঁ এবং ব্রহ্মদেশের করেণ দিগের মধ্যেই খৃষ্টানের সংখ্যা বেশী বাড়িয়াছে। এই যে সকল জাতি খৃষ্টান হয়, ইহারা কি যথার্থই ধর্ম্ম বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যীশু খৃষ্টের শরণাপন্ন হয়? আঃ রাম, তাহা কখনই না। একজন ছোটনাগপুরের মিশনারী বলিয়াছেন, ইহারা খৃষ্টান হয় কেবল গ্রাম্য জমিদার ও পুলিসের অত্যাচারে। আবার "সখা" নাম ধারী এক প্রকার জীব ছোটনাগপুরের জঙ্গলে বিচরণ করেন তাঁহার অত্যাচারও কম নয়। গ্রামকে গ্রাম তাঁহার উৎপাতে অস্থির হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যাজকের শরণাপন্ন হয়। সে "সখা" কি জানিতে চান? তিনি নিশ্চয়ই বন্ধু নহেন, ঘোর শত্রু। কোন গ্রামে কলেরা হইয়া লোক মরিতে লাগিল, কিম্বা গো-মড়ক লাগিয়া গরু বাছুর মরা আরম্ভ করিল। তখন গ্রামের "প্রধানেরা" শাল কিম্বা মহুল বৃক্ষমূলে মিলিত হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং গ্রামের "সখা" কে তলব করিলেন। সখা অনেক গণনার পর স্থির করিলেন, "ঐ যে শাম ভূমিজ বুঢ়া তার এই কাজ বটে। তার যে একটা ভূত আছে, সেই এই সব মানুষ (অথবা গরু) খাইতেছে।" তখন সেই শাম ভূমিজের তলব হইল। সে ব্যক্তি কাঁপিতে ২ হাজির হইল। গ্রামের লোক তাহার উপর খড়্গহস্ত; তাহাকে একদিনের মধ্যে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ হইল। নচেৎ টাঙ্গীর আঘাতে অথবা বিষাক্ত কাঁড়ের (তীর) দ্বারা তাহার প্রাণ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তখন সে বেচারা করে কি? সে তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া গিয়া মিশনারী সাহেবের শরণাপন্ন

হইল। ছোটনাগপুরের অধিকাংশ খুন জখম এই সকল "সর্দার" কার সাজিতে হয়।

যা'ক সে কথা। খৃষ্টান মিশনারীগণ এই সকল নীচ জাতীয় লোকদিগকে বিপদে আশ্রয় দিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিতেছেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের চেষ্টায় এই সকল লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইতেছে এবং এই সকল অসভ্য লোক অন্ততঃ বেশভূষা আদপ-কায়দায় সভ্য হইতেছে। কোন ২ স্থলে ব্রাহ্ম-মিশনারীগণও এইরূপ সৎকার্য্য করিতেছেন।

এই লোকগণনায় ব্রাহ্মগণের সংখ্যা শতকরা ৩৬ বাড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের মোট সংখ্যা সমস্ত ভারতে মাত্র ৫,৫০৩। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক বৃদ্ধি পাঞ্জাবে; তাহার কারণ ইহার পূর্ব্বগণনায় অনেক ব্রাহ্ম হিন্দু নামে পরিচিত ছিলেন, এবার তাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া নাম লেখাইয়াছেন: মোট ব্রাহ্মের মধ্যে কলিকাতার বাসিন্দা হইতেছে সিকি, কিন্তু বঙ্গদেশে বৃদ্ধির হার অতি সামান্য। ইহার দুইটী কারণ দেখান হইয়াছে। হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকিয়াও এখন অনেক লোক হিন্দুর আচার জাতিভেদাদি সম্পূর্ণরূপে পালন না করিয়া পারিতেছে,সুতরাং তাহাদের ব্রাহ্ম হওয়ার আবশ্যক নাই। দ্বিতীয়তঃ যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে, অনেক হিন্দু এখন তাহা ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের একটা প্রয়োজনীয় নিম্নস্তর বলিয়া মনে করেন,সুতরাং হিন্দু সমাজে সেই পৌত্তলিকতা আছে বলিয়া সেই সমাজের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিত মনে করেন না।

ব্রাহ্ম সমাজে ভাঁটা পড়িলেও, পাঞ্জাবের আর্য্যসমাজে কিন্তু খুব জোয়ারের জোর দেখা যায়। তাঁহাদের সংখ্যা এবার ২ লক্ষ ৪৩ হাজার, অর্থাৎ দশ বৎসরে আড়াইগুণ বাড়িয়াছে। আর্য্যসমাজের অনেক প্রচারক খুব উৎসাহের সহিত দয়ানন্দ স্বামীর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন! আর মুসলমানাদি অন্যান্য জাতির মধ্য হইতেও অনেক লোককে 'শুদ্ধি" দ্বারা আর্য্য সমাজ ভুক্ত করা হইতেছে। আর্য্যসমাজের প্রায় দশআনি লোক এই জাতীয়। সেই জন্য যে সকল হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা খুব কমিয়াছে।

আর একটা কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এই রিপোর্টে প্রকাশ হিন্দুর সংখ্যা যেমন মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বনের জন্য কমিতেছে তেমন আবার কোন কোন ভূত প্রেত বাদী (animist) অসভ্য জাতি ক্রমশঃ হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া অলক্ষিত ভাবে হিন্দু সমাজ ভুক্ত হইতেছে। প্রথমতঃ হিন্দুদিগের নিকটে বাস করার দরুণ ইহারা অল্পে ২ হিন্দুর ভাব গ্রহণ করে, হিন্দুদের পূজা পার্ব্বণ উৎসবাদিতে যোগ দান করে। ক্রমে হিন্দুদের দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার পায়, এবং ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে শিখে। পরে হয়ত এক জন হিন্দু সন্ন্যাসী কি কোন বৈষ্ণব গোঁসাই ইহাদিগকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া একেবারে হিন্দু করিয়া ফেলেন। এই প্রকারে আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় অনেকগুলি অসভ্য জাতি (animist) শিব নারায়ণ স্বামী নামক এক জন সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া হিন্দু হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য এবারকার লোকগণনায় সেইঅসভ্য জাতির সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। সেই স্বামীজী গোয়ালপাড়ার অনেক রাজ বংশী জমিদারকেও শিষ্য করিয়াছেন। যে সব অসভ্য জাতি এইরূপে হিন্দু হইয়াছে, তাহারা গরু, শূকর, মদ খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। ছোটনাগপুরে কুরমী মাহাতো নামধারী অসভ্য জাতিও হিন্দুর সংশ্রবে আসিয়া অনেক পরিমাণে হিন্দু ভাবাপন্ন হইতেছে। তাহাদের মধ্যে অনেক অবস্থাপন্ন লোক হইয়াছে। ইহারা কেহ কেহ দোল দুর্গোৎসব পূজাও করে, হরি সংকীর্ত্তনের ত কথাই নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

মনে রেখো।

অদৃষ্ট।

কপালে থাকিলে দুঃখ অবশ্যই ফলে,
জলধি হইয়ে জলে বাড়ব অনলে!

অন্তর-দৃষ্টি।

দর্পণে কেবল দেখ আপনার মুখ,
হৃদয়ে চাহিয়ে দেখ পাপ কত টুক!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস

ময়মনসিংহে সংবাদ পত্র।

ময়মনসিংহে সংবাদপত্র পরিচালনার কাল এখনও ৫০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। এই সময় মধ্যে আমরা ময়মনসিংহে কয়েক খানি উচ্চ শ্রেণীর সংবাদ পত্র দেখিতে পাইয়াছি। "বিজ্ঞাপনী" এই জেলার প্রথম সংবাদ পত্র। ১৮৬৬ সনে "বিজ্ঞাপনী" যন্ত্র এই নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে এই মুদ্রাযন্ত্র ঢাকা নগরীতে ছিল। ৺ গিরীশচন্দ্র রায় চৌধুরী (ধানকুড়া), ৺ হরচন্দ্র চৌধুরী (সেরপুর), ৺ হরিকিশোর রায় চৌধুরী (মশুয়া) প্রভৃতি ময়মনসিংহ নগরের ত্রয়োদশ জন উদ্যমশীল ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া ময়মনসিংহ নগরে উক্ত "বিজ্ঞাপনী যন্ত্র" স্থাপন করেন। ঐ সনেই ময়মনসিংহ নগর হইতে "বিজ্ঞাপনী" নামে সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। ৺ জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী "বিজ্ঞাপনীর" প্রথম সম্পাদক ছিলেন। বিজ্ঞাপনীতে সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইত। ময়মনসিংহে তখন "ইয়ং-বেঙ্গলের" পূর্ণ প্রতাপ। বিচারক শ্রেণীতে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প ছিল না। ইঁহাদের অনেকেরই নৈতিক চরিত্র শিথিল ছিল। 'হায় কি মজার শনিবার' আসিলে, দ্রব্য বিশেষের গুণে ইঁহাদের শিথিল চরিত্রের কলুষিত ভাব উছলিয়া উঠিত। ইহাদের এক রজনীর ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া "বিজ্ঞাপনী" "হৃষ্ট চন্দ্রের বৈঠক খানায় অনৈক্য নাথের অদ্ভুত জুতা খাওয়া" শীর্ষক বিদ্রূপাত্মক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শিরো নামার ইঙ্গিতে বিচারক দ্বয়কে বুঝিতে কাহারও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ প্রবন্ধ লিখিত হইলে তাহা অমার্জনীয় হইত। কিন্তু ইহা তৎকালে বহুলোকের রুচিকর হইয়াছিল। প্রবন্ধের লক্ষীভূত উভয় ব্যক্তিই প্রতাপান্বিত ছিলেন। ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নগরে দলাদলির সৃষ্টি হয়।

১৮৬৭ সনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই নগরে আসিয়া যে ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত করেন, তাহার ফলে সম্পাদক জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী-যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। যদিও তিনি অব্যবহিত পরেই উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি হিন্দুগণের আক্রোশ হইতে তিনি অব্যাহতি পাইতে পারেন নাই। হিন্দু এবং ব্রাহ্মগণের 'সংঘর্ষ উপলক্ষ্য করিয়া এই নগরে 'হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িনী সভার' প্রতিষ্ঠা হয়। ইতঃপূর্ব্বে বিজ্ঞাপনীর বিরুদ্ধে যে বিষাক্ত ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নানা জনের ফুৎকারে প্রবল হইয়া উঠে এবং ক্রমে "বিজ্ঞাপনীর' অধ্যক্ষ-ব্যূহকেও আক্রমণ করে। পরিশেষে দলাদলির ফলে বিজ্ঞাপনী এই নগর হইতে উঠিয়া যায়। ত্রয়োদশ জনে যে কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন, অকালে তাহা পণ্ড হইয়া বৈলাতিক কুসংস্কার দৃঢ় করিয়া গিয়াছে।

অতঃপর কতিপয় বৎসর ময়মনসিংহে কোন সংবাদ পত্র ছিল না। তখন কোন বিষয়ের আন্দোলন করিতে হইলে ঢাকা এবং কলিকাতার সংবাদ সমূহের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। ময়মনসিংহের ন্যায় বিস্তৃত

৺কালী নারায়ণ সান্যাল।

জেলার পক্ষে ইহা সামান্য অসুবিধার বিষয় ছিল না। এই সময়ে রাজসাহীর অন্তর্গত খাজুরা নিবাসী ৺ কালী নারায়ণ সান্যাল তাহার সম্পত্তি সংরক্ষণ উপলক্ষে এই

নগরে বাস করিতেছিলেন। কালীনারায়ণ বাবু তখন একজন উৎসাহী যুবক ছিলেন। তিনি আপন এবং পর'চিত্ত বিনোদন জন্য ছায়াবাজী দেখাইয়া সময় কাটাইতেন। কি জানি কোন্ সূত্রে তাঁহার মনে এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্পের উদয় হয়। অর্থের তাঁহার অভাব ছিল না। ৺ শরৎচন্দ্র রায় ও বাবু অনাথবন্ধু গুহ প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি তাঁহার সেই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে যত্ন করেন। ইহা ১৮৭৫ সনের প্রথম ভাগের কথা।

ঐ সনে কালীনারায়ণ বাবু কলিকাতা হইতে একটি Royal Columbian Press. ও অন্যান্য উপকরণ আনিয়া নদীর পারে ব্রাহ্ম দোকানের সংলগ্ন একটী গৃহে স্থাপন করেন। ইহার অল্পদিন পূর্ব্বেই কালীনারায়ণ বাবুর জ্ঞাতি মুক্তাগাছার নিকটবর্ত্তী বাঁশহাটী গ্রামের ৺ প্রসন্নচন্দ্র সান্ন্যাল তাঁহার পিতার নামে 'আনন্দ যন্ত্র' নামক একটী যন্ত্র স্থাপন উদ্দেশ্যে প্রেস ও উহার উপকরনাদি লইয়া ময়মনসিংহ নগরে উপস্থিত হন। এই ক্ষুদ্র নগরে দুইটী প্রেস চলিতে পারে কি না, এই বিষয় লইয়া মহা সমস্যা উপস্থিত হয়।

উল্লিখিত কারণে উভয় প্রেসের কার্য্যই দোদুল্যমান অবস্থায় স্থগিত থাকে। অতঃপর 'আনন্দ যন্ত্র' মুক্তাগাছায় চলিয়া যায়। কালীনারায়ণ বাবুর প্রেসের কার্য্য আরম্ভ হয়।

কালীনারায়ণ বাবুর প্রতিষ্ঠিত এই মুদ্রাযন্ত্রের নাম ছিল "ভারত মিহির মুদ্রাযন্ত্র"। ঐ যন্ত্র হইতে "ভারত মিহির" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। ময়মনসিংহে তখন রেল ছিল না। কলিকাতা হইতে বহুদূরবর্ত্তী ময়মনসিংহে উচ্চ অঙ্গের একটী মুদ্রাযন্ত্র এবং একখানি উৎকৃষ্ট সংবাদ পত্র পরিচালন সহজ ব্যাপার ছিল না। বাবু কালীনারায়ণ সান্ন্যাল উহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে মুক্ত-হস্ত ছিলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। তৎকালের "ভারত মিহির" সম্বন্ধে কর্ম্ম জীবন হইতে অবসর প্রাপ্ত ভারত মিহিরের প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘটক বি, এল, আমাদিগকে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘটক।

"আজ প্রায় ৪০ বৎসর হইল নসিরাবাদ নগরে 'ভারতমিহির' প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন এখানে লেখকের সংখ্যা অধিক ছিল না। যে অল্প কয়েকটী লোক সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সংবাদ পত্র লিখিবার যোগ্যতা দেখা যাইত না। লেখক সংগ্রহ করিতে, প্রবন্ধাদি লিখাইয়া উপযোগী হইবে কি না পরীক্ষা করিতে, "ভারত মিহির" প্রচার করিবার প্রথম নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেকে সংবাদ পত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে স্কুলের রচনা লিখিয়া ফেলিতেন। সংবাদ পত্রের জন্য সাপ্তাহিক বিষয় নির্ব্বাচন একটী প্রধান কথা। উহার উপর লোকের মনোরঞ্জন এবং জন-হিতসাধন অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। তাহার পর নির্ব্বাচিত বিষয়, তথ্যে এবং সিদ্ধান্তে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া উঠান অতিশয় কঠিন ব্যাপার। প্রথম প্রথম অনেকের লিখিত প্রবন্ধ অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়াইতে

পারিল না। আমি সম্পাদক ছিলাম ; বিষয় নির্ব্বাচণের ভার, তথ্য সংগ্রহ এবং তত্ত্ব সমাবেশের ভার আমার উপর ছিল। কিন্তু ইহার প্রধান লেখক ছিলেন—শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ। এই সময় কবিবর ৺ দীনেশচরণ বসু স্থানীয় মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন এবং হেলেনা

আনন্দ চন্দ্র মিত্র।

কাব্যের কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র স্থানীয় জেলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বাবু অমরচন্দ্র দত্ত ও কিছুদিন পরে কলিকাতা হইতে আসিয়া "ভারত মিহিরের" কার্য্য গ্রহণ করেন। ইহাঁদের পরিচর্য্যা ভারত মিহিরের প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। তাঁহাদের লিপি কৌশলে "ভারত মিহির" বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

"সাধারণের সহিত যে সকল কার্য্যের সংশ্রব, উহা সুপথে পরিচালন করিবার জন্য বান্ধব-সমিতি চাই। সংবাদ পত্র পরিচালনায় উহার আবশ্যকতা অতিশয় অধিক। সে বান্ধব-সমিতি আমাদের ছিল। কোন বিষয়ই বান্ধব-সমিতিতে উত্তমরূপে আলোচিত না হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিত না। তখন জন সাধারণের সঙ্গে রাজ-কর্ম্মচারিগণের সাধারণতঃ সদ্ভাব ছিল। সেই সদ্ভাব রক্ষা করিতে যাইয়া স্থানীয় বিষয় আলোচনায় কখনও যে আমরা কঠোর কর্ত্তব্যের কণ্টকময় পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়ি নাই, একথা বলিতে পারি না। ভারতমিহিরের তীব্র মন্তব্যে অনেকে অসাধু পন্থা বর্জ্জন করিতেন এবং সৎ পথে চলিবার জন্য বহু লোকের সুমতি জন্মিত। এ আত্মপ্রসাদ আমাদের ছিল।

"রাজনীতি চর্চ্চা বহু সময়ে রাজপুরুষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিত। অনেক সময়ে উহার কোন কোন মন্তব্য উচ্চ রাজপুরুষগণের মনঃপুত হইয়া উঠিত না। Lethbridge (Sir) সাহেব যখন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের Censor ছিলেন, তখন ভারতমিহিরের ২।৩টী প্রবন্ধ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সময়ে রাজকীয় সর্ব্বোচ্চ মন্ত্র-ভবনে মুদ্রাযন্ত্র-আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছিল। "ভারত মিহির" হইতে ও অন্যান্য পত্রিকা হইতেLethbridgeসাহেব যে সকল প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেন, তাহা উল্লেখ করিয়া ইংলিসম্যান লিখিয়াছিলেন। "The sword of Damocles is hanging over the heads of the Vernacular News papers." ইহার কিছুদিন পরেই ১৮৭৭ সনে মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধি বদ্ধ হয়। ঐ আইনে মুচলিকার এক বিধান ছিল। "ভারত মিহির" মুচলিকা দিতে প্রস্তুত ছিল না। সম্পাদকগণের বৈঠকে এক রজনীতে উহার যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা এখনও ভুলিতে পারি নাই। মুচলিকা দিলে "ভারত মিহিরের" এত দিনের অর্জ্জিত গৌরব ও আত্ম-সম্মান খর্ব্ব হইয়া পড়ে ; অপর দিকে মুচলিকা না দিলে "ভারত মিহির" রক্ষা অসম্ভব, সুতরাং যন্ত্র রক্ষাও দুরূহ ব্যাপার। স্বত্বাধিকারী ৺কালীনারায়ণ সান্যাল মুচলিকা দিয়া সংবাদ পত্র পরিচালনে সম্মত হইলেন না। পরিচালকগণও তাঁহার মত সমর্থন করিলেন। সমস্ত রাত্রি এই আলোচনায় অতিবাহিত হইয়া যায়। রাত্রি প্রভাত কালে যখন "ভারত মিহিরের বিদায়" নামক প্রবন্ধ লিখিত এবং পঠিত হয়, তখন কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে "ভারত মিহিরের" বিদায়ে সকলেই অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। আসামের Extra Assistant Commissioner ৺ঈশান চন্দ্র পত্রনবিশ আমাকে বলিয়াছিলেন 'যে দিন ঐ ভারত-মিহির তাঁহার নিকট পঁহুছে সে দিন তাঁহার একটী পুত্রের

মৃত্যু হয়; তিনি ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া পুত্রের মৃত্যু শোক ভুলিয়া গিয়াছিলেন।' Government মুচলিকার ধারা তুলিয়া নেন। "ভারত মিহির" পরবর্ত্তী সপ্তাহেই পুনরায় বাহির হইতে থাকে।

"ময়মনসিংহে রেলওয়ে বিস্তার, ব্রহ্মপুত্রের সংস্কার, টাউন হল নির্ম্মাণ, সারস্বত সমিতির সংস্রবে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা, আত্মশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রেস একট্ ও সামরিক ব্যয়, থিয়েটারও ছাত্রদিগের নীতি এবং স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি ভারত মিহিরের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। "ভারত মিহির" ময়মনসিংহের কত আদরের বস্তু ছিল তাহা আমি বলিতে চাই না। ময়মনসিংহের সে মধুর-মিহির-যুগের কথা মনে পড়িলে এখনও আনন্দে চক্ষে জল আইসে। প্রায় ১২ বৎসর "ভারত মিহির" ময়মনসিংহের পরিচার্য্য করিয়াছিল।

"আমি লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি;—"ভারত মিহির" পরিচালনার মধ্যসময়ে মুক্তাগাছার "আনন্দ যন্ত্র" ময়মনসিংহ নগরে স্থানান্তরিত হয়। ঐ যন্ত্র হইতে ১৮৮১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম" রচয়িতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় "নবমিহির" নামক অন্য একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। কালীনারায়ণ বাবু সমস্যায় পড়িয়া "ভারত মিহির যন্ত্র" প্রসন্ন বাবুর নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু ঘটনা ক্রমে কালীনারায়ণ বাবুকেই শেষে আনন্দযন্ত্র ক্রয় করিতে হয় এবং তিনি আনন্দযন্ত্র স্বগৃহে আনয়ন করেন। উভয় যন্ত্র মিলিত হইয়া যায়। এখন যেস্থানে "শশীলজ"সেইস্থানে ভারতমিহির যন্ত্র স্থাপিত ছিল "আনন্দ যন্ত্র" হইতে "নব মিহির" মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সম্পাদক চন্দ্রশেখর বাবু ও আসিয়াছিলেন, কিন্তু "নব মিহির" প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এই ঘটনা উপলক্ষে যে সকল রাত্রি জাগরণ এবং বিপত্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। "১৮৮৪ সনের আশ্বিন মাসে কালীনারায়ণ বাবু "ভারতমিহির যন্ত্র" লইয়া কলিকাতা চলিয়া যান। অতঃপর কয়েক বৎসর কোন সংবাদ পত্রের সহিত আমার সম্বন্ধ ছিল না।

সেরপুরে ৺হরচন্দ্র চৌধুরীর "চারু যন্ত্র" নামে এক মুদ্রাযন্ত্র ছিল; উহা হইতে ১৮৮১ সনে "চারুবার্ত্তা" নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩সনে

৺হরচন্দ্র চৌধুরী।

সেরপুরের চারুবার্ত্তা বন্ধ হইয়া যায়। ঐ সনেই ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ৺শ্রীকণ্ঠ সেন, বাবু শ্রীনাথ রায় (বর্ত্তমান ম্যানাজার) এবং আমাকে কতকগুলি স্বর্ত্তে এক দলিল সম্পাদন করিয়া তাঁহার ঐ "চারুযন্ত্র" অর্পণ করেন। শ্রীনাথ বাবু কিছুদিন পরেই উহার সংস্রব ত্যাগ করেন। ১৩০০ সনের আশ্বিন মাসে আমরা সেরপুর হইতে "চারু যন্ত্র" ময়মনসিংহ নগরে আনয়ন করি। ১৩০১ সনের বৈশাখ হইতে বর্ত্তমান "চারু মিহির" প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহারও প্রথম সম্পাদক আমাকেই হইতে হইয়াছিল। ইহারও প্রধান লেখক ছিলেন অনাথ বাবু। তখন লোক শিক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিস। অনেক শিক্ষিত লেখক সংবাদ পত্র

পরিচালনে অভ্যস্ত হইয়াছেন। এদিকে রাজনৈতিক আকাশ ইহার পূর্ব্ব হইতেই মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে থাকে। বোম্বাইয়ে নাথু ভ্রাতৃদ্বয়ের বিপত্তি স্মরণ করিয়া লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ পশ্চাৎপদ হইয়া পড়েন। এই তুফানের দিনেও "চারুমিহির" যে আপন কর্ত্তব্যের পথে অটল ছিল তজ্জন্য আমি আমার সুহৃদগণের নিকট কৃতজ্ঞ। বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সোম, ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, বাবু জ্ঞানদাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী. ও বাবু অমরচন্দ্র দত্তের সহায়তায় আমি চারুমিহির পরিচালিত করিতে পারিয়াছিলাম। ব্যবস্থাপক সভা, স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যাচার, দুর্বৃত্ত দমন, ময়মনসিংহ কলেজ, জলকষ্ট নিবারণ, পুলিশ সংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা হইত। দুর্বৃত্তদমন আলোচনায় সুফল ফলিয়াছিল। ময়মনসিংহে পুলিশ সংস্কার সম্বন্ধে কোন

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক লেখার জন্য জেলার তৎকালীন মাজিষ্ট্রেট মিঃ রো আমাকে অভিযুক্ত করেন এবং হেতু না পাওয়ায় আমাকে অব্যাহতি দেন।

"সে সময়ের "চারুমিহির" লোকের যে অতিপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রধান কারন ঐ সুহৃদগণের নিঃস্বার্থ পরিচর্য্যা। "চারুমিহির" আমরা লাভ লালসায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম না। নদীর পারে ব্রাহ্মদোকান যে দালানে ছিল সেই দালানেই আমাদের প্রেস ও কার্য্যালয় ছিল। পরে উহা আমার বাসার নিকটে উঠিয়া আইসে। বান্ধবসমিতির সাপ্তাহিক মাসিক এবং বাৎসরিক অধিবেশনে বহুলোকের সমাগম হইত। বহু বিজ্ঞলোকের উপদেশ পাইবার সুবিধা ঘটিত। প্রীতিভোজের সঙ্গে জনহিত-চিন্তার যে হিল্লোল বহিত তাহা হইতে এখন আমি বঞ্চিত। আমি ১০।১২ বৎসর হইল চারুমিহিরের ভার বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সোমের উপর দিয়া এখন আপন গ্রামে পল্লি-জীবন যাপন করিতেছি।"

জানকী বাবুর পত্র হইতে "ভারতমিহির" এবং "চারুমিহিরের" সময়ের একখানি সুন্দর চিত্র পাওয়া গেল।

ভারতমিহিরের সম-সমকালে মুক্তাগাছা আনন্দযন্ত্র হইতে "বিশ্বসুহৃদ" নামে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইত। "বিশ্বসুহৃদ" কিছুদিন মুক্তাগাছায় চলিয়া ময়মনসিংহ নগরে উঠিয়া আইসে। উহাতে রাজনীতি সমাজনীতি এবং স্থানীয় বিষয়ের আলোচনা থাকিত। সময় সময় উহাতে ইংরেজী প্রবন্ধও বাহির হইত।

কবিবর দীনেশচরণ বসু।

১২৮৮ সনে (১৮৮১) ৺হরচন্দ্র চৌধুরী সেরপুরে চারুযন্ত্র স্থাপন করেন। উহা হইতে চারুবার্ত্তা নামে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। "রাজস্থানের" সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় চারুবার্ত্তার প্রথম সম্পাদক হইয়া আসেন। চারুবার্ত্তা অতিশয় যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইত। "চারুবার্ত্তার" পরবর্ত্তী সম্পাদক দ্বারবঙ্গের লাহিরিয়া-সরাইর বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ উকিল বাবু অদ্বৈতচরণ বসু বি, এল। তাঁহার 'ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতি', 'অসতী স্ত্রী ঘাতকের প্রাণদণ্ড' প্রভৃতি প্রবন্ধের যথেষ্ট প্রসংশা হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী সম্পাদক কবিকাহিনী

প্রণেতা কবিবর ৺ দীনেশচরণ বসু। দীনেশ বাবু চলিয়া গেলে বাবু অমরচন্দ্র দত্ত চারুবার্ত্তার সম্পাদক হন। এই সময় "ভারতমিহির যন্ত্র" কলিকাতা উঠিয়া গেলে সেরপুরের "চারুযন্ত্র" কিছুকালের জন্য ময়মনসিংহে আনীত হয় ও "চারুবার্ত্তা" এই নগর হইতে পরিচালিত হইতে থাকে। কিছুদিন পর "চারুবার্ত্তা" পুনরায় সেরপুর চলিয়া যায়। অমর বাবুর সম্পাদকতার সময়ে কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস "চারুবার্ত্তার" পরিচলনায় যথেষ্ঠ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ময়মনসিংহের "সারস্বত কবি" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই নগরে এবং সেরপুরে তাঁহার অনেক কবিতা রচিত হয়। "চারুবার্ত্তার" শেষ সময়ের বিবরণ জানকী বাবুর পত্রে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত।

১৮৭৮ সনে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র স্বরূপ বাবু শ্রীনাথ চন্দ, বাবু অমরচন্দ্র দত্ত, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে ভারতমিহির যন্ত্র হইতে "সঞ্জীবনী" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র পরিচালিত হইয়াছিল। "সঞ্জীবনী" দুই বৎসর কাল জীবিত ছিল। এই পত্রে শিক্ষা এবং সমাজ সম্বন্ধেই অধিকাংশ আলোচনা থাকিত।

টাঙ্গাইল আহাম্মদী প্রেস হইতে মুশলমান সমাজের মুখপত্র স্বরূপ আহাম্মদী নামক একখানা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। আহাম্মদী মুশলমান সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ভারত-ইতিহাসের উপকরণ।

প্রাচীন ভারতের কোন ইতিহাস নাই—এই কথাটী প্রবাদ বাক্যের মত আমরা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইহাকে অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া কখনও গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে ইতিহাস রচনা হইয়া থাকে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এই নীতি অপরিচিত ছিল। ভারতীয় আর্য্যগণ জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও কর্ম্মকেই জীবনের মুখ্য অবলম্বন বলিয়া জানিতেন, সুতরাং তাঁহারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার পরতে পরতে কেবল জ্ঞান ধর্ম্ম ও কর্ম্মের কথাই ফুটীয়া উঠিয়াছে; উচ্চ ধর্ম্ম কথার আবরণে সাময়িক ঐতিহাসিক তথ্য ঢাকা পড়িয়াগিয়াছে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কোন রাজবংশের পারিবারিক ঘটনাবলীর এমন কি কোন রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাস জাতীয় ইতিহাস বলিয়া গণ্য হয় না। কোন এক সমগ্র জাতির জীবনে যে ধর্ম্ম ও নীতি প্রকাশ পায় তাহার ইতিহাসই জাতীয় ইতিহাস। জাতির জীবনের ঘটনা পরম্পরা উক্ত ইতিহাসে উল্লেখিত সত্যের সমর্থন করে মাত্র। প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক কোন বিবরণ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন ভারতের জাতীয় ইতিহাস নাই, একথা বলা চলে না। রামায়ণ ও মহাভারতে প্রাচীন ভারতের সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতির যে চিত্র প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন হিন্দুদের জাতীয় জীবনের একটি সুন্দর আলেখ্য পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারতই প্রাচীন হিন্দুগণের প্রকৃত ইতিহাস।

প্রাচীন আর্য্যগণ ধর্ম ও জ্ঞান প্রচারেই ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং সমসাময়িক বা পূর্ব্বতন ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে তাঁহাদের আগ্রহ ছিল না। মুসলমান শাসনকালে আমরা ধারাবাহিক ঘটনা বলীর বিবরণ রক্ষার উপায় দেখিতে পাই। মুসলমান নৃপতিগণ, শাসিত প্রদেশের চতুর্দ্দিকে — যথাযথ সংবাদ রক্ষার জন্য "ওয়াকিব নবীশ" নিযুক্ত রাখিয়া দেশের প্রকৃত সংবাদ লইতেন। নিজ নিজ সিংহাসন পার্শ্বেও উপযুক্ত পণ্ডিত লোক রাখিয়া রাজ্যের ও উল্লেখ যোগ্য ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। ফলে মুসলমান শাসনকালে ভারতের প্রচুর বিবরণ সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছিল।

ইতিহাস বিরোধী অরসিক লোকেরা অনেকেই মনে করেন, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী যেমন কবি কল্পনায় অতিরঞ্জিত, মুসলমান ঐতিহাসিকগণের লিখিত ইতিহাসাবলীও তেমনি সিংহাসন-পার্শ্বে-উপবিষ্ট চাটুকার গণের অতিরিক্ত স্তুতিবাদে কলুষিত। তাহাদের এইরূপ মনে করিবার যে একেবারেই কারণের অভাব, তাহা বলা যাইতে পারে না। অতিরঞ্জিত ও পক্ষপাতিত্ব পূর্ণ হইলেও ঐ সকল গ্রন্থে ইতিহাসের যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। আবার মুসলমান লেখকদিগের মধ্যেও এমন লেখক নিতান্ত বিরল নহে, যাহাদের লিখিত বিবরণ পড়িলেই মনে হয়, তাহারা কোন কিছু গোপন করিবার অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন নাই।

প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণ করিতে হইলে একই রাজত্বের একাধিক বিবরণ পাঠ করিয়া তাহা হইতে প্রকৃত সত্য উদ্ধার করিতে হইবে। এরূপ চেষ্টার ফলও যে নির্দ্দোষ হইবে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না।

মুসলমান সম্রাটগণের উৎসাহে ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা বেশ প্রসার লাভ করিয়াছিল। ফলে সম্রাটদিগের অনুগৃহীত লোক ব্যতীত, অন্য লোকেও সমসাময়িক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিত। এইরূপ লেখকদের একই বিষয়ের বর্ণনা যে একরূপই হইবে তাহা বলা যায় না।

সমসাময়িক লেখকগণের সঙ্কলিত বৃত্তান্তই লোকে সমধিক আদরের চক্ষে দেখে। কারণ, পরবর্ত্তী লেখকগণ সমসাময়িক লেখকগণের অনুসরণ করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, তাহারা জন প্রবাদেরও আশ্রয় গ্রহণ করেন, তৎসঙ্গে নিজ কল্পনারও প্রচুর প্রশ্রয় দেন।

সমসাময়িক লেখকদের বিবরণে অনৈক্য হওয়ায় কয়েকটী কারণ আছে।

(১) সম্রাটের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির লেখায় সম্রাটের দোষ সমর্থনের চেষ্টা থাকিতে পারে।

(২) ঐ ব্যক্তির লেখায় সম্রাটের দোষ গোপনের চেষ্টা থাকিতে পারে।

(৩) সম্রাটের অনাবশ্যক স্তুতিবাদ থাকিতে পারে।

(৪) অতিশয়োক্তির বাড়াবাড়ি থাকিতে পারে।

এগুলি অনুগৃহীত ও অধীন ব্যক্তির লেখায় থাকা স্বাভাবিক। অপর পক্ষে, অপরের লিখিত বিবরণে

(১) লেখকের রাজত্ব সম্পর্কিত কার্য্য হইতে দূরে অবস্থান হেতু রাজ্য ও রাজাদেশ ঘটিত প্রকৃত তথ্য তাহার নিকট অবিদিত থাকা সম্ভব।

(২) ঐ ব্যক্তি সম্রাটের বিরুদ্ধ বাদী হইলে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক শুনা-কথাও সে প্রকৃত বলিয়া লিখিতে পারে।

(৩) তাহাতে সম্রাটের অযথা নিন্দাবাদের বাড়াবাড়ি থাকিতে পারে।

লেখক সম্রাটের বিরুদ্ধ বাদী হইলে, তাহার লেখায় এগুলি থাকা স্বাভাবিক।

লেখক নিরপেক্ষ হইলেও রাজ-প্রসাদে তত্ত্বসংকলন করিতে হইলে, রাজার পক্ষ সমর্থন করিতেই হইবে।

ভাল মন্দ সকল জিনিষেই আছে। প্রকৃত সত্য সকল সময়েই যে সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইতেছে, তাহা নহে; ইহা বোধ হয়, দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান অনাবশ্যক। অনেক স্থলেই লেখকের শক্তি পাঠকের মনের উপর ক্রিয়া করে; শক্তিমান লেখকের উক্তিই পাঠকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মুসলমান শাসন কালেই—বিবিধ উপায়ে ভারতের তাৎকালীন বহু বিবরণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এইরূপ গ্রন্থ যে কত লিখিত হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। ভারতের পুণ্য ফলে

ইংরেজ শাসনে স্যার হেনরী ইলিয়টের * মত কয়েকজন অক্লিষ্ট কর্ম্মা মনস্বী ব্যক্তি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইঁহারা আরবি ও পারসী ভাষার বিপুল গ্রন্থ সাগর মন্থন করিয়া ভারতীয় ইতিহাসের যে উপকরণ চয়ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভারতীয় ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। ইংরেজ ব্যতীত এ সম্পদ ভারতবাসী কখনও ধ্বংশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

মুসলমান শাসন সময়ে যে ভারতবর্ষের কত বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্ত্যা নাই।

সার হেনরী ইলিয়ট যখন রাজকীয় কার্য্য ব্যপদেশে দিল্লীতে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন তিনি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট মুসলমান লেখকদিগের লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস গুলির পাণ্ডুলিপি রাখিয়া তাহাদিগকে ধ্বংশের মুখ হইতে রক্ষা করিবার এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। গবর্ণমেণ্ট অর্থ কৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন সেই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অপারগ হইয়া স্যার হেনরী ইলিয়টকে ঐ সমস্ত হস্তলিখিত গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া রাখিতে উপদেশ দেন। গবর্ণমেণ্টের আদেশে স্যার হেনরী ইলিয়ট এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।

তিনি নানা স্থান হইতে দেড় শতাধিক পারসী ভাষায় লিখিত হিন্দু ও মুসলমান লেখকের হস্তলিখিত ভারত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া তাহার সার সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিতে ব্রতী হন এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বিরাট সংগ্রহ গ্রন্থের ১ম খণ্ড (Bibliographical India to the Historians of Mohamadan India) প্রকাশ করেন।

স্যার হেন্‌রী ইলিয়ট।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অকালে এই কর্ম্মী পুরুষ দেহ ত্যাগ করিলে এই বিরাট সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশের ভার ষ্টাফ কলেজের অধ্যাপক জন ডাউসন সাহেবের উপর অর্পিত হয়। অধ্যাপক জন ডাউসন মহাত্মা ইলিয়টের ১ম খণ্ডের পুনঃ সংস্করণ করিয়া ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮ খণ্ডে ভারতীয় ইতিহাসের এই বিপুল উপকরণ রাশি জনসমাজে প্রকাশ করেন।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ এই বিরাট গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও বঙ্গ ভাষায় যে এই সংগ্রহ গ্রন্থের ধারা বাহিক আলোচনা বা অনুবাদের চেষ্টা

* ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার নগরে স্যার হেনরী মায়ার্স ইলিয়ট জন্ম গ্রহন করেন। আট বৎসর কাল উইনচেষ্টারে ওয়াইকহাম কলেজে কৃতিত্বের সহিত শিক্ষা লাভ করিয়া অক্‌স্‌ফোর্ডে নিউ কলেজে প্রবেশ করেন ও তথা হইতে ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রাচ্য ভাষা সমূহে তাঁহার জ্ঞান এত প্রগাঢ় ছিল যে একমাত্র তাঁহার নামই তখন সম্মানের তালিকায় স্থান পাইয়াছিল। এদেশে তিনি প্রাচ্য ভাষার জ্ঞান সম্বন্ধে যে সুযশঃ লইয়া পদার্পন করেন, তাহা পরবর্ত্তী জীবনে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টের বিবিধ উচ্চ পদে যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করিয়া ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটরী পদে নিযুক্ত হন। সার হেনরী ইলিয়ট ৪৫ বৎসর মাত্র বয়সে অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

হইয়াছে, তাহা আমাদের জানা নাই। মহাত্মা ইলিয়ট যে ভাবে পারস্য হস্ত লিখিত পুঁথির সার সঙ্কলন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভাষায় যদি এরূপ সার সঙ্কলনের চেষ্টাও হয়, তবে যে ঐ চেষ্টার ফল বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রচুর সম্পদশালী করিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নাই।

এই বিরাট গ্রন্থে দেড় শতাধিক হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজের লিখিত প্রায় পৌণে দুই শত ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ কাহিনী ও জীবনী প্রভৃতি মূল গ্রন্থগুলির ও তৎসহ গ্রন্থকারগণের পরিচয় সঙ্কলিত হইয়াছে।

আমরা নিম্নে সংক্ষেপে পুস্তকগুলির নাম উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১ম খণ্ড—আরব দেশের ভৌগোলিকগণ ও সিন্ধু দেশের ইতিহাস।

(১) সোলেমান প্রণীত এবং আবু জৈদুল হোসেন কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত—সাল সিলাতু-ত্-তোয়ারিখ।

(২) ইব্ন খুর্দাদ্বা প্রণীত—কিতাবু-ল্ মসলিক ওয়ালা মমালিক।

(৩) অল্ মাসুদী কৃত—মারুজা-ল্-জাহার।

(৪) আবু ইসাক আল্ ইস্তাখী কৃত—কিতাবু-ল্-আকালিম।

(৫) ইবন হাউকল্ প্রণীত—আস্কালু-ল্ বিলাদ্।

(৬) সুরু-ল্ বুলদান।

(৭) রসীদু-দ্ দীন কৃত—জামিউ-ত্ তুয়ারিখ্।

(৮) আল্ ইদ্রিসি প্রণীত—নুঝাতু-ল্ মস্তক্।

(৯) আল্ কাজুনি কৃত—আসারু-ল বিলাদ।

(১০) মজ মালু-ত তুয়ারিখ।

(১১) আহাম্মেদ ইব্ন প্রণীত—ফতাহু-ল্ বল্দান।

(১২) সাচ্নামা বা তারিখ-ই হিন্দ।

(১৩) মীর মহম্মদ মাসুম কৃত তারিখু-স্ সিন্দ্।

(১৪) তারিখ্-ই তাহিরি। (১৫) বেগলার নামা।

(১৬) তারখান নামা। (১৭) তুহ্ফতু-ল্ কিরাম।

২য় খণ্ড—(১৮) আবু রিহান্ অল্ বিরুনী কৃত তারিখু ল্ হিন্দ।

(১৯) অল্ উতবী কৃত—তারিখ য়ামিনি।

(২০) বৈহাকী কৃত—তারিখু-স্ সবক্তিগিন।

(২১) মহম্মদ উফী কৃত—জামিয়ু-ল হিকায়ত।

(২২) হুসেন নিজামি কৃত—তাজু-ল মাআসির।

(২৩) ইব্ন আসির কৃত—কামিলু-ত্ তারিখ।

(২৪) বৈজাউয়ি কৃত—নিজামু-ত্ তারিখ।

(২৫) মিন্হাজু-স্ সিরাজ কৃত—তব কত্ ই নাসিরি।

(২৬) জুয়াইনি কৃত—জাহান কোশা।

৩য় খণ্ড—(২৭) রসিদু-দীন কৃত—জামিউ-ত্ তারিখ

(২৮) আবদুল্লা ওয়াসফ প্রণীত তাজ্জিয়াতু-ল্ আমসর। (২৯) ফখরু-দীন প্রণীত তারিখ-ই বিনাকিটি।

(৩০) হামদুল্লা কৃত—তারিখ-ই-গুজিদা।

(৩১) আমীর খুশরু কৃত—তারিখ-ই আলাই।

(৩২) জিয়াউ-দীন বর্ণীর তারিখ-ই ফিরোজসাহী।

(৩৩) সম্‌স্-ই সিরাজের তারিখ-ই ফিরোজসাহী।

(৩৪) সুলতান ফিরোজসাহ কৃত ফতাহাত্-ই ফিরোজসাহী। (৩৫) তাজাক্-ই তাইমুরি।

(৩৬) সরাফু-দীন কৃত—জাফরনামা।

৪র্থ খণ্ড—(৩৭) তারিখ্-ই হাফিজ আব্রু।

(৩৮) বিন আহামেদ কৃত—তারিখ্-ই মুবারক সাহী।

(৩৯) আবদুর্ রেজ্জাক কৃত—মতলাউ-স্ সাদীন।

(৪০) মীরখন্দ কৃত—রাউজাতু-স্ সফা।

(৪১) খন্দমীর কৃত—খোলাসাতু-ল্ আকবর।

(৪২) খন্দমীর কৃত—দস্তুরু-ল্ ওয়াজরা।

(৪৩) খন্দমীর কৃত—হাবিবু-স্ সিয়ার।

(৪৪) ইব্রাহিম বিন হারিরি কৃত—তারিখ্-ই ইব্রাহিমি।

(৪৫) তুজাক্-ই বাবরি।

(৪৬) সেখ জেইন কৃত—তবকত্-ই বাবরি।

(৪৭) আবদুল লতিফ কৃত—লুবু-ত্ তারিখ।

(৪৮) কাজী আহাম্মদ কৃত—নুসাখ্-ই জাহানারা।

(৪৯) আব্বাছ খাঁ সারওনী কৃত—তারিখ্-ই সেরসাহী

(৫০) আবদুল্লা কৃত—তারিখ্-ই দাউদী।

৫ম খণ্ড—(৫১) প্রণীত তারিখ্-ই সলাতিন-ই আফগান

(৫২) নিয়ামতুল্লা কৃত—মখ্জান্-ই আফগান এবং তারিখ্-ই খান জাহান লোদী।

(৫৩) খন্দমীর কৃত—হুমায়ুননামা।

(৫৪) হাইদর মীর্জা কৃত—তারিখ্-ই রসীদী।

(৫৫) জৌহর কৃত—তাজ্কিরাতু-ল্ ওয়াকিয়াত্।

(৫৬) আহাম্মেদ প্রভৃতি প্রণীত তারিখ-ই আলফি।

(৫৭) নিজামুদ-দীন কৃত—তবকত্-ই আকবরী।

(৫৮) বদাউনী কৃত মন্তাখাবু-ত্ তারিখ।

৬ষ্ঠ খণ্ড—(৫৯) আবুল্ ফজল প্রণীত আকবর নামা।

(৬০) ইনায়েতুল্লা কৃত—তকমিলা-ই আকবরনামা।

(৬১) সেখ ইল্লাহ্দাদ্ ফৈজীর আকবর নামা।

(৬২) সেখ ফৈজী কৃত—ওয়াকিয়াত।

(৬৩) আসাদ বেগ কৃত - উইকায়া।

(৬৪) আবদুল হক কৃত—তারিখ-ই হকী।

(৬৫) নুরু-ল্ হক কৃত—জাব্দাতু-ত্ তারিখ।

(৬৬) মহম্মদ তাহির কৃত—রৌজাতু-ত্ তাহিরিন্।

(৬৭) হাসানবিন্ মহম্মদ কৃত—মন্তখবু-ত্তারিখ।

(৬৮) ফিরিস্তা কৃত—তারিখ্-ই ফিরিস্তা।

(৬৯) আবদুল বারী কৃত—মোয়াসির্-ই রহিমি।

(৭০) মহম্মদ আমীন কৃত—আনফাউ-ল্ আকবর।

(৭১) তারিখ্-ই সলিমসাহী।

(৭২) দোয়াজ্দা-সালা-ই জাহাঙ্গিরী।

(৭৩) মহম্মদ হদী কৃত—তাতিম্মা-ই ওয়াকিয়াত্-ই জাহাঙ্গিরী।

(৭৪) মুতামদ খাঁ কৃত—ইকবল নামা-ই জাহাঙ্গিরী।

(৭৫) কামগর খাঁ কৃত—ময়াসির্-ই জাহাঙ্গিরী।

(৭৬) ইন্তিখাব-ই জাহাঙ্গিরী সাহী।

(৭৭) সাদীক ইস্ফাহানী কৃত সুবহ্-ই সাদিক।

৭ম খণ্ড—(৭৮) মহম্মদ আমিন প্রণীত পাদশাহ নামা।

(৭৯) আবদুল হামিদ কৃত বাদসাহ নামা।

(৮০) ইনায়ত খাঁ কৃত শাজাহান নামা।

(৮১) মহম্মদ ওয়ারিশ কৃত বাদশাহ নামা।

(৮২) মহম্মদ সলিয়া কাম্বু কৃত আমল-ই সলিয়া।

(৮৩) সাদিক খাঁ কৃত সাজাহান নামা।

(৮৪) সরিফ হানাফি কৃত—মজালিসু-স্ সালাতিন।

(৮৫) মুফজ্জল খাঁ কৃত—তারিখ্-ই মুফজ্জলি।

(৮৬) বক্তাওয়ার খাঁ কৃত—মীর-আত্-ই আলম, মীর-আত্-ই জাহান্‌নামা।

(৮৭) আজিজু-ল্লা প্রণীত জিনাতু-ত্ তারিখ।

(৮৮) রায় বিহারীমল কৃত লুব্বু-ত্ তারিখ্-ই হিন্দ্।

(৮৯) মহম্মদ কাজীম কৃত—আলমগীর নামা।

(৯০) মহম্মদ সফি কৃত—মা-আসির্-ই আলমগিরি।

(৯১) মহম্মদ মাসুম কৃত ফাতাহাত্-ই আলমগিরি।

(৯২) সাহাবুদ্-দীন তলাস কৃত তারিখ্-ই মুলুক্-ই আসাম। (৯৩) নিয়ামত খাঁ কৃত—ওয়াকাই।

(৯৪) নিয়ামত খাঁ কৃত—জংনামা।

(৯৫) রুকায়াত্-ই আলম গিরি।

(৯৬) খাফি খাঁ কৃত—মুন্তাখাবু-ল্ লাবাব।

(৯৭) ইরাদত খাঁ কৃত তারিখ।

(৯৮) তারিখ্-ই বাহাদুর সাহী।

(৯৯) তারিখ্-ই সাহ আলম বাহাদুরসাহী।

(১০০) মহাম্মদ কাশিম কৃত—ইব্রত নামা।

(১০১) মুখ্তাসিরুত্ তারিখ্।

(১০২) সোভান রায় কৃত খোলাসাতু-ত্ তারিখ।

(১০৩) মহম্মদ হাদী কামোয়ার খাঁ কৃত হফ্ত্ গুলসান্-ই মহম্মদসাহী।

(১০৪) মহম্মদ হাদী কামোয়ার খাঁ কৃত তাজ্কিরা-ই শাঘাতাই। (১০৫) মহম্মদ সফী কৃত তারিখ্-ই শাঘাতাই।

(১০৬) মহম্মদ আলী কৃত—রায়্হানু-ল্ ফতাহ্।

(১০৭) কঞ্জু-ল্ মহফুজ।

(১০৮) রুস্তমালী কৃত তারিখ-ই হিন্দ।

(১০৯) খুসালচান্দ কৃত তারিখ্-ই-নাদিরু-জ জামানি।

(১১০) মহসীন সাদিকি প্রণীত জৌহরী সমসম্।

(১১১) আনন্দরাম কৃত—তাজকিরা।

(১১২) মহম্মদ মহদী কৃত—নাদির নামা।

(১১৩) মিস্কিন কৃত তাহমাস্প নামা।

(১১৪) বাহ্রু-ত তারিখ।

(১১৫) মহম্মদ নামা।

(১১৬) ইয়ুসফ মহম্মদ খাঁ কৃত—তারিখ-ই মহম্মদ সাহী

(১১৭) তারিখ্-ই আহাম্মদ সা।

(১১৮) করিমখাঁ কৃত—বায়ান্-ই ওয়াকি।

(১১৯) তারিখ-ই আলমগীর সানী।

(১২০) মহম্মদ জাফর কৃত তারিখ্-ই মনাজিল্ ফতুয়া।

(১২১) মোজাফর হোসেন কৃত—জাম্-ই জাহান্নামা।

(১২২) মহম্মদ আস্লাম কৃত—ফর্হাতু-ন্ নাজরিন্

(১২৩) শিউপ্রসাদ কৃত—তারিখ-ই ফৈজবক্স।

(১২৪) মুর্ত্তাজা হোসেন কৃত—হাদিকাতুল আকালিম।

(১২৫) কুদ্রতু-ল্লা কৃত—জাম্-ই জাহান্নামা।

(১২৬) সা-নোয়াজখাঁ সামসামু-দ দৌল্লা কৃত মা-আমিরু-ল ওম্‌রা।

(১২৭) কেবল রামকৃত তাজকিরাতু-ল্ ওম্‌রা।

(১২৮) আমির হায়দর হোসেন কৃত—সোয়ান্-ই আকবরী।

(১২৯) গোলাম হোসেনখাঁ কৃত সৈয়রু-ল মুতাক্ষরীন।

(১৩০) আলীহোসেন কৃত—মালাখখাসু-ত্ তারিখ।

(১৩১) গোলাম রসীদ কৃত—তারিখ-ই মমালিক্-ই হিন্দ।

(১৩২) হরিচরণ দাস কৃত চাহার গুলজার সুজা-ই।

(১৩৩) মীর্জা মহম্মদ বক্স কৃত—তারিখ-ই সাহদাত-ই ফরাফসিয়ার। (১৩৪) ওয়াকিয়াত-ই আজফরী।

(১৩৫) আলিখাঁ আনসরী কৃত—বাহরু-ল মওয়াজ।

(১৩৬) ফকীর খয়রুদ্-দীন কৃত—ইব্রত্ নামা।

(১৩৭) রামচন্দ্র মান কৃত—চাহার গুলসান।

(১৩৮) তারিখ-ই ইব্রাহিমখাঁ।

(১৩৯) আবুতালিব লন্দনী কৃত—লাব্বু-স্ সৈয়র।

(১৪০) আউসফ-ই আসফ।

(১৪১) যুগল কিশোর কৃত তারিখ।

(১৪২) নবাব মুস্তজাবখাঁ কৃত গুলিস্তান্-ই রহমত।

(১৪৩) সাদতিয়ারখাঁ কৃত—গুল্-ই রহমত।

(১৪৪) স্বরূপচাঁদের—সাহিহু-ল আকবর।

(১৪৫) মহম্মদ আলিখাঁ কৃত—তারিখ-ই মুজাফরী।

(১৪৬) শিউদাসের—শাহ্ নামা।

(১৪৭) শাওয়ান সিংহের—ইক্তিসারু-ত তারিখ।

(১৪৮) সাহনেওয়াজখাঁর—মীর আত-ই আফতাবনামা

(১৪৯) মীর্জা নসিতার ইস্তিখবু-ত তারিখ।

(১৫০) হরনাম সিংহের—সাআদাত-ই জাওয়েদ।

(১৫১) সৈয়দ সুলতান আলী কৃত মদন্নু-স্ সাআদত।

(১৫২) হরসুখ রায়ের—মজমাউ-ল আকবর।

(১৫৩) ইনায়েত হোসেন কৃত—কাশিফু-ল আকবর।

(১৫৪) ওমরাও সিংহের জুবদাতু-ল আকবর।

(১৫৫) রামপ্রসাদের—মস্তখব-ই খোলাশাতু-ত তারিখ

(১৫৬) নবাব মহাব্বতখাঁ কৃত—আকবর-ই মহব্বত।

(১৫৭) মন্নুলালের—তারিখ-ই শাহ আলম।

(১৫৮) গোলামালিখাঁর—শাহআলমনামা।

(১৫৯) মীর গোলামালি কৃত—ইমাদু-স সায়াদত।

(১৬০) সৈয়দ গোলামালি কৃত—নিগর নামা-ই হিন্দ।

(১৬১) সদাসুখ কৃত—মস্তখবু-ত তারিখ।

(১৬২) কিষণ দয়াল কৃত—আসরফু-ত তারিখ।

(১৬৩) মীর্জা ইয়ুসুফী—জিনাতু-ল ফিরদৌস।

(১৬৪) সৈয়দ মহম্মদ বাকীরালীখাঁর তারিখ-ই হেনরী

(১৬৫) ফকীর খৈরুদ্-দীন কৃত—বলবন্ত নামা।

(১৬৬) বাহাদুর সিংহের যাদ্গর-ই বাহাদুরী।

(১৬৭) ফকীর মামুদ কৃত—যামিউ-দ্ তারিখ।

(১৬৮) সৈয়দ আহাম্মদখাঁ কৃত—জাম্-ই জাম।

(১৬৯) মহম্মদ রিজার—মজমাউ-ল মুলুক এবং জাব-দাতুল্ ঘারাইব।

(১৭০) মহম্মদ রিজাকৃত আকবরত-ই হিন্দ।

(১৭১) টমাস উইলিয়ামবিল কৃত মিফতাহু-ত তারিখ।

শ্রীবিমলানাথ চাকলাদার।

কেন বাঁচালে আমায়।

১

কেন, বাঁচালে আমায়?

আমি ভেবেছিনু হরি, এবার করুণা করি,
ঘুচাইবে অভাগার এ ভবের দায়,
যত দুঃখ যত ক্লেশ, সকল হইবে শেষ,
কাঁদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায়!
আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মাহেন্দ্র যোগ,
তিলে তিলে পলে পলে আশার আশায়,
ভেবেছি মরণ মাঝি, লইতে আসিবে আজি,
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায়!

ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হস্‌পিটেলে কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর সৌজন্যে—
সৌরভের জন্য গৃহীত ফটো হইতে।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

২

কেন, বাঁচালে আমায়?

চাল ডাল তেল নুন, আবার ভাবিয়া খুন,
জ্বালালে আগুণ ফিরে হৃদি কলিজায়,
ক্ষুধিত সন্তান বুকে, গৃহিণী বিষণ্ণ মুখে,
সম্মুখে আসিয়া সে যে আবার দাঁড়ায়!
মুখে নাহি ফোটে ভাষা, মূর্ত্তিমতী ক্ষুৎপিপাসা,
গরাসে গরাসে পেলে গ্রহ তারা খায়,
ভয়ে ভীত চিত্ত মম, অচেতন শব সম,
আতঙ্কে তরাসে তার চরণে লুটায়!

৩

কেন, বাঁচালে আমায়?

মহাজন খাতা হাতে, কিবা সন্ধ্যা কি প্রভাতে
আবার দিবসে রাতে আসে তাগাদায়!
গেলেও যমের বাড়ী, করিবে নীলাম জারি,
শমনের বাড়ী এরা 'শমন' লট্‌কায়!
দোকানী বাঘের মত, রাগে কটু কহে কত,
ভয়ে হয়ে থতমত ধরি তার পায়,
নরক ভোগের বাকি, আর কিছু আছে নাকি,
বাঁচালে করুণাময় এই করুণায়?

৪

কেন, বাঁচালে আমায়?

ছেলের বইয়ের কড়ি, যোগাইতে প্রাণে মরি,
কোথা পাব ছাতি জুতা ছেঁড়া তেনা গায়!
অবোধ বুঝে না আহা, জেদ্‌ করে চায় তাহা,
সে জানে—বাবার কাছে চেলে পাওয়া যায়!
কিন্তু সে মনের দুঃখে, কাঁদ কাঁদ চাঁদ মুখে,
অভিমানে যে সময় ফিরে নিরাশায়,
তোমার 'বাবার প্রাণ,' থাকিলে হে ভগবান,
দিতে না এমন প্রাণ দেখিতে আমায়!

৫

কেন, বাঁচালে আমায়?

গৃহিণীর ছিল যাহা, বন্ধক রাখিয়া তাহা,
সে দিন আনিয়া আহা দিল চিকিৎসায়,
আজ সেই খালি হাতে, শাক ভাত দিতে পাতে
হঠাৎ পড়িল মনে ক্ষতি লাভ তায়!
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি, মরণে বাঁচনে এক-ই,
দুয়েতেই খালি হাত- নাহিক উপায়,
মরিলে থাকিত মূল, বেঁচে যে'ত জাতিকুল,
বিধাতা তোমার ভুল—দুই কুল যায়!

৬

কেন, বাঁচালে আমায়?

কত করি 'বাড়ী বাড়ী', ফিরিলাম বাড়ী বাড়ী,
চাহেনি পুরুষ নারী স্নেহ করুণায়,
শেষে করিলাম বল, আছেত গাছের তল,
না হয় শুইব তাহে ভূমি বিছানায়।
ইহাতেও হলে বাদী, জানি না কি অপরাধী,—
কি দোষে হয়েছি বল দোষী তব পায়,
পদ্মায় লইল চাটি, না রাখিবে ভিটা মাটি,
না রহিল তৃণটুকু শেষের সহায়!
কি বিকট অট্ট হাসে, গর্জ্জিয়া ফোঁপায়ে আসে,
আকাশ পাতাল যেন গ্রাসে সমুদায়,
সহস্র তরঙ্গ বাহু, মেলিয়া আসিছে রাহু,
কত জনমের যেন ক্ষুধা পিপাসায়!

৭

কেন, বাঁচালে আমায়?

এখন কোথায় যাই, আপনার কেহ নাই,
কে দিবে চরণে ঠাঁই স্নেহ করুণায়,
কে লইবে বুকে তুলি, অনাথ সন্তান গুলি,
কে দিবে আশ্রয়, দেখি দীন অসহায়!
দৈত্যরাজ বলি সম, ত্রিদিব ভূতল মম,
হরিয়া লইলে হরি যদি ছলনায়,
তবে সে বামণ বেশে, পতিত অধমে এসে,
জীবনের অবশেষে রাখ রাঙ্গাপায়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

———

ছেলের কাণ্ড।

(১)

দেবেন্দ্রনাথকে একটী মাত্র পুত্ররত্ন উপহার দিবার পর-মুহূর্ত্ত হইতে সুহাসিনীকে লইয়া স্বর্গে ও মর্ত্তে একটা ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গেল। অবশেষে বহুদিন সংগ্রামের পর ধর্ম্মরাজ যমেরই বিজয় লাভ হইল। দেবেন্দ্রনাথ পত্নী বিয়োগে কাতর হইয়া পড়িলেন।

কিছু দিন স্ত্রী বিয়োগ জনিত অবসাদে দেবেন্দ্রনাথ একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু সময়ে সব সহিয়া গেল। সুহাসিনীর শেষ স্মৃতিটিকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া লইয়া দেবেন্দ্রনাথ আপনার নয়ন প্রান্তের তপ্ত অশ্রুকণা টুকু মুছিয়া লইলেন এবং মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পত্নীর বেদনা স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

শিশুর লালন পালন পুরুষ জাতির আয়ত্ত নহে তাই নারীর অভাব দেবেন্দ্রনাথ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া অসচ্ছলতা সত্বেও আর একটা বিবাহ করিবেন স্থির করিলেন।

যথা সময়ে মাতৃ পিতৃ হীনা একটী অপরিচিতা ষোড়শীর সহিত প্রজাপতি ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের অদৃষ্ট এক দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া দিলেন।

বিবাহের উত্তেজনা, উদ্দীপনা এবং আনন্দ কম্পন শান্ত হইতে না হইতেই বিনোদিনী দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আসিয়া কর্ত্তৃত্বের ও মাতৃত্বের অধিকারী হইয়া বসিল।

(২)

বিবাহের পর তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। মা হারা সন্তান জনকের অত্যধিক আদরে যেরূপ 'আদোরে' হইয়া উঠে, খোকা ও দেখিতে দেখিতে সেইরূপ হইয়া উঠিতে লাগিল। অত্যধিক আদরে তাহার জীবনী শক্তির ভিতর যেন একটা নব জীবনের জোয়ার আসিয়া লাগিয়াছে। ক্রমে তাহার চাঞ্চল্য ও ঔদ্ধত্য এতদুর বাড়িয়া চলিল যে আদরের আতিশয্যে তাহার স্বভাবটা একবারে বিগড়াইবার পথেই আসিয়া দাঁড়াইল।

সে দিন ভাদ্র মাস। বাহিরে টিপ্ টাপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল। বিনোদিনী নির্জ্জনে বসিয়া নারী সুলভ কল্পনায় বিচরণ করিতেছিল, এমন সময় একটা চীৎকার ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু বিনোদিনী তাহা গ্রাহ্য করিল না।

এমন সময় পটাপট শব্দে দেবেন্দ্রনাথ খোকাকে কোলে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তার স্বরে বলিলেন—"শুধু বসিয়া থাকিলেই কি হয়? ছেলেটা পড়িয়া গিয়া ঠোঁট টা কাটিয়া রক্তে ভরিয়া গিয়াছে, সে দিকে কি লক্ষ্য করিতে হয় না?"

স্বামীর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা ও মুখভঙ্গী দেখিয়া বিনোদিনী বিচলিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ বিমর্ষভাবে ছেলেকে নিজ হস্তে ধোয়াইতে বসিলেন, বিনোদিনী তখন জল আনিয়া খোকাকে স্বামী র কোল হইতে লইয়া নিজেই ধুয়াইতে লাগিল। তার পর একটা হাই তুলিয়া বিনোদিনী বলিল—"খোকা আদর পাইতে পাইতে বড় দুষ্ট হইতে চলিয়াছে।"

দেবেন্দ্রনাথ মুখ কাল করিয়া বলিলেন "দেখ খোকা বেশী আদর পাইলে নষ্ট হইয়া যাইবে ঠিক, কিন্তু এক দিনই বলিয়াছি তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার আমার অসহ্য। তার পরকাল নষ্ট হইবে সত্য, কিন্তু ইহাই যে তাঁহার শেষ চিহ্ন।" বলিতে বলিতে দেবেন্দ্রনাথের নয়ন প্রান্তে এক ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল।

বিনোদিনীর বুঝিতে বাকী রহিল না, অন্তরের কোন্ গভীরতম ব্যথা হইতে এই অশ্রুকণা ঝড়িয়া পড়িয়াছে। এতদিন যে সে বুঝিতে পারে নাই, তাহা নহে, তবে তাহাতে তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। আজ সত্যই বিনোদিনীর অন্তরে একটা সজোর-আঘাত লাগিল—হৃদয়ে একটা সুখের বেদনা বাজিয়া উঠিল। স্বামীর প্রতিশ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া গেল। বিনোদিনী ভাবিল বহু পুণ্যবতী ছিল তাহার সতীন, তাই স্বামীর এত স্নেহ, এত প্রেম, এত ভালবাসা সে লাভ করিয়াছিল।

বিনোদিনী বুঝিল—স্বামীর প্রেম ব্যতীত নারী জীবন ব্যর্থ। স্বামীর প্রতিকার্য্যে সাহচার্য্যই নারী জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। নারীর ইহকাল পর কালের আরাধ্য দেবতা, জীবন মরণের অবলম্বন স্বামীর সহায়তাই সহ-

ধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বামী-পুত্রের হিতাহিত বুঝাইয়া দেওয়াও গৃহিণীর কাজ, তাই বিনোদিনী মৃদু কণ্ঠে বলিল "খোকা কি আমার স্নেহের ধন নয়? পাছে সে খারাপ পথে যায়, এইজন্য একটু সাবধান করি, তা তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও, তবে আর কিছুই বলিব না।"

দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, বিনোদিনীর কথায় একটা সহানুভূতির ঢেউ খেলিতেছে। তিনি শান্তভাবে বলিলেন "সে জন্য তোমায় আমি বারণ করি না, তবে কি বুঝিলে —ছেলে মানুষ একটু দুষ্ট থাকা ভাল। এমন ভাবে শাসন করিবে, যেন তোমার কথা দশের কানে না যায় এবং দশের কথায় ছেলে নিজকে মাতৃ হীন বলিয়া বুঝিতে না পারে। মানুষ ভাঙ্গিতে জানে, গড়িতে জানে না।"

দেবেন্দ্রনাথের বেদনা বিজড়িত স্বর বিনোদিনীর হৃদয়ের কাণায় কাণায় একটা অব্যক্ত বেদনা জাগাইয়া দিল; সে দেবেন্দ্রনাথের মুখের দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল। দেবেন্দ্রনাথ ও কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

(৩)

কিছু দিন বিনোদিনীর একটু সুখেই কাটিয়া গেল। বিনোদিনীর হৃদয়ের অমৃতে সেই ক্ষুদ্র সংসার খানাকে সে স্বর্গে পরিণত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সুখ-সৌভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া রাখা বহু পুণ্যের ফল; সেরূপ পুণ্য বিনোদিনীর অদৃষ্টে বিধাতা পুরুষ লিখিয়া দেন নাই—; তাই নব বসন্তের এক স্নিগ্ধ প্রভাতে যখন প্রকৃতি বসন্তের লীলায়িত তরঙ্গে ভাসিতেছিল, তখন বিনোদিনী দেখিল,তাহার এত সুখ শান্তি সৌন্দর্য্যের মধ্যেও তাহার সৌভাগ্য দেবতাটী ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে।

অশ্রু সজলা বিনোদিনীর হাতে যখন দেবেন্দ্রনাথ খোকাকে ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন -"এই খোকা রহিল। যদি খোকাকে মানুষ করিতে পার, তোমার শ্বশুরের ভিটায় বাতি জ্বলিবে।" তখন বিনোদিনীর বুঝিবার আর বাকী রহিল না যে অচিরেই বৈধব্যের কাল রেখা উজ্জ্বলতর হইয়া তাহার সীমন্তের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ রেখা গ্রাস করিতে আসিতেছে।

যে শিশুটির "মা" ডাক একদিন বিনোদিনীর নারী মর্য্যাদায় আঘাত করিত, আজ তাহাকে আশ্রয় করিয়াই সে তাহার বৈধব্য নারী জীবন চরিতার্থ করিবার উপায় করিল।

প্রায়ই দেখা যায় জীর্ণ কুটীর, ছিন্ন বসন, দীর্ণ বক্ষের মধ্য দিয়াই অভাবের হাস্য বিরল পাণ্ডুর মুখচ্ছবি ঘন ঘন আত্মীয়তার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হয়। সদ্য বিধবা বিনোদিনীর গৃহে আজকাল এই অনাহুত আত্মীয়টীর শুভাগমনের সাড়া প্রায় প্রত্যহই লক্ষিত হইতে লাগিল। পতি দেবেন্দ্রনাথ ভিটায় কয়েকখানা জীর্ণ গৃহ, এবং খামারে যৎ সামান্য জমি ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাই সম্বল করিয়া এবং স্বামীর শেষ স্নেহ-স্মৃতি এই সুকুমার শিশুর আরক্ত কচি মুখ খানির প্রতি চাহিয়া এবং দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বেদনার স্মৃতি দিন দিন করিয়া মুছিয়া মুছিয়া বিনোদিনী কোনও মতে দিন কাটাইতে লাগিল।

(৪)

সন্ধ্যার ম্লান ছায়া যখন কর্ম্ম ক্লান্ত জগতের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছিল, গ্রামের দেব মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়া উঠিতেছিল,তখন তুলসী তলায় বিনোদিনী প্রদীপটী রাখিয়া প্রণাম করিল।

অদূরে পদ শব্দ শুনিয়া বিনোদিনী বলিল —"কে?"

"মা, আমি" বলিয়া সত্যেন্দ্র রুদ্ধ নিশ্বাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখের উপর একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা গেল। বিনোদিনী আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন "কিরে খোকা, কি হইয়াছে?"

সত্যেন্দ্র হর্ষ বিগলিত কণ্ঠে বলিল—"শেখর টেলিগ্রাম করিয়াছে, আমি প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছি। আমাদের গ্রামে নাকি এপর্য্যন্ত কেহ আর এরূপ পাশ করিতে পারে নাই মা।'

কথা শুনিয়া বিনোদিনীর বুকের মধ্যে একটা আনন্দের প্রবল বান ডাকিয়া গেল। সে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তারপর উভয়ে তুলসী তলায় দেবতার উদ্দেশ্যে মস্তক লুটাইয়া প্রণাম করিয়া গৃহে গেল।

আজ চৌদ্দ বৎসর দারিদ্র্যের প্রবল আক্রমণ হইতে

প্রাণ পণ যত্নে যে কচি শিশুটীকে সে বুকে করিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ; হৃদয়ের প্রতি স্নেহ কণায় অভিষিক্ত করিয়া ছায়ায় ছায়ায় আগুলিয়া রাখিয়াছে, সেই খোকা সতু সত্যই কি আজ মানুষ হইতে চলিল ? বিনোদিনীর নিকট এ সকল যেন ছায়া বাজি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। নিরাশ্রয়া বিধবা এ আকস্মিক আনন্দের বেগ সামলাইতে না পারিয়া সত্যেন্দ্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। স্বামীর পরলোক প্রবাসী আত্মার নিকট তাহার খোকার সম্মান ও গৌরব সংবাদ পঁহুছাইয়া দেওয়াই যেন এই আকুল ক্রন্দনের উদ্দেশ্য।

সত্যেন্দ্রও কাঁদিল। উভয়ের ক্রন্দন যখন শেষ হইল. তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি উঠিলেন ; হায় আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাঁহার স্মরণ নাই, আজ যে তাঁর ঘরে চাউল নাই। তিনি আকুল ভাবে বলিলেন "সতু আমি যে বড় ভুল করিয়াছি।"

সতু আগ্রহে বলিল—"কি মা ?"

মা বলিলেন—"বিনুর মা চাউল দিবে, কথা ছিল, আমার আনিতে মনে নাই, সেও দিয়া যায় নাই। ঘরে যে এক মুষ্টিও চাউল নাই। এখন উপায় ? সেত এখন ঘোর ঘুমে।

সত্যেন্দ্র বলিল—"না আজ আর কিছুর দরকার নাই মা।" বিনোদিনী স্নেহ মাখা স্বরে বলিল "কি করি বাবা, চারটা খই আছে, তাই খা।"

সত্যেন্দ্র তাহাই খাইল। বিনোদিনী আর কি খাইবে? এরূপ অভাব বিনোদিনীর নিত্য সঙ্গী—সে বাতিটী নিবাইয়া শুইয়া পড়িল। কাহারও চক্ষে নিদ্রা আসিল না।

সত্যেন্দ্র শুইয়া শুইয়া ভাবিল, আমার জীবনের উন্নতির পথে এই দাঁড়ি পড়িল। বহুব্যয় সাধ্য কলেজে পড়ার আশা ইহ জন্মের মত ত্যাগ করিতেই হইবে। এখন যে প্রকারে পারি মাকে সুখী করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। ছোট বেলা হইতে তাহার মা কি ভাবে তাহাকে মুর্খতা ও বুভুক্ষার করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য কঠোর প্রতিযোগীতার সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া সত্যেন্দ্র আকুল হইয়া উঠিল। দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন, অভাবে উপবাস—এ সকল দৃশ্য তাহার কোমল হৃদয়ের কাণায় কাণায় আজ প্রত্যক্ষিভূত হইতে লাগিল। এখন ইচ্ছা করিলে সে বিধবার শ্রান্ত হৃদয়ে একটু শান্তিদান করিতে পারে, তাই সে কোন প্রকারে মাইনর স্কুলের একটা মাষ্টারী যোগাড় করিয়া লইবে স্থির করিল।

সত্যেন্দ্র অপেক্ষাকৃত একটু ম্লান স্বরে বলিল—"মা এখন আমাদের একটা উপায় হইল, কোনরূপ একটা কিছু করিয়া খাইতে পারিব। লেখা পড়াত আর কিছু হইবে না। আর আমার কলেজে যাওয়াও শোভা পায় না। এখন আমি পনর বিশ টাকার একটী মাষ্টারী ঠিক করিয়া তাহাতেই কোন রকমে চালাব।"

পুত্রের ক্ষীণ স্বরের মধ্যে মা গ একটা আশা ভঙ্গের মৌন বেদনা দেখিতে পাইলেন। তিনি বিস্ময়ে বলিলেন— "না তাহা হইবে না; তোমাকে কলেজে পড়িতেই হইবে।"

সত্যেন্দ্র অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল "মা তুমি পাগল নাকি ? সে যে অনেক টাকা চাই, এত টাকা আমি কোথায় পাইব মা?" বিনোদিনী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন — "সে কত ?"

"নেহাত না খেয়ে না পরে পড়লেও বছর দুই শ আড়াই শ টাকা।"

বিনোদিনী চিন্তিত হইলেন। সত্যেন্দ্র মাতাকে চিন্তান্বিতা দেখিয়া বলিল—"ও হইবে না মা, হইলেও. দুই একটা পাস করিলেও, যার উপরওয়ালা নাই, তার ভাগ্যে বি এ পাশেও সেই কুড়ি টাকা। তার চেয়ে এখন হইতেই সে পথ দেখা ভাল।"

বিনোদিনী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "না যেরূপেই হউক তোমাকে পড়িতেই হইবে। টাকার জন্য তোমার চিন্তা ; আচ্ছা দেখি ! আমি একটা উপায় দেখিব। তোমাকে পড়িতেই হইবে।"

সে রাত্রে মায়তে ছেলেতে অনেক পরামর্শ হইল।

(৫)

যতীশ বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের ছেলে, নীচের ক্লাসে পড়ে। সত্যেন্দ্র তাহারই সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিয়া খাইয়া কলেজে পড়িবে এবং যতীশকে বাড়ীতে পড়াইবে—

এই নিয়মে সত্যেন্দ্রর কলেজে পড়িবার বন্দোবস্ত হইল।

প্রাতঃকাল। সত্যেন্দ্র রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"মা তবে আসি।"

বিনোদিনী এতক্ষণ মনের আবেগ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রাণের উচ্ছ্বাস আর বাঁধ মানিল না। তিনি যে আজ চৌদ্দ বৎসরে এক দিনের জন্যও সতুকে নয়নের আড় হইতে দেন নাই। মায়ের কান্না দেখিয়া সত্যেন্দ্রও দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে যে আজ স্নেহ ভক্তি ভালবাসার স্বর্গ পশ্চাতে ফেলিয়া এক অজানা স্থানে, অপরিচিত লোকের সহবাসে থাকিতে যাত্রা করিতেছে। মা ব্যতীত তার যে ইহ সংসারে আপনার বলিতে আর কেহ নাই।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিনোদিনী একটা পুঁটুলি সতুর হাতে দিয়া বলিল—"বই কিনিও আর মাহিয়ানা দিও।"

জীবনে সত্যেন্দ্র মায়ের হাতে এতগুলি টাকা একত্র কখনও দেখে নাই। সে বিস্মিত হইয়া বলিল--"এত টাকা তুমি কোথায় পাইলে মা?" বিনোদিনী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল—"আমার ছিল।"

সত্যেন্দ্র বলিল "এই টাকা হইতে কয়টী টাকা তুমি রাখ। আমি বই কিনিয়া লইব এবং ছেলে পড়ানো যোগার করিয়া লইব। আমার অবস্থা বিবেচনা করিলে আমার প্রতি লোকের দয়া হইবে, তাহা হইলে কলেজেও আর মহিয়ানা লাগিবে না।"

বিনোদিনী কয়েকটা টাকা রাখিয়া দিলেন। সত্যেন্দ্র অশ্রুসিক্ত নয়নে মাকে প্রণাম করিল। যতক্ষণ দেখা গেল, বিনোদিনী নির্নিমেশ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। যখন বেণুকুঞ্জের অন্তরালে সত্যেন্দ্র ঢাকিয়া পড়িল, তখন বিনোদিনী তুলসিতলায় লুটাইয়া পড়িয়া পুত্রের মঙ্গল কামনায় ভগবানকে যুক্তকরে ডাকিতে লাগিলেন।

আজ বিনোদিনীর নিকট গৃহ অরণ্যবৎ বোধ হইল। বিধবা নির্জ্জন গৃহে বসিয়া কতবার কাঁদিল, কতবার শান্ত হইল, আবার কাঁদিল, তারপর অদৃষ্টকে একবার ধন্যবাদ দিল, আবার তিরস্কার করিল। এইরূপে পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। এমন সময় বিন্দুর মা আসিয়া বলিল—"ও বউ তোমার যে হার ছড়া দিয়াছিলে, সে ত খুব দামী জিনিস। রায়দের ছোট বউ বলিল সে পোদ্দার ডাকিয়া যাচাই করিয়াছিল। তুমি ইচ্ছা করিলে আরো টাকা আনিতে পার।"

বিনোদিনী বলিলেন 'না বউ আমার আর টাকার প্রয়োজন নাই। এই হার ছড়া আমার মার গলার। মা মরিবার সময় এই হার আমাকে দিয়া যান। এতদিন শত অভাবেও এই হার আমি বাহির করি নাই। আজ আমার সতুর দিকে চাহিয়া তাহা বাহির করিলাম।"

বিন্দুর মা হাসিয়া বলিল "তাতে কি? এখন তোমার সতু মানুষ হইয়াছে। কত কড়ি আসিবে।"

বিনোদিনী গদ গদ কণ্ঠে বলিল—"দিদি আশীর্ব্বাদ কর, সতু বাঁচিয়া থাকুক।

(৬)

যথা সময়ে সত্যেন্দ্র বি,এ, পাস করিয়া মা এর চরণে প্রণাম করিল। আনন্দ পরিপ্লুত নয়নে বিনোদিনী তাহাকে গৃহে বরণ করিয়া লইলেন।

শিক্ষিত পুত্রের আগমনে বিনোদিনীর গৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটী শিক্ষিতা ডিপুটী কন্যা আসিয়াও তাহার জীর্ণ গৃহের এক কোণা উজ্জ্বল করিল।

তারপর ভাগ্য বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদে ও শ্বশুরের চেষ্টায় অচিরেই সত্যেন্দ্রনাথ ডিপুটী হইলেন। সপরিবারে কার্য্য স্থলে চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী পতির পরিত্যক্ত বাস্তভিটা ছাড়িতে রাজি ছিলেন না; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এবং নব বধুর তত্ত্বাবধানের জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইল। কার্য্যস্থলেও বিনোদিনীই স্নেহের রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন। নব্য শিক্ষিতা বধুর নিকট কিন্তু বিমাতার এরূপ আধিপত্য অনধিকার চর্চ্চা বলিয়াই মনে হইল।

কমলা সৎশাশুড়ীর ঘর করিতে যাইতেছে, এজন্য তাহার মাতার দুঃখের অন্ত ছিল না। আত্মরক্ষার জন্য কমলা মাতৃ উপদেশও সে জন্য প্রচুর পাইয়াছিল। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সে পদেপদে কড়ায় গণ্ডায় শাশুড়ীকে সংসারের জন্য, জবাব দাহি করিতে বাধ্য করিল।

বিনোদিনী বুদ্ধিমতী, সুতরাং সহজেই তাহা বুঝিয়া

ফেলিলেন, স্নেহের আধিক্যে তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন তথাপি আপন কর্ত্তব্য ভুলিলেন না।

বিনোদিনী যখন প্রাতঃকালের মুখ ধুইবার জল গরম হইতে খাওয়ার ভাতটী পর্য্যন্ত বধূর সমীপে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন নববধূ, বিমাতার পক্ষে যে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে পারিলেন। ক্রমে অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে বধুর-প্রীতির ফল প্রকাশ্য ভাবে ফলিতে লাগিল; বিনোদিনী অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া নীরবে সব সহ্য করিতে লাগিলেন। বিনোদিনী পুত্রের নিকট মুহূর্ত্তের জন্য কখনও অপ্রসন্ন ভাব প্রকাশ করেন নাই, পাছে নিজ বক্ষ শোণিতের প্রতি বিন্দুতে গড়া এই সংসারে কোন অশান্তি ও বিচ্ছেদের কোন ছায়া ঘনাইয়া আসে। তাহার মর্ম্ম শোণিত নীরবে ঝড়িয়া যাউক কিন্তু পুত্রের সুখের নীড় যেন তাহার কোন অলক্ষিত অভিসম্পাদও স্পর্শ না করে। তিনি সতর্ক মাঝির ন্যায় বাহিরের ঝড় ঝাপটার হাত হইতে তাহার সংসারতরী খানিকে সযত্নে রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবতী হইলেন।

শাশুড়ীকে নির্য্যাতন করিতে যতটুকু আত্ম প্রকাশের প্রয়োজন, কমল এতদিন তাহা নীরবে প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে তাহার তৃপ্তি হয় নাই; তাই এখন মায়ের কথা মাঝে মাঝে পাকে প্রকারে ছেলের কানে তুলিতে লাগিল। সত্যেন্দ্র মায়ের সম্বন্ধে কোন কথা উঠিতেই তাহা বন্ধ করিয়া দিত। সত্যেন্দ্রের প্রশান্ত হৃদয়ে কোন প্রকার উত্তেজনাই স্থান পাইত না। মায়ের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস।

(৬)

"ঝি, আজ জল গরম হইল না যে?"

ঝি বলিল "তা আমি কেমন করিয়া বলিব মা।" কমলা বালক চাকরকে ডাকিয়া বলিল "কিরে ফুলিয়া গরম জল কোথায়?"

ফুলিয়া জবাব দিল "হামি কেমনে কহিব?"

কমলা রুক্ষস্বরে বলিল—জিজ্ঞেস করে আয় দেখি?"

"কাকে"

একটু স্বর চড়াইয়া কমলা বলিল "যে বরাবর করে, আর কাকে?

তখন ঝি বলিল "মার কাল একাদশী গিয়াছে, রাত্রে জর হইয়াছে; তিনি এখন ও উঠেন নাই।

কমলা উত্তেজিত স্বরে বলিল "সে ভাব তো চির দিনই আছে। তার জ্বর, তোমার মাথা ব্যথা, সে জানে না। পিণ্ডি মরিবার সময় তো লোকের অভাব হয় না।'

যখন বাহিরে এইরূপ ঝড় বহিতেছিল, সেই সময় শাশুড়ী জল গরমের কেটলীটী লইয়া আসিয়া ঘরের কোণায় মুখ ধুইবার স্থানে রাখিয়া আস্তে আস্তে পাটশোলা লইয়া ঘরে যাইতে লাগিলেন।

কমলা শাশুড়ীর এতাদৃশ বিলম্বের কৈফিয়ত তলপ স্বরূপ বলিলেন 'যার যা খুসি, সেরূপই হচ্ছে; কেহ আসেন ৮ টায়, কেহ দশটায়, কেহর বা মাথা ব্যথা,—এদিকে ভাতের বেলাতো কারো কামাই নাই—"

ঠিক সেই সময় সত্যেন্দ্র নাথ ভোর ফিরিয়া আসিয়া কমলার স্বর-ঝঙ্কার শুনিলেন—"ভাতেরবেলাত কামাই নাই।"

সত্যেন্দ্র চিরদিন দরিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। ভাতের তুলনা যে কি মর্ম্মান্তিক, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনেক বার অনুভব করিয়াছে, তাই কমলার কথা কয়টী "ভাতের বেলা তো কামাই নাই" তাহার বক্ষ পঞ্জরের অস্থিগুলিকে যেন নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতে ছিল। সত্যেন্দ্র উচ্চ কণ্ঠে বলিল—"সে কেমন?" কমলা মুখ তুলিয়া চাহিয়া অপ্রস্তুত হইল। তখন তাড়াতাড়ি মুখ ধুইবার ভাণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সত্যেন্দ্র নাথ ঝিকে ডাকিলেন। ঝি বধুর পক্ষ ছাড়িয়া শাশুড়ীর পক্ষ অবলম্বন নিষ্কণ্টক মনে করিল না। সুতরাং শাশুড়ী যে বধূর মর্জ্জি-মত আদেশ প্রতিপালন করিয়া চলেন না, তাহাই বিশদ রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিল এবং এই সঙ্গে তার নিজের ও যে খাটুনি অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সেই জন্য সেও সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া কাজ করিতে পারে না, কাজেকাজেই জল গরম ও হয় নাই ইত্যাদি বলিয়া গেল।

সত্যেন্দ্রের নিকট এসকল কথা নূতন; সুতরাং ঝির কথা শুনিয়া তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি রুক্ষস্বরে

বলিলেন "কিসের জল গরম? কেন হলো না, হয়েছে কি, স্পষ্ট করে বল না?"

ঝি তখন ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল "বউ ঠাকুরাণের মুখ ধুইবার জল গরম পান নাই। মা ঠাকুরাণের কাল অসুখ ছিল, তা আমাকেও বলেন নাই। আমাকে না বলিলে,না করিতে দিলে,আমরা কি করিয়া বুঝিতে পারি"

অনেক প্রশ্ন করিয়া সত্যেন্দ্র নাথ প্রকৃত বিষয়ে পঁহুছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মার ঘরের সম্মুখে গিয়া ডাকিলেন—"মা"।

বিনোদিনী ছেলের জল খাবার—মোহনভোগ প্রস্তুত করিতেছিলেন। পশ্চাৎ হইতে সত্যেন্দ্রের ডাক শুনিয়া তাহার মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বধুর কথাগুলি তাহার হৃদয়ের পরতে পরতে বেদনার উৎস জমাইতেছিল, ছেলের স্নেহ মাখা "মা" শব্দে যেন তাহা ঝড়িয়া পড়িল। তিনি শব্দ করিতে পারিলেন না। ফিরিতেও পারিলেন না।—চক্ষের জলে যেন সত্যেন্দ্রের সেই মা কথাটার নীরব প্রত্যুত্তর দিবার জন্য—দুকুল প্লাবিত করিয়া ছুটীল।

সত্যেন্দ্র নাথ স্বাভাবিক স্বরে বলিল—"মা তুমি কাঁদিতেছ?"

মা চক্ষু জল মুছিয়া বলিলেন "না আগুন জ্বলিতেছে না ভাল।"

সত্যেন্দ্রের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল; সে নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল "মাকে তুমি কি বলিয়াছ?"

কমলা ক্রুদ্ধ ভাবে বলিল "আমি কেন কাকে কি কথা বলিতে যাব?"

সত্যেন্দ্র গম্ভীর অথচ দৃঢ় ভাবে বলিলেন—'দেখ কমলা তুমি অন্য যাই কর, আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু আজ যাহা করিয়াছ, তার ক্ষমা নাই। তুমি আমার বাড়ীতে আসিয়াছ কি এ সংসারের সেবা করিতে, না সেবা বুঝি করিতে? সেইটাই আমি জানিতে চাই।

কমলা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া অতি তীব্র স্বরে প্রতি ধ্বনির মত বলিল "আমি যদি সংসারের জঞ্জাল হইয়া থাকি, তাড়াইয়া দিলেই হয়। আমারই যত দোষ।"

"দোষ তোমার কি মার? আমি সে সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে চাই না। তোমার সহিত আমার পরিচয় আজ তিন বৎসর, আর তাঁর সহিত ২৫ বৎসর। তাঁকে আমি যতটা জানি, আর কাউকে আমি ততটা জানি না। তাঁর সম্বন্ধে তোমাকে আর কিছুই বলিতে হইবে না। যদি সেবা করিয়া থাকিতে পার, থাক, মাথায় করিয়া রাখিব; আর যদি তা না পার—

কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "কোন কথা না শুনিতে চাও, আমাকে তাড়াইয়া দাও! আমার ভাতের জন্য আমার মা বাপ মরবে না, এটা ঠিক জানিও।"

সত্যেন্দ্র তেমনি দৃঢ় স্বরে বলিল "দেখ, তাড়াইয়া দিবার কথা হইতেছে না। সংশোধনের কথা হইতেছে। আমার যিনি মা"—সত্যেন্দ্র নাথের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল! "তিনি তোমার গ্রাহ্যের পাত্রী না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি আমার মা; আমার পূজনীয়া, আমার আরাধ্যা। তোমাকে ঘরে আনিয়াছি, তাঁহাকে যত্ন করিবে বলিয়া, তোমাকে সেবা করিবার কাজ আমার মার নয়। আমার এই কথাগুলি যদি তোমার মনঃপুত না হয়, এই মুহূর্ত্তে তুমি এ বাড়ী ছাড়িতে পার। স্ত্রী সংসারে অনেক মিলিবে। মা জগতে দুর্লভ।"

দলিতা ফণিনীর ন্যায় কমলা পোর্টমেণ্ট ধরিয়া টানিয়া নামাইল। আলনার কাপড় গুলি একটানে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহা বাছিয়া লইতে লাগিল। সত্যেন্দ্র নাথ ক্রোধ স্বরে বলিলেন—"সেই ভালো।'

এই সময় জল খাবার—মোহনভোগ লইয়া মা ছেলের ঘরে আসিলেন। সত্যেন্দ্র নাথের মুখ বন্ধ হইল।

বিনোদিনী জল খাবার লইয়া আসিয়া ছেলের কথা শুনিয়াছিলেন, তাই কিছুক্ষণ বাহিরে থাকিয়া কথা শেষ হইলে ঘরে ঢুকিয়া স্নেহ মাখা স্বরে বলিলেন" ছি বাবা, ঘরের বউকে কি এসব কথা বলিতে আছে। বউ ছেলে মানুষ, এখনও যে তার এতটা বুঝিবার সময় আসে নাই। আমাদেরই কি এসব কথায় রাগ করিতে আছে? বউ মা, যাও মা, ঘরে জল খাবার রাখিয়া আসিয়াছি। তুমি মা আমার ঘরের লক্ষ্মী। রাগ করিও না। সংসার করিতে হইলে কথাবার্ত্তা হইয়াই থাকে, আতে কি কেউ

সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়; না চিরদিনই ঝগড়া ঝাটী থাকে। আমি এক সময় তোমাকে বলিব, তুমি এক সময় আমাকে দু কথা বলিবে।"

সত্যেন্দ্র মার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"ওকথা হইবে না মা। সে কেন তোমাকে দু কথা বলিবে? সে বলিবার কে? ওই করিয়াই তো তুমি নিজের মান খোয়াইলে। আর এখন ঘাড়ে বসিতে চায়। তা হইবে না। আমি অশান্তি সহিতে পারিব না, তোমাকেও জীবন ভরিয়া অশান্তি সহিতে দিব না।"

বিনোদিনী পুত্র ও বধুর সম্মুখে দাড়াইয়া থাকা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তিনি বধুকে জল খাইতে ডাকিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। শেষ বলিয়া আসিলেন "বাবা কাহাকেও কটু কথা বলিয়া মনে কষ্ট দিও না।"

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া কমলার মনে সান্ত্বনা আসিয়াছিল; ভক্তিতে শাশুড়ীর প্রতি মন একটু নত হইয়া আসিয়াছিল।

মা চলিয়া যাইতেই সত্যেন্দ্র বলিল "সেই ভাল। দশের দূরে থাকুক দুই জনের সেবা করিতেই যদি না পার, তবে এ সংসারের সেবা পাইবারই বা প্রয়োজন কি? পিত্রালয়েই যাও; তোমার আমার সম্বন্ধ চিরদিন বজায় থাকিবে। তোমার যাহা প্রয়োজন, আমি সব যোগাইব। যাইব, দেখিব, কিন্তু স্ত্রীর জন্য আমি মার অসম্মান করিতে পারিব না।" একটু থামিয়া সত্যেন্দ্র নাথ আবার বলিতে লাগিলেন "দেখ কমলা, মা থাকিলেও বোধ হয় মাতৃ ভক্তি যে কি, তাহা জান না। বোধ হয় তোমার মা তোমার বাবার মাকে তেমন চক্ষেই দেখিয়া থাকেন।"

মাতৃ নিন্দা শুনিয়া কমলার হৃদয় আবার উদ্বেলিত হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে পোর্টম্যান্টো বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল।

সত্যেন্দ্র নাথ বলিলেন "তাহাই হউক। মার অবমাননা আমি দেখিতে পারিব না। এই ঘরের যাহা কিছু খুঁটী তুমি দাও, আবার প্রত্যেক জিনিসে তোমার [illegible] আছে। কিন্তু আমার মার উপর কথা বলিবার [illegible] কোন অধিকার নাই।"

কমলা রাগ করিয়া পিত্রালয় চলিয়া গেল। বিনোদিনী বাধা দিয়া, আপত্তি করিয়া, অনেক অনুরোধ খোষামোদ করিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিলেন না।

(৭)

কমলা পিত্রালয়ে দিন যাপন করিতে লাগিল। পিতা জগমোহন বাবু ৮০০৲ টাকার ডিপুটী। পিতৃগৃহে কমলা অর্থের বেশ প্রাচুর্য্য দেখিতে পায় কিন্তু শান্তির চিহ্নও সে গৃহের ভিতর কখনও সে খুজিয়া পাইল না। সর্ব্বদা, ঝগড়া বিবাদ লাগিয়াই আছে। তাহার মাতা একটী উগ্রচণ্ডা। ক্রোধ হইলে তাঁহাকে শান্ত করে কাহার সাধ্য। জগমোহন বাবুর বৃদ্ধা মাতা বধুর পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। কখন কখনও বৃদ্ধার কোন ত্রুটী হইলে তাহাকে যে দুই এক ঘা সহ্য করিতে না হয়, তাহাও নহে। ছোট বেলা হইতে এই সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়া কমলাও সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া শাশুড়ী হইতে কড়ায় গণ্ডায় আপনার প্রাপ্য আদায় করিতেছিল, কিন্তু সহসা সত্যেন্দ্র নাথের বজ্রবাণী তাহার সে বড় সাধের আসন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

কমলা পিতৃগৃহে নিত্য নূতন ঝগড়া ঝাটী দেখিয়া এতটা অশান্তি অনুভব করিতেছিল যে সে শান্তির জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বিশেষ তাহার অন্তর মধ্যে তখন একটা বড় তুমুল ঝড় বহিতেছিল। এইরূপে ঝড়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া কমলার দিন যাইতেছিল। একদিন কমলা রাত্রে স্বপ্ন দেখিল:—

"তাহার বাড়ীতে ধুম বিবাহ। পাত্র সত্যেন্দ্র, পাত্রী যেন তাহাদেরই জ্ঞাতি ভগ্নি—কুমুদিনী। কুমুদিনীর জন্যই প্রথম সত্যেন্দ্রর কথা হইয়াছিল। সত্যেন্দ্র ডেপুটীর মেয়ে বিবাহ করায় দরিদ্র-কন্যা কুমুদিনীর বিবাহ হয় নাই। কুমুদিনী এখনও অবিবাহিতা। তার পরই আর এক দৃশ্য। একটা সুন্দরী পরীতে আসিয়া সত্যেন্দ্রকে লইয়া যাইতেছে—তাহার শাশুড়ী চীৎকার করিয়া কমলাকে ডাকিতেছে "বউ তুমি আসিলে না। এ ডাইনী সতুকে লইয়া চলিল, আমি একা আর রাখিতে পারিলাম না।" শাশুড়ীর ডাকে কমলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কমলা চাহিয়া দেখিল বেলা হইয়াছে। তার মা তাহাকে ডাকিতেছেন।

বিছানায় বসিয়া কমলা দেখিল, তার সম্মুখে একখানা

ডাকের চিঠি। স্বপ্ন দেখিয়া শাশুড়ীর প্রতি কেমন যেন একটা শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। এখন শাশুড়ীর চিঠি খানা পড়িয়া তাহার মস্তক শাশুড়ীর চরণে আরও নত হইয়া পড়িল। চিঠি পড়িয়া কমলার অভিমান, উচ্ছৃখলতা কোথায় সরিয়া গেল, শাশুড়ীর সে অসহায় চক্ষুর জল তাহার নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া যেন তাহাকে বিগলিত করিয়া ফেলিল। কৃতজ্ঞতায় কমলার অশ্রু আর বাধ মানিল না। সে বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করিল। সে অশ্রু জলে তাহার মনের সকল গ্লানি-আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া তাহার হৃদয়কে পবিত্র করিয়া দিল। কমলা মাকে স্বপ্ন কথা বলিয়া এবং শাশুড়ীর অনুরোধ পত্র দেখাইয়া স্বামী গৃহে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করাইল।

(৮)

রাত্রি ৭টার সময় সত্যেন্দ্র নাথ আফিস হইতে আসিয়া গৃহের চারিদিকে কমলার হস্ত বিন্যাসের আভাষ লক্ষ্য করিলেন। সত্যেন্দ্র ডাকিলেন"—মা।"

এমন সময় মায়ের ঘর হইতে দুটী সলজ্জ আঁখি আসিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। কমলার চাহনিতে আর সে উগ্র তেজ নাই; কমলা যেন একখানা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি।

সত্যেন্দ্র নাথ হাস্য মুখে বলিলেন—"কখন আসিলে? প্রণাম করিলে না।"

কমলা অপ্রস্তুত ভাবে অথচ মৃদু স্বরে উত্তর করিল—"কেন, আমি কোথায় গিয়াছিলাম?"

সত্যেন্দ্র নাথ লক্ষ্য করিলেন কমলার কথায় আর জোড় নাই, অথচ বিনয়ের আভাষ আছে।

সত্যেন্দ্র অবস্থা বুঝিয়া একটু স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন—"দেখ কমলা, তুমি গিয়াছ অবধি, মা খান না, লন না. তাহার মনে সে আনন্দ নাই।"

তেমনি মৃদুস্বরে কমলা বলিল "আমিই কি আর সুস্থির ছিলাম।' সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"বুঝিলে ত। শান্তিই সংসারে সুখ।" গতর খাটাইয়া দিন কাটাও, দেখিবে কত সুখ। কমলাও হাসিয়া বলিল "সে কথা আর বলিতে হইবে না।" সত্যেন্দ্র নাথ আবার বলিলেন "দেখ কমলা অনিচ্ছা সত্বেও আজ তোমায় আর একটী কথা বলিব—মা ছেলের দেবতা, স্বামী স্ত্রীর দেবতা। স্বামীর দেবতা স্ত্রীরও দেবতা। আমার মা আমার দেবতা, সুতরাং তিনি তোমারও দেবতা। কথাটী যেন স্মরণ থাকে। সংসারে যে খাটে, সংসারটী তার, দেবতার নহে। দেবতা কেবল পূজা পাইবার অধিকারী।"

কমলা মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল "একথা আর বলিতে হইবে না। আমি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াই আসিয়াছি।"

* * * *

পর দিন শাশুড়ী ভোরে উঠিয়া দেখিলেন, তাহার কাজ করিবার মত কাজ কিছুই আর বাকী নাই। তুলসীতলা লেপা, ঘর লেপা, উঠান ঝাড়ু দেওয়া, গোবর ছিটা দেওয়া, শাশুড়ীর সন্ধ্যার স্থান মুক্ত, এমন কি মালার পেটিকাটী পর্য্যন্ত যথাস্থানে রক্ষিত। যেন স্বয়ং লক্ষ্মী আসিয়া গৃহে অধিষ্ঠান করিয়াছেন।

মা বুঝিলেন, এ ছেলের কাণ্ড। ছেলে বুঝিল এ কমলার কাজ। কমলা তখন বুঝিল, ইহাই সংসারে শান্তি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

তিব্বত অভিযান।

লাসার রাজপ্রাসাদ।

লাসা সহরের ঠিক বুকের উপর পটল পর্ব্বত। দলাই-লামার রাজ-প্রাসাদ ইহার উপর অবস্থিত। প্রাসাদের সুবর্ণমণ্ডিত গুম্বজ দূর হইতে বেশ সুন্দর দেখায়। প্রাসাদের চারিদিকে জঙ্গল ও পর্ব্বত থাকাতে উহার সৌন্দর্য্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ইহা অবশ্য একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন দলাইলামার সময় ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার মধ্যে নানাপ্রকার সুদৃশ্য অট্টালিকা, মন্দির এবং সমাধি স্থান প্রভৃতি আছে। স্ত্রংচন্ লাসা সহরের প্রথম ভূপতি। ইনি খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে লাসা নগর সংস্থাপন

করেন এবং পটলের উপর প্রথম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। মধ্যস্থলের প্রধান প্রাসাদ প্রথম দলাইলামা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। উহার বর্ণ লোহিত বলিয়া উহা 'লোহিত প্রাসাদ' নামে প্রসিদ্ধ। সমস্ত প্রাসাদের মধ্যে এই অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য; কারণ সমস্ত প্রধান ২ মন্দির, সিংহাসন কক্ষ, দলাইলামার পোষাক পরিচ্ছদ ভবন, দরবার হল প্রভৃতি ইহারই মধ্যে অবস্থিত।

আমরা একদিন বেলা দশটার সময় প্রাসাদ দেখিতে গমন করিলাম। আমরা দুই জন বাঙ্গালী—রায় মহাশয় ও আমি, চারি জন সাহেব ও একজন লামা একত্রে রওনা হইলাম। যখন আমরা উহার সম্মুখে আসিলাম, তখন প্রাসাদের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ অন্য প্রকার মনে হইল। প্রাসাদের চারিদিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। বন্দুক চালাইবার জন্য উহার মধ্যে মধ্যে ছিদ্র করা হইয়াছে। উত্তরদিকে কোনও প্রাচীর নাই; কারণ, ঐ দিকে পর্ব্বতের এক অংশ এমন ভাবে চলিয়া গিয়াছে যে, উহা প্রাসাদের অতি সুবৃহৎ প্রাচীরের কাজ করিতেছে। এই পর্ব্বত প্রাকার ভেদ করিয়া এক বৃহৎ প্রবেশ দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা এই পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম। কিয়দ্দূর গমনের 'পর আমাদিগকে সিঁড়ির সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিতে হইল। গণনা করিয়া দেখিলাম সর্ব্বশুদ্ধ ৯৫টী সিঁড়ি আছে। উহা শেষ হইবার পরই আমরা সম্মুখে "লোহিতপ্রাসাদ" দেখিতে পাইলাম। প্রাসাদের সৌন্দর্য্যের তুলনায় তাহার প্রবেশ নিতান্ত বেমানান মনে হইল। রায় মহাশয় বলিলেন, "ইহারা যে ঘোর অসভ্য তাহার কিছু না কিছু নিদর্শন সব জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়।" প্রবেশ দ্বার পার হইবার পর, আমরা দুইধারে প্রহরীদিগের আবাসস্থল দেখিলাম। এই সকল বাড়ী আগাগোড়া পাথরের প্রস্তুত ও তিন চারিতলা পর্য্যন্ত উচ্চ।

কিয়দ্দূর পরে আমরা দক্ষিণদিকে ফিরিয়া আর একটী ফটক দেখিতে পাইলাম। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা বামদিকে এক ঘোর অন্ধকারময় পথে প্রবেশ করিলাম। রায় মহাশয় আমার অগ্রে ২ যাইতে ছিলেন। তিনি আসিয়া আমাকে একটু ভয়-ত্রস্ত ভাবে কহিলেন, "এ কোথায় আনিলে হে? আমার ত ভাই বড় ভাল বোধ হইতেছে না। যদি এইখানে গলা টিপিয়া ধরে?" আমার রাগও হইল, হাসিও পাইল। আমি বলিলাম, "এখন তাহা হইলে কি করিতে চান?" এই সময় সহসা আমরা আলোকে আসাতে আমাদের কথাবার্ত্তা স্থগিত হইল। তাহার পর আমরা সিংহাসন কক্ষে উপস্থিত হইলাম।

কক্ষটি চতুষ্কোণ—প্রায় ২০ গজ হইবে। উহার চারিদিকে গ্যালারির মত বসিবার স্থান সাজান। কক্ষের প্রায় মধ্যস্থলে (উত্তরদিক ঘেঁসিয়া) রাজসিংহাসন স্থাপিত। উহার ঠিক পশ্চাতে খানিকটা স্থান সুদৃঢ় রেলিং দ্বারা বেষ্টিত। উহার মধ্যে নানাপ্রকার বহুমূল্য মণি মুক্তা খচিত অলঙ্কার প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে।

এই কক্ষের পার্শ্বে পুরাতন সিংহাসন কক্ষ। এখন এইস্থানে দলাইলামা প্রতিদিন প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়া যাত্রীদিগের পূজা ও উপহার গ্রহণ করেন, এবং তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ দান করেন। লামা ও অন্যান্য বড় লোকদিগের মস্তক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। অন্যান্য সাধারণ লোককে তিনি হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা স্পর্শ করেন।

সিংহাসন কক্ষের উত্তরদিকে একটী সমাধি স্থান। এই সমাধি অত্যন্ত বৃহৎ ও নানাপ্রকার কারুকার্য্য পরিপূর্ণ। শুনিলাম প্রথম দলাইলামার নশ্বর দেহ এইস্থানে রক্ষিত আছে। এই সমাধির পাদমূলে সিংহাসন খানি রক্ষিত। সিংহাসনের উচ্চতা দুই হাতের অধিক নয়। উহার মধ্যে বিশেষ সৌন্দর্য্য কিছু দেখিলাম না। সিংহাসনে পাঁচ জনের বসিবার স্থান আছে। ইহা একটী সিংহের উপর স্থাপিত।

সমাধিটী দেখিবার সামগ্রী। সমগ্র তিব্বতে ইহা অপেক্ষা মনোরম বস্তু আর নাই। ইহার উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান নানাপ্রকার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও মণি মুক্তায় পূর্ণ। শত শত বর্ষব্যাপী যাত্রীদিগের প্রদত্ত উপহার দ্রব্য এই স্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। আমরা এক অপ্রশস্ত সিঁড়ির সাহায্যে সমাধির চূড়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানে যে

সৌন্দর্য্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। উহা দেখিয়া আমার আগ্রার তাজ, লাহোরের সাহাদ্রা, দিল্লীর জুম্মা মসজিদ প্রভৃতির কথা মনে পড়িল। এ প্রকার শিল্পনৈপুণ্য তিব্বতের আর কোথাও নাই। এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, দলাইলামার আজ্ঞায় দেব-শিল্পী আসিয়া এই সমাধি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমার কিন্তু ধারণা, ইহা ভারতীয় কারিকরের নির্ম্মিত। কারণ, ইহা সকলেই জানেন যে তিব্বতের লোক কোনও দিন শিল্পকার্য্যে নিপুণ ছিল না। এখানকার প্রধান ২ ইমারত চীনা কারিকরের প্রস্তুত। কিন্তু চীনারা কোনও দিন স্থপতি বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন না। কাঠের কাজের জন্যই তাহারা চিরপ্রসিদ্ধ।

এই প্রাসাদের মধ্যে দ্বিতীয় দলাইলামার সমাধি ব্যতীত আর সমস্ত দলাইলামারই সমাধি স্থান আছে। শুনিলাম, দ্বিতীয় দলাইলামা পাপ কার্য্যের জন্য পদচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন। তিব্বতের ইতিহাসে এ প্রকার ঘটনা অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়। এই ঘটনা দ্বারা বেশ স্পষ্টই বোধ হয় যে, পাপের শাস্তি সব স্থানেই আছে। যাহারা দলাই লামাকে জীবন্ত ঈশ্বর মনে করে, তাহারাও পাপকে পাপ মনে করে।

এই সিংহাসন কক্ষের ঠিক সম্মুখেই দলাইলামার মঠ। পাঠক, মনে রাখিবেন, দলাইলামা রাজবেশধারী সন্ন্যাসী। আমরা যাঁহাকে রাজর্ষি বলি, ইনি তাহাই। এই মঠের ইনি প্রধান মহান্ত। মঠের মধ্যে প্রায় ৫০০ ভিক্ষু ও লামা বাস করেন। এই মঠের মধ্যে এক সুবর্ণময় বুদ্ধ-মূর্ত্তি ভিন্ন দ্রষ্টব্য আর কিছুই নাই। এই মঠের কাছেই এক সুউচ্চ প্রাসাদ দেখিলাম। শুনিলাম, সমস্ত প্রাসাদের মধ্যে ইহা সর্ব্বোচ্চ। দলাইলামা প্রতিদিন অপরাহ্নে ইহার ছাদের উপর পাদচারণা করিয়া থাকেন। এই প্রাসাদের ছাদ অনেকটা চন্দ্রাতপের মত। যে সময়ে দলাইলামা ছাদের উপর ভ্রমণ করেন, তখন যাত্রীরা নিম্নে তাঁহার স্তুতিগান করে।

এই প্রাসাদ দেখিয়া আমরা ফিরিতেছি, এমন সময় রায় মহাশয় বলিলেন, "শুনেছিলুম, দলাইলামা একজন সন্ন্যাসী। কিন্তু এখন দেখ্‌চি সংসারীরও অধম লোকটা কিন্তু বড় আরামে থাকে। আমাদের তারকনাথের মহান্তের চেয়েও এ লোকটা সৌখিন।" আমি বলিলাম, "তোমার কি হিংসা হয় নাকি?" রায় মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হিংসা যে হয়না তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু ভাই, গিন্নিকে ছাড়িয়া আমার বুঝি স্বর্গেও সুখ হইবে না।"

উপর্য্যুক্ত প্রাসাদের দক্ষিণদিকে অনেকগুলি উঁচু প্রস্তর স্তূপ দেখিলাম। শুনিলাম, ইহার নীচে মৃত্তিকার মধ্যে ঘর আছে। রাজকোষ উহার মধ্যে রক্ষিত। এই কোষাগারের ঠিক সম্মুখে দলাইলামার বাসস্থান। বর্ত্তমান দলাইলামার বয়স যখন এক বৎসর ছিল, তখন তিনি এইস্থানে আনীত হইয়াছিলেন। ইঁহার জননী ইহার নিকটে একটি ক্ষুদ্র ভবনে বাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে শিশুকে কয়েকবার স্তন্যপান করাইয়া আসিতেন। ইঁহার পিতা কিন্তু ইঁহার সহিত অবস্থান করিতেন।

তিব্বতের অস্থায়ী দলাইলামা।

আমাদের লাসা প্রবেশের পাঁচদিবস পূর্ব্বে দলাইলামা একজন প্রবীণ ও বহুজ্ঞ লামাকে আহ্বান করিয়া পাঠান। ইঁহাকে লামা বলিলাম বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইনি একজন 'প্রধান' পদভুক্ত। ইংরাজিতে (Cardinal) যে শ্রেণীভুক্ত তিব্বতে ইঁহারও ঐ পদ। ইনি দলাইলামার প্রাসাদে আসিয়া দেখিলেন যে, দলাইলামা তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই লাসা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যাইবারে পূর্ব্বে উক্ত প্রধান লামাকে তিনি স্বীয় পদে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

দলাইলামা ইঁহাকে নিজের পদে নিযুক্ত করিয়া বিশেষ বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ও ধার্ম্মিক লোক সমগ্র তিব্বতে আর কেহই ছিল না। এই গোলযোগের সময় তাঁহার ন্যায় লোকের নায়কতার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল।

রাজ প্রাসাদ দেখিবার দুই দিবস পরে আমি একজন সাহেব কর্ম্মচারীর সঙ্গে ঐ অস্থায়ী শাসন কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করি। আমরা যখন তাঁহার কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তখন তিনি একখানি কৌচের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার বয়স ৭০এর কম

হইবে না। পরিধান নিতান্ত সাদাসিদে রকমের। তাঁহার সম্মুখে একখানি চৌকি; উহার উপর এক পেয়ালা চা এবং কয়েকখানা কাগজ ছড়ান ছিল। তাঁহার পশ্চাতে দুইজন লামা দাঁড়াইয়া ছিলেন।

আমাদিগকে তিনি বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। প্রথমেই আমাদের জন্য চা আসিল। তাহার পর তিব্বতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রকার কথোপকথন আরম্ভ হইল। আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, চিরদিন তাঁহার কেবল ধর্ম্ম চর্চ্চাতেই অতিবাহিত হয় নাই। তিব্বতের সমস্ত রাজনৈতিক অবস্থা ইঁহার, নখদর্পণে। উপস্থিত অবস্থায় কি প্রকার ভাবে যে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা তিনি বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন।

সহসা তিনি সাহেবকে বলিলেন, "আপনি অবশ্য বৌদ্ধ নহেন? সাহেব বলিলেন, "না। কিন্তু বৌদ্ধের সহিত অনেক বিষয়ে আমাদের মিল আছে। জগতে যাহাতে শান্তি ও সার্ব্বজনীন সৌভাত্র স্থাপিত হয় সে বিষয়ে খ্রীষ্টও বুদ্ধের ন্যায় চেষ্টিত ছিলেন। সকলকে ভাইএর মত দেখা, শত্রুকে আলিঙ্গন করা প্রভৃতি মত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান্ উভয়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।" প্রধান লামা মহাশয় তাঁহার এই কথায় যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। নিতান্ত উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—"ইংরাজ তাহা হইলে কখনও খ্রীষ্টের উপাসক নয়। আপনি বিরক্ত হইবেন না। আপনাদের উপস্থিত কাজই আমার এই কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সকলকে ভাইএর মত দেখিবার উপদেশ যদি খ্রীষ্ট দিয়াছেন, তবে আমাদিগের উপর এ ব্যবহার কেন? আমরা যদি আপনাদের সহিত কোনও অন্যায় আচরণ করিতাম, তাহা হইলেও না হয় আপনাদের একটা ওজর থাকিত। কিন্তু বলিতে পারেন কি, আমরা আপনাদের কি অনিষ্ট করিয়াছি?"

সাহেব যে লজ্জিত হইয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তথাপি তিনি বলিলেন, "আমরা ত আপনাদের সহিত কোনও অন্যায় ব্যবহার করি নাই। আমরা বাণিজ্য প্রধান জাতি, আপনাদের সহিত বাণিজ্য সন্ধি স্থাপনের জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছি; আপনারা আমাদের সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না, অথচ আমাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রুসের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে অগ্রসর। ইহা কি আপনাদের উচিত ব্যবহার হইয়াছে?"

প্রধান লামা—"আমরা স্বাধীন জাতি। যাহার সহিত ভাল বুঝিব সন্ধি করিব। আমরা আপনাদের সহিত বাণিজ্য করিব না। জোর করিয়া আমাদিগকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার অধিকার আপনাদের আছে কি? আমরা দুর্ব্বল না হইয়া যদি প্রবল হইতাম, তাহা হইলে আপনারা এই ভাবে গায়পড়া হইয়া সন্ধি করিতে আসিতেন কি?' সাহেব বলিলেন—"সেটা দুর্ব্বল সবলের কথা নয়, স্বার্থ ও প্রয়োজনের কথা।"

ইহার পর নানা বিষয়ের আলাপের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন তাহা এইস্থানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল 'হিন্দু ও বৌদ্ধ এক মায়ের দুই সন্তান। দুই জনেই পিতার (ঈশ্বরের) উদ্দেশে রওনা হইয়াছেন। চারিদিক কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকায় আছন্ন বলিয়া তাঁহারা পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক হইয়া ভিন্ন ২ পথে যাইতেছেন। মধ্যে ২ কণ্ঠধ্বনি দ্বারা এ উহার অস্তিত্ব জানিতে পারিতেছেন। তখন উভয়ে উভয়কে বলেন, "ভাই! তুমি বিপথে চলিতেছ, আমার সঙ্গে চল। আমি তোমার আসল পথ বলিয়া দিব।" কিন্তু শেষে যখন কুজ্ঝটিকা দূর হইয়া চারিদিক পরিষ্কার হইয়া যাইবে (অর্থাৎ, উভয়ে যখন প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিবেন) তখন উভয়েই দেখিবেন যে, বিভিন্ন পথ অনুসরণ করা সত্ত্বেও তাঁহারা পিতার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন।'

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তিব্বতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, এদেশে অনেক মহাত্মা আছেন। তাঁহারা নাকি অনেক অলৌকিক কার্য্য করিতে পারেন? একথা কি সত্য? প্রধান লামা মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তিব্বতের পরম সৌভাগ্য যে আপনারা ইহার বিষয়ে এতটুকু ভাল কথাও শুনিয়াছেন। আপনি বলিতেছেন যে, আপনি ভারতে বহুদিন হইতে বাস করিতেছেন। সে দেশ

ছাড়িয়া আপনি এখানে মহাত্মাদের সন্ধান করিতেছেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এক ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও মহাত্মা নাই। উঁহারা সেখানে যোগী নামে প্রসিদ্ধ। তবে কি জানেন, ভারত এক বড় মজার দেশ। যে যেমন রংএর চসমা পরে, সে ভারতকে সেই ভাবে দেখে। আপনারা দেশ হইতে আসিবার সময় যদি বুঙিন্ চস্‌মা গুলি সেইখানে রাখিয়া আসেন, তাহা হইলে ভারতে এমন সব জিনিস দেখিতে পান, যাহা পৃথিবীর আর কোথাও নাই। আমি বৃদ্ধ লোক। রাগ করিবেন না। আমার মত নির্ব্বোধের কাছে ভাল জিনিস কেমন করিয়া আশা করিতে পারেন।" সাহেব হাসিলেন।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

অনাথ।

(১)

মাতা পিতা নাই কিরে তোর, নাই কি আপন জন,
থাক্‌বার বুঝি ঘর বাড়ী নাই, নাই বুঝি তোর ধন।
কাপড় খানি অমন ছেঁড়া ধূলায় মলিন কেন?
মু'খানি তোর বিষাদ ভরা ভোরের চাঁদটী যেন।
মাথার চুল তোর উস্কু খুস্কু করুণ দু'টী আঁখি,
কে তোরেরে করলে অমন দুঃখের ছায়ায় ঢাকি?

(২)

"লক্ষীছাড়া" "হাড় হাবাতে" সদাই শুনিস্ গালি;
উদাস্ চোখে কাহার পানে চেয়ে থাকিস্ খালি?
এ জগতের সুখের কণা পা'স্‌নি একটী বার?
সকল অঙ্গে বেরোয় ছুটে বক্ষের হাহাকার।
কার কি ধন তুই হরে নিলি—করলি সর্ব্বনাশ,
তার ফলে তোর নয়নের জল ঝড়ছে বারমাস।
কোন দেবতার পূজার ফুলটি হেলায় ফেল্‌লি ছেঁড়ে
কোন কাঙ্গালের মুখের গ্রাসটী নিছিলি তুই কেড়ে?

(৩)

আয়রে যাদু, আয়রে আমার বক্ষে নিই আয় তুলে,
ঝেড়ে দিয়ে ময়লা ধূলো তেল দে'দি তোর চুলে।
কোচান কাপড় পড়িয়ে দিয়ে খাওয়াব দুধ ভাত,
"নারায়ণ" তোর সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌বে রে দিন রাত।
তোম্‌রা যখন মা বলে বাপ ডাক্‌বে হরষ ভরে,
আমি ইহ লোকেই স্বর্গ পাব, আয়রে আমার ঘরে।
সাত রাজার ধন রতন মাণিক আর যত সব ছার,
তোরাই আমার ধর্ম্ম অর্থ, চাইনে কিছু আর॥

শ্রীকুন্দমালা দেবী।

ময়মনসিংহের রঘুনাথ।

বঙ্গদেশের সারস্বত ক্ষেত্রে শিক্ষা ও দিগন্ত প্রসারিণী প্রতিভার বীজ বপন করিয়া হৃদয়ের রক্তে যাঁহারা তাহার পুষ্টি বিধান করিয়াছেন, রঘুনাথ তাঁহাদের একজন ছিলেন। এই রঘুনাথ নবদ্বীপের রঘুনাথ নয়, এই রঘুনাথ ময়মনসিংহের এক নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তত্ত্ব সমন্বিত "বিশ্ব বিজ্ঞান" ও "তত্ত্বোপস্কার" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া একসময়ে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত করিব।

ময়মনসিংহ জেলার অধীন নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত বিশ্বনাথপুর গ্রামে লব্ধ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ভৈরবচন্দ্র পঞ্চানন মহাশয় বাস করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া নারায়ণডহর নিবাসী জমিদার স্বর্গগত রামচরণ মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি সহকারে স্বীয় অধিকারভুক্ত কান্দাপাড়া গ্রামে আনিয়া বাস্তব্য করাইলেন, এবং সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিছু সম্পত্তিও ঐ সঙ্গে পঞ্চানন মহাশয়কে দিয়াছিলেন। এই মহাত্মার দ্বিতীয় পুত্রই প্রাগুক্ত রঘুনাথ সার্ব্বভৌম। তিনি বাঙ্গালা ১২৫১ সনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম বয়সে রঘুনাথ পিতার টোলে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। রঘুনাথ বাল্য কালে

অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার দুরন্তপনার জন্য তিনি একদিন পঞ্চানন মহাশয় কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। এই তিরস্কারেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনোন্নতির সূত্রপাত হইল। এই তিরস্কারে তাঁহার মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হওয়ায় দশমবর্ষ বয়সেই তিনি পিতৃভবন ত্যাগ করতঃ সহর সেরপুরস্থ সেরাগ্রামে উপস্থিত হন। তথায় অধুনাতন বিখ্যাত সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর কবিরত্ন মহাশয়ের পিতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি অসাধারণ পরিশ্রম ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে ১৮ বৎসর বয়সেই ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া ইহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তৎপর কথিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকটেই অল্প বাদার্থ অধ্যয়নান্তর স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। অল্পকাল মধ্যেই ইহাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সার্ব্বভৌম উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে নবদ্বীপ গিয়া স্বর্গীয় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট আরও কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যয়ন করেন।

রঘুনাথ স্মৃতি শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ পর্য্যালোচনায় অত্যন্ত নিপুণ ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে সকল কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন তাহাতে অধ্যাপকগণ চমৎকৃত হইতেন। অনেক সময় তাহার সমাধান করিতে পারিতেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলে অধ্যয়ন কালে তিনি যে সকল প্রশ্নের অবতারণা করিতেন, তৎ মীমাংসার্থে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনেক চিন্তা করিতে হইত। রঘুনাথ সার্ব্বভৌম ও দুর্গাসুন্দর কবিরত্ন মহাশয় উভয়েই এককালে অধ্যয়ন করিয়াছেন।

নবদ্বীপ হইতে আসিয়া রঘুনাথ কিছুদিন কলিকাতায় তত্রত্য প্রধান পণ্ডিত ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্রালোচনা করেন। এই সময় ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার প্রতিভা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিয়া এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে "গোভিল গৃহ্য সূত্রের" টীকা রচনার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। রঘুনাথ বলিলেন যে আমি নারায়ণডহরের জমিদার মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে অধ্যয়ন করিয়াছি, এখন যদি দেশে না যাই তবে আমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়; কাজেই আমি এখানে থাকিতে স্বীকৃত হইতে পারিতেছিনা। তবে যদিও আমি চলিয়া যাইতেছি তথাপি আমার বিশেষ বন্ধু প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়কে রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহা দ্বারাও এসকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে আশাকরি। ইহার পরই স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় সেখানে নীত হন। এবং সেইখানেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটে।

রঘুনাথ অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়নে রত হইতেন। এমনকি সেই সময় তিনি বাহ্য জগতের সম্বন্ধ ভুলিয়া যাইতেন। এতদসম্বন্ধে একটি নিদর্শন উল্লেখ করিতেছি।

একদা রজনীতে রঘুনাথ শাস্ত্রাধ্যায়ন কালে কূটার্থ মীমাংসায় গভীর চিন্তামগ্ন আছেন। বাড়ীর সকলে আহারাদি সমাপন করিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে আহারার্থে ডাকিতে গিয়া দেখেন তিনি ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় গবেষণায় নিরত আছেন; এত রাত্রি যে হইয়াছে, ইহা তাঁহার বোধ নাই; পরে সকলের ডাকে তাঁহার চৈতন্য হইল এবং আহারার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই বলিলেন, একি জল ফেলিয়া রাস্তা এত কদর্য্য করিয়াছে কেন? তখন সকলে বলিল এ জল নহে, কতকক্ষণ হইল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে রঘুনাথ অত্যধিক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে! ইহার ত আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। তিনি কিছুদিন নারায়ণডহর জমিদার বাড়ীতে সভাপণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ঐ কার্য্যে ব্রতী করেন। এবং নিজে বাটীতে থাকিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধে রচিত তাঁহার "বিশ্ববিজ্ঞান" এক উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ তিনি সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া পরে সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি "তত্ত্বোপস্কার" নামে এক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থের এ দেশে আদর নাই। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে "শান্তি" নামক একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহা

অসমাপ্ত রাখিয়াই মরলোক ত্যাগ করতঃ স্বর্গধামে চলিয়াগিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় তাহার পাণ্ডুলিপি খানাও এখন পাওয়া যাইতেছে না।

ইনি ১৩০২ সনে কাশীলাভ করিয়াছেন। ইঁহার ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাভূষণ একপ্রকার জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। একমাত্র পুত্রের বিয়োগে তিনি ব্যথিত না হইয়া যথারীতি তাহার ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইনিও একজন সুলেখক ছিলেন, ধীতপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় এম, এ, বি এল মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে পণ্ডিত সভা আহুত হইয়াছিল ঐ সভায় "তিথি বিশেষে দ্রব্য বিশেষ ভক্ষণ নিষেধ" সম্বন্ধে অতি যুক্তি পূর্ণ এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ শ্রবণে সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলী বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত বিরাট পর্ব্বের একখানা টীকা আছে। ইনি কাশী লাভের পর কাশীধামে জনৈক সন্ন্যাসী তাঁর ভ্রাতা শ্রীযুক্তকালীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে ইনি যোগভ্রষ্ট পুরুষ।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

গ্রন্থ সমালোচনা।

মৈত্রীর পথে—শ্রীমাখনলাল চৌধুরী বি, এ, বি, টি প্রণীত। হোয়াইট পাবলিসিং কোম্পানী হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা। এই গ্রন্থখানি ছাত্রবৃন্দকে নীতি উপদেশ প্রদান ছলে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অতি সহজ ভাষায় নানারূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা চারি অধ্যায়ে তাহার উপদেশ গুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে পরের কারণে নিজ সুখ বলিদানকেই প্রকৃত বড় লোকের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বহু দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ছাত্রদের জন্য লিখিত হইলেও ইহাতে অনেক জানিবার বিষয় আছে।

"**ভিজ্ঞাস-চিত্র ও অন্যান্য গল্প**" শ্রীসুধাংশু কুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনুবাদিত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য দশ আনা। সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন হাস্যরসিক মার্কটোয়েনের কতিপয় কৌতুকচিত্র ও গল্প এই গ্রন্থে সঙ্কলন করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর সঙ্কলন বঙ্গসাহিত্যে নূতন সম্পদ। রচনার সহজ সরল স্বাভাবিক ভাবটী তর্জ্জমায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; এ বিষয়ে আমরা গ্রন্থকারের নিপুণ হাতের প্রশংসা করি।

গল্পগুলির অধিকাংশই সুখপাঠ্য ও কৌতুহল উদ্দীপক। "হাস্যরসিক মার্কটোয়েন" শীর্ষক প্রবন্ধে মার্কটোয়েন সম্বন্ধে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে গুলি পরম উপভোগ্য। কতকগুলি ত্রুটী সত্বেও গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে বলিতে হইবে।

"**আরো গল্প**"—শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত প্রকাশক ইউ, রায়, এণ্ড সন্স; ১০০ নং গড়পার রোড, কলিকাতা। মূল্য ॥০ আনা। "আরো গল্পে"র গল্পগুলি যেমন কৌতুককর গল্পের ছবিগুলি তেমনি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। ছবিগুলি লেখিকার স্বহস্তাঙ্কিত। গ্রন্থের ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট একথা বলাই বাহুল্য।

বিক্রমাদিত্য—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরিরাম ধর, বি,এ, পপুলার লাইব্রেরী ঢাকা। মূল্য ।৵ আনা।

পূর্ণবাবু সৌরভের পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নহেন। তিনি এই শ্রেণীর আরো কয়েক খানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার কিম্বদন্তীর উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিক্রমাদিত্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল। ছাপাও উৎকৃষ্ট। গ্রন্থে কয়েকখানি ছবি আছে।

বল্লাল চরিত—(সমালোচনা) শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বল্লালসেন সম্বন্ধে যে সকল কল্পিত গল্প প্রচলিত আছে, তাহা খণ্ডন করিতে যাইয়া গ্রন্থকার বেশ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

আইন ও দলিল শিক্ষা—মৌলবী আবদুল আকিক মিঞা প্রণীত। প্রকাশক—এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা সর্ব্বদা মামলা মোকদ্দমায় বিজড়িত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে এ গ্রন্থখানি উপকারে আসিবে। ইহাতে মোটামুটি মকদ্দমা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। পল্লিবাসীদের এক এক খানা থাকিলে সর্ব্বদা সাধারণ বিষয়ের জন্য উকীল মোক্তারের নিকট পৌঁছিতে হয় না।

সাহিত্য সংবাদ।

কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি এ, বাহাদুরের গল্প পুস্তক 'মৃগনাভি' বাহির হইয়াছে।

মসূয়ার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুখলতা রাও ছেলেমেয়েদের জন্য "আরো গল্প" নামক একখানা সচিত্র গল্প পুস্তক বাহির করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু তাঁহার "আটীয়ার ইতিহাস" গ্রন্থ প্রায় শেষ করিয়াছেন। করটীয়ার বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ওয়াজেদ আলী খাঁ পানির সাহায্যে ইহা প্রকাশিত হইবে।

টাঙ্গাইল নাগরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের "গায়ে হলুদ" উপন্যাস ছাপা হইতেছে।

সিমলা পুরাতত্ব বিভাগের ডাঃ স্পুনার তথাকার ঐতিহাসিক সভায় পাটলীপুত্রের খনন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন 'পাটলীপুত্র খননে যে সকল গৃহের ভিত্তি ও অগ্নি কুণ্ডের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার স্পষ্টই হৃদ-বোধ হইয়াছে যে সে কালের এই পাটলীপুত্র নগরটী নিশ্চয়ই পারসী দিগের স্থাপিত এবং সেই শৌর্য্য বীর্য্য সম্পন্ন মৌর্য্য বংশটীও পারসী দিগেরই প্রতিষ্ঠিত অন্যতম কীর্ত্তি।" অধ্যাপক সরকার ও অধ্যাপক সমাদ্দার এ সম্বন্ধে কি বলেন?

ভগবানের অনুগ্রহে কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস আরোগ্য লাভ করিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা এই সংখ্যায় তাঁহার রুগ্নাবস্থার একখানা ছায়া চিত্র প্রদান করিলাম।

ময়মনসিংহ বালিগাও নিবাসী শ্রীমান্ প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ 'চম চম' নামে একখান্না শিশুপাঠ্য সচিত্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

যশোহর নবম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ও সাহিত্য বিভাগের, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ দর্শন বিভাগের, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বিজ্ঞান বিভাগের ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু ইতিহাস বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্তের নূতন গল্পের বই নিরালা বাহির হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদকতায় নির্ব্বাসিতা সীতা প্রণেতা কবিবর স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মিত্রের বিরচিত রামায়ণ মহাকাব্য ঢাকা সিটি লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিসর্জ্জন ব্যবস্থা।

বর্ত্তমান বর্ষে ১লা কার্ত্তিক দেবী বিসর্জন হওয়ার ব্যবস্থা আশ্বিন মাসের সৌরভে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই অভিনব প্রাদেশিক উদয় কাল ধরিয়া ব্যবস্থা প্রচলনের সমর্থন করিতে পারিতেছিনা। কারণ ১৩০৭ সালেও ১৮ই আশ্বিন ১দণ্ড ৫৩ পল দশমী থাকায় ১৭ই আশ্বিন নবমীর পর বিসর্জ্জন হইয়াছিল। তখন স্বর্গীয় মহা মহোপাধ্যায় পূজনীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, স্বর্গীয় মহা মহোপাধ্যায় পূজনীয় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় ও স্বর্গীয় পূজনীয় হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ বিশেষ সমালোচনা সহকারে পূর্ব্ব দিনে বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। তখন ও অপরাজিতা পূজা যাহাদের নাই তাহাদের পক্ষে পরদিন বিসর্জন হওয়ার ব্যবস্থা কয়েক জন পণ্ডিত প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন পক্ষই প্রাদেশিক উদয় লইয়া ব্যবস্থা দেন নাই। সেবারও ৪ পল মাত্র সময়ের জন্য পরদিন দশমীর মুহূর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছিল। বিশেষতঃ কেবল দেশ ভেদে উদয়ানুসারে বিসর্জ্জন ব্যবস্থা হইতে পারে না। একাদশী, শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সমস্ত কর্ম্মেই প্রাদেশিক উদয় গ্রহণ হয় না। অপিচ কলিকাতার সময়ানুসারেই ব্যবস্থা হইতেছে। বিশেষতঃ ব্যবস্থা সংশয়স্থানে প্রাগুক্ত স্মার্ত্ত শিরোমণি মহোদয়গণের মতেই ধর্ম্মক্রিয়া হইত এখনও হয়। কাজেই মহাজন গৃহীত পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে যাওয়া সঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে সেরপুর নিবাসী সর্ব্ব শাস্ত্রদর্শী পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন যে "এ পর্য্যন্ত কলিকাতার সময় মতেই সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন প্রাদেশিক উদয় লইয়া কেবল মাত্র বিসর্জ্জন ব্যবস্থা সঙ্গত নহে।

আরও বিচার্য্য এই যে নব ব্যবস্থায় কুমিল্লার সহিত ময়মনসিংহের পূর্ব্ব সীমার ও পাবনার সহিত পশ্চিম ময়মনসিংহের এক কি দুই মাত্র ব্যবধান সত্বেও জেলা ভেদে উদয় ভেদ ধরিলে ধর্ম্মক্রিয়ার ব্যবস্থা একমত হইতে পারে না। অপিচ এই ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমার উদয়ের ভেদ ধরিয়া শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা এক জিলায়ই ভিন্নমত হইতে পারে এ সমস্ত কথা বিশেষভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমালোচনা আবশ্যক।

অতএব দেশভেদে উদয় লইয়া সমস্ত ক্রিয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত কিনা ও লোকের জন্য পত্রিকাদি প্রস্তুত হওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা না করিয়া কেবল বিসর্জ্জনের অভিনব ব্যবস্থা অসঙ্গত।

শ্রীদুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদসিদ্ধান্তরত্ন।

স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

চতুর্থ বর্ষ } ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩২২। { দ্বিতীয় সংখ্যা।

ঋগ্বেদে আর্য্যজাতির শিক্ষা ও জ্ঞান।

ভারতীয় আর্য্য দিগের অতি প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থ ঋগ্বেদ। ইহা কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এক মত নহেন। তবে খৃষ্টের ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছে তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। গ্রীক দিগের ইলিয়াড গ্রন্থ খৃষ্টের ৯ম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রাচীন যুগে ভারতের আর্য্যগণ কিরূপ ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম ও জ্ঞান কত দূর বিকশিত হইয়াছিল, এবং গ্রীক দিগের তুলনায় তাঁহারা সভ্যতা সোপানের কোন স্তরে বিদ্যমান ছিলেন, এই প্রকার নানাবিধ তথ্য জানিতে সকলেই যে কৌতুহলাবিষ্ট হয়েন তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের যুগে আর্য্যদিগের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের অবস্থা কিরূপ ছিল এ প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে আমরা চেষ্টা করিব। এবং যদি পাঠক পাঠিকার কৌতুহল বৃদ্ধি পায়, তবে ভবিষ্যতে উপরোক্ত অপরাপর বিষয়ের অবতারণা করিতেও যত্ন করিব। আর্য্য দিগের পূজ্য ইন্দ্রাদি দেবতার স্তব সমূহে ঋগ্বেদ পূর্ণ। যখন আর্য্যগণ কোন যুদ্ধে বহির্গত হইতেন বা শত্রুর অক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতেন, তখনই ইন্দ্র, মরুৎ, অগ্নি প্রভৃতির পূজা বিশেষ ভাবে হইত এবং নুতন নুতন স্তব রচিত হইয়া পঠিত ও গীত হইত। এইরূপ পূজাকে সেকালে যজ্ঞ বলিত। এরূপ যজ্ঞ ভিন্ন, প্রত্যেক আর্য্য গৃহস্থ প্রতিদিন অগ্নি, অশ্বিদ্বয়, রুদ্র প্রভৃতির পূজা করিতেন। এই সকল স্তবে আমরা অনেক উপমার ব্যবহার দেখিতে পাই। সেই সকল উপমা আর্য্যগণ স্বজাতির আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি হইতে গ্রহণ করিতেন। আমরা নিম্নে আর্য্য দিগের শিক্ষা ও জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিব তাহা ঐরূপ উপমা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। মূল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদের উক্তি সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা যে কালে বর্ত্তমান, তাহার সহিত তুলনায় প্রাচীন বৈদিক যুগ এরূপ স্বতন্ত্র যে তাহার অনেক কথা সহজে আমরা ধারণা করিতে পারি না। এক্ষণে কোন বালকের শিক্ষার কথা উল্লেখ করিতে হইলে আমরা বলিয়া থাকি, তাহার "লেখা পড়া" কেমন হইতেছে। কিন্তু বৈদিক যুগে লেখা আদৌ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কাজেই "পড়া" কিরূপে হইতে পারে? ঋগ্বেদের যুগে কোন লোককে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত বলিতে হইলে, বলিতে হইত লোকটী "দীর্ঘশ্রুৎতম।' যথা—

যঃ স্মুম্নৈ র্দীর্ঘ শ্রুত্তম আবিবাসত্যেনান্। ১০।৯৩।২

যিনি "দীর্ঘশ্রুত্তম" (তিনি) সুন্দর বস্তুদ্বারা ইহা, দিগকে (অর্থাৎ দেবতাদিগকে) সন্তুষ্ট করেন।

সদাপৃণো যজতো বিদ্বিষোবধীৎ বাহুবৃক্তঃ শ্রুতবিৎ তর্যোবঃসচা। ৫।৪৪।১২

অর্থ ঃ—সদাদানশীল, যজ্ঞশীল, বাহুতে দর্ভযুক্ত, শ্রুতিবেত্তা আমাদের সখা তর্য শত্রুকে বধ করিয়াছেন।

য পবমানো অধ্যেতি ঋষিভিঃ। ৯।৬৭।৩১

অর্থ ঃ—যিনি ঋষিদিগের সহিত পবমান নামক সোম স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন (বা অধ্যয়ন করিতেছেন)।

সেইজন্য বেদের নাম শ্রুতি। সেকালে লিখন প্রথা উদ্ভাবিত হয় নাই। অতএব কোন প্রকার রচনা লিখিত হইতে পারিত না। কোন রচনা রক্ষা করিতে হইলে স্মরণ করিয়া রাখা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। সেইজন্য আর্য্যজাতির বেদ শিষ্য পরম্পরায় স্মরণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে শিষ্যকে গুরুর নিকট গমন করিয়া শ্রবণ করিতে হইত। এই নিমিত্ত বেদ শ্রুতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। যিনি সমস্ত বেদ এইরূপে শ্রবণ করিয়া আয়ত্ত করিতেন, তিনিই দীর্ঘশ্রুত্তম আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। ভারতে যেমন বেদ সকল বংশ পরম্পরায় স্মরণে রাখিয়া রক্ষিত হইয়াছে, গ্রীসদেশে ইলিয়ড গ্রন্থও সেইরূপ রক্ষিত হইয়াছিল। গলদেশের ড্রুইডগণ, হেলিওপলিসের মিশরীয় পুরোহিত, পারস্য দেশের কুরের্গ্নিয়ান স্তোতা, মহম্মদের কোরান পাঠক এবং কালমুকদিগের জাতীয় কবিগণ, স্ব স্ব ধর্ম্মের স্তোত্র সকল স্মরণ রাখিয়া রক্ষা করিয়াছেন।

বৈদিক যুগে শ্রবণ করিয়াই জ্ঞান পাওয়া যাইত বলিয়া বেদ বা জ্ঞানকে শ্রুতি বলা হইত। যখন আর্য্যগণ লিখন প্রণালীর ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, সম্ভবতঃ স্মৃতিশাস্ত্র তখনই সংগৃহীত হইয়াছে। "স্মৃতি" নাম হইতে মনে হয়, বেদের স্মরণ হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছিল ; কারণ প্রথমে শ্রুতিই আর্য্য জাতির সকল প্রকার জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল বলিয়া বোধ হয়।

ঋগ্বেদের একস্থলে আমরা সেই কালের শিক্ষা প্রদান প্রণালীর আভাষ প্রাপ্ত হই। যথা,

যদেষা মন্যো অন্যস্য বাচং শাক্তস্যেববদতি শিক্ষমাণঃ। ৭।১০৩।৫

অর্থ ঃ—শিক্ষাকারী যেরূপ শাক্তের (বা গুরুর) বাক্য বলে, সেইরূপ ইহাদের মধ্যে একে অন্যের (বাক্য বলে)। এস্থলে বর্ষাকালে ভেকদিগের রবের বর্ণনা হইতেছে। এই একটী উপমা দ্বারা আমরা বুঝিতেছি যে গুরু প্রথম বেদ উচ্চারণ করিতেন এবং শিষ্য তাঁহার উচ্চারণ শুনিয়া উচ্চারণ করিতেন। এখনও পাঠশালায় নামতা প্রভৃতি পড়াইবার এইরূপ রীতি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যিনি অনেক বিষয় জানেন তাঁহাকে আমরা বিদ্বান্ বলিয়া থাকি। বিদ্বান্ শব্দ আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। যথা—

অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাৎ বিদ্বান্ অদব্ধো বিমুমোক্তু পাশান্। ১।২৪।১৩

অর্থ—রাজা, বিদ্বান (বা জ্ঞানী), অহিংসিত বরুণ ইহাকে (অর্থাৎ শুনঃ শেপকে) বন্ধন মুক্ত করিয়া ছিলেন বন্ধন সকল বিমোচন করুন।

যথা বিদ্বান্ অরং করৎ বিশ্বেভ্যো যজতেভ্যঃ। ২।৫।৮

অর্থ ঃ—যেরূপ বিদ্বান্‌গণ সকল দেবতাদিগকে শোভমান করেন।

ঋষিদিগকে কবি আখ্যা প্রদান করা হইত। তাঁহারা অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন, তাহাদ্বারা সকল দেখিতে পাইতেন। যথা—

সতো বন্ধু মসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মণীষা। ১০।১২৯।৪

অর্থ ঃ—কবিগণ হৃদিবদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা অসতে সতের বন্ধু বা উৎপত্তিকারণ স্থির করিয়াছেন।

বেদবিদ্‌গণকে "বিপ্র" আখ্যা প্রদান করা হইত। সেই বেদবিদ্‌গণ যজ্ঞে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন। যথা—

ইন্দ্রবায়ূ মনোজুবা বিপ্রা হবন্ত উতয়ে।
সহস্রাক্ষা ধিয়স্পতী॥ ১।২৩।৩

বিপ্রগণ (বা মেধাবী ঋত্বিক্‌গণ) রক্ষার জন্য মনোগতিযুক্ত, সহস্র অক্ষিযুক্ত, বুদ্ধির পালক ইন্দ্র ও বায়ুকে আহ্বান করিতেছেন।

যাঁহারা যজ্ঞে স্তব করিতে পারিতেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মণ বলা হইত। যথা—

যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ। ২।১২।৬

অর্থ ঃ—যিনি সমৃদ্ধির প্রেরক, যিনি দরিদ্রের (ও) যিনি যাচমান স্তোতা ব্রহ্মণের (সমৃদ্ধি প্রেরক)।

সে কালের লোকে মনে করিতেন, দেবতাগণ জগৎ সংসারের সকল বিষয় জানেন। অতএব তাঁহাদিগের নিকট মানব শিক্ষালাভ করিবে। সেইজন্য আর্য্যগণ যজ্ঞ করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন এবং দেবগণ যজ্ঞে আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান দান করিতেন। ইহাকে আমরা revelation বলিতে পারি।

নিম্নে ঋক্ সকল উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে।

বিদ্বান্ পদস্য গুহ্যান্ অবোচৎ যুগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্। ৭।৮৭।৪

অর্থ ঃ—বিদ্বান্ (ও) বিপ্র (বরুণ) উপযুক্ত (ও) সমীপস্থ (শিষ্যের) শিক্ষার্থ গুহ্য পদের বিষয় বলিয়াছিলেন।

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মারন্ তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টান্। ১০।৭১।৩

অর্থ ঃ—যজ্ঞের দ্বারা বাক্যের পথ পাওয়া গিয়াছে। ঋষিদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট তাহাকে (বাক্যকে) লাভ করা গিয়াছে।

যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা যা মধ্যমা বিশ্বকর্ম্মন্নুতেমা।

শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধাবঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বং বৃধানঃ॥ ১০।৮১।৫

অর্থ ঃ—যে সকল তোমার উৎকৃষ্ট ধাম (বা শরীর) যে সকল মধ্যম, ও যে সকল নিম্ন (ধাম) আছে, হে বিশ্বকর্ম্মন্! সখা দিগকে (অর্থাৎ স্তোতা দিগকে) যজ্ঞকালে সেই সকল অবগত কর। হে অন্নবান্! তনুকে বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত নিজেকেই যজ্ঞ করিয়াছ।

দেবগণ ভিন্ন২ বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া আর্য্যগণ বিশ্বাস করিতেন। বরুণকে নিম্নলিখিত বিষয়ে জ্ঞানী বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাই।

বেদা যো বীনাং পদ মন্তরিক্ষেণ পততাম্।
বেদনাব সমুদ্রিয়ঃ॥ ১।২৫।৭

অর্থ ঃ—অন্তরীক্ষে গমনকারী পক্ষীদিগের বা নক্ষত্রদিগের পদ (অর্থাৎ পথ) যিনি জানেন; সমুদ্রস্থিত নৌকার বা জল বিচরণকারীদিগের (পদ) জানেন।

বেদ মাসো ধৃত ব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ।
বেদা য উপজায়তে॥ ১।২৫।৮

অর্থ ঃ—ব্রতধারী (বরুণ) প্রজাযুক্ত দ্বাদশ মাস জানেন। যাহা অধিক জন্মায় (অর্থাৎ ত্রয়োদশ মাস বা মলমাস) তাহাও জানেন।

বেদ বাতস্য বর্ত্তনি মুরো ঋষস্য বৃহতঃ।
বেদা যে অধ্যাসতে॥ ১।২৫।৯

অর্থ ঃ—বায়ুর পথ এবং দর্শনীয় বৃহতের (পথ) জানেন। যাঁহারা উপরে আছেন (তাঁহাদিগকেও) জানেন।

এই ঋকের "দর্শনীয় বৃহৎ" শব্দ দ্বারা সম্ভবতঃ সূর্য্যকে বুঝাইতেছে। যে সকল স্তোত্র রচিত হইত তাহাদের নানাপ্রকার নাম দেখিতে পাই। যেমন, শ্লোক, গাথা, অর্ক, কাব্য, বাণী, ব্রহ্ম, ঋক্, উক্থ, সূক্ত, নিবচন, স্তোম, তন্ত্র প্রভৃতি। আরো দেখা যায় যে নানা প্রকার ছন্দে স্তোত্র রচিত হইত। সেই সকল ছন্দের বিশ্লেষণও করা হইয়াছিল। ছন্দ সাত প্রকার এবং তাহাদিগকে বাণী বলা হইত; কোন স্থানে তাহাদিগকে পক্ষী বলা হইয়াছে দেখা যায়। নিম্নে উদাহরণে দেওয়া যাইতেছে।

শ্লোক, উক্থ } ঃ—মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ।
গায় গায়ত্রম্ উক্থ্যম্॥ ১।৩৮।১৪

অর্থ ঃ—মুখে শ্লোক উচ্চারণ করিয়া (বা রচনা করিয়া) বৃষ্টির মত বিস্তার কর; গায়ত্র-উক্থ গান কর।

ইন্দ্র যথা সুত সোমেষু চাকনোনর্বানম্ শ্লোক মারোহসে দিবি। ১।৫১।১২

অর্থ ঃ—অভিষুত সোমপানে তৃপ্ত হইয়া ইন্দ্র যেরূপ স্বর্গে আরোহণ করেন, (সেইরূপ) এই অচঞ্চল শ্লোক (স্বর্গের দিকে গমন করিতেছে)।

গাথা, অর্ক, বাণী, বাক্ } ঃ—ইন্দ্রমিৎ গাথিনো বৃহদিন্দ্র মর্কেভিরর্কিনঃ।
ইন্দ্রং বাণী রনূষত॥ ১।৭।১

অর্থঃ—গাথা গায়কগণ বৃহৎ (গাথা) দ্বারা ইন্দ্রকে, অর্চনাকারীগণ অর্ক (বা মন্ত্র) দ্বারা ইন্দ্রকে, (বাণী উচ্চারণ কারীগণ) বাণী দ্বারা ইন্দ্রকে স্তব করেন।

গায়ত্রেণ প্রতিমিমীতে অর্ক মর্কেণ সাম ত্রৈষ্টুভেন বাকম্।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদা ক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ॥

অর্থঃ—গায়ত্র দ্বারা অর্ক রচিত হয়; অর্ক দ্বারা সাম; ত্রিষ্টুভ দ্বারা বাক্‌; বাক্যের দ্বারা বাক্‌ (দুইপ্রকার হয়,) যথা দ্বিপদী (ও) চতুষ্পদী; অক্ষরের দ্বারা সপ্তবাণী প্রস্তুত হয়। ১।১৬৪।২৪

পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম। ১ ১৬৪.৩৪

বাক্‌ সকলের মধ্যে পরম ব্যোম (সদৃশ) কি, জিজ্ঞাসা করি।

ব্রহ্মাংং বাচঃ পরমং ব্যোম। ১।১৬৪।৩৫

"ব্রহ্ম" এই (বাক্য), সকলের পরম ব্যোম (সদৃশ)।

ব্রহ্ম:—হ্রদং ন হি ত্বান্য ঋষন্ত্যূর্ম্ময় ব্রহ্মাণীন্দ্র তব যানি বৰ্দ্ধনা। ১।৫২।৭

অর্থঃ—হে ইন্দ্র! তোমার বৃদ্ধিকর ব্রহ্ম (অর্থাৎ স্তোত্র) সকল তোমাকে প্রাপ্ত হয়, যেমন হ্রদে জলের প্রবাহ প্রবেশ করে।

কাব্য } উকৃথ } :—মন্দিষ্ট যদুশনে কাব্যে সচাঁ-ইন্দ্রো বঙ্কু বঙ্কু তরাবি তিষ্ঠতি। ১।৫১।১১

অর্থঃ—যখন উশনা (ঋষির) কাব্যদ্বারা স্তুত হন, তখন ইন্দ্র অতি শীঘ্র শীঘ্র আগমন করেন।

অস্মাইৎ কাব্যং বচ উকৃথ মিন্দ্রায় শংস্যম্‌।

কাব্য বাক্য (ও) উকৃথ এই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করিতে হয়।

নিবচনঃ—অবোচাম নিবচনানস্মিন্‌ মানস্য সূনুঃ সহসানে অগ্নৌ।

১।১৮৯।৮

অর্থঃ—মানের পুত্র শত্রু অভিভবকারী এই অগ্নিতে নিবচন সকল বলিয়াছেন।

স্তোম:—এষবঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মানস্য কারোঃ। ১।১৬৫।১৫

অর্থঃ—হে মরুৎগণ! তোমাদিগের (উদ্দেশ্যে) এই স্তোম (ও) এই গীতি, মাননীয় স্তোত্র-রচয়িতা মান্দার্য্যের।

দেখা যাইতেছে যে শ্লোক রচনা করিয়া তাহা কাহার দ্বারা রচিত, তাহার নামের ভণিতাও দেওয়া হইত।

যুবাভ্যাং বাজিনী বসু প্রতিস্তোমা অদৃক্ষত। বাচং দুতো যথোহিষে॥ ৮।৫।৩

অর্থঃ—হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্তোম সকল (তোমরা) দেখিয়াছ। দূত যথা বাক্য বহন করে (সেইরূপ স্তোম দূতরূপে আমাদের বাক্য তোমাদের নিকট লইয়া যায়)।

ঋকঃ—ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ যস্মিনদেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। ১।১৬৪।৩৯

অর্থ:—ঋকের অক্ষরে পরম ব্যোমন্‌ (আছেন), তথায় সকলের উপরিস্থ দেবগণও অবস্থান করেন।

তন্ত্র:—তত্রতে বাচমতি পন্থ পাপয়া সিরীতন্ত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ। ১০।৭১।৯

অর্থ:—সেই সকল যজ্ঞহীন লোক বাক্য (অর্থাৎ বেদ) প্রাপ্ত হইয়াও পাপের দ্বারা লাঙ্গলের তন্ত্র বিস্তার করে।

স্তোত্র রচয়িতাকে কারু বলা হইত। সূত্রধর যেরূপ কাষ্ঠ বাইস দ্বারা কাটিয়া পরস্পর সংযুক্ত করত রথাদি প্রস্তুত করে, সেইরূপ কারু হৃদয় দ্বারা বাক্য সকল বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের সংযোগে স্তোত্র প্রস্তুত করেন, এইরূপ ভাব দেখিতে পাই।

কারু:—এষবঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গী-র্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ। ১।১৬৫।১৫

অর্থ:—হে মরুৎগণ! তোমাদিগের (উদ্দেশ্যে) এই স্তোম (ও) এই গীতিমাননীয় কারু মান্দার্য্যের।

কারুরহং ততো ভিষগুপল প্রক্ষিণী ননা। ৯।১১২।৩

অর্থ:—আমি কারু পুত্র (বা পিতা) ভিষক্‌, কন্যা (বা মাতা) প্রস্তরে (যবাদি) প্রক্ষেপ কারিণী (অর্থাৎ জাঁতায় যব ভাঙ্গে বা উত্তপ্ত বালুকায় যব ভাজে)।

স্তোত্র হৃদয় দ্বারা রচিত:—এষ ব স্তোম মরুতো নমস্বান্‌ হৃদাতষ্টো মনসাধায়ি দেবাঃ। ১।১৭১।২

অর্থ:—হে মরুৎগণ! তোমাদিগের (উদ্দেশ্যে) এই স্তোত্র, ভক্ত হৃদয় দ্বারা কাটিয়া প্রস্তুত করিয়াছে (বা রচনা করিয়াছে); হে দেবগণ! মনদ্বারা (ইহাকে) গ্রহণ কর।

অক্ষর, বাক্‌, ছন্দ প্রভৃতির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহাও বেদের কোন২ স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে।

চত্বারি-বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদু ব্রাহ্মণাঃ যে মণীষিণঃ।

গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাকো মনুষ্যা-বদন্তি। ১।১৬৪।৪৫

অর্থ ঃ—বাক্ চারিপদ বিশিষ্ট। যাঁহারা মণীষি ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে জানেন। গুপ্ত স্থানে নিহিত তিনটীকে (মনুষ্যগণ) প্রকাশ করেন না, চতুর্থ (বাক্‌কে) মনুষ্য-গণ উচ্চারণ করেন।

গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্ক মর্কেণ সাম ত্রৈষ্টুভেন বাকম্।

বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদা অক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণী॥ ১।১৬৪।২৪

গায়ত্র (ছন্দ) দ্বারা অর্ক (বা অর্চ্চণামন্ত্র) রচিত হয়; অর্কদ্বারা সাম; ত্রিষ্টুভ দ্বারা বাক্; বাক্যের দ্বারা বাক্ (দুই প্রকার হইয়া থাকে) দ্বিপদী (ও) চতুষ্পদী; অক্ষরের দ্বারা সপ্তবাণী রচিত হয়।

জগতা সিন্ধুং দিব্যস্তভায়ৎ রথন্তরে সূর্য্যং পর্য্যপশ্যৎ।

গায়ত্রস্য সমিধ স্তিস্র আহু স্ততো মহ্না প্ররিরিচে মহিত্বা॥ ১।১৬৪।২৫

(সৃষ্টিকর্ত্তা) জগতী (ছন্দে সাম গান করিয়া) দিব্য-লোকে সিন্ধুকে (বা স্বর্গগঙ্গাকে) (১) দীপ্যমান করিয়াছেন, রথন্তর (ছন্দে সাম গান করিয়া) সূর্য্যকে দর্শন করিয়া-ছেন; গায়ত্রীর সমিধ (বা পদ) তিনটী বলিয়া থাকে, সেই জন্য (উহা) শক্তি ও মহিমায় (সকল ছন্দকে) অতিক্রম করিয়াছে।

উপরে গায়ত্রীর সমিধ তিনটী বলা হইল। আমরা গায়ত্রী আহ্বানের মন্ত্রে দেখিতে পাই—(২) গায়ত্রী ত্র্যক্ষর বিশিষ্টা। অতএব সমিধ অর্থে অক্ষর বুঝিতে হইবে। অক্ষর কাহাকে বলা হইত জানিতে গেলে, গায়ত্রী মন্ত্র অন্বেষণ করিতে হয়।

ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি। ধীয়ো-যনঃ প্রচোদয়াৎ।

উপরি বিভক্ত তিন অংশ যদি তিনটী অক্ষর হয় তবে অক্ষর বুঝিতে মনের ভাব বা Idea বুঝিতে হয়। এই গায়ত্রী মন্ত্রে মনের তিনটী ভাবের উদ্রেক হয়। এই তিনটী ভাব তিনটী অক্ষর বা অক্ষয় পদার্থ।

নিম্নোদ্ধৃত ঋকে সাতটী ছন্দের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অগ্নে গায়ত্র্যভবৎ স যুগ্বোষ্ণিহয়া সবিতা সংবভূব।

অনুষ্টুভা সোম উক্‌থৈ মহস্বান্ বৃহস্পতে র্বৃহতী বাচমাবৎ॥ ১০।১৩০।৪

অর্থ ঃ—গায়ত্রী (ছন্দ) অগ্নির সহায় ভূত হইয়াছিল; উষ্ণিক্ (ছন্দের) সহিত সবিতা হইয়াছিল; অনুষ্টুভ (ছন্দের) উক্‌থের সহিত তেজস্বী সোম; বৃহস্পতির নিকট বৃহতী (ছন্দের) বাক্য গিয়াছিল।

বিরাণ্‌মিত্রা বরুণয়ো রভি শ্রীরিন্দ্রস্য ত্রিষ্টুবিহ ভাগো অহ্নঃ।

বিশ্বান্দেবা জগত্যা বিবেশতেন চাকৢপ্র ঋষয়ো মনুষ্যাঃ ১০।১৩০।৫

অর্থ ঃ—বিরাট (ছন্দ) মিত্রবরুণের আশ্রিত হইল; ত্রিষ্টুপ্ (ছন্দ) এই যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগে রহিল; জগতী (ছন্দ) সকল দেবতাতে প্রবেশ করিল; ইহা দ্বারা (অর্থাৎ দেবতাদিগের এই প্রথম যজ্ঞ দ্বারা) ঋষি ও মনুষ্যগণ সৃষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, বিরাট, ত্রিষ্টুভ্, ও জগতী—এই সাতটী ছন্দ।

এক্ষণে যেরূপ বিবাহ বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হন এবং তাঁহাদের সভায় শাস্ত্রের বিচার হয়, বৈদিক যুগেও যজ্ঞ উপলক্ষে ধনী লোকের গৃহে ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ উপস্থিত হইতেন। সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে বেদের অর্থ লইয়া বিচার হইত। যাঁহারা বিচারে জয়ী হইতেন তাঁহারা সম্মানিত হইতেন। সম্ভবতঃ কবি বিপ্র, মনীষি, ঋষি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আখ্যা সে কালের বিদ্বান দিগের উপাধি ছিল। যাঁহারা বেদের ব্যাখ্যা করিতে ও বৈদিক স্তোত্র রচনা করিতে পারিতেন তাঁহারাই ঐ সকল উপাধি প্রাপ্ত হইতেন বলিয়া মনে হয়।

---

(১) সম্ভবতঃ দিব্যলোকের সিন্ধু অর্থে Milky way কে বুঝাইতেছে।

(২) আয়াহি বরদেদেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাত ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥

যাঁহারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইতেন এবং নূতন নূতন ভাবের স্তোত্র রচনা করিতে পারিতেন, তাঁহারাই ঋষি (বা দ্রষ্টা) উপাধিতে ভূষিত হইতেন।

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টান্। তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্তরেভা অভিসংনবন্তে॥ ১০। ৭১। ৩

অর্থ ঃ—যজ্ঞের দ্বারা বাক্যের পথ পাওয়া গিয়াছে। ঋষিদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট তাঁহাকে লাভ করা গিয়াছে; তাঁহাকে লাভ করিয়া বহু দেশে স্থাপন করা হইয়াছে। সাতটী পক্ষী (অর্থাৎ ছন্দ) তাঁহার নিকট গমন করে।

যিনি বেদার্থ বেত্তা তাঁহাকে ‘স্থিরপীত” বলা হইত। কিন্তু যে সকল লোক বেদার্থ না জানিয়া বেদ শুধু মুখস্ত রাখিতেন এবং যজ্ঞাদি কার্য্য করাইতে পারিতেন না তাহাদিগকে “অধেনু” নাম দেওয়া হইত।

উতত্বং সখ্যে স্থিরপীত মাহু নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু অধেন্বা চরতি মায়যৈষ বাচং শুশ্রুবান্ অফলা মপুষ্পাম্॥ ১০ : ৭১। ৫

অর্থ ঃ—তোমাকে (অর্থাৎ বেদার্থ বেত্তাকে) বেদে স্থিরপীত বলে; ইঁহাকে কেহই তর্ক যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে না। কেহ বা অধেনুবৎ (অর্থাৎ বন্ধ্যাগাভী সদৃশ), প্রতারণা করিয়া বেড়ায়; (সে) ফল পুষ্প বিহীন বাক্য শ্রবণ করিয়া ছিল : (১)

হৃদাতষ্টেষু মনসো জবেষু যদ্ ব্রাহ্মণাঃ সংযজন্তে সখায়ঃ। অত্রাহত্বং বিজহু বেঁদ্যাভিরোহ ব্রহ্মাণো বিচরন্ত্যুত্বে॥ ১০। ৭১। ৮

অর্থ ঃ—হৃদয় দ্বারা রচনা কার্য্যে, মানসিক শক্তিতে সমান ব্রাহ্মণগণ যে (যজ্ঞে) সমবেত হন, তুমি (অর্থাৎ বেদার্থ হীন লোক) বিদ্যা সকল দ্বারা নিশ্চয় পরিত্যক্ত হও এবং উপরোক্ত ব্রাহ্মণগণ (বেদার্থ নিশ্চয়ে) বিচরণ করেন।

সেকালে বিদ্বান্ দিগের মধ্যে বিদ্যা বিষয়ে ইতর বিশেষ জলের গভীরতার সহিত তুলিত হইত।

অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্ত সখায়ো মনো জবেষ সমা বভূবুঃ। আদঘ্নাস উপকক্ষাস উত্বে হ্রদা ইব স্নাত্বা উত্বে দদৃশে॥ ১০। ৭১। ৫

অর্থ ঃ—অক্ষি (ও) কর্ণ যুক্ত বলিয়া সমান হইলেও (বেদ বিদ্গণ) মনের শক্তিতে অসমান হন। (কেহ) মুখ পর্য্যন্ত গভীর, (কেহ) বক্ষ পর্য্যন্ত (গভীর) হ্রদের মত, (কেহ) স্নানের উপযুক্ত দেখায়।

সাধু ভাষা দ্বারা স্তোত্র সকল রচিত হইত। সাধারণের যে ভাষা তাহা সুন্দর ও সাধু ছিল না। যজ্ঞ স্থলেই নূতন ২ স্তোত্র রচিত হইত বলিয়া বোধ হয়।

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্রধীরা মনসা বাকমক্রত। অত্রা সখায় সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মী র্নিহিতানি বাচি॥ ১০। ৭১। ২

অর্থ ঃ—ছাতুকে যেমন চালুনি পরিস্কার করে, সেইরূপ ধীমান্‌গণ যথায় (অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে) মনের দ্বারা বাক্যকে (সাধু) করেন, এইখানে (অর্থাৎ যজ্ঞে) বেদবিদ্গণ দেবতাদিগের বন্ধুত্ব লাভ করেন; ইঁহাদিগের বাক্যে কল্যাণদায়িনী লক্ষ্মী বিরাজ করেন।

বেদে সৃষ্টিতত্ব দেবতত্ব, জ্যোতিষ, ভাষাতত্ব, ভেষজতত্ব প্রভৃতির উল্লেখ আছে। প্রবন্ধটী দীর্ঘ হইবার ভয়ে তাহাদের অবতারণা করা গেল না। যতদূর দেখান গেল, তাহাতে সেকালের পক্ষে জ্ঞান ও শিক্ষা নিতান্ত অল্প ছিল না।

শ্রীতারাপদমুখোপাধ্যায়

——

(১) বেদের অর্থ না জানিয়া বেদ শুধু শ্রবণ করিয়া ছিল।
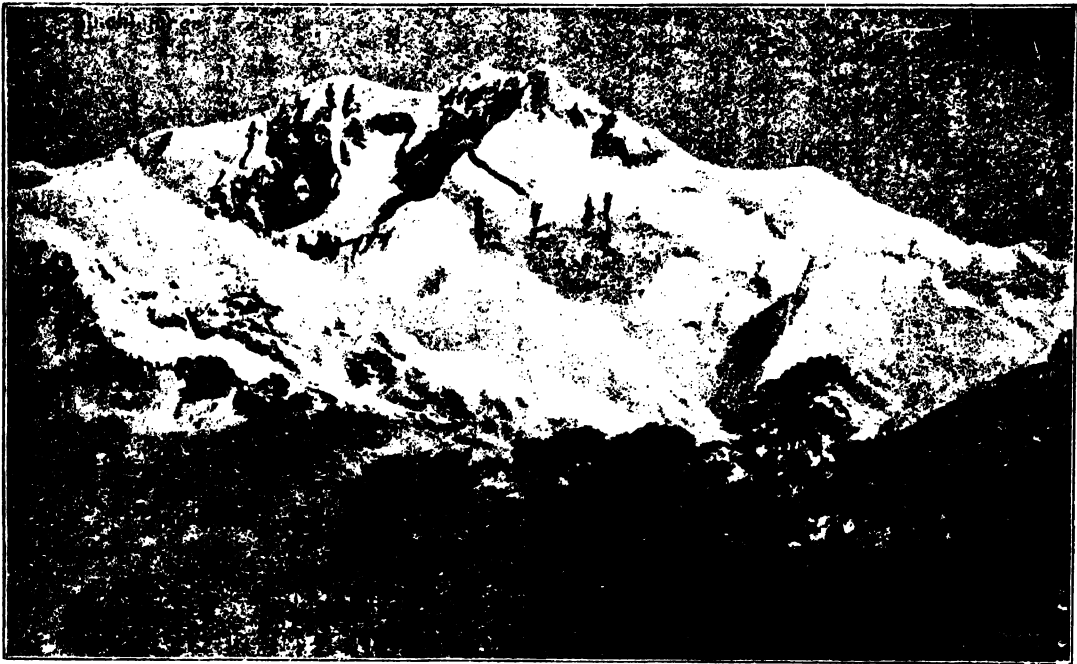
হিমালয়ে প্রভাত।

মরি কি রূপ হয়েছে আজ কনকচাঁপা উষার,
পাহাড়ের থাক্ বেয়ে বেয়ে ছেয়ে গিয়েছে তুষার।
সবার মাঝে দাঁড়িয়ে স্থির, মহাকাশে তুলে শির,
তিন ভুবনের শোভা জমে, ওইখানে কি হচ্ছে লুঠ!
ওকি বিশ্বের মাথার মণি, না ও বিশ্বনাথের মুকুট?
যত শুভ্র চিন্তারাশি জমাট হয়ে বাঁধ্‌ল স্তূপ,
যত ভালো যত আলো ধর্‌ল সেথায় ধবল রূপ।
ধুয়ে যাচ্ছে মনের কাদা, শাদায় নেয়ে জীবন শাদা,
চরণতলে পড়ে' উর্দ্ধে চেয়ে দেখ্‌ছি বিরাট মূর্ত্তি,
ধীরে ধীরে ধ্যানের তীরে নিখিল জগত পাচ্ছে স্ফূর্ত্তি।

কোন্ পাহাড়ের গুহার আড়ে লুকায়ে আছে শিশু রবি
রবি কে চায়? দেখ্‌ছি আমি ছবির মত একটী ছবি।
ছবি উঠ্‌ছে সজীব হ'য়ে, কোথায় যাচ্ছে আমায় ল'য়ে!
বল্‌ছে কবি,—দেখ্‌ছিস্, ও যে বিশ্বেশ্বরের কীর্ত্তিমঠ্!
ওঙ্কারের ও সুতিকাগার, ঝঙ্কারের ও সুধাঘট!

মানুষ ছিল দ্বিপদপশু, দেবতা ছিলেন ঘটে পটে,
এখানেই ত রূপের সাথে, অরূপ মিশ্‌ল অকপটে।
লোমশ খোলস গেল খুলে, দাঁড়াল নর মাথা তুলে
অজ্ঞান তার স্কন্ধ ছেড়ে আঁধার রাজ্যে করল প্রয়াণ,
এই পাহাড়ে মানব পেল নূতন করে' জীবন দান।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

অনুভূতি ও ধারণা।

অনুভূতি জাগ্রত হইলে তাহার বেগ হৃদয়ে প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল।' 'আমার কলেজা ফাটিয়া গেল।' ভগ্ন-হৃদয় কখনও কখনও মৃত্যুর কারণ হয়। ভাবের প্রাবল্যে রক্ত স্রোত বহিতে থাকে অথবা মন্দগতি প্রাপ্ত হয়; হৃদয় হইতে রক্ত ধমনীতে সঞ্চালিত হইয়া পুনরায় হৃদয়ে প্রবেশ করে তজ্জন্যই বোধ হয় হৃদয়কে অনুভূতির যন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া

কোন ও বিষয়ের ধারণার চেষ্টা হইলে লোকে বলে 'অত মাথা ঘামাইও না, 'ভাবিতে ভাবিতে আমার মাথা খারাপ হইয়া গেল'। একাদি ক্রমে কোনও একটি বিষয়ের চিন্তা হইতে উন্মত্ততা প্রকাশ পায়. এবং মস্তিষ্ক শীতল হইলে উন্মত্ততা থাকে না! মস্তিষ্কে রক্তের আধিক্য অথবা অভাব বিকারের কারণ। শরীরতত্ত্বের সবিশেষ আলোচনা না করিয়াও এ কথা বলা যাইতে পারে যে মস্তিষ্কই ধারণার যন্ত্র। ষট্ চক্র ভেদে মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির নিদ্রাও জাগরণের কথা বলা হইয়াছে। ষট্ চক্রভেদে হৃদয়কে ও সাধনার ক্ষেত্রে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

শরীর যন্ত্র গুলির, একের সহিত অপরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, পূর্ণ বিকাশ সাধন মানুষের আহার বিহারের প্রধান লক্ষ্য। অনুভূতি ও ধারণার সম্যক বিকাশ শিক্ষার চরম ফল। সভ্যজগতের শিক্ষারদিকে দৃষ্টি পাত করিলে মনে হয় জ্ঞান বিকাশের জন্য যতটা চেষ্টা হইয়াছে অনুভূতির প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। বুদ্ধের ধ্যান. শঙ্করের জ্ঞান ও মহম্মদের কর্ম্ম পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ধর্ম্মক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়াছে। খৃষ্ট যদিও প্রেমকেই সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়াছেন তথাপি খৃষ্টজগতে প্রেম অপেক্ষা জ্ঞানই যে অধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান জর্ম্মান যুদ্ধের অত্যাচার কাহিনী পাঠ করিলে জর্ম্মান 'কুলতুর' এর প্রতি একটা নিতান্ত অবজ্ঞার ভাব আসিয়া পড়ে।

চৈতন্য শুষ্ক জ্ঞানের গভীরতায় তুষ্ট হইতে পারিয়া ছিলেন না। উপনিষদের 'রসোবৈসঃ' এবং তদ্ ভাবে ভাবিত শ্রীমৎভাগবতের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসমাধুরী তাঁহাকে এমনই উদ্বেলিত করিয়াছিল যে তাঁহার শরীর সেইবেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। চৈতন্য অনুভূতি ও ধারাণার যে উজ্জল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পৃথিবীর পরম সম্পদ।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের সহজ সাধনায় অনুভূতি প্রধান আশ্রয়। অনুভূতি ও ধারণার মধ্যে সীমারেখা পাতকরা কঠিন কিন্তু তাহাদের প্রকাশ বিকাশ ও লক্ষণ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মানুষের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইতর প্রাণীরদিকে চাহিলে দেখা যায় নবপ্রসূতা গাভী বৎসের গা চাটিয়া কতই না আনন্দ অনুভব করে! বৎসহারা গাভী কি ব্যাকুলতা প্রদর্শন করে! তখন আঘাত করিলেও তাহাকে গন্তব্য পথ হইতে ফিরান যায় না। গাভীর মনের ধারণা কি আমরা জানিনা কিন্তু তাহার হৃদয়ে কি হইতেছে তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। মেষ, মহিষ, গরু, হরিণ, হস্তী প্রভৃতি পশুর একজাতীয়তা ও সৌহার্দ্দ মানুষের সকল প্রকৃতির অনুরূপ। সময় সময় একে অপরের সেবা করিয়া মানুষের ন্যায়ই তৃপ্ত হয়। বিহঙ্গ মিথুনের শাবক প্রতিপালন ও প্রাণ দিয়া শাবক রক্ষা দেখিলে কালিদাসের এই বন্দনা মনে পড়ে—„জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতি পরমেশ্বরৌ।'' জগৎ অনুভূতিময়। বৃক্ষ শীতাতপ অনুভব করে। ধাতব জড় পদার্থ পর্য্যন্ত মানুষের ন্যায় সাড়া দেয় বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব অনুভূতির মধ্য দিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা না থাকিলেও উদৎ সূর্য্যের ন্যায় তাহার প্রথম প্রকাশ স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। মাতৃহৃদয়ে সন্তানের সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়, যুক্তি, তর্ক, ধ্যান, ধারণা, ও তপস্যা তাহার অন্তস্তল খুঁজিয়া পায় নাই। পৃথিবীর সমস্ত খেলা ধুলা আনিয়া জড় কর সকল ছাড়িয়া সম্বৎসর শিশু মার কোল আশ্রয় করিবে। সে কি মিথ্যা অবলম্বন? পত্নীর প্রেম হারাইয়া চক্রবর্ত্তী রাজাও দীনহীন মেথর হইতেও কাঙ্গাল! "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং" কাল-রাত্রি-স্বরূপিনী নিশায় যে স্বপ্ন সেত জাগরণেরই ফল। জাগরণে যাহা হৃদয় ও মনে প্রকাশ পায় অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল ভাবে তাহা স্বপ্নে দেখা যায়। ধারণা অনুভূতির মধ্যে মানুষকে জাগ্রত রাখে।

শিশুদিগের চিত্ত ও প্রতিভার বিকাশ যাঁহারা লক্ষ্য করেন তাহারা দেখিতে পান শিশুর চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট হয় তাহার মধ্যদিয়া তাহার শিক্ষা দ্রুতবিস্তার লাভ করে। নীরস বাক্যের প্রতি সে কর্ণপাত করিতে চাহে না। শৈশবে স্নেহ, এব যৌবনে প্রেম হইতে বঞ্চিত হইলে কাহারও প্রতিভার পূর্ণবিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে

বলিয়া আমার মনে হয় না। বৈজ্ঞানিক তত্বগুলি যেমন মানুষের কাছে আকস্মিক উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রথম পরিচয় পাইয়া মানুষ যেমন সূক্ষ্মসূত্র অবলম্বনে পর্য্যবেক্ষণ অনুসন্ধান দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে তেমনই অতর্কিতে মানুষের হৃদয়ে সৎবস্তুর আভাস প্রকাশিত হয় এবং ধারণাশক্তি তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করে। হৃদয়ের দিকটা উপেক্ষার বিষয় নহে। ইহাই সহজ সাধনার পথ।

পত্নীর প্রেমে তুলসীদাস ভক্ত কবির, সংসারারণ্যে পথ হারাইয়া বিত্রট্রিসের প্রেমে ভক্ত কবি দান্তে। বেকন বলিয়াছেন শ্বাস রোধে দৈহিক শক্তির ধ্বংস অপেক্ষা ভাবের নিষ্পেশনে চিত্তবৃত্তির বিনাশ আরও ভয়ঙ্কর।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

তিব্বত অভিযান।

পাঁচ রকম।

এ দেশের লোকের প্রধান অমোদ ঘোড় দৌড়, কুস্তী, ভারী পাথর উঠান, তীর ফেলা, দাবা খেলা, তাস প্রভৃতি। নূতন কিছু দেখিলাম না। তীর ধনুকের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে বন্দুকের প্রচলন দিন দিন বাড়িতেছে। এখন এদেশে বন্দুক প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হওয়াতে সকলেই ইহা রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তিব্বতীয়েরা বড়ই গীত-বাদ্যপ্রিয়। বাঁশী ও সারঙ্গির এ দেশে খুব অধিক প্রচলন। লাসায় কয়েকটা হারমনিয়মও দেখিলাম। ইংরাজের মত এখানকার লোকেও অনেক সময় নরনারী একত্রে নৃত্য করিয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলেরা ঘুড়ি উড়াইতে খুব ভালবাসে। লাসায় তিনটি থিয়েটার দেখিলাম। থিয়েটারের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। যেখানে সেখানে ইহার অভিনয় হয়। কেহ পয়সা দিয়া থিয়েটার দেখে না। বিবাহাদিতে অনেক সময় থিয়েটার হইয়া থাকে। লামা এবং ভিক্ষুরা কিন্তু থিয়েটারে প্রায়ই যোগদান করেন না। বুদ্ধ দেবের জীবনের কোনও এক অংশ লইয়া প্রায়ই অভিনয় হয়। সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাটকের প্রচলন একবারে নাই। প্রহসনের অভিনয় মধ্যে ২ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অপদেবতা দিগকে প্রায়ই নায়ক নায়িকা ভাবে খাড়া করা হয়। রমণী দ্বারা রমণীর অংশ অভিনীত হয়। আমাদের খাতিরে কয়েকটি অভিনয় হইয়াছিল ভাষা না জানাতে আমরা তাহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করি নাই। তবে ভাবভঙ্গি নিতান্ত মন্দ লাগিল না। বেশ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইল।

তিব্বতীয় দিগের অভিবাদন প্রথা একটু নূতন ধরণের। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রথমে দক্ষিণ হস্তদ্বারা মস্তকাবরণ খুলিয়া ফেলে, এবং ঈষৎ ঝুঁকিয়া স্বীয় বাম কর্ণ আগন্তুকের দিকে বাড়াইয়া দেয়। ইহার সঙ্গে ২ জিহ্বার কিয়দংশ বাহির করে। আগন্তুক যদি সম্মানের পাত্র হয়েন তাহা হইলে এইরূপ করা হয়। তাহা না হইলে আগন্তুককে উপরোক্ত প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। যদি দুজনে সমান পদের হন, তাহা হইলে উভয়কে কেবল মাত্র। মস্তক খুলিয়া সামান্য ঝুকিতে হয় মাত্র। কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে আমরা সকলকেই জিহ্বা বাহির করিয়া দেখাইতাম।

নদীর অপর পারে লাসার অস্ত্র নির্ম্মাণাগার। ইহা কয়েকজন ভারতবর্ষীয় কারিকরের তত্বাবধানে। কারখানাটি একবারে নূতন বলিয়া মনে হইল। য়ুরোপে কখনও যাই নাই বলিয়া, এপ্রকার স্থান সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। দমদমার কারখানায় একবার গিয়াছিলাম,—কিন্তু বন্দুকের কাজ সেখানেও দেখিতে পাই নাই। দুইজন প্রবীণ সাহেব আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা এই কারখানার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। এখানকার প্রস্তুতীয় বন্দুক প্রায় বিলাতী বন্দুকের মত। শুনিলাম, লাসার ৪। ৫ মাইল দূরে আরও একটি বৃহত্তর বন্দুকের কারখানা আছে। ঐ স্থানটিও ভারতবর্ষীয় কারিকরের অধীনে। ভারতের লোক উপযুক্ত অবসর

পাইলে যে কি প্রকার উৎকৃষ্ট কারিকর হইতে পারে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ আমরা হাতে হাতে পাইলাম:

১লা সেপ্টেম্বর তিব্বতীয় দিগের সহিত আমাদের সন্ধি বন্ধন হইয়া যায়। ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রধান অম্বান্ হুকুম দিলেন যে, চীন সম্রাটের আদেশ অনুসারে দলাই লামাকে পদচ্যুত করা হইল। এই হুকুম বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়া চারিদিকে লাগাইয়া দেওয়া. হইল। কিন্তু দেখা গেল যে, ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তিব্বতীয়েরা ঐ আদেশ পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। কয়েক জন চীনা সিপাহী এই আদেশ ঢোল বাজাইয়া চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে ছিল। তিব্বতীয়েরা উহাদের সকলকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া ঢোল কাড়িয়া লয় উহাদের বস্ত্রাদি খণ্ড ২ করিয়া দেয়। অম্বান্ এই ঘটনায় বিন্দুমাত্র ভীত বা হতাশ্বাস হইলেন না। তিনি পুনরায় আর এক আদেশ দিলেন যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাসী লাসাকে অস্থায়ীভাবে দলাইলামার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল।

কিন্তু এই সময় দলাই লামা কোথায়? তিনি লাসা ত্যাগ করিয়া মঙ্গোলিয়া অভিমুখে প্রস্থান করেন। সমস্ত চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে একমাত্র এই মঙ্গোলিয়াই তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করে। উহার রাজধানী উর্‌গায় একজন দলাইলামা থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহার সম্মান লাসার দলাইলামার নীচে। লাসার দলাইলামার উর্‌গায় উপস্থিত সম্বন্ধে আমরা একজন রুষ কর্ম্মচারীর নিকট যে কাহিনী জ্ঞাত হইয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে এই—ইঁহার সঙ্গের দ্রব্যাদি প্রায় ২০০ উষ্ট্রের উপর বোঝাই ছিল। যে সময়ে তিনি উর্‌গায় উপস্থিত হইলেন তখন প্রবল বেগে বরফ পড়িতেছিল। তথাপি সহরের সমস্ত প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, মহান্ত, লামা ও প্রায় ২০,০০০ সাধারণ লোক তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। তাহার পর তাঁহাকে বিশেষ যত্নের সহিত সহরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাসাদে স্থান দেওয়া হয়। প্রত্যহ অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও যাত্রীরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতেছে।

আমরা প্রধান অম্বানের নিকট শুনিলাম যে, তিব্বতীয়েরা সকলেই তাঁহার (অম্বানের) উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। আমরা এ সময়ে সহরে না থাকিলে নিশ্চয়ই তাহারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিত। ইংরাজ সৈন্য লাসা ত্যাগ করিলেই যে সেখানে একটা ভীষণ গোলযোগ বাধিবে তাহা আমরা সকলে বেশ বুঝিতে পারিলাম। অম্বান্‌ও ইহা জানিতেন। সেই জন্য তিনি চারিদিক হইতে চীনা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লাসায় জমা করিতে লাগিলেন। চীনা সম্রাট যাহাতে অবিলম্বে তাঁহার নিকট অনধিক ১০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন তাহার জন্য তিনি এক অতি দ্রুতগামী অশ্বের ডাক চীনের রাজধানী অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য আমরাও বিশেষ সন্তর্পণের সহিত এই আগ্নেয় পর্ব্বতের মধ্যে বাস করিতে লাগিলাম।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

সেকালের কথা।

ময়মনসিংহে জলের কল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের কথা। রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর তাঁহার স্বর্গগতা পত্নী রাণী রাজরাজেশ্বরী দেবীর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ সহরবাসীর হিতকর কোনও অনুষ্ঠানে গবর্ণমেন্টের হস্তে ৫০,০০০ হাজার টাকা ন্যস্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এই বিষয়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও ঢাকা বিভাগের কমিশনর সহিত রাজাবাহাদুরের পত্র ব্যবহার হইতে লাগিল। সে সময় মিঃ গ্রেজিয়ার ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ লারমেণী বিভাগীয় কমিশনর ছিলেন; ময়মনসিংহের গৌরব সূর্য্যকান্ত তখন "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত হয়েন নাই।

এই অঙ্গীকৃত অর্থ ময়মনসিংহের কোন্ প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে তদ্বিষয়ে নগরবাসী নানাব্যক্তি নানা মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। ১৮৮৭ সনের ৩১ জানুয়ারী তারিখে সারস্বত ক্ষেত্রে সর্ব্বসাধারণের এক সভায় সহরে একটী আর্ট অথবা টেকনিকেল স্কুল স্থাপিত হওয়া স্থির হয়। কিন্তু কমিশনর মিঃ লারমেণী স্থির করিলেন

প্রস্তাবিত অর্থের দ্বারা ময়মনসিংহ সহরের রাজপথে গ্যাসালোক প্রদানের ব্যবস্থা হউক। কমিশনরের ইচ্ছা-মুরূপ গ্যাস লাইট্ প্রদানের সর্ব্ববিধ আয়োজন সমাধা করিবার জন্য মিউনিসিপাল চেয়ারম্যানের উপর ভার অর্পিত হইল। তখন ৺ চন্দ্রকান্ত ঘোষ নসিরাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান, ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভাইস্ চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সে সময়ে ময়মনসিংহ একটী ক্ষুদ্র নগর মাত্র ছিল। সহরের স্বাস্থ্য বড় ভাল ছিলনা। সময়ে সময়ে কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক পীড়া উপস্থিত হইয়া সহরবাসীর প্রাণে উদ্বেগ সঞ্চার করিত। রাজা বাহাদুরের এই বিপুল দান সহরবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতিকর কোনও কার্য্যে প্রযুক্ত না হইয়া এই ক্ষুদ্র নগরে গ্যাসের বাতি স্থাপনে ব্যয়িত হইবে, ইহাতে মিউনিসিপালিটীর অন্যতম কমিশনর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় আপত্তি উত্থাপন করিলেন। এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য বাবু শ্যামাচরণ রায়ের অনু-রোধে ময়মনসিংহ এসোসিয়েশনের সম্পাদক কর্ত্তৃক জন-সাধারণের এক সভা আহুত হইল। ১৮৮৮ সনের ২২শে এপ্রিল তারিখে ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউশন গৃহে এই সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, রাজ কর্ম্মচারী, ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকেল বোর্ডের মেম্বর মিউনিসিপাল কমিশনর প্রভৃতি নগরবাসী সর্ব্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। ময়মনসিংহের তদানিন্তন সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু পরামর্শ দিলেন, পানীয় জলের সংস্থান জন্য এই টাকাতে কয়েকটা দীঘি খনন করা হউক, এবং তাহাদের নামাকরণ হউক "রাণী দীঘি।" তদনুসারে ডাক্তার সাহেবের মত বাবু শ্রীনাথ চন্দ প্রস্তাবের আকারে উপস্থিত করিলেন। বাবু কালী-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে সমর্থন করিলেন। বাবু শ্যামা-চরণ রায় ইহাতে একমত হইতে পারিলেন না। স্থানীয় উকীল ৺ আনন্দমোহন বিশ্বাস মুর্শিদাবাদ হইতে অবগত হইয়া আসিয়াছিলেন যে বহরমপুর সহরে ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে জলের কল স্থাপিত হইয়াছে। তিনি এই সংবাদ শ্যামাচরণ বাবুকে জানাইলে শ্যামাচরণ বাবু এই সহরেও জলের কল স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন।

এই প্রস্তাব বাবু শ্যামাকান্ত রায় অনুমোদন করিলে এবং ৺ যাদবচন্দ্র লাহিড়ী ও ৺ আনন্দমোহন বিশ্বাস সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। একমাত্র মৌলবী হামিদুদ্দিন এই প্রস্তাবের সহিত একমত হইতে পারিলেন না। সেই সভাতে ইহাও ধার্য্য হইল যে বাবু কালীশঙ্কর গুহ, শ্রীকণ্ঠ সেন, অনাথবন্ধু গুহ, শ্যামাচরণ রায়, রত্নমণি গুপ্ত, জ্ঞানশঙ্কর সেন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা ডেপুটেশন গঠিত করিয়া রাজা বাহাদুর এবং ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিকট প্রেরণ করা হউক। সর্ব্ব-শেষ প্রস্তাবে স্থির হইল যে শ্যামাচরণ রায়, অনাথবন্ধু গুহ, যাদবচন্দ্র লহিড়ী, গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অমরচন্দ্র দত্ত ও শ্যামাকান্ত রায় দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হউক ও বাবু শ্যামাচরণ রায়কে উহারা সম্পাদক পদে নিযুক্ত করা হউক। এই সভার কার্য্যবিবরণীর প্রতিলিপি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরিত হইল।

সৌভাগ্যক্রমে মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় অল্পদিন পূর্ব্বেই ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া আসিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট দত্ত সাহেব জলের কল স্থাপনের প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিলেন, এবং লিখিয়া জানাইলেন যে তাঁহার নিকট এই জন্য ডেপুটেশন পাঠা-ইবার আবশ্যকতা নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিশনর নিকট কার্য্য বিবরণীর প্রতিলিপি পাঠাইয়া দিলেন। কমিশনর মিঃ লারমেনী এই সভার বিবরণ অবগত হইয়া অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে এক পত্র লিখিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিশনরের এই চিঠির নকল বাবু শ্যামাচরণ রায়কে প্রেরণ করিলেন। এই সরকারী চিঠি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সর্ব্বসাধারণের মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সম্পাদক শ্যামাচরণ বাবু এক সভা আহ্বান করিলেন। সভার পূর্ব্ব দিবস ম্যাজি-ষ্ট্রেট দত্ত সাহেব শ্যামাচরণ বাবুকে ডাকাইয়া জানাইলেন যে কমিশনরের ইচ্ছা নহে যে এই সভা হয়। তদুত্তরে শ্যামাচরণ বাবু জানাইলেন যে সভার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়া গিয়াছে, এখন তাহা স্থগিত করা যাইতে পারে না। আলেক জাণ্ডার বালিকাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এই সভার

অধিবেশন হয়। সকলে এক বাক্যে স্থির করিলেন যে কমিশনর যাহাতে জলের কল স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা না করেন এই মর্ম্মে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সমীপে মেমোরিয়েল প্রদত্ত হউক। শ্যামাচরণ বাবু সভায় মেমোরিয়েলের এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠ করিলেন।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত।

সে কালে লোকমতের গুরুত্ব ছিল; গবর্ণমেণ্ট তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতেন এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। ময়মনসিংহের জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টে মেমোরিয়েল দিতে কৃতসংকল্প, এই সংবাদ অবগত হইয়া মিঃ লারমেণী একটু বিচলিত হইলেন। তিনি দত্ত সাহেবকে লিখিয়া জানাইলেন যে এই মেমোরিয়েল তাঁহার নিকট প্রদত্ত হইলে তিনি এ বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন, এবং সত্বরেই ময়মনসিংহে আগমন করিয়া জলের কলের প্রস্তাব সমর্থন করিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের পরামর্শে কমিশনরের নিকটই মেমোরিয়েল প্রেরিত হইল।

এদিকে যাঁহারা রাজা বাহাদুরের সমীপে ডেপুটেশনে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা সকলেই আশ্বস্ত হইয়া আসিলেন। উদারহৃদয় রাজা সূর্য্যকান্ত সর্ব্বদাই সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে মুক্তহস্ত ছিলেন। ময়মনসিংহ টাউনের তিনি একক ভূস্বামী। ইহার উন্নতিকল্পে তাঁহার রাজকোষ উন্মুক্ত ছিল বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। সাধারণের প্রার্থনা পূরণার্থ জলের কল প্রতিষ্ঠায় রাজা বাহাদুর স্বীয় দানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। উদ্যোক্তাগণ পূর্ণ উৎসাহে কার্য্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়ে গৌরীপুরের বিখ্যাত প্রবেটের মোকদ্দমা। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও তাঁহার মাতা বিশ্বেশ্বরী দেবী চৌধুরাণীর পক্ষে বহু উকীল কৌন্সিলে সহর গুলজার। মিঃ ইভান্স,হীল, ষ্টিভেন্স প্রভৃতি রথী মহারথীগণ একই সময়ে ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ঢাকা হইতে কমিশনর বাহাদুরের ষ্টীমলঞ্চ ও ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে আসিয়া পহুছিল।

দত্ত সাহেব শ্যামাচরণ বাবুকে জানাইলেন, কমিশনর সাহেব ইচ্ছা করেন যে বেলা ১১ ঘটিকার সময় শ্যামাচরণ বাবু লঞ্চে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্যামাচরণ বাবু গৌরীপুরের মোকদ্দমায় নিযুক্ত, বিশেষতঃ ব্যারিষ্টার ইভান্স সাহেবের সাহায্যকারী। তিনি কাছারীর সময়ে লঞ্চে যাইয়া কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে দত্ত সাহেব শ্যামাচরণ বাবুকে বলিলেন যে কমিশনর যখন ডাকিয়াছেন, তখন না যাওয়া ভাল হয় না। ইহার উত্তরে শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন যে কাছারীর পূর্ব্বে বেলা ১০ ঘটিকার সময়ে কালেক্টরের খাস কামরায় যাইয়া কমিশনর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, এবং সে সময়ে দত্ত সাহেবও উপস্থিত থাকেন ইহা তাঁহার ইচ্ছা, কেননা কমিশনর যখন বিরক্ত হইয়াছেন তখন হয়ত তিনি তাঁহাকে অসম্মান করিতে পারেন।

এই প্রস্তাবে কমিশনর সাহেব সম্মত হইলেন। বেলা ১০ ঘটিকার সময় শ্যামাচরণ বাবু কালেক্টরের খাস কামরায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে কমিশনর,

মাজিষ্ট্রেট ও সিভিল সার্জ্জন ডাঃ বসু তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। কথা প্রসঙ্গে মিষ্টার লারমেনী প্রথম উষ্ণ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ বাবুর দৃঢ়তায় ও যুক্তি তর্কে কমিশনার আর জলের কল সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিলেন না, বরং তাঁহাকে প্রচুর উৎসাহ দিয়া বলিলেন যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের টাকা সাহায্য করার প্রস্তাব তিনি মঞ্জুর করিয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায়।

আকাশে যে কৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে কাটিয়া যাইতে লাগিল। উদ্যোক্তাগণ প্রবল উৎসাহে জলের কল প্রতিষ্ঠা কার্য্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি ৩০ হাজার টাকা সাহায্য পাওয়ার ভরসা দিলেন।

এদিকে আর এক নূতন বিপদের সূত্রপাত হইতে লাগিল। রাজা বাহাদুরের অর্থে জলের কলতো প্রতিষ্ঠিত হইবে, কিন্তু উহার সংরক্ষণ ও পরিচালনে যে অর্থের আবশ্যক হইবে, তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে? জলের কলের জন্য ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইবে শুনিয়া বিরুদ্ধপক্ষীয়গণ তদ্বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে মেমোরিয়েল প্রদান করিলেন। তখন লারমেনী সাহেব আর কমিশনর নহেন, নূতন কমিশনর মিঃ ওয়ারসি্ কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। মেমোরিয়েল প্রাপ্ত হইয়া ১৮৮৯ সনের অক্টোবর মাসে তিনি মাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে কল কিরূপে পরিচালিত হইবে তদ্বিষয়ে মিউনিসিপালিটী কিম্বা কোনও ব্যক্তি বিশেষের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ না করিয়া যেন কলের কার্য্য আরম্ভ না হয়।

এই বিষয় বিবেচনার জন্য ১৮৯০ সনের ৩১ জানুয়ারী তারিখে মিউনিসিপাল কমিশনরগণের এক সভা হয়। কমিশনর বাবু শ্যামাকান্ত রায় প্রস্তাব করিলেন যে ট্যাক্স-ভার পীড়িত করদাতাগণের উপর আরও অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিয়া জলের কল পরিচালনের ভার মিউনিসি-পালিটী যেন গ্রহণ না করেন। বাবু আনন্দ মোহন নিয়োগী এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

তখন বাবু শ্যামাচরণ রায় উপস্থিত কমিশনরগণের উদ্দেশে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করিয়া জলের কল পরিচালনের এক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। বাবু গিরীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উভয় প্রস্তাবই ভোটে দেওয়া হয়। শ্যামাচরণ বাবুর পক্ষে ৯ ভোট এবং শ্যামাকান্ত বাবুর পক্ষে ৪ ভোট হওয়াতে ট্যাক্স ধার্য্য করা সাব্যস্ত হইয়া যায়।

যাহারা জলের কল হওয়ার বিরোধী, তাহারা এই সুযোগে বেশ দল পাকাইতে লাগিলেন। ট্যাক্স বৃদ্ধি হইবে বলিয়া নানা আশঙ্কামূলক জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল। দেওয়ানী ও কালেক্টরীর অনেক আমলা এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। করদাতাগণ জলের কলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভা করিয়া মেমোরিয়েল দেওয়া স্থির করিলেন। গবর্ণমেণ্ট প্লিডার বাবু রোহিনীকুমার বসাক ও সবজজ বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন বলিয়া জানা গেল। জলের কলের উদ্যোক্তাগণ প্রমাদ গণিলেন। তখন কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সম্পাদক বাবু শ্যামাচরণ রায় এবং চেয়ারম্যান বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ মাজিষ্ট্রেট দত্ত সাহেবকে সকল ঘটনা জানাইলেন। তখন মিঃ পিটার্শন ময়মনসিংহের

ডিষ্ট্রীক্ট জজ। জজসাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া দত্ত সাহেব স্থির করিলেন যে এই আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা দরকার। টাউনহলে সভা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল। সভার অব্যবহিত পূর্ব্বে দত্ত সাহেব সবজজ অতুলবাবুকে এক চিঠি লিখিয়া কোন্ সময়ে সভা হইবে জানিতে চাহিলেন। সেই চিঠিতে মাজিষ্ট্রেট একথাও লিখিলেন—"Both Mr Peterson and myself are interested in the meeting."

জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদ্বয় সভায় উপস্থিত হইতে পারেন আশঙ্কায় দেওয়ানী ও কালেক্টরীর আমলাগণ ক্রমে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। সরকারী উকীল বাবু রোহিনীকুমার বসাক সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। জলের কলের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু বক্তৃতা হইল। ডাক্তার ডি, বসু জলের কলের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সভার মধ্যসময়ে জজ সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মাজিষ্ট্রেট প্রকাশ্যে উপস্থিত হইলেন না। জজ সাহেবকে দেখিয়া সভাপতি মহাশয় কিছু অপ্রতিভ হইলেন, সবজজ অতুল বাবু ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া রহিলেন। উপস্থিত সভ্য মণ্ডলী জলের কলের পক্ষে কি বিপক্ষে তাহা নির্ণয় করার জন্য তাহাদিগকে হস্ত উত্তোলন করিতে আদেশ করা হইল। কেহ কেহ হস্ত উত্তোলন করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "জলের কল চাই না।" সকলের মধ্য জজ সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"জলের কল চাই।" জজ ও মাজিষ্ট্রেটের চেষ্টায় এই আন্দোলন নিস্তেজ হইয়া গেল। গবর্ণমেণ্টে আর মেমোরিয়েল দেওয়া হইল না।

ময়মনসিংহে জলের কল দেওয়ায় বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট মহানুভব রমেশচন্দ্র দত্তের নিকট আমরা অল্প ঋণী নহি। ১৮৮৮ সনের ২৫শে সেপ্টেম্বরের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সভায় তিনি জলের কলের জন্য ৩০ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। এই সৎকার্য্যের বিরুদ্ধেও বোর্ডের কতিপয় মেম্বর স্বীয় স্বীয় ক্ষীণ চেষ্টা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। রাজরাজেশ্বরী জলসত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সহরবাসী সকলে উহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং আজ এখানে সেই সকল বিরুদ্ধবাদীগণের নামোল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। সভায় বিরুদ্ধ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলেও মাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্রের চেষ্টায় অধিকাংশ সভ্যের মতে অর্থসাহায্য সহজেই মঞ্জুর হইয়া গেল।
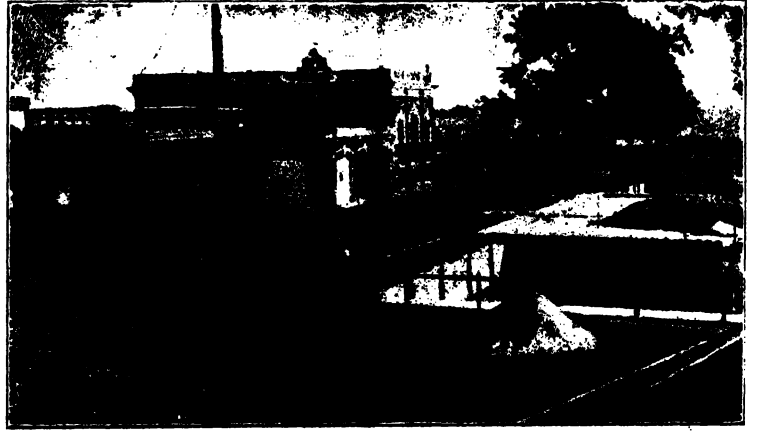
রাজরাজেশ্বরী জলের কল—দক্ষিণ দিক হইতে।

রাজাবাহাদুরের এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ৩০ হাজার টাকা সাহায্যের অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়া উদ্যোক্তাগণ বিপুল উৎসাহে সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতঃপর জলের কলের প্লান ও এষ্টিমেট একজিকিউটর্ ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়া ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে প্রেরিত হইল ও অনুমোদিত হইয়া আসিল। এই সময়ে (১৮৯১।১৮ জুলাই তারিখে) চেয়ারম্যান চন্দ্রকান্ত বাবু হঠাৎ পরলোক গমন করিলেন। এই ঘটনার ৬ দিবস পরে অর্থাৎ ২৫ শে জুলাই তারিখে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। জলের কল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এতদিন যে বিপুল চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা স্বীয় আয়ত্তের মধ্য আসিয়া পড়িল, এবং অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী মাসেই অর্থাৎ আগষ্টের মধ্যভাগেই বঙ্গেশ্বর সার চার্লস

ইলিয়ট্ কর্ত্তৃক জলের কলের ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত হইল। ১৮৯১ সনের ৭ই সেপ্টেম্বরের মিউনিসিপাল সভায় স্থিরীকৃত হইল যে জলের কলের কার্য্যে ইষ্টক প্রস্তুত জন্য ২০ বিঘা জমি খাস করা হউক। ২৬ শে সেপ্টেম্বরের সভায় ইষ্টক প্রস্তুত ও অন্যান্য কার্য্য পরিদর্শন জন্য জনৈক এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা ধার্য্য হইল। ৬ই অক্টোবরের সভায় ইষ্টক ও সুরকী প্রস্তুত জন্য মিঃ ড্রেকফোর্ডের টেণ্ডার মঞ্জুর করা হইল এবং ২৬শে নবেম্বরের সভাতে কল কারখানা সমেত সমগ্র কার্য্য সমাধা করিবার জন্য ড্রেকফোর্ড সাহেবকে কণ্ট্রাকটার নিযুক্ত করা হইল।

রাজরাজেশ্বরী জলের কল—পূর্ব্বদিক হইতে।

প্রথমতঃ যে এষ্টিমেট অনুসারে কল নির্ম্মাণের কার্য্য চলিতেছিল, পরে দেখা গেল যে আরও ১২ হাজার টাকা ব্যয় করিলে কলটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইতে পারে। চেয়ারম্যান শ্যামাচরণ বাবু পুনরায় রাজাবাহাদুরের নিকট এই টাকা প্রার্থনা করিলেন। দানশীল রাজা সূর্য্যকান্ত বাহাদুর কাহাকেও বিমুখ করিতে পারিলেন না। জলের কলের জন্য তিনি সর্ব্বসাকুল্যে একলক্ষ বার হাজার টাকা দান করিলেন। ১৮৯৩ সনের অক্টোবর মাসে রাজরাজেশ্বরী জলের কল স্থাপিত হইয়া গেল, মিউনিসিপালিটী তাহার কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন।

শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ।

বঙ্গদেশ।

খৃষ্টের জন্মের অন্যূন এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ মগধ হইতে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বদিকে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইবার সময় বর্ত্তমান বঙ্গদেশ চারি চক্রে বিভক্ত ছিল এবং যশোহর, পাবনা ও ফরিদপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যশোহর, পাবনা এবং ফরিদপুরের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী স্থান আধুনিক, তৎকালে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল।

প্রথম চক্র, মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থান। পুণ্ড্র, চান্দাল এবং পোদ নামক অর্দ্ধ সভ্য তিনটী জাতি এই চক্রের অধিবাসী ছিল। কোচ, মেচ, লেপচা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির তাণ্ডবে এই চক্র বিধ্বস্ত হইত। তৎফলে পুণ্ড্র জাতির অনেকে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; পোদেরা ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে গমন করে; চান্দালেরা পূর্ব্বদিকে সমুদ্র তীরে উপনিবিষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে ও মহানন্দার উভয় তীরে পুণ্ড্রেরা (পুঁড়ো) বসবাস করিতেছে; ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে পোদদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ববঙ্গে বহু চান্দাল বাস করিতেছে।

দ্বিতীয় চক্র, রূপনারায়ণ নদের উভয় তটে বিস্তৃত ভূমি। কেওট (কৈবর্ত্ত) নামক অর্দ্ধ সভ্য জাতি এই চক্রের অধিবাসী ছিল। অদ্যাপি মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া অঞ্চলে এই জাতীয় লোকের বসবাস দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় চক্র, দারুকেশ্বর ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী স্থান। বাগদী নামক অর্দ্ধ সভ্য জাতি এই চক্রে বসবাস করিত। অদ্যাপি বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার পশ্চিম খণ্ডে বাগদীদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ চক্র, বর্দ্ধমানের কিয়দংশ, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা। গোপগণ এই চক্রের অধিবাসী ছিল।

চতুর্থচক্রের পশ্চিমবর্ত্তী পর্ব্বতমালার অপরপারে মগধ দেশে আর্য্যজাতির বসতি ছিল। আর্য্যগণ এই পর্ব্বত মালা উত্তীর্ণ হইয়া এই চক্রে প্রবিষ্ট হন। কোন সময় আর্য্য জাতির তাদৃশ অভিযান হইয়া ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বঙ্গদেশ মধ্যে এই অংশেই আর্য্যজাতির সংখ্যা সমধিক হইয়া ছিল।

মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অর্থাৎ প্রথম চক্রেই আর্য্যগণ প্রথমে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার পশ্চিমে প্রাচীন মিথিলা প্রদেশ এবং গঙ্গার অপর পারে মগধ এবং অঙ্গরাজ্য অবস্থিত ছিল। এই আর্য্য ভূমি হইতে আর্য্যজাতি প্রথম চক্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন মগধের (কীকটের) নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পরিত্যক্ত পুত্রগণ মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে আগমন করিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাঁহাদের আগমনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের একশত বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। এই ভাবে খৃষ্ট পূর্ব্ব ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান বঙ্গদেশে আর্য্য প্রভাবের সূত্র পাত হয়। ইহার পর একশত বৎসর মধ্যেই উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ মহানন্দা ও করতোয়ায় মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বিষ্ণুপূজা প্রচলিত করিতে সমর্থ হন। তৎকালে এই দেশে যে অনার্য্য নরপতি রাজত্ব করিতেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দী ছিলেন এবং আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিষ্ণুর চিহ্ন সকল ধারণ করিয়াছিলেন; বিষ্ণুপূজা প্রবর্ত্তিত না থাকিলে অনার্য্য নরপতির পক্ষে আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করা নিরর্থক ছিল। (১)

(১) সাহিত্যে প্রকাশিত ৺ উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের লিখিত বরেন্দ্র ভূমি নামক প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া এই অংশ সঙ্কলিত হইল। তদ্ব্যতীত পারজিটার সাহেবের Ancient countries in the Eastern India, পরেশ বাবুর বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত ও পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৌড়ের ইতিহাস হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

আর্য্যগণের অধিকারের পূর্ব্বে পুণ্ড্র, পোদ, কোচ, কৈবর্ত্ত, বাগদী প্রভৃতি জাতি বাঙ্গলার অধিকারী ছিল। ইহাদের কোন কোন জাতি কোলবংশ সম্ভূত ছিল, কোন কোন জাতি দ্রবিড় বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, পণ্ডিত মণ্ডলী নানা প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল জাতির ধর্ম্ম ও ভাষা বিভিন্ন ছিল।

আর্য্যেরা বাঙ্গলায় আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় অনার্য্যদের বাস ছিল। সেই অনার্য্যগণ এক বংশীয় নহে। কতকগুলি কোল বংশীয়, আর কতকগুলি দ্রাবিড় বংশীয়। দ্রাবিড় বংশের পূর্ব্বে কোল বংশীয়েরা বাঙ্গালার অধিকারী ছিল। তারপর দ্রাবিড় বংশীয়েরা আইসে। পরে আর্য্যগণ আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিলে কোলিয় ও দ্রাবিড়ী অনার্য্যগণ তাহাদের তাড়নায় পলায়ন করিয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সকল অনার্য্যই আর্য্যের তাড়নায় বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিল, এমত নহে। অনার্য্যগণ আর্য্যের সংঘর্ষণে পড়িলে আর্য্য ধর্ম্ম ও আর্য্য ভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া হিন্দু সমাজভুক্ত হইতে পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে।" *

আর্য্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নানা খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল; পরেও নানা রাজ্য ছিল। এই সকল রাজ্যের নাম সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইত। যে খণ্ডরাজ্য এক সময় পৌণ্ড্র নামে পরিচিত ছিল, তাহাই অন্য সময় গৌড় নামে কীর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। অন্যান্য খণ্ড রাজ্য সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছিল।

আমরা বঙ্গদেশের প্রদেশ বোধক প্রাচীন নাম সকল এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ, রাঢ়, সমতট, দবাক, কর্ণ সুবর্ণ এবং গৌড়।

মহাভারতের নানা স্থানে এবং গরুড় বিষ্ণু, মৎস্য এবং ভাগবত পুরাণে কলিঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি এবং সুহ্মের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের ঐসকল অংশের এবং ঐ কয়েকখানি পুরাণের বয়স কত, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। সুতরাং বঙ্গদেশের প্রদেশ সমূহের

* বঙ্কিম বাবুর বাঙ্গালার উৎপত্তি।

বহাদেব বানের তিরোধানের পর বাঙ্গালার ই তহাস পুনর্ব্বার যবনিকাবৃত হইয়া পড়ে। গুপ্ত বংশের রাজত্বকালে এই যবনিকার সামান্ত অংশ উত্তোলিত হয়।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

অশ্রু বিনিময়।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর সদাশিব বানার্জ্জির এক শরীরে অনেক কাজ—মিউনিসিপালিটীর চেয়ার ম্যান, সরকারী উকীল, জেলা বোর্ডের ভাইস্ চেয়ার ম্যান ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত জেলার প্রায় প্রত্যেক সৎকার্য্যের সঙ্গেই তাঁহার নাম লিপ্ত। বাস্তবিক সদাশিব বাবু তৈল মর্দ্দনে যেমন পটুত্ব এবং কার্য্যকারিতায় যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার উপর একটু মনের জোড় থাকিলে অবশ্য সোনার সোহাগা হইত। সেটা তাঁর নাই।

সদাশিব বাবুর স্ত্রী বড় মুখরা, সুতরাং গৃহে তাঁহার শান্তির বড়ই অভাব ছিল। তিনি দেশের চতুর্দ্দিকে নাম অর্জ্জন করিতেছেন সত্য, কিন্তু গৃহে তাঁহার অসারতাই প্রতিপন্ন হইতেছিল অধিক।

তিনি দেশে দশের ঘরে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী হইলেও তাঁহার নিজগৃহ দিন দিনই অশান্তির তপ্ত প্রজ্বাপে পরিণত হইতেছিল। এদিকে প্রসার প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছির পালের ন্যায় মধু অন্বেষণে স্ত্রীর সম্পর্কীত আত্মীয় স্বজনে বাসা যতই ভরিয়া যাইতে লাগিল স্বীয় আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্বসব ততই বিরল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহারা আসিলে আর স্থান হইত না, কিন্তু স্ত্রীর দূর সম্পর্কীত যে কেহ আসিলেও আদরের অবধি থাকিত না। সদাশিব বাবু তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না বুঝিয়াও বুঝিতেন না। বুঝিলেও সে সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। বিশেষতঃ তখন কমলা চতুর্দ্দিক হইতে অজস্রধারায় তাহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন, সুতরাং কোন প্রতিবাদ করিয়া বাড়ির ভিতর একটা অশান্তি সৃষ্টির তিনি কোন আবশ্যকতা বোধ করেন না।

(২)

কুমুদ সদাশিব বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পাঁচ বৎসরের শিশু কুমুদকে সদাশিবের হাতে দিয়া তাঁহাদের পিতামাতা শৈশবেই তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তারপর সদাশিব বাবু স্বহস্তে এই শিশুটীকে মানুষ করিয়াছেন। তাঁহার স্নেহে প্রতিপালিত হইলেও এখন কুমুদ দাদার নিকট আর সে যত্ন ও আদর পাইবার সুযোগ পাইতেছেন না। তাহার দাদাকে এখন স্ত্রী সম্পর্কীত বিরাট ব্যূহ আগুলিয়া রাখিয়াছে। তাহার সে হৃদয়ে ভ্রাতৃস্নেহ নাই থাকিলেও তাহা খুঁজিয়া লইবার উপায় কোথায়?

সদাশিব বাবু সরল লোক এবং শান্তি প্রয়াসী। ভ্রাতার প্রতি তাহার অবহেলার ভাব নাই। তিনি ভাবিতেছেন যখন আমার বিপুল উপার্জ্জনেই অপর দশ জন প্রতিপালিত হইতেছে, তখন আর কুমুদের কষ্ট করিয়া চাকুরী করিবার প্রয়োজন কি? কুমুদ ভাবিতেছে দাদা আমার জন্য কিছুই করিলেন না; অথচ তাঁহার শালার বড় বড় কণ্ট্রাক্টের কাজ অকাতরে হইয়া যাইতেছে। দাদা যেখানেই আমার জন্য অনুরোধ করেন, সেখানেই আমার কাজ হয়। অথচ আমার কিছুই হইল না।

কুমুদ আহারে বিহারে একটা কঠোরতা, শয়নে উপবেশনে সঙ্কীর্ণতা বেশ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। দিনে দিনে যেন তাহাদের বিস্তৃত বাড়ীখানা তাহার নিকট ক্রমে একখানা সংকীর্ণ কোঠায় পরিণত হইতেছিল। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সে যেন তাহার প্রতি একটা অবিচ্ছিন্ন তাচ্ছল্যেরভাব অনুভব করিতেছিল। দিন দিন এসকল সংকীর্ণতা ও অবহেলা তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং কুমুদ দাদার কাণে এ সকল কথা তুলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে চেষ্টা কুমুদের সফল হইল না। সদাশিব বাবু কুমুদের মানসিক অশান্তির কোন কথাই জানিতে পারিলেন না। বরং তাহার সাময়িক রূঢ় ব্যবহারের কথাই বাড়ীর ভিতর হইতে সময় সময় শুনিতে পাইতেন এবং তাহাও তুচ্ছ করিয়াই উড়াইয়া দিতেন। প্রথম প্রথম সদাশিব বাবু

তাহা তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেও—ক্রমে তাহা কিন্তু শান্তিপ্রিয় সরল সদাশিবকে চঞ্চল ও বিচলিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

মানসিক অশান্তি সহ্য করিয়া করিয়া কুমুদ বাস্তবিকই একটু কেমনতর হইয়া উঠিয়াছিল, সে অতঃপর কোন বিষয়ে বড় একটা লক্ষ্য করিত না। দোষগুণ যে যাহা বলিতে চাও বল—কুমুদ সংসারের কোন কাজ করিতে সুবিধা না পাইয়া পরের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কুমুদ যদি শুনিল—একটী বসন্তের রোগী গাছের তলে পড়িয়া ছটফট করিতেছে কুমুদ দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে বুকে করিয়া হাসপাতালে রাখিয়া আসিল, কোন নিরাশ্রয়ের কলেরা হইয়াছে, কেহ সে দিকে যায় না, কুমুদ একাকী সেখানে যাইয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে—আহার নাই, নিদ্রা নাই, আপ্রাণ খাটিতেছে। কুমুদ এই সকল করিয়াই বিমল আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিল।

(৩)

সে দিন সন্ধ্যার সময় কুমুদ তাড়াতাড়ি বাসায় আসিয়া সম্মুখেই দেখিল তাহার দাদার শ্যালক অতুল বাবু দাঁড়াইয়া। কুমুদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "অতুল বাবু এই কতক্ষণ হইল দুইটী ভদ্রলোক দাদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন কি ?

অতুল একটু রুক্ষস্বরে বলিল "হাঁ আসিয়াছিল—কে তা'রা ?" "হেড মাষ্টার বাবু আর মুন্সেফ বাবু দাদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, আপনারা কেহ বুঝি তা দাদাকে বলেন নাই ; না ?"

"তাঁদের গায় কি লেখা যে উনি মুন্সেফ বাবু আর ইনি হেডমাষ্টার বাবু ?"

"নাম কি আর গায় লেখা থাকে ?"

"তবে আর কি ? কত লোক আসে যায়, কে কার খবর রেয় ?"

"ভদ্রলোকেরা আসিয়া দেখা করিতে পারিল না ? তুমিই বা কেমন ?"

অতুল একটু রুক্ষস্বরে বলিল "কেন ; তাহারা বুঝি তোমার কাছে নালিশ করিয়াছে, না ?" অতুলের উত্তর শুনিয়া কুমুদের একটু রাগ হইল ; সে পায়চারী করিতে ২ বলিল "না নালিশ করিবে কেন ? তবে তাঁহারা রাস্তায় একে অন্যে বলাবলি করিয়া যাইতেছেন যে বাড়ীর লোক গুলি কি অভদ্র ?" এই কথা বলিয়া কুমুদ দালানের বাহিরে চলিয়া গেল। অতুল গর্জ্জন করিয়া বলিল "কি, আমরা অভদ্র আর তুমি ভারী ভদ্র ?"

প্রতিধ্বনির মত এই কথাগুলি অদূরে গৃহিণীর কর্ণে ধ্বনিত হইল, তিনি অমনি ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন "অতুল কি হইয়াছে রে ?"

"দিদি দেখ না, কুমুদ আমায় কি বলিতেছে ; আমি নাকি কি—

এমন সময় কুমুদ হাত পা ও ধুইয়া ফিরিয়াছে। সে অতুল বাবুর কথার উত্তরে বলিল " না আমি তো আপনাকে কিছু বলি নাই অতুল বাবু!" বলিয়া একটু অগ্রসর হইল। অমনি বাড়ীর ভিতর হইতে উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "রোজ রোজ আর এসকল গালি গালাজ কত বড়দাস্ত হয়। এক এক জন রাখেন আর রসিক বসিয়া বসিয়া অনর্থক লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাবেন। সস্তা ভাত মিলে কি না, খেয়ে তো আর কোন কাজ কর্ম্ম নাই। ভাত হজম হওয়া চাই তো ? ঝগড়া না জুটাইলে চলিবে কেন ? পায়ের উপর পা তুলিয়া খাওয়া আর টু টু করিয়া ঘুরা—যার এক কড়ার মুদ্রা নাই তার মুখে আবার এত কথা কেন ?"

"বউ দিদি আমি অতুল বাবুকে তো কিছুই বলি নাই" বলিয়া কুমুদ একটু অগ্রসর হইল। অগ্রসর হইয়া দেখিল, সদাশিব বাবু দালানের বারান্দায় একখানা ইজি-চেয়ারে উপবিষ্ট, সম্মুখে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি বউদিদি দুই হাত নাড়িয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার শিশু পুত্রটী নিকটে দাড়াইয়া কাঁদিতেছে। কুমুদ নিকটে যাইয়া শিশুটীকে কোলে তুলিয়া লইতে যাইবে অমনি তাহার বউদিদি শিশুকে ছিনাইয়া লইয়া গেলেন। অবোধ শিশু "কাগা বাবু" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কুমুদ এতক্ষণ ঘটনাটী বড় লক্ষ্য করে নাই কিন্তু যখন তাহার ক্রোড় হইতে বউদিদি ঝড়ের মত শিশুকে ছিনাইয়া লইয়া গেল, তখন কুমুদের মনে প্রকাণ্ড একটা দারুণ আঘাত লাগিয়া গেল, সে আর সেখানে দাঁড়াইয়া

ঐ সকল নাম ঐতিহাসিক কাল অপেক্ষাও প্রাচীন কিনা, তাহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব পর নহে। ঐতিহাসিক কালে কি নাম পাওয়া যায়, তাহাই আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকায় রাঢ় (গঙ্গা রিডি) এবং কলিঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রচারিত অশোকের অনুশাসনে কলিঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ আছে।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত টলেমির ভূগোল বৃত্তান্তে কার্টিসিনা (কর্ণ সুবর্ণ) গঙ্গারিডি (রাঢ়) এবং তামাল তিস (তাম্র লিপ্তি) রাজ্যের নাম লিখিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রচারিত হরিষেণের প্রসস্তিতে সমতট এবং দবাকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিরচিত রঘুবংশে (আমরা মহাকবি কালিদাসকে বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের সম সাময়িক বলিয়া স্বীকার করিতেছি) বঙ্গ এবং সুহ্মের নাম পাওয়া যায়। *

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আবির্ভূত বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা নামক গ্রন্থে পৌণ্ড্র, সমতট, বঙ্গ, উপবঙ্গ, সুহ্ম, তাম্র লিপ্তি, বৰ্দ্ধমান প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আগত হিউএন্থ্ সঙের গ্রন্থে কর্ণ সুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি, পৌণ্ড্র এবং সমতট রাজ্য বর্ণিত হইয়াছে।

"খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়, পৌণ্ড্র বৰ্দ্ধনের নামান্তর মাত্র ছিল। খৃষ্ট অষ্টম শতাব্দীতে জয়ন্তের সময়ে পৌণ্ড্র-বৰ্দ্ধন এবং গৌড় উভয়েরই উল্লেখ রাজ তরঙ্গিণী গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।" †

আৰ্য্য অধিকারের আদিকালে তিনটী রাজ্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল ; এই তিনটী রাজ্যের নাম কলিঙ্গ, রাঢ় এবং পৌণ্ড্র।

পৌণ্ড্র—বর্ত্তমান মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর জেলা এই রাজ্যভুক্ত ছিল।

রাঢ়—পশ্চিমবঙ্গ। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

কলিঙ্গ,—গঙ্গানদীর সাগর সঙ্গমস্থল হইতে গোদাবরী নদী পৰ্য্যন্ত সমগ্র সমুদ্র তীরবর্ত্তী প্রদেশ কলিঙ্গ রাজ্য নামে খ্যাত ছিল। কালক্রমে কলিঙ্গ রাজ্য হইতে তাম্রলিপ্তি (দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ), ওড্র (উড়িষ্যা) প্রভৃতি কতিপয় রাজ্যের উদ্ভব হয়। এবং কলিঙ্গ রাজ্যের সীমা চিল্কাহ্রদ হইতে গোদাবরী নদী পৰ্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

পাল বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালার ইতিহাস আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। কেবল সময় সময় অন্যদেশ বা প্রদেশের ইতিহাসের প্রসঙ্গে বাঙ্গলার ক্ষণিক পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এইরূপ দুইটী পরিচয় দিতেছি। প্রথম, সিংহলের পুরাবৃত্তে বিজয় সিংহ কর্ত্তৃক সিংহল বিজয়ের বিবরণ; দ্বিতীয়, মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক কলিঙ্গ জয়ের বিবরণ।

[খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহবাহু নামক অধিপতি রাঢ় প্রদেশে আধিপত্য করিতেন। "তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় যথা সময়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। বিজয় যথেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। তাঁহার অনুচরগণও তদ্রূপ ছিল। প্রজাবর্গ তাহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে রাজ সমীপে ঐ সকল অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা নিবেদন করিল। রাজা সিংহবাহু পুত্রকে অতিশয় তিরস্কার করিলেন। কিছুদিন অতীত হইলে প্রজাগণ সমবেত হইয়া পুনরায় স্বীয় নরপতিকে যুবরাজের উৎপীড়ন কাহিনী অবগত করাইল। রাজা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় বিজয়কে ভর্ৎসনা করিলেন। নরপতি সিংহবাহুর এইরূপ বারম্বার তিরস্কারে যুবরাজ বিজয়ের চৈতন্যোদয় হইল না। কিছুদিন পরে আবার প্রজাগণ আৰ্ত্তনাদ করিতে করিতে

† রঘু বংশে কলিঙ্গ রাজ্যেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু কালিদাসের সময়ে কলিঙ্গ বঙ্গ দেশের বহির্ভূত হইয়াছিল। কলিঙ্গ রাজ্যের বঙ্গীয় অংশ স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

* বাঙ্গালার পুরা বৃত্ত।

রাজাকে যুবরাজকৃত নানাবিধ উৎপীড়নের বিষয় জ্ঞাপন করিল। নিপীড়িত প্রজাবর্গ ইহাও নিবেদন করিতে কুণ্ঠিত হইল না যে, যুবরাজ জীবিত থাকিলে তাহাদের প্রাণরক্ষা দুষ্কর হইবে। রাজা তখন যুবরাজ ও তদীয় সাত শত অনুচরের মস্তক অর্দ্ধ মুণ্ডন করিয়া সমুদ্রবক্ষে ভাসাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। যথাকালে রাজার আদেশ অনুসারে প্রথমে যুবরাজ ও তদীয় অনুচরবর্গকে, তৎপরে উক্ত নির্ব্বাসিতগণের পত্নীদিগকে এবং তৎপরে তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগকে পৃথক পৃথক পোতে স্থাপন পূর্ব্বক সমুদ্র বক্ষে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বহুদিন পরে বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া বিজয় সাত শত অনুচর সহ লঙ্কার (সিংহলের প্রাচীন নাম লঙ্কা, তৎপরে সিংহবাহুর পুত্র বিজয় যখন অনুচরাদিসহ তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেই সময় হইতেই লঙ্কা ইতিহাসে সিংহল নামে পরিচিত হয়) তাম্রপর্ণী বন্দরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিলেন যে, উক্ত প্রদেশ অসভ্য জাতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক অনুরাধাপুরে (সিংহলের প্রাচীন রাজধানীর নাম অনুরাধাপুর। প্রাচীন কদম্ব নদীর উপর এই গ্রাম অবস্থিত ছিল। বিজয়ের অনুরাধ নামক এক সহচরের নাম হইতে অনুরাধাপুর নাম হয়) স্বীয় রাজ সিংহাসন স্থাপন করিলেন। বিজয়ের অনুচরগণ সিংহলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্ব স্ব নামে পৃথক পৃথক রাজ্য স্থাপন করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহারা সকলে এক মত হইয়া বিজয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করিল।" *

এই বিবরণ হইতে আমরা বিজয়সিংহ এবং তদীয় অনুচরদের শৌর্য্য বীর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি। বস্তুতঃ তৎকালে রাঢ়ীয়গণ অতিশয় শৌর্য্য বীর্য্যশালী ছিলেন। গ্রীক মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারত জয় জন্য প্রবিষ্ট হইয়া শতদ্রু তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ছিলেন, এই স্থান হইতে তিনি প্রত্যাগত হন। তদীয় সৈন্য অনবরত যুদ্ধ ও পরিভ্রমণ করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি মগধ ও গঙ্গারাঢ় রাজ্যদ্বয়ের বিপুল সৈন্যবল ও তাহাদের শৌর্য্য বীর্য্যের জনশ্রুতিই তাহাদিগকে ভীত করিয়া তুলিয়া ছিল, তজ্জন্য আলেকজাণ্ডার প্রত্যাবর্ত্তী হইয়াছিলেন। গ্রীক ইতিহাস বেত্তৃগণের সাক্ষ্য হইতে আমরা এতরূপ জানিতে পারি এবং তাঁহাদের সাক্ষ্যই প্রাচীন রাঢ়ীয়গণের শৌর্য্য বীর্য্যের উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

কেবল যে বাঙ্গালার রাঢ়ীয়গণই শৌর্য্য বীর্য্যশালী ছিল, তাহা নহে। বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীগণও তদনুরূপ শৌর্য্য বীর্য্যশালী ছিল। মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক কলিঙ্গ বিজয়কালে কলিঙ্গের অধিবাসীরা যে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীদের শৌর্য্য বীর্য্যের আর একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমরা সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মহারাজ অশোক কলিঙ্গ রাজ্য বিজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই জন্য অপরিমিত সৈন্য উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল। কলিঙ্গ বাসীরা তাঁহার বিরুদ্ধে অদীন পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া স্বদেশের জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করে! এই যুদ্ধে রক্ত প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছিল। দুই পক্ষে একলক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছিল। ফলতঃ মৌর্য্য সৈন্যের হস্তে কলিঙ্গের "পরাজয় কাহিনী বহু বিজয় কাহিনীর তুলনায় অধিক গৌরবের সহিত ইতিহাসে উল্লিখিত হইবার যোগ্য।" কলিঙ্গ বিজয়ের পূর্ব্ব বা সমকালে মৌর্য্য সৈন্য বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশও অধিকার করিয়াছিল, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল দেশ দীর্ঘকাল মৌর্য্যবংশের অধীনতা করে নাই। অশোকের তিরোধানের পরই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল।

আমাদের ঈদৃশ নির্দ্দেশের কারণ এই যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহামেঘবান খারবেল নামক একজন পরাক্রান্ত নরপতি কলিঙ্গ রাজ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং দিগ্বিজয়ার্থ মগধের সীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ মহামেঘবান জৈনধর্ম্মানুরাগী ছিলেন; তিনি জৈন ধর্ম্মের পুনঃ প্রচলন করিয়া ছিলেন। কলিঙ্গ নগরীতে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহামেঘবানের বংশের নাম চেত; তিনি এই বংশের তৃতীয় নরপতি ছিলেন।

* শ্রীচারুচন্দ্র বসু প্রণীত অশোক চরিত।

ভাবিয়া সাহেব বড়ই চিন্তিত হইলেন এবং ইহার কারণ অনুসন্ধান জন্য Tour এ বাহির হইলেন।

যথা সময়ে সাহেব ও মেম কার্য্য স্থলে পহুঁছিয়া বানার্জ্জির কার্য্যের অনুসন্ধান করিলেন; দেখিলেন, কাজ চলিতেছে। কুলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন কণ্ট্রাক্টর বাবু দুই সপ্তাহ যাবত শয্যাগত কাতর। কুলিদের নিকট হইতেও অভিযোগ পাইলেন, তাহারা টাকা পাইতেছে না কিন্তু তাহারা অভিযোগ করিয়াও সাহেবকে জানাইল বাবু খুব ভাল লোক. এমন অবস্থায় টাকার অভাবে তাহারা এখন কাজ বন্ধ করিতে পারে না, করিবেও না। তিনি তাহারা সময় সময় তাহাদিগকে অনেক টাকা অগ্রিম ও দিয়াছেন টাকা না পাইয়া ও কাজ চালাইতেছে।

সাহেব দেখিলেন এখনও যে কাজ হইয়াছে তাহাতেও কনট্রাক্টর বিল করিলে অনেক টাকা পাইবে। যাই হউক সাহেব তাঁহার অবস্থা জানিবার জন্য একটী কুলিকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাসস্থানে চলিলেন।

(৬)

দাদার চিঠির কোন উত্তর আসিল না। আজ সোমবার গৃহস্বামী টাকার শেষ তাগিদ দিবে, টাকা না দিতে পারিলে তাহার গৃহ ত্যাগ করিতে হইবে, ভাবিয়া ভাবিয়া কুমুদ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

এমন সময় একজন কুলি দৌড়িয়া আসিয়া খবর দিল বড় সাহেব আসিয়াছে। গৃহস্বামী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া সাহেবকে সংবর্দ্ধনা করিল এবং যে গৃহে কুমুদ শায়িত ছিল সেই জীর্ণ কুটীরে সাহেবকে লইয়া চলিল। সাহেব ও মেম কুমুদের পাংশু মুখ দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি কুমুদের মাথায় জল দিতে লাগিলেন।

কুমুদ মা—মা বলিয়া যখন চক্ষু উন্মেলিত করিল, তখন দেখিল তাঁহার মস্তকে হস্ত রক্ষা করিয়া এক সজীব মাতৃমূর্ত্তি যেন তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। সে স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সে দৃষ্টি হইতে আশ্রয় হীনতার আকুল ব্যথাই যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। "মাতৃ সম্বোধনে সে রমণীর অন্তঃপ্রবাহী রুদ্ধ স্নেহ সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া তার সমুদায় হৃদয় টুকু এক মধুর প্লাবনে সরস করিয়া তুলিল। মানুষের হৃদয় যখন করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখন দুঃখীর বেদনায় সমস্ত চিত্ত ভরিয়া উঠিতে বিলম্ব হয় না। যা নাকি পাষাণ গলিয়াও যে স্রোত বহে। সহৃদয়া ইংরেজ রমণী কুমুদের মাতৃ সম্ভাষণে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কুমুদের মস্তক সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইলেন বিধাতার প্রেরিত আশীর্ব্বাদ স্বরূপ যেন এই দম্পতি যুগল আত্মীয় স্বজন বর্জ্জিত এই বিজন অরণ্যে যুবকের আশ্রয় রূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমুদ যেন অকস্মাৎ দেব আশীর্ব্বাদে মাতৃ-কোলে আশ্রয় লাভ করিল।

(৭)

তারপর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় গঙ্গার ধারে "বানার্জ্জি লজের ত্রিতল কক্ষে বসিয়া বানার্জ্জি সাহেব একদিন প্রাতে গঙ্গার লহরী লীলা প্রত্যক্ষ করিতে ছিলেন। তাঁহার রিক্ততার মধ্যে কেমন করিয়া যে নিজে একটা বিরাট সংসার গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা ভাবিয়া তাহার চোখ মুখ উৎসাহের বিমল দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

এমন সময় দরোয়ান আসিয়া এক খানা Statesman রাখিয়া গেল। মিঃ বানার্জ্জি পত্রিকাখানা হাতে লইয়া চক্ষু বুলাইতে লাগিলেন, সর্ব্ব প্রথম কলিকাতার বাজার দর দেখিয়া পত্রিকাখানা টেবিলের উপরে রাখিলেন, তারপর চা'র পেয়ালা হাতে লইয়া পত্রিকা খানার উপর আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বড় বড় অক্ষরে লেখা "motor accident in Clive Street" সংবাদটা পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু ঝাপসা হইয়া গেল। তিনি কাগজ খানা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

বানার্জ্জির মটর মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিল। তখন হাঁসপাতালের বড় সাহেব আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন।

বানার্জ্জি জিজ্ঞাসা করিলেন "কাল সন্ধ্যায় যে একটা Motor accident হইয়াছে। সে রোগী এখন কেমন কি অবস্থায় আছেন? অমনি একজন কেরানী আসিয়া

স্লিপ দেখিয়া বলিল "রোগী ৪নং ওয়ার্ডে আছেন।" "আমি রোগীকে আমার নিজ বাড়ীতে নিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।"

বড় সাহেব বলিলেন "আপনি ইচ্ছা করিলে লইয়া যাইতে পারেন। এখন আপনার তত্বাবধানে চিকিৎসা ভালই চলিবে।"

তখন আহত ব্যক্তিকে ষ্ট্রেচারে করিয়া গঙ্গার ধারে "বানার্জ্জিলজে" লইয়া যাওয়া হইল। রোগী কিছুই বুঝিতে পারিলেন ন.।

স্থান পরিবর্ত্তনে সে দিন রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া দাঁড়াইল। দুই জন ডাক্তার অবিশ্রান্তভাবে দিবা রাত্রি রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল। বানার্জ্জির চক্ষে নিদ্রা নাই, শরীরে ক্লান্তি নাই নিয়ত রোগীর পার্শ্বে আছেন। চিকিৎসকেরা নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিলেন না এমন করিয়া অর্থ ও প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া মিঃ বানার্জ্জি রোগীকে প্রাণের আশঙ্কা হইতে দুরে আনিলেন।

প্রাতঃকাল চতুর্দ্দিকে জানালা দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। গঙ্গার সুশীতল সমীরণ হু হু করিয়া আসিতে-ছিল। বানার্জ্জি কোন কার্য্য উপলক্ষে কক্ষান্তরে গিয়াছিলেন। সহসা রোগীর চক্ষু মেলিবার বিফল প্রয়াস লক্ষ্য করিয়া ডাক্তারেরা বুঝিলেন রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি প্রয়োজন আমায় বলুন।" রোগী আবেগ ভরে কথাগুলি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আমি কোথায়?"

ডাক্তার উত্তর করিল "কলিকাতায় গঙ্গার ধারে আপনার নিজ বাড়ীতেই আছেন—রোগী আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়া বলিলেন" নিজ বাড়ীতেই" ডাক্তার "হাঁ এই বাড়ী আপনাদের জন্যই ভাড়া হইয়াছে।"

রোগী আশ্বস্থ হইয়া বলিল "আমার বাড়ী হইতে কে আসিয়াছে।"

এমন সময় মিঃ বানার্জ্জি আসিয়া শিয়রে বসিয়া ইংরেজিতে উত্তর করিলেন আপনার বাড়ীতে খবর দেওয়া হইয়াছে। এখনও কেহ আসেন নাই, কিন্তু আপনার চিন্তা ভাবনার কোন কারণ নাই। আপনি নিজ বাড়ীতেই আছেন মনে করুন। যখন যাহা প্রয়োজন বলিবেন। আপনার অভিপ্রায় মতই কার্য্য করা যাইবে। এখন একটু নীরবে থাকুন। মাথা নাড়িতে ও চক্ষু মেলিতে চেষ্টা করিবেন না।

রোগী বিপদ মুক্ত হইলেও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে নাই। তখনও চক্ষে এবং মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাধিতে হইতেছিল। অন্যান্য স্থানের আঘাতগুলি সারিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু মাথায় ও চক্ষে তখনও ব্যাণ্ডেজ বাধিতে হইতেছিল। রোগী চুপ করিলেন।

(৮)

বেলা দশটা। এক খানা ভারাটে গাড়ী আসিয়া "বানার্জ্জিলজের" গাড়ী বারেন্দায় নামিল। বানার্জ্জি তাহার আফিস ঘর হইতে দেখিলেন একজন স্ত্রীলোক একটী দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু ও একটী বৃদ্ধ গাড়ী হইতে নামিল।

বড়ীর চাকর বাকরকে অগন্তকদের ও রোগীর পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিয়া মিঃ বানার্জ্জিকে একটা জরুরী কার্য্যে বাহির হইয়া যাইতে হইল। স্ত্রীলোক দেখিয়া রোগীর ঘর হইতে লোক জন চলিয়া গেল।

আগন্তকেরা যখন রোগীর গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন রোগী বিছানায় শুইয়া কি ভাবিতেছিলেন। ঘরে লোক সমাগম বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?',

"আমি রাম চরণ"

"রামচরণ, আর কে আসিয়াছে।"

"মা ঠাকুরাণ আর খোকা।"

"অতুল আসে নাই।"

"না।"

"কি অতুল আসে নাই।" বলিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে সজোরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "জন জামাই ভাগিনা কেহ নয় আপনা।" হায় আজ কুন্দ নাই তাই বন্ধু হীন জীবন—রোগীর মুখে আর কথা ফুটিল না। উদ্বেলিত আবেগে চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। গৃহিণী আসিয়া নিকটে বসিলেন। সকলেই নীরব। শোকের এমন একটা

থাকিতে পারিল না। সে যেন তাহার অন্তরে একটা ভীষণ অপমানের তীব্র দংশন অনুভব করিতে লাগিল। হায়, সে চিরদিন দাদার গলগ্রহ হইলেও দাদার সম্মুখে যে ভাতের জন্য এত কথা শুনিতে হইবে তাহার জন্য সে কোন দিনই প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ এই ব্যবহারে তাহার দুই চক্ষু ছাপিয়া উঠিল। তারপর গণ্ড বাহিয়া ধারা বহিতে লাগিল।

কুমুদ লেখাপড়া বড় বিশেষ কিছু করে নাই। ইংরেজী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। অর্থোপার্জ্জনের দিকেও তাহার কোন লক্ষ্য ছিল না। সে চিরদিন ভ্রাতার গলগ্রহ ছিল এবং মুখাপেক্ষী আছে কিন্তু কোনদিন স্বপ্নেও সে ভাবে নাই যে ভ্রাতার দান অনুগ্রহের দান। সে ভাবিত ইহা তাহার ন্যায্য প্রাপ্য। সে বহুদিন বহু তীব্র মন্তব্য শুনিয়াছে, কিন্তু তাহার পশ্চাতেই দাদার স্নেহের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে সব ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু আজ দাদা সম্মুখে বসিয়া তাহার অপমান লক্ষ্য করিলেন, টু শব্দটী করিলেন না, এ অপমান কুমুদের সহ্য হইল না। সে বাষ্পাকুল লোচনে বলিল—"দাদা—" কুমুদ আর বলিতে পারিল না। সদাশিব বাবু ভ্রাতার পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া কি বলিতে যাইতে ছিলেন, অমনি ঝঙ্কার দিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন "লোককে অপমান করিলেই আবার কাঁদিয়া রাজ্য ভাসাইবেন"। কুমুদ আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ভ্রাতার সম্মুখ হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তাহার বউদিদির নিষ্ঠুর মূর্ত্তিও যেন ব্যঙ্গ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। গৃহে আসিয়া কুমুদ দরজা বন্ধ করিল।

যথা সময়ে ঠাকুর আসিয়া কুমুদকে রাত্রির আহারের জন্য ডাকিল। কুমুদ অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া গেল। তখনও কর্ত্তায় গৃহিণীতে তর্ক যুদ্ধ চলিতেছিল। কর্ত্তা এক কথা বলিতে গৃহিণীর মুখ হইতে দশ কথা বাহির হইয়া সে বেচারীকে হতভম্ব করিয়া দিতেছিল। কর্ত্তা বলিতেছেন "হাজার হলেও মায়ের পেটের ভাই ?

গৃহিণী—"তা হইলেই—তাকে মাথায় করে নাচতে হবে, না? এইত দেখ না তাকে আবার বামণ ঠাকুরের ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতে হয় ইহাকেই বলে—আকাঠা মায়ের সাজন দড়।"

শুনিয়া কুমুদের আর খাওয়া হইল না। থালের ভাত থালেই রহিল। কুমুদ ভাবিল একমুঠা অন্নের সংস্থান, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, দীন দুনিয়ার যিনি মালিক তিনি কি তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডারে তাঁহার এই অসহায় সন্তানটীর জন্য কোন ব্যবস্থাই করিয়া রাখেন নাই?" অবশ্যই করিয়াছেন। দিন কাটিবেই—দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকিবে না। অসহায়ের যিনি সহায় তিনিই আমার দিকে—আজ হোক কাল হোক, মুখ তুলিয়া চাহিবেনই চাহিবেন।

সেই নিস্তব্ধ নিশীথে অনাহারে কুমুদ তাহার অন্তরের বেদনাকে অন্তর তমের চরণে নিবেদন করিয়া তাহার করুণার ভিকারী হইয়া বাহির হইল।

(৪)

তখন আসাম বেঙ্গল রেলের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। রেল কোম্পানী উচ্চমূল্যে মাটী কাটিবার কণ্ট্রাক্ট দিতেছিলেন। কুমুদ সেই জন-বিরল আসামের নিবিড় অরণ্যে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে চলিল।

কোন কোন মানুষের সকরুণ দৃষ্টির ভিতর এমন এক একটা আকর্ষণী শক্তি থাকে যাহা তেমন পাষাণের ভিতর হইতেও সহানুভূতির সরল বন্যা প্রবাহিত করিতে পারে। কুমুদের দিব্য কান্তি ও সকরুণ দৃষ্টির ভিতর এমন একটা কিছু ছিল, যাহাতে সে সহজেই তথাকার একজন বড় সাহেবের অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু লৌকিক অনুগ্রহ যত বড়ই হউক না কেন ভোগের শেষ না হইলে ভগবানের দয়া মিলে না। কুমুদ আসামের জন হীন অরণ্যে কণ্ট্রাক্টরী আরম্ভ করিল। এত দিন কুমুদের স্বাস্থ্য ছিল, আসামে আসিয়া কুমুদের হাতে দুচারটী টাকাও হইয়াছিল, কিন্তু অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুর প্রভাবে ও সুখাদ্যের অভাবে সে তাহার অমূল্য স্বাস্থ্য খোয়াইতে বসিল। খাওয়ার সুব্যবস্থার অভাবে কোনদিন অর্দ্ধাহারে কোনদিন বা অনাহারে থাকিয়া একাগ্রচিত্তে কুমুদ তাহার ভাগ্যের পশ্চাতে দৌড়িতে লাগিল।

প্রত্যহ চারিক্রোশ পথ হাটিয়া কুমুদকে কাজের তত্ত্বা-

যথান করিতে হইত ; আবার সন্ধ্যায় চারিক্রোশ পথ আসিয়া ক্লান্ত দেহে আহার গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপ তাহার দিন গুলি যাইতে ছিল। অপরিচিত বিভূমে তাহার আশ্রয় ছিল—মুদীর জীর্ণচালা—সঙ্গী ছিল—পশ্চিমা কুলী, ছিল আর কালাজরের অব্যর্থ ঔষধ কুইনাইন। অনাহারে অর্দ্ধাহারে দুশ্চিন্তায় কুমুদের শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অতিরিক্ত শ্রমে কুমুদের মুখ সদ্য তুষার পাত ক্লিষ্ট পদ্ম কুড়িটীর মত ম্লান হইয়া গিয়াছে। যে কুমুদের সুগোল দেহ দর্শক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত সেই কুমুদের দেহ এখন জীর্ণ শীর্ণ ও নিত্য নূতন নূতন ব্যাধির আকর হইয়া উঠিয়াছে। কুমুদের দেহের এখন আর সে দীপ্তি নাই। চাওনির আর সে আকর্ষণ শক্তি নাই। প্রত্যহ দুইবেলা জরের প্রবল কম্পনে ও কুইনাইনের তীব্র বিষে কুমুদের শরীর একেবারে অসার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার আর কাজের তত্ত্বাবধানের শক্তি নাই; বিল গুলি ভাঙ্গাইয়া যে টাকা আনাইবে তাহারও সামর্থ্য নাই। কুমুদ শয্যায় শুইয়া চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। গৃহস্বামী মুদী দুই সপ্তাহ টাকা পায় নাই এখন কোন দিন জবাব দেয়। অন্নদাতা মুদী জবাব দিলে এই বিজন অরণ্যে কুমুদের উপায় কি? কুমুদ ভাবিয়া ভাবিয়া অনুপায় দেখিয়া তাহার সকল মান অভিমান ডুবাইয়া দিয়া কম্পিত হস্তে একখানা চিঠি লিখিল :—

শ্রীচরণেষু—

দাদা, আশৈশব তোমার স্নেহে বর্দ্ধিত ও লালিত পালিত হইয়াই জীবিত আছি। আজ সুদূর আসামের বিজন প্রান্তরে তোমার সেই সকল স্নেহের স্মৃতি থাকিয়া থাকিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। আমি অপদার্থ, তোমার স্নেহের অযোগ্য। তোমার স্নেহকে একদিন উপেক্ষা করিয়াই আমি মরণকে বরণ করিয়াছিলাম, সে দিন মরণই আমার একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। আজ আমার মরণের কোল হইতে তোমার কোলে যাইতে লালায়িত হইয়াছি। দাদা মরণের যন্ত্রণা জানিতাম না তাই মরণ শ্রেয় মনে করিয়াছিলাম কিন্তু যে যন্ত্রণা পাইতেছি তাহা যে বড়ই অসহ্য আমি কি তোমার স্নেহের কোল আর পাইতে পারিব না? কালাজরে আমার উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছে, দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে শিকড় বিস্তার করিয়া দেহটাকে অসার করিয়া ফেলিয়াছে। তার উপর অভাবের তীব্র কষাঘাত। আর যে সহ্য হয় না।

এখন তোমার স্নেহ ব্যতীত আমার যে অন্য গতি নাই। ভরসা আছে হত ভাগ্যের এই অন্তিম প্রার্থনা চরণে স্থান পাইবে।

তোমার গৃহে শিয়াল কুকুরে যে অন্ন অকাতরে গ্রহণ করিতেছে আজ আসামের বিজন অরণ্যে তোমার এই অসহায় হতভাগ্য ভাই সেইরূপ অন্নের জন্যও লালায়িত। তোমার স্নেহের দানের প্রতীক্ষায় এই কয় দিন কোন প্রকারে অতিবাহিত করিব। সপ্তাহ মধ্যে সাহায্য না পাইলে অনাহারে জীবন যাইবে। আর লিখিতে পারি না। শরীর কাঁপিতেছে। তাগাদা যে অসহ্য হইয়াছে।

স্নেহের সেবক

হতভাগ্য কুমুদ"—

(৫)

নবাগত কণ্ট্রাক্টর বানার্জ্জির কার্য্যে আফিসের বড় সাহেব বড়ই প্রীত। সে যাহা কাজ করে ও বিল দেয় তাহার ভিতর কোন ভ্রম প্রমাদ নাই। সে অন্যান্য কণ্ট্রাক্টরের ন্যায় কাজ না করিয়া কখনও বিল করে না। আফিসের বড় সাহেব বরাবর এ সকল লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন এবং দিন দিন তাহার বিলের কাজ দীর্ঘ হইতেছে দেখিয়া বড়ই সুখী হইতেছিলেন। এখন বানার্জ্জির বিল আসিলে সাহেব চেক না করিয়াই বিল দস্তখত করিতে প্রস্তুত। বানার্জ্জির উপর তাঁহার এতটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে।

সে দিন আফিসে আসিয়া সাহেব একটা প্রয়োজনীয় কাগজ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিলেন বানার্জ্জির কয়েক খানা বিল পড়িয়া রহিয়াছে। কেন বিল গুলি পড়িয়া রহিয়াছে, সাহেব অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কেহ কোন সন্তোষ জনক উত্তর দিতে পারিল না। এতগুলি টাকা পড়িয়া থাকিলে কাজ কেমনে চলিতে পারে?

সময় আসে যখন মানুষ ক্রন্দনেও তাহা বিকাশ করিতে পারে না। কুমুদের কথা স্মরণ করিয়া আজ রোগীর বক্ষ পঞ্জর যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল, তিনি হু হু করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন কিন্তু কাঁদিয়াও যেন তিনি তাহার অভাবটা বুঝাইতে পারিতেছিলেন না। সে কান্না দেখিয়া গৃহিনীর চক্ষে জল আসিল। বিপদে পড়িলে মানুষ কেন পশু পক্ষী পর্য্যন্ত হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া যায়।

গৃহিনীর আজ আর যেন সে ভাব নাই। তিনি বাস্পাকুলনয়নে বলিলেন "হাজার হলেও মায়ের পেটের ভাইতো, সম্পদে শত্রু হলেও বিপদে বন্ধু।"

এমন সময় হাস্য মুখে খোকা আসিয়া বলিল "মা এ বাড়ী নাকি আমাদের কাকা সাহেবের বাড়ী তিনি কে মা।"

খোকার মা বলিলেন "তা হইতে পারে; উঁকে জিজ্ঞাসা কর না।"

কথা শুনিয়া রোগী বলিলেন "কে বলিলরে খোকা?"

খোকা বলিল "ঐ চাকর বেটা আমাকে বলিল।"

রোগী—"ডাক দেখি তাকে। তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন "যাহা হউক তবুত একজন ভাই হইল।"

খোকা চাকরকে লইয়া আসিল। রোগী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে যিনি আশ্রয় দিয়া চিকিৎসা পত্র করাইতেছেন, তিনি কি তোমার মুনিব?

চাকর উত্তর করিল "হাঁ"।

চক্ষের বেণ্ডেজ খুলিয়া অবধি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। তিনি থাকেন কোথায়?"

"এ কয় দিন তো সকল কর্ম্ম ফেলিয়া তোমার কাছেই বসি ছিলেন। আজ এঁরা সব আমার বাহির হইছেন। এনার মস্ত কারবার কি না—এ কয়দিন তো একেবারে দিন রাত তোমারি এখানি ছিলে, কাজ তো কিছুই হই নি।"

"আচ্ছা তোমার মুনিবের নাম কি?"

নাম বানার্জ্জি সাহেব?"

"বাড়ী"

"সে তো আমি জানি নি। বাবু বলচেন তিনি আপনার ভাই হন।"

রোগী প্রৌঢ়া রমনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "আমাদের বংশের কেউ যে কলিকাতায় এরূপ ভাবে আছে, তাতো আমার জানা নাই। তা হইতে পারে আমাদের কোন জ্ঞাতিই হইবে।"

প্রৌঢ়া বলিলেন—"ভগবানের ইচ্ছা হইলে দেখ কুমুদও তো হইতে পারে" আসাম গেলে নাকি রাতারাতি"—

কথা শেষ করিতে না দিয়া রোগী বাষ্পবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন "আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিও না।" কুমুদের সেই বিপদে যা ও তোমার সহিত ঝগড়া করিয়া ১০০৲ টাকা দিলাম, তাও তোমার ভাই অতুলচন্দ্র নিয়া নিজের বাক্সেই ভরিল। আমি মনি অর্ডার রসিদের অনুসন্ধান না করিলে হয়ত সেটাও আর ধরাই পড়িত না।"

প্রৌঢ়া "তারপর তো তুমি নিজেই টাকা পাঠাইয়াছিলে।"

রোগী "সে টাকা প্রাপকের অভাবে ফেরত আসিয়াছিল; যাক্ সে নিতান্ত দুরাশা।" বলিয়া রোগী বালিসে মুখ লুকাইলেন।

(৮)

অপরাহ্নে বানার্জ্জি সাহেব যখন মটর হইতে নামিলেন তখন দ্বারেই খোকার সহিত সাক্ষাৎ হইল। খোকা সাহেব দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল—সে একটু জড়সড় হইয়া গিয়াছিল—বানার্জ্জি তাহার চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন "তোমার নাম কি বাবা?

শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র বানার্জ্জি।

"তোমার বাবা আজ ভাল তো?"

"হাঁ ভালই আছেন।"

"চল দেখি, তোর মা ও বাবা কেমন আছেন।" বলিয়া সাহেব তাহার হাত ধরিয়া লইয়া উপরে চলিলেন। খোকার হাত ধরিয়া সাহেব আসিতেছে দেখিয়া রোগী মনে করিলেন, ডাক্তার সাহেব আসিতেছেন, তিনি খোকার মাকে সড়িয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। খোকার মা পরদার আড়ালে যাইতেছিলেন—সাহেব তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া নতশিরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "বৌ দিদি মঙ্গল ত?"

বউ দিদি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কুমুদ"—তাহার মুখ হইতে আর কথা সরিল না। ঝর ঝর করিয়া দুই চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কুমুদের ও চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সেই দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু তাহার বউ দিদির হাতে পড়িয়া নীরব ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহার তপ্ত দেহ স্নিগ্ধ করিল।

রোগী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল "কে কুমুদ, ভাই আমার!" কুমুদ মাথা নত করিয়া নিকটে বসিল। সদাশিব বাবু তাহার রোগ-দুর্ব্বল হস্ত প্রসারিত করিয়া কুমুদকে কোলের কাছে টানিয়া আনিলেন। রুদ্ধ কণ্ঠে কুমুদ ডাকিল—"দাদা"

উচ্ছ্বসিত আবেগে বৃদ্ধের চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল, যেন হিমালয়ের পাষাণ স্তূপ হইতে ভ্রাতৃ স্নেহের মন্দাকিনী রজত ধারায় প্রবাহিত হইয়া বদ্ধ প্রাণের সমস্ত ক্লেদ ধুইয়া দিয়া যাইতে লাগিল। বহুক্ষণ উভয়ে বসিয়া অশ্রুজলে অতীত স্মৃতির তর্পণ করিল। অশ্রু জলে সকল মনোমালিন্য ধৌত হইয়া গেল। এই পবিত্র অশ্রুবিনিময়ের পর আর কাহারও মুখ হইতে কোন কথা ফুটিল না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

'সমস্যাপূরণ'

এখন যেমন ছেলেদের মধ্যে হেঁয়ালি ও ধাঁধাঁর প্রচলন আছে এবং তার উত্তর দেওয়া যেমন একটা নির্দ্দোষ ন্যূনাধিক সাহিত্যিক আমোদ, সাবেক কালেও তেমনই পণ্ডিতদের মধ্যে সমস্যা পূরণ একটা সাহিত্যিক আমোদ বলিয়া পরিগণিত ছিল। একজন কবিতার একটা বা দুইটা, কখনও বা আধটা মাত্র চরণ আবৃত্তি করিতেন, আর এক-জন তৎক্ষণাৎ বাকীটুকু যোগাইয়া একটা সরস-ভাব-ব্যঞ্জক-পূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া ফেলিতেন। যিনি যত শীঘ্র এবং সহজে, যত সরস কবিতা যোগাইতে পারিতেন, তাঁর তত বাহাদুরী ছিল। 'বালে কথং বোদিষি?' একজন হয়ত এই টুকু মাত্র বলিলেন; কে, কাহাকে, কিরূপ স্থলে এই প্রশ্ন করিতে পারে, ইহাই সমস্যা; আর একজন হয়ত শ্লোকটা পূরণ করিয়া একটা গভীর পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিয়া সমস্যাটা পূরণ করিলেন, 'এই নিবিড় অরণ্যে, গভীর নিশীথ সময়ে এই বিপদ-সঙ্কুল স্থানে, উন্মাদিনীর মত, হে বালিকে, তুমি কাহার জন্য, কেন রোদন করিতেছ?' ইহার নাম ছিল সমস্যা পূরণ।

জানি না, প্রাচীন সমস্যা-পূরক কবিদের কেহ জীবিত আছেন কিনা। জানি না, জীবিত থাকিলে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের আসরে নামিতে প্রস্তুত আছেন কিনা। কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি সমস্যা বাংলার মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতেছে; সুতরাং সমস্যা-পূরকের দরকার হইয়া পড়িয়াছে। কে যে এই সকলের পূরণ করিয়া দিবে, ইহাই হইতেছে প্রধানতম সমস্যা। আঁধার ঘরে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে কোন্ দিকে দরজা রহিয়াছে ঠিক করিতে না পারিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিতে হয়; অকস্মাৎ এই সকল সমস্যায় বিব্রত, আলোড়িত বঙ্গ-মস্তিষ্ক ও তেমনই কোন্দিক্ হইতে যে উত্তরের ঊষা কিরণ আসিবে ঠিক করিতে না পারিয়া কখনও বা উত্তরে, কখনও বা পশ্চিমে, কখনও বা নরওয়ের দিকে, কখনও বা ইংলণ্ডের দিকে দৃক্‌পাত করিতেছে। কেহ ২ আবার প্রাচীন সমস্যা-পূরক কবিদের ওয়ারিশ আধুনিক বঙ্গ কবিদেরই নিকট এই উত্তরের প্রত্যাশা করিতেছেন।

আমাদের কিন্তু মনে হয়, বাংলা দেশের প্রাণ হইতে এই প্রশ্নগুলি উঠিতেছে কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য, তাহাই সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা। মানুষের কারিগরিতে তৈয়ারি উষ্ণ-গৃহে অসময়ে এবং অস্থানে উদ্ভিদ্ উৎপাদনের মত, এই সমস্ত প্রশ্ন যে অস্থানে ও অকালে কাহারও ২ মস্তিষ্ক চিড়িয়া মাথা জাগাইতেছে না, তাহাই সকলের আগে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের নিজেদেরও সমস্যা আছে; নরওয়ের প্রশ্ন বিচার করার অবকাশ আমাদের এখনও হয় নাই। কতকগুলি প্রশ্ন যে কেহ ২ জাগাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা যে এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বাংলার প্রাণ হইতে যে তাহাদের উৎপত্তি হইতেছে, কোন অস্বাভাবিক হিম সেচনে মেরু প্রদেশের এই উদ্ভিদ্ গুলিকে উষ্ণ বাংলার মস্তিষ্কে যে উৎপাদিত করা হইতেছে না, তাহার বিচার হইয়াছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর বাংলা দেশই দিতে পারে; ইহার জন্য ইবসেন্ কিংবা বার্নার্ডসর সাক্ষ্য অনাবশ্যক।

ভিড়ে না মিশিয়া একটু দূর হইতে দেখিলে মনে হয় বাংলার মনটাকে একটা কুয়াসায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে; ক্ষীণ

রশ্মিপাত হইতে না হইতেই ইহার ভিতরে দ্রব্যমাত্রেই এক বিকট মূর্ত্তিধারণ করিয়া ফেলে। একবার রব উঠিল, বাঙ্গালী চিত্রাঙ্কনে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ; ছবি না আঁকাই বাঙ্গালীর উন্নতির যা প্রধান বাধা; সুতরাং ছবি আঁকা চাই। ভাল কথা. চিত্রাঙ্কন ললিত-কলার-অঙ্গ, তাহার চর্চ্চায় ললিত-কলার শ্রীবৃদ্ধি হইবে, সে ত আশার কথা। কিন্তু পাণ্ডারা ঠিক করিলেন, আলেখ্য দেবীর মন্দিরে ভারতীয়-পদ্ধতিতে প্রবেশ করিব, এবং অন্যকেও এ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে প্রবেশ করিতে দেখিলে সমাজ-চ্যুত করিব। তাহাই হইল; ফলে, ভারতীয় চিত্রবিদ্যা নামক জীবের জন্ম হইল। অনেকে তাহার উপাসক হইয়াছেন; রাজশক্তি তাহাকে স্বত্বশাসন দিয়াছেন ও খেতাবে সম্মানিত করিয়াছেন। 'সে ধর্ম্মটার ঈশ্বর হচ্ছে ভূত না পরব্রহ্ম,' তাহাই এখনও অনেকের বোধগম্য হয় নাই; তাঁদের বুদ্ধির দোষ, সন্দেহ নাই। ভারতীয়-চিত্র-বিদ্যা কুয়াসার ভিতরে যে সমস্ত দ্বৈপায়ন প্রসব করিতেছেন, বিশাল বুদ্ধি বা কালে সে গুলিকে চিত্র-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ সন্তান বলিয়া জগতের সম্মুখে প্রতিপন্ন করিয়া দিবেন, তাহাই দেখিবার জন্য আমরা বাঁচিয়া আছি। সে দিন আসিতে বিলম্ব নাই; এরই মধ্যে ইউরোপের কেহ ২ ইহাদের নূতনত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তত দূর অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত, দর্শনের সূত্রের মত টীকা করিয়া ইহাদের অর্থ বলিয়া দিতে হইবে। তথাপি, মানুষ আঁকিতে কেন ঈগল পক্ষী আঁকিতে হয়, কুয়াসার ভিতর অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তির অর্থ সতীত্বের না হইয়া মাতৃত্বের আলেখ্য কেন, সর্পাঙ্গুলি ও কম্বু নাসিকা কেন সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ ছবি;—এ যারা না বুঝিবে তারা তাদের সময় পার করিয়া জন্মিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় চিত্র-বিদ্যা বাংলার একটী শ্রেষ্ঠ-সম্পত্তি।

পণ্ডিতদের বড় বড় কথার অর্থ সব সময় বুঝা যায় না। নূতন পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রগুলির অনেকটীরই সরলতা সাধারণের নিকট অস্ফুট। তবে, সুখের বিষয় এই যে ইহাদের সকলেই এক একটা প্রশংসাপত্র নিয়া লোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়; একজন না একজন আগে হইতেই বলিয়া দেন, 'এখুব ভাল ছবি, ইহাতে এই এই ভাব অতি চমৎকাররূপে প্রকাশিত হইতেছে।' তা না বলিয়া দিলে লোকে যে কি অর্থে ছবিটি গ্রহণ করিত, বলা কঠিন।

আরব্য উপন্যাসের ধীবর মাছ ধরিতে গিয়া এক বদ্ধ-মুখ কলসী ধরিয়াছিল। ঔৎসুক্য-প্রণোদিত হইয়া যেই সে কলসীর মুখ খুলিল, অমনি চারিদিক পুঞ্জীভূত ধূমে ঘিরিয়া ফেলিল, এবং ক্রমে সেই ধূম হইতে এক বিশাল-কায় দৈত্য আবির্ভূত হইয়া ধীবরের তালুজিহ্বা সংলগ্ন করিয়া দিল। বাংলার মনটাকে যে 'ধূয়ায় ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তার মধ্যে যৌবনে যে কাব্যের উন্মেষ হয়, তাহার কিরণপাত হইতে না হইতেই অদ্ভুত সব কবিতা-দৈত্যের আবির্ভাব হয়; তাই দেখিয়া জন সাধারণের মুখ শুকাইয়া যাইতেছে এবং বুদ্ধির জড়তা-প্রাপ্তি ঘটিতেছে। আমরা যে সব কবিতার অর্থ বুঝি না তার জন্য কবিরা মোটেই দুঃখিত নন; ইংরেজ কবি মিল্টন তাঁর সময়ে বিশেষ আদর পান নাই; আমাদের কবিরা ও আশায় আছেন ভবিষ্যতে সোণার অক্ষরে তাঁদের নাম বাংলার গৃহে২ বিরাজ করিবে। কুয়াসার দ্বিতীয় লক্ষণ।

কলা-বিদ্যার দোহাই দিয়া বাংলা-সাহিত্যে এক নূতন পদ্ধতির আমদানী করা হইতেছে, কেহ২ খুব তেজের সহিত তার সাফাই গাহিতেছেন। বেশ্যা গৃহের নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারায় ও একটা ক্ষমতা ও একটা চতুরতার দরকার; সকলে কিছু তা পারে না। ইহাতে যে কল কৌশল নাই, তাহা কে বলে? কিন্তু সব রকম চাতুরীই ভদ্র সমাজে চলে কি? সমাজের নিম্নস্তরের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না এমন নয়; ইউরোপে অনেকেই সাহিত্যে ইহাদিগকে তুলিয়া নিয়াছেন; কিন্তু তাঁদের একটা স্পষ্ট নৈতিক উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যাদের তা নাই, তারা নিন্দিত। আর, ইউরোপের দোহাই সব সময়, সববিষয়ে সম্ভব নয়। সে দেশে রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পাণিগ্রহণের জন্য অনেক সময় পদস্থ ব্যক্তিরাও লালায়িত হয়েন—তাতে তাঁদের নিন্দা হয় না। এদেশে তা চলিবে কি? নজীর উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে উভয় দেশের সামাজিক অসমতার কথাটা মনে রাখিতে হয়। মানুষের হৃদয়ে যে পশু বিরাজ করে, তার পরিপূর্ণ তমোমূর্ত্তি যদি নিন্দা ও ঘৃণার জন্য সাহিত্যে উপস্থিত করা হয়, তা হইলে

একটা সদুদ্দেশ্য সাধিত হয় ; তা না করিয়া যদি তাকে বিবিধ বর্ণে চিত্রিত করিয়া, নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া একটী প্রশংসনীয় একটী উপাস্য চিত্র রূপে অবতীর্ণ করা হয়, তাহা হইলেই ত আমাদের সঙ্গে কলহের সৃষ্টি হইবে। উভয়টাতেই কল-কৌশল থাকিতে পারে ; কিন্তু উভয়ের ফল এক নয়। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ;—অন্তিমে বেশ্যা-লোক প্রাপ্তিকেই আমরা জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া নেই নাই ; কল-কৌশলের দোহাই দিয়া বেশ্যা চিত্রকে সাহিত্যের উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতেও নারাজ।

কেহ২ আছেন, সহিত্য সেবা তাঁদের নিষ্কাম লীলা ক্রীড়া, আনন্দ—এ ছাড়া সাহিত্যে আর কিছু আশা করা বৃথা। পতিতাদের নিবিড় ভাব, অপাঙ্গ দৃষ্টি, বক্র-হাসি— এ সব ভাবিয়া এ সবের চিত্র আঁকিয়া কারও যদি আনন্দ হয়, তবে সাহিত্যে তার স্থান হইবে না কেন ? তাদের 'লোলাপাঙ্গৈ যদি ন রমসে লোচনৈ র্বঞ্চিতোঽসি'। আনন্দ হিসাবে ইহাতে দোষ কি ? কাব্য ও সাহিত্য একটা ক্রীড়া, একটা লীলা,—আনন্দ ছাড়া তার আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে ? ঠিক ; শিশু এবং পশু উভয়েই এই কথা বলিতে পারে ; কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানুষের কাজে কোন উদ্দেশ্য নাই— একথাটা নূতন না হইলেও সকলে বুঝিবে না।

ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাসে যে সব খুনখরাবীর বর্ণনা থাকে তাতে কি কোন রসের অনুভূতি হয় না, তাতে কি কোন কল কৌশল নাই ? কিন্তু ডাকাত বা খুনীর সাহসকে যদি কেহ শৌর্য্যের উৎকর্ষ বলিয়া উপস্থিত করেন, তাহা হইলে সকলে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি ?

মানুষের মনে মূল্য নিরূপণের একটা মাপ-কাঠি আছে। কাব্যেই হউক, আর বাস্তব জীবনেই হউক, মানুষের ক্রিয়ার বিচার করিবার সময় এই মাপ কাঠি অনুসারে মূল্য-নিরূপণ না করিয়া উপায় নাই। রুচি, আনন্দ বা বিমর্ষ, ভাল লাগা বা ভাল না লাগা—ইহাদেরও একটা নৈতিক মূল্য আছে। সব আনন্দের সমান মূল্য নয় ;—বেশ্যা-চিত্রের আনন্দ আর দেবী-চিত্রের আনন্দ এক জিনিস নয়। এই কথাটা ভুলিয়া গিয়া কেবল বর্ণনা চাতুর্য্য, কেবল অঙ্কন. কৌশলকেই যে আমরা বড় করিয়া দেখিতেছি, তার কারণ ইউরোপের কলা-শিল্পের এক বিকট মূর্ত্তি কুয়াসায় আচ্ছন্ন আমাদের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। গণিতবিদ্ যখন মিল্টনের কাব্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ইহাতে কি প্রমাণ করিতেছে" ; তখন তার সাহিত্য-রস আস্বাদনের একান্ত অক্ষমতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। সাহিত্য কিছু প্রমাণ করে না, ত্রিভুজের যে কোন দুই বাহু যে তৃতীয় বাহু হইতে বৃহত্তর—এই সত্য নিয়া কোন কবিতা হয় না— কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্য যে কেবলই অবাস্তব জিনিসের বিহার-ভূমি এমন নয়। ইহাতেও সত্য আছে ; সেটা অনুভূতির সত্য, আদর্শের সত্য। এবং এই সত্য আছে বলিয়াই তার মূল্যের বিচার হইয়া থাকে,—তার ভাল মন্দ আছে। সাহিত্যের সত্য মাত্র আনন্দ নয় ;—কারণ আনন্দ মাত্রেরই এক মূল্য নয়। ভাল আনন্দ যে সাহিত্য দেয়, তাহাকে ভাল সাহিত্য বলিব, এবং তার বিপরীতটাকে মন্দ বলিতে ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই।

সাহিত্য যদি কোন অনিচ্ছাকৃত অঙ্গবিক্ষেপের মত হইত তাহা হইলে তার ভাল-মন্দের কোন বিচার সম্ভব হইত না। সাহিত্য যদি কেবল অনিচ্ছা-দৃষ্ট স্বপ্ন হইত, তাহা হইলে কেবল আনন্দ বা তার অভাব দিয়াই তার মূল্য নিরূপণ করা যাইত। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিয়া সাহিত্যে আনন্দ-সৃষ্টি করিতে চায়, সুতরাং তার একটা নৈতিক ভাল-মন্দ আছে। কোন একটা রস ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই যে লেখাটীকে ভাল বলিব, এমন কোন নিয়ম নাই ; সে রসের অনুভূতির মূল্য সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন হইলেও ইঙ্গিত থাকা দরকার। পিশাচ-প্রবৃত্তিকে খুব ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে কলা-কৌশলের পরিচয় দেওয়া হয় ; কিন্তু সেটাকে এমনই ভাবে ফুটাইতে হইবে যে মানুষের তার প্রতি আসক্তি না জন্মিয়া ঘৃণারই উদ্রেক হয়। তা যদি না হয়, তবে তাকে মন্দ না বলিব কেন ? লেখক যদি আসিয়া বলেন, 'এই ভাবে অঙ্ক-নেতেই আমার আনন্দ হয়.' তাহা হইলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি ' আপনার আনন্দের রকম আপনার চরিত্রকেই প্রকাশ করিতেছে।'

কৌশল দেখ, নীতি দেখিও না,—এই বলিয়া যাঁরা আমাদের মুখ বন্ধ করিতে চান, তাঁরা অসম্ভব উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন। সাপের ল্যাজ ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘনে

কৌশল আছে, কিন্তু এ ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম, ইহার উদ্দেশ্য অনুসারে মূল্য হইবে। এই কথাটা আমরা কিছুতেই ভুলিতে চাই না। কবি বলিবেন, উদ্দেশ্য আবার কি? তোমাকে আনন্দ দিতে চাই, এবং আমারও তাতে আনন্দ হয়।' আমরা বলিব, 'আনন্দের জাতিভেদ আছে, আপনি কি প্রকার আনন্দ দেন, তাই জানিয়া আপনাকে বিশেষণ দিব।' ইহাতে যদি কেহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবে বলিব 'কুয়াসার ভিতর আপনারা এ কি দেখিতেছেন!'

কিন্তু এই কুয়াসায় আচ্ছন্ন বাংলার মনে সবচেয়ে বিপুল-কায় যে দৈত্যের আবির্ভাব হইয়াছে, সেটা কতক গুলি সমস্যার সমষ্টি। আমরা যে বিবাহ করিয়া সংসার-বাস করি, এটা একটা প্রবীণ সমস্যা। প্রকৃতিতে কোথাও স্থায়ী বিবাহ-বন্ধন নাই। মুসলমান আইনে 'মু'তা-বিবাহ নামক একপ্রকার অস্থায়ী দিন কয়েকের জন্য বিবাহের ন্যায্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পশুপক্ষীর ভিতর এর চেয়ে বড় কোনপ্রকার বিবাহ দেখা যায় না ; তাদের মিলন শুধু দিন কয়েকের জন্য। কিন্তু স্থায়ী বিবাহ মানুষের সমাজের বিশেষত্ব ; মানুষই ইহার সৃষ্টি করিয়াছে। রুশো বলিতেন "ভগবান সবজিনিসই সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; মানুষ তাহাতে হাত দিয়াই যত অনিষ্টের উৎপাদন করিয়াছে।" বিবাহ-বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া মানুষ যে কি অনিষ্টের জনক হইয়াছে, মানুষ যে এখনও তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য। গৃহ আমাদের "পুতুলের ঘর,' স্ত্রী আমাদের পুতুল। স্ত্রীও যে মানুষ, তারও যে একটা আত্মা আছে, তারও যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, একথাটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাচীতে এটা বিশেষভাবে সত্য। এবং প্রাচ্য দেশে জন্মিয়াছিল বলিয়াই খ্রীষ্টান ধর্ম্মেরও প্রথম অভ্যুদয়ের সময় স্ত্রী ও পশুকে এক শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছিল : বিশ্বাস ছিল, এ উভয়েরই আত্মা নাই। হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রী শূদ্র এক শ্রেণীর জীব :—আত্মা আছে বটে, কিন্তু পদপাঠে কিংবা প্রণব উচ্চারণে কোন অধিকার নাই। পাতিব্রত্যের যে ধারণাটা হিন্দু সাহিত্য এত করিয়া ফেলাইয়া তুলিয়াছে, তাতে স্ত্রী যে একটা ব্যক্তি, তার যে একটা পৃথক সত্ত্বা আছে, তার যে কর্ম্মের অধিকার ও দায়িত্ব আছে, সে যে ধর্ম্মাধর্ম্মাচরণে সমর্থ, তারও যে আত্মার উৎকর্ষ-অপকর্ষ হইতে পারে,—একথাটাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। 'পতিরেকো গুরু স্ত্রীণাম্,' পতির জীবনে তার অস্তিত্বের ষোল আনা একেবারে ডুবাইয়া দেওয়াই স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইল। পতি গুণী হউক, নির্গুণ হউক, পণ্ডিত হউক বা মূর্খ হউক, অধার্ম্মিক হউক কিংবা ধার্ম্মিক হউক, গরু হউক কিংবা মানুষ হউক, কায়মনোবাক্যে তাহাতে নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

এই বন্ধন সৃষ্টিতে পুরুষের সতর আনা কর্ত্তৃত্ব ছিল। সে তাহার নিজের দিকটা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছে। তাহার বেলায় এইরূপ কোন বাঁধাবাধি নিয়ম নাই। সে খুঁজিয়া নিয়া পছন্দ মত সঙ্গিনী গ্রহণ করিবে, কিংবা গৃহীত সঙ্গিনী অপছন্দ হইলে অন্য সঙ্গিনী গ্রহণ করিতে পারে। সে কখনও নিজেকে হারাইবে না। সে পুরুষ, সে কর্ত্তা, তার ধর্ম্মাধর্ম্ম পৃথক্, তার উন্নতি অবনতি আলাদা,—জীবনপথে খেলার সামগ্রীর মত যে স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছে, স্ত্রীতে তার আত্মা সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে না।

পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষের অধিকার অনেক খর্ব্বীকৃত হইলেও, সেখানেও পুরুষই পরিবারের কর্ত্তা,—স্ত্রী তাহার অধীন। স্ত্রীকে যে ভালবাসিতে পারে, আয়না গয়না দিয়া সাজাইতে পারে, তাহাকে রাস্তায় বেড়াইবার স্বাধীনতা দিতে পারে, তাহাকে বাজার সওদা করিবার অধিকার দিতে পারে;—কিন্তু তথাপি সে তাকে পুতুলের বেশী কিছু মনে করে না। সুন্দর হিসাবে, আমোদের সামগ্রী হিসাবে, স্ত্রীকে সে কতই না আদর করে; কিন্তু সব সময় বলা কঠিন সে স্ত্রীর দেহটাকে ভালবাসে, না তার আত্মাকে ভালবাসে। স্ত্রীরও যে প্রাণ আছে—স্ত্রীরও যে বুদ্ধি আছে, সেও যে নীতি ধর্ম্মের অধিকারী, এ কথা মনে রাখিয়া পুরুষ স্ত্রীর আত্মার সম্মান করে কিনা সন্দেহ। পরিবারের যে বন্ধন তাতে স্ত্রীর বুদ্ধিবৃত্তির, তার নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতির সম্পূর্ণ সুবিধা কুত্রাপিও দেওয়া হয় না। রান্না-বান্না, গৃহস্থীর কাজ কর্ম্ম দেখা—সেবা, নারীরত ধর্ম্ম। কিন্তু নারী যে মানুষ ; নিজের পাপপুণ্যের জন্য যে সে দায়ী, সে যে শুধু ভোগের সামগ্রী নয়,—একথাটা কেহ মনে করে না। পুরুষও যদি নিজেকে স্ত্রীর অস্তিত্বে একেবারে ভুলাইয়া দিত,

তা হইলেও না হয় বুঝিতাম পুরুষ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিয়াছে। কিন্তু "ঘরে-বাইরে" ত সমান অধিকার নয়। এটা কি অন্যায় নয়?

দার্শনিক-ভাবে এই কথার আলোচনা পূর্ব্বেও হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক মিল্ স্ত্রীর দাসীত্বের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তেজের সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "একজন সামান্য ক্রীত-দাসী প্রভুর যে লালসা চরিতার্থ করিতে বাধ্য নয়, পরিণীতা স্ত্রীর সহস্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই ভোগের সামগ্রী না হইয়া উপায় নাই।—বিবাহে স্ত্রীকে এতই খর্ব্ব করিয়া ফেলে। মিল্ এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। পুরুষ এবং স্ত্রী, উভয়ই ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্র সমান অধিকার পাইবার উপযুক্ত; পূর্ণবিকশিত বুদ্ধিশক্তি নিয়া চারিদিক ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিয়া যখন উভয়ে উভয়ের মনের ঐক্য অনুভব করিবে, তখনই বাস্তবিক বিবাহ হইতে পারে; তা না হইলে, স্ত্রীনাম দিয়া ঘরের বাঁদী রক্ষা করা হইতে পারে মাত্র।

দার্শনিক বিচারে তেমন অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। সেখানে যুক্তিতর্কের কথা, বিচারের কথা, জ্ঞানের কথা;—সকলে তাতে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু কাব্যের উন্মাদক আলোকে, রঙ্গীন বেশে যখন ঐ প্রশ্নের উত্থাপন করা হয়, তখন সকলেই টক্ করিয়া তাহা ধরিতে পারে। মিলের এই দার্শনিক বিচারের কোন প্রতিধ্বনি বাংলা-সাহিত্যে উঠিয়াছে বলিয়া জানি না। ঐ বই খানা পড়িয়া কেহ কোন সাময়িক প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু মিল্ যেমন তাঁর যুক্তিগুলিকে একটা স্থায়ী আকার দিয়া পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন, তেমন চেষ্টা কেহ এদেশে করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু নরওয়ের নাট্যকার হেন্‌রিক ইব্‌সেন্ এই প্রশ্নকে নাটকাকারে প্রকাশ করিবার পর দেখিতেছি অনেকের তাহা অনুকরণ করিবার জন্য হস্ত-কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইয়াছে।

হেন্‌রিক্ ইব্‌সেনের নায়িকা নোরা অতি সুখের সংসার পাতিয়াছিলেন। স্বামী তাহাকে প্রাণের চেয়ে ভাল বাসেন; তিনটী ছেলে মেয়ের তিনি মা; সন্তানদের কল-হাস্যে তাঁর গৃহ মুখরিত। তিনিও স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসেন। সাময়িক অর্থাভাবের পর আজ তাঁহার সংসার সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। আজ তাঁহার স্বামীর নিকট কত জন চাকরীর জন্য লালায়িত। ক'জনের ভাগ্যে এরূপ সুখ ও সম্মান ঘটে? কিন্তু পূর্ব্বে যখন তাদের তেমন অর্থের সংস্থান ছিল না, তখন একবার তাঁর স্বামী মরণাপন্ন কাতর হইয়াছিলেন; পিতাও তাঁহার তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কোন দিকে সাহায্যের সম্ভাবনা না দেখিয়া, তিনি স্বামীকে না জানাইয়া, পিতাকে না জানাইয়া, স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য বাপের নাম জাল করিয়া এক ব্যক্তির নিকট টাকা ধার করিয়াছিলেন। স্বামী ভাল হইয়া উঠিলেও তিনি কখনও স্বামীর নিকট একথা প্রকাশ করেন নাই। পিতা সেই কাতরেই মারা যান। সুতরাং তাঁহার এই জালের বিষয় আর কেহ জানিতে পারে নাই। কিন্তু যে ব্যক্তির নিকট হইতে ধার করিয়াছিলেন, সে অনুসন্ধানে তার সন্ধান পাইয়াছে। সেই ব্যক্তি আজ চাকরী রক্ষার জন্য নোরার স্বামীর নিকট উপস্থিত। স্বামী চরিত্র-হীনতার জন্য কিছুতেই তাহাকে রাখিতে সম্মত নন। অগত্যা ঐ ব্যক্তি নোরাকে সুপারিশ করিল। নোরা বুঝিলেন তাঁর স্বামীর কর্ত্তব্যজ্ঞান স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার চেয়ে বড়,—নোরার অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। লোকটা অতঃপর নোরাকে জানাইয়া বলিল, 'যেরূপেই হউক, আমার চাকরী রক্ষা করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ আপনি যে জাল করিয়াছেন প্রকাশ করিয়া দিব।' নোরার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাধ্য হইয়া স্বামীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে হইল। স্বামী তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। নোরা ভাবিলেন স্বামীকে ভালবাসি,—তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য এই কাজ করিলাম, তথাপি স্বামীও ইহা নিন্দনীয় মনে করেন।' পিতামাতাকে ভরণ পোষণের জন্য রত্নাকর ডাকাতি করিত; সেও জানিয়া ছিল তাঁরা তার পাপের ভাগী নন, এবং ডাকাতি যে পাপ তাঁরাও তা মনে করিতেন। নোরারও আজ এই জ্ঞান লাভ হইল। তিনি বুঝিলেন, 'আমি এতকাল স্বামীর স্নেহের পুত্তলী হইয়াই রহিয়াছি; ভাল মন্দের ফল সম্পূর্ণ আমাকে ভোগ করিতে হইবে, অথচ এই ভাল মন্দ বিচারেরই ক্ষমতা আমার জন্মে নাই। এই পুতুলের ঘরে আর বাস্তব্য করিব না।'—এই

বলিয়া তিনি স্বামীর নিকট বিদায় নিলেন; স্বামীও সন্তান-গুলিকে ত্যাগ করিয়া নিশার অন্ধকারে তিনি মিলাইয়া গেলেন। যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন 'যেদিন তোমাতে আমাতে আত্মার সমতা জন্মিবে, সেই দিন আমাদের বাস্তবিক বিবাহ সম্ভব; কেবল পুতুলের আদর পাইয়া আমি আর তোমার সংসারে থাকিতে চাই না।'

আমাদের সংসারে হইলে স্ত্রী এস্থলে কারও নাম জাল করিবার কথা ভাবিতেন কিনা সন্দেহ; হয় ত, দুই এক খান গয়না বন্ধক দিয়াই টাকা ধার করিতেন। নোরার বিবাহ না হইলেও, জাল করা অন্যায় এই ভাব যে জন্মিত, তাহা জানা নাই। আর, স্বামীপুত্র ত্যাগ করিয়া গিয়া নোরা কোথায় যে এই নৈতিক উন্নতি সাধন করিবেন, ইব্‌সেন্ তাহা বলেন নাই; অবশ্যই কাব্যের হিসাবে তাহা বলা দরকারও নয়; কিন্তু প্রশ্ন যখন উত্থাপিত হইয়াছে, তখন উত্তর থাকা উচিত।

ইব্‌সেনের আরও অনেকগুলি নাটক আছে। এবং প্রায় সব গুলিতেই সমাজের কোন না কোন সার-হীনতার প্রতি কটাক্ষ রহিয়াছে। সে গুলির মর্ম্ম এদেশে এখনও কেন যে আসে না, আর, নর-নারীর সম্বন্ধটার কথাটাই কেন যে এত প্রবল হইয়া উঠিল, ভাবিবার বিষয়। সমাজে যাঁরা নেতা হন, যাঁরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হন—তাঁরা যে অনেক সময় কি প্রকাণ্ড প্রতারণা করিয়া থাকেন—কি এক মিথ্যা ও ছলনার উপর তাঁদের যশঃ ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়, ইব্‌সেন্ একটী নাটকে তা দেখাইয়াছেন। সে প্রতারণা কি এদেশে নাই? পর কে ঠকাইয়া, টাকার জোড়ে অথবা পদের মাহাত্ম্যে অন্যের মুখ বন্ধ করিয়া এ দেশের লোক কি বড় হয় না? কিন্তু তাদের অতীত ইতিহাস ত ইচ্ছা করিয়াই লোপ করিয়া দেওয়া হয়। পাপীর আর উদ্ধার নাই, এ বিশ্বাস আমরা করি না। কিন্তু পাপীর উদ্ধার অনুতাপে—সে নিজে যখন বুঝিবে যে পাপ করিয়াছি, পশ্চাত্তাপ যখন তাহাকে দগ্ধ করিয়া দিবে, তখনই সে শুদ্ধ হইয়া পবিত্রতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। 'লোকে জানিলে নিন্দা করিবে, সুতরাং গোপন করিয়া যাই'—ইহার নাম অনুতাপ নয়,—ইহা হইতে পবিত্রতার সৃষ্টি হয় না। অথচ এই গোপন করিয়াই যে কতজন ঋষিত্ব, দেবত্ব এবং নেতৃত্ব লাভ করিতেছেন, আত্ম জীবনীতে তা না থাকিতে পারে, ইতিহাস তা না জানিতে পারে, কিন্তু অন্তর্যামী ত জানেন! যাঁরা করেন তাঁরা নিজেরা ত জানেন! ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ ভগবানের কাছে সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু সমাজে কি তাই প্রায় একমাত্র উপায় নয়?

ছেলে আগে বানান শিখিবার সময় শিখিত 'প্রবঞ্চনা করিও না।' এখন সেগুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে,—এখন তাকে শিখান হয় গরুর কয়টা পাকস্থলী। ভালই হইয়াছে; কারণ, সে পড়িত 'প্রবঞ্চনা করিও না,' আর সমাজের কাছে শিখিত 'প্রবঞ্চনা করিও।' নিরিবিলি জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত সকলেই বলিবে, 'কাজটা ভাল হয় নাই।' কিন্তু প্রবঞ্চনা করিয়া যে বড় হইয়াছে, তার বাড়ীতে লোকের অভাব নাই। সমাজ ও সাহিত্য তাকে কত উচ্চে যে তুলিয়া ধরিবে ঠিক পায় না। কেন, এটা কি সমাজের সার-হীনতার পরিচায়ক নয়? এটা কি একটা সমস্যা নয়? ইব্‌সেন্ ত এটাও বাদ দেন নাই! তোমাদের বেলা ওদিকে যে কেউ ঘেঁস না! কার ভয়, কিসের আশঙ্কা? যদি বল 'আমার লীলা;—কোন্ দিকে কখন মন চলে, তার কি কোন হেতু আছে?' আমি বলিব, 'তা-হ'লে একটু ভাবিয়া লই।'

আমাদের সমাজে কোন সমস্যা নাই, একথা বলার মত অবোধ আমরা নই। কিন্তু তাই বলিয়া মূলধনী ও শ্রমজীবীর সম্বন্ধে, কিংবা স্ত্রীলোকদের ভোট ও শাসনের অধিকার বিষয়ে, কিম্বা শিল্প-মূল সমাজ (industrialism) ও ক্ষাত্র-মূল সমাজ (militarism) প্রভৃতির দ্বন্দ্ব—এই সকল বিষয়ে কোন সমস্যা যে এখন বাংলায় উঠিতে পারে, এমন ত সম্ভব দেখি না। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ ও যে আমাদের একটা গুরুতর, প্রাচীণ, জটিল, সমস্যা এমনও ত মনে হয় না।

কবি বলিবেন, 'আমি কি তোমাদের সামাজিক সমস্যার বিচার করিতেছি! নরনারীর সম্বন্ধের যে একটা আদর্শের অনুভূতি আমার মনে জাগিয়াছে, তাহাই আমি ব্যক্ত করিতেছি। কাহারও যদি সে আদর্শ সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, ভাল কথা; কাহারও যদি তা না ঘটিয়া থাকে, আর তিনি যদি সে দিক অগ্রসর হইতে চান, তবে আমি বাধা দিবার কে?

আর কেহ যদি মোটেই না যেতে চায়, তা হইলেও ত আমি তাকে প্রাণোদিত করিতে চাই না।' কিন্তু প্রবীণের মুখে একথা শোভা পায় না। কবি যদি কেবল নিজের জন্য লিখিতেন তা হইলে, তা ছাপা হইত না। সমাজের জন্য লিখা হয়, সমাজে প্রচারিত হয়, অথচ, সমাজে তার ফল কি হইবে, তাহা আমি ভাবিব না, লেখক এই কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারেন কি না বিবেচ্য।

ইহা যদি ইউরোপের প্রশ্নরূপে বাংলা-সাহিত্যে আসিত তাহা হইলে, বর্ণিত বিষয়ের স্থান হইত অন্যত্র; বাংলার পরিবারে, "বাঙ্গালী" স্ত্রীর পত্রে তাহা ফুটাইয়া তুলার চেষ্টা হইত না। বাঙ্গালী স্ত্রী ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, বিকশিত বুদ্ধির জাল ফেলিয়া, জাল-রশ্মির আকর্ষণে স্বামী রত্ন, ছাঁকিয়া লইবেন—সে সম্ভাবনা এ দেশে আছে কি? তা না হইলে, এ অবস্থার প্রশংসা কেন? যদি বলা হয়, সম্ভাবনা করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে আমাদের একমাত্র উত্তর 'সময় আসে নাই।'

আমাদের কেবল জিজ্ঞাস্য 'ইহা কি একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা নয়?' ইউরোপে যে প্রশ্নটা উঠিয়াছে, আমাদেরও যেরূপেই হউক, সেই প্রশ্নটা জাগাইয়া তুলিতে হইবে, নইলে সমাজ অধঃপাতে যাইবে, এমন কোন যুক্তি আছে কি? ইউরোপের সমাজকে এমন অনেক প্রশ্ন আলোড়িত করিতেছে যাহা এদেশে কল্পনার অতীত। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য অতীত ইতিহাস ও বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের মত সে গুলি আমরা পাঠ করিতে পারি সেই সমস্ত বিষয়ে চর্চ্চা ও বিচার করিতে পারি, তর্কে সে গুলি সমাধানের ও চেষ্টা করিতে পারি, এবং আমাদের দেশে যাতে ঐ সব বিপদ্ উপস্থিত না হয় তারও চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু এগুলি আমাদেরও বর্ত্তমান সমস্যা—এ কল্পনা যে শশ-শৃঙ্গের সৌন্দর্য্য বর্ণনা নয় তা কি করিয়া বলিব! দুনিয়ার কোন খবর না রাখা মূর্খতা; কিন্তু যে খবর পাই তাহাই আমার খবর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ মনে করা যায় না, সুতরাং আপাততঃ ইহা গুরুতর মূর্খতা। ইউরোপীয় সমাজে শ্রমজীবী-নিম্নশ্রেণীদের নিয়া একটা প্রকাণ্ড সমস্যা উঠিয়াছে;—এ দেশের সে প্রকার শ্রমজীবী একটা শ্রেণীই নাই, সুতরাং সে প্রশ্নটা এখনও এদেশে উঠিবার সময় আসে নাই। যদি কেহ ঐরূপ একটা আন্দোলন বিপজ্জনক মনে করেন, তবে তাঁর উচিত যাতে ঐ প্রশ্ন উঠিবার মত অবস্থা এ দেশে না আসিতে পারে, তার চেষ্টা করা। কাব্যে এবং উপন্যাসে ঐ অবস্থার বিপদের দিকটা ফুটাইয়া তুলিলে মনে করিতে পারি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কাজ করা হইল; যদিও অবশ্যই যারা শ্রমজীবীদের ভাগ্য বিধাতা হয়, সেই ব্যবসায়ী মূলধনীদের উপন্যাসে উত্তেজিত হওয়ার অভ্যাস কম।

নর-নারীর সম্বন্ধটা বাংলায় একেবারে নিখুঁত একথা কেহ বলে না। কিন্তু ইব্‌সেনের প্রশ্ন এখনও বাংলায় উঠিবার সময় হয় নাই। বাঙ্গালী স্ত্রী যে স্বামীর নিকট এক খান চিঠি লিখিয়া থুইয়া পুরীতে গিয়া সমুদ্রের হাওয়ায় আত্মোন্নতির চেষ্টা করিবেন, ইহা সুঘট নহে। বাংলার বাল বৈধব্য, বাংলার মেয়ের বিয়ে—জটিল সমস্যা; সে গুলির দিকে মন দিলে মনে করিতাম দেশের কথা ভাবা হইতেছে; তা না করিয়া পরের সমস্যার আবর্ত্তে আত্মহারা হওয়া পৌরুষ নাই।

ইব্‌সেন 'পুতুলের ঘর' নামক নাটকের নায়িকা নোরার কর্ত্তব্য জ্ঞান—মানুষ হিসাবে নিজের দায়িত্ব জ্ঞান ভাল করিয়া জন্মে নাই। ইব্‌সেন হয়ত তা হইতে দেখাইতে চান যে বিবাহে নারীকে এতই খর্ব্ব করিয়া ফেলে,—পুরুষের কৃত্রিম ভালবাসা নারীর মনের পূর্ণ বিকাশের এতই অন্তরায় জন্মায় যে নারী মনুষ্যত্ব হারাইয়া একটা কৃত্রিম পুতুলের মত পুরুষের স্নেহের নিকট নিজের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দেয়। সূর্য্য হইতে সূর্য্য-তাপে উত্তাপিত বালুকার তেজ বেশী। বাংলায় ইব্‌সেনের অনুকরণে পরিণীতা স্ত্রী দেশের নায়ক ও উপনায়কদের সঙ্গে মিশিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে তাদেরই একজনকে তিনি স্বামীর চেয়ে বেশী পছন্দ করেন। পরে, একবার বন্ধুর সঙ্গে পুরীতে হাওয়া খাইতে যাইবেন কি না দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম যে দেশে দেখিয়া শুনিয়া বাছিয়া নিয়া পূর্ব্ব পরিচয়ের পর বিবাহ হয়, যে দেশে বিবাহ-ভঙ্গের রীতি আছে, যে দেশে স্ত্রীদের অনেক বেশী স্বাধীনতা আছে, সে দেশেরও কবি বিবাহের পর বিশ্বের হাটে যাচাই করিয়া স্বামীর চেয়ে অন্যকে বেশী ভালবাসা যায় কি না দেখিবার অধিকার স্ত্রীকে

দিতে লজ্জা বোধ করিয়াছেন; আর, দেশে সমাজের কেন্দ্রীকৃত শক্তি স্ত্রীপুরুষকে একত্র মিলাইয়া দেয়, যেখানে বিবাহ ভঙ্গের সুবিধা নাই, যে দেশে বিবাহের পর স্ত্রীকে জানিবার সুবিধা দেওয়া হইতেছে, তিনি স্বামীর চেয়ে অন্তকে বেশী পছন্দ করিতে পারেন কিনা। অবশ্যই ইহা হইতে প্রমাণ করা যাইবে যে না জানিয়া শুনিয়া বিবাহ করা একটা ভুল, তা হইলে ভবিষ্যতে মনের অমিল হইতে পারে এবং তা হইতে পারিবারিক শান্তি ও অন্তর্হিত হইতে পারে; সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে পরিচয় থাকা উচিত, উভয়েরই বিবাহের পূর্ব্বে বুঝা উচিত যে জীবনে তাদের লক্ষ্য ও লালসা এক, সুতরাং একত্র তাদের অবস্থিতি সুখের হইবে। মানিলাম এ অতি খাঁটি কথা; কিন্তু মনুষ্যত্ব আর অভিজ্ঞতা শেষ করিয়া জীবনের শেষ অধ্যায়ে উপস্থিত হইয়া বিবাহ করি না, বিশেষ সমস্ত লোক এক স্বয়ম্বর সভায় একত্র করিয়া তা হইতে এক জনকে বাছিয়া নিয়া ত আর কেহ বিবাহ করিতে পারে না। জানিয়া শুনিয়া বিবাহের পরও ত এ অনুভূতি হইতে পারে যে এর চেয়ে আর এক জন ভাল সঙ্গী হইতে পারিত। তখন কি হইবে? আমেরিকায় স্বামীর ঘুমের সময় নাক ডাকে, কিংবা তিনি রোজ স্নান করেন না, কিংবা তিনি অত্যধিক বাইবেল পড়েন, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণের অনুমতি পান। এতটা সুবিধা আমাদের এখানে সম্ভব হইবে কি?

তার পর, কেবল সম্ভব অসম্ভব কিংবা ভাল মন্দের কথা হইতেছে না। মাঝে মাঝে যে কৌশলের দোহাই শুনি, সে দিকেও দৃকপাত করিতে হয়। এ স্বামী অথবা এই স্ত্রী আমার জীবনের ধারার সঙ্গে ঠিক মিলিবে না—এই অনুভূতি নানা প্রকারেই আসিতে পারে। যদি ইহাই দেখান উদ্দেশ্য হইত যে আমাদের সহসাকৃত বিবাহে অনেক সময় মনের মিল হয় না এবং পারিবারিক সুখ ও শান্তি জন্মিতে পারে না, তা হইলে ত অন্য রকমে ও দেখান যাইত যে বিবাহের পর স্বামী বা স্ত্রী বুঝিতে পারিতেছেন যে উভয়ের মন ঠিক এক ছাঁচে ঢালা নয়। পর-পুরুষের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস রহস্যালাপ করিয়া স্ত্রী বুঝিতেছেন ইহাদের একজনের প্রতি তাঁর মনের টান বেশী;—আবার পুরুষদের ও কেহ স্ত্রী-পুরুষের আদর্শ সম্বন্ধ বিষয়ে নানা রূপ আলাপন ও গ্রন্থ পাঠ করিতে দিয়া এই মনের টানের সৃষ্টির সহায়তা করিতেছেন;—এরূপ একটা দৃশ্য বাঙ্গালী পরিবারে ঘটিতেছে, বাঙ্গালী পাঠকের কাছে কি তাহা ভাল লাগিবে?

সুতরাং খুব যে একটা অবহেলার অনুপযুক্ত সমস্যা আলোচনা বাংলা সাহিত্যে আরম্ভ হইয়াছে এমনত বোধ হয় না। আপাততঃ বুঝিতে পারিতেছি না, ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিলে সুখী হইব। আমাদের কিন্তু মনে হয়, অনেকেই ভূমি হইতে ছিন্নমূল তরুর মত অথবা বড় গাছের গায়ে পর-গাছার মত, সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক-হীন হইয়া হাওয়ার উপর দুর্গ-নির্ম্মাণ করিতেছেন। নীচে, দৃঢ়, সম্বদ্ধ সমাজের প্রাণে কি বাসনা জাগে, কি চিন্তা, কি সমস্যা তাহার মনকে আলোড়িত করে, তাহার দিকে দৃকপাত না করিয়া হাওয়ায় উড়িয়া যে সব প্রশ্নের বীজ অন্য ভূমি হইতে আসে সেগুলিকেই সমাজদেহে শিখর মেলিবার সুবিধা তাঁরা করিয়া দিতে চান। তাঁরা ভুলিয়া যান, এ ভূমি এখনও সে বীজ গ্রহণের উপযুক্ত হয় নাই, কখনও হইবে কিনা, তাও জানা নাই। বিদেশের এই সমস্যা এদেশের সমাজে বিষের কাজও করিতে পারে। এ সমাজের ভূমিতে যে সব সমস্যা-তরু আপনা হইতে এবং সহজে জন্মিতেছে সে গুলির প্রতি দৃষ্টি করাই কি বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়? ইচ্ছা মত বাগান করার মত মানুষের মনকে গড়িয়া তুলা যায় না। অস্বাভাবিক উপায়ে জোর করিয়া কোনও সমস্যার বীজ এখানে বপন করায় হানি ছাড়া লাভের আশা কম।

———

সন্ধ্যায়।

শয়ন করে তৃণের পরে
নয়ন করে নত
চাহিয়া আছি দীঘির কালোজলে,
যেখানে তারি সুনীল বারি
অনিল--অনাহত,
রতন রচা কুমুদ উতপলে।
দীঘির পরে বনের ছায়া
নিবিড় হয়ে আসে
ঘরের পথে ফিরিতে যদি হয়,
একটু হাসি আমারো আজি
কমল-দল-প্রাশে
অমল হয়ে যেনগো ফুটে রয়।

রবির আলো বাসে কি ভালো
ফুলের হাসিটিরে,
ধরণী বুঝি রবিরে ভালবাসে ?
তপন-হীনা কেঁদেছে সে কি
ভেসেছে আঁখি নীরে,
নীহার জলে কপোলতল ভাসে।
কবির হিয়া বাসেগো ভালো
শিশির-শীত-বারি,
পরাণ চাহে গাঁথিয়া পরি' মালা ;
কেবল যেন তাহারি সনে
মিশায়ে নিতে পারি -
নয়ন জল করুণাগীতি-ঢালা।

বা হতে পথ অনেক বাকী
জোনাকী জ্বলে বনে
গাহিতে থাকে আড়ালে ঝিঁঝিঁ পোকা,
শিউলি শীতে শিউরে উঠে
মলয় পরশনে,
আকাশে তারা বিকাশে থোকা থোকা।
পরশ জাগে প্রাণের পরে
সরস সুকুমার,
দরশ মম বিরাম নাহি মানে
কবে আমারি আশা তারার দেশে
নীরব নীলিমার
নিলয় হতে চাহিবে মম পানে।

আজিকে বাকী দেউল পরে
আনিলে কেহ আলো,
কেহবা এলে নয়ননীরে নাহি,
সবার পাশে বসিয়া আমি
সবারে বাসি ভালো,
সবার সনে চলিয়া যাব গাহি'।
আমারি দেওয় ফুলের রাশি
কেহ বা করো হার
কেহবা পথে ফেলিয়া দিও ও কি,'
হাসির পরে রাখিয়া হাসি
আঁখিতে আঁখিধার
সবার পাশে বসিয়া আমি সুখী।

শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী।

First 2nd and 3rd form and pages 75 and 76 art printed by Satish Chandra Ray at the Jugat art Press, Dacca and the fourth form is printed by Rebatimohn Das at the Ashutosh Press, Dacca, Publish by Kedarnath Mozumdar Researchhouse Mymensingh,

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

৪র্থ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩২২। | তৃতীয় সংখ্যা।

তিব্বত অভিযান।

সন্ধি বন্ধন।

আমরা ৩রা আগষ্ট লাসায় প্রবেশ করি। আমাদের কর্ত্তারা ঐ দিন হইতেই তিব্বতীয়দিগের সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। দলাই লামার মন্ত্রী সভার সকলেই লাসায় ছিলেন, কিন্তু দলাই লামার ভয়ে কেহই এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। শুধু তাহাই নয়; তাহারা সকলে গোপনে আমাদের সহিত শত্রুতা করিতে লাগিল। তাহারা প্রথমে আমাদের খাদ্যাদি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল। জেনারেল সাহেব অতি সহজে ঐ ষড়যন্ত্র মিটাইয়া ফেলিলেন, এবং সৈন্যগণের সাহায্যে রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

আমরা 'সংতু' মহাসভার উল্লেখ করিয়াছি। দেশে বিশেষ বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে ইহার অধিবেশন হয়। আমরা লাসায় প্রবেশ করিবার পর কয়েকবার ইহার অধিবেশন হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। তিব্বতীয়দিগের সহিত যাহাতে আমাদের সন্ধি হয়, সে বিষয়ে প্রধান অম্বান মহাশয় যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অম্বান দলাইকে ফিরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষিত হইল না। যখন তিনি বুঝিলেন যে, দলাই ফিরিল না; তখন তিনি একজন অস্থায়ী দলাই লামা নিযুক্ত করিলেন। এ সব কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যখন এই সব ব্যাপার চলিতেছিল, এবং সন্ধিবন্ধন বিষয়ে আমরা এক প্রকার হতাশ হইয়া পড়িতেছিলাম; তখন সহসা একদিন সংবাদ পাইলাম যে, দলাই লামা পলাইবার সময় যাঁহাকে স্বীয় পদে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি আমাদের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইয়াছেন। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, একদিন আমি ও একজন সাহেব ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম।

১৪ই আগষ্ট ইনি লাসায় উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে আর একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। পাঠক জানেন, অম্বান তাসী লামাকে অস্থায়ী দলাই লামা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিব্বতীয়েরা যখন তাঁহার নিয়োগে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল ও প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে অসম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন অম্বান আর অধিক গোলযোগ না করিয়া দলাই লামার মনোনীত ব্যক্তিকেই অস্থায়ী দলাই লামা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

রিম্‌পোচি মহাশয় (অস্থায়ী দলাই লামা) প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার নিকট দলাইলামার শিলমোহর আছে বটে, কিন্তু উহা ব্যবহার করিবার আদেশ তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। কয়েকদিবস হইল তিনি উর্‌গা হইতে দলাইকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কয়েকজন লামাকে পাঠাইয়াছেন। আর তিন দিনের মধ্যে তাঁহাদের ফিরিবার কথা। তাঁহাদের

ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত সন্ধির কথা স্থগিত রাখা হউক। আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হহতে হইল।

চতুর্থ দিবসে লামারা ফিরিয়া আসিলেন। দলাইলামা আসিলেন না। শিলমোহর ব্যবহার করিবার কোন আদেশও দেন নাই। তখন রিম্‌পোচি সংতু মহাসভায় প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাকে শিলমোহর ব্যবহার করিবার অনুমতি দেওয়া হউক। কারণ, যতদিন পর্য্যন্ত তিনি উহা ব্যবহার করিবার ক্ষমতা না পাইবেন, ততদিন তিনি সন্ধি করিতে পারিবেন না, আর যতদিন সন্ধি না হইবে, ততদিন ইংরাজ লাসা ছাড়িবেন না। সংতু তাঁহার প্রার্থিত প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। ইহার পর তিনি নিম্নলিখিত প্রকার আদেশ তিব্বতীয় ভাষায় ছাপাইয়া লাসার সমস্ত প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া দিলেন। তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই :—

আমাদের রাজ্যের সমস্ত লামা, ভিক্ষু ও জনসাধারণের প্রতি:—তোমরা শ্রবণ ও পালন কর। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের পর চীন ও ইংরাজের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহাতে স্থির হয় যে, অপরাপর কথা পরে বিবেচিত হইবে। এক্ষণে ইংরাজ বিনা অনুমতিতে আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের রাজপ্রতিনিধি কর্জ্জন বাহাদুরের আদেশানুসারে তাঁহারা তিব্বতে আসিয়াছেন। চীন সম্রাট ও তাঁহার প্রতিনিধি অম্বানের ইচ্ছা যে আমরা ইংরাজের সহিত যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করি। আমরা জানি তোমরা ইংরাজের এই ব্যবহারে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়াছ। কিন্তু আমাদের উপস্থিত অবস্থা ও স্বর্গীয় মহান্ ধর্ম্মের উপদেশ স্মরণ করিয়া আমরা সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি। বিশেষ আমরা সকলে বৌদ্ধ। প্রাণীহিংসা আমাদের নিকট অতি গুরুতর অধর্ম্ম। যুদ্ধ করিলেই প্রাণীহিংসা অনিবার্য্য। এই জন্য সন্ধি করাই আমাদের কর্ত্তব্য। অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, তোমরা ইংরাজের সহিত অতিথির ন্যায় ব্যবহার কর। যাহাতে তাহাদের অসন্তোষ বা অনিষ্ট হয়, এমন কার্য্য তোমরা কেহই করিও না। তোমরা যে বৌদ্ধ ইহা ভুলিও না। তোমরা ইঁহাদের সহিত ভবিষ্যতে কি প্রকার আচরণ কর, তাহা আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি। যদি কোনও প্রকার অন্যায় ব্যবহার কর, তাহা হইলে তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিতে আমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিব না।

১৬ই আগষ্ট এই আদেশ প্রচারিত হয়। ১৮ই আগষ্ট একজন লামা আমাদের শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই-জন সাহেব কর্ম্মচারীকে (Cap. A. C. Young husband and T. B. Belly, I. M. S.) তরবারি দ্বারা অতি ভীষণ ভাবে আঘাত করে। ইঁহারা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন বলিয়া আত্মরক্ষা করিবার অবসর পান নাই। আঘাত এমন গুরুতর হইয়াছিল যে, ঐ কর্ম্মচারীদ্বয় প্রায় ৩ মাস কাল শয্যাগত ছিলেন। পর দিবস প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে সেই লামার ফাঁসি হয়।

৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধির সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া যায়। রিম্‌পোচি প্রস্তাব করিলেন যে, ঐ দিনই সন্ধি পত্রে সাক্ষর করা হউক। তিনি জেনারেল সাহেবকে সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "আমরা দুর্ব্বল। প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের বিবাদ হইলে চিরদিন যাহা হয়, এখানেও তাই হইয়াছে। যাহা হউক, দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য আমি এই সন্ধি পত্রে বিংশতিবার দস্তখত করিতে পারি।" সে দিন কিন্তু সাক্ষর হইল না। কারণ, সন্ধিপত্র ইংরাজি, তাহা তিব্বতীয় ও চীনা ভাষায় অনুবাদ করিবার প্রয়োজন ছিল।

৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইল। দলাই লামার প্রাসাদের সিংহাসন কক্ষে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। কর্ণেল ইয়ংহজব্যাণ্ড সাহেব এই অভিযানের সর্ব্ব প্রধান (Political) কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ দিকে জেনারেল সাহেব ও বাম দিকে অম্বান বসিয়াছিলেন। রিম্‌পোচি এবং অন্যান্য তিব্বতীয় কর্ম্মচারীরা অম্বানের বাম দিকে বসিয়াছিলেন। অপরাপর ইংরাজ কর্ম্মচারীরা জেনারেল সাহেবের দক্ষিণ দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। কক্ষের অন্য দিকে ইংরাজ, শিখ ও তিব্বতীয় সৈন্য এবং কয়েকজন পদস্থ সহরবাসী দণ্ডায়মান ছিলেন।

সকলে স্থির ভাবে আপনাপন স্থানে অবস্থিত হইলে তিব্বতীয় কর্ম্মচারীরা চা, বিস্‌কিট, মিষ্টান্ন ও নানা প্রকার ফল আনিয়া উপস্থিত করিলেন। উহার যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষিত হইবার পর সন্ধিপত্রের নকল একজন তিব্বতীয় কর্ম্মচারী কর্তৃক পঠিত হইল। কর্ণেল সাহেব দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন যে, ইহাতে কাহারও কিছু বক্তব্য আছে কি না। কেহই বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না। এইবার আসল সন্ধিপত্র খানি আনীত হইল। পাশাপাশি তিন কলমে (columns) তিন বিভিন্ন ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছিল। এই ভাবে পাঁচখানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রত্যেক খানিতে সকলকে সাত জায়গায় দস্তখত করিতে হইল। সর্ব্ব প্রথম নিম্ন পদের তিব্বতীয় ও ইংরাজ কর্ম্মচারীরা, তাহার পর সংতুর কয়েকজন প্রধান সভ্য, তিনটি প্রধান মঠের মহন্ত, ও দলাই লামার মন্ত্রীরা উহাতে সাক্ষর করিলেন। এই সকল সাক্ষরের নিম্নে রিম্‌পোচি; ও তাঁহার পর কর্ণেল সাহেব সাক্ষর করিলেন। যখন শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয় সাক্ষর করিতেছিলেন তখন সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। সকলের নীচে দলাই লামার সীল মোহরের ছাপ দেওয়া হইল।

ইহার পর কর্ণেল সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া কয়েকটি আবশ্যক কথা বলিলেন। এই সন্ধি হওয়াতে তিব্বতের কি লাভ হইল, তাহা তিনি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। বাণিজ্য দ্বারা জাতির কি ২ উন্নতি হয়, তিব্বতের সহিত ভারতের অবাধ বাণিজ্য স্থাপিত হওয়াতে উভয়ের কি কি উপকার হইবে তাহাও সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, যুদ্ধের সময়ে উভয় পক্ষে যাহারা বন্দী হইয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হইবে।

এই বক্তৃতার সময় আমি তিব্বতীয়দিগের ভাব ভঙ্গি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছিলাম। সাহেবের কথায় যে কেহই সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল। তিব্বত কোনও দিন বাণিজ্য প্রিয় জাতি নয়। তাহারা চিরদিন বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ কাটাইয়া বাস করিয়া আসিতেছিল। আজ জোর করিয়া তাহাদিগকে সূর্য্যের আলোকে লইয়া আসাতে তাহারা বড়ই অশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। ইহার ফল কি হইবে তাহা ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত।

নিম্নে আমরা এই সন্ধিপত্রের অনুবাদ প্রদান করিলাম। অনুবাদের স্থানে ২ আমরা অনেকটা স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছি।

১৮৯০ ও ১৮৯৩ খ্রীঃ কলিকাতায় ইংলণ্ড ও চীনের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহার কয়েকটি ধারা তিব্বত সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু তিব্বত উহা মান্য করিতে অসম্মত হওয়ায়, তিব্বতের সহিত একটা স্থায়ী সন্ধি করিবার উদ্দেশে কর্ণেল ইয়ং হজ্‌ব্যাণ্ডকে ইংলণ্ড নিযুক্ত করেন। এক্ষণে ইংরাজ ও তিব্বতীয় কর্ম্মচারীরা পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিলেন ও তজ্জন্য দশটি ধারা লিপিবদ্ধ করিলেন। লাসাস্থ চীন সম্রাটের প্রতিনিধি অম্বান এই সন্ধি বন্ধনে সম্পূর্ণ অভিমত প্রদান করিয়াছেন।

১ম ধারা। ১৮৯০ খ্রীঃ সন্ধি অনুসারে ইংরাজ সিকিম প্রান্তে সীমান্ত স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন।

২য়। উভয় জাতি মধ্যে বাণিজ্য স্থাপনের জন্য ইয়াটং ব্যতীত গিয়াংসী ও গায়টোকে বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হইবে। ঐ তিন স্থান হইতে বাণিজ্য দ্রব্যাদি ভারতে ও তিব্বতে প্রেরিত হইবে।

৩য়। পূর্ব্বোক্ত সন্ধির মধ্যে কোন ও আপত্তিকর কথা থাকিলে পরে তাহা দূরীভূত হইতে পারে।

৪র্থ। বাণিজ্য দ্রব্যের তিব্বত ও ইংলণ্ড যে শুল্ক একবার নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, তাহা ছাড়া আর কোনও শুল্ক দিতে হইবে না।

৫ম। ভারত হইতে ইয়াটং গিয়াংসী ও গায়টোকের মধ্যে অপর কোনও স্থানে আর কোনও শুল্কাগার স্থাপিত হইবে না। ঐ পথের মেরামতাদি তিব্বত করিবেন। এই সকল স্থানের সমস্ত কর্ম্মচারী তিব্বত নিযুক্ত করিবেন কিন্তু ঐ স্থানের কোনও ইংরাজ বা ভারতীয় বণিক বা কর্ম্মচারী যদি ইচ্ছা করেন, তবে তিনি অম্বানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্রাদি লিখিতে পারিবেন।

৬ষ্ঠ। তিব্বত বিনা কারণে ইংরাজ অভিযানের সহিত যুদ্ধ করাতে, তাহাকে ৭৫ লক্ষ টাকা (ইংরাজকে) ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। তিন বৎসরে এই টাকা শোধ দিতে হইবে।

৭ম। সন্ধির ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ ধারা যতদিন পর্য্যন্ত না তিব্বত সন্তোষ জনক ভাবে রক্ষা করেণ, ততদিন পর্য্যন্ত ইংরাজ চুম্বী উপত্যকা অধিকার করিয়া থাকিবেন।

৮ম। ভারত হইতে গিয়াংসী পর্য্যন্ত যে সকল দুর্গ আছে, তাহা ভূমিসাৎ করিতে হইবে।

৯ম। ইংলণ্ডের বিনা অনুমতিতে তিব্বত স্বীয় রাজ্যের মধ্যে অপর কোনও জাতিকে প্রবেশ করিতে দিবেন না।

অপর কোনও জাতি তিব্বতের শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কোনও বিদেশী জাতি তিব্বতে রেলওয়ে, তার বা অন্য কোনও পথাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। তিব্বতের কোনও খনি বা ঐ জাতীয় অপর কোনও স্থান কোনও অপর জাতিকে দেওয়া হইবে না।

১০ম। সীমান্ত কমিশনর, জং ও দলাইলামা ইহাতে সাক্ষর করিবেন। ইহার (সন্ধিপত্রের) ইংরাজি ও তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ হইল। কিন্তু গোলযোগ উপস্থিত হইলে ইংরাজি সন্ধিপত্রই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হইবে।

ঘটনাটা অনেক দিনের বলিয়াই এই খানে দুই চারিটা অবান্তর কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই সন্ধির কথা যখন প্রকাশ হইল, তখন ইংলণ্ডের অনেকে বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুরের এই কার্য্যে বিশেষ নিন্দা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, তিব্বত স্বাধীন রাজ্য, সেখানে জোর করিয়া প্রবেশ করাই ভুল হইয়াছে। তাহার পর ৭৫ লক্ষ টাকা তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় করা অন্যায় হইয়াছে। তাহারা এমন কি অপরাধ করিয়াছিল?

যাহাহউক, আমরা এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। ইংলণ্ড চিরদিনই দুর্ব্বলের মিত্র। ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সেই ইংলণ্ড যে দুর্ব্বল তিব্বতকে নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে এই কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন, তাহা কখনও সম্ভব নয়। কথাটা যদি আমরা বিশেষ স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, ভারতের মঙ্গলার্থেই এই কার্য্য হইয়াছিল। তিব্বতের সহিত অবাধে বাণিজ্য দ্বারা ভারতের যে পরিমাণ লাভ হইতেছে, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অবশ্য আমাদের এই কথা অস্বীকার করিবেন না। তাহার পর ভারতকে উত্তর দিক হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিব্বতকে হাতে রাখা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা আমরা প্রথমেই বিবৃত করিয়াছি। রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে একবারে সত্যযুগের লোক হইলে চলে না। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সব সময় এক পথে চলে না। যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম্মের পুত্র। কিন্তু দ্রোণ নিপাতের জন্য তাঁহাকে পর্য্যন্ত চাতুরী করিতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকে আমরা পূর্ণাবতার বলিয়া মনে করি। অথচ তিনিই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতিকে অন্যায় ভাবে নিহত করিবার জন্য পাণ্ডবদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক জগতের কোনও ঘটনার উপর মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ভাবা উচিত যে, আমাদের অধিকার কতটুকু।

সাংপো বক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন।

২৩এ সেপ্টেম্বর আমরা লাসা ত্যাগ করিলাম। পর দিবস আমরা সাংপো তীরে উপস্থিত হইলাম। এখানে শুনিলাম, কয়েকজন সাহেব নদীর ধারে জঙ্গলে শীকার করিবার আদেশ পাইয়াছেন। তাঁহারা নদী বক্ষে শীকার করিতে করিতে ভুটানের ধার দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। অবশিষ্ট সকলে পূর্ব্বপথে ফিরিয়া যাইবেন। আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া প্রথম দলে থাকিবার আদেশ পাইলাম। অবশিষ্ট সকলে চলিয়া গেল।

রি সাহেব আমাদের একজন নবীন কর্ম্মচারী। মোটে দেড় বৎসর হইল বিলাত হইতে আসিয়াছেন। লোকটা কিন্তু বড় সরল। আমার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। একদিন তিনি প্রাতঃকালে শিবির হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে এক স্থানে শৃগাল ধরিবার এক জাঁতিকল পাতিয়া আসেন। ঐ দিন রাত্রে খুব এক পসলা বরফ পড়ে। পরদিবস প্রাতঃকালে তিনি অশ্বারোহণে ঐ স্থানে গমন করেন। সঙ্গে একটা কুকুর ভিন্ন আর কেহই ছিল না। যখন বুঝিলেন যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই বুঝিলেন যে, রাত্রে বরফ পড়াতে তাঁহার কল অদৃশ্য হইয়াছে। তখন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ফিরিবার অভিপ্রায়ে এক নূতন পথ অবলম্বন করিলেন। এইবার তাঁহার বিপদের কথা তাঁহার নিজের কথায় বলি।

"কিয়ৎদুর আসিবার পর একি! কেহ আসিয়া যেন পাৎ করিয়া আমার বামপদ কামড়াইয়া ধরিল। সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। চাহিয়া দেখি আমারই কলে আমি ধরা পড়িয়াছি। সহসা সর্ব্বাঙ্গে এক বিষম অবসাদ অনুভব করাতে সেইস্থানে বসিয়া পড়িলাম। তাহার পর বুঝি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন জ্ঞান

হইল, তখন প্রথমেই আমার দৃষ্টি কলের উপর পড়িল। দেখি, জুতা হইতে প্রায় ৭ আঙুল উপরে—পা কলে আবদ্ধ হইয়াছে। কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোনও মতে কল খুলিতে পারিলাম না! কলে চাবি দেওয়া ছিল। চাবিটা ঘোড়ার জিনের মধ্যে। এখন উপায় কি? শিবির এখান হইতে অনেক দূরে। আমি যে এখানে আসিব, তাহা কেহই জানে না। শীঘ্র যে আমায় কেহ সন্ধান করিতে বাহির হইবে তাহারও সম্ভাবনা বড় ছিল না। আমি শীকার করিতে বাহির হইলে অপরাহ্ণ ৩।৪ টার আগে ফিরিতাম না! সুতরাং ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অদর্শনে কেহই উদ্বিগ্ন হইবে না! তাহার পর খুঁজিতে খুঁজিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। এই পাহাড়ে-দেশে বরফের উপর অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে আমি ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িব তাহা জানিতাম। এমত অবস্থায় শীঘ্র উদ্ধার পাইতে না পারিলে আমার অবস্থা যে কিরূপ বিপজ্জনক হইবে, তাহা আমি যতই স্মরণ করিতে লাগিলাম, ততই অস্থির হইতে লাগিলাম।

এ রকম কল প্রায়ই কোনও গাছের সহিত শিকলের দ্বারা বাঁধা থাকে। ইহাও সেইরূপ ছিল। অধিকন্তু উহাতে আবার আমি তালা বন্ধ করিয়াছিলাম। এই চাবিও আমার কাছে ছিল না। এই সময় পায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, পা কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে,। ক্রমেই যে আমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম।

এই সময়ে সহসা আমার কুকুরের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। আমার সঙ্গে যে আর কেহ আছে, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। উহাকে দেখিবামাত্র আমার দেহে নবীন বলের সঞ্চার হইল। কুকুরটা জন্মের পর হইতেই আমার কাছে আছে, এবং আমি তাহাকে এমন অনেক কাজ শিখাইয়াছিলাম, যাহা অনেক পোষা কুকুর পারিত না। আমি তাহাকে ডাকিবামাত্র সে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে আমার কাছে আসিল। আমি তাহাকে সঙ্কেত করিয়া বলিলাম, "টেভি! আমার ঘোড়াকে এইখানে আন। শীঘ্র।" টেভি একবার আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার পর যে দিকে ঘোড়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম সেই দিকে অদৃশ্য হইল। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, আগে ঘোড়া পশ্চাতে টেভি আসিতেছে। তাহার পর অবশ্য আমি নিজেকে জাঁতিকল হইতে উদ্ধার করিলাম।"

* * * * *

আমরা আবার অগ্রসর হইলাম। তিন দিন পরে আমরা ঠিক নদীর দক্ষিণ তীরে এক বিশাল পর্ব্বত শৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম। ঐ প্রদেশে ইহার নাম—'জাণাপ লং'। শুনিলাম উহার উচ্চতা প্রায় ২২,০০০ ফুট। কিয়দ্দূর গমনের পর নদীর দুই দিকেই উচ্চ পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। ৮।১০ মাইলের মধ্যে ৪টা Defile দেখিলাম। Defile ব্যাপারটা বুঝাইতেছি। দুই ধারে উচ্চ পর্ব্বত, পর্ব্বত দ্বয় নদীর এক ধারে জলের ভিতর হইতে শাখা তুলিয়াছে। নদী এই স্থানে খুব কম চওড়া। নদী এক ফার্লং বা দেড় ফার্লং অন্তর মুখ ফিরাইয়াছে, এমনভাবে মুখ ফিরাইয়াছে যে দেখিলে মনে হয় আগে আর পথ নাই, নদীর মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই Defileএ নদীর জোর এত অধিক যে, আমাদের নৌকা ঘণ্টায় প্রায় ২৫ মাইল যাইতেছিল।

প্রায় দেড়ঘণ্টা গমনের পর নদীর দুইধারে গভীর জঙ্গল আরম্ভ হইল। জঙ্গলের মধ্যে সাল ও শিশু গাছ অপর্য্যাপ্ত দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম এ সমস্ত ইংরাজ রাজের অধীন। যথাসময়ে আমরা কংতুতে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে আমরা এক উচ্চ পর্ব্বত দেখিলাম। উহা পূর্ব্বোত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। সাংপো—কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহা ভেদ করিয়া গমন করিয়া পুনরায় সমতল ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে নদী খানিকদূর উপর দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। প্রায় ৮০ মাইল এইভাবে গমনের পর নদী আবার দক্ষিণ দিকে ফিরিয়াছে। ইহার পর নদী আবার পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। শুনিলাম নদী এইখানে এমন অসমতল, বন্ধুর ও পার্ব্বত্য ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে যে, নৌকায় গমন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তখন বাধ্য হইয়া আমাদিগকে নৌকা ত্যাগ করিতে হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর কয়েকজন কুলী সংগ্রহ করিয়া আমরা সকলে পদব্রজে অগ্রসর হইলাম।

চতুর্থ দিবসের পর পুনরায় আমরা সাংপোর তীরে উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায় বুঝিয়া আমরা ঐ স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলাম। রাত্রি প্রায় ৮টার

সময় নদীর তীরে বসিয়া আমরা আহারাদি করিতেছি, সম্মুখে দুইটা বাতি ও একটা ল্যাম্প জ্বলিতেছে। এমন সময় একজন সাহেব চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ! বোধ হয় হাজার হাজার বিশাল কায় কাঁকড়া জলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমাদের আহার্য্য দ্রব্যের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। এত বড় বড় কাঁকড়া জীবনে কখনও দেখি নাই। দাড়া সমেত এক একটা দুই হাতের কম হইবে না। দাড়া গুলা পায়ের বুড়া আঙ্গুলের মত মোটা। আমরা খাদ্যাদি মাটির উপরে রাখিয়া পরিবেশন করিতেছিলাম, উহারা সকলে আসিয়া উহার উপর পড়িল। খাদ্যাদি রক্ষা করা দূরের কথা, তখন আত্মরক্ষা করাই কঠিন হইয়া পড়িল। সামান্য চেষ্টার পর বুঝিলাম, 'যঃ পলায়তি স জীবতি'। তখন অতি ক্ষিপ্রভাবে আমরা সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলাম। আমাদের সঙ্গে একজন প্রবীন ও অভিজ্ঞ কাপ্তেন ছিলেন। তিনি বলিলেন একবার আমেরিকার মিসিসিপির তীরে তিনি এইভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেখানেও তাঁহাদিগকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল।

পরদিন আমরা বহুকষ্টে আবার একখানি দেশী বোট সংগ্রহ করিলাম। নৌকার মালিক একজন ভূটিয়া। মাঝি, দাঁড়ী সকলেই ভুটানের লোক। এইখানে বলিয়া রাখি যে, এতদূর পর্য্যন্ত পথিমধ্যে আমরা লোকালয় বড় একটা দেখি নাই। মধ্যে মধ্যে দুই একখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু উহার অধিবাসীরা আমাদের নিকট আসিত না। আমাদিগকে দেখিলেই তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিত। এই জন্য অনেক সময় আমাদিগকে খাদ্যাদি তাহাদের গ্রাম হইতে তাহাদের বিনা অনুমতিতে লইয়া আসিতে হইত। অবশ্য তাহার বিনিময়ে অর্থ বা অন্য কোনও দ্রব্য ঐ স্থানে রাখিয়া আসিতে আমরা কখনও ভুলিতাম না। এ প্রদেশের লোকদিগের চেহারা ভূটানিদিগের মত। বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখিলাম না।

ইহার তিন দিবস পরে আমরা এক পর্ব্বতের পাদমূলে শিবির স্থাপিত করিলাম। তখন সন্ধ্যা হয় নাই, কিন্তু পশ্চিম দিকে এক পর্ব্বত থাকাতে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ৪টার পরই থামিতে হইল। এসব স্থানে সন্ধ্যার পর নৌকায় ভ্রমণ করা নিরাপদ নয় বলিয়া সূর্য্য অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেদিনকার জন্য ভ্রমণ খতম করিলাম। এদিনও তাহাই হইল। নদীর তীর হইতে কিয়দ্দূরে খানিকটা সমতল ভূমি ছিল, ইহার ঠিক উপরে পর্ব্বতের কিয়দংশ বাহির হইয়া ছাদের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিল; আমরা এই ছাদের নীচে তাঁবু খাটাইলাম।

সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া আমরা ধূমপান করিতেছি, এমন সময় এক অদ্ভূত শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হইল। শব্দটা যে পর্ব্বতের উপর হইতে আসিতেছে তাহা আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু দুই একজন সাহেব তাহা স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "নদীর জল সহসা বৃদ্ধি পাইতেছে।" বৃদ্ধ মাঝী কিন্তু তাহা স্বীকার করিল না। সে আমাদিগকে তাড়াতাড়ি নৌকার উপর আশ্রয় লইবার অনুরোধ করাতে আমরা ক্ষিপ্রহস্তে তাঁবু তুলিয়া নৌকার উপর উঠিলাম। ইহার বোধ হয় এক মিনিট পরে হুড়্ হুড় হুড় হুড় দুম্ শব্দে কোনও বিষম গুরুভার দ্রব্যের পতন বুঝিতে পারিলাম। হাজার হাজার মন প্রস্তর উচ্চ স্থান হইতে পড়িলে যেমন শব্দ হয় ইহা অবিকল সেই রকম।

আমরাও স্তম্ভিত! কয়েক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা সকলে নীরব নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম। তাহার পর আমরা নৌকার ছাদের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। উপরে যে ছাদের কথা বলিয়াছি, তাহা সমতল ভূমি হইতে প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ। উহার উপর হইতে বন্য মহিষ দলে দলে আসিয়া নীচে পড়িতেছে ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কি কারণে যে তাহারা এইভাবে আত্মহত্যা করিতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ৮ মিনিট কাল এই অত্যদ্ভুত ব্যাপারের অভিনয় চলিল। ইহার মধ্যে যে কতগুলা মহিষ পড়িল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহার পর এ সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত হইয়াছিলাম, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

এই সকল প্রদেশ গভীর জঙ্গলে আবৃত। উহার মধ্যে বন্যমহিষেরা দলে দলে বিচরণ করিয়া থাকে। এই মহিষেরা অত্যন্ত ভীষণ প্রকৃতি সম্পন্ন হইলেও অতি সামান্য কারণে

নিতান্ত ভীত ও অস্থির হয়। যখন ইহারা এইভাবে পলাইবার আশায় কোনও পর্ব্বতের প্রান্ত দেশে উপস্থিত হয়, তখন আর বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া একবারে নীচে যাইয়া পড়ে।

ইহার পর আমরা গিয়ালাজং নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। নদী এই স্থান হইতে একবারে পূর্ব্বদিক হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থান আবর দেশের মধ্যে। আবরেরা সাংপোকে তিহং নামে অভিহিত করে। তিনদিন পরে আমরা সাদিয়া উপস্থিত হইলাম। পাঠক জানেন, সাদিয়া আসামের উত্তরসীমান্ত নগর। ইহার অল্প-দূরে তিহংএর সহিত লোহিত নদী মিলিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সাদিয়া লোহিত নদীর উপর অবস্থিত। এই লোহিত নদী দক্ষিণ চীন হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ৩০০ মাইল ভ্রমণের পর তিহংএর জলে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে।

এই আবর ও কংতু দেশ ক্ষুদ্র পর্ব্বত মালায় পরিপূর্ণ। অধিকাংশ স্থানে নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন। এক এক স্থান এত গভীর যে, দিনের বেলায় সূর্য্যদেবও তথায় প্রবেশ করিতে পারেন না। ইহার সর্ব্বত্র নানাপ্রকার হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। এমন কি দিনের বেলায় ইহার মধ্যে ব্যাঘ্র. ভল্লুক, চিতা, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতি নির্ভয়ে বিচরণ করে। লোক সংখ্যা এস্থানে খুব কম। এই প্রদেশে লালো ও চিঙ্গমি নামক দুই অসভ্য জাতি বাস করে। শুনিলাম, ইহারা সুবিধা পাইলে নর মাংসও ভক্ষণ করে। একদিন আমরা জঙ্গলের মধ্যে কয়েকজন লালো দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহাদের মধ্যে নরনারী দুই ছিল। কাহারও অঙ্গে কোনও প্রকার পরিচ্ছদ দেখিলাম না। সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ইহাদের সকলেরই সর্ব্বাঙ্গ উল্‌কিতে পরিপূর্ণ। কটিদেশ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত এমন ঘন উল্‌কিতে আচ্ছন্ন যে, দূর হইতে দেখিলে উহারা যে উলঙ্গ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরি দক্ষিণ হস্তে এক ধনুক ও বামদিকে একগোছা বাণ থাকে। কয়েক জনের হাতে এক একটা বড় ছোরা দেখিলাম। ইহাদের নিকট অপর কোনও দ্রব্য দেখিলাম না।

শুনিলাম, শীকার ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহরা জঙ্গলের একস্থানে বাস করে এবং প্রতিনিয়ত স্থান পরিবর্ত্তন করে। কখনও ইহারা বাঘের হাতে নিহত হয় বটে, কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ দুঃখিত হয় না। কারণ, ইহারা ব্যাঘ্রকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। ব্যাঘ্রের জঠরানল তৃপ্তি করা ইহারা বিশেষ সৌভাগ্যজনক বলিয়া মনে করে। ইহারা অনেক সময় ব্যাঘ্র শিশু ধৃত করিয়া নানাপ্রকার মাংস দ্বারা উহার তৃপ্তি সাধন করে। বৎসরের বিশেষ এক সময়ে ইহারা ব্যাঘ্র দেবতাকে নর মাংস দ্বারা উপাসনা করে:। প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া পুরোহিত থাকে। কাহাকে বাঘের মুখে যাইতে হইবে, তাহা পুরো-হিত স্থির করেন। যুদ্ধের পর যাহারা বন্দী হয়, তাহাদের মধ্যে দুই একজনকে ব্যাঘ্রের কবলে সমর্পণ করা হয়। অবশিষ্ট বন্দীদিগকে বিজয়ীরা স্বস্ব উদরে স্থান দান করে। যাহাকে ভক্ষণ করা হয়, তাহাকে প্রথমে হত্যা করিয়া পরে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে।

ইহাদের বিবাহ প্রথাটা একটু বিস্ময়কর। বর ও কন্যা প্রাপ্ত বয়স্ক না হইলে বিবাহ হয় না। বর প্রথমে মনে মনে কন্যা মনোনীত করে। তাহার পর একদিন অবসরমত কন্যার মাকে স্কন্ধের উপর উঠাইয়া এক অজ্ঞাত স্থানে লুকা-ইয়া রাখে। কন্যার পিতা বরের আত্মীয়দিগের রসনা তৃপ্তিকর দুইজন মানুষ প্রদান করিবে স্বীকার করিলে বর ভাবী শাশুড়ীকে বাহির করিয়া দেয়। যদি কন্যার পিতা আহারের জন্য মানুষ দিতে না পারে, তবে অপহৃতা স্ত্রীকে দিয়া রেহাই পান। এমন ভীষণ প্রথা কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি?

এইখানে একদিন আমরা মহিষ শীকার করিতে গিয়া-ছিলাম। দুইজন সাহেব ও আমি দ্বিপ্রহরের সময় শীকার করিতে বাহির হইলাম। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরি-বার পর দূরে এক বিলের মধ্যে একদল মহিষ দেখিলাম। একজন সাহেব বলিলেন, "এমন সুযোগ আর পাইব না। মহিষের মাংস বড় সুস্বাদু। কিন্তু উহাদের শীকার করা বড় বিপজ্জনক। তোমরা খুব সাবধান।" পাঠক! দোহাই আপনার! মনে করিবেন না যে, আমি মহিষের মাংসের লোভে শীকার করিতে গিয়াছিলাম।

প্রথমে আমরা হাওয়ার গতি স্থির করিলাম। মহিষের শ্রবণ শক্তি এত প্রবল যে, উহারা হাওয়ার সাহায্যে বুঝিতে

পারে যে, শত্রু নিকটে আসিয়াছে। তাহা হইলে তাহারা নিমিষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। তবে হাওয়া যদি তাহাদের দিক হইতে আমাদের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহারা কিছু জানিতে পারে না। অনেকে জানিয়া হয়ত বিস্মিত হইতে পারেন যে বন্য মহিষ অতি দ্রুতগামী অশ্ব হইতেও দ্রুত যাইতে পারে। তবে একটা কথা এই যে, ইহারা শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ইহারা সচরাচর দলবদ্ধভাবে বাস করে। এক এক দলে ৪০।৫০ হইতে ১০০।১৫০ পর্য্যন্ত মহিষ বাস করে। উহারা যেখানে চরে, তাহার চারিদিকে পাহারা বসায়। কোনও প্রকার ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেই পাহারা মহিষ সঙ্কেত করে। তখন সমস্ত দল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটীতে আরম্ভ করে। পলায়নের সময় ইহারা সোজা যাইতে থাকে। সে সময় কোনও বাধা বিঘ্ন গ্রাহ্য করে না। পাঠক জানেন, একদিন সন্ধ্যার পর আমরা কি প্রকার মহিষ বৃষ্টি দেখিয়াছিলাম। এ দেশে এমন ঘটনাকে কেহ আরব্য উপন্যাস মনে করেন না।

হাওয়ার গতি স্থির হইবার পর আমরা কতক দূর অগ্রসর হইলাম। যখন মহিষগুলির নিকট হইতে প্রায় ৩০ গজ দূরে উপস্থিত হইলাম, তখন আমরা তিনজনে তিনটা মহিষ লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইলাম। একটা তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল, আর উঠিল না। আর একটা মহিষ আহত হইল মাত্র। সে মুহূর্ত্তের মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর যখন সে আমাদিগকে দেখিতে পাইল, তখন ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে আমাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। ঐ সময়ে উহার মস্তক ভূমির দিকে ও পুচ্ছ ধনুকের মত দণ্ডায়মান হইল। সাহেব উহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, কিন্তু এই সময় যখন দেখিলাম যে দলের সমস্ত মহিষ আমাদিগের দিকে আসিতেছে তখন একজন সাহেব বলিলেন, "দৌড়িয়া পলাও। দূরে ঐ বড় গাছটার উপর উঠিয়া পড়।" আমাদের সহিত ৪ জন চাকর ছিল। তাহারা যে কোন দিকে গেল বুঝিতে পারিলাম না। আমরা তিনজনে অতি দ্রুত বেগে গিয়া সেই বৃক্ষের উপর উঠিয়া পড়িলাম। পরমুহূর্ত্তেই মহিষের দল উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়া একবার আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহাদের চক্ষের কি ভীষণ দৃষ্টি! সাক্ষাৎ যেন মহিষাসুর। তাহার পর তাহারা সকলে মিলিয়া বৃক্ষের উপর সজোরে ধাক্কা দিতে লাগিল। প্রকাণ্ড বৃক্ষের তাহাতে অবশ্য কোনও ক্ষতি হইল না। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে তাহারাও ইহা বুঝিতে পারিল। তখন ধাক্কা দেওয়া পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষের চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা শৃঙ্গের দ্বারা বৃক্ষের মূল খনন করিতে আরম্ভ করিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা গাছের উপর বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে তামাসা দেখিতেছিলাম। এইবার কিন্তু আমাদের মনে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হইল।

প্রায় ২০ মিনিটের মধ্যে বৃক্ষের চারিদিকে প্রায় ২০।২২ হাত ভূমি তাহারা খুঁড়িয়া ফেলিল। বৃক্ষের অনেক বড় বড় শিকড় একবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। আরও কিয়ৎকাল এইভাবে চলিলে যে গাছটা একবারে ভূমিস্যাৎ হইবে তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু উপায় কি? আমরা নিরস্ত্র। আমাদের বন্দুক বৃক্ষের তলায়। কিন্তু অসহায়ের সহায় ভগবান আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। আমাদের সঙ্গে যে ভৃত্য ছিল তাহারা শিবিরে উপস্থিত হইয়া আমাদের বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিল। তখন সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অচিরে আমরা উদ্ধার পাইলাম।

ইহার কয়েক দিবস পরে আমরা অভিযান সমাপ্ত করিয়া সিলং পঁহুছিলাম।

শ্রীঅতুল বিহারী গুপ্ত।

বিলাতী গণক।

গণকেরা বলিয়াছিল মুসলমানেরা বঙ্গ দেশ জয় করিবে, এই কথা শুনিয়া হিন্দু নরপতি লক্ষ্মণ সেন একেবারে হা'ল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; তাহার ফলেই নাকি সোণার বাংলা তুর্কির পদানত হয়। এই উক্তি কতদূর সত্য ঐতিহাসিক গণেরই তাহা বিচার্য্য; কিন্তু বাঙ্গালী ভীরু বলিয়াই যে কেবল এ সংস্কারের বশবর্ত্তী ছিল, তাহা নহে জগজ্জয়ী বীর-জাতিবর্গের মধ্যে ও পূর্ব্বে ইহার বিশেষ প্রভাব ছিল। আমরা নিম্নে তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্য নৃপতি প্রথম চার্লস কারারুদ্ধ হইলে তিনি লিলী নামক গণককে কোন্ সময়ে তাঁহার পলায়ন সুবিধাজনক হইবে গণনাপূর্ব্বক বলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। বার্ণেটের ইতিহাসে একটা গল্প আছে, তাহা হইতে জানা যায়, নৃপতি দ্বিতীয় চার্লসের জ্যোতির্ব্বিদ্যায় প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।

উইলিয়ম ডাগডিল্, এলিয়াস য়্যাশমোল, ডাক্তার গ্রু ইঁহারা সকলেই এককালে ইংলণ্ডে গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া বিদিত ছিলেন। এবং ইঁহারা ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বিদ সভার সদস্য ছিলেন।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্কট বলেন, এলিজাবেথের রাজত্ব কালে ইংলণ্ডীয় জন সাধারণের জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অত্যন্ত ভক্তি ছিল। স্কট তাঁহার কেনিলওয়ার্থ নামক উপন্যাসের নায়ক আর্ল অব লাইচেষ্টার ও জ্যোতির্ব্বিদ আলস্কোর চিত্রে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ড্রাইডেন তাঁহার পুত্রদিগের জন্মের কথা গণনাপূর্ব্বক বলিতে পারিতেন, তদীয়পুত্র চার্লস সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নাকি ঠিকঠাক্ মিলিয়া গিয়াছিল।

১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গ্রহ নক্ষত্র দৃষ্টে কোষ্ঠি কাটিবার বেজায় ধুম পড়িয়া যায়। তৎকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে নগ্নাবস্থায় গণকের নিকট লইয়া যাওয়া হইত। তিনি তাহার কপাল ও হাতের রেখাগুলি বিশেষ করিয়া দেখিতেন এবং তৎসাহায্যে স্বচ্ছন্দে শিশুর ভাবীজীবনে কি শুভ ও কি অশুভ ঘটিবে, তাহার বিস্তারিত ফর্দ্দ করিয়া দিতে পারিতেন। চতুর্থ হেনরীকে যখন ভাগ্য গণনা করিবার উদ্দেশ্যে আধা গণক আধা সন্ন্যাসী এক ব্যক্তির নিকট লইয়া যাওয়া হয়, তখন তিনি নাকি তাহার লম্বা দাঁড়ি দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন! সাধারণের ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইবে কিনা জানিনা—নৃপতি নবম চার্লসের গণক নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে এক পায়ের উপর দাঁড় হইয়া তিনি প্রত্যহ এক ঘণ্টার মধ্যে যতবার ঘুরপাক খাইতে পারিবেন তাঁহার আয়ু সংখ্যা তত অধিক দিবস বর্দ্ধিত হইবে। রাজা গণকের উক্তি অনুসারে প্রত্যহ প্রত্যূষে এক পায়ের উপর খাড়া হইয়া ঘুরপাক খাইতেন; ভদ্রতার খাতিরে তাঁহার প্রধান সভাসদগণ, জজ, চান্সেলার প্রভৃতি সকলেই এই অদ্ভুত নিয়ম পালন করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে বাধ্য হইতেন। ইহাও শুনা যায়, কোন কোন বিখ্যাত গণক নাকি নিজের গণিত বিষয়ের সত্য সংরক্ষিত করিতে যাইয়া আত্মদান করিয়াছেন। কর্ডান এবং বার্টানকে উহার উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যথানুরূপ ফল না ঘটিলে বহু স্থলে গণক মহাশয়েরা নানারূপে তাঁহাদের গণিত বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করিতেন। বোডিন একজন নামজাদা গণক ছিলেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি একটী বড় ঝড়ের কথা গণনাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার নির্দ্ধারিত দিবসে একটু বায়ুও বহিল না। বোডিন তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ঝড়ের অর্থ বিদ্রোহ বা মরামারি কাটাকাটি করিলেন। ইংলণ্ড তৎকালে অন্তর্দ্রোহে সমাচ্ছন্ন সুতরাং তাঁহার উদাহরণ যোগাড় করিবার অসদ্ভাব হইল না। ইংলণ্ডের গণকগণের বিশ্বাস ছিল, কোন নির্দ্দিষ্ট দিন পরিবার বিশেষের পক্ষে মঙ্গল বা অমঙ্গলজনক হইয়া থাকে। অষ্টম হেনরীর পক্ষে বৃহস্পতি বারটী নাকি বড় খারাপ। তিনি, তাঁহার পুত্র ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, কন্যা রাণী মেরী এবং এলিজাবেথ সকলেই উক্ত বারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কি সঙ্ঘাতিক দিন!

গৃহ বিবাদের সময় ইংলণ্ডে গণকদিগকে লইয়া বড় টানাটানি পড়িয়া গিয়াছিল; সৈন্য-সেনাপতি ভাল হউক আর নাই হউক, যাহাতে প্রাধান প্রধান গণকদিগকে হাত করা যায়, এজন্য উভয় পক্ষ নিরন্তর চেষ্টিত ছিলেম। গণকদিগের নিকট হইতে ভাল দিন নক্ষত্র দেখিয়া সৈন্য চালনা করা হইত।

১৬৯১ খৃষ্টাব্দে জন চেম্বার নামক জনৈক ভদ্রলোক বিলাতী গণক মহাশয় দিগকে তীব্রভাবে আক্রমণপূর্ব্বক এক পুস্তক বাহির করেন। তাঁহার আক্রমণের কঠোরতায় গণকেরা বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের এই বিষম সঙ্কটকালে নরওয়ে দেশীয় ক্রিষ্টোফার হেডন নামক এক ব্যক্তি অসীম বীরত্ব সহকারে পঞ্চশত পৃষ্ঠা বোঝাই করিয়া গণক পক্ষ সমর্থনার্থ অগ্রসর হইলেন। তাঁহার তর্ক যুক্তি কোন নিয়ম-কানুন, ভদ্রতা বা রুচির বাঁধনে বদ্ধ ছিল না। চেম্বার সাহেব ডাক্তার ছিলেন। ক্রিষ্টোফার হেডেন

উত্তেজনা বশে জ্যোতিষ শাস্ত্র সংরক্ষণ কল্পে ডাক্তারগুলিকে বয়কট করিবার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ডাক্তারগুলা রসাতলে যাক্, তাহাতে দেশের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু হে আমার দেশবাসি! হে প্রকৃত খৃষ্ট ধর্ম্মে আস্থাবান জন মণ্ডলি! দুর্বৃত্তদিগের দুরভিসন্ধি চালিত হইয়া তোমরা জ্যোতিষ বিদ্যারূপ অমূল্য রত্নটী হারাইও না। টমাস ভিকার্স ইহার পাল্টা জবাবে "গণকের পাগলামি" নাম দিয়া আর একখানি পুস্তক বাহির করেন।

গণকদলের সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা ছিলেন, লিলী। তিনি ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে "খ্রীষ্টীয় জ্যোতিষশাস্ত্র" নামক কয়েক খণ্ডে এক সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় রং বেরংয়ের রাশি চক্র আঁকিয়া অপূর্ব্ব তৎপরতা সহকারে তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য জাহির করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের এক অংশে গণকদিগের নামের একটা তালিকা বাহির হইয়াছিল, ইহাতে লিলীর একটী প্রতিমূর্ত্তিও ছিল।

লিলীর দল ইংলণ্ডে তৎকালে বেশ জমকাইয়া বসিয়াছিল, তাহারা অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা সকলকে প্রতারিত করিয়া নিজের উদর পূর্ত্তি করিতে ক্রটী করিত না। পণ্ডিত গাটাকার (Gataker) সাধারণের ভ্রমঅপনোদন হেতু যুক্তি ও পাণ্ডিত্য সহকারে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহার পুস্তক ছাপা হইবার সঙ্গে সঙ্গে গণকদিগের মাথায় টনক পড়িয়া গেল। লিলী প্রতি বৎসর পঞ্জিকাতে গাটাকারের মৃত্যুর তারিখ ঠাওরাইয়া দিয়া তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় দিতে আথাড়ি বিথাড়ি করিতে লাগিলেন; তাঁহার সৌভাগ্য ক্রমে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে গাটাকারের মৃত্যু হইল।

তখন লিলীর আস্ফালন দেখে কে? আগষ্ট মাসের পঞ্জিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়া দিলেন "দুরাত্মা গাটাকার এই কবরে পচিতেছে"। একবার লিলী তাঁহার পঞ্জিকায় ছাপাইয়া ছিলেন 'পার্লিয়ামেণ্টের অবস্থা বড় সংকট জনক। যখন পুলিশ আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার উদ্যোগ করিল; অমনি রাতারাতি লিলী তাঁহার পঞ্জিকার পাতা বদলাইয়া তাহার স্থানে নূতন পাতা বসাইয়া দিলেন এবং কমিটীকে জবাব দিলেন— "আমার শত্রু পক্ষীয়েরা আমাকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে জাল করিয়া উহা ছাপাইয়াছে; বাস্তবিক পক্ষে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

স্মৃতি।

(১)

সেই দিন শুভ দিন জীবনে আমার।
আকাশে জলদ জাল,
যেন কালান্তক কাল,
ঢাকিয়াছে ধরণীরে প্রলয় আঁধার।
গুড়ুম গুড়ুম রবে,
গরজে অশনি যবে,
মুশল ধারায় জল ঝরে অনিবার।
ম্লান মুখে সন্ধ্যারাণী,
ঢাকিয়া বদন খানি,
পূর্ণিমায় আঁধারিয়া করে অভিসার।

(২)

আমার জীবণ ধন,
করিয়া জীবণ পন,
এলো ছুটে প্রেম ভরে পিয়াসে আকুল।
শাশুড়ী ননদী ঘুমে
অচেতন লুটে ভুমে
আজি যেন প্রকৃতির সবি অনুকুল।

(৩)

শুনিনু চকিত প্রাণে,
শ্যামের বাঁশরি তানে,
উছলি উঠিল হিয়া ভাসায়ে দুকুল।
ধীরে ধীরে পায় পায়,
মুগ্ধা হরিণীর প্রায়,
হাতে লয়ে গাঁথা মালা সুবাসে অতুল—

(৪)

ভুলিয়া সরম ভয়,
ভাবিয়া প্রেমের জয়,
উপনীত তারি পাশে হইনু যখন;
সে আঁধারে মুখে তাঁর,

জ্যোতি শত চন্দ্রমার,
পশারিয়া বাহু বুকে হইনু পতন।

(৫)

আবার বিজুলি হাসে,
বাঁধি শ্যাম ভুজপাশে,
প্রেম নিমিলিত আঁখি করিল চুম্বন,
সার্থক এ দেহ মন,
সার্থক যৌবন ধন,
সেই দিন হলো ধন্য রাধার জীবন।

(৬)

বনমালী বেনু যন্ত্রে,
ছড়ায়ে মোহন মন্ত্রে,
চলে যমুনার কুলে গভীর নিশায়।
রাধা রাধা নাম গানে,
চলেছে আকুল প্রাণে,
নয়ন মুদিয়া রাধা তাহারে ধেয়ায়॥

শ্রীকুন্দমালা দেবী।

মুসলমানী উপাধির বিশ্লেষণ।

মধ্যবিৎ এবং ধনী বাঙ্গালী সমাজে অনেক গুলি মুসলমানী উপাধি প্রচলিত আছে দেখা যায়। সেই সকল উপাধি বঙ্গীয় হিন্দু-উপাধির ন্যায় নামের একাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সেই সকল উপাধি গুলির বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া এই প্রবন্ধের অবতরণা করিতেছি।

বাঙ্গালী সমাজের বড় বড় ভূম্যধিকারীরা "জমিদার" বলিয়া অভিহিত হন। "শাহেন্থল আকবর" একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস। স্বরূপ চাঁদ ক্ষত্রি নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক ১২০৯ হিজরীতে (১৭৯৪-৯৫ খৃঃ অঃ) ইহা লিখিত হয়। গ্রন্থকার সেই পুস্তকে জমিদার ইত্যাদি কথার কোন্ স্থান হইতে উৎপত্তি হইয়াছে ও কিরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যাঁহারা কতকগুলি গ্রাম অথবা পরগণার রাজস্বের জন্য নবাব সরকারে দায়ী থাকিতেন, তাঁহাদিগকে "জিম্মাদার" বলা হইত। "জমিদার" কথা এই জিম্মাদার শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। আকবর বাদশাহের রাজত্ব কালে পুরাতন প্রসিদ্ধ "মালগুজার" গণকে "জমিন্দার" অথবা 'তালুকদার' বলিয়া অভিহিত করা হইত। পরবর্ত্তী বাদশাহদের সময় কতকগুলি পরগণার স্বত্যাধিকারী গণকেও জমিন্দার বলা হইত।

"তালুকদার" শব্দ বাঙ্গলা দেশেই প্রচলিত আছে, ইহা অন্যদেশে প্রচলিত নাই। এক কিম্বা ততোধিক গ্রামের স্বত্বাধিকারীকে "তালুকদার" বলা হইত। মোগল বাদশাহদের সময়ে ভারতবর্ষে এত লোক সংখ্যা ছিল না। প্রসিদ্ধ জনপদ সমূহ ব্যতীত অনেক স্থানই বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এইসমস্ত স্থান চাষ আবাদের উপযুক্ত করিবার জন্য এবং জঙ্গলাদি পরিস্কৃত করিয়া গ্রাম সমূহ স্থাপন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মী ব্যক্তিদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা হইত। সাধারণ তালুকদার হইতে বিশিষ্ট রূপে পরিচিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে "জঙ্গল বুড়ী তালুকদার" নামে অভিহিত করা হইত। উচ্চশ্রেণীর রায়ত দিগের মধ্যে যাঁহারা ৫০০ এবং তদূর্দ্ধ হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত রাজস্ব প্রদান করিতেন, অথবা কতক গুলি গ্রামের রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজ সরকারে পৌঁছাইয়া দিতেন, তাঁহাদিগকেও "তালুকদার" বলা হইত।

আকবর বাদসাহের সময়ে সমস্ত জেলা গুলি পরিমাপ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এই বিভাগ গুলির রাজস্ব এবং পরিমাপ পৃথক পৃথক ভাবে নির্ণয় হইত। ইহার প্রত্যেক বিভাগটিকে "তালুক" এবং তাহার স্বত্বাধিকারীকে 'তালুকদার" নামে অভিহিত করা হইত। যখন কোন পরগণায় কতক গুলি তালুক সৃষ্টি হইয়া তাহার স্বত্যাধিকারীগণের নাম পৃথক ভাবে বাদসাহ্ সরকারে জারি হইত, তখন তাঁহাদিগকে "তক্‌সিমি তালুকদার" অথবা "মুজগুরি তালুকদার" বলা হইত। আজকালও অনেক পরগণায় "সিক্‌মি তালুক" বর্ত্তমান আছে দেখা যায়। সেই সিক্‌মি তালুকদারগণ রাজস্ব কালেক্টরীতে দাখিল না করিয়া পরগণার মালিকের নিকট দখিল করিতেন। বাংলা দেশে যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকের জন্য কালেক্টরীতে রাজস্ব প্রদান করেন, তাঁহারাই তালুকদার নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গে প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীগণের নামের শেষে "চৌধুরী" উপাধি থাকিয়া তাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। বাস্তবিকই চৌধুরী সম্মান সূচক উপাধি ছিল। একটি আধটি পরগণার মালীককে যেমন জমিন্দার বলা হইত, সেইরূপ দুই বা ততোধিক পরগণার স্বত্বাধিকারী বা রাজস্বের সংগ্রাহককে "চৌধুরী" বলা হইত। প্রসিদ্ধ এবং ধনী, ব্যবসায়ী এবং ব্যাপারী দিগকে "মহাজন" বলা হইত। যে সকল ব্যক্তি সামান্য অর্থ সুদে লাগাইয়া কারবার করিত তাহাদিগকে "সররাফ্" বলা হইত। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা কিঞ্চিৎ ধনী তাহাদিগকে "শা" এবং বিশিষ্ট ধনীকে 'শেট' উপাধিতে ভূষিত করা হইত। চৌধুরীগণ এই সকল মহাজন এবং শেঠ গণের উপর প্রভুত্ব এবং সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী স্বরূপ অনেকটা শাসন সংরক্ষণের কার্য্য করিতেন।

নির্দ্দিষ্ট একটি কিংবা দুইটি গ্রামের রাজস্ব সংগ্রাহককে "পাটওয়ারী" নামে অভিহিত করা হইত।

শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী।

প্রাচীন ভারতে দাসত্ব ও মনুষ্য বিক্রয় প্রথা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতের কোন কোন স্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে, বাজারে দাস বিক্রয় হইত। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে ব্রৃটিশ গবর্ণমেন্ট আইন করিয়া এই কলঙ্কিত প্রথা ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। দাসত্ব প্রথা ভারতবর্ষে কত কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

দাসত্বপ্রথা ভারতবর্ষের একটী অতি প্রাচীন প্রথা। উষার অরুণ আলোকের সহিত পরিচিত হইয়াই আর্য্যগণ জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখন ভারতভূমি অনার্য্যগণের লীলানিকেতন ছিল। আর্য্যগণ এই অনার্য্যদিগকে পরাভূত করিয়া ক্রমে ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। অনার্য্যগণও আর্য্যগণের বুদ্ধিবল এবং অস্ত্রবলের নিকট পরাজিত হইয়া অধীনতা বা দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই অধীনতার ভাব হইতেই ক্রমে দাসত্বভাব সমাজমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ দুর্ব্বলতা বা অধীনতা হইতে ক্রমে দাসত্ব ভাবের বিকাশ যে ভারতবর্ষেই প্রথম বিকশিত হইয়াছিল তাহা নহে। দাসত্ব প্রথা যখন যে দেশে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা এই ভাবেই প্রবেশ করিয়াছে।

আর্য্যদিগের প্রাথমিক জীবন সংগ্রামের ইতিহাস ঋক্ বেদে দাসত্বের কোন স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও দাস শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

ঋক্‌বেদের ৩য় মণ্ডলের ১২শ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋক্, ৪র্থ মণ্ডলের ৩০ সূক্তের ১৪শ।১২শ।২০শ ঋক্ ও ঐ মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ১০ম ঋকে দাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল ঋক্ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে প্রাচীন ঋষিগণ বিজিত শত্রুগণকে দাস বাচ্যে অভিহিত করিয়াছেন। নিম্নে রমেশ বাবুর ঋক্‌বেদের অনুবাদ হইতে দুইটী ঋকের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"হে ইন্দ্রাগ্নি তোমার এক উদ্যোগ দ্বারাই দাসগণের নবতি সংখ্যক পুরী যোগপৎ কম্পিত করিয়াছিল।" ৩।১২।৬

"হে ইন্দ্র তুমি (সোমপানে) হৃষ্ট হইয়া দাসগণের বিরুদ্ধে গমন করতঃ (উহাদিগকে) ভগ্ন করিয়াছিলে। আমরা তোমার সেই বীর্য্য কীর্ত্তন করি।" ৪। ৩২। ১০

ঋক্‌বেদে অনার্য্য অধিবাসীদিগকে দস্যুবাচ্যে অভিহিত করা হইয়াছে। এই দস্যুগণই পরাজিত হইয়া দাসরূপে পরিণত। আমাদের মনে হয়, এই দস্যু শব্দ হইতেই ক্রমে দাস শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

অনার্য্য দস্যুগণ পরাজিত হইয়া দাসরূপে অভিহিত হইলেও তাহারা যে তখনই দাসত্বে ব্রতী হইয়াছিল, ঋক্‌বেদে এমন আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ঋক্‌বেদের রচনা সময় ভারতবর্ষে অল্পে অল্পে আর্য্য প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল এবং বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্য্যরাজগণ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। (১) কিন্তু তখনও ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

ঋক্‌বেদের প্রাথমিক সময় চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠা না হইলেও সমাজের প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ এবং দ্রব্যাদি নির্ম্মাণও সংগ্রহের জন্য লোক ছিল। রথ নির্ম্মাতা, মেষপালক, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, নৌকা নিম্মাতা ও নৌকা পরিচালক,

(১) ঋক্‌বেদ ৩ অঃ ১মঃ ১৫সূ— ৭। ৮। ৯। ১০ ঋক্।

তন্তুবায় ও বস্ত্র নির্ম্মাতা, কূপ খননকারী, ছুতার, চিকিৎসক, স্তোতা, কর্ম্মকার প্রভৃতির অস্তিত্ব বৈদিক সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

এই সময় সমাজের প্রয়োজন ও নিজের অভাব লক্ষ্য করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও হীন ব্যক্তিরা যাহার যে ব্যবসায় ইচ্ছা, সে সেই ব্যবসায় করিত। ৯ম মণ্ডলের ১১২ সূক্তের ৩য় ঋক্‌টী তাহার পোষক প্রমাণ রূপে এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রমেশ বাবুর অনুবাদ এইরূপ -

"দেখ আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব ভজন কারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি।"

এই সময় ধনাঢ্য সমাজে নর্ম্মসচিবের (মোসাহেব) ও অভাব ছিলনা। (২) এইরূপ অবস্থায় সমাজ যে দাসহীন ভাবে সম্পূর্ণ ভাবে স্বাবলম্বী ছিল, তাহা কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। সমাজ যখন গঠিত হইয়াছিল, তখন অবশ্যই ভৃত্যের কার্য্যোপযোগী লোক ও সমাজে গঠিত হইয়াছিল; তবে এ সকল কার্য্য কিরূপ ভাবে সম্পাদিত হইত, সমাজ সেই সকল কার্য্যের জন্য কিরূপ ভাবে পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা আলোচনার বিষয়।

ঋক্‌বেদে ক্রয় বিক্রয়ের উল্লেখ আছে। ৯ম মণ্ডলের ১১২ সূক্তের ২য় ঋকে আছে—"কর্ম্মকারগণ বাণ প্রস্তুত করিয়া সেই বাণ ক্রয় করিবার উপযুক্ত কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে।" এই ঋকাংশ দ্বারাই তৎকালীন সমাজে ক্রয় বিক্রয়ের প্রথার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি সম্বন্ধে ও ঋকবেদে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (৩)

দাস বা ভৃত্য ব্যবহার তৎকালে কিরূপে সম্পাদিত হইত, ঋক্‌বেদ হইতে তৎসম্বন্ধীয় কোন সুস্পষ্টভাব গ্রহণ করা যায় না। তবে তৎকালীন অবস্থা যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে অর্থ ও বুদ্ধিবল দ্বারাই যে সমাজ পরিচালিত হইত, তাহা বেশ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অনসন ক্লিষ্ট দীন এবং স্বল্প বুদ্ধি-মানবের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ধনবান্ ও বুদ্ধিমানের গৃহে আশ্রয় ভিক্ষা স্বাভাবিক। এই উপায়েই যে সমাজ পরিচালিত হইত তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় প্রথা, সেই প্রাচীনতম যুগেই সমাজ দেহে প্রবেশ করিয়াছিল কিনা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে না। ঋক্‌বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ১৫ সূক্তের দশম ঋক্‌টি এইরূপ।

"কে আমার ইন্দ্রকে দশটি ধেনুদ্বারা ক্রয় করে। যখন ইন্দ্র শত্রুদিগকে বধ করিবেন তখন তাহাকে পুনর্ব্বার আমায় প্রদান করিবে।"

ঋকবেদে শুনঃশেপের বিলাপ আছে। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি ঋকবেদের ৭টি সূক্তের রচয়িতা। তাহার রচিত ১ম মণ্ডলের ২৪ সূক্তের ১ম ঋকটি এইরূপ :—

"দেবগণের মধ্যে কোন শ্রেণীর কোন দেবের চারু নাম উচ্চারণ করিব। কে আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে আবার ছাড়িয়া দিবেন, যে আমি আমার পিতা মাতাকে দর্শন করিতে পারি।"

শুনঃশেপ কি দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া এই ঋক্‌টী রচনা করিয়াছিলেন, বেদে তাহা অপ্রকাশিত থাকিলেও পুরাণ কারগণের দিব্যদৃষ্টি তৎ কারণ প্রদর্শনে ক্রটী করে নাই।

বেদের পরবর্ত্তী গ্রন্থ ঐতরীয় ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবৎ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে প্রচুর পল্লবিত হইয়া এই শুনঃশেপ বিলাপ কাহিনী লিপি বদ্ধ হইয়াছে।

আধুনিক পুরাণ গ্রন্থগুলি রচিত হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ গুলিই পুরাণ বাচ্যে অভিহিত হইত। রামায়ণের পুরাণ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—সূর্য্যবংশাবতংশ রাজা অম্বুরীষ স্বীয় যজ্ঞে মনুষ্য বলি প্রদান জন্য শুনঃশেপকে তাঁহার পিতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া আনয়ণ করেন। পিতামাতা কর্তৃক বিক্রীত শুনঃশেপের করুণ বিলাপে মাতুল বিশ্বামিত্রের হৃদয় দ্রবীভূত হয়। বিশ্বামিত্র ভাগিনেয়কে আগ্নেয় মন্ত্রে অভিষিক্ত করেন। শুনঃশেপ সেই মন্ত্র প্রভাবে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিয়া যুপ কাষ্ঠ হইতে রক্ষা পান। (আদি ৬১)

রামায়ণের বর্ণনার সহিত উপর্য্যুক্ত অন্যান্য গ্রন্থ গুলির বর্ণিত শুনঃশেপ কাহিনীর বিষয়গত প্রভেদ থাকিলেও সকল গ্রন্থেই শুনঃশেপের ক্রয় বিক্রয় কাহিনীটীর উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

(১) ম ১১ সূ— ১। ২। ৩ ঋক্ দেখুন।
(২) ৯ম—১১২সূ—৪ ঋক্।
(৩) ৪ম—২৪ সূ—৯ঋক্।

এইখানে কথা উঠিতে পারে, যে শুনঃশেপ নির্ম্মম মাতাপিতা কর্তৃক এইরূপ নির্দ্দয় ভাবে বিক্রীত হইলেন, তিনি সেই মাতা পিতাকে দর্শন করিবার জন্য এত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবেন কেন। শুনঃশেপের চরিত্র লক্ষ্য করিলে এই প্রশ্নের মীমাংসার পথ সহজ হইয়া পড়ে।

রামায়ণের ঐ অংশ হইতে তৎকালীন সমাজের মনুষ্য বিক্রয় চিত্র এবং শুনঃশেপের চরিত্রটী বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইবে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

রাজা অম্বুরিষ কহিলেন "যদি আপনি শত সহস্র গাভী মূল্যে একটী পুত্র বিক্রয় করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই। আপনার তিনটী পুত্র অছে, আপনি মূল্য লইয়া আমাকে একটী পুত্র প্রদান করুণ।"

ঋচিক (১)—"নরশ্রেষ্ঠ। আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন মতেই বিক্রয় করিব না।"

ঋচিকপত্নী—"মহারাজ আমিও আমার প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না। রাজন্ জগতে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা জনকের এবং কনিষ্ঠ পুত্রেরা জননীর প্রিয় হইয়া থাকে। অতএব আমি কনিষ্ঠ পুত্রটীকে রাখিব।"

অনন্যোপায় হইয়া তখন মধ্যম পুত্র শুনঃশেপ বলিলেন "রাজপুত্র আমার পিতা বলিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিক্রেয় এবং মাতা বলিলেন কনিষ্ঠ পুত্র অতি প্রিয় সুতরাং বোধ হইতেছে আমি মধ্যম আমিই বিক্রেয় (২)। আমাকে হইয়া যান।"

অনন্তর বহুগাভী ও সুবর্ণ বিনিময়ে অম্বুরীষ শুনঃশেপকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

রামায়ণী যোগে মানুষ ক্রয় বিক্রয় প্রথা সমাজে প্রচলিত না হইলে সেই যুগের সম সাময়িক কবির লেখনী মুখে নিঃশঙ্কোচ যুক্তি তর্কের সহিত এইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতে পারিত না।

---

(১) রামায়ণে শুনঃ শেপকে ঋচিক ঋষির পুত্র বলা হইয়াছে। ঋক্ বেদের শুনঃ শেপ আজিগর্ত্তের পুত্র, ভাগবতে আবার শুনঃশেপ ক্রেতা অম্বুরীষ নহেন, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত। বেদে, পুরাণে, ইতিহাসে এইরূপ প্রভেদ নিত্য।

(২) পিতা জ্যেষ্ঠমবিক্রেয়ং মাতাচাহ কনীয়সম্।
. বিক্রেয়ং মধ্যমং মন্যে রাজপুত্র নয়স্বমাম্॥

এই শাস্ত্রবাক্য অবলম্বনেই বোধ হয় মধ্যম পুত্রকে বর্ত্তমান সময় দত্তক প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রামায়ণের সময় চাতুর্ব্বর্ণ্য সম্মত সমাজ প্রতিষ্ঠীত হইয়া শূদ্রজাতির মস্তকে দাসত্বের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। দাস দাসীর অবস্থা কোন কোন বিষয়ে এই সময়ই অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা গৃহস্বামীর ইচ্ছানুসারে স্থানান্তরিত হইতে বাধ্য হইত। সীতা বিবাহে যৌতুক স্বরূপ বহু দাস দাসী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের দাস দাসী এইরূপ দান সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত ছিল।

মহাভারতকার দাসের পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, "শূদ্র শুশ্রূষার্থী হইয়া আসিলে তাঁহার জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। পরিচারক পুত্রহীন হইলে পিণ্ডদান এবং বৃদ্ধ হইলে তাহার ভরণপোষণ করা প্রভুর অবশ্য কর্ত্তব্য।" (শান্তি পর্ব্ব ৬০ অধ্যায়)

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্ত প্রকার দাস বা ভৃত্যের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা (১) হৃত দাস (যুদ্ধে জয় লব্ধদাস), (২) ভক্তদাস (কেবল ভাতের বা অন্নের অর্থাৎ পেটে খাইয়া), (৩) গৃহজদাস বা নিজ গৃহের দাসীপুত্র, (৪) ক্রীত দাস (মূল্যদ্বারা প্রাপ্ত), (৫) দত্রিম দাস (দান প্রাপ্ত), (৬) পৈত্রিক দাস (পিতৃপিতামহ ক্রমে আগত) ও (৭) দণ্ডদাস (রাজ দণ্ডে দণ্ডিত)। (মনুসংহিতা ৮ম অধ্যায়)

ইহার পর বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাম্য মন্ত্রে ভারতের কোন কোন স্থান হইতে দাসত্ব প্রথা ও দাস বিক্রয় প্রথা একবারে তিরোহিত হইয়া যায়, এবং বেতন গ্রাহী স্বেচ্ছা সেবক প্রথা প্রচলিত হয়। গ্রীক ভ্রমণ কারী মেগাস্থানিসের উক্তি হইতেই আমরা এইরূপ অনুমান করিতেছি।

খ্রীষ্টঃপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রাকদূত মেগাস্থানিস্ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তিনি ভারতে দাসত্ব প্রথার অভাবলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—

ভারতবাসিদিগের মধ্যে একটী মহৎ প্রথা এই যে কোন অবস্থাতেই কেহ অন্যের দাসত্ব গ্রহণ করে না। ভারতবাসী সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা উপভোগ করে। প্রত্যেক ভারতবাসীই স্বাধীন। লেকডমিয়া বাসীরা হিলট দিগকে দাসরূপে ব্যবহার করে, এই হিলটেরা তাঁহাদের হীন কার্য্য সকল সম্পাদন করে। কিন্তু ভারতবাসীরা স্বদেশের কথা দূরে থাকুক, এমনকি বিদেশীয়কেও দাসরূপে গ্রহণ করেনা।"

মেগাস্থানীসের পর খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এরিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ও ভারতীয় দাসত্ব সম্বন্ধে মেগাস্থানিসের বাক্যই তাহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রে ক্রীত দাস ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। মেগাস্থানিস যে সিংহাসন পার্শ্বে বসিয়া ভারত-তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই সিংহাসনের অধিকতর সন্নিকটে থাকিয়া ভারতের শুভাশুভ ব্যবস্থা কারক মন্ত্রনা বিশারদ চাণক্য এই রাজ অনুশাসন নীতি —অর্থ শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

মেগাস্থানিস অতি অল্পদিন মাত্র ভারতে অবস্থান করিয়া ছিলেন; এরিয়ানের ভারতীয় অভিজ্ঞতা আরও সামান্য, এমন স্থলে বৈদেশিক ভ্রমণকারী দ্বয়ের এই মত নিরঙ্কুশ বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে।

মনুসংহিতা পাঠে আমরা তৎকালীন সমাজের অন্তর্গত দাসত্ব প্রথার অবস্থা একটু বিষদ ভাবে অবগত হইতে পারিতেছি। মনু শূদ্র দাসের প্রতি একটু জোর-কলম চালাইয়াছেন। মনু লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণ কোন স্থলেই ব্রাহ্মণকে দাস করিবেন না। ক্রীতই হউক আর অক্রীতই হউক, ব্রাহ্মণ শূদ্র দ্বারা দাস্য কর্ম্ম করাইয়া লইবেন। (৮ম অধ্যায় ৪১৩)

ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণ ও যে এক সময় দাস্য বৃত্তি অবলম্বন কারী ছিলেন তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। (১)

মনু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রয়োজন হইলে বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন কিন্তু তাহাদিগের পক্ষে মনুষ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। (২)

(১) চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় ব্রাহ্মণেতর সমাজ ব্রহ্মণ সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করেন। এই সময় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতর সমাজ হইতে দাস না পাইয়া ব্রাহ্মণগণ হইতে দাস গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। ইহার পর ব্রাহ্মণ্যতেজ ক্ষত্রিয় শক্তিকে হস্তগত করিয়া বৈশ্য ও শূদ্রকে আজ্ঞা কারী করিলে এই ৪ ৩ ধারাটী সংহিতার ভিতর প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই সমাজ বিপ্লবটীকে বৌদ্ধ বিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

(২) পুরাণোক্ত হরিশ্চন্দ্র ও শুনঃশেপ উপাখ্যানে কিন্তু সে অনুশসানের সম্মান রক্ষিত হয় নাই। বোধ হয় মনুসংহিতার প্রণেতা (?) এই পৌরানিক ঘটনাটী লক্ষ্য করিয়াই পরবর্ত্তী কালে এই ধারাটী বিধি বদ্ধ করিয়াছিলেন।

মেগাস্থানীসের পরবর্ত্তী কালের ভারতীয় কাব্য ও নাটক গ্রন্থাদিদ্বারাও মেগাস্থানীসের মত সমথিত হয় না।

কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীর বৃদ্ধ কঞ্চুকীর উক্তিতে দাস জীবনের একটী মর্ম্মান্তিক ব্যথা প্রকটীত হইয়াছে।

মৃচ্ছকটিকের দ্যূত ক্রীড়াশক্ত সংবাহক আত্মক্রীত কর্ম্মফলে ঋণজালে বিজরিত হইয়া শেষ আত্ম বিক্রয়ে উদ্যত। পরিচারিকার প্রেমাস্পদ শর্ব্বিলক প্রেমপাত্রী মদনিকাকে বসন্তসেনার দাসীত্ব হইতে বিমুক্ত করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র।

এই আত্ম বিক্রয়ের চিন্তা এবং দাসত্ব মুক্তির ব্যগ্রতা ও চেষ্টার ভিতর প্রাচীন ভারতের মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে।

এই দাসত্ব প্রথা ও দাস ক্রয় প্রথা ভারতের নিজস্ব। ইহার পর মুসলমান প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আরবীয় দাসত্ব প্রথা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। আরবীয় দাসত্ব প্রথা প্রাচীন ভারতীয় দাসত্ব প্রথা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনার চেষ্টা করিব।

দাসত্ব জঘন্য হইলেও ভারতীয় সমাজে দাস দাসীর সম্মান সামান্য নহে। প্রাচীন ভারতে দাস দাসী পরিবারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল। বৃদ্ধ দাস দাসী পিতা মাতার ন্যায় পূজনীয় ছিল। হিন্দুগৃহস্থ দাস দাসীকে অবহেলা করিয়া অগ্রে ভোজন করিতেন না। এতৎ সম্বন্ধে মহা কবি কালিদাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"বাল সুবাসিনী বৃদ্ধা গর্ভিণ্যাতুর কন্যকাম্।
সন্তোজ্যাতিথি ভৃত্যাংশ্চ দম্পতোঃ শেষভোজনম্॥"

বাঙ্গলার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র ও সাময়িক পত্র।

মুদ্রাযন্ত্র সভ্য সমাজের একটী প্রধান উপকরণ, পত্রিকা পরিচালনের মুখ্য উপায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ ভারতবর্ষের প্রভুত্ব গ্রহণ করিলেও তাঁহারা প্রভুত্ব

স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, পত্রিকা পরিচালন, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি উন্নত সভ্যতানুমোদিত কার্য্য সকলে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

এই সময় এ দেশের অবস্থা খুব উন্নত ছিল না। দেশীয় লোকের ভীতিভাব যেমন প্রবল ছিল, উত্তেজনার ভাবও তেমনি বিলক্ষণ ছিল। সুতরাং রাজপুরুষগণ একেবারে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাইতেছিলেন না।

মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্রের অভাব যে ভারত প্রবাসী ইংরেজ পুরুষগণ তখন অনুভব করিতেন না, তাহা নহে। তাঁহারা এতদোভয় বিষয়ে প্রচুর অভাব অনুভব করিতেন; কিন্তু ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের প্রাথমিক কার্য্যের সেই ক্রটী বিচ্যুতির সময় তাঁহাদের সেই সকল কার্য্যের উপর মন্তব্য প্রচারিত হওয়া ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাহা আলোচিত হওয়া ইংলণ্ডীয় কাউন্সিল সভা নিরাপদ মনে করিতেন না!

যাই হউক এইরূপ ঔদাস্য সত্বেও ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরাজের দেওয়ানী গ্রহণের পরেই বোল্টস্ নামক একজন ইংরেজ কাউন্সেল হাউসে ও নানাস্থানে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণকে অবগত করাইয়া দেন যে যদি কেহ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাহাকে সম্যক প্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

বোল্টস্ সাহেবের এবম্বিধ আগ্রহ সত্বেও কেহ যে এই বিজ্ঞাপন প্রচারের দশ বৎসরের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এমন অবগত হওয়া যায় নাই।

অতঃপর ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির কর্ম্মচারী উইলকিন্স সাহেব (Sir Charles Wilkins) নিজে অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া হুগলিতে এক বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। উইলকিন্সের নির্দ্দেশ অনুসারে হুগলীর পঞ্চানন কর্ম্মকার কাঠ খোদিয়া বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিল। এই মুদ্রাযন্ত্রই বাঙ্গালার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র। এই যন্ত্রে কাঠের অক্ষরে মাত্র এক খানা পুস্তকই মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তক—হলহেড্ সাহেবের 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'।

ইহার পর ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইংরাজী মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্র ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী শনিবার হইতে হিকি সাহেব (James Augustus Hicky) "বেঙ্গল গেজেট" নামে ইংরেজী সংবাদ পত্র বাহির করেন। Bengal Gazetteই বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম সংবাদ ও সাময়িক পত্র। বেঙ্গল গেজেট জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমে বেশ নীরবে চলিতেছিল। কিছুদিন পরেই তাহাতে গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইলাইজাইম্পের বিরুদ্ধে গ্লানিকর আক্রমন বাহির হইতে লাগিল। এইরূপ কয়েক সংখ্যায় বাহির হইলে ১৪ই নবেম্বর পোষ্টাফিসের দ্বারা এই পত্রিকার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ ব্যবস্থা করিলে হিকি ২০জন হরকরা নিযুক্ত করিয়া বাড়ী বাড়ী পত্রিকা বিলি করিতে লাগিলেন এবং ঘোষণা করিলেন, যদি তাহাকে হোমারের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গলিতে গলিতে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে হয়, তথাপি তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বিরত হইবেন না।

পোষ্টাফিস দ্বারা পত্রিকা প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়ার পরও হিকির গ্লানিকর লেখনীর নিবৃত্তি হইল না দেখিয়া ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস তাহার নামে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ আনয়ন করিলেন।

এই অভিযোগ পাইয়া স্যার ইলাইজইম্পে তাহাকে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করেন ও কারারুদ্ধ করেন। দণ্ড দিয়া কারামুক্ত হইয়া হিকি পুনরায় আসরে অবতীর্ণ হইলেন। পুনরায় লেখনী মুখে প্রধান রাজপুরুষ ও প্রধান বিচারকের কুৎসা প্রচার করিতে লাগিলেন, ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় হিকির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইল। এই অভিযোগে হিকি ১ মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইলেন, তাহার মুদ্রাযন্ত্রও বাজেআপ্ত হইল। ফলে—"বেঙ্গল গেজেট" লীলা সম্বরণ করিল।

ইহাই বাঙ্গালার প্রাথমিক মুদ্রাযন্ত্র ও সাময়িক পত্রের উত্থান পতনের ইতিহাস।

৺সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অজ্ঞাত বন কুসুমের মত সতীশ চন্দ্র বিরলে বর্দ্ধিত হইয়া নীরবে পৃথিবীর কোল হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিকগণের ন্যায় তিনি বিজ্ঞাপনের ঢাক ঢোলে নিজকে জাহির করিতে জানিতেন না তাই বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিবর্গের নিকট
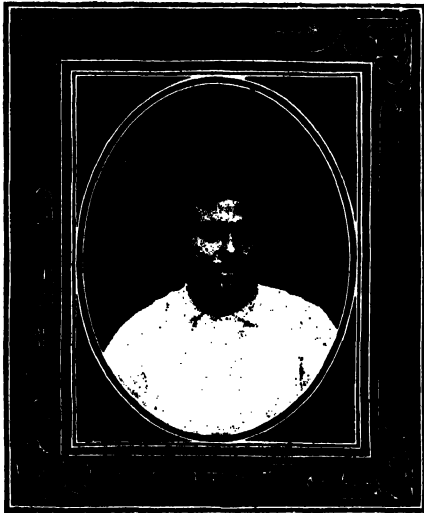
৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তিনি অপরিচিত রহিয়া গিয়াছেন। যে নিজকে আদর করিতে জানে না, সে সাধারণের নিকট সম্মানের কি দাবী করিতে পারে? বোধ হয় সেই জন্যই সতীশ চন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভ্য তালিকা ভুক্ত হইয়াও বর্দ্ধমানের মিলনোৎসবের মৃতের তালিকায় উল্লেখযোগ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন নাই। সতীশ চন্দ্র নিজকে সর্ব্বদাই তৃণাদপি সুনীচ মনে করিতেন।

আমরা সতীশ চন্দ্রকে সর্ব্বদাই নীরব সাহিত্যসেবী বলিয়াই জানিতাম। বাস্তবিক কিন্তু তাঁহার এই নীরবতার অন্তরালে অনন্য সাধারণ কার্য্যপটুতা, প্রভুত চিন্তাশীলতা এবং সত্য নির্ণয়ে প্রগাঢ় চেষ্টা বর্ত্তমান রহিয়াছিল। সে জন্য আমরা তাহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতাম।

সাহিত্য ক্ষেত্রে সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ "দুর্ম্মুখের" সরস সময়োপযোগী, ও মোলায়েম ব্যঙ্গ রচনায় ও তীব্র কশাঘাতের সময়। "দুর্ম্মুখ" যখন এক শ্রেণীর সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল তখন আমরা যে কয়জনকে তাহার পরিচালনে অগ্রসর দেখিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র অন্যতম। দুর্ভাগ্যের বিষয় "দুর্ম্মুখের" দলের প্রধান তিন জনই অকালে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। একজন রসিক কবি ৺ মনোমোহন সেন দ্বিতীয় "বাঘা তেঁতুলের" চাবুকধারী ৺ রজনী কান্ত চৌধুরী তৃতীয় আমাদের "ভবঘুরে" নামধারী এই সতীশ চন্দ্র।

সতীশচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যকে আপন জননীর মত পূজনীয়া মনে করিতেন। একটী কথায় আমরা আজ তাহা দেখাইয়াই বিদায় লইব। তাঁহারা পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন ময়মনসিংহে ভাষা জননীর মহা পূজার আয়োজন হইতেছিল। ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক কেদার বাবু সতীশ চন্দ্রকে জামালপুর ও টাঙ্গাইল প্রভৃতি অঞ্চলের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে ও ঐতিহাসিক স্থান সমূহের আলোক চিত্র সংগ্রহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় সতীশ চন্দ্র কেদার বাবুকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার নয়নের মণি ভ্রাতুষ্পুত্রটী মৃত্যু শয্যায়, আমি তথাপি মহাপূজায় পুষ্পাঞ্জলির অর্ঘ্য সাজাইতে যত্নের ত্রুটি করিবনা। ছেলেটী যদি বাঁচে

ভগবানের দান বলিয়া চুম্বন করিব। আর যদি তাহার জীবনান্ত হয়, তাহার সৎকার করিয়া, অশ্রুহীন অকম্পিত হৃদয়ে উদ্দিষ্ট কার্য্যে ব্রতী হইব। সময় নষ্ট করিবনা।” এমন পূজারি যে ভাষার পবিত্র মণ্ডপে প্রবেশ করে, সে পূজা যে সার্থক এবং বরদ হয়, সে সম্বন্ধে কি দ্বিধা করা চলে? আর কেহ এরকম বলিদানে পূজার সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনি নাই। শেষটা আত্ম বলিদান করিয়া সতীশ পূজার দক্ষিণান্ত করিয়াছেন। সাহিত্য সেবাব্রতে যে জীবনের কার্য্যারম্ভ, সাহিত্য সেবাই তাহার অকাল পরিসমাপ্তি।

আজ কয়েক বৎসর যাবত সতীশচন্দ্র “পদ্মাপুরাণের” আদিকবি নারায়ণ দেব সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। নারায়ণ দেব সম্বন্ধীয় তাঁহার বিস্তৃত প্রবন্ধ “রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সুলেখক শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ, মহাশয় মহা আড়ম্বরে সতীশ চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ লইয়া অনেক বাদ প্রতিবাদ হয়। সতীশবাবুর অকাট্য নজীর, অভ্রান্ত সাক্ষি সাবুদ ও খাঁটি দলীল দস্তাবেজের সম্মুখে কাহার কোন আপত্য টিকে নাই।

সতীশচন্দ্র “রঙ্গপুরের শাখা সাহিত্য পরিষদের” এক জন কর্ম্মীপুরুষ ছিলেন। ‘রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার” অন্যতম লেখক হইলেও “উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের” কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহাদিগের বিগত সম্মিলনে তাহাদের এই সভ্যটীর নাম লইয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সতীশ চন্দ্র ময়মনসিংহের ঐতিহ্য সংগ্রহে যে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। সতীশচন্দ্র যে দিন যে স্থানে থাকিয়া যে যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা তখনই সম্পাদক কেদার বাবুকে পাঠাইয়াছেন। * আমরা সম্মিলনের সময় তাহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। প্রত্যেকখানি পত্রের ছত্রে ছত্রে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা এবং কর্ম্মক্ষমতা যেন পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার নবগ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। ১২৮৬ সালের ১৬ই ভাদ্র সতীশচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা অদ্যাপি বর্ত্তমান। মাতা, যুবতী পত্নী ও তিনটী শিশু পুত্রকন্যা রাখিয়া ১৩২১ সালের ২০শে পৌষ অকালে বসন্ত রোগে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রী—

* আমরা ৺ সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সংগৃহীত এই ঐতিহাসিক বিবরণগুলি চিত্র সহ আগামী সংখ্যা হইতে সৌরভে প্রকাশ করিব। সৌঃ সঃ।

কালের ডায়রী।

(জন্ম কথা)

লোকে আমাকে কাল বলিয়াই জানে আমিও আমার স্মারক লিপিতে মানবের কীর্ত্তি কলাপের একটা কাল আঁচড় রাখিয়া দেই—তাহার ধ্বংস নাই কিন্তু মানা হস্তে পড়িয়া নানা বর্ণে চিত্রিত হয় মাত্র। আজ সেই প্রাচীন ডায়রীর এক পৃষ্ঠা খুলিলাম। সে ডায়রী অতি জীর্ণ কীট দষ্ট।

“সে সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। তখন এদেশে মোগলের বিজয় বৈজয়ন্তি বাজিয়া উঠিয়াছে। মোগলকুল তিলক আকবর সাহ তখনও জীবিত।

"ময়মনসিংহ জেলার উত্তরপ্রান্তে গারো পাহাড়। সেই গারো পাহাড়ের পাদদেশ প্রক্ষালিত করিয়া ক্ষুদ্র কায়া পার্ব্বত্য নদী সোমেশ্বরী আঁকিয়া বাঁকিয়া আপন উচ্ছ্বাসে ছুটিয়াছে। এই পর্ব্বত্য স্রোতস্বতীর পশ্চিম তটে সোমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত মনোরম ছায়া শীতল ক্ষুদ্র রাজ্য সুসঙ্গ-পূর্ব্বপারে বিস্তৃত গারো পাহাড়।

"আষাঢ়মাস, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ। আকাশ এখন একটু পরিস্কার, দূরে মেঘ রাশি কুণ্ডলী করিয়া ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর বিস্তৃত হইতেছিল, নিকটে সোমেশ্বরীতে নানা রঙ্গের ফুলরাশি ভাসিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তখনও সন্ধ্যার ঘন ছায়া পৃথিবী ঘেড়িয়া আসে নাই। এমন সময় ঠাকুর জানকী নাথ বাহির হইলেন। সমস্ত গ্রাম খানি প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার জন্য স্বীয় চণ্ডীমণ্ডপে উপনীত হইলেন। তখন সন্ধ্যার কালছায়া পৃথিবী গ্রাস করিয়াছে। জানকীনাথ সেখানে বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক পরি সমাপ্তি করিলেন। তারপর বাহির হইয়া সোমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত সুসঙ্গ রাজ্যের রক্ষকরূপি অশোক বৃক্ষটী প্রদক্ষিণ করিলেন। ইহাই তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য। আজ এইখানে দাস দাসী সকলে তাহাকে ঘেড়িয়া ধরিল। সকলের মুখে এক আনন্দের ঢেউ খেলা করিতেছিল সকলেই কিছু পুরস্কারের অভিলাষী; কুমারের জন্ম সংবাদ কে জানকীনাথকে অগ্রে শুনাইবে তাহার জন্য সকলেই ব্যগ্র।

জানকীনাথ সকলকেই আশ্বস্ত করিয়া ছেলের জন্ম সময় নির্ণয়ে মনোযোগী হইলেন। গণক গণিয়া যাহা বলিল তাহাতে জানকীনাথ নিজকে সৌভাগ্য বান মনে করিয়াই সকলকে যথেষ্ট পুরস্কারে পুরস্কৃত করিলেন। রাজধানীতে আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল।'

অঙ্কুর।

"যথা সময়ে রীতিমত কুমারের নামাকরণ হইয়া গেল। পঞ্চমবর্ষ বয়সে বালক রঘুনাথের হাতে খড়ি পড়িল। তখন লেখা পড়া করিবার বড় তেমন তাড়না ছিল না শিকার শিক্ষা করাই রাজপুত্রদের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল এবং এই বিষয়ে তাঁহারা অত্যধিক উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেন।

'জানকী নাথ কুমার রঘুনাথকে শিক্ষায় দীক্ষায় স্বীয় মনোমত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। সঙ্গে রাখিয়া শস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় কুমার গুরুগৃহে প্রেরিত হইল। সেখানে ভৃত্যের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া রঘুনাথ বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।"

পার্ব্বত্য নদী সোমেশ্বরী।

"তখন গারো পাহাড়ে সুসঙ্গ রাজগণ স্বাধীন ভাবে হস্তীর খেদা করিতেন। রঘুনাথ ছোট বেলা হইতেই পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বন্যহস্তী শিক্ষিত করা ও পরিচালন করার কৌশল শিক্ষা করিতে ছিলেন এবং অবসর পাইলেই পাহাড়ের নিবিড় অরণ্যে শিকার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং বন্য পশু পক্ষী ধরিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেন। রাজকুমারের মল্লযুদ্ধেও বেশ খ্যাতি ছিল; তাঁহার শারীরিক শক্তিও যথেষ্টছিল।

"জানকীনাথ ভৌমিক শ্রেষ্ঠ ইশা খাঁর সমসাময়িক লোক ইশা খাঁ জানকী নাথকে স্বীয় করায়ত্ত করিবার জন্য বহু শর জাল বিস্তার করিতে ছিলেন কিন্তু জানকীনাথ স্বীয় দূরদর্শিতায় ও তাহার বিপুল গারো বাহিনীর প্রভাবে ইশা খাঁর সকল সন্ধান ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল। উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বীতার বিরামছিল না।

"কুমার রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহ একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং সর্ব্বদা পিতার সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেন। জানকীনাথ বাল্য হইতেই রঘুনাথের প্রাণে স্বাধীনতার একটা বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে সেই অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। স্বাধীনতার জন্য রঘুনাথের প্রাণে নব আশা জাগিয়া উঠিল। তিনি গারো বাহিনী প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করিলেন।

বিবাহ।

"উপযুক্ত বয়সে রাজা জানকীনাথ পুত্রের বিবাহ দিতে সংকল্প করিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারে রঘুনাথ যেরূপ বীরত্বও অদ্ভুত পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিল তাহা আজও আমার থাকিয়া থাকিয়া স্মরণ হইতেছে।

"সুসঙ্গের জোয়ারদারগণের সহিত রাজ পরিবারের পুরুষানুক্রমিক শত্রুতা বিদ্যমান। জানকীনাথ পুত্রকে বিবাহ করাইবেন জানিতে পারিয়া লস্কর উপাধি ধারী জনৈক জোয়ারদার স্বীয় কন্যা প্রদানে অভিলাষী হইয়া রাজ সকাশে উপস্থিত হইলেন। জানকীনাথ ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন।

অশোক বৃক্ষ।

"যথারীতি রাজকুমার শোভা যাত্রা করিয়া বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন, সময় মত বিবাহ হইয়া গেল।

"বিবাহ অন্তে কুমার রঘুনাথ বাসরগৃহে উপনীত হইলেন। দেখিলেন সব নীরব। নবপরিনীতা পত্নী শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতিছেন। রঘুনাথ ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। নববধূ প্রথমে মৌণভাবেই রহিলেন। পরে, অনেক চিন্তা করিয়া

বলিলেন "চতুর্দ্দিকে আপনাকে হত্যা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত রহিয়াছে আপনি এখনও ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিতেছেন না।" সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না। কেবল কাঁদিতে লাগিল।

"রঘুনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। অনুসন্ধান করিতে যাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এখন উপায়? গৃহের চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান। রঘুনাথ মুহূর্ত্ত মধ্যে শত্রুর চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন; তখন অসীম সাহসে ভর করিয়া স্বীয় নব পরিণীতা পত্নীকে উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারায় নিজ পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া একখানা বংশদণ্ড মাত্র সম্বল করিয়া হুহুঙ্কারে বাহির হইলেন। তাঁহার তৎকালিক মূর্ত্তি দেখিয়া প্রহরীগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি এই ভাবে নিশীথে স্বীয় পত্নীকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

"রঘুনাথের এই বিবাহ ব্যাপার হইতে এখন সুসঙ্গ রাজকুমারগণকে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাসর যাপন করিতে দেখিতে পাই।"

(সংগ্রাম)

"আমার হাতে কারো সোয়াস্তি নাই। আমি মানবের সুখ সম্পদ, রূপ যৌবনের অনিত্যতা বুঝাইতে নিয়ত ব্যস্ত, কিন্তু হায় অবোধ মানব ভুলিয়াও সে দিকে তাকায় না।

"মানুষ যখন সম্পদের মাঝ খানে থাকে তখন আমার দিকে মুখ তুলিয়াও চায় না। কিন্তু আমি মিনিটে মিনিটে তাহাকে আমার করাল গ্রাসে টানিয়া আনি। সে কিছুতেই তাহা টের পায় না। আমি চক্রের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসি; চক্রের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাই। কাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া ধ্বংস করি কাহাকেও সজোরে উর্দ্ধে উঠাইয়া দেই। যাহাকে নিম্নে চাপিয়া নিষ্পেষিত করি তাহার পক্ষে দিন কি কঠোর। কি ভীষণ কালান্তক কাল!

জঙ্গল বাড়ী পরিখা।

"রাজা জানকীনাথ চতুর্দ্দিক বাঁধিয়া সুখের সংসার পাতিয়া ছিলেন এমন সময় একদিন প্রত্যুষে কাল বৈশাখীর ঝড়ের মত ছু মারিয়া তাহাকে উড়াইয়া আনিলাম। কাহারও সাধ্য হইল না তাহাকে রক্ষা করে। কালের টানে জোড় করিতে পারে কে?—সে যত বড় ক্ষমতাবান হোক না কেন?

"তারপর কুমার রঘুনাথকে যথারীতি মুকুট পড়াইয়া সুসঙ্গের মসনদে বসাইলাম। রঘুনাথকে বুঝাইলাম ইশাখাঁর ষড়যন্ত্রেই তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তাই সর্ব্বপ্রথম সে, সেই পিতৃ শত্রুকে বিনাশ জন্য আপনার

সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল। গারো বাহিনী সজ্জিত হইল।

"পরিখা পরিবেষ্টিত জঙ্গল বাড়ীর সুদৃঢ় দুর্গে বসিয়া ইশার্খা গুপ্তচরের মুখে সকল সমাচার অবগত হইলেন এবং সসৈন্যে রঘুনাথের গতিরোধ করিতে বাহির হইলেন। কংশ তীরে উভয় সৈন্যের শক্তি পরীক্ষা হইল। বিপুল বিক্রমে পার্ব্বত্য গারো সৈন্য মোগল সৈন্যকে পরাজিত করিল। ইশার্খা পৃঠ প্রদর্শন করিল। যুদ্ধ জয় করিয়া গারো বাহিনী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল, রঘুনাথ কংশ অতিক্রম করিলেন।

"রঘুনাথ মোগল বিজয়ী ইশার্খাকে পরাজিত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময় অবসর বুঝিয়া অল্প সংখ্যক মোগল সৈন্য নিঃশব্দে রঘুনাথের শিবির আক্রমণ করিল। রঘুনাথ ধৃত হইলেন। তাঁহার বিপুল বাহিনী আমোদে মত্ত সুতরাং ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। রঘুনাথ বন্দী ভাবে রাজধানী জঙ্গল বাড়ীতে নীত হইলেন।

"রাত্রি প্রভাত হইলে গারো সৈন্যগণ যখন রাজা রঘুনাথ বন্দী হইয়াছেন অবগত হইল; তখন তাহারা উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল এবং চতুর্গুণ বলবৃদ্ধি করিয়া ইশার্খার রাজধানী আক্রমণ করিল। তাহারা ২২ কাহণ গারো সৈন্য একত্র হইয়া জঙ্গল বাড়ী আক্রমণ ও রাজা রঘুনাথকে মুক্ত করিয়া রাজধানী সুসঙ্গে প্রত্যাগমন করিল। * ইশার্খা এই উন্মত্ত পার্ব্বত্য সৈন্যের গতিরোধ করিতে সাহসী হইলেন না।

রঘুনাথ মুক্তিলাভ করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য অবসর খুজিতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য গারো সৈন্যগণ একান্ত প্রভুভক্ত এবং সংখ্যায় অত্যধিক হইলেও ইশার্খা প্রবল পরাক্রান্ত এবং বিশেষ দিল্লীশ্বরের অনুগৃহীত তাই সহসা কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

* গারো বাহিনী যে জলপথে জঙ্গল বাড়ী হইতে রঘুনাথকে লইয়া আসে তাহা "রঘু খালি" নামে পরিচিত। বর্ত্তমান কিশোরগঞ্জ টাউনের দুইমাইল পূর্ব্ব উত্তরে অবস্থিত।

(সুযোগ)

"মানুষ বলে অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে সুযোগ আপনি আসে। আমি বলি আমার টানে মানুষ আপনি গড়িয়া উঠে, সুযোগ আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। উতলা হইলে কাজ হয় না। মাটীর সংসারে মাটীর মত সহিষ্ণু ভাবে অপেক্ষা করিও নতুবা পুড়িয়া মরিতে হইবে। রঘুনাথ অপেক্ষা করিতে জানিতেন।

"আমার বেশ মনে হয় সে দিন করতোয়া স্নান। করতোয়ার নির্জ্জন উপকুল ক্ষণকালের জন্য মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রে আছে করতোয়ার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়; তাই ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু আজ নানা দিগদেশ হইতে এই অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য দলে দলে এই মহাতীর্থে সমবেত হইয়াছে। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ তর্পন করিতেছে। কেহ দান করিতেছে, কেহ গ্রহণ করিতেছে। চারিদিকে হৈ চৈ চলিতেছে।

"এই করতোয়ার কুলে যেখানে লোক জন একটু কম, এরূপ নির্জ্জন স্থানে একজন পশ্চিম দেশীয় ক্ষত্রিয় পুরুষ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন। তাহার পরিধানে গৈরিক বসন, বিস্তৃত ললাটে উজ্জ্বল চন্দনের ফোঁটা; গায়ে নামাবলী। লম্বা বাহু, বড় বড় চোখ উন্নত বক্ষ দেখিলেই বোধ হয় কোন অসাধারণ পুরুষ। এক ব্রাহ্মণ মন্ত্র বলিতেছেন, আর সেই গৈরিক বসন পরিহিত পুরুষ একখানি কুশাসনে বসিয়া ভক্তিভরে সেই মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন।

'নিকটেই সুসঙ্গের কুমার রঘুনাথ ও স্নান করিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণের বিকৃত মন্ত্র রঘুনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। রঘুনাথ পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিলেন—ব্রাহ্মণ কি বলিতেছ। অর্থের লোভে যাহা খুসি তাহাই বলিতেছে।" কথা শুনিয়া ক্ষত্রিয় পুরুষ ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, নিকটে একটী সুন্দর যুবা পুরুষ আহ্নিক করিতেছে। তাহার দীর্ঘ দেহ উজ্জ্বল রং উন্নত ললাট; দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?" রঘুনাথ উত্তর

করিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র জানি; এই ব্রাহ্মণ আপনাকে ভুল মন্ত্র পড়াইয়েছে।"

"তেজস্বী যুবকের কথা শুনিয়া সেই ক্ষত্রিয় পুরুষ অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহাকে মন্ত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। যুবক যথারীতি মন্ত্র পাঠ করাইলেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে ক্ষত্রিয় পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ জীকা কিয়া দক্ষিণা চাহিয়ে।" (পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণকে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে)।

"ব্রাহ্মণ যুবক বলিলেন "আমি শাস্ত্র ব্যবসায়ী নহি আমার কোন অর্থের প্রয়োজন নাই।" তখন ক্ষত্রিয় পুরুষ বলিলেন "তবে কি আমি আপনার কোন উপকারই করিতে পারিব না।"

"রঘুনাথ দেখিলেন এই এক স্বুবর্ণ সুযোগ। সুযোগ একবার গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না। এই মাহেন্দ্র-ক্ষণে যদি ইশার্থার প্রতিহিংসা নিবৃত্তির কোন উপায় করা যায়, মনে করিয়া বলিলেন "মহারাজ আমি আপনাকে জানি আপনি দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই সম্বোধনটী দিল্লীর সম্রাট হইতে চিরস্থায়ী করিয়া দিন এই আমার প্রার্থনা।"

"ক্ষত্রিয় রাজ মানসিংহ স্বীকৃত হইয়া রঘুনাথকে দিল্লী যাইতে অনুরোধ করিলেন। রঘুনাথ স্বীকৃত হইলেন।

* * *

"কিছু কাল পরে রঘুনাথ দিল্লীতে পৌঁছিলেন। তখন আকবর সাহ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন; জাহাঙ্গীর ভারতের ভাগ্য বিধাতা। মানসিংহ প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রবীণ রাজকর্মচারিগণ সকলেই বিতাড়িত। রঘুনাথ দিল্লীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"এই সময় বঙ্গদেশে যশোহরের প্রতাপাদিত্য ও বিক্রমপুরে চাঁদরায় কেদাররায়ের বিপুল যশ গৌরব মোগল শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া বাঙ্গালায় স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছিল। জাহাঙ্গীর এই সঙ্কট সময়ে প্রাচীন মন্ত্রিদিগের শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিয়া মানসিংহপ্রভৃতিকে পুনরায় আহ্বান করিলেন। রঘুনাথের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল।

"রঘুনাথ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং মানসিংহের চেষ্টায় বাদশাহের নিকট পরিচিত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে রঘুনাথের প্রখর বুদ্ধি ও অলৌকিক বল বীর্য্য দেখিয়া নবীন সম্রাট জাহাঙ্গীর রঘুনাথকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিলেন। দিন যাইতে লাগিল কিন্তু রঘুনাথের উপাধি লাভ ঘটিয়া উঠিল না। কেননা, কাল পূর্ণ হয় নাই।

"বাস্তবিক আমার দেয় পরিশোধ না হইলে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন কিছুতেই ঘটে না। দেখিতে দেখিতে আমার অনুগ্রহ দৃষ্টি রঘুনাথের উপর পতিত হইল— তাহার সৌভাগ্য সূর্য্য দেখা দিল।

"সে দিন সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বীয় পারিষদ সমভিব্যাহারে বাহির হইয়াছেন এমন সময় একটী সওদাগর একটী প্রকাণ্ড অদম্য গোণ্ডা হস্তী সম্রাট সমীপে উপস্থিত করিল। এরূপ হস্তী সচরাচর দেখা যায় না। হস্তীটী সম্রাটের মনঃপূত হইল। তিনি উহা ক্রয় করিলেন। কিন্তু কেহই সেই হস্তী পরিচালন করিতে সাহসী হইল না। হস্তী চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিয়া লোক জন হত্যা করিতে লাগিল। সম্রাট চিন্তিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সহরময় এই বার্ত্তা রাষ্ট্র হইয়া গেল।

"রঘুনাথ স্বীয় আবাসে অবস্থান করিতে ছিলেন। সহসা এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি সম্রাটসকাশে উপস্থিত হইলেন এবং শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বীয় শক্তির উপর রঘুনাথের যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসে রঘুনাথ লম্ফ দিয়া হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং অপূর্ব্ব কৌশলে সেই মত্ত হস্তীকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। রঘুনাথের হস্তী পরিচালন কৌশল পরিদর্শন করিয়া সম্রাট বিশেষ প্রীত হইলেন এবং পরদিন দরবারে সাক্ষাৎ করিতে হুকুম প্রদান করিলেন।

(যশ)

"প্রধান আমীর ওমরাওগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাট দেওয়ানী খাসে উপবিষ্ট। দেশ দেশান্তর হইতে সমস্ত রাজগণ সম্রাট সংদর্শনে সমাগত। রঘুনাথও সেই দরবারে গিয়া উপবেশন করিলেন। রাজ কার্য্য চলিতে

না । একে একে সবকার্য্য শেষ করিয়া সম্রাট চলিয়া যাইবেন এমন সময় রঘুনাথের উৎকণ্ঠিত চক্ষের উপর সম্রাটের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইল। দৃষ্টি পড়িবা মাত্র সম্রাট মানসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পূর্ব্ব দেশাগত সেই অসীম সাহসী যুবক কোথায়? আমি তাহাকে পুরস্কৃত করিব।"

"মানসিংহ দেখিলেন ইহাই তাহার প্রত্যুপকারের উপযুক্ত সময়। তখন তিনি বিস্তৃত ভাবে রঘুনাথের গুণগ্রামের পরিচয় প্রদান করিলেন।

"তখন রঘুনাথ কর জোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। সমস্ত সামন্ত রাজগণ রঘুনাথের নির্ভীক ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক আকৃতি দেখিয়া একে অন্যের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

"সম্রাট বলিলেন "রঘুনাথ। আমি তোমার কল্যকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তোমার ন্যায় সাহসী যুবক বাঙ্গালির ভিতর দুটী দেখি নাই। তোমার দ্বারা এ সংকারের প্রভূত উপকার হইবে আশা করিতে পারি তাই তোমাকে আমি হস্তীমর্দ্দন "সিংহ" উপাধি ভূষণে ভূষিত করিলাম। এবং তোমাকে পঞ্চ হাজারী গারো তাম্বী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। আর ভাটী মুলুকে এখন এমন এক প্রবল শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে সেই শক্তির সংঘর্ষে পড়িয়া দিল্লীর সম্রাটকেও বহু বেগ পাইতে হইতেছে। যদি ঐ শক্তির বিরুদ্ধে তুমি দণ্ডায়মান হও জানিও তোমার বিশেষ উপকার হইবে।

"রঘুনাথ বুঝিলেন ইশার্থাই ভাটী মুলুকের কর্ত্তা সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে, রঘুনাথ ইতঃস্তত না করিয়া আহ্লাদের সহিত সম্রাট সকাশে প্রতিশ্রুত হইলেন। সম্রাট হৃষ্ট মনে তাহাকে সামন্তরাজগণ সহ বসিবার আসন প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন।

(নিয়তি)

"যথা সময়ে রঘুনাথ দিল্লী হইতে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নামাঙ্কিত সনন্দ ও পঞ্চহাজারী গারো তাম্বী উপাধি লইয়াও রাজকীয় সৈন্যসামন্ত সমভিব্যহারে রাজধানী সুসঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

"রঘুনাথের সম্রাট সংদর্শন ব্যাপার যথা সময়ে ইশার্থাঁর কর্ণগোচর হইল। ইশার্থাঁ মনে মনে চিন্তিত হইলেন।

"রঘুনাথ যখন উপাধি সনন্দ লইয়া দিল্লী পরিত্যাগ করেন মহারাজ মানসিংহ তখন বিক্রমপুরের কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রঘুনাথ রাজধানীতে আসিবার অল্পকাল পরেই মানসিংহের অনুরোধ লিপি প্রাপ্ত হন। তাহাতে মানসিংহ লিখিয়াছেন "সম্রাট আদেশ করিয়াছেন, আপনি রাজ সরকারের উপকার করিতে প্রতিশ্রুত। আমি চাঁদরায় কেদার রায়ের বিরুদ্ধে

অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত দশভুজা মূর্ত্তি।

অভিযান করিলাম, আপনি আমার সহিত সসৈন্যে মিলিত হইয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন এবং রাজ সরকারে প্রতিপত্তি ও যশ প্রতিষ্ঠা করুন।"

"রঘুনাথ মানসিংহের পত্র পড়িয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন কখন ইশার্থাঁকে আক্রমণ করিবেন

আর একি? তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রঘুনাথ ভীত হইবার লোক নহেন, সেরূপ শক্তিদিয়া বিধাতা তাহাকে গড়িয়া তুলেন নাই। রঘুনাথ বহুচিন্তার পর স্থির করিলেন যখন সম্রাটের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি তখন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেই হইবে। তিনি মানসিংহের সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন।

"বিশ্বাস ঘাতকতায় কেদাররায় পরাজিত হইলেন। তাঁহার সাধের শ্রীপুর দুর্গ মোগলের অধিকৃত হইল। রাজকোষ লুণ্ঠিত হইল। মানসিংহ রঘুনাথকে কেদার রায়ের সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুনাথ হিন্দুর দ্রব্য এরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া, শুধু কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতু নির্ম্মিত দশভুজা মূর্ত্তিটী স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

"কীর্ত্তি যস্য সঃ জীবতি।"

"শ্রীপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া রঘুনাথ সুসঙ্গে একটী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা করিলেন। সুসঙ্গ আরণ্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত, অসীম শোভার আকর; ইহা জনকোলাহল বিরহিত, বন বিহঙ্গমের কল কাকলী মুখরিত, নানাপ্রকার বনকুসুমের সৌরভে পুলকিত সুতরাং নয়ন মনোমুগ্ধকর। এই পর্ব্বত পরিবেষ্টিতা নদী মেখলা, বনরাজি কুন্তলা, সুজলা সুফলা ভূমিই রাজধানীর উপযোগী স্থান বলিয়া রঘুনাথের মনপূত হইল। তাই তিনি সোমেশ্বরী তটে সোমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত অশোক বৃক্ষের সম্মুখে আনিয়া দশভুজা মূর্ত্তিটী অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে স্থাপন করিয়া একটী ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন।

"আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে কার সাধ্য? রঘুনাথের বুকে এমন কি শক্তি? রঘুনাথের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলাম। রঘুনাথের আশা আকাঙ্ক্ষা বুক থাকিতেই একদিন সকলের অলক্ষ্যে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম; আমাকে দেখিয়া তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল; শরীর নিস্তেজ, আশা আকাঙ্ক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। রাজত্ব আত্মীয় স্বজন সকলই পড়িয়া রহিল। কালের ডাকে আর কে সাড়া দেয়?

"রঘুনাথ তাহার ধন জন শোভা সম্পদের নশ্বরত্বের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি আজও তাহার কীর্ত্তি কলাপের অতীত সম্পদ-স্মৃতির দীর্ঘ নিশ্বাস বুকে করিয়া জগতে চির সত্য প্রচার করিতেছি যে "কীর্ত্তি যস্য সঃ জীবতি।"

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বৈষ্ণব দর্শন।

কারণ জীব উৎপন্ন হইলে তাহার অনিত্যত্বাদি দোষ প্রসঙ্গ হয়, তবে জীবের ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতে পারেনা, যেহেতু উপাদানপ্রাপ্তি হইলে কার্য্যের বিলয় হইতেই দেখা যায়। বিশেষতঃ সূত্রের দ্বারাই জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। (নাত্মা শ্রুতে নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ) ২।৩।১৭।

২।২।৪৩। এই কারণেও জীবের উতপত্তি কল্পনা সঙ্গত হয় না, যেহেতু দেবদত্ত প্রভৃতি কর্ত্তা হইতে কুঠার প্রভৃতি করণের উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না। ভাগবতগণ বর্ণনা করেন সঙ্কর্ষণ সংজ্ঞক জীবরূপ কর্ত্তা হইতে প্রদ্যুম্ন নামক করণ মন উৎপন্ন হয়। ইহা দৃষ্টান্ত ব্যতীত স্বীকার করা যায়না। ইহার মূলে কোন শ্রুতিও দৃষ্ট হয় না।

৪৪। যদি একথা বল যে, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি জীবাদিরূপে অভিপ্রেত হয় নাই, কিন্তু ইহারা সকলেই জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তি প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পরমার্থত ইঁহারা সকলেই বাসুদেব, ইঁহারা নির্দোষ নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য নহে। সুতরাং প্রদর্শিত দোষের আশঙ্কা নাই। এইরূপ বলিলেও প্রকারান্তরে উৎপত্ত্যসম্ভব দোষ উপস্থিত হয়। যদি এইরূপ অভিপ্রায় হয় যে, পরস্পর বিরুদ্ধ ইহারা সকলেই সমানস্বভাব, সুতরাং ঈশ্বর, ইহাদের একাত্মকত্ব নাই তবে অনেক ঈশ্বরকল্পনা নিরর্থক হয়, কারণ এক ঈশ্বরের দ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, এবং সিদ্ধান্ত হানিও হইয়া পড়ে, কারণ ভগবান্ বাসুদেবই একমাত্র পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। যদিবল এক বাসুদেবরই এই চারিব্যূহ ইহারা তুল্যস্বভাব, তবে উৎপত্ত্য

সম্ভব দোষ পূর্ব্বের মতই থাকিয়া যায়। কারণ বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের ইত্যাদি ক্রমে উৎপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু ইহাদের অতিশয় অর্থাৎ আধিক্য নাই, কার্য্য কারণের অতিশয় থাকা আবশ্যক, যদি কোনরূপ অতিশয় না থাকে, তবে ইহাকার্য্য উহা কারণ এই প্রকার অবগতি হয় না। পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিগণ-কর্ত্তৃক বাসুদেবাদিগত জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি তারতম্য জনিত কোন প্রকার ভেদ স্বীকৃত হয় নাই, এই চারিব্যূহ নির্ব্বিশেষ বাসুদেব বলিয়াই অভিমত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভগবানের ব্যূহ চতুঃসংখ্যায় পরিচ্ছিন্ন নহে, শাস্ত্রে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগতই ভগবানের ব্যূহরূপে কথিত হইয়াছে। (৪৫ সূ) এই শাস্ত্রে (পঞ্চরাত্রে) নানা প্রকার বিরোধ ও দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য তেজ গুণরূপে কথিত হইয়াছে, আবার ইহারা ভগবান্ বাসুদেব আত্মা বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই শাস্ত্রে বেদেরও নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়; শাণ্ডিল্য মুনি চতুর্ব্বেদপাঠে শ্রেয়োলাভ করিতে না পারিয়া এই শাস্ত্র অধিগত হইয়া ছিলেন; সুতরাং বেদনিন্দুকশাস্ত্রোক্ত কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না।

বৈষ্ণব দার্শনিকগণ, শঙ্করাচার্য্য প্রদর্শিত প্রত্যেক দোষের খণ্ডন করিয়াছেন; কেহ বা সূত্রার্থেরই অন্য প্রকার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া শঙ্করো ভাবিত দোষের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই।

পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে বেদান্তপারিজাতসৌরভে এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত বেদান্ত কৌস্তভে প্রদর্শিত চারিসূত্রাবলম্বনে শাক্তদর্শনাভিমত শক্তি কারণ বাদ নিরাকৃত হইয়াছে।

(৪২ সূ) শাক্তগণ শক্তি হইতেই জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন; উক্ত মতের খণ্ডনাভিপ্রায়েই সূত্র অবতারিত হইয়াছে, "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" পুরুষ ব্যতীত শক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না; অতএব শক্তিকারণবাদ সঙ্গত নহে। (নিম্বার্ক)। শ্রীনিবাস নিম্বার্কের মত বিশদ করিয়াছেন। "অথবা জগতের নিত্যত্ব নিবন্ধন শক্তির জগৎ কারণত্ব সিদ্ধ হয় না, জগৎ যে জন্য এই বিষয়ে প্রমাণই নাই। যদিবল বেদবাক্যই প্রমাণ তবে বেদকথিত ব্রহ্মকারণবাদই আছে; সুতরাং নির্ম্মূল শক্তিকারণবাদ উপেক্ষণীয়।"

(৪৩ সূ) পুরুষের সংসর্গানুসারে শক্তি জগৎ প্রসব করিতে পারে, একথাও বলিতে পার না, কারণ তখন পুরুষের করণ নাই; সুতরাং করণের অভাব বশতই সংসর্গ অসম্ভব (নিম্বার্ক)। শ্রীনিবাস বলেন শক্তির অনুগ্রাহক কর্ত্তা আছে, দৃষ্টান্তানুসারে জগতের জন্যত্বও অনুমিত হয়; অতএব উক্তদোষের অবসর নাই, এ কথাও বলিতে পার না, কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে করণের সত্তা নাই; অতএব পুরুষের অনুগ্রাহকত্ব সম্ভব হয় না; অধিকন্তু ঘটাদির ন্যায় আকাশাদির স্থূলত্ব প্রভৃতি ও নাই; সুতরাং তাহাদের জন্যত্ব সিদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ পুরুষ কর্ত্তাসত্বে শক্তির কারণত্ব হইতে পারে না।

(৪৪ সূ) যদিবল শক্তি স্বাভাবিক জ্ঞানাদি বিশিষ্ট, তবে আর তাহাকে জগৎ কর্ত্তৃত্বের প্রতিষেধ কি? তোমাদের নিজের কথাতেই শক্তিকারণবাদ নিরস্ত হইয়া গেল, কারণ এই কথাতে ব্রহ্মই স্বীকৃত হইতেছে। (নিম্বার্ক)।

শ্রীনিবাস বলেন, স্বাভাবিক-বিজ্ঞানবলাদিগুণগণ-নিকেতনভূতাস্বাধীন-স্বাশ্রয় শক্তি স্বীকার করিলে তাহার জগৎ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষিদ্ধ নহে। কারণ সর্ব্ববেদান্তবেদ্য দেবতাকেই তোমরা স্বীকার করিতেছ, পরন্তু সেই দেবতা অন্য কাহারও শক্তি নহে, সেই পরদেবতা ব্রহ্ম প্রভৃতিপদ-প্রতিপাদ্য,—অতএব নিজ হইতেই শক্তিকারণবাদ নিরস্ত হইল।

(৪৫ সূ) শ্রুতিস্মৃতিবিরোধনিবন্ধন ও শক্তিকারণবাদ অপ্রামানিক (নিম্বার্ক)। শ্রীনিবাস বলেন, "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং, পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ, অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবাক্যের সহিত বিরোধনিবন্ধন শক্তি-কারণবাদ মুমুক্ষুদিগের আদরণীয় নহে। অতএব সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণে শ্রুতির সমন্বয় (তাৎপর্য্য) কিছুতেই বিরুদ্ধ হয় না। এই প্রকার ব্যাখ্যার দ্বারা শক্তি-কারণবাদনিরাসে সূত্রগুলির তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

কেশব কাশ্মীর ভট্টাচার্য্য ৪২—৪৩ সূত্রদ্বয়ের দ্বারা পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্ত বিরোধিতর্কোপন্যাসপূর্ব্বক পরবর্ত্তি

সূত্রত্রয়ের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষোপন্যাস শঙ্করাচার্য্যের রীত্যনুসারেই হইয়াছে। পরন্ত শঙ্করের মতে এই সকল সূত্র পাঞ্চরাত্রের প্রতিকূল, ইঁহার মতে অনুকূল। কেশবভট্টের ব্যাখ্যায় রামানুজের মতই সর্ব্বতোভাবে অনুসৃত হইয়াছে।

(২।২।৪২) তিনি বলেন ভগবৎ প্রণীত পরমশ্রায়োবোধক শাস্ত্রের ও কপিলাদি প্রণীত শাস্ত্রের ন্যায় অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া আচার্য্য (ব্যাস) তাহার পরিহার করিয়াছেন।

আশঙ্কা হইতেছে, জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদান পরব্রহ্ম শ্রীবাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীব উৎপন্ন হয়, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মন, এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধনামক অহঙ্কার জাত হয় ; পাঞ্চরাত্রদিগের এইমত সঙ্গত নহে। কারণ শ্রুতিবিরোধনিবন্ধন জীবের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। "অজো হ্যেকো জুষমানঃ, ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(২।২।৪৩) সঙ্কর্ষণনামক কর্ত্তা জীব হইতে প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞক মনোরূপ করণের উৎপত্তি সম্ভব হয় না ; যেহেতু কুলাল প্রভৃতি কর্ত্তা হইতে দণ্ড প্রভৃতি করণের উৎপত্তি কেহ কখনও দেখে নাই, সম্ভবও হয় না। বিশেষতঃ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্ম আত্মা হইতেই মনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে ; সুতরাং শ্রুতি বিরুদ্ধ এই মত অপ্রমাণ, এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইলে তাহার নিরাসপূর্ব্বক সিদ্ধান্তাভিপ্রায়ে সূত্র অবতারিত হইয়াছে "বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ" (২।২ ৪৪)।

পূর্ব্বপক্ষনিবৃত্তিদ্যোতনাভিপ্রায়ে "বা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মস্বরূপত্ব নিবন্ধন তৎপ্রতিপাদক পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রমাণত্ব প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে ন। ইহার প্রমাণ উহা অপ্রমাণ এই বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র নিয়ামক।

যে শাস্ত্রের মূলে শ্রুতিসম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই শাস্ত্রই শিষ্টজনকর্ত্তৃক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে শ্রুতি বিরুদ্ধ শাস্ত্র প্রমাণ নহে, এবং সজ্জনের অগ্রাহ্য। সূত্রকার ব্যাস স্বয়ংই মোক্ষধর্ম্মে পঞ্চরাত্রের বেদমূলকত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। গৃহস্থ ব্রহ্মচারী বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু ইহাদের মধ্যে যেজন সিদ্ধিলাভ করিতে অভিলাষ করে, সে কোন দেবতার আরাধনা করিবে? যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ পঞ্চরাত্রবিহিত ভজনের উল্লেখপূর্ব্বক কথিত হইয়াছে যে বুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ডের সাহায্যে দধি হইতে নবনীতের ন্যায় বিস্তৃত ভারতাখ্যান হইতে এই পঞ্চরাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

দধির সারভাগ যেমন নবনীত,দ্বিপদ প্রাণীর মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, বেদাপেক্ষা যেমন আরণ্যক শ্রেষ্ঠ, ঔষধি হইতে যেমন অমৃতের উৎপত্তি, তেমন চতুর্ব্বেদসমন্বিত এই মহোপনিষদ। সাংখ্যযোগসিদ্ধান্তানুসারে ইহা পঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। অথবা সাংখ্যযোগ সিদ্ধান্তসমন্বিত এই শাস্ত্র পঞ্চরাত্রসংজ্ঞায় কথিত হইয়াছে।

এই প্রকারে পঞ্চরাত্রের আরও অনেক প্রশংসা আছে।

অপিচ উক্ত পঞ্চরাত্রের অপ্রামাণ্য কি প্রমাণাভাবনিবন্ধন, অথবা শাস্ত্রে নিষেধ নিবন্ধন? প্রমাণাভাব বলা যায় না, কারণ প্রমাণত প্রদর্শিতই হইয়াছে। শাস্ত্রে নিষেধ নিবন্ধনও অপ্রামাণ্য বলা যায়না, কারণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে নিন্দার উল্লেখ দৃষ্ট হয়না ; যদি বল কূর্ম্মপুরাণাদি গ্রন্থে নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"কাপালং পাঞ্চরাত্রঞ্চ যামলং বামনার্হতম্।
এবং বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানিতু॥"

সুতরাং পঞ্চরাত্রের অপ্রমাণ্য আশঙ্কিত হইতে পারে। এ কথাও বলিবার উপায় নাই, কারণ ভারত বিরুদ্ধ স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার্য্য নহে যেহেতু সূত্রকার স্বয়ংই বলিয়াছেন যে "যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি নতৎ ক্বচিৎ"

এই মহাভারতে যাহা আছে, তাহাই অন্যত্রও আছে অর্থাৎ মহাভারতে সূক্ষ্মাকারে বর্ণিত বিষয় অন্যত্র পল্লবিত হইয়াছে, ভারতে যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা অন্যত্রও নাই। ভারতের প্রমাণ্য সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

অতএব মোহনশাস্ত্রসমভিব্যাহৃত পঞ্চরাত্রশব্দে এতদতিরিক্ত কোনও পঞ্চরাত্র অভিহিত হইয়াছে, এইরূপ কল্পনাই সঙ্গত। কেশব ভট্ট উপক্রমাদি ষড়বিধ তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গের দ্বারা এবং অন্যান্য প্রভূত প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য সুদৃঢ় করিয়া-

ছেন ২.২।৪৫ এই শাস্ত্রেও জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে বাসুদেবের একত্ব সত্ত্বেও ব্যূহাবতারাদিরূপে অবস্থানে এবং প্রাদুর্ভাবে কোন প্রকার বিরোধ নাই, তাঁহার স্বরূপগত একত্ব এবং মূর্ত্তিরূপে অনেকত্বও শাস্ত্র সম্মত; শাস্ত্রেই বলিতেছেন তিনি "অজায়মাণ" জাতহন না, অথচ বহু প্রকারে জন্মগ্রহণ করেন।

"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে"

বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাদির উৎপত্তিও বিরুদ্ধ নহে, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি শব্দে তদধিষ্ঠেয় জীবাদির গ্রহণ হইলেই বিরোধের পরিহার হয়। বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাধিষ্ঠিত সমষ্টিজীবের স্থূলদেহাদি সম্বন্ধরূপ উৎপত্তি অভিপ্রেত হইয়াছে।

শ্রুতিতেও অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে জীবের যে উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও স্বরূপতঃ জন্ম নহে, বাস্তবিক জন্ম হইলে অনিত্যত্বাদি দোষ অনিবার্য্য। এইরূপ সঙ্কর্ষণ নামক ব্রহ্ম হইতে প্রদ্যুম্নাধিষ্ঠিত মনোবর্গের উৎপত্তি এবং প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক ব্রহ্ম হইতে অনিরুদ্ধাধিষ্ঠিত অহঙ্কার সমষ্টির উৎপত্তি হয়। এইরূপ কল্পনা করিলে সর্ব্ববিষয়েরই সামঞ্জস্য হয়।

গুণ গুণিভাব কল্পনা নিবন্ধন যে বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই বিরোধও অতি তুচ্ছ। কারণ শ্রুতি প্রসিদ্ধ গুণাদি স্বাভাবিক বলিয়াই বিবেচনীয়।

বেদের নিন্দা বশতঃ পঞ্চরাত্রের যে অপ্রামাণ্যারোপ করা হইয়াছে, সে কথাও যুক্তিসহ নহে। কারণ এই উক্তির দ্বারা পঞ্চরাত্রের স্তুতিমাত্র করা হইয়াছে, বেদনিন্দায় ইহার তাৎপর্য্য নাই। ভূমবিদ্যার প্রশংসা দ্যোতনার্থ নারদের উক্তিতে যেমন ঋগ্বেদাদি সমস্ত বিদ্যার অভিমত বোধোৎপাদনে অসামর্থ্য বর্ণিত হইয়াছে, প্রস্তাবিত স্থলেও তেমনই বুঝিতে হইবে।

কেশব ভট্ট এই ভাবে শঙ্করোদ ভাবিত যাবতীয় দোষের খণ্ডন পূর্ব্বক উপসংহারে বস্তুতত্ত্ব বলিয়া আনন্দ তীর্থানুসারি নিম্বার্ক বর্ণিত শক্তিকারণ বাদ নিরসনেই অধিকরণের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দ ভাষ্যের মতও ইহারই অনুরূপ।

পাঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য স্থাপনার্থ রামানুজ প্রভৃত বচন প্রদর্শিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহাভারতের বচনই অধিক। পরমার্থতঃ কোনও হিন্দুই পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে পারেন না। কারণ হিন্দুর অনুষ্ঠান প্রধান যাবতীয় গ্রন্থেই পঞ্চরাত্রের প্রভূত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চরাত্রে অর্চ্চা-পূজা প্রভৃতি উপাসনা বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে; তৎপ্রসঙ্গে প্রতিমা নির্ম্মাণ প্রণালী প্রতিমার গৃহাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য এবং প্রতিষ্ঠা বিধান বিস্তৃত ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে এবং মঠাদি প্রতিষ্ঠাতত্ত্বে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদনুসারে বুঝাযায়, পঞ্চরাত্রই প্রতিষ্ঠা ক্রিয়ার উপজীব্য। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যেজন আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে ইচ্ছাকরে, সে লক্ষণাক্রান্ত আচার্য্য অন্বেষণ করিবে। পঞ্চরাত্রশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণেই সকলবর্ণের আচার্য্য বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণের অসম্ভব হইলে বৈশ্য শূদ্রের আচার্য্য ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের অভাবে, বৈশ্য শূদ্রের আচার্য্য কর্ম্মকরিবেন। রঘুনন্দন স্পষ্টতই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রতিষ্ঠাকার্য্যে মহাকপিল পঞ্চরাত্রোক্ত অনুষ্ঠানও করিতে হইবে। এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া পঞ্চরাত্রোক্ত প্রণালী প্রদর্শিত করিয়াছেন, রঘুনন্দনের গ্রন্থে এবং রাঘবভট্টের পদার্থাদর্শে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের এবং মহাকপিল পঞ্চরাত্রের প্রমাণই অধিক সংখ্যক দেখা যায়। নারদ পঞ্চরাত্র বশিষ্ঠ পঞ্চরাত্রের প্রমাণও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রণালী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিগ্রন্থে প্রতিমা নির্ম্মাণের যে পদ্ধতি দেখা যায়, তাহাতেও পঞ্চরাত্রোপজীব্যতাই প্রতিভাত হয়।

জলাশয় প্রতিষ্ঠা বিধানেও পঞ্চরাত্র উদাসীন নহে। সুতরাং হিন্দুর অনুষ্ঠেয় ইষ্টপূর্ত্তক্রিয়ার পথপ্রদর্শক পঞ্চরাত্রকে অপ্রমাণ বলিতে গেলে হিন্দুধর্ম্মের মেরুদণ্ডেই আঘাত পড়ে বলিয়া মনে হয়। পঞ্চরাত্রের বিমল আলোক পাইয়াই হিন্দু স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের সমুন্নত স্থানে সমারূঢ় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এ হেন পরম প্রাণভূত পঞ্চরাত্রেও প্রভৃতি নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের অপরার্কটীকায় পঞ্চরাত্রাদির নিন্দা বোধক অনেকগুলি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বিরুদ্ধবচন ও উপন্যস্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিরুদ্ধ বচনের যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তিনি বরাহ পুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই বচনে বেদবাহ্য মানব গণের জন্য পঞ্চ রাত্রাদি মোহন শাস্ত্র সৃষ্টির কথা জানা যায়, যথা—

"যে বেদ মার্গ নিযুক্তা স্তেষাং মোহার্থ মেবচ।
সিদ্ধান্ত সংজ্ঞকং পূর্ব্বংময়া শাস্ত্রং প্রদর্শিতম।

এই বচন অগস্ত্যের প্রতি রুদ্র কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে মহাভারতের প্রদর্শিত বচনানুসারে স্বয়ং নারায়ণকেই পঞ্চরাত্রের বক্তারূপে জানিতে পারাযায়। তিনি মনুর বচন উদ্ধৃত করিয়া বেদ বাহ্য স্মৃতির যে নিন্দা খ্যাপন করিয়াছেন, তাহাতেও ভগবৎ কথিত পঞ্চরাত্রের নিন্দা প্রতিপন্ন হয় না, কারণ ভগবান মনুর উক্তিতে বেদ বাহ্য প্রভৃতিরই নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"যা বেদবাহ্যঃ শ্রুতয়ো যাশ্চ কাশ্চিৎ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাপে নিষ্কলা জ্ঞেয়া তমো ভূতাহি কেবলম॥

অপরার্কের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রহিত সমস্ত বিচার উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যায়, সুতরাং তাহা উপেক্ষিত হইল।

রামকেশ্বরটীকাকার ভাস্কর রায় পঞ্চরাত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝাযায় সর্ব্বোতো ভাবে বেদ বিরুদ্ধ পঞ্চরাত্র বিশেষই নিন্দিত হইয়াছে, এবং শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্মাধিকারি ব্যক্তি কোনও কারণে তাহাতে ভ্রষ্টাধিকার হইলে তাহার জন্যই পঞ্চরাত্রাদি বিহিত হইয়াছে। যথা—

'পঞ্চরাত্রং ভাগবতং তথা বৈখান সাবধম।
বেদভ্রষ্টান সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্॥

অতএব কাশ্মীর ভট্টও ভাস্কর রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও কেবল শুষ্ক উৎপত্তি বাদের খণ্ডন করিয়া সরল উপাসনা পদ্ধতির সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চরাত্র বিদ্বেষী অপরার্ক কেনই যে ইহার উপাসনাংশের প্রতিও এত খড়্গহস্ত, তাহা তিনিই বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। তিনি পঞ্চরাত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে পুরাণাদি বিহিত ইতি কর্ত্তব্যতাই অবলম্বনীয়, অন্য প্রকার গ্রাহ্য নহে*।

যাহাহউক পঞ্চরাত্রোক্ত উপাসনা যে পুরাণ তন্ত্রে সর্ব্বত্রই অনুসৃত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন সম্প্রাদায় কর্ত্তৃকও গৃহীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণের অসদভাব নাই। এমন কি শক্তি উপাসনার অঙ্গরূপে বৈষ্ণব বারাবলম্বনের ও উপদেশ শক্তি তন্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চরাত্রে যে চতুর্ব্যূহ বাদ কথিত হইয়াছে। তন্ত্র শাস্ত্রেও তাহার সমাবেশ দেখা যায়। সারদাতিলকে কথিত হইয়াছে যে, সেই সুখ দায়িণী শাম্ভবী শক্তি চারি প্রকারে গুণিত হইয়া বিষ্ণুর মূর্ত্তি চতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছেন।

অষ্টম পটলোক্ত লক্ষী পূজার অঙ্গরূপে উক্ত মূর্ত্তি চতুষ্টয়ের পূজা প্রসঙ্গে ইহাদের নাম এবং আকার কথিত হইয়াছে। বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি মূর্ত্তিকে পদ্মের দিগ্দলে অর্চ্চনা করিবে।

এই চারি মূর্ত্তি যথাক্রমে হিমবর্ণ পীতবর্ণ তমালবর্ণ ও ইন্দ্রনীল-মনিসমানবর্ণ। ইহাঁরা পীত বস্ত্র পরিধারী, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ও চতুর্ভুজ।

তন্ত্রে স্থানে স্থানে বিষ্ণুর আরও অনেক প্রকার মূর্ত্তি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

দেব পূজায় সমস্ত জাতিরই অধিকার আছে। বিষ্ণু পুরাণে কথিত হইয়াছে যে "ক্ষমা শৌচ দম সত্য দান ইন্দ্রিয় নিগ্রহ অহিংসা গুরু শুশ্রূষা তীর্থানুসরণ দয়া আর্জ্জব লোভশূন্যতা দেবপূজা ব্রহ্মণ পূজা ও অনসূয়া, এইগুলি সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্ব সাধারণের অনুষ্ঠেয়। এই সাধারনানুষ্ঠেয় দেবপূজা প্রভৃতি কার্য্যেও জাত্যনুসারে অধিকারগত পার্থক্য আছে। ত্রৈবর্ণিক বৈদিকানুষ্ঠানে অধিকারী, শূদ্রাদি পুরানাগমোক্ত-বিধানে অধিকারী। ত্রৈবর্ণিকগণ পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক এই উভয় অনুষ্ঠান করিতে পারেন, এবং বৈদিকানুষ্ঠানেও পূজা করিতে পারেন; কিন্তু ইতর জাতি বৈদিকানুষ্ঠান করিতে পারে না। ত্রৈবর্ণিকের মধ্যেও যাঁহারা তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের তান্ত্রিকানুষ্ঠান করিবার অধিকার নাই। যাঁহারা তান্ত্রিকানুষ্ঠানে দৈনিক পূজা করেন, তাঁহাদের পক্ষে পৌরাণিকানুষ্ঠানের বা বৈদিকানুষ্ঠানের আর স্বতন্ত্র আবশ্যকতা নাই। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

---

*এবং প্রতিষ্ঠায়ামপি পুরাণাদ্যুক্তৈবেতী কর্ত্তব্যতা গ্রাহ্য নান্যা। ১০পৃঃ

বৈষ্ণব দর্শনের মতে পঞ্চপ্রকার উপসনার অন্যতম স্বাধ্যায়। উক্ত স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ পাতঞ্জল দর্শনের একটি সূত্রের ব্যাখ্যানে বাচস্পতি মিশ্র কর্তৃক এবং মাধবাচার্য্য কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অত্রত্য স্বাধ্যায় যোগদর্শনে ক্রিয়াযোগনামেশ অভিহিত হইয়াছে। যাহাদের চিত্ত সমাহিত তাহাদের পক্ষে যোগানুষ্ঠান সম্ভব হয়, কিন্তু বিক্ষিপ্তচিত্তের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; অতএব হীনাধিকারীর জন্য ক্রিয়াযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, "তপংস্বাধ্যায়ে শ্বরপ্রণিধানি ক্রিয়াযোগঃ।'

ভাষ্যকার ব্যাস বলেন অত্রত্য স্বাধ্যায় শব্দে প্রণব প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রজপ অভিপ্রেত হইয়াছে। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলেন প্রণবাদি শব্দের প্রতিপাদ্য পুরুষবুক্ত রুদ্রমণ্ডল ব্রাহ্মণে প্রভৃতি বৈদিক এবং ব্রহ্মপারায়ণাদি পৌরাণিক মন্ত্র। উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যানাবসরে মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন, "প্রণব গায়ত্রী মন্ত্রাধ্যয়ন স্বাধ্যায় নামে কথিত, সেই সকল মন্ত্র বৈদিকও তান্ত্রিক এই দুই প্রকার। "তেচমন্ত্রাদ্বিবিধা বৈদিকাস্তান্ত্রিকাশ্চ। সর্ব্ব দর্শন সং ১৬৭)' একই সূত্রের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র বৈদিক পৌরাণিক ভেদে মন্ত্রের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিলেন এবং মাধবাচার্য্য পৌরাণিকের পরিবর্ত্তে তান্ত্রিক মন্ত্রের উল্লেখ করিলেন, ইহাতে বোধ হয় বৈদিক ও অবৈদিক এই প্রকারদ্বয় প্রদর্শনই দার্শনিক প্রবরদ্বয়ের উক্তির তাৎপর্য্য, নাম বিশেষ নির্দ্দেশ বৈদিকেতর মন্ত্র সত্তার প্রদর্শক মাত্র।

বৈষ্ণব দর্শন সম্মত স্বাধ্যায় তন্ত্রশাস্ত্রে জপনামে অভিহিত হইয়াছে, এবং যোগদর্শনে যেমন বিক্ষিপ্ত চিত্তের জন্য কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা হইয়াছে, তেমনই ক্লেশ বহুলানুষ্ঠানে অসমর্থ উপাসকের পক্ষে কেবল জপের ব্যবস্থা হইয়াছে—

"জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ণ সংশয়ঃ॥

বৈষ্ণবাদ্যু মত পঞ্চমূর্ত্তির প্রদর্শিত ক্রমোপাসনার অভিপ্রায় অতীব উদার বলিয়া মনে হয়। ইহাতে উত্তম হইতে অধমতম পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ মানবেরই শক্ত্যনুসারে উপাসনার অধিকার দেখা যায়। দেবগৃহের মার্জ্জন লেপনেও একপ্রকার উপাসনা হয়, পুষ্প পত্রাদি সংগ্রহ ও উপাসনার প্রকারান্তর, নাম সংকীর্ত্তন স্তোত্রপাঠ গানও প্রকৃষ্ট উপাসনা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে।

মাধবাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে মুমুক্ষু যক্ষ প্রভৃতিও সমাগত হইয়া নৃত্যগীতের দ্বারা ঈশ্বরকে ভজন করে, এই বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের বচন প্রমাণ। তিনি বলিয়াছেন যে, বিনা বাদ্য কুশল রাগ রাগিনী বিশারদ তানজ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসে মোক্ষ পথ প্রাপ্ত হয়।

"বীনাবাদন তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতি জাতি-বিশারদঃ।
তানজ্ঞশ্চা প্রয়াসেন মোক্ষ মার্গং নিগচ্ছতি। পরাপর মাধব। ৬৬ পৃ

পুরাণে আড়ম্বর রহিত সহজ পূজার ফল বিশেষ কথিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ বন নরকস্থিত ক্লেশ কাতর পাপীদিগকে প্রশ্ন করিয়াছেন অন্য দ্রব্যের অভাব হইলে কেবল জলের দ্বারা পূজিত হইয়াও যিনি নিজের স্থান ভক্তকে প্রদান করেন, তুমি কি সেই বিষ্ণুকে পূজা কর নাই?

নারদের মত অবলম্বন করিয়া রাঘব ভট্ট দেখাইয়াছেন যে সমস্ত উপচার বস্তুর অভাবে কেবল ভাবনাই করিবে অথবা নির্ম্মল জল দানের দ্বারাও পূর্ণতা হইতে পারে। এইরূপ উপদেশ গীতা প্রভৃতি গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কি অশুভক্ষণে ৪ঠা পৌষ সোমবারের রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশীর চন্দ্র অস্ত যাইবার অত্যল্প পরে ময়মনসিংহের গৌরব দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধ, গীতবাদ্যে সুপণ্ডিত, চিত্রশিল্পে সিদ্ধহস্ত শিশু সাহিত্য রচনায় অদ্বিতীয়, সন্দেশের সুযোগ্য সম্পাদক উদারহৃদয় অমায়িক আমাদের উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অনন্তের কোলে অন্তমিত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহের দুর্ভাগ্য একে একে ইহার কৃতি সন্তানগণ চলিয়া যাইতেছেন। সাহিত্য এবং শিল্প কলায় উপেন্দ্রকিশোর যে সম্পদ দিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। তাঁহার যশোদীপ চিরদিন ময়মনসিংহকে আলোকিত করিবে। উপেন্দ্রকিশোর আপন সুকৃতিবলে স্বর্গলাভ করিয়াছেন তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবার, যিনি সকল শোক হরণ করেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা লাভ করুন।

Printed by Satish Chandra Rai at the Jagat Art Press. Dacca.

সৌরভ

ফলদার রাজবাড়ীর বর্ত্তমান দৃশ্য।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।
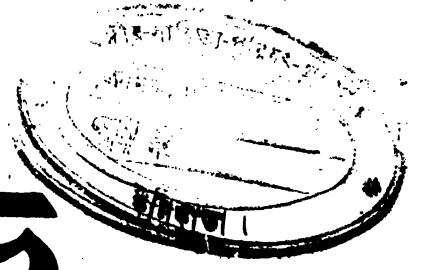
চতুর্থ বর্ষ } ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩২২। { চতুর্থ সংখ্যা।

বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অভাব ও তন্নিবারণের উপায়।

কোনও সাহিত্যের অভাবের কথা ভাবিতে হইলে মোটামুটি সেই দেশে সাহিত্য অর্থে কি বুঝায় একটু না ভাবিলে চলে না। কারণ, লোকের মনে সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণা থাকে সেই অনুসারেই সাহিত্যের সেবা ও চর্চ্চা হইয়া থাকে; এবং অভাব যদি কিছু থাকে তবে তাহার হেতুও এই ধারণার অপূর্ণতা ভিন্ন আর কিছু নহে।

সাহিত্য অর্থে আমরা কি বুঝি, এক কথায় তাহা বলিয়া উঠা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে. ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।' অপিচ, 'সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।' বাহিরের বস্তুর জ্ঞান এবং মানুষের নিজের অন্তঃপ্রবৃত্তি এ উভয়ের সংমিশ্রনে যে সমুদয় ভাবের উৎপত্তি হয়, তাহাই অন্যের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার যে চেষ্টা ভাষায় প্রকাশ পায়, মোটামুটি তাহাকেই সাহিত্য বলা হয়। কেবল জ্ঞানের কথা সাহিত্য নামধেয় নহে; বীজগণিত বা জ্যামিতি, ভূগোল কিংবা পদার্থবিদ্যা, আত্মতত্ব কিংবা অর্থশাস্ত্র, এ সমস্তেই জ্ঞানের কথা আছে; কিন্তু সাহিত্য বলিতে আমরা এগুলিকে বুঝি না।

সেইরূপ জীবনে কত শত ঘটনা আমাদের হইতেছে; আমরা যদি তাহার সংবাদই কেবল অন্যকে প্রদান করি তবে উহা সাহিত্যের সংজ্ঞায় পড়িবে না। সকলেই জানেন, 'ব্যবহারিক চিঠি পত্র সাহিত্য নয়। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা নিমিত্তক যে ভাবের প্রবাহ আমাদের মনে উৎপন্ন হয় তাহা যদি অন্যের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য ভাষাপ্রয়োগ করি, তবে উহা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। 'উদ্ভ্রান্তপ্রেম' প্রণেতা যদি কেবল তাঁহার পত্নীবিয়োগের সংবাদটী আমাদিগকে প্রদান করিতেন, তবে উহাকে সাহিত্য বলিতাম না। কিন্তু পত্নীবিয়োগ জনিত তাঁহার উদ্বেগ শোকসাগরের প্রত্যেকটী লহরী আমাদের চিত্ত সৈকতে আঘাত করে বলিয়াই 'উদ্ভ্রান্তপ্রেম' সাহিত্য স্থানীয়। তেমনি, ইতস্ততঃ যে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে, তাহাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে যে ভাষা, তাহা সাহিত্য নয়; কিন্তু ঐ সমস্ত সত্যের চিন্তনে যে ভাব মনে উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রকাশ করিলে সাহিত্যের অঙ্গ হইবে। ইতিহাস সাহিত্য নহে, কিন্তু ইতিহাসেরই ঘটনা অবলম্বন করিয়া যে উপন্যাস রচিত হয়, তাহা সাহিত্যের সামগ্রী।

সত্যের সংবাদ দিতেও আমরা ভাষা প্রয়োগ করি; কিন্তু ভাব জাগাইয়া তুলিবার যে ভাষা তাহার ভঙ্গি, তাহার কৌশল পৃথক। কেবল মাত্র ব্যাকরণ শুদ্ধ বাক্য রচনা দ্বারা ভাব জাগান চলে না। এইখানে ভাবকে অলঙ্কারে, সঙ্গীতে, চিত্রে সাজাইয়া তুলিতে হয়;

সাহিত্য ললিত-কলা; লালিত্যে সৌন্দর্য্যে এবং সরসতায়ই তাহার জীবন। সাহিত্য বলিতে কাজেই আমরা কলাকৌশল পূর্ণ, ভাববহুল ভাষা রচনা বুঝি।

সাধারণতঃ যে আমাদের সাহিত্যের ধারণা এইরূপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এবং বাঙ্গালার সাহিত্য চর্চ্চা যে প্রায়সঃই এই ধারণার অনুযায়ী, তাহাও সন্দেহের অতীত। কিন্তু এই সংজ্ঞায় একটা সংকীর্ণতা আছে। ইহাতে কেবল নাটক, উপন্যাস, কাব্য ও গান ছাড়া আর কিছু আটকান যায় কিনা সন্দেহ। সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনা ও গবেষনা, এমন কি সাহিত্যের ইতিহাসকে ও এই সংজ্ঞা অনুসারে সাহিত্য হইতে বাদ দিতে হয়। অথচ, একথা বোধ হয় সকলই স্বীকার করিবেন যে তাহা হইলে সাহিত্য অত্যন্ত ক্ষীণ ও দরিদ্র হইয়া যায়। আর ইহাও বলা চলে না যে ইতিহাস বা বিজ্ঞান বা দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ মাত্রেই সাহিত্যের বাহিরে। বীজগণিত বা পাটীগণিত সাহিত্য না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া মেকলে বার্কের লেখা সাহিত্যের বাহিরে, একথা কে বলিবে? অথচ ইহাদের লেখা ত ঐতিহাসিক গবেষণায় পূর্ণ। আর, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সন্দর্ভকে যদি সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করিতে নারাজ হই, তাহা হইলে আমাদের দেশের রামেন্দ্রসুন্দর বা হীরেন্দ্রনাথের সাহিত্যের আসরে আসন পাওয়া দুষ্কর।

সুতরাং সাহিত্যকে যখন একটা জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে বিচার করা হয়, তখন উহাকে কেবল ছড়া, পাঁচালী বা গানের সমষ্টি মাত্র মনে করা ভুল। ছড়া পাঁচালীতে যথেষ্ট ভাবসম্পদ থাকিতে পারে, কিন্তু জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে ইহাই প্রচুর কিনা সন্দেহ। যখন কোনও জাতির সাহিত্যের বিচার করিতে বসি, তখন আমরা উহাতে যে কেবল কলা কৌশল, কেবল সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিই খুঁজি, এমন নহে; আমরা উহাতে জাতির মনের পূরা ইতিহাসটাই আশা করিয়া থাকি। কর্ম্মরাজ্যে জাতির যে ক্রিয়া কলাপ বিকাশ পায়—গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে, জাতি যে সমস্ত কাজ করে, মনোরাজ্যে জাতির চিন্তনে ও তাহার ছায়া থাকে, এবং সেই জন্য সাহিত্যে ও তাহার পরিচয় থাকা উচিত। জাতির বহুবিধ মানস-সম্পত্তির অভাব যে সাহিত্যে না পাইব, সে সাহিত্যকে ঐ জাতির প্রকাশক মনে করা সঙ্গত হইবে না; আর যদি কোনও লোক সমষ্টিতে ক্রিয়া, জ্ঞান ও ভাবের বৈচিত্র না পাই, তবে তাহাকে জাতি মনে করাও যুক্তি সঙ্গত হইবে না। একটী সমগ্র জাতি যেমন চিরকাল কেবল কবিতার ভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনই কেবল কবিতায় কখনও একটী সমগ্র সাহিত্য হইতে পারে না। পরস্পর সম্বন্ধ বহুবিধ ভাব ও চিন্তার ঐক্যকেই যেমন আমরা ব্যক্তি বলিয়া থাকি, তেমনি জাতি বলিতে আমরা বিভিন্ন চিন্তায় প্রনোদিত, বিভিন্নভাবে পরিপূর্ণ, ও বিভিন্ন ক্রিয়ায় সক্রিয়, মানব সমষ্টিই বুঝিয়া থাকি। যে ভাষায় একই গানের সুর বাজে কিংবা একই ভাব প্রকাশ পায়, সেই ভাষাকে এইরূপ একটী জাতির সাধারণ সম্পত্তি সাহিত্য মনে করা ভুল নয় কি?

একটী পরিপুষ্ট, সতেজ জাগ্রত জাতি বলিতে যখন আমরা বিবিধ ভাব ও ক্রিয়ার আধার মানব সমষ্টি বুঝি তখন সাহিত্য বলিতেও এই বিভিন্ন ভাব ও চিন্তার প্রকাশক ভাষারচনাই বুঝা উচিত। সুতরাং যদিও সাধারণতঃ ভাববহুল ভাষাবিন্যাসকেই সাহিত্য বলা হয়, তথাপি অন্য দিক দিয়া দেখিলে দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞানের কথাও সাহিত্যের উপাদান বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। মানুষের মনের একটা প্রকাণ্ড সত্য এই যে ইহাতে ক্রিয়া প্রবৃত্তি বা জ্ঞান বা ভাব কখনও একলা থাকিতে পারে না। কেবলই কাজ করিয়া যাইতেছি অথচ মনে কোনও অনুভূতি নাই, কোনও জ্ঞান নাই ইহা অসম্ভব; তেমনই কেবলই জ্ঞানে ভরা, কোনরূপ ভাব নাই, অনুভূতি নাই, এরূপ একটা মনের অস্তিত্বও অসম্ভব। জ্ঞান শূন্য ভাব অথবা ভাব-বিহীন জ্ঞান আকাশ-কুসুমতুল্য। কেবল এক রাশি ভাব নিয়া ব্যক্তির জীবনই যখন সম্ভব হয় না, তখন একটা জাতীয় জীবনের অবলম্বন একমাত্র ভাব কিছুতেই হইতে পারে না; এবং সেই জন্যই একটী পরিপুষ্ট সাহিত্যে ও বিভিন্ন জ্ঞান ও বিচিত্র ভাবসম্পদ ঐ উভয়েরই স্থান থাকা আবশ্যক এবং না থাকিয়া ও পারে না।

কেহ হয়ত মনে করিবেন, আমরা এখানে ভাষা ও সাহিত্যের পার্থক্যটা ভুলিয়া যাইতেছি। জ্ঞানের কথা, ক্রিয়ার ইতিহাস ভাষায় থাকিবে বটে, কিন্তু তাহাকে সাহিত্যের অঙ্গ মনে করা ভুল। 'সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।' উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে ভাব ও জ্ঞানের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল তুলিয়া সীমানা ঠিক করিয়া দেওয়া চলেনা, ভাবকে নিয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে, জ্ঞানের তথায় স্থান হইবে না—ইহা অসম্ভব কথা। সাহিত্যের পূর্ণ-বিকাশ দিগন্তব্যাপী স্ফূর্ত্তি যদি হইতে হয়, তবে তাহা ভাব বৈচিত্র্য ছাড়া হইতে পারেন, বটে, কিন্তু এই ভাব বৈচিত্র্য চিরকালই জ্ঞানের বিপুলতার উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং একটী সমগ্র সাহিত্যের সম্পদের যদি ইয়ত্তা করিতে হয়, তবে তাহাকে কেবল ভাবের মাপ কাটিতে দেখিলে চলিবে না, জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য ও তখন ধর্ত্তব্য হইয়া উঠিবে। ভাবেরও তারতম্য হয়, ভাবের ও প্রকার ভেদ ও মূল্যভেদ আছে; কিন্তু এই ভেদের বিচার ভাবের মূলস্থিত জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া করা চলে না। অন্ধকারে যে ভয় হয়, সেটা ও একটা ভাব; আর, বিশ্বমানবের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার ফল শূন্যে পরিণত হইবে, ইহা ভাবিতে যে ভয় হয়, সেটা ও একটা ভাব; কিন্তু এ উভয়েতে কি কোন তফাৎ নাই থাকিলে, সে তফাৎ মাপিবার কি উপায়? শিশু যে তার পুতুলটীকে ভালবাসে সেটাও ভালবাসা, আর, পৃথিবীশুদ্ধ লোককে যে মহাত্মারা ভাল বাসিয়াছেন সেটা ও ভাল-বাসা; উভয়টীই ভাব, উভয়ই ভাষায়, ছন্দে প্রকাশ করা যায়; উভয়ই সাহিত্যের উপাদান হইতে পারে এবং হইয়াছেও; কিন্তু উভয়ের মূল্যভেদ আছে। আর মূল্যভেদ না থাকিলেও, উভয়ের মূলস্থিত জ্ঞানটুকু ছাঁকিয়া ফেলিলে ইহাদের প্রকার ভেদই লোপ পাইবে, ইহাদের বৈচিত্র্য দূরীভূত হইবে।

একটী সমগ্র সাহিত্য বলিতে আমরা কেবল একই ভাবের প্রত্যাশা করি না। সাহিত্যকে প্রকৃতির মত বৈচিত্র্যময়,—প্রকৃতির মত লতায় পাতায়, সৌরভে সঙ্গীতে, সুন্দরে মহতে পরিবৃত—প্রকৃতিরই মত একত্ব-মূলক বহুত্বে পরিপূর্ণ দেখিলে তবে বলিতে পারি ইহা একটী সমগ্র পুষ্টদেহ সাহিত্য'। ভাবের এই বন্ধহীন, সীমাহীন বৈচিত্র্যের বিকাশ হইতে হইলে জ্ঞানকেও তেমনই হাওয়ার মত উন্মুক্ত, দিগন্তব্যাপী করিয়া দিতে হইবে। দোকানের বা আফিসের সংকীর্ণতার মধ্যে সুস্থ, সবল সাহিত্যের জন্ম হইতে পারে কিনা জানিনা।—মুক্ত আকাশ যে দেখে নাই, প্রকৃতির বিশাল রাজ্য যার নিকট অন্ধকার সমাচ্ছন্ন, জানিনা সাহিত্যে সে কি ভাবসম্পদ উপহার দিতে পারে! বিশ্বের বিশাল বস্তু-সমষ্টির জ্ঞান যাহার নাই, তাহার পক্ষে ভাব বৈচিত্র্য প্রত্যাশা করা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন প্রয়াসের মত।

সাহিত্যের ভিতরই যখন স্তরভেদ করা হয়, তখন রসাত্মক ললিত-ভাষা-বিন্যাসকেই মাত্র সাহিত্য বলা হয়, একথা আমরা স্বীকার করি; এবং এই অর্থেই দর্শন ও ইতিহাস প্রভৃতি হইতে সাহিত্যকে পৃথক্ মনে করা হয়। এ সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন যে ভাবের বিষয় তাহাও অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু ভাব এই খানেও একমাত্র অবলম্বন নয়, অপ্রধান হইলেও, জ্ঞানও এখানে একটী অবলম্বন। কিন্তু সাহিত্যের আর একটী অর্থ আছে; সাহিত্য জাতির সমস্ত ভাব ও চিন্তা রাজ্যের প্রতিবিম্ব। সাহিত্যকে যখন পুষ্ট ও সবল করিতে চাই, সাহিত্যের যখন অভাব ও অপূর্ণতার কথা ভাবি, তখন সাহিত্যের এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল ভাবের প্রকাশ যে ভাষায় তাহার পূর্ণতা-অপূর্ণতার বিচা-রের কোন অর্থ নাই। যদিও বাংলার অধুনাতন অনেক কাব্যেরই ভাবগ্রহণ করা একটু দুষ্কর, তথাপি তাহাতেও কমবেশী ভাব যে প্রকাশ করে, ইহা ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। আর ভাবটী যদি সম্পূর্ণই প্রকাশ লাভ করিয়া থাকে, তবে ভাবের প্রকাশক হিসাবে তাহাতে আর কি অভাব থাকিতে পারে? কেবল ভাব প্রকাশের দিক্ দিয়া যদি দেখি, তবে যে কোন সাহিত্যেই এবং সাহিত্যের যে কোন অবস্থায়ই কতকগুলি ভাব যে প্রকাশিত থাকিবে তাহাত নিঃসন্দেহ; সুতরাং তাহার আর কি অভাব আছে এ প্রশ্নের কোন মানে থাকে না। অভাবের কথা যখন তুলি, তখন বুঝিতে হইবে যে,

সাহিত্যে অনেক জিনিষই থাকা দরকার, সবগুলি আছে কিনা তাহাই জানিতে চাই। এই অনেক সামগ্রী আর কিছু নয়—নানাবিধ, বিচিত্র ভাব, ও তাহা উৎপাদন করিতে পারে এমন বহুবিধ জ্ঞানরত্ন। একটী ছাড়া যখন আর একটী হইতে পারে না' তখন উভয়টীকেই সাহিত্যের অন্তঃপাতী করিয়া নিতে হইবে। জ্ঞানের দিক্ পুষ্ট না হইলে, ভাবের বহুত্ব ও বৈচিত্র্য ও ঘটিতে পারে না। সুতরাং যদিও ল'লতকলা হিসাবে কেবল রসাত্মক ভাষারচনাকেই সাহিত্য বলিয়া থাকি,তথাপি অন্য দিক হইতে দেখিলে সাহিত্য একটী প্রকাণ্ড ভাবাময় দর্পণ যাহাতে জাতির সমস্ত চিন্তা ও ভাবসমূহ প্রতিবিম্বিত থাকে। এই অর্থ গ্রহণ করিলেই সাহিত্যের পূর্ণতা-অপূর্ণতা বিচারের সার্থকতা জন্মে আর এই অর্থে সাহিত্যের বিচার আর সেই জাতির বিচার প্রায় একই হইবে।

একই দেহে যেমন বিভিন্ন কর্ম্মোপযোগী পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ থাকে, একই পরিবারে যেমন বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি থাকে, এবং ইহাদের প্রত্যেকটীর বিভিন্ন পরিণতির পূর্ণতা অপূর্ণতা সত্বেও, প্রত্যেকেরই শেষ পরিণতি যেমন সমগ্র দেহের বা পরিবারের পূর্ণতায়; তেমনই, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতিকেই বিশাল মানব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এক একটী ব্যক্তির মত মনে করা যাইতে পারে; এবং দেহে বা পরিবারে যেমন একের কাজ অন্য দ্বারা সম্পাদিত হয় না, তেমনই বিশ্বমানবদেহেও এক জাতির নির্দ্দিষ্ট কাজ অন্য জাতি দ্বারা সম্পাদিত হইবে না। এবং শেষ পরিণতি হইবে তখন যখন একটী সমগ্র পরিপূর্ণ, বিভিন্ন অংশে পরিব্যক্ত অথচ পরস্পর সম্বন্ধ-হেতু এক, বিশাল মানব পরিবারের সৃষ্টি হইবে। যতই বড় হউক না কেন, প্রত্যেক জাতিই যে এই বিশ্বমানবদেহের একটী অঙ্গ মাত্র, বিরাট্ পুরুষের বহুধা অভিব্যক্তির একটী রূপ মাত্র, ইতিহাস একটু তলাইয়া বুঝিলে এ ধারণা কতকটা না হইয়া পারে না। যে জাতির যে কাজ, জাতি যে সব সময় সজ্ঞানে তাহা অনুসরণ করে, এমন নহে; প্রায়শঃ বিশ্বশক্তির অন্তঃপ্রেরণায় আপনা হইতেই জাতিবিশেষের প্রতিভা তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের দিকে প্রধাবিত হয়। এবং ইহাও বোধ হয় সত্য যে, প্রত্যেক জাতিরই যে এক একটী কর্ম্ম রহিয়াছে, ঐতিহাসিক অনুধাবনার বাহিরে তাহার অনুভূতিও অতি ক্ষীণ।

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে জাতীয়ত্বের ভাবটীই অত্যন্ত সতেজ। সর্ব্বত্রই প্রত্যেক জাতিই আত্মবিকাশের জন্য পৃথিবী জুড়িয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র এবং এই যে চারিদিকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এত সংঘর্ষ হইতেছে, তাহার ও অন্তর্নিহিত কারণ প্রত্যেকের একান্ত আত্ম-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আর কিছু নহে। এই সংঘর্ষের ফলে প্রত্যেক জাতিই জগৎপ্রপঞ্চে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থান লাভ করিয়া শান্ত হইবে কিনা দেখিবার বিষয়। কিন্তু আপাততঃ পৃথিবীতে আমরা কতকগুলি জাতি পাই যারা সবল, সতেজ; আর কতকগুলি জাতি আছে যারা নিতান্ত হীন, দীপ্তিহীন, মৃতপ্রায়। সবল জাতি যারা, চারিদিকে তাদের কর্ম্মের ধ্বজা উড়িতেছে; তাদের করণীয়ের অন্ত নাই, চিন্তনীয়ের অবধি নাই;—চারিদিকেই সবেগ জীবনের স্পন্দন, চারিদিকেই স্ফূর্ত্তি, বিকাশ, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। আর জীবন্মৃত যে জাতি, সে পৃথিবীর কোন্ কোণে নীরবে পড়িয়া আছে;—দেহেতে জীবন রক্ষা ভিন্ন তাহার আর কোন কার্য্য নাই, আর কিছু ভাবিবার নাই; কদাচিৎ দৈনন্দিন কার্য্যের অবকাশে দু চারটা গান গাহিয়া জীবনটাকে একটু সরস করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে এবং তাহাকেই সাহিত্যে স্থান দিয়া সন্তুষ্ট থাকে।

এক বিরাট্ মানব পরিবারের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এক বিশাল বিশ্ব সাহিত্যেরও জন্ম হইবে। কিন্তু তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সাহিত্যকেই চূড়ান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি। জাতির মধ্যে যেমন দুর্ব্বল ও সবল আছে, সাহিত্যের মধ্যে ও তেমনই নিস্তেজ ও সতেজ আছে। অধিকন্তু, যেহেতু সাহিত্য জতির বিবিধ অভিব্যক্তির অন্যতম, বীর্য্যবান্ সাহিত্য ও বীর্য্যবান্ জাতির মধ্যে অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ। আমরা একথা বলিতে চাইনা যে জাতি অন্য দিকে আপনার বীর্য্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে বীর্য্যবান্ সাহিত্যের অধিকারী হইতে পারে না। বস্তুতঃ, উন্নতিশীল জাতির

শক্তি চারিদিকে যেমন প্রকাশ লাভ করে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে ও তাহা ছড়াইয়া পড়ে। পৃথিবীতে যে জাতি যখন বড় হইয়াছে, সে তাহার সাহিত্যকেও বড় করিয়া তুলিয়াছে; বড় হওয়া অর্থে যাহা বুঝায়, সাহিত্যের উন্নতিও তাহার অন্তর্গত। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী ও ফ্রান্স, পুরাকালের রোম, গ্রীস্, ও ভারতবর্ষ, —ইহার উদাহরণ। জাতির অন্যদিকের উন্নতি ও সাহিত্যের উন্নতির মধ্যে পরস্পর একটা জন্যজনকভাব রহিয়াছে—অন্য প্রকার উন্নতি যে জাতির হইয়াছে তাহার সাহিত্যও পিছনে পড়িয়া থাকিবে না; আর, অপ্রতিহত চেষ্টা দ্বারা যদি সাহিত্যকে সবল করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে অন্যপ্রকার উন্নতি ও জাতির একেবারে না হইয়া পারে না।

বীর্য্যবান্ জাতির যেমন, বীর্য্যবান্ সাহিত্যেরও তেমনই বৈচিত্রময় জীবন। বহু জ্ঞান, ভাব ও চিন্তার অস্তিত্বই বীর্য্যবান্ সাহিত্যের লক্ষণ। যে কোন সময়ে পৃথিবীর উপার্জ্জিত জ্ঞান রাশি ও ভাব সমষ্টি যে সাহিত্যে না পাইব, সেই সাহিত্যকে সেই পরিমাণে অঙ্গহীন ও অপূর্ণ মনে করিব। অবশ্যই বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে এক এক সাহিত্যের এক একটী বিশিষ্ট আদর্শ না হইয়া পারে না; সব সাহিত্যে যে একই সুর বাজিবে, একই গান গীত হইবে, এমন নহে; তথাপি তার পূর্ণতা অপূর্ণতা আছে। সমাজে সব মানুষই এক কাজ করে না, কিন্তু যে যে কাজই করুক না কেন, তার মধ্যেও ভালমন্দ আছে; সামান্য কাজে ও একটা সৌষ্টব, একটা বিশালতা, একটা ঐশ্বর্য্য থাকিতে পারে; আবার অতি বড় পদস্থ ব্যক্তির কাজেও একটা অসৌষ্টব বা হীনতা অসম্ভব নহে। সাহিত্যের বেলাও তেমনই। সাহিত্য বিশেষের কি উদ্দেশ্য তাহা নির্দ্ধারণ না করিয়াও বলা যায় উহা ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কিনা। উহাদ্বারা যদি বহু জ্ঞান লিপ্সা চরিতার্থ হয় যদি বিবিধ ভাবের অনুভূতি হয়,—এক কথায়, যদি একটা বিশালতার ভাব মনে জাগে, তবে বলিতে পারিব সাহিত্যটী সৌষ্টব সম্পন্ন।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রূপ নারায়ণ।

"রূপ নারায়ণ" ময়মনসিংহের একজন স্বনাম ধন্য মহাপুরুষ ছিলেন। তাহার পণ্ডিত্য প্রতিভায় ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণবত্বের নির্ম্মল যশোগৌরবে ময়মনসিংহ অদ্যাপিও বৈষ্ণব সাহিত্যে গৌরবান্বিত।

যে সময় বৃন্দাবনেশ্বরী কিশোরীর কামগন্ধ হীন উজ্জ্বল মধুর প্রেম প্লাবনে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়" হইয়াছিল,—যে সময় বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান জনপদ গুলিতে চৈতন্য ধর্ম্মের বিজয় নিশান উড়িতেছিল,—প্রাণী মাত্রের প্রাণের পরতে পরতে শ্রীশ্রীহরিনামামৃত রসের মৃদু তরঙ্গ খেলিতে ছিল, যে সময় নবদ্বীপের নবাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌর চন্দ্রের কল্যান প্রদ করুণা কিরণে কলি কলুষিত দুর্ব্বল জীবের পাপতমসাচ্ছন্ন হৃদয় কুটীর সমূহ উদ্ভাসিত হইতেছিল, যে সময়, নিত্যানন্দের আনন্দ ঝটিকায় মানুষের মায়ার সংসার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতেছিল,—জীবমাত্রের রক্ত কনিকায় প্রেমানন্দের স্পন্দন লীলা বর্ত্তমান ছিল, যে সময়, শ্রীরূপ, সনাতন, দাস রঘুনাথ প্রভৃতি মহাত্মারা প্রবল বৈরাগ্যের তীব্র তাড়নায় সংসার বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বৃন্দাবনের বৃক্ষ মূলাশ্রয় করিয়া অকিঞ্চনা ভক্তির শীতল ছায়ায় বিষয় বিকৃত পোড়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে ছিলেন, এবং যে সময়, শ্রীনিবাস নরোত্তম, শ্যামানন্দ রামচন্দ্র প্রভৃতি ভাগবত গণের শুভাবির্ভাবে ধরণীধাম ধন্য হইতেছিল, যে সময়, যবন কুল তিলক নাম সম্পত্তির মহা সম্রাট্ শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহাশয় হরিনামের বিজয় ভেরী বাজাইয়া জগতের সাধক মণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন,—আমাদের পণ্ডিত প্রবর "রূপ নারায়ণ" সেই সময় ময়মনসিংহ জেলার "ভিটাদিয়া" গ্রামে লক্ষ্মী নাথ লাহিড়ীর ঔরসেও কমলা দেবীরগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। "প্রেম বিলাস" নামক একখান প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে রূপনারায়ণের কথা বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। এস্থলে "প্রেম বিলাসের" একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি।

"প্রেম বিলাস„ বাঙ্গলা পয়ার ছন্দে লিখিত। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নিবাসিনী শ্রীশ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণীর প্রিয়তম শিষ্য শ্রীল নিত্যানন্দ দাস এই গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশীয় আত্মারাম দাসের ঔরসে ও সৌদামিনী দাসীর গর্ভে নিত্যানন্দ দাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈদ্য বংশের "দাস" উপাধি থাকিবার মৌলিক তত্ত্ব জানিনা,—বোধ হয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই ইঁহারা "দাস„ পদবী গ্রহণ করিয়া ছিলেন। বর্ত্তমান শ্রীখণ্ডের বৈদ্যগণ "ঠাকুর" উপাধি ভূষিত।

বীরচন্দ্র মহাশয় নিত্যানন্দ দাসের শিক্ষাগুরু। নিত্যানন্দ দাসের পূর্ব্বনাম বলরাম দাস ছিল। প্রেম বিলাসের বিংশ বিলাসে তাহার পরিচয় এই রূপ লিখিত আছে। যথা—

"মোর দীক্ষাগুরু হয়, জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে. কহিতে না পারি।
বীরচন্দ্র প্রভু মোর শিক্ষা গুরু হয়।
আমারে করুণা তিহোঁ, কৈলা অতিশয়॥
মাতা সৌদামিনী, পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম, শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
বলরাম দাস নাম, পূর্ব্বে মোর ছিল।
এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিল॥

শ্রীমুখে রাখিল ইহাতে বুঝাযায়,—বলরাম দাসের নিত্যানন্দ দাস নামটী গুরুদত্ত।

১৫২২ শকাব্দে "প্রেম বিলাস" লেখা শেষ হয়, ইহা হস্ত লিখিত এক খানা মূল গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে।—যথা

"পনর শত বাইশ যখন শকাব্দের আসিল।
ফাল্গুণ মাস আসিয়া উপস্থিত হৈল॥
কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি মনেতে উল্লাস।
পূর্ণ করিল গ্রন্থ শ্রীপ্রেম বিলাস॥
(প্রেম বিলাস। ২৪ বিলাস।)

গ্রন্থ সমাপ্তি সম্বন্ধে একটী সংস্কৃত শ্লোক এইরূপ আছে। এই শ্লোকার্থ উপরের লিখিত পয়ারের সঙ্গে এক মিল। শ্লোকটী এই—

শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন পক্ষতিথি সম্মিতে।
শাকে প্রেম বিলাসোহয়ং ফাল্গুনে পূর্ণতাংগতঃ।"

"প্রেম বিলাস„ একখানা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐতিহাসিক কাব্য গ্রন্থ। প্রেম বিলাসের অধ্যায় গুলির নাম বিলাস। প্রেম বিলাস অবলম্বন করিয়াই রূপ নারায়ণ শীর্ষক এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল।

প্রেম বিলাস পাঠ করিতে বসিয়া উনবিংশ বিলাসে প্রবিষ্ট হইলে পর, রূপনারায়ণের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। রূপ নারায়ণের নাম 'রূপচন্দ্র" ছিল। একদিন সনাতন গোস্বামী রূপ চন্দ্রের শরীরে "নারায়ণ" প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া রূপচন্দ্রকে "রূপ নারায়ণ" আখ্যা প্রদান করেন। যথা— প্রেম বিলাসে —

এত কহি সনাতন বিরত হইলা।
রূপ চন্দ্র. গোস্বামীর পদ মাথে নিলা॥
হেনই সময়ে এক আশ্চর্য্য ঘটিলা।
রূপচন্দ্রে নারায়ণ প্রবেশ করিলা॥
দেখি সনাতন তার ভক্তির প্রভাব।
আলিঙ্গন করি প্রেম কৈলা অনুভব॥
গোসাই কহে নারায়ণ তোর অঙ্গে প্রবেশিল।
আজি হৈতে নাম তোর "রূপ নারায়ণ" হৈল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা "রূপচন্দ্র" ও "রূপ নারায়ণ" উভয় নামই ব্যবহার করিব।

যে সময়ের কথা বলিতেছি,—তৎকালে কামরূপ রাজ্য বঙ্গদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। পাঠান বংশীয় মুসলমান রাজারা যুদ্ধ করিয়া কামরূপ অধিকার পূর্ব্বক মনমনসিংহের এগার সিন্দুর কামরূপের রাজধানী করিয়াছিলেন। প্রেম বিলাসে এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব টুকু এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা.—

বঙ্গদেশে কামরূপ রাজ্য অভিশুদ্ধ।
পাঠানে লইল তাহা করি মহা যুদ্ধ॥
সে দেশের রাজধানী এগার সিন্দুর।"
ব্রহ্ম পুত্র পারে স্থিত অতি মনোহর॥

ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ যে সকল স্থানে বিদেশীয় বণিকগণ আসিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেন—সেই বাণিজ্য বিখ্যাত স্থানগুলির নাম ও প্রেম বিলাসে পাওয়া গিয়াছে। যথা,—প্রেম বিলাসে

"এগার সিন্দুর আর মিরজাফর পুর।
দগ্ দগা, কুটীশ্বর, আর হোসেন পুর ॥
ব্রহ্মপুত্র তীরেতে এ সব গ্রাম হয়।
নানা দেশী লোক তথে বাণিজ্য করয় ॥
এগার সিন্দুর আর দগ্ দগা স্থানে।
বাণিজ্য বখ্যাত ইহা সর্ব্ব লোকে জানে ॥
নানা দিক্ দেশীয় বণিক থাকয়ে এথায়।
বেচা-কেনা করে সবে আনন্দ হিয়ায় ॥"

এই স্থানে আমাদের রূপনারায়ণের পরিচয়ও লিখিত আছে। যথা,—প্রেম বিলাস ঊনবিংশ বিলাসে।

"এগার সিন্দুর নিকট আছে এক গ্রাম।
কুলীনের বাসস্থান, "ভিটা দিয়া" নাম।
তথি বাস করে বিপ্র, লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
পত্নী তাঁর কমলা দেবী পরমা সুন্দরী ॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তেঁহো কুলীন প্রধান।
সর্ব্ব ব্রাহ্মণের মান্য, পূজ্য সর্ব্ব স্থান ॥
এক পুত্র হৈল তার, যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র।
নাম রাখিল তাঁর, শ্রীল রূপ চন্দ্র ॥

এই রূপচন্দ্রই "রূপ নারায়ণ"। রূপ নারায়ণ বাল্য-কালে মহা দুষ্ট ছিলেন। লেখা পড়া মোটেই করিতেন না। সারাদিন কেবল খেলিয়া বেড়াইতেন। লাহিড়ী মহাশয় পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার জন্য যত্ন ও উদ্যোগের ক্রটি করিলেন না। কিন্তু চঞ্চল বুদ্ধি বালক কিছুতেই বিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগী না হওয়ায়,—একদিন তাহাকে লক্ষ্মী নাথের আদেশ ক্রমে ভাতের সঙ্গে ছাই দেওয়া হয়। সেই দিন হইতেই রূপচন্দ্রের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল।

রূপচন্দ্র পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া মাতাকে প্রণাম পূর্ব্বক গৃহ ত্যাগ করিলেন। এবং কিছু দিন পর "পণ্ডিত বাড়ী" নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রামে বিদ্যা শিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। যথা প্রেম বিলাসে।—

"বাল্যকালে রূপচন্দ্র, মহা দুষ্ট ছিল।
পিতৃ নিদেশেও লেখা পড়া না শিখিলা ॥
নানা যত্ন করিলেন, লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
কিছুতেই তিহোঁ না করিলা লেখা পড়ি ॥
এক দিন ক্রোধে পিতা অন্নে দিলা ছাই।
মনস্তাপে উঠি গেলা, অন্ন নাহি খাই ॥
মাতাকে প্রণাম করি, গেলা গৃহ ছাড়ি।
কিছু দিনে উত্তরিলা, গ্রাম "পণ্ডিত বাড়ী ॥"

পণ্ডিত বাড়ী গ্রামটী নবদ্বীপেরই গর্ভস্থ, ইহা নিম্ন লিখিত পয়ারটীতে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যথা,—

"ব্যাকরণ পড়ি নাম, হৈল চক্রবর্ত্তী।
নবদ্বীপে অধ্যয়ন, বাড়ে তার কীর্ত্তি ॥
নানা শাস্ত্র পড়ি তাঁর বিদ্যা হৈল অতি।
তথিতে পাইলা তিহোঁ "আচার্য্য" খ্যাতি ॥"

নবদ্বীপে এক মত পাঠ শেষ করিয়া, রূপচন্দ্র নীলাচলে (শ্রীক্ষেত্রে) যাইয়া সংকীর্ত্তনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দর্শন সৌভাগ্য লাভ করেন। এবং তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া ৺জগন্নাথ দেবকে দর্শন পূর্ব্বক, ক্ষেত্রধাম হইতে বেদ পাঠ করিবার নিমিত্ত মহারাষ্ট্রের "পুনা" নগরীতে যান। সেখানে কিছুকাল বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করিয়া "সরস্বতী" উপাধি গ্রহণ করতঃ নানা স্থানে দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যথা,—প্রেম বিলাসে।

"সেথা হৈতে নীলাচলে করিলা গমন।
সঙ্কীর্ত্তনে কৈলা মহা প্রভুর দর্শন ॥
দূরে থাকি শ্রীচৈতন্যে প্রণাম করিয়া।
জগন্নাথ দর্শণ কৈলা, আনন্দিত হৈয়া।
সেথা হৈতে মহারাষ্ট্র পুনা নগরীতে।
বেদাদি পড়িতে গেলা হরষিত চিতে ॥
মহা শ্রুতিধর রূপচন্দ্র এহোঁ হয়।
বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, সকল পড়য় ॥
নানা শাস্ত্রে তাঁর দেখি, প্রভূত ব্যুৎপত্তি।
অধ্যাপক উপাধি তাঁহে দিলা "সরস্বতী ॥"
দিগ্বিজয় করি তিহোঁ নানা স্থানে যায়।
যেখানে পণ্ডিত দেখে বিচারে হারায় ॥"

এইরূপে নানা স্থান জয় করিয়া রূপনারায়ণ শ্রীবৃন্দাবনে, পরম পণ্ডিত রূপ-সনাতনের নিকট যাইয়া বিচার প্রার্থী হইলেন। রূপ-সনাতন বৈষ্ণব,—অকিঞ্চনা ভক্তির সাধনই তাঁহাদের মূল মন্ত্র।—বিচার করিতে গেলে পাছে, তর্ক বিতর্কের নিদারুণ উষ্ণ রশ্মিতে ভক্তি মন্দাকিনীর অনাবিল পবিত্র স্রোত শুষ্ক হইয়া যায়,—

আপন বৈষ্ণবত্বের অপচয় ঘটে. এই আশঙ্কায় তাঁহারা (রূপ-সনাতন) রূপচন্দ্রের সঙ্গে বিনা বিচারেই পরাজয় স্বীকার করিলেন। যথা --প্রেম বিলাসে।

"গোসাই কহে বিচারে নাহি প্রয়োজন।
পরাজয় মানিনু আমরা দুই জন॥"

রূপ-সনাতনের সঙ্গে শাস্ত্র যুদ্ধ করিতে না পারিয়া রূপচন্দ্র ক্ষুণ্ন মনে যমুনা তীর দিয়া যাইবার সময়, পথে শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শ্রীজীব রূপচন্দ্রের মুখে তাঁহার পরিচয় ও রূপ সনাতনের পরাজয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে কিছু ক্রোধান্বিত হইলেন। এবং বলিতে লাগিলেন.—"রূপ সনাতন আমার অধ্যাপক,—তাঁহারা বৈষ্ণবতায় ও পাণ্ডিত্য প্রতিভায় জগতে অতুলনীয়। এই মহা পণ্ডিতদ্বয় যে বিনা বিচারেই আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করলেন, ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। আপনি আগে আমার সঙ্গে বিচার করিয়া আমাকে জয় করুন,--পশ্চাৎ রূপ-সনাতনের সঙ্গে বিচার হইবে।

শ্রীজীবের বাক্যে উত্তেজিত হইয়া, পণ্ডিত প্রধান রূপনারায়ণ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচ দিন পর্য্যন্ত বিচারে জয় পরাজয় কিছুই হইল না। সপ্তম দিবসে দৈব দুর্ব্বিপাকে রূপচন্দ্র পরাজিত হইলেন।

বিচারের বিষয় ছিল,—"জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ না ভক্তি শ্রেষ্ঠ।" বিচারে জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগ হইতে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। যথা.—প্রেমবিলাসে।

"বৈষ্ণব মতের তিঁহো (জীব) দেখাইলা প্রাধান্য।
জ্ঞান কর্ম্ম যোগ হইতে ভক্তির হৈল মান্য॥"

শ্রীজীবের নিকট পরাজিত হইয়া রূপচন্দ্র শ্রীরূপ-সনাতনের মাহাত্ম্য অনেকটা বুঝিতে পারলেন। এবং অতিশয় আগ্রহ সহকারে শ্রীজীব সহ রূপ সনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া হরনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

তৎপর শ্রীপাট খেতরীতে গিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তদবধি রূপনারায়ণ একজন পরম বৈষ্ণব হইলেন। শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণের পর রূপনারায়ণ কিছুকাল বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। যথা,—প্রেম বিলাসে।

"কিছু কাল বৃন্দাবনে তিঁহো কৈলা বাস।
শ্রীজীবের স্থানে কৈলা, ভক্তি শাস্ত্রাভ্যাস॥
ভাগবত পড়ে স্বামী তোষিণী টীকা দিয়া।
লঘু বৃহদ্ভাগবতামৃত পড়ে হর্ষ চিত্ত হৈয়া॥
রসামৃত,-- উজ্জ্বল * পড়ে সন্দর্ভ সকল।
নাটকাদি পড়ি প্রীতি পাইল বহুল॥

তদনন্তর রূপনারায়ণ সমস্ত বৃন্দাবন ধাম পরিদর্শন পূর্ব্বক, বৃন্দাবন বাসী গোস্বামীগণের নিকট বিদায় হইয়া পুনর্ব্বার নীলাচলে আইসেন। নীলাচলে আসিয়া শুনিলেন,—মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। রূপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধান সংবাদে যৎপরনাস্তি দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে মহাপ্রভু বিরহ বিহ্বল রূপচন্দ্রকে স্বপ্নযোগে বলিয়া গেলেন যে. "নরসিংহ রায়ের সহিত তোমার মিলন হইবে। তুমি তাঁহার সহিত খেতুরী যাইয়া গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ রূপচন্দ্রের মাথায় পাদপদ্ম অর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। যথা,—

"প্রভু কহে শুন ওহে রূপনারায়ণ।
নরসিংহ রায় সহ হইবে মিলন॥
তাঁর স্থানে থাকি তুমি নরোত্তম হৈতে।
লভিবে গোপাল মন্ত্র তাহার সহিতে॥
এত কহি তাঁর মাথে চরণ অর্পিয়া।
অনুগ্রহ করি গৌর, গেলেন চলিয়া॥" (প্রেমবিলাসে।)

এইরূপ স্বপ্ন দর্শনের পর, রূপনারায়ণ ক্ষেত্র ধামস্থ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, শ্রীল স্বরূপ ও দাস গোস্বামী প্রভৃতি মহাশয়গণের নিকট ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের অযাচিত কৃপাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে রামানন্দ রায়ের সহিত তাঁহার শুভ সাক্ষাৎ হয়। রামানন্দ রূপচন্দ্রকে যথেষ্ট কৃপা করিলেন। রূপচন্দ্র গৌড়দেশে আসিয়া নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর অন্তর্দ্ধান শ্রবণে মহা দুঃখিত হইলেন।

---

* ভক্তি রসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণি॥

একদিন গঙ্গা ঘাটে স্নান করিবার সময় রাজা নরসিংহের সহিত রূপ নারায়ণের সাক্ষাৎ হয়। রাজা অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক রূপনারায়ণকে আপন বাড়ীতে লইয়া যান। যথা,—প্রেম বিলাসে

"রাজা নরসিংহ দেখি রূপ নারায়ণে।
পরিচয় লৈলা যত্নে আসি তাঁর স্থানে॥
* * * * * *
রাজা নরসিংহ রায়, অতি আগ্রহ করি।
রূপ নারায়ণে নিল, আপনার বাড়ী॥

রাজ বাড়ীতে একজন পণ্ডিত আসিয়াছেন, এই কথাটা মুহূর্ত্ত মধ্যে সংসার ছাইয়া পড়িল। দলে দলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া রাজ বাড়ীতে শাস্ত্র বিচার বাসনায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বিচারে দিগ্বিজয়ী রূপ নারায়ণের নিকট ক্রমে সকলেই পরাজয় মানিলেন। যথা.— প্রেম বিলাসে

"বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজ বাড়ীতে আইলা।
বিচারে রূপ নারায়ণ, সবে পরাজয় কৈলা॥
রূপ নারায়ণের কীর্ত্তি সর্ব্বত্র ব্যাপয়।
তাঁর সম পণ্ডিত কোন দেশে নাহি হয়॥"

তৎপর রূপনারায়ণ রাজা নরসিংহের সহিত খেতুরী আসিয়া ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র ও কামবীজ কাম গায়ত্রী গ্রহণ করেন।

রূপ নারায়ণ সম্বন্ধে অনেক কথা প্রেম বিলাসে লিখিত আছে। সমস্ত লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বড় বিস্তৃত হইয়া পড়ে, অতএব এই পর্য্যন্তই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

রূপ নারায়ণ একজন মহাপণ্ডিত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন;—তিনি বহু বহু পণ্ডিত সমাজে উপস্থিত হইয়া বিচারে জয়লাভ করত "গোস্বামী" প্রভৃতি আরোও অনেক বড় বড় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতীতের অন্তরাল হইতে টানিয়া খুজিয়া বাহির করিলে, ময়মনসিংহের এইরূপ উজ্জল রত্ন আরও অনেক পাওয়া যাইতে পারে। এবং এই সকল মহাপুরুষের জীবনী লইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের অনেকটা পুষ্টি সাধন করা যাইতে পারে।

ময়মনসিংহে এই প্রকার কত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া কাল চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করে কে?

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

লক্ষ্মী নারায়ণ।

বাজার থেকে আসছি মাত্র, নামাইনিক ভুলা,
বগলে কটা পোলটা বাঁধা শুক্‌না—শুঁঠা মূলা!
গিন্নী দেখে বিম্নি ফাটা রাগে তখন কয়,
'বৌজ্‌রা মাছের মুঁড়ায় ভাল মূলার ঘণ্ট হয়!"
পেঁজের যেমন ভিতর শূন্য কেবল বেড়া খোঁসা,
তেম্‌নি তর অসার আরো মেয়ে মানুষের গোষা।
কিন্তু তবু পেঁয়াজ ছাড়া রান্না ভাল নয়,
যদিও তার উগ্রগন্ধে উট্‌কী কারো হয়।
নারীর মানে তীক্ষ্ণ ঘ্রাণে বিষম বটে ঝাঁজ,
রম্য করে তবু অনেক নিরামিষা কাজ!
পউষ মাসে মেঘ বাতাসে রুক্ষ খর রোদ,
শরতের পূর্ণিমার চেয়ে মিষ্টি লাগে বোধ!
কাঁকর সম কড়াই ভাজা নীরস অতিশয়,
খর নুণে লঙ্কার ঝালে রুচির কত হয়!
"হাতে মাত্র ছিল দেখ পয়সা গোটা চার,
একটী গেছে বৌজ্‌রা মাছে, মূলায় গেছে আর,
দুইটী পয়সা গেছে কিন্তু কিস্তে তোমার 'সাজা,'
হিসাব করে দেখ এখন এক্‌লা তুমি আধা!"
এক পলকে নীল যমুনা হয়ে গেল লাল,
কটকে দেশের আট্‌কা জল কপাট বাঁধা খাল
খুলে গেল এক নিমিষে, টস্ টসিয়ে পড়ে,
'বম্' বলিতে চন্দ্র নাথের "হাজার ধারা" ঝরে!
"এ সংসারে যত অভাব কেবল আমার লাগি,
আমি সে অলক্ষ্মী বাড়ীর—আমিই হতভাগী!
নাই যে বাড়ী, নাই যে ঘর, কুঁড়ের নাই যে বেড়া,
জাব্‌রি দিয়ে আব্রু রাখি—পরণ তেনা ছেঁড়া!

পদ্মাতে ধুইয়া এই ত নেয় যে ভিটা মাটী,
আমার জন্য হয় না বাড়ী—এই ত কথা খাঁটি।
কিন্‌তে আমার পাণ্ শুপারি—কিন্‌তে আমার চূণ
হায়রে আমার পোড়া কপাল—মানুষ হ'ল খুন!"
অরুণ চেয়ে তরুণ অতি করুণ আঁখি তার
অদৃষ্টে অদৃষ্টে করি নীরব নমস্কার,
নীরবিলা নতমুখে কলকণ্ঠ পিক,
অন্তরে বিঁধিল আসি নীরব শত ধিক্।
অস্ত যেতে সূর্য্য যেন কৃষ্ণ মেঘের ফাঁকে.
অভিমানে ধরার পানে দীপ্তি দিয়ে থাকে!
হেলায় যেন উপহেসে বিপদ সে নেয় ভার
কালোর কোলে আলোর জলে করুণ অহঙ্কার!
"কল্লে কেন মলিন আনন মলিন অতিশয়,
হোক্ না তোমার পিতৃভূমি সাগর—জলময়,
আছে সে অনন্ত দুঃখ হাজার ফনা ধরি,
আমরা দু'জন সুখ-শয়ন কর্‌ব তদুপরি।
তুমি আমার লক্ষ্মীরাণী সেবিবে চরণ.
হইব অনন্তশায়ী আমি নারায়ণ!"

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

ইলিয়টকৃত ভারত-ইতিহাস।

কার্ত্তিক মাসের সৌরভে আমরা ইলিয়টকৃত ভারত-ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে আমরা উক্ত বিরাট গ্রন্থাবলীর পরিচয় সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ-সাগর মন্থন করিয়া ইলিয়ট সাহেব যে সার সংকলন করিয়াছেন, তাহার কতটুকু গ্রাহ্য এবং কতটুকু অগ্রাহ্য তাহা সুধিগণ বিবেচনা করিবেন।

কার্লাইল বলিয়াছেন, পূজা ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। ভক্তিবিহীন জ্ঞান পাণ্ডিত্যের নিষ্ফল আড়ম্বর মাত্র—উহাকে তিনি শুষ্ক পত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান অতীতের সাক্ষী। অতীত বর্ত্তমানের ছায়া। অতীতে যাহা অদৃশ্য বর্ত্তমানে তাহা মজ্জাগত। প্রাণশীল জাতির জীবনে দেখিতে পাই অতীত বর্ত্তমানে পরিণতি ও পরকাষ্ঠা লাভ করিতেছে। যে পরম ইচ্ছা জাতীয় জীবনের মূলে অঙ্কুরিত, তাহা অতীতের কোন গহ্বরে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে এরূপ মনে করা প্রাজ্ঞ-লোকের কর্ত্তব্য নহে। ইহা সত্য বটে, ভারতবর্ষের এমন কোন ইতিহাস রচিত হয় নাই যাহাতে বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের সামঞ্জস্য দেখাইয়া ভবিষ্যতের সুন্দর আলেখ্য প্রদর্শন করা হইয়াছে; এক কথায়, ভারত-বর্ষের বিজ্ঞান সম্মত যথার্থ ইতিহাস এপর্য্যন্ত রচিত হয় নাই বটে; কিন্তু সেরূপ ইতিহাস রচিত হইবার সম্ভাবনা ও উপকরণ নাই একথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? স্বদেশের বৈদেশিক প্রদত্ত সুদূর অতীত কাহিনী পাঠ করিয়া বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের মজ্জার সঙ্গে যখন তাহার সাদৃশ্য অবলোকন করি তখন স্তম্ভিত হই। দেখিতে পাই ভারতীয় সভ্যতাকে লোকে প্রাচীন বলিলেও তাহার বীজ অক্ষয়। যে রস প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবন সঞ্জীবিত করিয়াছিল তাহা এখনও বিশুষ্ক হয় নাই। অতীতের সেই রস বর্ত্তমান ছাপিয়া ভবিষ্যতে উদ্বেলিত করিয়া তুলিবে যদি এই আশা না করিতে পারি তবে আমাদের ইতিহাস পাঠ বৃথা—আমাদের জ্ঞান শুষ্ক পত্রের মত পদার্থ হীন ও নিষ্ফল।

প্রাচীন আরবদেশীয় ভৌগোলিকগণ।

(১) আবুজেইদু-ল্ কর্ত্তৃক পরি-বর্দ্ধিত বণিক সোলেমান রচিত সালসিলাতু-ত্ তারিখ।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মন্ত্রী কলবার্ট * সাহেবের পুস্তকাগারে পাওয়া যায় এবং রেনডট সাহেব ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার অনুবাদ প্রকাশিত করেন। কিন্তু রেনডট কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ বৃত্তান্ত চীনদেশে প্রেরিত ক্রিশ্চিয়ান প্রচারক-গণের বিবরণের সঙ্গে আদৌ সঙ্গত হয় নাই বলিয়া কেহই তাহা বিশ্বাস করে নাই। সমালোচকগণ তাহাকে প্রতারণা, চৌর্য্য, অলীক কল্পনা ইত্যাদি অপরাধে দোষী করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্য কখনও আবৃত থাকে না। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লেংলিস্ সাহেব উক্ত

* ইনি একজন প্রসিদ্ধ করাসী রাজ নৈতিক, ১৬১৯ খ্রীঃ পেরিস নগরীতে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন।

পাণ্ডুলিপি ছাপাইয়া প্রকাশিত করিলে সকলেই রেনডট সাহেবের লিখিত বৃত্তান্তের সত্যতা উপলব্ধি করিলেন।

সোলেমান একজন বণিক ছিলেন। বাণিজ্য উপলক্ষে খ্রীষ্টিয় নবম শতাব্দীতে তিনি বহুবার পারস্যোপসাগর, ভারতবর্ষ ও চীনে বাণিজ্য যাত্রা করেন। তিনি ঐসকল দেশে ভ্রমণ করিয়া যে সকল বিবরণ রাখিয়া যান তাহার নাম "সালসিলাতু ত-তারিখ"। আবুজেইদ কখনও চীন বা ভারতে আগমন করেন নাই। তিনি বহু অধ্যয়ন ও ভ্রমণকারিদিগের সহিত আলাপ করিয়া উক্ত সোলেমানের গ্রন্থ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে ব্রতী হন। আবু জেইদ এই বলিয়া তাহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন, "নাবিকগণ যে সকল অলীক গল্প বিবৃত করিয়াছে, যাহা তাহারা নিজেরাই বিশ্বাস করে না, আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছি। সত্য বিবরণ ক্ষুদ্র হইলেও আদরণীয়। পরমেশ্বরই আমাদিগকে সত্যপথে চালিত করেন।"

সোলেমান প্রদত্ত বিবরণ।

"ভারতবর্ষ ও চীন দেশের অধিবাসীগণ সকলেই স্বীকার করে যে পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি চারিজন। তন্মধ্যে বাগদাদের খালিফ সর্ব্বপ্রধান। ঐশ্বর্য্যে ও রাজসভার সমৃদ্ধিতে তাহার সমকক্ষ কেহই নয়; বিশেষতঃ তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের রক্ষয়িতা। চীনদেশের রাজা নিজেকে বাগদাদের খালিফের নিম্নে স্থান প্রদান করেন। তৎপরে রুমের নৃপতি ও সর্ব্বশেষে বালহরার (Balhara) নরপতি।"

"ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ মধ্যে বালহরা শীর্ষস্থানীয়। ভারতে নৃপতিগণ স্ব স্ব রাজ্যে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন, কিন্তু সকলকেই বালহরার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়। বালহরা কোন নৃপতির নিকট দুত প্রেরণ করিলে তাহাকে অশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করা হয়। বালহরার হস্তী অশ্ব সংখ্যাতীত ও তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপরিসীম। তিনি সৈন্যগণকে রীতিমত বেতন প্রদান করেন। তাতারীয় দার্হাম (dirham) দেশের প্রচলিত মুদ্রা। বালহরা রাজ্যে হিজরী অব্দ প্রচলিত নাই। প্রত্যেক নৃপতির সিংহাসনারোহণের বৎসর হইতে নুতন অব্দের প্রচলন হয়। নৃপতিগণ দীর্ঘজীবী হয় এবং সাধারণতঃ সকলেই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী রাজত্ব করে।"

"বালহরা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। ইহা পারস্যের "খুশরুর" মত উক্ত বংশের রাজগণের সাধারণ নাম। বালহরা চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজগণের সহিত অনবরত সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। কেহই তাঁহাকে জয় করিতে সক্ষম হয় না। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের মধ্যে ইনিই মুসলমানধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু। ইঁহার রাজ্যে বিনিময় কার্য্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের রেণুদ্বারা সম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষে এই দেশের মত তস্করাদির উপদ্রবহীন রাজ্য আর নাই।"

অতঃপর তাফক, রুহমী, কাসবিন, কিরাঞ্জ ও সরন্দীব নামক চারিটী রাজ্যের অবস্থিতি ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সরন্দীব (সিংহলদ্বীপ) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "সরন্দীবের রাজা পরলোক গমন করিলে তাহার শব একটী অনুচ্চ শকটে এরূপ ভাবে বহন করা হয় যে তাহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ভূমিসংলগ্ন থাকে ও চুলগুলি বিলুণ্ঠিত হইয়া যাইতে থাকে। পশ্চাতে সমার্জ্জনী হস্তে একটী স্ত্রীলোক ধূলি ঝাটাইয়া শবের মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে থাকে, "হে মানবগণ, অবলোকন কর, এই ব্যক্তি গতকল্য তোমাদের রাজা ছিল, সে তোমাদের শাসন করিত আর তোমরা তাহার আদেশ পালন করিতে। এখন দেখ তাহার কি অবস্থা! সে সংসার হইতে বিদায় লইয়াছে, মৃত্যুর দুত আসিয়া তাহার আত্মা লইয়া গিয়াছে। তোমরা ঐহিক সুখকর্ত্তৃক বিপথে চালিত হইও না।" এই অনুষ্ঠান তিন দিন পরিপালিত হয়। অবশেষে চন্দন কাষ্ঠ কর্পূর ও জাফরান দ্বারা শবদেহ দাহ করা হয় ও ভস্ম বাতাসে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। কখন কখন রাজার মৃত্যু হইলে রাজ-

* বালহরার সংস্কৃত নাম বল্লভীপুর। বালহরার নৃপতিগণের উপাধি বল্লভরায়। মুসলমানগণ বালহরা শব্দের অর্থ রাজার রাজা (king of kings) করিয়াছেন। প্রাচীনকালে এই রাজ্য অশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আগামীতে আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিব।

* আবুজেইদের বন্ধু প্রসিদ্ধ পারস্য দেশীয় ঐতিহাসিক আলমসুদী স্বচক্ষে এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

মহিষীগণ সেই চিতায় আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ, করেন। অবশ্য এরূপ করা তাহাদের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।"

ভারতবর্ষে অনেক লোক আছে, পাহাড় জঙ্গলে ভ্রমণ করাই তাহাদের ব্যবসা। তাহারা মানবসমাজের সংশ্রবে বড় একটা আসেনা। সময় সময় তাহারা আরণ্য ফল মূল ভিন্ন কিছুই আহার করে না। কেহ কেহ উলঙ্গ অবস্থায় পরিভ্রমণ করে। আমার ভ্রমণকালে এক ব্যক্তি শুধু একটী শার্দ্দূলচর্ম্ম দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া উলঙ্গাবস্থায় সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিয়াছিলাম। ষোল বৎসর পরে পুনরায় সেই দেশে গমন করিয়া ঐ ব্যক্তিকে পূর্ব্বাবস্থায়ই নিরীক্ষণ করিয়া যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাহার গাত্র সূর্য্যতাপে গলিয়া যায় নাই। এই সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস তাহার ভারতীয় ব্রাহ্মণদের বিবরণ মধ্যে লিখিয়াছেন যে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে একদল দার্শনিক আছে তাহারা স্বাধীন জীবন যাপন করে। কোন প্রকার আমিষ বা অগ্নিপক্ক দ্রব্য আহার করে না। নদীর জল আর বৃক্ষ হইতে পতিত ফল গ্রহণ করে এবং সারা জীবন উলঙ্গাবস্থায় পরিভ্রমণ করে। তাহারা বলে শরীর আত্মার আবরণ স্বরূপ পরমেশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। তাহারা মৃত্যুকে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের সহিত নিরীক্ষণ করে। তাহারা সকল জীবকেই বদ্ধ মনে করে ও সেই বন্ধন মুক্তির জন্য তাহারা সারা জীবন তপস্যা করে।

"এই সমস্ত রাজ্যে সম্ভ্রান্ত বংশ সমূহ এক পরিবার ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। শাসন ক্ষমতা শুধু উহাতেই আবদ্ধ থাকে। জ্ঞান চর্চ্চা ও চিকিৎসা বিদ্যাও এইরূপ জাতি বিশেষে আবদ্ধ থাকে। ভারতের রাজন্যবর্গ কোন এক রাজার বশ্যতা স্বীকার করে না। তাহারা সকলেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। কিন্তু তথাপি বালহরাকেই নৃপতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা হয়।"

"চীন বাসীগণ সুখপ্রিয় জাতি। কিন্তু ভারতীয়েরা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় সুখের বিরোধী। তাহারা কখনও মদ্য স্পর্শ করে না। ভারতের কোন রাজা মদ্য পান করে না। তাহারা বলেন যে ব্যক্তি মদ্যপানে মত্ত থাকে সে কিরূপে রাজ্যের গুরুভার বহন করিবে?

"ভারতের রাজারা সময় সময় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়। কিন্তু দেশ জয় করিয়া তাহা অধিকার করে না। পরাভূত রাজবংশের কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া বিজেতার নামে রাজ্য শাসন করায়। অন্যরূপ ব্যবস্থা করিলে প্রকৃতিপুঞ্জ তাহাতে বাধা প্রদান করে।"

"চীনের ধর্ম্মনীতি ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত; এবং উভয় দেশেই জন্মান্তর বাদের প্রচলন আছে।"

আগামীতে আমরা আবুজেইদ প্রদত্ত বিবরণ প্রকাশ করিব।

শ্রীবিমলনাথ চাকলাদার

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার চাকরীর দরখাস্তের জবাবে একখানি পাশ ও হুকুম পাইলাম যেন ১৯এ এপ্রিল বোম্বাই সহরে উপস্থিত হইয়া ক্যানাডা' জাহাজে আরোহণ করি। কোথায় জাহাজ হইতে নামিতে হইবে, কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে প্রভৃতি উপদেশ সমস্তই ঐ সঙ্গে পাইলাম।

ঐ তারিখের বেলা ৯টার সময় আমি জাহাজে আসিয়া চড়িলাম। নীচের ডেকে নিজের বিছানা পাতিয়া একবার চারিদিকে ঘুরিয়া আসিলাম জাহাজ খানা প্রকাণ্ড। একবারে উপরের তালায় কাপ্তেন সাহেবের স্থান। তিনি ঐ স্থান হইতে দুরবীণের সাহায্যে বহুদূর পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। দরকার হইলে ঐখান হইতে টেলিফোনের সাহায্যে কর্ম্মচারীদিগকে উপযুক্ত হুকুম দিয়া থাকেন। উহার নীচে থার্ড ও সেকেণ্ড ক্লাস এবং খোলা ডেক। ঝড় তুফান না থাকিলে ডেক যাত্রিরা এই স্থানে থাকিতে পারে। কিন্তু ঝড়ের সময় তাহাদিগকে নীচের ঘেরা ডেকে পাঠাইয়া চারি-দিগের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শুনিলাম,

ঝড়ের সময় উপরের খোলা ডেকের উপর সমুদ্রের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। জাহাজের খালাসী ও ছোট ছোট কর্ম্মচারীরা নীচের তালায় থাকে। ঝড়ের সময় শুনিলাম জাহাজের অবস্থা বড় ভয়ানক হয়। আমার সৌভাগ্য যে, আমাকে এই বিপদে পরিতে হয় নাই।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, আমার দেশের এক মুসলমান আমার সহিত ইউগণ্ডা যাইতেছে। তাহার বয়স প্রায় ৫০। পেটের দায়ে এই বয়সে আফ্রিকা যাইতেছে। সে উপরের খোলা ডেকে নিজের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। আমি খানিক ক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া করিম খাঁর (ঐ মুসলমানের) নিকট আসিয়া বসিলাম। দেখিলাম সে তখন এক বাঙ্গালী ছোকরার সহিত বিশেষ মনোযোগের সহিত কথোপকথন করিতেছে। শুনিলাম, ঐ ছোকরাও ইউগণ্ডা যাইতেছে। উহার নাম রতিকান্ত। আমরা তিনজনে একই স্থানে যাইতেছি বলিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা বন্ধু হইয়া পড়িলাম। ভগবানের এমনি কৌশল যে, কর্ম্ম-স্থানে আমরা তিনজনে প্রায়ই একত্র বাস করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সেইজন্য আমাদের এই বন্ধুত্ব বরাবর বজায় ছিল।

জাহাজে আমরা প্রস্তুত খাদ্য প্রত্যহ পাইতাম বলিয়া আমাদের হাতে সময় অনেক ছিল। এই স্থানে জাহাজে খাদ্যাদির বন্দোবস্তের কথা দুই একটী বলিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রিয়কর হইবে না। প্রাতঃকালে ৬টার সময় এক এক পেয়ালা চা বা কোকা ও দুইখানি করিয়া বিস্‌কুট প্রত্যেককে দেওয়া হইত ৮॥টার সময় ডাল, রুটি, মাংসের বা মৎস্যের ঝোল, একটা তরকারি পাইতাম। বেলা একটার সময় আবার চা ও বিস্‌কুট সন্ধ্যার পর আবার পেট ভরিয়া আহার। যাঁহারা পয়সা খরচ করিতে পারেন, তাঁহারা ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্য খাইতে পান। আঙ্গুর, পেস্তা, বেদানা, বাদাম, কিস্‌মিস্ লেবু, খেজুর, পেপে, প্রভৃতি ফল, নানা প্রকার ইংরাজি মিষ্টান্ন, মদ প্রভৃতি প্রচুর সংগ্রহ আছে। যাঁহারা পড়িতে ভাল বাসেন, তাহারা জাহাজের লাইব্রেরি হইতে নানা প্রকার পুস্তক গ্রহণ করিতে পারেন। মাসিক ও সংবাদ পত্রও (অবশ্য পুরাতন) সংগ্রহ আছে।

ডেক যাত্রীরা রেল যাত্রীদিগের অপেক্ষা অনেক আরামে থাকে। সকলেরই বেশ ঢালা বিছানা। কেহ তাস খেলেন, কেহ দাবা রত, কেহ গান বাজানা করেন, কেহ বা কিছু পাঠ করেন। ১০।১৫ জন তাঁহার চারিদিকে বসিয়া উহা উপভোগ করেন। যাহার কিছুই ভাল লাগেনা, সে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায় বা খোলা ডেকের উপর দাঁড়াইয়া সমুদ্রের শোভা দর্শন করে। সাহেবদের আমোদ প্রমোদের নানা প্রকার বন্দোবস্ত আছে। উহাদের নাম আমি জানি না বলিয়া বলিতে পারিলাম না।

এক দিন আমরা তিনজনে খোলা ডেকে দাঁড়াইয়া সমুদ্র দেখিতেছি, এমন সময় কতক গুলা মাছ আসিয়া আমাদের সম্মুখে ডেকের উপর পড়িল। একজন খালাসি নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাছ গুলা উঠাইয়া লইল। রতিকান্ত বলিল "উহারা উরন্ত মাছ। আকাশে উহারা উড়েনা, কিন্তু সজোরে দৌড়ায়। বড় ২ মাছ উহাদিগকে তাড়া করিলে উহারা জল ছাড়িয়া পলাইতে যায় মনে হয় যেন উড়িতেছে।" সমুদ্রে অনেক রকম মাছ আছে। খালাসিরা জাহাজের পেছনে প্রত্যহ একখানা জাল বাধিয়া দেয়। ৮।১০ ঘণ্টা পরে জাল উঠাইলে প্রায় উহাতে ২০।৩০ সের মাছ পাওয়া যায়। এই অসীম ও সুগভীর ভারত মহাসমুদ্রে আমরা পুটি মাছের মত অনেক রকম ছোট ২ মাছ দেখিলাম। উহারা যে কেমন করিয়া এত বড় সমুদ্রে থাকে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সমুদ্রের মাছ বড় স্বাদু হয়। প্রত্যহই আমরা তাজা মাছ খাইতে পাইতাম। শুনিলাম, এই পথে সময়ে ২ তিমি মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন খালাসি বলিল যে, তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার তাহারা এই পথে এক তিমি দেখিতে পায়। মাছটা লম্বায় প্রায় ৪০ হাত হইবে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উহা জাহাজের সঙ্গে ২ গিয়াছিল তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বোম্বাই ছাড়িবার এগার দিন পরে জাহাজ মোম্বাসা বন্দরে উপস্থিত হইল। ইহা আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত। মোম্বাসা নামক এক দ্বীপের ইহা প্রধান সহর। যে জল ভাগ আফ্রিকা হইতে এই দ্বীপকে পৃথক করিতেছে, উহাই বন্দর। জাহাজ প্রভৃতি ঐ স্থানে অবস্থান করে। জাহাজ হইতে সহরের দৃশ্য বড় সুন্দর বোধ হইল। সহরের চারিদিকে শত ২ নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া রতিকান্ত বলিয়া উঠিল, "এ যেন বাঙ্গলা দেশ!"

জাহাজ বন্দরে লাগিতে না লাগিতেই চারিদিক হইতে ৪০।৫০ খানা ঐ দেশীয় নৌকা আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিয়া। উহাদের মাঝি, মাল্লা সমস্তই আরব জাতীয়। তাহাদের বিশাল চেহারা দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আমি জানিতাম আমার দেশের লোকই সবল দেহের জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এখন ইহাদিগকে দেখিয়া আমাকে স্বীকার করিতে হইল যে, পঞ্জাবের লোক ইহাদের সঙ্গে তুলনাই হয় না। রতিকান্ত বলিল "সিংহজী! ব্যাপার দেখিতেছেন। এমন দুষমন্ চেহেরা কখন ও দেখিয়াছেন কি? ইহাদের নৌকায় চড়িয়া কিনারায় নামিতে হইবে নাকি? ও বাপ! যদি পথের মধ্যে গলা টিপিয়া ধরে, তবে বিদেশে বেঘোরে প্রাণটা যাইবে। কি বল?"

আমি জবাব দিবার পূর্ব্বেই আরবেরা দলে ২ জাহাজের উপর আসিয়া উঠিল, এবং কয়েকজন আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। তাহারা প্রায় সকলেই ভাঙ্গা ২ ইংরাজি জানে দেখিলাম। একজন আসিয়া আমায় ধরিল ও আমাকে তাহার নৌকার দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। এই সময়ে একজন হিন্দু-স্থানী চাপরাসী আসিয়া আমার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করাতে আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, আমার সাহেব (যাঁহার প্রধান চাপরাসী হইয়া আমি ইউগণ্ডায় আসিয়াছি) কর্ণেল্ পেটারসন তাহাকে পাঠাইয়াছেন। আমি যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এই ঘোর বিদেশে কি যে করিব কিছুই জানিতাম না। সাহেবের এই অনুগ্রহে তাঁহাকে মনে ২ শত ২ ধন্যবাদ দিয়া চাপরাসীর সঙ্গে ২ চলিলাম। রতিকান্ত এবং করিম খাঁ ও আমার সহিত চলিল। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ইহারা দুইজনে ও ঐ কর্ণেল সাহেবের অধীনে চাকরী করিতে আসিয়াছে।

মোম্বাসার দৃশ্য।

চাপরাসীর নাম মহিনা। সে এ দেশে

দুই বৎসর হইতে আছে। এখানকার কথাবার্ত্তা ও ধরণ ধারণ সে অনেক জানে। নৌকায় উঠিবার পর সে বলিল—"এই আরবেরা বড় ভীষণ স্বভাবের লোক। উহারা কথায় ২ ছুরি চালায়। নুতন লোক পাইলে অনেক সময়, নৌকার উপর উহার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লয়। একা পাইলে কখনও কখনও হত্যা করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। ৪ মাস পূর্ব্বে ইহারা একজন পার্শী সওদাগরকে নৌকার উপর খুন করে। ভাগ্যক্রমে অপর নৌকা হইতে একজন সাহেব ইহা দেখিতে পান। তিনি গোলমাল করাতে সকলে ধরা পড়ে ও সকলেরই ফাঁসির হুকুম হয়।" এই গল্প শুনিয়া করিম খাঁ বলিয়া উঠিল, "আল্লা, আল্লা! কি ভয়ানক জায়গা! আমি ভাই মোটে ৭ মাস আগে চাঁদ বিবিকে নিকা করিয়া আসিয়াছি। আজ বড়ই বাঁচিয়া গিয়াছি। তা' না হইলে কি আর ফিরিয়া যাইতে পারিতাম।"

মহিনা বলিল, "খাঁ সাহেব! বিবির বয়স কত?"

করিম। এই ধরনা, আমার বড় ছেলের বয়স ৯ গণ্ডা। বিবির বয়স তাহার অপেক্ষা ৩ গণ্ডা বেশি।

রতিকান্ত। তুমি দেখিতেছি এক দাঁও মারিয়াছ।

খাঁ সাহেব হর্ষোৎফুল্লভাবে বলিল, "সে কথা আর বল কেন ভাই। এই নিকা করিতে আমাকে বাড়ী বাধা দিতে হইয়াছে। ছেলেগুলা বলে কিনা, "তুমি বুড়া হইয়াছ, আর নিকা কেন? হা ভাই! আমি কি বৃদ্ধ হইয়াছি?"

মহিনা সে আবার কি কথা। চুলগুলা সাদা হইয়াছে—তা আজকাল কচি ছেলেরও চুল পাকে। দাঁতগুলা সব গিয়াছে বটে, কিন্তু তাও বোধ হয় ব্যারামে।

এই সময় আমরা কিনারায় উপস্থিত হওয়াতে কথাবার্ত্তা স্থগিত রহিল। কি শুভক্ষণে বাড়ী ছাড়িয়াছিলাম জানিনা, সহরে উপস্থিত হইয়াই শুনিলাম, আমাদের সাহেব অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে মোম্বাসায় আসিয়াছেন। এত তাড়াতাড়ি আসিয়াছেন যে, মহিনা পর্য্যন্ত তাঁহার আসিবার কথা জানিত না। আমরা ঐ সংবাদ পাইয়াই সোজা সাহেবের তাঁবুতে গমন করিলাম। সাহেব আমাদের তিন জনেরই সহিত দেখা করিলেন। আমরা নিরাপদে আসিয়াছি বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। আমাদের উপর আদেশ হইল যে, আমরা যেন কল্য বেলা ১০টার সময় তাঁহার সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকি। এখন আমাদিগকে কোথায় যাইতে হইবে সেই বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক।

মোম্বাসার একটী হোটেল।

যখন হিন্দুস্থানে ছিলাম, তখন মনে করিতাম, জাহাজ হইতে নামিয়াই আমাকে ইউগণ্ডা যাইতে হইবে - ইউগণ্ডা কোনও দেশের নাম, রেল লাইন ঐ দেশের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে বা যাইবে। এখানে আসিয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে দেখিলাম, আমার এই ধারণা ভিত্তিহীন। আফ্রিকার পূর্ব্বকূলের প্রায় মাঝামাঝি এক ভূমিখণ্ড আছে, উহা মানচিত্রে British East Africa নামে প্রসিদ্ধ। ইহারই ঠিক দক্ষিণে German East Africa. British East Africa দক্ষিণ প্রান্তে 'মংসাই ভূমি'। এই দেশে মংসাই জাতি বাস করে বলিয়া উহা এই নাম পাইয়াছে। মোম্বাসা বন্দর এই দেশে অবস্থিত। এক নুতন রেল লাইন মোম্বাসা হইতে আরম্ভ হইয়া আফ্রিকার প্রসিদ্ধ হ্রদ Victoria Nyanza-র পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই হ্রদের পশ্চিম কিনারার নাম ইউগণ্ডা। প্রথমে প্রস্তাব হইয়াছিল যে, লাইন পরে ইউগণ্ডার মধ্য দিয়া চালিত হইবে, সেই জন্য ইহার নাম হইয়াছিল Mombasa Uganda Railway Line পরে কিন্তু এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়, এবং ঐ হ্রদের পূর্ব্ব প্রান্তে এই লাইন শেষ করা হয়। সেই জন্য হিন্দুস্থানে এই লাইন ইউগণ্ডা লাইন বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং সকলে মনে করিয়াছিল যে ঐ রেলে যাহারা চাকুরী করিবে, তাহাদিগকে ইউগণ্ডা যাইতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও ঐ স্থানে যাইতে হয় নাই। হয়ত অনেকে বলিবেন তাহা হইলে আমি এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের নাম—'ইউগণ্ডা প্রবাস' কেন দিলাম? ইহার জবাব এই যে ইউগণ্ডা নামটি এত প্রসিদ্ধ, এবং উহার সহিত এত প্রকার দুঃখের ও বিপদের স্মৃতি জড়িত আছে যে, ভুল হইলেও আমি ঐ নামের আকর্ষণ ভুলিতে পারি নাই।

আমরা যখন মোম্বাসা পঁহুছিলাম, তখন রেল লাইন ঐ বন্দর হইবে 'স্থাভো' নামক স্থান পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। স্থাভো হইতে উক্ত হ্রদের পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত নির্ম্মাণের ভার কর্ণেল প্যাটারসনের উপর পড়িয়াছে। আমি তাঁহার সর্দ্দার খানসামা, রতিকান্ত তাঁহার দপ্তরের ছোটবাবু, ও করিম খাঁ তাঁহার বাবুর্চ্চি নিযুক্ত হইয়াছিল। আমরা যে দিন আসিলাম, তাহার দুই মাস পূর্ব্বে সাহেব কাজের ভার লইয়াছেন। শুনিলাম, স্থাভো হইতে লাইন এক পাও আগে বাড়ে নাই। এই দুই মাস কাল সাহেব সুধু দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

পশ্চিম ময়মনসিংহের উপেক্ষিত প্রাচীন স্মৃতি।

ইতিহাসের সহিত আমার দ্বন্দ চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য মাষ্টার মহাশয়গণ তাঁহাদের হস্ত এবং বেতের যত প্রকার কুপ্রয়োগ সম্ভব সব শেষ করিয়া পরিশেষে সযত্ন উপদেশের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতৃদেবের সংগৃহিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের পত্র সমূহ শৈশবে আমার ঘুড়ি তৈয়ারির প্রধান উপকরণ ছিল। আমি সুযোগ পাইলেই লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া গোপনে উহা সংগ্রহ করিতাম। এই ভাবে অল্প দিনের মধ্যে তিন Valume Asiatic Researches. আমি প্রায় শেষ করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ একদিন হঠাৎ ছিন্ন পত্র সহ ধৃত হইয়া পিতৃদেবের নিকট এমন উপদেশ লাভ করিলাম যাহার ফলে ইতিহাসের উপর আমার দারুণ বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল। এহেন উপযুক্তের উপর পশ্চিম ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক বিবরণী সংগ্রহের ভারদিয়া শ্রদ্ধেয় কেদার বাবু কাজটা কিরূপ গুরুতর করিয়াছেন, আমি তাহারই পরিচয় আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। কেদার বাবু তাঁহার ময়মনসিংহের ইতিহাসে চীন পরিব্রাজক হিউএনৎ সঙ্গের বর্ণনা অনুসারে প্রথিতযশা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ এবং ঐতিহাসিক পরলোক গত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির সহিত ঐক্যমতে পশ্চিম ময়মনসিংহকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই অঞ্চলের ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত মঠ মন্দির ইষ্টকালয় প্রভৃতির ধ্বংশাবশেষ পুষ্করিণী পরীখা প্রভৃতির বাহুল্য ও জন প্রবাদ প্রভৃতির প্রাচুর্য্য দ্বারা ইহা যে প্রাচীনকালে কোনও একটী সমৃদ্ধ হিন্দুজনপদের অংশছিল সে বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনা উৎপন্ন হইয়া এ অঞ্চলের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি বিলোপ করিয়াছে। দূরত্ব হেতু যমুনার আক্রমন হইতে আত্ম রক্ষা করিয়া, অতীত গৌরবের স্মৃতি মণ্ডিত যে সমস্ত প্রাচীন অট্টালিকা মঠ মন্দির রৌদ্র বৃষ্টি-বাত্যা-ভূমিকম্প প্রভৃতি হইতে আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল দেশবাসীগণের উপেক্ষায় এবং অযত্নে তাহার অধিকাংশ ভগ্নস্তুপে পরিণত এবং বিলুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের শ্রীযুত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বঙ্গের পাট বিক্রয়ের আয় বার্ষিক ২০ কোটী টাকার অধিকাংশের গুরুতর দায়িত্ব ময়মনসিংহবাসীদের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। একথা সত্য হউক বা না হউক কিন্তু পাটের চাষে ময়মনসিংহ পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন জেলা অপেক্ষাই পশ্চাৎপদ নহে। পাটের চাষে একদিকে যেমন দেশের সমৃদ্ধি বাড়িতেছে তেমনি জমির প্রয়োজন বৃদ্ধি হওয়ায় অর্থলোলুপ জনসাধারণের ক্ষুধিত দৃষ্টি দেশের যত জীর্ণ ভগ্ন ইষ্টকালয় পরিবৃত প্রাচীন কীর্ত্তি ক্ষেত্র সমূহের উপর নিপতিত হইতেছে। ফলে জমিদারদিগের তহবিল পরিপুষ্ট হইতেছে এবং দেশের শ্রেষ্ট সম্পদ সমূহ বিলুপ্ত হইতেছে। যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় কতিপয় বৎসরের মধ্যেই পশ্চিম ময়মনসিংহ প্রাচীন চিহ্নবর্জ্জিত হইবে।

পশ্চিম ময়মনসিংহের প্রাচীন গ্রাম-বৃদ্ধগণ অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বহুকাল হইতে প্রচলিত জনপ্রবাদ অনেক পুরাতত্ত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। উহার মধ্যে অনেক গুলির স্থান পর্য্যন্ত নির্ণয় করাও এখন অসম্ভব হইয়াছে। এই সকলের মধ্য হইতে মধুপুর, ফলদা, রাজগোলাবাড়ী, নলুয়া, নরিল্লা, ধনবাড়ী ও দুর্গাপুরের কয়েকটী প্রাচীন কীর্ত্তির বিবরণী উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিলাম।

ফলদার রাজবাড়ী।

যোড়শ শতাব্দীতে রাজা যশোধর (কেহ কেহ ইহাকে যশোবন্ত বলেন) নামক ক্ষত্রিয় রাজা এইস্থানে বাস করিতেন। ইনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুছিলেন। ইঁহার রাজধানী অতি বিস্তৃতছিল। বহু সংখ্যক দেবমন্দির এই স্থানের শোভা বর্দ্ধন করিত। ইনি সর্ব্বদাই যাগযজ্ঞাদিতে ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহার বাড়ীর ধ্বংশাবশেষ ক্ষেত্রে ৬। ৭ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সুন্দর ইষ্টক গ্রথিত যজ্ঞকুণ্ড পরিদৃষ্ট হইত; পাটের অনুগ্রহে এখন সে সকল কিছুই নাই। এখন কয়েকটী পুষ্করিণী ও একটী সুবৃহৎ গাছ তাহার বাড়ীর স্মৃতি বহন করিতেছে। বাড়ীর অবশিষ্ট অংশের ইষ্টকাদি অপসারিত করিয়া তাহাতে পানের বরজ ও পাটের ক্ষেত করা হইয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষ ক্ষেত্রে একটী বিস্তৃত পুকুর আছে উহা কোশা পুষ্করিণী নামে পরিচিত। জনপ্রবাদ—রাজা যশোধর সপরিবারে এই পুকুরে ডুবিয়া মরিয়াছিলেন। এই রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন পশ্চিমদিকে প্রায় ৩ মাইল দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। ঐ সকল স্থানে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী পরিখা বাঁধাঘাট প্রভৃতি আজও রাজার স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই রাজবাড়ীর অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে সোণাআটা নামকস্থানে রাজবাড়ী সংস্পৃষ্ট গোলা-গঞ্জ ও দোকান পাট ছিল। পূর্ব্বদিকে তেরল্লা বিলে ও ঝিনাই নদীতে দুইটী বাঁধাঘাট আছে; উহা রাজবাড়ীর ঘাট নামে পরিচিত রাজবাড়ী হইতে একটী সড়ক রাজ গোলাবাড়ী ও যোগীর ঘোপার মধ্যদিয়া আট মাইল দূরবর্ত্তী রাজা ধনপতির বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার অধিকাংশ এখন বিনষ্ট হইয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তবে মধ্যে ২ এখনও সামান্য সামান্য অংশ বিদ্যমান আছে।

৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মুক্তি।

(১)

ভ্লেডিমার সহরে এক বণিক যুবক বাস করিত। নাম তার আইভান আক্‌সেনব। সহরে তাহার দুইটী দোকান ও একখানা বাড়ী ছিল। আক্‌সেনব্ অতি সুপুরুষ, আর মনটী ও তার বেশ সরল। সদাই সে প্রফুল্ল। সঙ্গীতে তাহার সমকক্ষ সহরে আর কেহ ছিল না। অল্প বয়সেই আক্‌সেনবের পানাভ্যাস জন্মিয়া ছিল। আর মদ খাইলেই সে একটা ঝগড়া বাধাইয়া বাড়ীতে ফিরিত। বিবাহের পর তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল। সে মদ খাওয়া একরকম ছাড়িয়া দিল কদাচিৎ এক আধদিন খাইত।

সে বছর আক্‌সেনব্ নিজনির মেলায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। স্ত্রীর নিকট যখন বিদায় লইতে গেল তখন পত্নী কিছুতেই স্বামীকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না।

স্ত্রী কহিল—"আইভান্ তুমি যেওনা, যেওনা, আমি তোমায় মিনতি ক'রে বলি তুমি যেওনা, তোমার সম্বন্ধে আমি বড়ই একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।"

আক্‌সেনব পত্নীর কথায় হাসিয়া কহিল "এখন ও তুমি ভয় কর আমি মেলায় গিয়ে ঝগড়া বিবাদ করব!"

স্ত্রী—"আমি জানি না কেন আমার ভয় হচ্ছে কিন্তু আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তা বড়ই ভয়ানক। স্বপ্নে দেখেছি তুমি সহর হতে ফিরে এসে মাথার টুপিটা খুলেছ। আমি তখন যেন দেখলাম তোমার চুলগুলি সব সাদা হয়ে গেছে।"

আক্‌সেনব্ পত্নীর স্বপ্নের কথা শুনিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"ও কিছু নয়। তুমি জান আমার কারবারের জন্য আমাকে প্রায়ই এদিক সেদিক যেতে হয়। তোমার কোন চিন্তা নাই।"

এই বলিয়া সে বিদায় হইল। গন্তব্য স্থানের অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিলে আক্‌সেনবের সহিত এক পরিচিত বণিকের সাক্ষাৎ হইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। রাত্রির জন্য উভয়ে এক হোটেলে আশ্রয় লইল, একত্র চা পান করিল এবং আহারান্তে পরস্পর সংলগ্ন কোঠায় নিদ্রা গেল। আক্‌সেনবের অধিক কাল নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস ছিল না। প্রাতঃকালে পথ চলার সুবিধা মনে করিয়া সে খুব ভোরে উঠিল এবং গাড়োয়ানকে তুলিয়া ঘোড়া জুড়িবার জন্য আদেশ করিল। গাড়ী তৈয়ার করিবার অবকাশে সে হোটেলওয়ালার পাওনা চুকাইয়া দিয়া আসিল।

(২)

চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আক্‌সেনব্ আবার আহারের জন্য এক হোটেলে প্রবেশ করিল। কিছুকাল বিশ্রামের পর সে চা'র পাত্রটী আনিতে আদেশ করিয়া বারেন্দায় গেল এবং নিশ্চিন্ত মনে আপন সেতারটী বাজাইতে আরম্ভ করিল। ঠিক সেই সময়ে এক ঘোড়ার গাড়ী দ্রুতবেগে আসিয়া হোটেলের দ্বারে থামিল। একজন রাজ কর্ম্মচারী ও দুই জন সৈনিক পুরুষ উহা হইতে অবতরণ করিল। আগন্তুকগণ নামিয়াই সোজাসোজি আক্‌সেনবের নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে নাম ধাম ইত্যাদি বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আক্‌সেনব তাহার নিজ সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া কহিয়া রাজকর্ম্মচারীকে কহিল—"আপনি কি আমার সহিত চা খাবেন?

কিন্তু কর্ম্মচারী এই কথার কোন জবাব না দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কাল রাত্রে তুমি কোথায় ঘুমাইয়া ছিলে? তুমি একা ছিলে না আরও কোন বণিক তোমার সঙ্গে ছিল? সেই বণিকের সহিত কি ভোরে তোমার আবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল? তুমি এত সকালেই বা চলিয়া আসিলে কেন?"

আক্‌সেনব এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। সে সকল কথার যথার্থ উত্তর দিয়া একটু ক্রুদ্ধ স্বরে রাজ কর্ম্মচারীকে কহিল—"আপনি আমাকে এত সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আমি কি চোর, না ডাকাত, না কোন বদমাইস। আমি আমার কাজে যাচ্ছি। আপনি কেন আমাকে মিছি মিছি এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন?"

রাজকর্ম্মচারী তখন সৈনিক দ্বয়কে ডাকিলেন এবং আক্‌সেনবকে কহিলেন—"আমি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট্, তোমাকে এত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার কারণ, গত রাত্রে যে বণিকের সহিত তুমি একত্র হোটেলে ছিলে, সেই বণিককে কে খুন করেছে। তোমার জিনিষ পত্র আমাকে খুলে দেখাও।" সহচরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তোমরা এর খানা তালাস কর।"

পুলিসেরা হোটেল হইতে আক্‌সেনেবের ট্রাঙ্ক এবং ব্যাগ আনিয়া জিনিস পত্র খুলিল। সহসা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ভিতর হইতে একটা রক্ত মখা ছুরী বাহির করিলেন এবং গর্জ্জিয়া কহিলেন "ইহা কি তোমার?"

আক্‌সেনব ফিরিয়া দেখিল উহারা তাহার ব্যাগ হইতে একটা রক্তাক্ত ছুরী বাহির করিয়াছে। তখন সে খুব ভীত হইল।

"এই ছুরীতে রক্ত কেন?"

আক্‌সেনব উত্তর দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। "আমি—আমি -কিছু জানি-না। আমি—আমি—ছুরী—ছুরী—আমার না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ কহিলেন—আজ প্রাতে বণিকের লাস আমরা বিছানায় পাইয়াছি। তুমি ছাড়া এ কাজ আর কে করিবে? হোটেলে অন্য লোক ছিল না। ঘর ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। তোমার ব্যাগের মধ্যে রক্ত মাখা ছুরীও পাওয়া গেল। বিষয় কি আর বুঝতে বাকী আছে? এখন খুলে বল কিরূপে তাহাকে খুন করিলে, আর কত টাকাইবা পাইলে।

আক্‌সেনব ভগবানের নামে শপথ করিয়া কহিল এ দুষ্কার্য্য কখনও সে করে নাই, রাত্রিতে চা খাওয়ার পর সেই বণিকের সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহার সঙ্গে যে এক হাজার রুবল্ আছে এই মুদ্রা তাহার নিজের। ঐ ছুরীও তাহার নয়। আক্‌সেনব ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কথা বলিবার আর শক্তি রহিল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ আক্‌সেনবকে বাঁধিয়া গাড়ীতে তুলিবার জন্য সৈন্য দ্বয়কে হুকুম দিলেন। উহারা আক্‌সেনেবকে হাতে পায় উত্তমরূপে বাঁধিয়া গাড়ীতে তুলিল। বেচারী মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। আর তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিল। আক্‌সেনবের অর্থাদি ও জিনিষ পত্র সকলই রাজকর্ম্মচারী বুঝিয়া লইলেন এবং তাহাকে নিকটবর্ত্তী সহরের কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

রাজকর্ম্মচারিগণ আক্‌সনবের স্বভাব চরিত্রাদি সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য তাহার বাসস্থান ভ্লেডিমার সহরে লোক পাঠাইলেন। তথাকার সকল বণিক ও অধিবাসিগণ সাক্ষ্য দিল আক্‌সেনব বাল্যাবধি মদ্যাসক্ত ও অলসতা-প্রিয় কিন্তু এই দুই দোষ বাদ দিলে সে অতি ভাল মানুষ।

(৩)

আসামীর বিচার হইল। বিচারকগণ স্থির করিলেন আক্‌সেনবই হোটেলে বণিককে খুন করিয়া তাহার কুড়ি হাজার রুবল্ আত্মসাৎ করিয়াছে।

আক্‌সেনবের স্ত্রী এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া শোকে আত্মহারা হইল। কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাহার সন্তানগুলি সকলই শিশু। একটী তখনও স্তন্য পান করে। অনন্যোপায় হইয়া সে শিশু সন্তানগুলিকে সঙ্গে লইয়াই যে সহরে স্বামী কারারুদ্ধ হইয়াছে তথায় গমন করিল।

পুলিশ প্রহরীরা কিছুতেই তাহাকে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতে সম্মত হইল না। কিন্তু তাহার কাতর ক্রন্দন ও মিনতি শুনিয়া এবং হতভাগ্য সন্তানগুলিকে দেখিয়া তাহাদের কঠিন হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। প্রহরীরা শোকাকুলা রমণীকে তাহার স্বামীর নিকট লইয়া গেল। পত্নী দুর্ব্বৃত্তদের সহিত কয়েদীর সাজে শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বামীকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর তাহার চৈতন্য আসিল। তখন সে শিশু সন্তানগুলিকে নিয়া স্বামীকে ঘেরিয়া বসিল এবং তাহার অচিন্তনীয় বিপদের আদ্যন্ত সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আক্‌সেনব সকল কথা পত্নীকে খুলিয়া বলিল। পত্নী কহিল—"এখন কি করা উচিত?" স্বামী—"আমরা স্বয়ং "জারের" নিকট আপিল

করিব। তিনি নিশ্চয়ই নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে মুক্তি দিবেন।"

পত্নী—"আমি "জারের" নিকট এক আবেদন করিয়াছি। কিন্তু জানিলাম ঐ আবেদন তাঁহার হাতে পৌঁছে নাই।" আক্‌সেনব্ কিছুই কহিল না; সে মাথা হেট্ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার স্ত্রী কহিল—"এখন দেখ আমার স্বপ্ন সত্য হল কিনা। তুমি ত আগে বিশ্বাস কর নি। এর মধ্যেই শোকে তোমার মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে।" এই বলিয়া স্ত্রী স্বামীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদুস্বরে কহিল—"আইভান্, প্রিয়তম, আমার নিকট খুলিয়া বল, সত্যই কি তুমি এ কাজ কর নাই?"

"কি! তুমি ও আমাকে অবিশ্বাস করছ?" আক্‌সেনব তখন জোড়করে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সেই সময়ে একজন প্রহরী উপস্থিত হইয়া আগন্তুক দিগকে সত্বরে প্রস্থান করিতে আদেশ করিল।

আক্‌সেনব সজলনয়নে আপনার প্রিয়তমা পত্নী ও প্রাণাধিক সন্তানের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

(৪)

আক্‌সেনবের স্ত্রী চলিয়া গেলে সে মনে মনে নিজ অবস্থার কথা ভাবিতে লাগল। তাহার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় বিপদের কাল মেঘে ভরিয়া উঠিল। একটী কথা বারবার তাহার মনে জাগিতে লাগিল। সে ভাবিল 'হায়! হায়! আমার স্ত্রী ও আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিল না! সেও জিজ্ঞাসা করিল আমি সত্যই কি বণিককে বধ করেছি কি না! এখন বুঝলাম এক ভগবান্ ছাড়া প্রকৃত কথা কি জানবার আর কাহারও সাধ্য নাই। তাঁহার নিকটই এখন প্রার্থনা করব, তাঁহার নিকটই দয়া ভিক্ষা করব।"

আক্‌সেনব্ আর দরখাস্ত করিল না; মানুষের কৃপায় তাহার মুক্তি হইবে সেই আশা চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিল। ঈশ্বরের নিকট সে কেবল প্রার্থনা করিতে লাগিল।

বিচারকেরা আকসেনবকে বেত্রাঘাত ও কঠোর পরিশ্রমের সহিত চির নির্ব্বাসনের দণ্ড প্রদান করিলেন। বেত্রাঘাতে তাহার শরীরের অনেক স্থান কাটিয়া গেল। যখন তাহার শরীরের ক্ষত শুকাইল তখন গুরু অপরাধে দণ্ডিত অন্যান্য কয়েদীর সহিত সেও সুদূর সাইবিরিয়া প্রদেশে প্রেরিত হইল।

সাইবেরিয়ার কঠোর কারাগারে আকসেনব সুদীর্ঘ একুশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিল। তাহার মাথার চুলগুলি সব পাকিয়া বরফের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। দাঁড়ি বক্ষ অতিক্রম করিয়াছে। শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ও ক্ষীণ। সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। তাহার মুখ সর্ব্বদা বিষাদ মলিন। একুশ বছরের মধ্যে সে কখনও হাস্য করে নাই। আর অন্যের সহিত সচরাচর আলাপও করে নাই। কিন্তু ঈশ্বরের নাম নিতে তাহার কখনও ভুল হয় না।

কারাগারে আকসেনব জুতা সেলাইর কাজ অভ্যাস করিয়াছিল। ঐ কাজে তাহার যা কিছু সঞ্চয় হইত তাহা দ্বারা সাধুপুরুষের জীবনচরিত কিনিয়া কারাগারে যতক্ষণ বাতি জ্বলিত ততক্ষণ সে পাঠ করিত। পর্ব্ব উপলক্ষে সে গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করিত ও বাইবেল পাঠ করিত এবং 'কোরাসে" যোগ দিয়া ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তণ করিত। এই বয়সেও তাহার কণ্ঠস্বর সুমধুর ছিল। জেলের কর্ম্মচারিগণ আক্‌সেনবকে তাহার নম্রতার জন্য ভালবাসিতেন। অপর কয়েদীরা তাহাকে শ্রদ্ধা করিত এবং সাধু আইবান বলিয়া ডাকিত। জেলে যে সকল কয়েদী অনুগ্রহের জন্য কোন দরখাস্ত করিত সুপারিশ করিবার জন্য তাহারা গবর্ণরের নিকট আক্‌সেনবকে পাঠাইত। কয়েদীদিগের মধ্যে কোন বিবাদ মিটাইতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষও আক্‌সেনবকে সালিশ মানিতেন।

একুশ বৎসরের মধ্যে আক্‌সেনবের বাড়ী হইতে কোন সংবাদ তাহার নিকট আসে নাই। সুতরাং তাহার স্ত্রী ও সন্তানাদি জীবিত কি মৃত তাহাও সে জানিত না।

(৫)

একদিন এক নূতন কয়েদীর দল সাইবেরিয়ার কারা

গারে আনীত হইল। সন্ধ্যাকালে পুরাতন কয়েদীরা তাহাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং ইহারা কে কোন্ গ্রাম বা সহর হইতে আসিয়াছে কে কি অপরাধ করিয়াছে ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আক্সেনেব নিকটেই একখানি বেঞ্চে মাথা হেট করিয়া বসিয়াছিল। সে সব কথাই নীরবে শুনিতেছিল।

নবাগত কয়েদীদিগের মধ্যে একটী বেশ লম্বা, সুস্থ ও সবল দেহ; দাড়ি পাকা। বয়স তাহার প্রায় ষাট বছর হইবে। কিরূপে ধৃত হইয়া সে দণ্ড পাইয়াছে সংক্ষেপে তাহার কাহিনী সে এইরূপ বিবৃত করিল:—

আমি যে একবারে বিনা অপরাধে ধরা পড়িয়াছি তা' নয়, আমার কিছু দোষ আছে। আমি একটী ভাড়াটে গাড়ী হইতে ঘোড়া খুলিয়া নিবার সময় ধৃত হইয়াছিলাম। পুলিসের লোক বলিল 'তুমি ঘোড়া চুরি করিয়াছ।' আমি কহিলাম তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য ঘোড়া দুইটী খুলিয়া লইয়াছিলাম—আমি ঘোড়া ছাড়িয়া দিতেছি। বিশেষতঃ গাড়োয়ান আমার একজন বন্ধু। আমি সত্য কথা কহিলাম কিন্তু ওরা বিশ্বাস করিল না। যদি পুলিসের লোক প্রকৃত ঘটনা কি বাহির করতে পারত তবে বহুদিন পূর্ব্বেই আমাকে এখানে পাঠাত। এখন আমাকে অকারণ শাস্তি দিয়েছে। যাই হো'ক শেষটায় সাইবেরিয়ায়ই আসতে হল, আপদ চুকল।

একজন কয়েদী জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথা হতে আসছ?"

আমরা ভ্লেডিমির সহর হইতে আসিয়াছি। আমি সেই সহরেরই অধিবাসী। আমার নাম "মাকার" লোকে আমাকে "সেমেনর" বলিয়া ডাকে।

ভ্লেডিমির সহরের নাম শুনিয়া আক্সেনব সহসা চমকিয়া উঠিল। সে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সেমেনর তুমি ভ্লেডমির সহরের আক্সেনব বণিকের নাম শুনেছ? আসকেনবের পরিবারের সকলই কি জীবিত আছে?"

"অবশ্যই শুনেছি। ওরা খুব ধনী বণিক। ওদের পিতা সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত হয়েছে। আমাদের মত পাপীর অভাব নাই। আচ্ছা, বাবা তুমি কেন এখানে এসেছিলে?"

আক্সেনব নিজ দুর্ভাগ্যের কথা বলিতে ইচ্ছা করিল না। সে একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আমার পাপের জন্যই ছাব্বিশ বৎসর যাবৎ এখানে কঠোর পরিশ্রম করছি।"

কি অপরাধ শুনতে পারি কি?

"যে অপরাধের জন্য নির্ব্বাসনই আমার উপযুক্ত শাস্তি।" আক্সেনব আর কিছু কহিল না। কিন্তু অন্য কয়েদীরা আক্সেনবের নির্ব্বাসনের কারণ বিবৃত করিল। তাহারা কহিল—কোন দুষ্ট লোকে এক বণিককে হত্যা করিয়া তাহার রক্তমাখা ছুরীখানা আক্সেনবের ব্যাগে লুকাইয়া রাখে। তাই হত্যার অপরাধে নির্দ্দোষ আক্সেনব এই কঠোর দণ্ডভোগ করছে।

'মাকার' আক্সেনবের কাহিনী শুনিয়া চমকিয়া উঠিল এবং বিস্মিত হইয়া আক্সেনবের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল—"আশ্চর্য্য, ভারী আশ্চর্য্য! কঠোর দণ্ডে তুমি একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েছ!"

আর কয়েদীরা মাকারকে জিজ্ঞাসা করিল—"আক্সেনবকে তুমি কোথাও আগে দেখেছ? আর এরূপ বিস্ময় প্রকাশ করবারই বা কারণ কি?"

মাকার কোন উত্তর না দিয়া কহিল—"এইভাবে সাক্ষাৎ হওয়া বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

মাকারের কথা শুনিয়া আক্সেনবের মনেও একটু চিন্তা হইল—"তবে কি বণিককে কে খুন করেছে, এই ব্যক্তি জানে?" সে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি এই ঘটনার কথা আগে শুনেছ সমেনর্? আমাকে কি পূর্ব্বে কোথাও দেখেছ?" মাকার সমেনর কহিল—শুনি নাই, এ কথা কিরূপে বলি? সংসারে কত কথাই প্রতিদিন বাহির হয়। কিন্তু সে অনেক দিনের ঘটনা। কোথায় এ কথা শুনছি এখন সব ভুলে গেছি।"

"তা' হলে ঐ বণিককে কে হত্যা করেছে অবশ্যই তুমি শুনেছ।"

মাকার সমেনর একটু হাসিয়া কহিল—'আমার মনে হয় ইহা অনুমান করা অতি সহজ। যাহার ব্যাগে ছুরী পাওয়া গিয়েছে সেই হত্যা করেছে। আর যদি কেহ

ছুরী তোমার ব্যাগে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে প্রবাদেই আছে—"যে ধরা পরে নাই সে চোর নয়।" আর এক কথা তোমার ব্যাগে অন্যে ছুরী রাখবে কিরূপে? ব্যাগ নিশ্চয়ই তোমার মাথার কাছে ছিল। ছুরী রাখবার সময় তুমি অবশ্যই টের পেতে।"

মাকারের কথা শুনিয়া আক্‌সেনবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল এই ব্যক্তিই বণিককে হত্যা করিয়াছে। সে তখনই উঠিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সে রাত্রে আকসেনবের নিদ্রা হইল না। কত অসার কল্পনা তাহার মনে জাগিতে লাগিল। সে দেখিল তাহার প্রিয়তমা পত্নী যেন তাহার কাছে বসিয়া সুমধুর কণ্ঠে আলাপ করিতেছে—তাহার সুনীল উজ্জ্বল নয়ন যুগল হাসিমাখা মুখখানি হতভাগ্য আক্‌সেনবের মনে পড়িল। তারপর সে দেখিল তাহার সন্তানেরা যেন আবদার করিয়া পিতার কাছে আসিল। আক্‌সেনবের নিকট তাহারা আজও পূর্ব্বের ন্যায় শিশুই রহিয়াছে। ধীরে ধীরে প্রথম যৌবনের সুখময় স্মৃতিও তাহার মনে পড়িল। সে কতই না আমোদপ্রিয় ছিল। বিষাদ কি সে জানিত না। মনে পড়িল হোটেলের বারান্দায় আক্‌সেনব কেমন নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত সেতার বাজাইতেছিল। অকস্মাৎ সে সময়ে তাহার মাথায় বজ্রপাত হইল। পুলিসের লোক তাহাকে ধরিয়া জেলে পুরিল! চাবুক দিয়া শরীর ক্ষত বিক্ষত করিল। আর কত সে কাতর ভাবে আর্ত্তনাদ করিয়াছে। মনে পড়িল অপর কয়েদীদের কথা, শৃঙ্খলের কথা আর ছাব্বিশ বৎসরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কথা। তখন নিদারুণ অবসাদ, তীব্র যাতনা তাহার হৃদয় দলিয়া মথিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল। এই দুঃসহ ক্লেশ ত কেবলি এই পাপিষ্ঠের জন্যই ভোগ করিতে হইয়াছে।

সেমেনবের বিরুদ্ধে এমন বিজাতীয় বিদ্বেষ আক্‌সেনবের প্রাণে স্থান পাইল যে সে প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যাকুল হইল। প্রাণ যায় তাতেও খেদ নাই তবু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতেই হইবে। সারা রাত্রি আক্‌সেনব ভগবান্‌কে ব্যাকুল হইয়া ডাকিল তবু প্রাণে শান্তি আসিল না। দিনের বেলায় সে ইচ্ছা করিয়া মাকার সেমেনব হইতে দূরে দূরে রহিল। সেমেনব যাহাতে তাহার চোকেও না পড়ে তজ্জন্য সে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিল।

(৬)

এইরূপে তিন সপ্তাহ অতীত হইল। আক্‌সেনবের রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। গভীর ক্ষোভে দুঃখে ও বিষাদে সে অভিভূত হইয়া পড়িল। কিরূপে আত্মসংযম করিবে কিছুই সে বুঝিতে পারিতেছিল না। যখন তাহার মনের এইরূপ বিক্ষিপ্ত অবস্থা তখন একদিন রাত্রে পায়চারি করিতে করিতে দেখিতে পাইল একটা কাঠের তক্ত-পোষের পিছনে কে কারাগৃহের ভিত্তি খুঁড়িয়া মাটি তুলিয়াছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময়ে মাকার সমেনব তাহার বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিল এবং ক্রুদ্ধ হইয়া আক্‌সেনবের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিল। আক্‌সেনব তথা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, যেন সে মাকারকে লক্ষ্যই করে নাই। কিন্তু মাকার তাহার হাত ধরিল এবং সংক্ষেপে কহিল সে দেওয়ালের নিকট গর্ত্ত করিয়া সুড়ঙ্গ করিতেছে; প্রত্যহ সে বুটের ভিতর মাটি পুরিয়া বাহিরের রাস্তার কাছে ছড়াইয়া দিয়া আইসে। তারপর সে আকসেনবকে সাবধান করিয়া দিয়া কহিল—"দেখ, বুড়ো, এ কথা মুখ দিয়ে বের করো না। আমি তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়া যাবো। আর যদি ঘূণাক্ষরেও এ বিষয় প্রকাশ পায় তবে আর তোমার রক্ষা নাই। আমি তোমাকে একবারে খুন করব।" আক্‌সেনব তাহার শত্রুর দিকে ফিরিয়া চাহিল। রাগে তাহার শরীর কাঁপিতে ছিল। সে ক্রোধ ব্যঞ্জক স্বরে কহিল "তুমি আমাকে কিছুতেই জেলের বাহিরে নিতে পারবে না। তুমি আমাকে খুন করবে বলে বৃথা ভয় দেখাচ্ছ। অনেক দিন হয় তুমি আমাকে খুন করেছ। আর কি করবার তোমার ক্ষমতা আছে। তোমার এ কুকার্য্যের কথা প্রকাশ করা না করা সম্পূর্ণ ভগবানের ইচ্ছাধীন।"

পর দিবস প্রহরীরা যখন কয়েদীদিগকে কাজের জন্য বাহিরে লইয়া গেল তখন তাহারা দেখিল মাকার মাটি

ছড়াইয়া ফেলিতেছে। কারাগৃহে পরীক্ষা আরম্ভ হইল। অনুসন্ধানে একটা গর্ত্ত বাহির হইল। গভর্ণরের নিকট তৎক্ষণাৎ সংবাদ গেল। কে এই গর্ত্ত করিয়াছে তিনি আসিয়া একে একে সকলকে একথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সকলেই অস্বীকার করিল। যাহারা জানিত তাহারাও গোপন করিল। কারণ অপরাধী মাকারের উপর যে কিরূপ গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা হইবে তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। গবর্ণর জানিতেন আক্‌সেনব একজন সত্যবাদী লোক। তিনি সর্ব্বশেষে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—"আক্‌সেনব, তুমি প্রাচীন, তুমি সত্যবাদী, ভগবানের নামে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, বল, কে একাজ করেছে ”

মাকার সমেনব্ তথায় দাঁড়াইয়াছিল। সে নিশ্চিন্ত, যেন কিছুই জানে না। কিন্তু আক্‌সেনবের সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে ছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। সে মনে ভাবিতেছিল— "সমেনবের অপরাধের কথা গোপন করিব ? সমেনব্, যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে ! এ সুখময় জীবন সে যে চিরবিষাদময় করেছে। তাহার অপরাধের কথা গোপন করব ? আজ তাহার পাপের শাস্তি হউক। সব কথা খুলে বলব। যদি বলি, তবে এখনই গবর্ণর তাহাকে চাবুক্ লাগাইয়া আধ মরা করবে ! কি করব ? অকারণ এই দুষ্টের প্রতি দয়া প্রকাশ করব ! হাঁ, ওকে ক্ষমাই করব। আমার মনে তবু একটু শান্তি পাব।"

গবর্ণর তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বুড়ো, সত্য কথা বল, কে মাটি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করেছে !" আক্‌সেনব্ মাকার সমেনবের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল। তারপর কহিল—"হুজুর ! আমি বলতে পারব না। ভগবান্ আমাকে বলতে আদেশ করেন নাই। আমি বলব না। আমাকে যে শাস্তি ইচ্ছা সেই শাস্তি দিন্।

গবর্ণর অনেক ভয় দেখাইলেন কিন্তু আক্‌সেনব্ কিছুই কহিল না। প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িল না।

(৭)

পরদিবস আক্‌সেনব্ যখন বিছানায় শুইয়া অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় অতীত জীবনের কথা ভাবিতেছিল তখন সে শুনিতে পাইল কে যেন ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পদতলে বসিয়াছে। আক্‌সেনব চাহিয়া দেখিল—মাকার। সে কহিল—"মাকার, আর কি করতে চাও ? কেন এখানে এসেছ ?"

মাকার সমেনব্ নীরব। "তোমার এখানে কি কাজ ? শীঘ্র এখান হতে যাও। নতুবা আমি পাহাড়াওলাকে ডাকব।"

মাকার আকসেনবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিল— "আইভান্, আমাকে ক্ষমা কর।"

আকসেনব—"কি জন্য ক্ষমা করব।"

মাকার—আমিই সেই বণিককে হত্যা কর তোমার ব্যাগে ছুরী রেখেছিলাম। আমি তখন তোমাকেও খুন করতাম কেবল লোক জেগে পড়ায় পারলাম না। তাই ছুরীখানা তোমার ব্যাগে রেখে জানালা দিয়ে প্রস্থান করলাম।"

আক্‌সেনব নীরব। কি বলিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিলনা।

মাকার আকসেনবের পায় জড়াইয়া ধরিয়া কহিল "আইবান্, আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ঈশ্বরের দোহাই ক্ষমা কর। বণিককে আমিই হত্যা করেছি স্বীকার করব। তাহলেই তুমি মুক্তি পাবে। তুমি আবার বাড়ী যেতে পারবে।"

আক—"মাকার তোমার পক্ষে বলা সহজ। কিন্তু আমার বুকভরা কত দুঃখ তুমি কি বুঝবে ? আমি কোথায় যাব ? আমার স্ত্রী আর এজগতে নাই, আমার সন্তানেরা আমাকে ভুলে গেছে। আমার কোথায় আর স্থান আছে মাকার ?"

মাকার আকসেনবের চরণতলে মাথা রাখিয়া কহিল "আইভান আমাকে ক্ষমা কর। আমিই তোমার জীবন দুখময় করেছি, তোমার পরিবারে অশান্তি ঘটায়েছি তবু কাল তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেছ। আইভান এই পাপিষ্ঠকে ক্ষমা কর, ঈশ্বরের দোহাই

ক্ষমা কর।" মাকার এই কথা বলিয়া মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আকসনব্ আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারও দুই চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সে কহিল—"মাকার! ভগবান্ তোমাকে ক্ষমা করুন। কে জানে; হয়ত আমি তোমার চেয়ে শতগুণে অধিক পাপী।"

তখন আক্সেনব্ প্রাণে বিপুল আনন্দ অনুভব করিল। যেন তাহার চিত্তের সকল অবসাদ, সকল যাতনা মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বাড়ী যাওয়ার জন্য তাহার আর ব্যাকুলতা নাই, কারাগৃহ পরিত্যাগ করিবারও তাহার প্রবৃত্তি নাই। সে তাহার আত্মার চির মুক্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মাকার আক্সেনবেরই কথা শুনিল না। সে গবর্ণরের নিকট গিয়া আত্মদোষ স্বীকার করিল। গবর্ণর আক্সেনবের মুক্তির আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু তখন আক্সেনবের পবিত্র আত্মা দেহ-কারাগার হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া শান্তি নিকেতনে প্রস্থান করিয়াছে।*

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

সংখ্যা লিখন পদ্ধতি।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর জগতের পণ্ডিত মণ্ডলী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে সংখ্যাবাচক লিপি সমূহ যাহাদিগকে আরবীয় বলা হইয়া থাকে তাহা সর্ব্ব প্রথম হিন্দুগণের দ্বারা আবিস্কৃত। ভারতবর্ষ হইতে আরবে সংখ্যা লিখন পদ্ধতি প্রচলিত হয়। আরব্য, পারশীয় এবং অন্যান্য প্রাচ্যজাতি সমূহের সংখ্যা রেখা ভারতবর্ষীয়দিগেরই অনুরূপ। প্রতীচি হইতে যে সমস্ত পর্য্যটক প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিয়াছিলেন তাহাদিগের দ্বারা এই লিখন রীতি পশ্চিম জগতে প্রবর্ত্তিত হয়। মিঃ অ্যাসল্ বলেন, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপে পঞ্জিকা এবং কোষ্ঠি ঠিকুজি ব্যতীত অন্য কোন দলিল পত্রে প্রাচ্য সংখ্যা রেখা সমূহের ব্যবহার ছিল না। স্পেনীয়গণ মুরদিগের নিকট ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে স্পেনরাজ দশম আলফোন্সাসের আজ্ঞানুসারে তদীয় কোষ্ঠীপত্র জনৈক ইহুদী ও আরব্য কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছিল। এই নজীর দেখাইয়া স্পেনীয়গণ বলেন, আরব্যগণই এই সংখ্যা লিখন রীতির আবিস্কর্ত্তা।

চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে জর্ম্মাণ দেশে ইহার প্রচলন হইয়াছিল না। দশমিকাঙ্ক লিখন ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তদ্দেশে চিরস্থায়ীরূপে প্রচলিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রুষরাজ পিটার তাঁহার পর্য্যটন শেষ করিয়া রুষিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহার পর হইতে তদ্দেশে প্রাচ্য সংখ্যা লিখন রীতির পূর্ণ প্রচলন হয়।

হিন্দুগণের পুরাকালে অঙ্ক এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে কি সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল তাঁহাদিগের এই সংখ্যা লিপির আবিস্করণে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার প্রচলন হইতে জগতে অঙ্ক শাস্ত্রের উন্নতির পথ পরিস্কৃত হইয়াছে। বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা লিখন বহুবিধরূপে অসুবিধা জনক ছিল।

প্রাচ্য দেশ হইতে এই সংখ্যা লিখন ইউরোপে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে তদ্দেশবাসীগণ বর্ণমালা অথবা রোমীয় সংখ্যালিপি হইতে ইহার অভাব পূরণ করিতেন। কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত মিলিয়া একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে রোমীয় সংখ্যা রেখা আবিস্কারের মূল নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে কতকগুলি অপূর্ব্ব তত্ত্বের সমাবেশ আছে। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বে মানব অঙ্গুলীর সাহায্যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিত; কিন্তু কালক্রমে যখন ইহাতে তাহার অভাব পূরণ হইল না, তখন সে সংখ্যা রেখার আবিস্কার করিতে চেষ্টিত হয়। প্রথম চারি সংখ্যা লিখিতে সে আঙ্গুলের ন্যায় রেখা (।) ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিল। এই রেখার সাহায্যে চার পর্য্যন্ত সংখ্যা লিখন চলিল। ৫ সংখ্যাবাচক রোমীয় লিপি V, তিনটী মধ্যম অঙ্গুলীর অগ্রভাগ বক্র করিয়া একত্র করিলে কতকটা এই অক্ষরটীর ন্যায় দেখায়; ইহা হইতে নাকি মানুষের মনে উক্ত সংখ্যাটী লিখিবার ধারণা আইসে। রোমীয় দশম সংখ্যাটী X পাঁচের দিগুণ দশ। V এই অক্ষরটীর নিম্নে আর একটী V উল্টা করিয়া বসাইয়া

---

* টলষ্টয় হইতে।

ইহার সৃষ্টি হয়। এক হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত আসিয়া রোমীয় সংখ্যা পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিয়াছে। আবার পাঁচ হইতে দশ পর্য্যন্ত আসিয়া অন্য একটী পরিবর্ত্তিত সংখ্যার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। রোমীয়গণ শতক বুঝাইতে C এই রোমীয় অক্ষরটী ব্যবহার করিতেন, ইহার মূলে তাঁহাদের সেণ্টাম (centum) শব্দটী। পাঁচশত বুঝাইতে D এবং সহস্র বুঝাইতে M লিখিবার রীতি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে তদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হয়।

অল্প কতকগুলি সংখ্যাবাচক রেখাপাত হইতেই যাহাতে প্রয়োজন নির্ব্বাহ হইতে পারে এজন্য রোমীয়গণ একটী কৌশল বাহির করিয়াছিলেন। অধিক সংখ্যা বাচক রেখাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা রেখা বসাইলে বৃহৎ সংখ্যাটীর সহিত তাহার যোগ বুঝা যায় তদ্রূপ বাম দিকে বসাইলে উক্ত সংখ্যা হইতে তাহার বিয়োগ বুঝিতে হইবে। এই কৌশলানুসারে IV. VI. IX. XI প্রভৃতি অঙ্ক রেখাগুলির সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় জগতে অদ্যাবধি রোমীয় সংখ্যালিপি কার্য্য বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঘড়ি অহরহ রোমীয় সংখ্যালিপির উপরে হাত চালাইয়া আপনার মন্ত্র জপ করিতেছে।

অঙ্গুলীর সাহায্যে যে পূর্ব্বে সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইত, তাহা অমূলক বলিয়া মনে হয় না। অদ্যাবধি বিশেষ শিক্ষিত দেশের বালক বালিকারাও এই উপায়ে গণনা করিতে শিক্ষা করে। অসভ্য জাতিরা পাথরের কুঁচি দিয়া সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, ইংরাজী গণনা বোধক ক্যালকুলেশন (calculation) পদটী রোমীয় শব্দ ক্যালকুলাস (calculas) হইতে আসিয়াছে, তাহার অর্থ নুড়ি পাথর।

অধ্যাপক ওয়ার্ড লিখিয়াছেন প্রাচ্য অঙ্ক রেখা গুলি রোমীয় অঙ্ক রেখা হইতে অল্লায়াসে ভ্রম সঙ্কুল করা যাইতে পারে। একের স্থানে কোনরূপে দুই কিংবা দুইকে কোন গতিকে তিন করিয়া ফেলিতে পারিলেই অনেক স্থলে আকাশ পাতাল প্রভেদ হইয়া পড়ে, এজন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণকে অনেক সময় সন তারিখের সত্যতা নিরূপণ করিতে যাইয়া সন্দেহে পতিত হইতে হয়। ডাক্তার রবার্টসন তাঁহার ইতিহাসের সন তারিখের নির্দ্দেশ করিতে সকল স্থলেই বর্ণমালার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন; পাছে মুদ্রাকরেরা কোন ভ্রম করিয়া বসে ইহাই তাঁহার ভয়। বিখ্যাত লেখক গিবন বলেন, হস্তলিখিত পুঁথি গুলির সন ও তারিখ বহু স্থলে উল্লিখিত কারণে ভ্রম সঙ্কুলরূপে আধুনিক ইতিহাস পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিতেছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস *

আমরা এই মূল্যবান সচিত্র বাঙ্গালার ইতিহাস খানা অনেক দিন হইল উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে এত কাল তাহার আলোচনা করিয়া উঠিতে পারি নাই। সৌরভের ক্ষুদ্রায়তন নিবন্ধন এখনও বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে পারিলাম না। না পারিলেও আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থ খানা পাঠ করিয়াছি, এখনও করিতেছি এবং নানা বিষয়ের আলোচনায় আরও অনেকবার পাঠ করিব বলিয়া মনে করিতেছি। বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষায় এই রকম উচ্চ শ্রেণীর আলোচনা গ্রন্থ আর নাই।

রাখাল বাবু তাঁহার এই আলোচনা গ্রন্থ খানাকে "বাঙ্গালার ইতিহাস" নামে অভিহিত করিয়া প্রচার করিয়াছেন; বাস্তবিক উহাকে বাঙ্গালার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের একটু আপত্তি আছে। বাঙ্গালার রাজবংশের ঐতিহাসিক উপকরণ আলোচনাই তিনি এই গ্রন্থে করিয়াছেন; বাঙ্গালার তৎকালীন সমাজের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, সাহিত্য, শিল্প, সমাজ-ধর্ম্ম প্রভৃতি যাহা ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাহা তাঁহার গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। তবে ভরসা আছে, তাঁহার এই গ্রন্থ ১ম ভাগ মাত্র।

গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী সঙ্গত উপাদান অবলম্বনে এই গ্রন্থ সম্পাদন করিলেও ইহাতে যে তাহার নিজস্ব

* বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য আড়াই টাকা।

আনুমানিক মত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই, তাহা নহে। এইরূপ গৃহীত মত ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাহার সহিত অনেকেরই মত ভেদ হইবে এবং আমাদেরও অনেক স্থলে তাহা হইয়াছে।

"শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা, ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জন প্রবাদকে তিনি ভূমিকায় বিশ্বাস যোগ্য উপাদান বলিয়া স্বীকার করিয়াও বিষয় আলোচনায় "অৰ্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই মহাজন বাক্যের অনুসরণ করিয়া কোন কোন তাম্রশাসন কে "কূট তাম্রশাসন", কোন কোন মুদ্রাকে জালমুদ্রা ও 'রামায়ণ' মহাভারতের ন্যায় লিপিবদ্ধ সাহিত্যিক প্রবাদ (?) কে এবং কুল পঞ্জিকা গুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস যোগ্য নহে বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই সাবধানতার বিরোধী নহি। কিন্তু এতখানি সাবধান হইয়া যিনি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন তিনি যদি ঘনরামের ধর্ম্ম মঙ্গলের উক্তি বিশ্বাস করিয়া পালরাজ ধর্ম্ম পালকে সমুদ্রের ঔরষে মানুষীর গর্ভে জন্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন (১৪৫ পৃঃ) তবে তাহাও কি বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্মত উপাদান বলিয়া গৃহীত হইবে ?

কুল শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত অদ্ভূত। এক স্থানে কুল পঞ্জিকা গুলিকে তিনি একবারেই সম্মানের চক্ষে দেখিতে নারাজ, (১২৯—১৩৭ পৃঃ) অন্যত্র আবার এই "কুল শাস্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত" বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। (২৪৪ পৃঃ)। "দেব বংশ" নামক নবাবিস্কৃত কুল পঞ্জিকার উল্লেখে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"দনুজ মর্দ্দন ও মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা আবিস্কার বার্ত্তা প্রচারিত হইবার অল্প দিন পরে ময়মনসিংহ জেলার পুড্ডা গ্রামে বটুভট্ট রচিত একখানি প্রাচীন কুল গ্রন্থ আবিস্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত, কিন্তু ইহার অক্ষর দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ন্যায়। অক্ষর দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় এবং মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা আবিষ্কারের অব্যবহিত পরে উক্ত গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে উক্ত কুল গ্রন্থ অকৃত্রিম নহে। উক্ত গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বারা মূল পুথি পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিতেছেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার মত পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত হইয়া থাকে। তিনি যখন মূল পুথি পরীক্ষা করিয়া উহা অকৃত্রিম বলিয়াছেন, তখন তৎসম্বন্ধে আমার কোন কথাই বলা উচিত নহে। কিন্তু মূল গ্রন্থ অকৃত্রিম হইলেও গত তিন বৎসর মধ্যে আবিস্কৃত কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বটু বট্টের "দেব বংশ"নামক কুল গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশ বিশ্বাস যোগ্য নহে।"

রাখাল বাবুর এই মন্তব্য যে নিতান্ত অসমীচীন তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে তিনি "মূল গ্রন্থ" ও "ঐতিহাসিক অংশ" বলিতে কি বুঝাইয়াছেন তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। দেব বংশের শেষ ভাগের কৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বেই সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তারপর শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যখন তাঁহার "রাজন্য কাণ্ডে" এই গ্রন্থখানার সাপক্ষে ওকালতি করিতে যাইয়া লিখিলেন—"এই কুল গ্রন্থখানি চারিশত বর্ষের আদর্শ পুথি দৃষ্টে ১৬২২ শকে নকল করা হইয়াছে। অধুনা পশ্চিম (?) ময়মনসিংহবাসী হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দেব রায় মহাশয় পুথি খানি পাঠাইয়াছেন। পুরুষানুক্রমে এই কুল গ্রন্থ খানি তাঁহাদের গৃহে শ্রাদ্ধাদি কালে পঠিত হইয়া আসিতেছে।" ("রাজন্য কাণ্ড" ৫৫ পৃষ্ঠা পাদ টীকা)—তখন আমাদের আর বিশ্বাস করিতে বাকী রহিল না যে আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী কোন ব্যক্তির প্ররোচনায়ই নগেন্দ্র বাবু এরূপ অলীক কথার সমর্থন করিয়া একখানা মূল্যবান প্রাচীন পুথিকে সাধারণের চক্ষে হেয় করিয়া ফেলিয়াছেন। রাজন্যকাণ্ডের পাদটীকার লিখিত উক্তির সত্যতা অনুসন্ধান করিতে যাইয়া জানিলাম এই উক্তি সম্পূর্ণ অলীক।

রাখাল বাবু লিখিয়াছেন "একই গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত একই গ্রন্থে একই বিষয়ে এক অংশ অমূলক ও দ্বিতীয় অংশ সত্য রূপে গ্রহণ করা ইতিহাস রচনার বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী নহে।" ১০৭ পৃঃ।

রাখাল বাবু রামচরিত গ্রন্থখানাকে অবিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। এই খৃঃ একাদশ শতাব্দীর গ্রন্থে যদি কোন আভিজাত্য প্রয়াসী ষোড়শ শতাব্দীর লোক তাহার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কলাকৌশলের আশ্রয়ে তাহার অংশ বিশেষকে "দেব বংশের" ন্যায় দোষিত করে, তবে তাহার এই সামান্য দোষের জন্য সমস্ত পুঁথি খানাকে অবিশ্বাস করিয়া দোষী করা কি রাখাল বাবুর মত একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের পক্ষে সমীচীন হইবে?

রাখাল বাবু অতি সাধারণ কারণে অনেক মূল্যবান বিষয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং অতি সামান্য কারণ না পাইয়াও অনেক বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যথাঃ—সন্ধ্যাকর নন্দী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ; বল্লাল সেন ১২ হইতে ১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, শ্রীক্ষেত্র (?) বর্ত্তমান প্রোম, কমলাঙ্ক পেগু ইত্যাদি।

এই সকল ভ্রম প্রমাদ মত ভেদ ইত্যাদি থাকা সত্বেও আমরা "বাঙ্গালার ইতিহাস" কে বঙ্গ ভাষার গৌরবের সামগ্রী বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন করিতেছি। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ অবশ্যই এত দিনে আরম্ভ হইয়া থাকিবে; আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এই সুদীর্ঘ শুষ্ক মরুভূমির মাঝে মাঝে পাঠক সমসাময়িক সমাজ ধর্ম্ম রীতি নীতি শিল্প সাহিত্যের রস উপভোগ করিয়া একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাঠের পিপাসা চরিতার্থ করিতে পারিবেন।

অর্ঘ্য।

আন, ভৃঙ্গার ভরি
গঙ্গার বারি
তীর্থ সলিল ভার,
বাজাও শঙ্খ
আন, চন্দন পঙ্ক
পুণ্য কুসুম হার।
আন, বিল্বের দল
নীল উৎপল
মানস-সরস ধন,
এস, মন্থর পদে
মন্দির-পথে
পল্লী রমণীগণ।
দাও, সকলে অর্ঘ্য,
পরাণে স্বর্গ
গঠুক ধূপগন্ধ,
ঘুচে যাক আজ
যত আছে লাজ
টুটুক সব বন্ধ।
এস, সার্থক ফল
ভক্ত সকল
আলোক উঠিছে ফুটে,
ধর, ব্যর্থ সাধকের
শত বরষের
আঁখি বারি করপুটে।

শ্রীঅনুপমচন্দ্র রায়।

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

উপেন্দ্রকিশোর অতি অকালে চলিয়া গিয়াছেন। এত সকালে তাঁহার জীবন চরিত লিখিতে হইবে আমরা মর্ম্মে তাহা ভাবি নাই। কৃতিপুত্রের মৃত্যুতে মায়ের যে শোক, ময়মনসিংহের সেই শোক। পঁচিশ বৎসর পরে হইলে লেখনীর মুখে এরূপ তীব্র বেদনা থাকিত না। তবে জননীর নিকট সন্তানের শোক সর্ব্বদাই সমান।

উপেন্দ্রকিশোরের অনেক গুণ ছিল। কিন্তু তাঁহার রূপ ছিল একটী। তিনি বাল্যে বালক, কৈশোরে বালক, যৌবনে বালক, অন্তিম শয্যায়ও তিনি বালকের ন্যায় আনন্দে ছিলেন এবং মহানন্দে হাসিতে হাসিতে আনন্দময় লোকে চলিয়া গিয়াছেন। শিশুর ন্যায় সরল প্রকৃতির লোক এরূপ অধিক দেখা যায় না। তিনি মৃত্যুর পথে হারাইয়া যান নাই, অক্ষয় অমৃত লোকে দুদিন আগে গিয়াছেন মাত্র।

উপেন্দ্রকিশোর ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত মসূয়া গ্রাম নিবাসী ৺কালীনাথ রায় মহাশয়ের

দ্বিতীয় পুত্র। ইনি ১২৭০ সনের ২৮শে বৈশাখ জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহের নাম ৺ লোকনাথ রায়। উপেন্দ্রের পিতা লোক সমাজে শ্যামসুন্দর মুন্সী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পিতা পিতামহ উভয়েরই সাত্বিক প্রকৃতি ছিল। মুন্সী মহাশয়ের বৈষয়িক বিচক্ষণতা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শিতা এ অঞ্চলে বিখ্যাত। উপেন্দ্রকিশোরের আদি নাম কামদারঞ্জন। শ্যামসুন্দর তাঁহার ভ্রাতা মসুয়ার জমিদার ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল ৺হরিকিশোর রায় মহাশয়ের নিকট উহাঁকে দত্তক প্রদান করেন। তদবধি কামদারঞ্জন নাম উপেন্দ্রকিশোরে পরিবর্ত্তিত হয়।

উপেন্দ্রকিশোর শৈশবে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে প্রবেশ করেন। বাল্যকালেই শিক্ষকগণ প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাবু রতনমণি গুপ্ত তখন জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। উপেন্দ্র কিশোরের উপর তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টি পড়ে। এই বালক কিরূপে তাঁহার স্কুলে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিবে তৎ-বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। কিন্তু অধ্যয়নে উপেন্দ্র-কিশোরের সেরূপ মনোযোগ দেখা যাইত না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন এই বালক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইল, তখন শিক্ষকগণ ও আত্মীয়বর্গের বিস্ময়ের সীমা থাকিল না। প্রতিভা বিধাতার এক মহাদান। প্রতিভা কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্রে মানুষকে সফলতা দেয় তাহা বোঝা কঠিন।

অতঃপর তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। তৎপর মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে ১৮৮৪ সনে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার এই শেষ। সুবিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়া তিনি যে যশ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই তাহা ঘটিয়া থাকে।

শিশু-সাহিত্য রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শিশু দিগের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি শিশুদের উপযোগী ভাব, ভাষা ও ছন্দ চয়ন করিতেন। এই কারণে তাঁহার রচনা বালকদের অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ হইত।

"সেকালের কথা" "টুনটুনির বই" "ছেলেদের রামায়ণ"ও "মহাভারত" 'মহাভারতের গল্প" উহার প্রমাণ স্থল। প্রমদাচরণ সেন-প্রবর্ত্তিত "সখায়" তিনি শিশুদিগের উপযোগী রচনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। "সন্দেশ" উহার পরিপক্ক পরিণতি। সন্দেশ সন্দেশের ন্যায়ই বালকগণের মুখরোচক হইয়াছে। তাহার 'সেকালের কথাতে' বালকের কেন বৃদ্ধ-গণের ও অনেক শিক্ষনীয় বিষয় আছে। স্থানে স্থানে প্রাদেশিক ভাষা প্রয়োগ করিলে ভাব কিরূপ পরিস্ফুট হয় এবং চিত্তকে কতদূর আকর্ষণ করে, উপেন্দ্রকিশোর তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রতিভার হস্তে প্রাদেশিকতা এক অপূর্ব্ব শক্তি।

বাল্যকাল হইতে উপেন্দ্রকিশোর চিত্র বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। বঙ্গের ছোটলাট একবার যখন ময়মনসিংহ আগমন করেন তখন স্কুল পরিদর্শন কালে তিনি উপেন্দ্র কিশোরের খাতায় তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়া বালককে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া বলেন "তুমি ইহারই চর্চ্চায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিও"। উত্তরকালে এই বালক চিত্র-শিল্পে যথেষ্ঠ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে তাঁহার তুল্য লোক অধিক দেখা যায় না।

হাফটোন শিল্পে তিনি নূতন পন্থার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ছেলেদের রামায়ণ সচিত্র করাইবার জন্য তিনি একজন চিত্রকরের হাতে উহার ভার অর্পণ করেন। ঐ চিত্রগুলি অতিশয় কদর্য্য হইয়া যায়। উহাতে তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়েন এবং চিত্রের উৎকর্ষ সাধনে মন দেন। তিনি তাঁহার পুস্তকগুলির চিত্র আপন হাতে আঁকিয়া হাফটোন করাইয়া গিয়াছেন এবং সেগুলি বর্ণনীয় বিষয়ের ভাব অতি স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়। হাফটোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় তিনি অর্থব্যয়ে কখনও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। বরং তিনি এই কার্য্যে এত অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন যে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সংসারে তিনি বহু লোকের দ্বারা প্রতারিত হইয়াও বিশ্বাস ও চিত্তের প্রসন্নতা হারান নাই। হাফটোনে তাঁহার পার-দর্শিতা সম্বন্ধে বিদেশীয় বিশেষজ্ঞগণ যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

বিলাতের পেনরোজ (Penrose) কোম্পানী প্রতি

বৎসর জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাফটোন চিত্রের একখানা সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ১৯০৪ সনে যে সংগ্রহ প্রকাশ করেন তাহাতে Roy এর সান্ত্বনা, প্রভৃতি তিন খানা চিত্র প্রদান করিয়া বলেন Mr. Roy is evidently possessed of a mathematical quality of mind, and he has reasoned out for himself the problems of halftone work in a remarkably successful mannar. Those who have the earlier volumes of Process work will do well to turn to his articles and they will be found to well repay perusal. উহাতে আরো বলা হইয়াছে, তাঁহার পদ্ধতি to do uniform work with the fullest graduation and detail in it and with the minimum amount of manipulation in etching. "The Jubelee number of the British Journal of Photography (1904) বলে "The question of multiple diaphragms has really a very important bearing on the future of half tone; and the only worker I know of who has thoroughly grasped the bearing it is U. Ray of Calcutta. He has brought it to a mathematical exactness". William Gamble F. R. P. S. তাঁহার A wonderful Process শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন Investigators of the highest eminence, amongst whom I may mention......U. Roy of Calcutta, whose admirable articles in the year Book have shown not only a clear grasp of the subject but have suggested new methods of work. এতদ্ব্যতীত Mr. Howard Farmer of the Polytechnic, in a paper before the Royal Photographic society বলেন "Mr. U. Ray a very clever writer on the subject.

আর এক স্থানে বলা হইয়াছে—Mr. Upendra Kishore Roy of Calcutta is far ahead of European and American workers in originality, which is all the more surprising when we consider how far he is from the centres of process work.

N. S. Amstutz of America তাঁহার Hand book of Photo engraving পুস্তকে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত Le. Procede (Paris) The Illustrator The Inland Printer (U. S. A.) "Process work and Printer, Process Photogram" প্রভৃতিতেও তাঁহার সুখ্যাতির অবধি নাই।

গীত বাদ্যে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগ তাঁহার বাল্যকালেই প্রকাশ পায়। ময়মনসিংহে থাকা কালে তিনি পথে বেহালার একটী গৎ শুনিতে পান; বাসায় আসিয়া একজন ভৃত্যকে বলেন, "গোপী দা এখনি আমার জন্য একটা বেহালা কিনিয়া আন একটা গৎ শুনিয়া আসিলাম, দেরি করিলে ভুলিয়া যাইব। তিনি বেহালা অতি মিষ্ট বাজাইতে পারিতেন। বংশীবাদনেও তাঁহার অধিকার ছিল; শেষ-জীবনে উত্তম পাখোয়াজ বাদ্য শিখিয়াছিলেন। হারমোনিয়ম সম্বন্ধে তাঁহার একখানি পুস্তক আছে। উত্তরকালে তিনি হারমোনিমে বাদ্যের বিরোধী হন। তিনি বিশ্বাস করিতেন "হারমোনিয়মে" ভারতীয় সঙ্গীতের মিষ্টতা নষ্ট হয়।

তিনি ৺হরিকিশোর রায়ের জমিদারীর অধিকারী। তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিবার পর হরিকিশোর রায় মহাশয়ের এক পুত্র জন্মে। তখন ঐ জমিদারী উভয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে হইয়াছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ ছিল। এরূপ স্নেহ অধিক দেখা যায় না। উপেন্দ্রকিশোর মসূয়ার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী বহু সহস্র টাকার সম্পত্তি ভ.ইকে দান করিয়া গিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সময়ে অতি বিরল।

ময়মনসিংহ থাকা কালেই তিনি ছাত্রবৎসল ৺শরচ্চন্দ্র রায় এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোমের যত্নে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কলিকাতা যাইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা। উপেন্দ্রকিশোর তাঁহার চিত্র, সাহিত্য ও

সঙ্গীত বিদ্যা তাঁহার পুত্র কন্যাগণে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। উপেন্দ্রকিশোরের অমায়িকতা এবং সুমিষ্ট ব্যবহার কেহ ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার গৃহের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা শিল্পি-জনোচিত সৌন্দর্য্যানুরাগের অনুরূপ ছিল।

তাঁহার অন্তিম সময়ের মহামূল্য উক্তি গুলি শ্রাদ্ধ বাসরে শ্রীমান সুকুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে নিয়ে প্রকাশিত হইল। এই সমুদয় উক্তি যাঁহারা আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করেন তাঁহাদেরও প্রণিধান যোগ্য। "আমার জন্য তোমারা শোক করিও না—আনন্দে আছি, আনন্দেই থাকিব।"

গিরিডিতে যে গৃহে বাস করিতেন তাহার সুব্যবস্থার কথা সম্বন্ধে বার বার বলিতেন "আমি রোগ যন্ত্রণার সময়ে যাহাতে সুখ স্বচ্ছেন্দে থাকি, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যেন এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।" গিরিডির দারুণ শীতের উপশম জন্য গরম কাপড় আনান হইল। কিন্তু সেই উদ্বেগ ও ব্যস্ততার মধ্যে জামা প্রস্তুত করে কে? গুরুতর কর্ম্মের তাড়নায় কাহারও অবসর আর ঘটিয়া উঠে না। এমন সময় অযাচিত ভাবে কোথা হইতে দরজি আসিয়া উপস্থিত। তখন ভক্তের আনন্দ দেখে কে? বলিলেন "দেখ ভগবানের দয়া।"

কলিকাতায় গিয়া চিকিৎসা করাইলে তিনি সুস্থতা লাভ করিবেন এরূপ কথা তিনি বলিতে দিতেন না। বলিতেন—"ওরূপ ভাবিতে নাই; ভগবান যেরূপ বিধান করেন তাহার জন্যই যেন প্রস্তুত থাকিতে পারি।"

মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে ভক্তিভাজন দাদা মহাশয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে তিনি প্রার্থনা করিতে বলেন। দাদা মহাশয় প্রার্থনার সময় বলেন "তুমি ইহার জীবনের অপরাধ সমুদয় মার্জ্জনা কর।" এ প্রার্থনায় তিনি তৃপ্ত হইলেন না। আবার তিনি নিজেই আকুল ভাবে প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন "আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, এ প্রার্থনা আমি করি না। যদি দণ্ড দান আবশ্যক হয়, দণ্ড দাও। কিন্তু আমায় পরিত্যাগ করিও না।"

মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন, রবিবার ঊষার প্রাকালে পাখীর কাকলী শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "পাখীরা এমন করিয়া ডাকে কেন?" বলা হইল—এখন সকাল হইয়া আসিতেছে। ইহাতে অত্যন্ত মৃদু ভাবে যেন আপন মনে তিনি কি বলিলেন, ভাল বোঝা গেল না; কেবল শোনা গেল, "পাখীরা কী জানে? তারা বুঝিতে পারে?" দুটি ছোট পাখী জানালার কাছে আসিয়া কিচির মিচির করিয়া উড়িয়া গেল। তিনি বিস্মিত ভাবে তাকাইয়া বলিলেন "ও কী পাখী। ও কী বলিয়া গেল, শুনিলে না? পাখী বলিল "পথ প পথ পা"

"তোমরা আমার রোগ ক্লিষ্ট দেহকে দেখিতেছ; আমার অন্তরে কি আরাম কি শান্তি, তাহা যদি দেখিতে তোমাদের আর দুঃখ থাকিত না। আমার জন্য তোমরা শোক করিও না—আমি আনন্দে আছি আনন্দেই থাকিব। মৃত্যুর সময়ে ক্রন্দন করিয়া আমাকে অস্থির করিও না। আমার কাছে বসিয়া সকলে ভগবানের নাম গান করিও।"

উপেন্দ্রকিশোর আপন প্রতিভার আলোকে স্বদেশ বিশেষতঃ ময়মনসিংহকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাব কবে পূর্ণ হইবে ভগবান জানেন।

সাহিত্য সংবাদ।

আগামী ১লা এপ্রিল শনিবার রঙ্গপুরে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশন হইবে। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

আগামী ২১শে, ২২শে এপ্রিল যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দিন স্থিরকৃত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ব্বে সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন; এখন তিনি অস্বীকৃত হওয়ায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সাধারণ সভার সভাপতি স্থির হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ সেরপুরের শ্রীযুক্ত যামিনীকিশোর গুপ্ত রায় এম, এ, বি, এল মহাশয় কবিবর হেমচন্দ্রের অনুকরণে 'রাজগীতা বা বঙ্গোচ্ছ্বাস" নামক একখানা সচিত্র কবিতা পুস্তক লিখিয়াছেন।
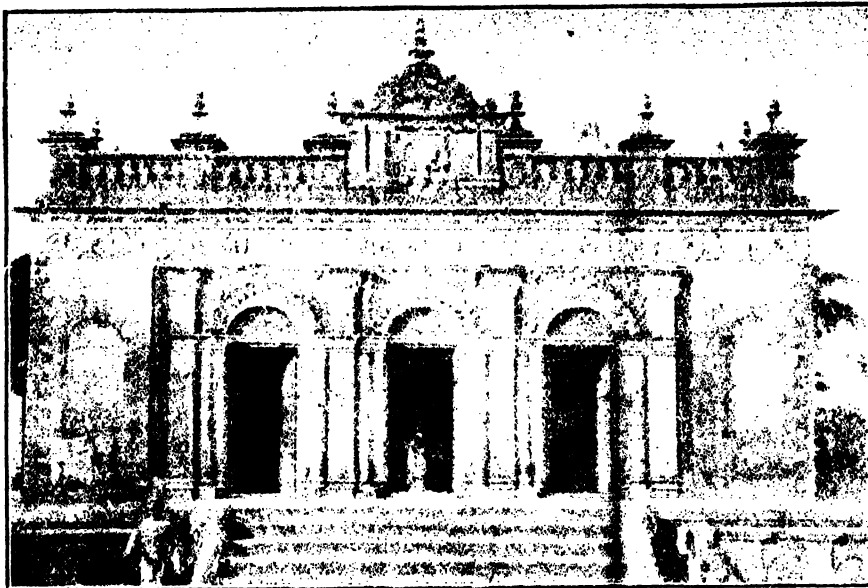
মধুপুর—মদনগোপালের মন্দির।

যোগীর গুফা।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

চতুর্থ বর্ষ } ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩২২। { পঞ্চম সংখ্যা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অভাব ও তন্নিবারণের উপায়।

(শেষাংশ)

এক্ষণে বাংলা সাহিত্যে এই অঙ্গ সৌষ্ঠব আছে কি না তাহাই বিচার্য্য। বাংলা সাহিত্য যে কোন২ বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমূহের সমকক্ষ, রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল' পুরস্কার পাওয়ার পর আর কেহই সে কথা অস্বীকার করিতে চাহিবেন না। কিন্তু এই খানে একটু বিশেষত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার প্রাপ্তিতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদ পৃথিবীকে দান করিয়াছেন;—সৌভাগ্য ক্রমে সেই গুলি বাংলায়ই প্রথম প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে বাংলা সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে একথা প্রমাণিত হয় নাই। বরং, সকলই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, বাংলার অনেক অঙ্গ এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে।

বাঙ্গালীর যেমন কেমন এক ঘেঁয়ে উদ্দেশ্যবিহীন জীবন, বাংলা সাহিত্যে ও তেমনই কেমন একটা উদ্দেশ্য বিহীন একটানা স্রোতঃ চলিয়াছে। জীবনে যাহার একটা স্থির উদ্দেশ্য রহিয়াছে, সহস্র কাজের ভিতর দিয়াও সে তার উপর লক্ষ্য রাখিয়া থাকে; এবং তাহার সমস্ত কার্য্যই পূর্ব্বাপর-সম্বদ্ধ এবং সকলই অন্তিম উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র। আর যার সেরূপ কোন স্থির উদ্দেশ্য নাই, বাত্যাহত তৃণের ন্যায় সে জীবনের ঘূর্ণিপাকে ঘুরিয়া মরে। বাংলা সাহিত্যে ও কতকটা অপস্মার রোগীর অঙ্গবিক্ষেপের ন্যায় ইতস্ততঃ কতকগুলি সাহিত্যিক চেষ্টা ছড়াইয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু নিতান্তই সাময়িক সংকোচ ও বিস্তার ভিন্ন ইহাতে এখনও স্থির, পরস্পর-সম্বদ্ধ, পূর্ণাবয়ব, সংযত আকার ভাল করিয়া উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জীবনের ক্ষীণাবস্থায় যেমন প্রত্যেক অঙ্গই অল্প বিস্তর স্পন্দিত হইয়া থাকে, অথচ সমস্তের ভিতর একটা দৃঢ় ঐক্য বন্ধন অনুভূত হয় না, বাংলা সাহিত্যেও তেমনই চারিদিকেই অল্পবিস্তর চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু তেমন দৃঢ় বন্ধন, তেমন পূর্ব্বাপর সংলগ্ন, সংযত অথচ সবল জীবনের আস্বাদ প্রায় দেখা যায় না। যাঁরা নিজেদিগকে সাহিত্যিক বলিয়া মনে করেন, তাঁরা সকলই আপন মনে সাধনা করিতেছেন বটে, কিন্তু এমারতের অন্যান্য অংশে যারা কার্য্য করেন, তাঁদের প্রতি যে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় এমন বোধ হয় না। অবশ্যই বছর২ যে এইরূপ সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তদ্দ্বারা ঐক্য সাধনের যথেষ্ট সহায়তা হয়। তথাপ, এখনও সাহিত্যের ভাষাটাই যে ভাল করিয়া ঠিক হয় নাই, ইহাতেই বুঝা যায় যে এই ঐক্য বন্ধন খুব পাকা হয় নাই। এমন অনেক সাহিত্যসেবী আছেন যাঁরা সংস্কৃত বা অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণে অসমর্থ, অথচ শব্দ নির্ম্মানেও অপটু; তাঁহারা একটু আধটু লিখেন

বলিয়াই এমন কি সাত খুন মাপের অধিকারী হইলেন যে, যে কোন প্রাদেশিক শব্দ দ্বারা ভাষাটাকে কর্দ্দমাক্ত করিয়া ফেলিতে পারেন? অথচ এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বিশেষতঃ কলিকাতায় যাঁদের নিবাস, তাঁরা ভাবেন যে যে হেতু কলিকাতায় তাঁদের বাড়ী, তাঁদের ঝি চাকরের ভাষাও সাহিত্যের ভাষা। লণ্ডনের বিলিংস্‌-গেটের ভাষাকে ইংরেজের সাহিত্যে তুলিয়া দিলে ইংরেজ কি বলিবে জানি না; কিন্তু সাহিত্য ত কাহারও নিজস্ব নয়, ইহার ভাষা যথাসম্ভব সার্ব্বজনীন হওয়া উচিত। আশা হয়, বাংলা সাহিত্যের এ দোষ কতকটা সংযত হইয়া আসিতেছে।

ভাবাগত এ দোষ ছাড়া বাংলা সাহিত্যের আর একটা দোষ আছে যাহার কথা বলিতে একটু সংকোচ বোধ হয়; কারণ, রোগ নিরাকরণের উপায় নির্দ্দেশ করা একটু শক্ত। আমাদের সর্ব্বত্রই যেন কেমন 'আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট'—ভাব। ইহাতে নিতান্তই জীবনের দৈন্য প্রকাশ পায়। অবশ্যই, আমরা ছোট নই—মনে করায় আত্মপ্রতারণা আছে। কিন্তু সাহিত্যে পর্য্যন্ত এ ভাবটা ছড়াইয়া পড়িলে মনে হইবে, বুঝি এটা চিরন্তন সত্য—বুঝি, আমরা ছোট থাকিবার জন্যই ছোট হইয়াই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, বুঝি, বড় হওয়া আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। বাঙ্গালী যে একটা রমণীসুলভ কুসুমপেলব ভাবের অধিকারী তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলিয়াছিলেন যে ভারতের অন্য জাতি যেখানে বলিবে 'জয় সীতারাম' বাঙ্গালী সেইখানে বলিবে জয় শ্রীরাধিকে'। ইহাতে যে একটা দৈন্য আছে তাহা নিতান্তই অহেতুক একথা বলি না; কিন্তু ইহার সর্ব্বত্র বিস্তারেরও ত কোন হেতু নাই। অথচ এই সুকুমার ভাবের ফলে বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালার যে নিজের বুদ্ধির উপর ও আস্থা কম, তাহা বোধ হয় সকলের পরিজ্ঞাত নহে। আমাদের নিজের বিচার শক্তির প্রতি আমাদের একান্ত অবিশ্বাস। অন্যে না বলিয়া দিলে আমরা কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি কি না সন্দেহ। অন্যের কথিত ও লিখিত বিষয় দিয়া মস্তিষ্ক ভরিয়া রাখাই আমরা পাণ্ডিত্য মনে করি। ইউরোপীয় নজীরের উপর ভর না দিয়া একটা কিছু বলিতে আমাদের সাহস অত্যন্ত কম। আমাদের গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধের দিকে চাহিলে বুঝা যায়, ছেলের চেয়ে ছেলের গয়নার বোঝা ভারী—প্রবন্ধের চেয়ে তার পাদটীকা বড়। লোক বিশেষের মতের মূল্য আমরা যতটা মনে করি, যুক্তির মূল্য তত নয়। আমরা অন্য হাজার রকমে ছোট হইতে পারি, কিন্তু আমরা যে বুদ্ধিটুকুও পরের দুয়ারে বিকাইয়াছি, ইহাই দুঃখ!

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশ্বকর্ম্মা দিবারাত্র খাটিয়া যে নিগড় তৈয়ার করিতেছেন, তদ্দ্বারা সমস্ত দেশের বুদ্ধিটাকে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে। চিরকালই পণ্ডিত মণ্ডলীর একটা সংসদ্ হইয়া আসিতেছে;—নৈমিষারণ্যে তাহা ছিল, নালন্দায় তাহা ছিল। এখনও সব দেশে, জার্ম্মনীতে বিশেষতঃ, বিশিষ্ট পণ্ডিতদের ক্রিয়াস্থল বিশ্ব-বিদ্যালয়। সুতরাং কলিকাতায় যে তাহা হইবে, তাহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব নয় বটে, তবুও বাঙ্গালী সেখানে একেবারেই কেউ নয় এমন নহে। কিন্তু আমাদের কেমন বিক্রান্ত, শৃঙ্খলিত অস্তিত্ব। আমাদিগকে অন্যদেশ হইতে কেহ না বলিয়া দিলে কোনটাই নির্দ্ধারিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এই যে সে দিন কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে 'সাহিত্যাচার্য্য' (ডি, লিট) উপাধি দিলেন ইহাতেও কি সেই শৃঙ্খলিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব্বে ও চিনিতেন; রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়া নূতন বিশেষ কিছুই লিখেন নাই; বরং পুরাণ লেখাই ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়া ইউরোপকে উপহার দেন। কিন্তু অদৃষ্টের ফের! তিনি এই অনুবাদের জোরেই 'নোবেল' পুরস্কার পাইলেন! আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তখন বুঝিলেন—তবে ইনি বড় কবি বটেন। সুতরাং দেশে ফিরিয়া আসিবা মাত্র পরম ২ ডি, লিট, তাঁহার লভ্য হইল! অবশ্যই একথা কেহ অস্বীকার করিবে না, যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে ক্রিয়া আমাদের কতকটা শৃঙ্খলিত থাকিবেই; কিন্তু যেখানে

বুঝি কিনা ইহাই মাত্র জিজ্ঞাস্য সেখানেও অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিতে হয়, এই দুঃখ।

তবুও যা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপের আইন কানুন অনুসারে তাহারই গণ্ডীর ভিতরে কতকটা বিচার, আলোচনা ও গবেষণা হইয়া আসিতেছে; কিন্তু বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাহিরে যে তাহাও আছে, এমন বোধ হয় না। ইংরেজীতে যিনি একছত্র লিখিতে তিনবার ব্যাকরণের কথা, অলঙ্কারের কথা ভাবিবেন, বাংলা এতই অনুকম্পার পাত্র যে বাংলায় লিখিতে হইলে ব্যাকরণের কথা দূরে থাকুক, অর্থের কথাই হয়ত সব সময় তিনি ভাবিবেন না। বাংলা লেখায় যে একটা নিয়ম ও সংযম থাকিতে পারে এ কথাটা অনেকে বিশ্বাস করিতে চান না। বাংলায় এমন লেখা অনেক আছে যার সমালোচনা দূরে থাকুক, সান্বয় পদনির্ব্বাচন করিতে গেলেই চুরমার হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাংলা লিখিতে আরম্ভ করিলেই অনেকে আপনাদিগকে একবারে প্রতিভাবান্ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়া ফেলেন, এবং তাঁদের যে কোন নিয়ম মানা উচিত একথা আদৌ মনে স্থান দেন না। কারণ, বাংলা যিনি লিখেন তিনি নিরঙ্কুশ—এবং প্রায়শঃই কবি। ইংরেজী আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পড়ি, জানি না বাংলার ক'খানা বই সেই ভাবে পড়া যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার তত উচ্চ আসন হয় নাই, বাহিরে বাংলা অরাজক রাজধানী। শাসন আমরা সর্ব্বত্রই মানিয়া আসিতেছি; সাহিত্যে আমাদের হওয়া উচিত সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন; কিন্তু পরম দুঃখের কথা এই যে এইখানে আমরা সকলই দুঃশাসন। এই অসংযত ভাবের ফলে অনেক স্থলে আমরা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত কিছু থাকুক বা নাই থাকুক, অমনি লিখিতে বসি, এবং এমনই এক শব্দঘটা রচনা করিয়া ফেলি যে 'নিজেই বুঝি না তার অর্থ, বুঝবে কি তা অন্যে।' এক নবীন কবি একবার বর্ত্তমান লেখককে তাঁহার একখানা কাব্য পড়িতে দেন; একাধিক বার পড়িয়া তাহার একটা মানে দাঁড়া করাইয়া কবিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'আপনার কি এই মানে?' কবি উত্তরে বলেন 'এ মানেও হয় বটে, কিন্তু আমার মানে একটু স্বতন্ত্র।' 'এমানেও হয় বটে'—ইহার মধ্যে একটা নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। কবিরা ভাবেন যে এমন করিয়া লিখিব যে যদি আদৌ কোন মানে হয়, তবে যে কোন মানেই হইবে। এক একটী কবিতা যেন বিশ্বরূপ ভগবান্ যাহার যেরূপে ইচ্ছা আরাধনা করুক।

কোথা হইতে বাংলা সাহিত্যে এক গবেষণার তুফান উঠিয়াছে যাহার মত্ত ক্রীড়ায় সাহিত্যের অভাব পূরণ হইতেছে কি আবর্জ্জনা বৃদ্ধি পাইতেছে ঠিক বুঝা ভার। ইতিহাসেই এই তথা কথিত অনুসন্ধিৎসার একান্ত বিকার দেখা যায়। চারিদিকে নানা জেলার, নানা সহরের, নানা পরগণার ইতিহাস বাহির হইতেছে; কোন্ দিন হয় ত দেখিব লেখক নিজের গ্রামের, পরে নিজের পরিবারের এবং ঐতিহাসিকতার চরম অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই ইতিহাস লিখিয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবেন। কিন্তু ইতিহাস যে কি থাকা উচিত তাহাই এখন পর্য্যন্ত অনেক লেখক ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারেন নাই। সাহিত্যের অঙ্গীভূত ইতিহাস একটী সার্ব্বজনীন বিদ্যা—ইহা ব্যক্তিবিশেষের জন্মপত্রিকা নহে। রোম একটী সহর মাত্র; তাহার যখন ত বড় ইতিহাস হইতে পারে, তখন, অনেকে মনে করেন, আমার সবডিবিসন সহরটীর ইতিহাস হইবে না কেন? কিন্তু দুঃখের বিষয় ইতিহাসে কিছু লিপিবদ্ধ হয়; পৃথিবীতে যখন আমার সহরটির লোক কিছুই করে নাই, তখন কি লিখিয়া ইহার ইতিহাস করিব? আমরা একটী ইতিহাসের স্বচী পত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া ইহার উত্তর দিতেছি:—"উনবিংশ অধ্যায়। মিউনিসিপালিটী; জলের কল; বৈদ্যুতিক আলো; ঠিকাগাড়ী; জেলা বোর্ড; লোকেল বোর্ড; গুদারা; পাউণ্ড; পাগলা গারদ; টাকশাল; হাঁসপাতাল, রেল; ষ্টিমার; গহেনা; ডাক।" আর, এই অধ্যায়ের গভীর প্রত্ন তত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায় কোন্ স্থান হইতে গহেনা কতবার ছাড়ে, এবং কোথায় কত ভাড়া, ইত্যাদি। আর একটী অধ্যায়ের নমুনা দিতেছি; "একাদশ অধ্যায়। মৎস, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ,।"।

প্রভৃতি।” আর এই অধ্যায়ে জানা যায় কোন্ নদীর কোন্ মাছ খাইতে ভাল এবং ইহাও জানা যায় যে শিশুকের তৈল বাতরোগের অমোঘ ঔষধ।’ টাইবারের জলে কিংবা এথেন্সের উপকূলে কি কি মাছ পাওয়া যায় এ খবর না দিয়া রোম গ্রীসের ইতিহাস অপূর্ণ রহিয়াছে বই কি! আর একজন ঐতিহাসিক এক লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিয়া মহীয়সী গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন:— সেটা আর কিছু নয়,—স্থান বিশেষের স্ত্রীলোকেরা কিরূপে শোক প্রকাশ করে। অনেকে হয় ত নাও জানিতে পারেন যে সেখানের স্ত্রীলোকেরা কাঁদিয়াই শোক প্রকাশ করে; এবং বিশেষত্বের মধ্যে এই যে তাঁরা চীৎকার করিয়াও কাঁদে। গ্রন্থকার এই সংবাদ দিয়া মন্তব্য করিতেছেন যে চীৎকার করিয়া কাঁদায় সমাজের ঘোর অনিষ্ট ঘটিতেছে; কারণ, পরিবারের ছেলেরা শিশুকাল হইতেই চীৎকারের ধ্বনিতে মৃত্যুকে ভয় করিতে শিখে। বীরোচিত মনুষ্য বটে!

দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া কিছু লাভ নাই। কিসের যে ইতিহাস হয়, আর কিসের হয় না ইহাই এখনও অনেক গবেষণাশীল মস্তিষ্কে ঢুকে নাই। ঠিকা গাড়ীর তালিকা যদি ইতিহাস হয়, তবে রেলওয়ের টাইমটেবল্, কিংবা পি, এম্, বাগচীর ডাইরেক্টরীকে সে আসন দেওয়া হইবে না কেন?

প্রত্নতত্ত্বের যে একটা দুর্দান্ত অনুসন্ধান পড়িয়া গিয়াছে তাহার মত্ততার নিমিত্ত কেহ কেহ ইহাকে ‘পেত্নী’ তত্ত্ব আখ্যা দিয়াছেন। অশোকের প্রস্তর লিপি হইতে ভারতের ইতিহাসের এক প্রকাণ্ড অধ্যায় রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যেখানেই একটা নষ্টপ্রায় ইষ্টকে দুই একটা অস্পষ্ট অক্ষরের রেখা দেখা যাইবে, সেখানটাকেই একটা মহান্ ঐতিহাসিক ক্ষেত্র কল্পনা করিয়া যদি প্রত্নতত্ত্বের খোঁজ আরম্ভ করি, তবে ডিকেন্সের পিক্ উইকের আর অপরাধ ছিল কি?

ঐতিহাসিক বাক্‌ল্ (Buckle) ইতিহাসের যে আদর্শ ধরিয়াছিলেন সেই অনুসারে তাঁরই মতে তাঁর সময়ে ইউরোপের সমস্ত সাহিত্যেও তিন চার খানার বেশী মৌলিক ইতিহাস ছিল না। আমরা অত বড় দাবী করি না। কিন্তু বাঙ্গালী লেখক যাহাতে না মনে করেন যে তিনি অনুগ্রহ করিয়া যাহা ছাপিয়া দিবেন তাহাই আমরা সাদরে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিব, এইটী আমরা চাই।

ইতিহাস ছাড়া—দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে যে এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান নাই, তাহা নহে; কিন্তু বাংলা ভাষায় তাহা প্রকাশ পায় না। এই সমস্ত বিষয়ে একটা সজীব সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে এই সমুদয়ের জীবিত প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিতে হইবে। অস্বাভাবিক কৌশলে তাহার সৃষ্টি হয় না। যেমন, অর্থনীতি সম্বন্ধে একটা সাহিত্যের জন্ম হইতে হইলে, সমাজে অর্থোৎপাদনের উপযোগী সমবেত চেষ্টা থাকা চাই, কিসে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, কিসে সেটা ভাল করিয়া সমাজের সকল স্তরে বিতরিত হয় ইত্যাদি প্রশ্ন উঠা চাই; তা না হইলে দেশে অর্থনীতি সম্বন্ধে একটা জীবিত সাহিত্য জন্মিতে পারে না। আমাদের অর্থোপার্জ্জনের এক মাত্র পন্থা যে আছে, অর্থাৎ চাকরী তাহাতে দরখাস্ত দেওয়া ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যের আবশ্যক করে না।

দর্শনে তেমনি আমাদের মনে যে পর্য্যন্ত কোন সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রশ্ন উদিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের দর্শন সাহিত্য অজাত থাকিবে। ইচ্ছা করিলে আমরা অন্য ভাষা হইতে পুস্তকের অনুবাদ করিতে পারি; কিন্তু কেবল তাহা দ্বারাই একটা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা যাহা, কাহাকেও নিমন্ত্রণ না করিয়া কেবল ভোজ্য পেয় দ্বারা উৎসব সম্পন্ন করা ও তাহাই। কেহ যদি না ভাবে, একটা আলোচনা যদি না হয়, তবে কেবল অন্যের মত জানিবার জন্য অনুবাদেরও আবশ্যক করে না; কারণ যাহারা জিজ্ঞাসু তাহারা অন্ততঃ ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ। অনুবাদের একটা উপকারিতা আছে স্বীকার করি; তাহাতে অন্ততঃ অন্যের চিন্তা সেই ভাষায় অনভিজ্ঞদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু চিন্তিত প্রশ্নগুলি যদি নিজেরও প্রশ্ন না হয়, তবে তাহা দ্বারা একটা নূতন সাহিত্য হইতে পারে না।

আর দর্শন শাস্ত্রে অন্ততঃ বাঙ্গালী যে কেন অনুবাদের প্রতীক্ষা করিবে তা বুঝি না। দর্শনের প্রশ্ন চিরন্তন প্রশ্ন—ভারত বাসীর কাছে তাহা অতি পুরাতন। প্রত্যেক যুগেই নূতন করিয়া জীবনের নূতন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মিল করিয়া সে গুলির পুনঃ২ আলোচনা করিতে হয়। দর্শনের সমস্যা কখনও মৃত হইতে পারে না। মানুষ যত দিন চিন্তা করিবে, ভোজনাদি নিত্য ব্যাপারের বাহিরে যত দিন মানুষের বুদ্ধি খেলিবে, তত দিন দর্শনের আয়ুঃ। ইহা সত্বেও মাসিক সাহিত্যের বাহিরে যে আমাদের দেশে দর্শনের বড় একটা চর্চ্চা নাই, তাহাতে আমাদের জীবনের অল্পতাই সপ্রমাণ হয়।

দর্শনের ন্যায় ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয়েও বাংলা সাহিত্য অত্যন্ত দরিদ্র। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সভা সমিতি, অনেক আশ্রম প্রভৃতি দেশে আছে বটে, কিন্তু অনেক জায়গায়ই এ সমস্ত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের আত্ম প্রচারের চেষ্টার রূপান্তর মাত্র। সম্প্রদায় বিশেষের মত প্রচারের চেষ্টাও একটা জিনিষ বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাধীন অথচ সংযত ভাবে সত্যের অনুসন্ধান করিতে হয়; ইহাতে চিন্তা চাই, সত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা চাই এবং প্রচারের চেয়ে জানার চেষ্টা বেশী চাই। জানিতে হইলেই আলোচনা দরকার, অন্যের মতের প্রতি সম্মান দেখান দরকার। অবশ্যই, নিজের মতও পরকে বলিতে হয়, কিন্তু এই মতের মূলে থাকা দরকার যুক্তি—স্বার্থ বা সুবিধা নহে। আমাদের দেশে যেমনই ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা ছিল না, তেমনই তাহার জোয়ার আসিয়াছে, এমন স্থান খুব কম আছে, যেখানে অমুক সভা বা অমুক আশ্রম না আছে; কিন্তু তথাপি বাংলা সাহিত্য ধর্ম্মতত্ত্বে এত দরিদ্র কেন? না, আমরা ধরিয়া নিয়াছি যে সত্য আর জানিবার বাকী নাই, এখন প্রচারই যা দরকার। কোন প্রশ্ন আমাদের নাই, কোন মীমাংসা আমাদের করিতে হয় না; কতকগুলি কথা আমরা মুখে আওড়াই মাত্র। অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনই আমরা বাহিরে আড়ম্বর পূর্ণ, ভিতরে ফাঁকা।

সমাজ সংস্কারের জন্য যে কতটা সভা এ দেশে বছরে হয়, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। কিন্তু ইউরোপীয় চিন্তার একটা প্রকাণ্ড অংশ দখল করিয়া আছে যে সমাজ তত্ত্ব সে বিষয়ে বাংলা সাহিত্য এত দরিদ্র কেন? তাহার কারণ একটু বক্তৃতা করিয়া যত সহজে যত বেশী পরিচিত হওয়া যায় একখানা সুচিন্তিত গ্রন্থ দ্বারা তত সহজে তাহা হয় না; আর, বই লিখিতে হইলে যতটা ভাবনা চিন্তার আবশ্যক, বক্তৃতায় তত দরকার হয় না। আসল কথা আমরা সকলই 'বেশ আছি।' কোন প্রশ্ন আমাদের মনকে উৎপীড়িত করে না, কোন চিন্তা আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষয় করিতেছে না; তুমি আমি মিলিয়া সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে একটা পরামর্শ করিব এমন কোন বিষয় আমাদের নাই।

একটা জাতির সাহিত্যে দুই প্রকার সম্পদ থাকে,—এক জ্ঞান সম্পদ আর ভাব সম্পদ। জ্ঞান সম্পদে আমরা কত হীন, উপরের কয়েকটী নামেই তাহা বুঝা যাইবে। ভাব সম্পদে আমাদের সাহিত্য এক দিকে খুব পুষ্ট, একথা মানিতে হইবে। কাব্যের যা প্রধান অবলম্বন, সৌন্দর্য্য ও প্রেম, তাহা বাংলা সাহিত্যে যথেষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানব চিত্তের যে নৈকট্য ও সহানুভূতি তাহাও বাংলা সাহিত্যে আছে। কিন্তু জ্ঞানের দিকটা অপুষ্ট থাকায় গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধানে যে ভাব মনে উপস্থিত হয় তাহার অভাব এখনও রহিয়াছে। বাংলায় উপন্যাসের দিকে দৃকপাত করিলে তাহার উপলব্ধি না হইয়া পারে না। আমাদের উপন্যাসে এক স্ত্রীপুরুষের প্রেমের বর্ণনা ছাড়া আর কিছু কদাচিৎ পাওয়া যায়। অবশ্য যে জাতির চরম উদ্দেশ্য ডেপুটি গিরি তাহার জীবন বর্ণনা করিতে হইলে ক্রিয়া বৈচিত্র্য ও ভাব বৈচিত্র্য পাওয়াও দুষ্কর। কিন্তু এই খানে কল্পনাকে বাস্তবের পূরণে নিযুক্ত করাই উচিত; প্রকৃত পক্ষে যাহা নাই, অথচ যাহা হওয়া উচিত, কল্পনায়ই তাহার বর্ণনা থাকা উচিত। তাহা হইলে জাতির জীবনের একটা বিস্তৃত ধারণা হয়, এবং ফলে জীবনটাও একটু পরিসর লাভ করিতে পারে। ডিকেন্স, জর্জ, ইলিয়ট, ভিক্টর হিউগো প্রভৃতির উপ-

ন্যাসে যেরূপ জ্ঞান ও ভাব পাওয়া যায়, বাংলার খুব কম উপন্যাসেই তাহা মিলে।

প্রবীণ জ্ঞান ও গভীর ভাবের কথা ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর একটা অভাব আছে, যাহার বিষয় সেদিন 'প্রবাসী' সম্পাদক উল্লেখ করিয়াছেন। 'আমাদের বনের কাঠুরিয়া, সুন্দর বনের ও নদীচরের চাষী, আমাদের পদ্মা মেঘনার মাঝি মাল্লা, আমাদের সমুদ্রগামী লস্কর, ইহাদের অভিজ্ঞতা সাহিত্যে এখনও স্থান পায় নাই।" বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন খুব ঘটনা বহুল নহে, তথাপি যা কিছু ঘটনা হয় তাহাও ত সব সাহিত্যে স্থান পায় নাই। জাতির সম্পূর্ণ চিত্র তাহার বিবিধ চিন্তা ও ভাব যে পর্য্যন্ত সাহিত্যে না পাইব, সে পর্য্যন্ত ইহাকে অপুষ্ট মনে করিতে হইবে।

আমরা এখানে অভাবের কথাই ভাবিতে বসিয়াছি, সুতরাং যে সম্পদ আমাদের আছে তাহার তালিকা নিষ্প্রয়োজন। আমরা অনেক অভাবের কথা বলিয়াছি, এখন তাহা দূর করিবার দুই একটা উপায় নির্দ্দেশ করিতে হয়, এবং এইটাই যা একটু শক্ত। যে কোন গৃহিণীই বলিতে পারেন তাঁর কি ২ জিনিসের অভাব এবং সকল গৃহিণীই জানেন যে যোগাড় করিয়া আনিলেই সেই ২ জিনিসের অভাব আর থাকে না। বাংলা সাহিত্যের গৃহিণীপণা করিতে গিয়া আমরা এক লম্বা অভাবের ফর্দ্দ করিয়াছি এবং এটাও বুঝি যে জিনিস গুলি হইলে আর তাহার অভাব থাকিবে না। কিন্তু কিসে আমরা এইগুলি পাইতে পারি, তাহাই সমস্যা।

আমরা যদি একটা সবল, তেজস্বী, দীপ্তিশালী জাতি হইতাম, তা হইলে এ অভাব আপনা আপনি পূরণ হইয়া যাইত। কিন্তু অন্যদিকে আমরা যে দুর্লঙ্ঘ্য সীমানার ভিতর আছি, তাহার ভিতর থাকিয়াই এ অভাব পূরণ করিতে হইবে, এইজন্য সমস্যাটা আরও গুরুতর।

জ্ঞানের দিকে আমাদের যে অভাব আছে অনেকে মনে করেন অন্য ভাষা হইতে অনুবাদ দ্বারা তাহা দূর করা যাইতে পারে। আমাদের কিন্তু মনে হয়, ইহা নিতান্তই অস্বাভাবিক উপায়। আমরা নিজেরা যদি পরের হাতের পুতুল না হইয়া বুদ্ধিটা কে স্বাধীন করিয়া দেই এবং একটু আধটু ভাবিতে চেষ্টা করি, এবং তাহা যদি দীনা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করি, তাহা হইলে যতটা উপকার হইবে, তেমন আর কিছুতে হইবে না। এইখানে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য আবশ্যক : আর আবশ্যক, বাঙ্গালী পাঠকের একটু ধৈর্য্য ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা। অনেক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক দর্শন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনার সহায়তা করিতে ইচ্ছুক ; কিন্তু পাঠকদের দিকে চাহিয়া তাঁরা গোড়ায়ই দাবী করিয়া বসেন যে প্রবন্ধ এমন করিতে হইবে যেন সকলই বুঝে। কিন্তু তাঁরা ভুলিয়া যান যে সকলের সকল বিষয়ে অধিকার নাই। এদেশে চিরকালই অধিকারী বিচার হইয়া আসিয়াছে, সাহিত্যে তাহা হইবে না কেন ? তারপর, কোন গভীর বিষয় বুঝিতে হইলে কিংবা কোন মৌলিক চিন্তার সহায়তা করিতে হইলে, পূর্ব্বেরও কিছু সঞ্চিত বিদ্যা চাই। বাংলা সাহিত্য সেবায় সব সময় একথাটা মনে রাখা হয়, এমন বোধ হয় না।

উপার্জ্জিত বিদ্যারূপ মূলধন বাংলা সাহিত্যে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে খাটিতেছে না। একটা সতেজ চিন্তাশীলতা এবং বিশিষ্টদের উপার্জ্জিত জ্ঞান এ দুইটা সাহিত্য সেবায় প্রচুর পরিমাণে নিয়োজিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাহিত্যের জ্ঞান সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে না। পণ্ডিতেরা যদি বাংলাকে একটু অনুগ্রহ করেন, আর জ্ঞান পিপাসু পাঠকেরা যদি বাংলাকে একটু শ্রদ্ধা করেন, তবেই বাংলার জ্ঞান সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। পাঠকদের মনে রাখিতে হইবে যে বাংলায় ও কঠিন, অর্থহীন নহে, কিন্তু গূঢ় অর্থপূর্ণ, বিষয় প্রকাশিত হইতে পারে।

দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশিষ্ট জ্ঞান রাশি বাংলায় প্রকাশ করিতে হইলে কতকগুলি বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দের ও প্রয়োজন হইবে। কিন্তু সে জন্য, প্রকাশ যোগ্য কোন চিন্তা আমাদের মনে না জন্মিতেই কতকগুলি শব্দ সংগ্রহ করিয়া রাখায় কি যে লাভ আছে তা ত জানি না। কিছুই প্রকাশ করিতে চেষ্টা নাই, অথচ কোন দিন চেষ্টা হইবে এই ভরসায় শব্দ প্রণয়ন করা অজাত পুত্রের নাম করণ তুল্য। প্রকাশের চেষ্টা আগে হওয়া উচিত। তারপর, আবশ্যক মত শব্দ বাধ্য হইয়াই সৃষ্টি

করিতে হইবে ; এবং তা হইলে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শব্দটীও সমাজে চলিয়া যাইবে। আমাদের মনে হয়, সাহিত্য পারিষদ্ প্রভৃতি সুধী মণ্ডলী যদি পরিভাষা সংকলনের চেষ্টা আগে না করিয়া সেই সেই বিষয়ের জ্ঞান প্রকাশের সহায়তা করিতেন, তাহা হইলে স্বভাবের নিয়ম মানিয়া চলা হইত। বিলাতের অনেক গ্রন্থ প্রকাশক নানা বিষয়ে ছোট ছোট হস্ত পুস্তিকা প্রণয়ন করাইয়া প্রচার করিতেছেন। আমাদের দেশে সেরূপ চেষ্টা দ্বারা প্রভূত উপকার হইতে পারে।

সাহিত্যের একদিকের শ্রীবৃদ্ধির কয়েকটী উপায় নির্দ্দেশ করিলাম। আমাদের সাহিত্যের ভাব সম্পদের ও উন্নতি সম্ভব। কিন্তু মনে হয় কেবল এক জাতীয় কাব্য দ্বারা তাহা হইতেছে না। নবীন কবিদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে নাহার তুল্য ভাবকে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিতে চেষ্টা না করিয়া ইহাকে একটু কাঠিন্য লাভ করিতে অবসর দেওয়া দরকার। একজন সম্পাদক একবার বলিয়াছিলেন, 'কবিতা ত কাগজে অনেক ছাপিয়াছি, কিন্তু মানে বুঝি নাই একটার ও।' একটু অতি রঞ্জিত হইলেও কবিতার পক্ষে ইহা সুখ্যাতি নহে। 'হঠাৎ কবি' হইতে চেষ্টা না করিয়া, ভাবটীকে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া পরে প্রকাশের চেষ্টা করা উচিত। যাহা নিজস্ব নয় তাহাতে কাহারও দানের অধিকার নাই।

আর একটা কথা। কবিরা একটা ঐশ প্রেরণার অধিকারী সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ মনে করেন যে স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদের লেখনীর সারথ্য করিবেন, তবে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের অধীনে আসিবেন না এরূপ বলা যায় না। অবশ্যই আমরা এরূপ বাতুল নই যে সকল কবি সম্বন্ধেই ইহা মনে করিব। কিন্তু এবম্প্রকার কবির সংখ্যা নিতান্ত কম নয় বলিয়াই কথাটা বলিতে হইল। আর, এত এত রস থাকিতে বাংলায় আদি রসের আধিপত্য কিছু বেশী নয় কি?

বাংলার সামাজিক অবস্থার বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য করিয়া আর একটা অভাবের এখানে উল্লেখ মাত্র করিব। বংলা সাহিত্য এখনও প্রধানতঃ হিন্দু সাহিত্য ; মুসলমান চিন্তা, মুসলমান ভাব ইহাতে যথোচিত পরিমাণে স্থান না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহা জাতীয় সাহিত্য হইবে না। মুসলমানেরা যে কেন বাংলা সাহিত্যের উপর দাবী ছাড়িয়া দিতে চান, বুঝি না। হয় ত, হিন্দুরা পূর্ব্ব হইতে চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া অনেকটা দখল করিয়া নিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের ন্যায্য পাওনা সব টুকুই ছাড়িয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। হইতে পারে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শের বিরোধী কথা আছে ; কিন্তু তা বোধ হয় ইউরোপের সব সাহিত্যেই কম বেশী পাওয়া যায়,— সেই সমস্ত সাহিত্যের চর্চ্চা ত মুসলমানেরা ছাড়েন না। বিরুদ্ধ কথা আছে বলিয়া সে ভাষায় পক্ষের কথা কি আর প্রকাশ করিতে নাই? এ ভাবে আত্ম গোপন করিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় বিপদ নাই এমন নহে। যদিই বা বিরুদ্ধ কথা সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক কোন ভাষায় রচিত হইয়া থাকে, তবে পক্ষের কথাও ত সেই ভাষায় সেই পরিমাণে প্রচারিত হওয়া উচিত ; তবেই ত নিরপেক্ষ বিচারের সুবিধা হয়। তার পর, ভাষাটার কি দোষ! বাংলা ত হিন্দু মুসলমান উভয়েরই মাতৃ ভাষা,— উভয়েরই সেবা আশা করিতে পারে। *

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

মোম্বাসা সহর খুব বড় নয়। চারিদিকে নীল সমুদ্র বলিয়া শোভা বড় চমৎকার। সহরে আরব ও পর্টুগীজ অধিবাসী অনেক। দেখিবার মত এখানে বড় কিছু নাই। বড় রাস্তার নাম 'গামা সড়ক।' শুনিলাম, ভাস্কোডি গামা যখন ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে পর্টুগাল হইতে বাহির হয়েন, তখন তিনি এই স্থানে কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এখানকার সুলতান প্রকাশ্যে তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু ভিতরে ২ তাঁহাকে সদলবলে হত্যা করিবার পরামর্শ আঁটিতে থাকেন। ভাগ্যক্রমে, তিনি উহা জানিতে পারেন। প্রতিদান স্বরূপ যখন

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বর্দ্ধমান অধিবেশনে পঠিত।

গামা সহর সংহার করিবার সঙ্কল্প করিলেন, তখন সুলতান সপারিষদ তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়েন। ইহাতে তিনি সুলতানকে ক্ষমা করেন। তাঁহার আগমনের নিদর্শন স্বরূপ তিনি সহরের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করান। এই স্তম্ভ গামা সড়কের এক স্থানে এখনও পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা সাহেবের সহিত মোম্বাসা ত্যাগ করিলাম। তিন মাইল দূরে আমরা কিলিনডিনি গ্রামে উপণীত হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মোম্বাসা একটী দ্বীপ। মোম্বাসা বন্দর ইহার পূর্ব্ব প্রান্তে ও কিলিসডিনি পশ্চিম প্রান্তে। এই স্থান হইতে আফ্রিকা মহা দেশে উপস্থিত হইতে হইলে ম্যাকুপা অন্তরীপ পার হইতে হয়। ইহার বিস্তার এক মাইলের অধিক নয়। এই অন্তরীপের উপর এক লোহার পুল প্রস্তুত হইয়াছে। রেল গাড়ী ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করে। যে সময় উহা প্রস্তুত হইতেছিল তখন বিলাতের Minister of Foreign affairs লর্ড সলিসবুরি। এই জন্য এই পুলের নাম Salisbury Bridge

প্রায় ২০ মাইল অতিক্রম করিবার পর আমাদের গাড়ী (এই সময় নূতন লাইন সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া বাহিরের যাত্রীরা যাইতে পাইত না। রেলের কর্ম্মচারী ও দ্রব্যাদি শুধু যাতায়াত করিত) রবই পাহাড় পার হইল। পাহাড়টি খুব ছোট। এই ২০ মাইলের মধ্যে ৫। ৬ টা ষ্টেশন দেখিলাম বটে, কিন্তু গাড়ী কোথাও থামিল না। বলা বাহুল্য প্রায় ষ্টেশনেই কোনও লোকজন ছিল না।

ঐ পাহাড়ের পরই তারু মরুভূমি আরম্ভ হইল। মরুভূমি যে ভীষণ ব্যাপার তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। চারিদিকে লাল রংএর বালি ভিন্ন আর কিছুই দেখিলাম না। মধ্যে ২ ক্ষুদ্র ২ গাছ রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। গাড়ীর হাওয়ায় রাশি ২ বালি আসিয়া গাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে লাগিল। রতিকান্ত তাড়াতাড়ি গাড়ীর সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিল বটে, কিন্তু তবুও আমরা নিস্কৃতি পাইলাম না। শুনিলাম, এই পথে রেল হইতে নানাপ্রকার আরণ্য জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই মরুভূমির সমস্ত পথ আমরা চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া সে সব কিছুই দেখিতে পাইলাম না। গাড়ীর মধ্যে আমরা যে ৫ জন লোক ছিলাম সকলেই রেলের চাকর তাহার মধ্যে একবার মাত্র একজন বলিয়া উঠিল, "সিংহ সিংহ" রতিকান্ত চক্ষু মুদ্রিত অবস্থাতেই বলিল, "যদি এ সময় স্বর্গের অপ্সরী আসিয়াও শর্ম্মাকে সাধ্য সাধনা করে, তাহা হইলেও চাহিয়া দেখিব না। বাবা এত বালি আসিল কোথা হইতে?" করিমখাঁ বলিল, "ভাই! দুঃখের কথা বলিব কি, একবার আমার বিবির চালভাজা খাইতে সাধ হওয়ায়। আমাকে বালি আনিয়া দিতে বলে, আমি কিন্তু অনেক ঘুরিয়াও বালি পাইলাম না। বালি না পাইয়া রাগ করিয়া সে আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। এইবার যখন বাড়ী যাইব বাক্স ভরিয়া বালি লইয়া যাইব।"

রতিকান্ত কহিল, "খাঁ-সাহেব, আর কি বাড়ী ফিরিতে পারিবে? হয়ত এই বালির মধ্যেই কবর হইবে।" মরণের কথায় করিম বড়ই চটিয়া উঠিত। সে বলিল "আমি কেন মরিব? মরিতে হয় তুমি মর।" এই সময় মহিনা বলিল, "দেখ ২ অষ্ট্রিচপাখী দেখ!" নূতন পাখীর নাম শুনিয়া সকলেই চাহিয়া দেখিলাম। দেখি, এক বৃহৎ পক্ষী আমাদের গাড়ীর সঙ্গে ২ ছুটিতেছে। পাখীটা উর্দ্ধে বোধ হয় ৫ হাত হইবে। এই সময় হঠাৎ সাহেবদের গাড়ী হইতে বন্দুকের আওয়াজ হইল, এবং সঙ্গে ২ পাখীটা লুটাইয়া পড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ী থামাইয়া উহাকে গাড়ীর উপর উঠান হইল। ৫জন লোক বিশেষ পরিশ্রমের পর ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিল। বোধ হইল ওজনে উহা ৩ মণ ৩॥ মণ হইবে।

বেলা ৩টার পর আমরা ভয়নাশক এক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। চারিদিককার সেই ভীষণ ভাব এই বার স্পষ্ট অদৃশ্য হইতে আরম্ভ হইল। আমাদের দক্ষিণে আমরা মেঘের মত এক পাহাড় দেখিলাম। উহাদের নাম নদাও। বাম দিকে আর এক পর্ব্বত শ্রেণী দেখিলাম উহার নাম নদুংও। সন্ধ্যার সময় আমরা সাভো পঁহুছিলাম। হয়ত আপনাদের মনে আছে যে, রেলের লাইন এই পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখান হইতে শেষ পর্য্যন্ত নির্ম্মানের ভার আমার সাহেবের উপর পড়িয়াছিল।

ষ্টেশনের কাছেই সাহেবের তাঁবু পড়িয়াছিল। তাহারই কাছে দুইটি ছোট ২ কুঁড়ে ঘর ছিল। আমরা উহার মধ্যে আশ্রয় লইলাম। রতিকান্ত ও আমি এক খানি, মহিনা ও করিম অপর খানি দখল করিল। অন্যান্য লোকজন অদূরে কয়েকটি কুটীরের মধ্যে আশ্রয় লইল। গ্রীষ্ম কাল না হইলে কিন্তু এমন ঘরে থাকা সম্ভব হইত না। উহাদের দেওয়াল তাল পাতার, তাহাও ফাঁক ২ করিয়া বাঁধা, ছাদও তাল পাতার পরে এই খানে যে সমস্ত কাণ্ড হইয়াছিল, তাহা যদি তখন জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে ঐ ঘরে আমি হাজার টাকা পাইলেও থাকিতাম না।

সাধারণ কুলিদের ঘর।

পরদিবস প্রাতঃকালে উঠিয়া স্থানটা ভাল করিয়া দেখিলাম। যেদিকে চাহিয়া দেখ, গভীর জঙ্গল. আমরা যেখানে বাসা করিয়াছিলাম, তাহা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার করা হইয়াছিল। ইহার ঠিক মাঝ খানে সাহেবের তাবু। তাহারই পাশে আমার কুড়েঘর ইহার অল্প দূরে মহিনার বাসা। তাবুর ২০।৩০ হাত দূরে আরও ৬০।৭০টা কুড়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে প্রায় ৪০০ কুলি, ৫০।৬০ জন ছুতার ও লোহার, ৭ জন কেরাণী, ১৩ জন চাপরাসী, বাবুর্চ্চি, আরদালি প্রভৃতি। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫০০ জন লোক সাহেবের অধীনে নিযুক্ত হইয়াছিল। সাহেব লোক আমাদের সহিত আর কেহই ছিল না। এই দেশে শীকার জন্ত অত্যন্ত প্রচুর বলিয়া মধ্যে ২ প্রায়ই দুই চারিজন সাহেব আসিয়া কর্ণেল সাহেবের অতিথি হইতেন।

দেশটা জঙ্গলে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আমাদের বাসার নিকট বড় ২ গাছ খুব বিরল ছিল। শুনিলাম ৫।৭ মাইল দূরের জঙ্গলে বড় ২ গাছের কোনও অভাব নাই। এই জঙ্গলময় দেশ—এখানে নিকা নামে প্রসিদ্ধ। সাহেবের বড় বাবু (একজন মাদ্রাজী), হিসাব রক্ষক (কাণপুরের এক মুসলমান), ষ্টোর কিপার (একজন বোম্বাইএর পার্সী), এবং প্রধান ছুতার (একজন পঞ্জাবী) ষ্টেশনের পাকা বাড়ীতে থাকিতেন। কুলিদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ভারতবর্ষের লোক। এদেশের লোক অত্যন্ত অসভ্য ও নির্ব্বোধ বলিয়া তাহাদিগকে এই কাজে লওয়া হয় নাই।

মোম্বাসা হইতে ভিক্টোরিয়া নিয়ানজার পূর্ব্ব উপকূল প্রায় ৪০০ মাইল। এই বিশাল দেশের মধ্যে অত্যন্ত জল কষ্ট। এই ৪০০ মাইলের মধ্যে কেবল মাত্র দুইটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হয়। বৃষ্টিও এদেশে খুব কম। এই জন্য এ দেশে অত্যন্ত জলকষ্ট। এখানকার অধিবাসীরা বৃষ্টির সময় জল সংগ্রহ করিয়া রাখে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত উহা একবারে শুখাইয়া না যায় ততদিন পর্য্যন্ত উহা ব্যবহার করে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, জল পচিয়া গিয়া বিষম দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, বড় ২ পোকা উহার মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তথাপও ঐজল ব্যবহৃত হইতেছে। জলের অত্যন্ত অভাব বলিয়াই তাহারা এমন করিতে বাধ্য হয়।

আমাদের বাসার খুব কাছে নিকা নদী থাকাতে আমরা প্রথমে জলাভাব মোটে জানিতে পারি নাই পরে কিন্তু আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইয়াছিল, যে সে কথা মনে হইলে এখনও পর্য্যন্ত আমার ভয় হয়। সে সব কথা যথাস্থানে বলিব। আমাদের লাইন এই নদীর এপার

পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সাহেব আসিয়াই নদীর উপর এক অস্থায়ী পুল করিয়া লাইনকে বাড়াইতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে পাকা পুল প্রস্তুত হইতে লাগিল। আমাদের আসিবার প্রায় একমাস পরে। যখন এই শেষোক্ত কাজ আরম্ভ হইল তখন আরও প্রায় ১৫০০ লোক উপস্থিত হইল। ইহারা সকলেই নদীর ধারের নিকট কুঁড়ে বানাইয়া বাস করিতে লাগিল। আমাদের বাসা হইতে ইহা বোধ হয় সিকি মাইলের অধিক হইবে না। এইবার সেই গভীর জঙ্গল প্রকৃতই রাতারাতি যেন আলাদীনের প্রদীপের গুণে নগরে পরিণত হইল। প্রাতঃকাল হইতে বারটা ও দুইটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ চলিত। ২০০০ লোক একসঙ্গে কাজ করাতে কেমন গোলমাল হয়, তাহা অনুমান করা বোধ হয় কঠিন নয়। সন্ধ্যার পর রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ হইত। গান-বাজনা, ভাঁড়ের নাচ, কথকতা, তাস, পাসা দাবা খেলা, বৈঠকি গান প্রভৃতি প্রায়ই হইত। ইহা ছাড়া সাহেবের চেষ্টায় ঐ দেশের মেয়ে পুরুষে মাঝে ২ আসিয়া

আমাদের সাহেবের তাঁবু, পাশে আমাদের কুটীর।

নাচ, গান করিত ও কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় দ্বারা আমাদিগকে বিলক্ষণ আমোদে রাখিত। আবার সাহেব আমাদিগকে মাঝে ২ নিজে ফুটবল ও হকি খেলা শিখাইতেন। যখন ম্যাচ্ হইত তখন চারিটার সময় কাজ বন্ধ হইত ও সকলকে আসিয়া উহাতে যোগ দিতে হইত। সত্য কথা বলিতেছি, আমাদের সাহেবের মত সাহেব আমি আর দেখি নাই। আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিতেন যে আমরা তাঁহাকে আমাদেরই একজন বলিয়া মনে করিতাম। তাঁহার মত সাহেব না থাকিলে, আমরা সেই জঙ্গলে বড়ই কষ্টে থাকিতে বাধ্য হইতাম।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

কুহেলী।

(১)

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন শরৎকাল গিয়াছে, হেমন্তও যায় যায়—কাশ কুসুমের আর সে ঝল মল রূপালী আভা নাই, কেশর সকল পড়িয়া গিয়াছে; ঝিলে আর তেমন পদ্মফুল ফুটেনা, পদ্মবনের আর সে বাহার নাই। দুই একটী শুষ্ক দল নলিনী দু একটী কমল কোরক জল ও স্থলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কিছু কালের জন্য আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছি। শীতের অগ্রদূত বিশ্বপৃথিবীর এক কোণে ধরিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া নাড়িয়া দিতেছিল।

নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জড় জগত। এই একজন বার্দ্ধক্যে জীর্ণদেহ হতশ্রী হইয়া যাইতেছে, এই আবার একজন নব যৌবনে প্রফুল্লতর শ্রী ধারণ করিতেছে। শরতের শোভা পদ্মবন শুকাইয়া গিয়াছে, অপর দিকে শস্যপূর্ণ হরিৎ প্রান্তরের দিকে নয়ন ফিরাও;—গাছ সকল ফলভরে ঈষৎ অবনমিত হইয়া পড়িয়াছে, স্বর্ণচূড় শস্যক্ষেত্রের উপর লক্ষ্মী পদ্মাসন পাতিয়া বসিয়াছেন। নিরন্ন বাঙ্গালীর ঘরে আবার নবান্ন হইবে, কুল কামিনীগণ হর্ষোৎফুল্ল নয়নে আবার লক্ষ্মী পূজার আয়োজন করিতেছেন। মাঠে মাঠে কৃষক শিশুগান ধরিয়াছে। হেমন্তের ছিন্ন তুষার একখণ্ড পাতলা চাদরের মত প্রকৃতির উপবন ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। আর্দ্র বসন পরিহিতা সুন্দরীর অঙ্গসৌষ্টবের ন্যায় সেই তুষার জাল ভেদ করিয়া দূরস্থিত চক্রবাল রেখা আধ আধ রূপে মানব নয়নে প্রতিভাত হইতেছে।

সে দিন কুয়াসা একটু বেশী মাত্রায় পড়িয়াছিল প্রান্তরে ধূয়ার আরম্ভ—গাছ পালা অটবীসব ধূয়ার প্রাচীরে ঘেরা। সুপ্তোত্থিত জগত তন্দ্রাবিজরিত চোক দুটি কচ্‌লাইয়া লইয়া, হিমাবরণের মধ্য হইতে মিটি মিটি তাকাইতেছিল। আমি হাত মুখ ধুইয়া জানালার কাছে বসিয়া সংবাদ পত্রের উপর চোক বুলাইতেছিলাম চূর্ণ তুষার কণা ধীরে ধীরে জানালা পথে উড়িয়া আসিতেছিল। কতক্ষণ পর সুর্য্য উঠিল, তুষার জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সহস্র কিরণ শ্যামাঙ্গিণী বসুমতীর গায় লুটাইয়া পড়িল। আনন্দে ছেলেরা রোদের দিকে পিট রাখিয়া বসিয়া গেল।

সহসা গ্রাম যুড়িয়া হুল স্থুল পড়িয়া গেল। নদীর পর পারে প্রান্তরে একদল বেদীয়া আসিয়াছে। চারিদিকে সামাল সামাল রব—গরুবাছুর ছেলে পিলে লইয়া লোক বিষম বিব্রত হইয়া পড়িল। গৃহে ডাকাত পড়িবে, গরু-বাছুর চুরী যাবে। জংলী দেশের লোক—তাদের না আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান, না আছে কাণ্ডাকাণ্ড বোধ। ঘূর্ণীবায়ুর মত ফস্‌ করিয়া আসে, আবার চলিয়া যায়। না মানে শাসন, না মানে রাজা, না মানে দোহাই দস্তুর। গ্রাম প্রান্তর আলোড়িত করিয়া ছুটে, সুবিধা পাইলে ছেলে মেয়েদের "ঝিনুকের মুক্তা", "সাপের মণির" লোভে ভুলাইয়া পাহাড় পর্ব্বতে লইয়া পলাইয়া যায়।

থানায় গেল সংবাদ; দারোগা আসিয়া তাহাদের জন বাচ্চা মালামালের একটা তালিকা করিলেন। ২৩ জন পুরুষ, ৯ জন স্ত্রীলোক, ১০ জন বালক, ৭টী বালিকা, ২১টী ঘোড়া, ১৭টী গাধা, ১৫টা খচ্চর, ৫টা ছাগল, ২০টী তাঁবু, আর যত ঘটী বাটী ইত্যাদি। কাকের পিছনে ফিঙ্গের মতন একদল লোক তাদের পিছনে লাগিয়াও রহিল। বাবা গ্রামের প্রজা পাইক সকলকে ডাকিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন। অতি দুরন্ত ছেলেরাও বেদের ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাদের মানুষ ধরা থৈলেটা না জানি কি অদ্ভুত পদার্থ!

(২)

সেই ভবঘুরে জাতি, যাদের না আছে বাড়ী, না আছে ঘর, গাছতলায় শয়ন, হিম আবরণ, পেশা ভ্রমন, চুরি জুচ্চুরি স্বভাব সিদ্ধ কর্ম্ম। তাদের নাম শুনিলেই যেন স্বভাবতঃ ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঘৃণার উদ্রেক হয় বটে সেই সঙ্গে যাযাবর জাতিটাকে দেখিবার জন্য মনে একটা আগ্রহও হইয়া থাকে। তারা নূতন দেশের মানুষ, পাহাড়ে পর্ব্বতে বাস, বন্যার জলের মত যাওয়া আসা, ঘূর্ণীবায়ুর মত চঞ্চলগতি, যাইবার সময় চিলের মতন ছোঁ মারিয়া সামনে যা কিছু পায় লয়ে চম্পট।

পাহাড় পর্ব্বতের কথা কেবল শুনিয়াই আসিতেছিলাম, কোন দিন দেখ নাই। সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে মনে মনে একটা বিপুল আগ্রহ লইয়া, সেই পাহাড় বাসী জানোয়ার গুলাকে দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। খেয়ার নৌকার মাঝি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমাকে পার করিয়া দিল। নদী পার হইয়াই দেখিলাম, বিস্তৃত প্রান্তরের উপর বেদেদের তাঁবু। ছোট খাট খেলা ঘরের ন্যায়, তার শত জায়গায় তালী দেওয়া, সহস্র জায়গায় ছেঁড়া দেখিলাম প্রান্তরের নানাস্থানে তাদের পালিত পশু সকল বিচরণ করিতেছে। গর্দ্দভের চীৎকারে সুপ্ত প্রান্তরটাকে যেন করাত ধরিয়া চিরিতেছে। ঘোড়াগুলি "জোরান" পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাইতেছে। ছাগল গুলো বোধ হয় বড় আদরের তাদের কোনটির গলায় ঘুঙ্গুর কোনটির গলায় ঝুছ্‌ড়া করিয়া কড়িফুল।

মেয়েরা সব 'ধনেশ পাখীর" তৈল সাপের মণি, বাঘের চোক্‌ বেচিয়া, দড়াবাজী খেলিয়া বাসায় ফিরিতেছে। মেয়েদের মধ্যে চতুর্ব্বেদই আছে। বৃদ্ধা প্রৌঢ়া, যুবতী ও বালিকা। বৃদ্ধা যারা তারা বাত রোগ ভাল করে, নানা রকম তন্ত্র মন্ত্র জানে, মানুষকে ফিঙ্গে করিয়া দেয়, মিলন গোটা তেজ ফলের গুণে স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসা জন্মায়, দাঁতের পোকা খসায়, বুড়ো মানুষকে জোয়ান করে। প্রৌঢ়া যারা তাদের ব্যবসা সাপের মণি, ধনেশ পাখীর তৈল বিকান। যুবতীদের কাজ অনুরূপ; তারা নানা রকম ঠাট ঠমক দেখাইয়া চলা ফিরা করে, আর পাড়া গাঁ হইতে লোক ঠকাইয়া চাল পয়সা, চাহিয়া চিন্তিয়া, লাউ বেগুন তরি তরকারী, চুরি করিয়া, ক্ষেত্রের শাঁক লইয়া চলিয়া আসে। আর যারা বালিকা তারা ছাগল নাচাইয়া বাজী দেখাইয়া, দুপয়সা

রোজগার করে। স্ত্রীলোকদের প্রত্যেকের পরণে ঘাঘড়ী, গলায় হাঁসলী, নাকে নথ পায়ে মোটা মোটা খাড়ু, হাতের কনুই পর্য্যন্ত পিতলের বাউটী। কানের গহনা গুলি এত বড় যে অনেকেরই ছেঁদাকানী হইতে হইয়াছে। ছোট ছোট মেয়েদের কোমরে ঘুঙ্গুর।

স্ত্রীলোকদের অনেক কাজ, তারা পাড়া ঘুরিবে দড়াবাজী খেলবে, পয়সা উপার্জ্জন করিবে; আবার শেয়াল ডাকার পূর্ব্বে তাঁবুতে ফেরা চাই। পুরুষেরা খুব সুখী, তাহারা তাঁবুর বাহিরে মেয়েদের জন্য রান্না চড়িয়েছে, আমাদের দেশের মেয়ে ছেলেরা ঘরে থাকিয়া যাহা করে, বেদেদের পুরুষের কাজ তাই। কুটনা কুটা, বাটনা বাটা, ভাত রাঁধা ইত্যাদি। দিনের বেলায় ছেঁড়া কাপড় তালি দেয়, ভাত রাঁধে, আর রাত্রে সকল বিদ্যার যে বড় বিদ্যা তার সাধনায় বাহির হয়।

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাদের সেই চাল চলতি দেখিতেছিলাম, এমন সময় এক বৃদ্ধ—বোধ হয় সেই বেদের দলের সর্দ্দার, মস্ত একটা লাঠি হাতে করিয়া আমাকে আসিয়া সেলাম করিল। তাহার চেহারা অতি ভয়ানক, মস্ত লম্বা জোয়ান, বুকের উপর সুন্দরবন গজাইয়াছে। দেখিতে ঠিক বনমানুষের মত, কটা দাড়ী শনের নুরীর মত নাভি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। গোফ দুটা মুচড়াইয়া দুকানের উপর দিয়া পিঠ পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দিয়াছে। দেখিতে ঠিক একটা পুরাতন ভালুকের মত। বাস্তবিক এমন লোমওয়ালা মানুষ আমি আর দেখি নাই। আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল—"সর্দ্দার জাজ।" আমি বলিলাম—বাড়ী? সে যেন খুব দুঃখিত ভাবে আমার কথার উত্তর দিল—"বাবু! আমাদের কি বাড়ীঘর আছে? ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবন কাটাই,গাছ তলায় শশ্মানে যেখানে রাত সেখানেই কাত। কত দেশে কত রাজ্যে জীবন ভরিয়া কত পাহাড়ে পর্ব্বতেই ঘুরিলাম; কোথাও আমাদের আশ্রয় মিলেনা। ভগবান জানেন আমরা কখনও কারও অনিষ্ট করিনা, তবু লোক কেন যে আমাদের প্রতি এত বিরক্ত—দু চার দিন এক জায়গায় থাকতে না থাকতেই তাড়িয়ে দেয়।" আমি তাহার কথার উত্তর দিতে না দিতেই

সে আবার বলিল, "সংসারে বাঘ ভালুকের থাকবার জায়গা আছে, আমাদের তাও নাই, এত বড় আকাশটার নীচে এক জায়গায় মাথা রাখিয়া দাঁড়াই বিধাতা এমন একটু স্থান আমাদের দেন নাই। বহু জায়গা হইতে তাড়া খাইয়া আপনাদের পায়ে আসিয়া পড়িয়াছি। বোধ হয় এখানে কিছুকাল সুখে থাকিতে পারিব।" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল, বড় সরল লোক, আমি ভাবিলাম, কাকের কোনও দোষ নেই ফিঙ্গের তাড়া খাইয়াই এমন হইয়াছে!

ঠিক এই সময় একটি বালিকা তাঁবুর ভিতর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া জজের কাছে দাঁড়াইল। একটী বিশালকায় শাল তরুর পাশে সেই ক্ষুদ্র কানন লতা, নয়ন ধাঁধা সহস্র কিরণের পার্শ্বে হেমাঙ্গিনী উষা, নির্ম্মমতার পাশে মুর্ত্তিমতী করুণা। কোমলে কঠোরে এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ইতিপূর্ব্বে আমি আর দেখি নাই। গোলাপ ফুলের মত সুন্দরী মেয়েটি, মেঘে ঢাকা চাঁদের মত মুখ খানি, চাঁচর চিকণ তরঙ্গায়িত কেশ বাহুতে পৃষ্ঠে উড়িয়া পড়িয়া খেলা করিতেছে। ভাসা ভাসা চোক দুটি—তাতে না আছে ভয়, না আছে আবিলতা, সরল কামনা বর্জ্জিত দৃষ্টি, তার উপর কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি বিরাজিত। সব চেয়ে সেই করুণ মুখ খানিতে কি এক অনির্ব্বচনীয় মোহিনী ছায়া আছে, যাহা দেখিলে অতি বড় পাষণ্ডের হৃদয় ও গলিয়া যায়।

তার পরিধানে ঘাঘড়ি, কোমরে দুছড়া ঘুঙ্গুর, বর্ণ অন্যান্য পাহাড়ী মেয়েদের মত ফেকাসে নহে। চুলগুলি তত কটা নহে, ঠিক বাঙ্গালী মেয়ের মত। ফলতঃ সে যদি ঘাঘড়ী ঘুঙ্গুর ছাড়িয়া শাড়ী চুড়ি পড়ে, তা হইলে কার সাধ্য তাকে বেদের মেয়ে বলে চেনে! কচু বনে এমন বহুমূল্য মণি কুড়াইয়া পাব, স্বপ্নেও আশা করি নাই।

আমি মনে মনে এইরূপ কত কি ভাবিতেছিলাম, এমন সময় সেই বালিকা ঠিক বাঙ্গালী মেয়ের মত সর্দ্দারের দিকে চাহিয়া বলিল—"উনি কে?" জজ বলিল—"আমাদের মুনিব সেলাম কর।" কচি হাত খানি তুলিয়া সে আমাকে সেলাম করিল। আমি বলিলাম

"জল, এটি তোমার কে ?" সে কিছুই বলিল না। দুহাত তুলিয়া ঊর্দ্ধদিকে তাকাইল বুঝিলাম এটী তারই কন্যা, বিধাতার দান, তাই সে অভীষ্ট ফলদাতা বিধাতার চরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

বুঝিলাম বটে, সেই সঙ্গে মনে একটা দারুণ সন্দেহও উপস্থিত হইল। কি! একটা বনবাসী অসভ্য জানোয়ার আর তার ঔরসে এমন দেব বালার জন্ম! হবে ও বা সাপের মণি, কাঁটা বনের গোলাপ—এওত বিধাতারই সৃষ্টি। যে সমুদ্রে তিমি নক্রের বাস মহারত্নওত সেই সমুদ্রেই জন্মে। আমি এইরূপ ভাবিতেছিলাম, এমন সময় সেই বালিকা বলিল, তুমি আমাদের তামাসা দেখিতে আসিয়াছ? প্রথম প্রথম এইরূপই হয়, আমরা যত জায়গায় যাই, প্রথম লোকে আমাদের ভারি আদর করে, কত লোক আমাদের দেখিতে আসে। তার পর দু'দিন যাইতে না যাইতেই তাড়াইয়া দেয়। ঈশ্বর জানেন, আমরা কোন দিন কার ও কিছু চুরি করিনা, তবু দুনিয়ায় আমাদের স্থান নাই। দুদিনের জন্য কাউকে আপন বলিতে পারি না।" সরলতা মাখান দৃষ্টি-তার উপর এই করুণ কথাগুলি, তীরের মতন আমার প্রাণে বাজিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার নাম কি?" সে বলিল "কুহেলী" নামটী যেন আমার বেশ পছন্দ হইল। বনলতা হেমাঙ্গনী অপেক্ষা কুহেলী বা কুইলী নামটীতে বালিকাকে আমার কাছে কি এক কুহেলিকা ময়ী করিয়া তুলিল।

সেও আমার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। আমি হাসিয়া নাম বলিলাম। সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল "নগা ফগা কি বিতিকিচ্ছি নাম। আমাদের দেশ হইলে তোমার নাম রাখিত সুজনীয়া!" আমিও হাসিলাম যে দেশের যে রীতি! বালিকা আবার বলিল "তোমাদের কোন বাড়ী?"

অস্তগামী সূর্য্যকিরণে আমাদের সিংহ দরজার কুম্ভগুলি জ্বলিতেছিল, আমি কিছু না বলিয়া অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাহাই দেখাইয়া দিলাম। সে সে দিকে চাহিয়া বলিল "একদিন আমরা তোমাদের বাড়ী যাইয়া বাজী দেখাইয়া আসিব।" এমন সময় তাঁবুর ভিতর হইতে কে যেন কর্কশ স্বরে কুঁই দিয়া উঠিল, কুহেলী বলিল "মা ডাকিতেছে।" এই বলিয়া সে কাণে কোঁক! চুলগুলি নাচাইয়া ঘুঙ্গুর বাজাইয়া তাঁবুর ভিতর ছুটিয়া গেল। আমার মনে হইল যেন একটা সচল সপুষ্প বনলতা আমার দৃষ্টিপথ হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। আমি কত কি ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যা প্রায় মিলাইয়া আসিতেছিল। পল্লীধূম ধূরবর্ত্তী কলঙ্ক রেখার উপর শ্বেত পক্ষ বিস্তার করিয়া সান্ধ্য পৃথিবীকে কুহেলিকাময়ী করিয়া তুলিতেছিল।

(৩)

আমার ছোট বোন ননী ভারি স্ফূর্ত্তিবাজ একটি চলন্ত হাসির ফোয়ারা বলিলেই হয়। আমি বাড়ী যাইয়া সব কথা তার কাছে খুলিয়া বলিলাম। সে ধরিয়া বসিল —"দাদা আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে বাজী দেখিবার। একদিন সেই ভবঘুরে জাতিটাকে আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করনা!" আমি বলিলাম—তাও কি হয়! খাল কেটে কুমীর আনিব! শেষে দস্যুর দল বাড়ী লুট করিবে। ননী হাসিয়াই অস্থির—তুমিত সাহসের হিমাচল, আমাদের এত লোকজন থাকিতে দু চারটা বেদের ভয়। একটা রাইফেলের গুলিতে যার গুষ্টিশুদ্ধ উড়িয়া যাইবে। তুমি যদি এতই ভয় পাও পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিও, আমি রাইফেল ধরিয়া একা তাহাদের গতি রোধ করিব। আমি হাসিয়া বলিলাম—তা জানি, আমি তোকে হাইলণ্ডের পল্টনের দলে ভর্ত্তি করিয়া কিন্তু দিবো। বাবা যদি সম্মত না হন।" ননী বলিল— সেইটা তোমার কাজ, তাঁর সম্মতি তোমাকে নিতেই হইবে।

আমার কিছুই বলিতে রহিল না, বেদেদের অদ্ভুত খেলার কথা চারি দিকেই রটিয়া গেল। পাড়ার লোক ধরিয়া করিয়া অনেক কষ্টে তাঁহার সম্মতি লইল। শুক্রবার খেলা দেখান হইবে।

শুক্রবার আসিল, সেদিন হেমন্তের কুয়াসা কাটিতে না কাটিতেই আমাদের পূজার আঙ্গিনা ভরিয়া গেল। চারিদিকে নরমুণ্ডের স্রোত। বেলা এক প্রহরের সময় সর্দ্দার জল দলবল সহ আসরে নামিল। প্রথমে সর্দ্দার

জঙ্গ বক্তৃতা দিল, তারপর একটী বেদে যুবক সকলকে নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গি দেখাইতে লাগিল। সে গাড়ীর চাকার ন্যায় পা মাথা এক সঙ্গে রাখিয়া গড়াইয়া যাইতেছিল, শরীরে যেন একখানাও হাড় নেই। তার পর আর একজন, সে নাকের ডগায় গাছ দাঁড় করাইয়া তাতে পাখী বসাইয়া মুখের ফুৎকারে গুলি ছুড়িতে লাগিল। অব্যর্থ লক্ষ্য, একে একে সবগুলি পাখী মাটিতে পড়িয়া গেল। তার পর একেবারে চার পাঁচ জন—কেউবা ধারাল ছুরি লুফিতে লাগিল, কেউ আগুণের গোলা চাবাইতে লাগিল, কেউবা ছেলে পিলের পেটের ভিতর হইতে হাঁসের ডিম বাহির করিতে লাগিল। একজন দুটা জলভরা কলসীর গলায় দড়ী বাঁধিয়া দড়ীর অগ্রভাগ চখের ভিতর দিয়া কলস দুটি টানিয়া তুলিল। আর একজন একটি তীক্ষ্ণধার বর্শা বোঝাই গাড়ীতে বাঁধিয়া বর্শার অগ্রভাগে মাথা রাখিয়া সেই বোঝাই গাড়ীটাকে ঠেলিয়া নিতে লাগিল। তারপর নানা রকম তাসের খেলা। একটা লম্বা ফিতাকে সকলের চোখের সামনে রাখিয়া খানিক পরে যাই সেটাকে তুলতে গেল অমনি সেটা একটা ভয়ঙ্কর কেউটে হইয়া দাঁড়াইল। এর মধ্যে সর্দ্দার জঙ্গ হাতে একটা হাড় নিয়া—লাগ ভেলকি বলতে বলিতে বার বার আত্মারাম সরকারের দোহাই দিতেছিল। তার পর যুবতীর দল, অগ্রসর হইল। বাজী খেলার চেয়ে তাদের হাসি চাহনীর কায়দা অনেক। ঠিক যেন কতকগুলি চলন্ত হাসির ফোয়ারা উঠিয়া আসর একেবারে গুলজার করিয়া দিল।

সর্ব্বশেষে কতকগুলি বালিকার সঙ্গে কুহেলী আসিয়া রঙ্গস্থলে নামিল। আনন্দে দর্শকমণ্ডলী করতালী দিয়া উঠিল। সেই অগণিত দর্শক মণ্ডলীর নয়ন মোহিনী বালিকার মুখের উপর কেন্দ্রীভূত হইল। পরক্ষণেই কতকগুলি শিক্ষিত অশ্ব ঠিক সার্কাসের ঘোড়ার ন্যায় তাহাদের পেছনে নাচিয়া নাচিয়া ছুটা ছুটী করিতে লাগিল। কুহেলী কতকগুলি শাণিত ছুরি লইয়া একটা চলন্ত অশ্বের উপর লাফাইয়া উঠিল। তার পর কখন এটার উপর কখন ওটার উপর উঠিয়া ছুরিগুলি লুফিতে লাগিল। কখন ও বা একপায় দাঁড়াইয়া, কখনও শুইয়া, কখন ও বা হামাগুড়ি দিয়া চলন্ত অশ্বগুলার পিঠে ছুটা ছুটী করিতে লাগিল। ঘোড়াগুলি চলিয়া গেল। পরক্ষণেই গলায় কড়িফুল গাঁথা ছাগলের পাল আসরে আসিল। কুহেলীর ঈঙ্গিত মতে তাহারা পিছনের একপায়ে দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দর্শককে সেলাম জানাইল। কুহেলী একটা লাঠি দ্বারা একে একে সবগুলি ছাগলের গায়ে মৃদু আঘাত করিল, অমনি তারা নাচিতে লাগিল। তারপর কুহেলী শুইতে বলিলে শুইয়া বসিতে বলিলে বসিয়া—নানা রকম শিক্ষার কৌশল দেখাইল। তারপরে দর্শক মণ্ডলীর অন্তরে তুফান ছুটাইয়া কুহেলী জলভরা কলস মাথায় করিয়া দড়ি বাহিয়া প্রায় ত্রিশ হাত উচ্চ একটা বাঁশের উপর উঠিয়া নানা রকম খেলা দেখাইতে লাগিল। কখন ও বা কলস রাখিয়া লাঠিমের মত ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। তার পর পালট খাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটিতে পড়িল। শেষে চারজন বেদে যুবক কুহেলীকে একটা থলের ভিতর পুরিয়া ছুরি দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দর্শক মণ্ডলী উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছিল, রক্তের গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে! দৃশ্য দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। শেষে অর্থের লোভে কি জঙ্গলীর দল একটি নিরপরাধিণী বালিকাকে প্রাণে মারিল? কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। দেখিলাম, কুহেলী প্রসন্ন বদনে অক্ষত শরীরে আমাদের সকলকে সেলাম করিতেছে।

তার পর উজ্জ্বল দৃশ্য। একখানা চেয়ারের উপর নানা বসন ভূষণ পরিহিতা কুহেলী। তার দুই পাশে দুইটি বেদে বালিকা চামর লইয়া দাঁড়াইল। ঠিক যেন কমলা মূর্ত্তি। সেই মোহিনী প্রতিমা দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী যেন ভক্তিভরে পর্ব্বত দুহিতার পদে মনে মনে প্রণত হইল।

খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি উঠিয়া ননীর কাছে গেলাম। ননী হাসিতে হাসিতে বলিল দাদা আজিকার খেলায় সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাইল কে? আমি বলিলাম ছাগল গুলো। ননী ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল দাদা ধন্য শিক্ষা দিয়াছে কিন্তু মেয়েটাকে! আমি কিছু বলিলামনা, মানস নয়নে তখনও কুহেলীর আশ্চর্য্য ক্রীড়াভঙ্গি দেখিতেছিলাম। ননী বলিল দাদা কুহেলীকে

কি পুরস্কার দেওয়া যায় বল দেখি? সে আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই কুহেলীকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিল। কুহেলী আসিল। ননী তাহার নিজের গলার হার তাকে পড়াইয়া দিল। তার পর একখানা শাড়ী আনিয়া পড়িতে বলিল। কুহেলী বিস্তর আপত্তি জানাইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা। ননী তাহাকে জোর করিয়া কাপড় পড়াইল। আর নিজের বহুমূল্য অঙ্গুরী কুহেলীর আঙ্গুলে পড়াইয়া দিয়া বলিল "যেখানে থাকিস কুহেলী, তোর বিদেশিনী ভগ্নীকে মনে করিস্।" চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ননী কুহেলীর গালে চুমো খাইতে লাগিল। এত আদর এত স্নেহ হয়ত সেই পর্ব্বত দুহিতার ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। কুহেলী বড় অপ্রতিভ হইল দেখিলাম লজ্জায় তাহার মুখখানি লাল হইয়া গিয়াছে। ননী বলিয়া দিল "দেখ কুহেলী তুই যখন আমাদের কাছে আসবি তখন যেন শাড়ী চুড়ী পড়িয়া আসিস। বেদের ধরা চূড়ায় তোকে ভারি বেমানান দেখায়।" কুহেলী চলিয়া গেল। ননী তাহার পিছনে পিছনে বার বার করিয়া বলিয়া দিল "এখানে যতদিন থাকিস্ রোজ যেন দুবেলা করিয় দেখা পাই।"

কুহেলী চলিয়া গেলে আমি ননীকে বলিলাম ননী তোর ঘৃণাও নাই লজ্জাও নাই! ননী বলিল কেন? বেদের মেয়ের গালে চুমো খেয়েছি বলে? দাদা মণি মুক্তা সাপের মাথায়ই থাক, আর কচুবনেই থাক, কে না তাকে আদর করে? স্থান বিশেষে ফুটে বলিয়া কি গোলাপ ফুলের সৌরভের হানি হয়? আমি বলিলাম হাজার হোক বেদের মেয়েত? ননী বলিল সে বলেইত, তা না হলে আমি তাকে বৌদিদি করিয়া নিতাম। আমি ভ্রূভঙ্গি করিলাম কি এত বড় স্পর্দ্ধা। ননী তখন হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া পলাইল। আমিও বাহিরে চলিয়া আসিলাম। এমন সময় সর্দ্দার ভজ আসিয়া ননীর দেয় অলঙ্কার সব আমার পায়ের কাছে রাখিয়া সেলাম করিয়া বলিল হুজুর এসবে আমাদের সাজেনা। আমরা অসভ্য বেদে, বানরের গলায় কেন মুক্তার মালা? পুলিশে দেখিলে এখনই গর্দ্দান যাবে। আমি বলিলাম দানের জিনিস ফিরাইয়া নিবনা। তোমরা যে কতকদিন এখানে আছ, কেউ তোমাদের কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না। যখন স্থানান্তরে যাও তখন অন্য ব্যবস্থা করিব।

(৪)

তারপর হইতে রোজ দুবেলা কুহেলী আমাদের বাড়ীতে আসিত। যে দিন তাহাদের বাজী খেলা না থাকিত, সে দিন সারাদিনটা আমাদের বাড়ীতেই কাটাইয়া দিত। ননী তাহাকে গলার মালা করিয়া তুলিল। ননীর বড় একটা গুণ ছিল, পরকে আপন করিয়া লইতে সে যেন যাদু জানিত। অতি বড় দুরন্ত ছেলেও তাহার চক্ষের চাহনীতে বশে আসিত। কেহ যে তাহার সঙ্গে রাগ করিয়া দু চার দণ্ড কথা না বলিয়া থাকিবে তার যো ছিল না। কুহেলীও অতি অল্পেই তাহার বশীভূত হইল। মাও দেখিলাম কুহেলীর জন্য বড় ব্যস্ত। শিশুর কোন অঙ্গে ব্যথা হইলে জননী যেমন তাহার সর্ব্বাঙ্গের কথা ভুলিয়া,কেবল সেই ব্যথিত স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, সেইরূপ মা সকল ভুলিয়া একমাত্র কুহেলীর সুখ সচ্ছলতার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ননী তাকে কোলে ঘাড়ে করিয়া রঙ্গমহালের উপর তালা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইত। মা তাতে যেন আরও আমোদ পাইতেন। কুহেলীকে খাওয়াইতে তিনি অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

কিন্তু বাবা এসবের প্রতিকূল ছিলেন তিনি প্রায়ই বলিতেন দুর্দ্দান্ত বেদে দস্যুরা ধীরে ধীরে চার ফেলিতেছে; কেউ আমার নিষেধ শুনে না,শেষে একটা সর্ব্বনাশ হইয়া না যায় না। কিছুকাল এইরূপে গেল। দেখিলাম স্নেহের এমনি একটা বন্ধন যে ধীরে ধীরে তাহা বাবাকেও জড়াইয়া ফেলিয়াছে। তারপর এমনি হইল যে দু দণ্ড কুহেলীকে না দেখিলে বাবাও যেন অস্থির হইয়া উঠিতেন। তিনি দু বেলা করিয়া তার খবর লইতেন। এতটা স্নেহ, এতটা, ভালবাসার কারণ কুহেলীর সেই ফুলের মতন কোমল স্বভাব, ফুলের মতন করুণ কোমল মুখখানি, সরল কামনা বর্জ্জিত দৃষ্টি। বাস্তবিক কুহেলীর জীবন আমাদের কাছে যেন দৃষ্টির অভেদ্য কি এক স্বপ্নজালে ঘেড়াও ছিল। আমি ধরিতে ছুঁইতে কিছুই পাইতাম না। এইরূপে কুহেলী আমাদের পরিবারের একজন হইয়া দাঁড়াইল।

দিন এইরূপে কাটিতেছিল। একদিন ননী

আমাকে বলিল—দাদা কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি কুহেলীর সম্বন্ধে কলম্বশের মত একটা নূতন তথ্য শীঘ্রই আবিষ্কার করিব। আমি মনে মনে ভাবিলাম হইতেও বা পারে, পরের মনের ভিতর প্রবেশ করিতে ননী বিশেষ ওস্তাদ ছিল। অতি গোপনীয় ঘটনাও কেহ তাহার নিকট অপ্রকাশ রাখিতে পারিতনা।—এমনি ছিল তাহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

আজ দুইদিন হইল কুহেলী আমাদের বাড়ীতে আসেনা। এই দুই দিনের ভিতর একটীবার তাহার ছায়াটীও দেখিলাম না। আমি আমার বৈঠকখানায় একটা ইজি চেয়ারের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছি, সামনের দেওয়ালের উপর মিশর সুন্দরী ক্লিউপেট্রার একখানি ছবি, আমি অন্য মনস্কভাবে তারই উপর চক্ষু বুলাইতে ছিলাম, তন্দ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে আমার চোখের কোণে আসন পাতিতেছিল। আমি যেন স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম, সেই মিশর সুন্দরীর পাশে আর একখানা ছবি, সে ছবিখানি কুহেলীর। তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; দেখিলাম, ননী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সে প্রবেশ করিয়াই অতি গম্ভীর ভাবে একটা চেয়ারের উপর বসিল; আমিত একেবারে হতভম্ব। হাস্য পরিহাস চঞ্চলা ননীর এই গম্ভীর মূর্ত্তি আমি এই সর্ব্ব প্রথম দেখিলাম। যেন সে খুব একটা রাজনৈতিক কূট প্রশ্নের মীমাংসা লইয়া আমার কাছে উপস্থিত।

আমি হাসিয়া বলিলাম কি রাজমন্ত্রী মশাই, রাজ্যেতো কোন গোলযোগ ঘটে নাই! ননী আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে বলিল দাদা কুহেলী সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হয়? আমি কিছু না ভাবিয়াই উত্তর দিলাম—একটা অসভ্য বেদের মেয়ে। ননীর আরক্ত অধর ঈষৎ স্ফুরিত হইল, আমি সেই প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্যের উপর একটা তাচ্ছল্যের রেখা টানা দেখিলাম। রহস্যের সময় নহে ভাবিয়া বলিলাম—তোর কিরূপ ধারণা? ডানহাতের গোলাপ ফুলটী বামহাতে নিয়া সে অতি গম্ভীর ভাবে বলিল আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, কুহেলী বাঙ্গালীর মেয়ে—দুর্দ্দান্ত বেদে তস্কর কর্ত্তৃক শিশুকালে অপহৃতা।

অতিমাত্র দৃঢ়তার সহিত সে এই কথা বলিল। অন্য সময় হইলে আমি তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু সে এমনি ভাবে এই কথাগুলি বলিল যে আমার হাসিবার আর অবসর রহিল না মনের সকল সন্দেহ জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া জোর করিয়া বিশ্বাস করাইয়া দিল। আমি উত্তর দিতে না দিতেই সে আবার বলিল—"দাদা! তার জন্য আমার ভারি কষ্ট হয়, আমি যদি তোমার মতন পুরুষ মানুষ হইতাম, তা হইলে নিশ্চয়ই এই সকল বেদে যাদুকরদের ইন্দ্রজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দুঃখিনী বালিকার উদ্ধার করিতাম।" কর্ত্তব্য পরায়ণতার ছলে ননী অনেক সময় আমাকে এমন দু একটী তীব্র কথা শুনাইত যে বিষবিদ্ধ বাণের ন্যায় সে গুলি আমার মর্ম্মস্থল ভেদকরিয়া চলিয়া যাইত। আমি বলিলাম—তুই কোন কোন সূত্র ধরিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলি? ননী বলিল—সূত্র অনেকগুলি, অবশ্য একটু ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন। আমি টেবিলের উপর হইতে খানিকটা কাগজ ও পেন্সিল টানিয়া লইয়া পেন্সিলের কতকটা মুখের ভিতর রাখিয়া বলিলাম, বল। সে বলিতে লাগিল, ধর প্রথমে কুহেলীর আকৃতি তাহার গড়ন পিটন ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ের মতন। শুধু বাঙ্গালীর মেয়ে বলিলেই হইবে না ভদ্রবংশীয়া; সেদিন অনেকগুলি বেদের মেয়ে দেখিয়াছি, কোনটীর সঙ্গেই তাহার মিল হয় না। অন্যান্য মেয়েদের মত তার গায়ের রঙ তত ফেকাসে নহে, গোলাপ ফুলের মত আরক্তিম, চুল পিঙ্গলা কিম্বা কটা নহে, ঘন কৃষ্ণ। তার কণ্ঠস্বর কোমল ঠিক বাঙ্গালী মেয়ের মত, কুহেলী অতি পরিষ্কার, অথচ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলিতে জানে। আমি লিখিলাম সূত্র ১নং। "তার পর ধর প্রকৃতির কথা, আমি তাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিয়া তাহার হাবভাব অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াছি। কুহেলী জানোয়ার জাতির মত মাংসপ্রিয় নহে" (সূত্র ২নং) "ইতস্ততঃ ভ্রমণ ভাল বাসেনা।"(সূত্র ৩নং) "তাহাদের মত হাত ভরা গহেনা ও নথ কতের পছন্দ করেনা।" (সূত্র ৪নং) "আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহার প্রকৃতি আজও জন্মস্থানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে।" আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

...বলিলাম, যদি তাই হয় তবে আর তাকে বর্ব্বরের দলে ঢুকতে দিবনা ননী। ননী বলিল—শুধু কি তাই। সে পূর্ব্ব জন্মের কথা বলে, আমাদেরই বাড়ীর মতন সে এইরূপ একটা বাড়ীতে থাকিত, সে বাড়ীতে পূজা হইত, অসুর সিংহ ও দুর্গা মূর্ত্তির দশটা হাত তার স্পষ্টই মনে আছে। আরও কয়েকটা মূর্ত্তি ছিল, তার মধ্যে হাতীর মাথাটা ছাড়া অন্যগুলি যেন তার স্বপ্নের মত বলিয়া বোধ হয়। আমি বলি সেটা কুহেলীর পূর্ব্বজন্ম নহে, ইহজন্মের শৈশবস্মৃতি।" আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম। ননীকে বলিলাম তুই নিশ্চিন্ত থাক, এই আমি সেই বেদে তস্করদিগকে দেশছাড়া করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগীর উদ্ধারার্থে চলিলাম। ননী বলিল যেওনা কথার আরও বাকী আছে। আমি কুহেলীকে আমাদের বাড়ীতে থাকিতে বলিয়াছিলাম। বিস্তর প্রলোভন দেখাইয়াছিলাম কিন্তু সে পাখী আর পোষ মানিবে না,—সে চির বনবাসই ভালবাসে। দাদা, কুহেলী পর্ব্বতের প্রেমে আত্মহারা। সে আমাকে স্পষ্টই বলিয়াছে, দিদি বাবু, যদি পাহাড় পর্ব্বত দেখিতে, যদি শাল তরুর ডালে তেমনি ময়ুর ময়ূরীর নাচ দেখিতে, তাহলে বোধ হয় এ রাজভবনে থাকিতে সাধ হইত না। যার পায় শিকল নাই সংসারে সেই সুখী। আমি চির বনবাসই ভালবাসি। যে দুএক মাস তোমাদের এখানে থাকি, ভারি কষ্ট হয়—সর্ব্বদা পাহাড়ের কথা মনে হয়। আমার মনে হইল যেন সে যাইতে পারিলে এখনি উড়িয়া পালায়।" ভালমন্দ কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সারাটা বিশ্বজগত যেন আমার কানের কাছে ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছিল।

(৫)

কিছুকাল উদভ্রান্ত ভাবে ফুলবাগানে পায়চারি করিলাম, মনে সন্দেহের অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে ছিল। অধিকক্ষণ সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলাম না। একটী গোলাপফুল শাখা সমেত নত হইয়া আমার পথ রোধ করিয়াছিল, অন্যমনস্ক ভাবে সেই ফুলটী তুলিয়া লইলাম। ধীরে ধীরে কটক পার হইলাম। [illegible] বাহের আনাগোনা [illegible]তে ছিল। [illegible] একটী সোণালী রঙের পাড়ের মত দেখা [illegible] আমি অতিক্রতপদে নদীর তীরে উপস্থিত [illegible] খেয়ার নৌকা তখন পরপাড়ে। দেখিলাম [illegible] একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাহিয়া এপাড়ে আসি[illegible] খেয়ার নৌকা ঘাটে আসিবার পূর্ব্বেই কুহেলীর [illegible] পবন" আসিয়া ঘাটে লাগিল। আমি বলিলাম "কুহেলী তুই এত নিষ্ঠুর, আজ দুদিন ধরিয়া আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা বন্ধ করিয়াছিস।" সে অতি বিনীতভাবে বলিল "দাদা বাবু ক্ষমাকর" মা বড় কাহিল; দিনে দুবেলা তার কোমরে বাতের তৈল মালিশ করিতে হয়, তাই যাইতে পারি নাই। আজ তোমাদের বাড়ী যাইতেছিলাম বোধ হয় দিদিবাবু আমার উপর রাগ হইয়াছেন তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব, তোমাদের না দেখিলে একদণ্ডও কাটেনা; ঈশ্বর জানেন এ দুটাদিন—[illegible] বলতে কুহেলী কাঁদিয়া ফেলিল। তার জল ভরা চোখ শিশির ধৌত অপরাজিতার মত বাতাসে নড়িতে[illegible] আমি বলিলাম "আজ প্রায় সন্ধ্যা হইয়াগিয়াছে [illegible] কাজ নাই। কাল যাস চল একটু জলের হাওয়া খাইয়া আসি।" কুহেলী তার ভাসা ভাসা চোখ দুটী আমার মুখের উপর কেন্দ্রীভূত করিয়া বলিল "দিদিবাবুর [illegible] প্রাণ বড় কেমন করিতেছে।" আমি বলিলাম "কুহেলী আজ তোকে একটা কথা বলিব, সেটা অতি গোপনীয় [illegible] হাল আমার কাছে দে, নদীর মধ্যে এমন জায়গায় [illegible] কথাগুলি বলিব যেখানে কেবল তুই আর আমি আর কেহই নয়।" কুহেলী চমকিয়াগেল, পরক্ষণেই [illegible] একটু সামলাইয়া বলিল "কেন হালত আমিই ধরিয়াছি" আমি বলিলাম 'হেমন্তের ভাটিয়াল নদী উজান বাহিয়া যাওয়া কি তোর সাধ্য?" কুহেলী যেন একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল "বল কি? তোমাদের এ[illegible] নদীতে স্রোত কোথায়? আমাদের পাহাড়ে নদীতে স্রোতে হাতী ভাসিয়া যায়, আমরা সেগুলি সর্ব্বদা পার হই।" কুহেলীই হাল ধরিল।

দুই পাড়ে বেলা ভূমি [illegible] ভুজঙ্গের ন্যায় আঁকিয়া বাকিয়া চলিয়াছে, মধ্যে ক্ষীণ স্রোত [illegible] একটী রূপার বেণীর মত ধীরে ধীরে [illegible]

যাইতেছিল। আমি একখানি ভাসমান মেঘখণ্ডের দিকে চাহিয়া বলিলাম "দেখ কুহুলি, কি সুন্দর মেঘখানা আমাদের দিকে উড়িয়া আসিতেছে।" কুহেলী বলিল "দাদাবাবু! কোন দিন পাহাড় দেখ নাই, দেখিতে যদি তবে বুঝি এসব আর ভাল লাগিত না।" এই বলিয়া সে দূরবর্ত্তী কলঙ্ক রেখার পানে চাহিয়া রহিল। আমি তাহার সেই উদাসদৃষ্টি দেখিয়া তাহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিলাম। ননী সত্য কথাই বলিয়াছিল—কুহেলী পর্ব্বতের প্রেমে আত্মহারা!

ধীরে ধীরে ধীরে অন্ধকারে পা ফেলার মত অতি সন্তর্পণে কুহেলীর মনের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলাম। বলিলাম "কুহেলী বর্ষাকালে তোরা কোথায় থাকিস?" কুহেলী বলিল—পর্ব্বতে, আমি বলিলাম—খাস কি? কুহেলী—কেন তথায় কি কারও কিছুর অভাব আছে! বনের ফল ঝরনার জল। আমি বলিলাম—তোর কাছে কোন জায়গাটা পছন্দের, পর্ব্বত না আমাদের দেশ? কুহেলী আমার কথায় কাণ না দিয়া বলিল "দেখ দাদাবাবু সেই মেঘটা আমাদের পিছন ফেলিয়া পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।"

কি ব্যাকুলতা! দেখিলাম পারিলে এই মুহূর্ত্তেই উড়িয়া পালায়।

আমি বলিলাম কুহেলী মিছে কেন বেদের তাঁবুর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াস, আমাদের বাড়ীতে থাক্‌না, সুখে থাক্‌বি। কুহেলী যেন আমার কথা শুনিয়াও শুনিল না। "বর্ষা আসিলে আমরাও এই মেঘের মতো আবার পাহাড়ে চলিয়া যাইব, আবার সেই শাল গাছের ডালে আমাদের সাধের ময়ুর গুলির নাচ দেখিব। দাদাবাবু তথায় যে কত রকম ফুল ফুটে, আমরা মালা গাঁথিয়া নদীস্রোতে ভাসাইয়া দেই, সেগুলি ভাসিতে ভাসিতে, তোমাদের দেশে চলিয়া আসে, আসিবার সময় বলে দেই, হেমন্তে তোদের সঙ্গে আবার দেখা হবে, কৈ নদীর ধারে খুঁজিয়া সেই ফুলের মালা একটিও ত পাইলাম না। তোমাদের দেশের ফুলের চেয়ে সে ফুল কত সুন্দর। ঝরণার জল কত মিষ্ট, পাহাড়ে নদীগুলিতে [illegible] কত সুখ! হায় কবে বর্ষা আসিবে!"

এত আবেগ এত ব্যাকুলতা মানুষের চক্ষে আর দেখি নাই, ননী সত্যই বলিয়াছে কুহেলী পর্ব্বতের প্রেমে আত্মহারা। তবে মিছে কেন বনের পাখীকে খাঁচায় পুরিতে যাই! উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলাম। সারা শব্দ নাই, পায়ের তলে হেমন্তের নদী কল কল করিতেছিল। মাথার উপর মেঘের পাহাড় ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, সে কত রকমের কত রঙ্গের, সোণালী রূপালী।—কোনটী শিবের জটার মত পিঙ্গল, কোনটী হাতীর শুঁড়ের মত, কোনটী সিংহের কেশরের মত, কোনটী জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত সুপ্তমেঘের অঙ্গে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে। দূর দিগন্তে কলঙ্ক রেখার পাশে একটি সোণালী রঙ্গের মেঘ রাম ধনুর মত বাঁকিয়া পড়িয়াছে। দেখিতে দেখিতে চলিতেছিলাম, কুহেলী কত রাজপুতনা, কত মারবার, কত মরুভূমি, কত পাহাড় পর্ব্বতের গল্প ঘটাই করিল। একটি বালিকার মুখে বহু দূর দেশের কাহিনী শুনিতে শুনিতে যেন আত্মহারা হইলাম। এক একটি করিয়া স্বপ্নরাজ্যের দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, বহুকাল-গত-স্মৃতি-জাগাইয়া দিয়া হেমন্তের জলতরঙ্গ কাণের কাছে বীণা বাজাইতেছিল।

আমি বলিলাম "কুহেলী কত দেশইত দেখিলি, বল দেখি আমাদের দেশের চেয়ে আর কোনটী তোর কাছে এম্‌নি ভাল লাগিল।" কুহেলী তখনও দিগন্তের পর্ব্বত ছায়ার উপর নির্নিমেশ দৃষ্টি বুলাইতেছিল, সে বলিল দাদাবাবু যদি কোনদিন পর্ব্বত না দেখিতাম তাহাহইলে হয়ত তোমাদের ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইত।" আবার সেই পাহাড়ের কথা! হাসিয়া বলিলাম কেন; এখানে প্রচুর মাংস পাওয়া যায়না বলিয়া কি? কুহেলী বলিল দূর তাকি? এত এত বনফল থাকিতে মাংস কেন? মাংস খায় বর্ব্বর লোকেরা। আমি বলিলাম—"বেদেরা কি ভদ্দর লোক?" কুহেলী—"না হউক কিন্তু আমার যেন মাংস খাইতে কেমন ঘৃণা করে, ছিঃ!" আমি বলিলাম কুহেলী! তোর ধরাণ করান চাল চল্‌তি সব বাঙ্গালীর মেয়ের মতো, বোধ হয় তুই আর জন্মে বাঙ্গালীর মেয়েই ছিলি, আচ্ছা বল দেখি তোর গত জন্মের কথা কিছু মনে পড়ে কি? কুহেলী দিগন্তের

পানে ক্ষুদ্র অঙ্গুলিটী তুলিয়া বলিল কুয়াসার ঢাকা পাহাড়ের মত আধ আধ মনে প'ড়ে—মনে পড়ে,আমাদের বাড়ীর সামনেই এইরূপ একটি নদী ছিল, আমাদের বাড়ীতেও দালান কোঠা অনেকছিল। বাড়ীতে পূজো হতো, সিংহের পিঠে একটি মূর্ত্তি ছিল, তার দশহাত, আর মনে পড়ে—মার কোলে উঠিয়া প্রতিমা দেখা—আর —আর—আমার একটি বড় বোন ছিল—দুইজনে নদীর ধারে বেড়াইতে যাইতাম। তার কথা শেষ হইতে না হইতেই আমি বলিলাম কুহেলী তুই নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর মেয়ে, দুরন্ত বেদেরা তোকে শিশুকালে চুরি করিয়া-নিয়াছে ; আমি যাই, এই মুহূর্ত্তেই সেই দস্যুদিগকে পুলিশে ধরাইয়া দিব, তোকে উদ্ধার করিব।" চকিতা হরিণী বাঘের মুখে পড়িয়া যেমন ভাবে সেই আততায়ীর মুখপানে তাকায়, তেমনি করিয়া কুহেলী আমার দিকে একবার মাত্র তাকাইল, পরক্ষণেই হাতছাড়িয়া নদীর জলে লাফাইয়া পড়িল। যতদূর সম্ভব ব্যস্তভাবে কুহেলী সাঁতার কাটিতেছিল, আমার বোধ হইতেছিল, যেন তরঙ্গের উপর একটি ফুলের মালা ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে সে নদী পাড় হইয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে হেমন্তের কুয়াসা কুহেলীকে আপন অঙ্গে মিশাইয়া লইল।

আর কিছুই দেখিতে পারিলাম না। চারিদিকে কেবল ধূয়ার পাহাড়, মেঘের আড়াল থেকে সুরবালাগণ একটি একটি করিয়া সাঁঝের বাতি জ্বালিয়া দিতেছিল। হেমন্তের বায়ু আমার কাণের কাছদিয়া কি যেন একটা অস্পষ্ট বেদনার গীত গাহিয়া হাহা ক'রিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

(৬)

সারারাত্র নিদ্রা নাই ছটফট করিয়া কাটাইলাম। স্বপ্ন আমার তন্দ্রাবিজড়িত চোখের সামনে যেন নানা রকমের বিচিত্র দৃশ্যপট খুলিয়া দেখাইতেছিল। এই দেখিতে-ছিলাম কুহেলী যেন পর্ব্বত শৃঙ্গে বসিয়া বীণা বাজাইতেছে, ঐ সে নির্ঝরিণীর তীরে দাঁড়াইয়া আনন্দে করতালী দিতেছে। ঐ শুনি অধিত্যকা প্রদেশে তার গান, ঐ আবার হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া এক হাতে অশ্রু মুছিতেছে। উদাস নয়ন কখনও বা গিরিশৃঙ্গ ছাড়িয়া শালতরু কখনও বা শালতরু ছাড়িয়া গিরিশৃঙ্গ পানে উঠিতেছে পড়িতেছে।

দুঃস্বপ্নে দুর্য্যোগময়ী রজনী কাটিয়া গেল। অতি প্রত্যুষে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় প্রান্তরাভিমুখে ছুটিলাম। ধূসর হিম-চন্দ্রাতপে সারাটা প্রান্তর ঢাকা। গাছ পালা সব তুষার স্তূপের মধ্য হইতে এক এক বার যেন পাখঝাড়া দিতেছে। নদী পাড় হইতে না হইতেই সূর্য্য উঠিল। দেখিতে দেখিতে ধূয়ার প্রাচীর কোথায় উড়িয়া গেল। দেখিলাম শূন্য প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে উত্তরে বায়ু আমার কাণের কাছে ঘুরিয়া হা হা করিতেছিল। স্থানে স্থানে বেদেদের পাকের চুলা ও ইন্ধনাদি পড়িয়া রহিয়াছে, অশ্বখুর মথিত দূর্ব্বাদল তাহাদের পলায়নের সাক্ষ্য দিতেছে। দুইটা চলন্ত ট্রেণ পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে যেমন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় তেমনি ভাবে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি থপ করিয়া এক জায়গায় বসিয়া পড়িলাম। আমার মাথার উপর দিয়া একদল হাঁস হাঁহাঁ করিয়া উড়িয়া গেল।

গ্রাম জুড়িয়া রাষ্ট্র হইল, বেদের দল কুহেলীকে লইয়া পালাইয়াছে। বাবা সে দিনের মত দরবার বন্ধ করিলেন। মা আহার করিলেন না; আর ননী ? ননীর কোন সন্ধানই পাইলাম না, সে কোথায় কোন গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া বাণবিদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

ছি ! ছি !

ভাল নাকি বাসি নাই
তাহারে জীবন ভরি,
তারে নাকি ডাকিনাই
কখনো আদর করি !
বুঝাতে যে নাহি ভাষা
প্রাণে তারে ভালবাসি
মুখের আদর ছি ! ছি !
তাই নাকি এত বেশী !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

সাহিত্য প্রচারে প্রাচীন ইয়ুরোপের রাজবিধি।

আমরা কথায় কথায় বিলাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কথা বলি এবং এদেশে সময় সময় যখন মুদ্রাযন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর নিয়মের কথা উঠে, তখন রাজ পুরুষদিগের উপর দোষারোপ করিয়া থাকি। বাস্তবিক এরূপ দোষারোপ করা আমাদের পক্ষে কতদূর সঙ্গত তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। মুদ্রাযন্ত্র ও সাময়িক পত্র এ দেশের জিনিস নহে। উহা ইউরোপীয় সভ্যতার একটী উপকরণ; সুতরাং ইহার স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা দমনে কঠোরতার ব্যবস্থাও সেই সকল সভ্য দেশেরই সামগ্রী।

মুদ্রাযন্ত্রের ও সাহিত্য প্রচারের বিরুদ্ধে সময় সময় এদেশে যে কঠোর বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইয়ুরোপের প্রাচীনতর সভ্য দেশ সমূহের কঠোরতম বিধির সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না।

আমাদের প্রাচীন ভারতে সাহিত্য প্রচারের কোন বিধি নিয়ম ছিল না। প্রাচীন ভারতে রাজার উপর ব্রাহ্মণের অসীম প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণ ব্যবস্থাপক যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহাই রাজবিধি বলিয়া গণ্য ও মান্য হইত। সেই লিপিবদ্ধ সাহিত্য রাজার এবং রাজ্যশাসনের বিরোধী হইলেও তাহা রাজা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেন। এই বিধি অনুসারে চার্ব্বাক মতাবলম্বীগণ দণ্ডনীয় ছিলেন। তাঁহাদের মুখবন্ধ করা যাইত, তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াও দেওয়া যাইত। প্রাচীন ভারতে ইহার অধিক এ সম্বন্ধে কোন বিধি নিয়ম প্রচলিত ছিল, দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ইয়ুরোপে সাহিত্য প্রচার লইয়া এবং মধ্য যুগের ইয়ুরোপে মুদ্রাযন্ত্র লইয়া যে সংগ্রাম চলিয়াছিল, এই প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব।

ইয়ুরোপে গ্রীস সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেই প্রাচীন গ্রীসে দুই প্রকার দোষে গ্রন্থকারদিগকে দণ্ডনীয় করা হইত। (১) প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী লেখার জন্য ও (২) ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিকর লেখার জন্য। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনীক পেতাগোরাসকে প্রথমোক্ত অপরাধে অপরাধী করা হইয়াছিল। তিনি দেববাদ বিশ্বাস করিতেন না। তাহার গ্রন্থগুলিও সেই মতের বিরোধী ছিল। এই কারণ ৪১১ খ্রী পূঃ অব্দে তাহার বিচার হয়। বিচারে তিনি নির্ব্বাসিত হন এবং তাঁহার লিখিত পাণ্ডুলিপি সমূহ অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়।

দ্বিতীয় দোষ অনুসারে গ্রীসের কতকগুলি নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ নাটক গুলিতে অনেক জীবিত সম্ভ্রান্ত লোকের গ্লানিকর বিষয় লিপিবদ্ধ ছিল; কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে ঐ নাটকগুলি মূল্যবান সাব্যস্ত হওয়ায় রাজকীয় পরীক্ষকগণ ঐ নাটকগুলির অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। সাধারণে ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। প্লেটো তাঁহার একজন প্রধান শিষ্যকে সাহিত্যের হিসাবে এই গ্লানিকর একখানা নাটক পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপ্রচারক ক্রাইস্তোম এই জঘন্য নাটকের একখানা পাঠ করিতে একাধিক রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

স্পার্টার অধীবাসীগণ কবি আর্কিয়োলোকাস কে তাঁহার কবিতা পুস্তকের দোষ হেতু নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাহার পুস্তক কি দোষে দুষ্ট ছিল, তাহা সাধারণে প্রকাশ হয় নাই।

গ্রীক হইতে সভ্যতা রোমে যায়। নেবিয়স গ্রীক সাহিত্যের আদর্শে রোমে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। নেবিয়সের তীব্র শ্লেষ পূর্ণ কবিতা যখন রোমের আভিজাত্য সম্প্রদায় কে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমন করিল, তখন রোমেও গ্লানিপূর্ণ রচনার নিষেধ আইন বিধিবদ্ধ হইল। আইনের প্রভাবে নেবিয়স কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

রোম সম্রাট অগষ্টাসের সময় লোক নিন্দা ও দেব নিন্দা সম্পর্কীয় গ্রন্থ সকলই কেবল দগ্ধ করা হইয়াছিল এবং তৎতৎ গ্রন্থকারদিগকে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। এই সময় রোমীয় সাহিত্যে দুর্নীতি বিষয়ে অনেক গ্রন্থ

রচিত হইয়া রোমীয় সাহিত্যকে গ্রীক সাহিত্যের ন্যায় কলঙ্কিত করিয়াছিল। এই দুর্নীতির প্রশ্রয়ে যখন রাশি রাশি অশ্লিল গ্রন্থ বাহির হইতে লাগিল, তখন অক্তেবিয়াস সিজার ওবিদ নামক জনৈক কাব্য লেখককে তাহার অশ্লিল গ্রন্থ প্রচার জন্য নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

রোমে সাধারণ তন্ত্র তিরোহিত হইয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক বিপ্লবকারী মত প্রচারক গ্রন্থের সহিত অনেক সৎ সাহিত্যও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরোধী মত সম্বলিত গ্রন্থগুলি পরীক্ষার জন্য একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ঐ সভা হইতে গ্রন্থ পরীক্ষা হইত এবং গ্রন্থকারগণ দোষী সাব্যস্ত হইলে দণ্ডনীয় হইতেন। অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজকগণ ও মন্ত্রী সভা কোন্ গ্রন্থ পাঠ্য ও কোন্ গ্রন্থ অপাঠ্য, তাহাই কেবল নির্ণয় করিয়া দিতেন। অতঃপর রোমের পোপ রাজকীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া বসিলে—তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধীন যে পরীক্ষাগার নিযুক্ত হয়, তাহাতে কোন পুস্তকে কোন আপত্তিকর কথা থাকিলেই তাহা দগ্ধ করিবার নিয়ম হয়। এই নিয়ম সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে বিষম অনিষ্ট কর হইয়াছিল। এবং এই নিয়মে রোমের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও অনলগর্ভে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়া ছিল। পঞ্চম মার্টিনের শাসন কাল পর্য্যন্ত এই কঠোর নিয়ম অব্যাহত ছিল।

পঞ্চম মার্টিন এ সম্বন্ধে যে ঘোষণা প্রচার করেন তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে কেবল খ্রীষ্টীয় মত বিরোধী গ্রন্থ এবং তাহার গ্রন্থকারগণই দণ্ডার্হ। এই শাসন ব্যবস্থা স্পেনেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

অতঃপর ১৬৪৫ খ্রীঃ অব্দে ট্রেণ্টে গ্রন্থ বিচার সভার অধিবেশন হয়। ৪র্থ পায়স এই সময় রোমের পোপের পদে সমাসীন। এই সভা পুস্তক পুস্তিকা সম্বন্ধে দশটী নিয়ম অবধারিত করেন। এই নিয়মে স্থির হয়—অগ্রে সভা পাণ্ডুলিপি পরিদর্শন করিবেন। পাণ্ডুলিপিতে আপত্তিকর বিষয় থাকিলে তাহা প্রকাশ হইবে না। নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিকা রাখা হইবে। সে তালিকা দুই প্রকারের। (ক) সর্ব্বাংশে দোষিত, (খ) সংশোধন যোগ্য। নিষিদ্ধ গ্রন্থ প্রচারে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ১৬৫৯ খ্রী অব্দে ৬১ জন মুদ্রাকর নিষিদ্ধ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দণ্ডিত হন ও তাহাদের মুদ্রিত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়। এই কঠোর আইন ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের উন্নতির মূলে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল। ৫ম পায়াসের মৃত্যুর পর এই কঠোর নিয়ম কতক পরিমাণে শিথিল হইয়া-যায়।

অতঃপর আমাদের ইংলণ্ডের কথা। অষ্টম হেনরীর সময় সকল প্রকার পুস্তকই দগ্ধ করা হইয়াছিল। তারপর এডওয়ার্ডের রাজত্বে কাথলিক গ্রন্থ সমূহ, রাণী মেরীর রাজত্ব সময় প্রটেষ্টেণ্ট গ্রন্থ সমূহ এলিজাবেথের সময় রাজনৈতিক গ্রন্থ সমূহ এবং ১ম জেমস্ ও তাঁহার পুত্রদিগের সময় ব্যক্তি বিশেষের গ্লানিকর গ্রন্থসমূহ দগ্ধ করা হয়। রাণী এলিজাবেথ কেবল গ্রন্থ দগ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই. এক জন গ্রন্থকারের দক্ষিণ হস্তটী—যাহা দ্বারা সে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল—কাটীয়া ফেলিয়াছিলেন এবং অন্য এক গ্রন্থকারের প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রথম চার্লসের সময় ইংলণ্ডে পুস্তক প্রণয়ন বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। পরীক্ষকগণ যে পুস্তক দোষনীয় বলিয়া মনে করিতেন তাহা মুদ্রিত হইত না। অতঃপর ঘাতকের কুঠারাঘাতে ১ম চার্লসের পতন হইলে ইংলণ্ডে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় কবিবর মিণ্টন পুস্তক প্রচারে স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাহার আন্দোলনে গ্রন্থ পরীক্ষক মবেট তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন। মাবেটের অনুরোধে সাধারণ তন্ত্রের অধিপতি ক্রমওয়েল গ্রন্থ পরীক্ষার কঠোরতা হ্রাস করিয়া দেন।

সাধারণ তন্ত্র উঠিয়া গিয়া পুনরায় রাজ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে নূতন মুদ্রাযন্ত্র আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইনের নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পুস্তক পরীক্ষক নিযুক্ত হন। মুদ্রা যন্ত্রের জামিন প্রচলিত হয়। ২০ জন মুদ্রাকরকে প্রধান মুদ্রাকর করা হয়। তাহারা জামিন দিয়া ২০টী যন্ত্র মাত্র চালাইবেন স্থির হয়। লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত

অন্য কোনও স্থানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইতে পারিবে না। নিষিদ্ধ পুস্তক মুদ্রিত করিলে মুদ্রাকরের কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

এই আইনের কঠোরতায় মিল্টনের Paradise Lost উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। পরীক্ষক গণ Paradise Lost কে নিষিদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বিধি বিলুপ্ত হয় এবং ইংলণ্ডীয় মুদ্রা যন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করে।

ইহার পর ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রের উপর পুনরায় কড়াকড়ি আইন প্রবর্ত্তিত হয়।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে টাইমস পত্র প্রকাশিত হয়। এই সময় ইংলণ্ডেসংবাদ পত্রের উপর দেড় পেনি করিয়া ষ্টাম্প কর (Postal Revenue) লওয়া হইত। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কর বৃদ্ধি করিয়া দুই পেনি করা হয়। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাকমাশুল তিন পেনি করিয়া ধার্য্য হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদ পত্রের প্রত্যেক পাতার উপর চারি পেনি করিয়া কর ধার্য্য হয়। কাগজের উপর ও উচ্চ কর ধার্য্য ছিল। ইহাতেও সংবাদ পত্রের প্রভাব হ্রাস হইল না দেখিয়া সংবাদ পত্রের আয়ের পউর টেক্স ধার্য্য হইয়াছিল, প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের উপর চারি শিলিং করিয়া কর লওয়া হইত। এই অসংখ্য প্রতিবন্ধক উপেক্ষা করিয়া ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্র ও ইংরেজী সাহিত্য জগতে জয় লাভ করিয়াছে।

১৮৩১ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫ বৎসরে ইংলণ্ডে প্রায় ৭ হাজার সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছিল এবং প্রায় ৫০০ শত ব্যক্তিকে আর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল।

বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে ভারতবর্ষে ইংরেজের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দানও স্বাধীনতা গ্রহণের ভিতর অভিনবত্ব কিছুই নাই। সুতরাং ইহার জন্য কাহাকে দোষী করা বা প্রশংসা করাও সমীচীন নহে।

ইউরোপে সংবাদ পত্র ও সাহিত্য লেখক দিগের উপর যেরূপ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে, জগতের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল।

"ফাগুন"

(১)

নন্দন বন সুষমা মাখিয়ে
ফাগুন এসেছে আজি;
নিখিল বিশ্ব অর্ঘ্য রচিছে
ভরিয়া কানন সাজি।
গুঞ্জরি আজ উঠিছে ভৃঙ্গ,
মঞ্জরী পরা তরুর অঙ্গ,
ভৃঙ্গের তানে পাপিয়ার গানে,
ধরণী পুলকে বিবশা;
নন্দন হ'তে লক্ষ্মী এসেছে
ধরণী করিতে সরসা।

(২)

সাগরে জানাতে এ শুভ বারতা
যেতেছে তটিনী বহিয়া,
ছুটিছে সমীর তটিনীর মধু
পরশন টুকু লইয়া।
রূপের লহর খেলিছে আকাশে,
পীযুষের ধারা ঝরিছে বাতাসে,
কাননে কাননে ফুলের পাথায়
জ্যোতি রূপে পরকাশি
লক্ষ্মী বুঝিবা বিশ্বে এসেছে
ঢালিছে সুষমা রাশি!

(৩)

বরণ করে'নে ফাগুন এসেছে
এসেছে আনন্দ রাশি,
ফুল্ল ফুলদল কাননে কাননে
অধরে রেখেছে হাসি।
নব পল্লবে মেলি অঞ্চল,
শুভ্র কমলে রাখি পদতল,
পথিকের মত এসেছে সে আজি
অতিথির বেশে সাজি;
বন্ধ্যা ধরার বুকের দুলাল
বন্ধু এসেছে আজি।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

কোষ্ঠী বিচারে বিরোধ ও সামঞ্জস্য।

(মহারাজা সূর্য্যকান্তের কোষ্ঠী)

আজকাল অনেক মাসিক পত্রিকায় ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচনাকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয়বিধ জ্যোতিষে ব্যুৎপন্ন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সুদীর্ঘ কাল অবজ্ঞাত ফলিত জ্যোতিষেরদিকেও ক্রমশঃ আধুনিক শিক্ষিত দিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে।

গণিত-জ্যোতিষে গণনা প্রণালীর বিভিন্নতা থাকিলেও ফলে কোন প্রভেদ নাই। লীলাবতীর বর্গমূল বা ঘন মূলে অঙ্ক কষিবার যে প্রণালী আছে, তাহা আধুনিক পাটীগণিতের প্রণালী হইতে বিভিন্ন হইলেও উভয়েরই ফল তুল্য। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষে প্রতি পদে বিরোধ দৃষ্ট হয়। ফলিতে শনি মঙ্গল প্রভৃতিকে অনেকেই প্রধান পাপ গ্রহ রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভগবান পরাশর কোন গ্রহেরই শুভত্ব বা পাপত্ব স্বীকার করেন নাই। শুভস্থান ও পাপ স্থানের অধিপতি অনুসারে তিনি গ্রহদিগের শুভত্ব বা পাপত্বের বিধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৃষ লগ্নে যাহার জন্ম তাহার পক্ষে শনি গ্রহ—কেন্দ্র ও ত্রিকোণাধিপতি বলিয়া প্রধান রাজ যোগ কারক। এই প্রকার শত শত বিরোধের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এই জন্য ফলিত জ্যোতিষে জ্ঞান লাভ বড়ই দুরূহ ব্যাপার। বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন, বহু মতের অনুশীলন, ভূয়োদর্শন এবং সূক্ষ্ম গণিত অবলম্বনে বিশেষরূপে মস্তিষ্ক চালনা ব্যতীত এক নিঃশ্বাসে ফলিত জ্যোতিষের ফলাফলের নিশ্চয়তা হয় না। বৃহজ্যোতিষার্ণবে উক্ত হইয়াছে—"যিনি দুস্তর হোরা শাস্ত্ররূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যিনি পাটীগণিত, বীজ গণিত, এবং গণিত জ্যোতিষ (সূর্য্য সিদ্ধান্তাদি) আয়ত্ত করিয়াছেন এবং যিনি গোলশাস্ত্রে পারদর্শী, এক মাত্র তিনিই ভাগ্য ফল কথনে সমর্থ। ইহার অভাবেই আমরা অহরহঃ বহু জ্যোতিষির গণনার ফল ভালরূপে মিলিতে দেখি না এবং ফলিত জ্যোতিষ কিছুই নহে বলিয়া সে শাস্ত্রের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করি।

জাতকের জন্ম কুণ্ডলীর নয়টী গ্রহ সংস্থান ও দ্বাদশ ভাবের অধিপতির বিবিধ সম্বন্ধ অনুসারে পরস্পর বিরোধী অনেক শ্লোক প্রত্যেক জাতক সম্বন্ধেই বাহির হয়। অনেক সময় আপাত দৃষ্টিতে একরূপ ফলের কল্পনা করা যায় কিন্তু খুব অভিনিবেশ সহকারে সূক্ষ্ম গণিত অবলম্বনে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে অনেক বিরোধেরই সমাধান হয়।

তবে একথা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে বিভিন্ন গ্রন্থ কর্ত্তার প্রধান গণনা প্রণালীর সূত্র সমূহের যে বিরোধ, তাহার সমাধান হইতে পারে না। যেমন সাধারনতঃ জাতকালঙ্কার, বৃহজ্জাতক প্রভৃতিতে পাদ ত্রিপাদ দৃষ্টি প্রভৃতির উল্লেখ আছে; কিন্তু লঘুপারাশরীকার কেবল পূর্ণ দৃষ্টিই গ্রাহ্য করিয়াছেন। জৈমিনী সূত্রকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীতে গ্রহের দৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন। নীলকণ্ঠীতাজক, হায়ণ রত্ন প্রভৃতি তাজক গ্রন্থে অষ্টম স্থানে দৃষ্টি স্বীকৃত হয় নাই। অন্যান্য গ্রন্থে অষ্টমে ত্রিপাদ দৃষ্টি স্বীকৃত হইয়াছে। তাজক গ্রন্থে অধিকন্তু একাদশ স্থানে দৃষ্টি স্বীকার করা হইয়াছে এবং স্নেহ দৃষ্টি বৈর দৃষ্টি প্রভৃতিদৃষ্টির ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। শীঘ্রগতি গ্রহ ও মন্দগতি গ্রহের তাৎকালিক স্ফুট অনুসারে ইত্থশালাদি যোগও কথিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এসব অন্যান্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত গণনার সূত্র সম্বন্ধে যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার সমাধান হইতে পারে না, কিন্তু ফল সম্বন্ধে বিরোধ দৃষ্ট হইলে অনেক স্থলেই তাহার মীমাংসা হইতে পারে। এই বিরোধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কোন একটী জাতকের জন্ম কুণ্ডলীর আলোচনা করা যাইতেছে।

এই জন্মকুণ্ডলীর জাতক ১৭৭৩ শকাব্দার ২৪শে মাঘ পূর্ণিমা তিথিতে বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে ৪০ পল বেলার সময় ভূমিষ্ঠ হন। গ্রহসংস্থান পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

এই গ্রহ সংস্থান ও লগ্ন হইতে দেখা যাইতেছে:—

(ক) ভাগ্য বিচার

(১) লগ্নের অধিপ ত নীচস্থ এবং লগ্নে পাপগ্রহ রবি। লগ্নে পাপগ্রহ থাকিলে এবং লগ্নাধিপতি বলহীন হইলে

১৭৭৩।৯।২৩।০।৪০

মানুষ মানারূপ আতঙ্কাকুল ও আধি ব্যাধিতে প্রপীড়িত হয়। প্রমান—মূর্ত্তৌ চেৎক্রুর খেটস্তদনুচস্তনুপতিঃ স্বীয়-বীর্য্যে নহীনঃ। নানাতঙ্কাকুলঃ স্যাদ্ ব্রজতি হি মনুজো ব্যাধি মাধি প্রকোপম্॥

(২) ধনাধি পতি নীচস্থ—গ্রহ নীচস্থ হইলে ভাবের বিনাশক হয়, সুতরাং ইহার ধনস্থান অতি খারাপ। "নীচস্থ রিপু গেহস্থ গ্রহো ভাব বিনাশকৃৎ।"

(৩) সেইরূপ আয়াধিপতি ও সুখাধিপতি নীচস্থ হওয়ায় পূর্ব্বোল্লিখিত প্রামাণানুসারে আয় ও সুখের আশা কিছু মাত্র নাই।

(৪) গ্রহ তুঙ্গী হইলে বা কেন্দ্রে শুভগ্রহ থাকিলে তাহাতে ভাগ্য যোগ হয়। পক্ষান্তরে কেন্দ্রে শুধুই পাপগ্রহ থাকিলে জাতকের ভাগ্য শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। * ইহার কোন গ্রহ তুঙ্গী নাই, কেন্দ্রে শুভ গ্রহ নাই, অপর পক্ষে শনি মঙ্গল প্রভৃতি পাপগ্রহগুলি বর্ত্তমান, সুতরাং ইহার অদৃষ্টাকাশ ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন।

(৫) যে ভাবাধিপতি ব্যয়স্থ হয় সেই ভাবের নাশ হয়। ইহার ভাগ্যাধিপতি ব্যয়স্থ হওয়ায় জাতকের আরও একটী ভাগ্য নাশ যোগ হইয়াছে। ×

(খ) **পুত্রস্থান** বিচার করিতে হইলে লগ্ন চন্দ্র, ও বৃহস্পতির পঞ্চমের বিচার করিতে হইবেক। ভগবান পরাশর বৃহস্পতির পুত্রকারকতা এবং পঞ্চমে বৃহস্পতির স্থিতি বা দৃষ্টিতে পুত্র প্রাপ্তি যোগ হয় বলিয়াছেন। পারিজাতকারও সেইরূপ বলিয়াছেন।

পুত্রস্থান গতে জীবে পরিপূর্ণ বলান্বিতে।
লগ্নেশে বলসংযুক্তে পুত্র যোগা ইমেস্মৃতাঃ॥

১। এই জাতকের লগ্নের পঞ্চমে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি চন্দ্রের পঞ্চমে বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির পঞ্চমাধিপতি ও বৃহস্পতিই, সুতরাং ইহার একাধিক পুত্র জন্মিবে দেখা যাইতেছে।

(গ) **আয়ুস্থানের** বিচার একটু বিস্তৃত না করিলে সাধারণের বোধগম্য হইবে না। জৈমিনী সূত্রকার অল্প, মধ্য, ও দীর্ঘ এই ত্রিবিধ আয়ুর উল্লেখ করিয়া ইহার প্রত্যেক ভেদে তিন প্রকার খণ্ডার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা অল্পায়ুর তিন খণ্ডা ৩২, ৩৬, ৪০ বৎসর মধ্যায়ু ইহার দ্বিগুন ৬৪, ৭২, ও ৮০ বৎসর। দীর্ঘায়ু, মধ্যায়ু ও অল্পায়ুর সমষ্টি ৯৬, ১০৮ ও ১২০ বৎসর। প্রথমতঃ জাতকের অল্প, মধ্য, ও দীর্ঘ ইহার কোন অধিকারে জন্ম তাহা নিরূপন করিয়া খণ্ডাধিকার নিরূপণ করিতে হয়। তৎপর, গ্রহস্ফুট প্রভৃতির অণুপাত দ্বারা স্ফুটায়ু নিরূপণ করা হয়।

যাহার দীর্ঘায়ু ৪০ বৎসর খণ্ডার অধিকারে জন্ম হয় তাহার মধ্যায়ু ৮০ বৎসর স্থির নিশ্চয় থাকে। অবশিষ্ট ৪০ বৎসরের গ্রহ স্ফুটাদির অনুপাত (ত্রৈরাশিক) লব্ধ ফল উক্ত ৮০ বৎসরে যোগ করিতে হয়।

লগ্নেশ, অষ্টমেশ, শনি চন্দ্র (চন্দ্র লগ্নে বা সপ্তমে থাকিলে "লগ্নচন্দ্র") এবং লগ্ন ও হোরা লগ্নের চর, স্থির, বা দ্ব্যাত্মক রাশিতে অবস্থিতি অনুসারে অল্পায়ু, মধ্যায়ু বা দীর্ঘায়ুর অধিকার নির্ণয় হয়। *

পূর্ব্বোক্ত রাশি চক্রে লগ্নেশ ও অষ্টমেশ চরস্থ হওয়ায় প্রথম প্রকারে দীর্ঘায়ু যোগ হইয়াছে। + লগ্ন ও চন্দ্র চরস্থ হওয়াতে দ্বিতীয় প্রকারেও দীর্ঘায়ু যোগ হইয়াছে। লগ্ন চরস্থ এবং হোরা লগ্ন কুম্ভে স্থিরস্থ হওয়ায় তৃতীয় প্রকারে মধ্যায়ু যোগ হইয়াছে। ++ প্রথম দুই প্রকারে দীর্ঘায়ু যোগ হওয়ায় ইহার দীর্ঘায়ু যোগই গ্রাহ্য। ‡

---

* একস্মিন্নপি কেন্দ্রে যদি সৌম্যো ন গ্রহো হন্তি যাত্রায়াম্।
জন্মন্যথবা কর্ম্ম ন ন ভদ্রুতং প্রাহুরাচার্য্যাঃ॥

× যদ্ যদ্ভাবপতি র্ব্বিলয় ভবনাৎ ষষ্ঠাষ্ট বিপকোপগঃ।
ভাবাদ্ভাব পতি র্য়াষ্ট রিপুগস্তদ্ভাব নাশং বদেৎ॥

* "আয়ুঃ পিতৃদিনে শাভ্যাং" "এবং মন্দ চন্দ্রাভ্যাং" "পিতৃ-কালতশ্চ" "পিতৃলাভগে চন্দ্রে চন্দ্রমন্দাভ্যাং"
+ "প্রথময়োরুত্তরয়োর্ব্বা দীর্ঘং"
++ "প্রথমদ্বিতীয়য়োরন্ত্যয়োর্ব্বা মধ্যং"
‡ "সংবাদাৎ প্রামাণ্যং" ইতি জৈমিনী সূত্রে।

লগ্নেশ ও অষ্টমেশ দ্বারা আয়ুঃখণ্ডা গ্রাহ্য হওয়ায় ৪০ বৎসরের খণ্ডার প্রাপ্তি এবং তাহার মধ্যায়ু ৮০ বৎসর স্থির নিশ্চয়। * অপর ৪০ বৎসরের অনুপাত লব্ধ ফল বর্ষ মাসাদি ৮০ বৎসরে যোগ করিতে হইবে। সুতরাং এই জাতক দীর্ঘায়ুর অধিকারী এবং ৮০ বৎসরের বেশী জীবিত থাকিবেন এইরূপ দেখা যাইতেছে। উপর্য্যুক্ত জন্ম কুণ্ডলীর গ্রহ সংস্থানের বিচার দ্বারা অবগত হওয়া গেল :—

(ক) জাতকের ভাগ্যস্থান অত্যন্ত খারাপ, তিনি অর্থাভাবে নানারূপ ক্লেশ পাইবেন এবং বিবিধ আধি ব্যাধিতে তাহাকে সর্ব্বদা আতঙ্কিত রাখিবে।

(খ) পুত্রস্থান উত্তম, একাধিক পুত্র লাভ করিবেন।

(গ) ইনি দীর্ঘায়ুর অধিকারী, ৮০ বৎসরের বেশী জীবিত থাকিবেন।

যে জাতকের জন্মকুণ্ডলী লইয়া আমরা বিচার করিতে বসিয়াছি, তাঁহার বাস্তব জীবনের ফল কিন্তু উক্ত বিচারাগত ফল হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। এই জন্ম কুণ্ডলী খানাকে একজন সাধারণ অজ্ঞাত লোকের জন্ম কুণ্ডলী ভাবিয়া যে ফলাফল ভবিষ্যতের জন্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, এখন বাস্তব জীবনে জাতক জীবনের অতীত ঘটনাবলী দ্বারা দেখা যাইতেছে—ইহার একবর্ণও জাতকের জীবনে ফলে নাই।

এক্ষনে তাহার অতীত জীবন আলোচনা করিয়া যদি এই গ্রহ সংস্থান ও লগ্ন হইতে সূক্ষ্ম বিচারে অন্যবিধ অতীত ঘটনানুযায়ী ফল মিলাইয়া বিরোধের সমাধান করা যায়, তবে ফলিত জ্যোতিষের সন্মান রক্ষা হইতে পারে এবং তাহার জটিলতা ও সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

যে জন্ম কুণ্ডলীর নকল আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দেশ বিশ্রুত স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের কোষ্ঠী হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং উপরে যে সকল কোষ্ঠী ফল দেখান হইয়াছে, তাহা যে বাস্তব জীবনে বিপরীত হইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

(ক) যাহাকে পূর্ব্ববিচারে ভাগ্যহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে তিনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ।

(খ) যাঁহার একাধিক পুত্র লাভ হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল, তিনি পুত্রাভাবে দত্তক পুত্র রাখিয়াছেন।

(গ) যিনি ৮০ বৎসরের ও বেশী কাল জীবিত থাকিবেন বলিয়া বিচার করা হইয়াছিল তিনি ৫৭ বৎসর বয়সে কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত মত জ্যোতিষের ভবিষদ্ বাণীতে ফলিত জ্যোতিষের প্রতি সকলেরই অনাস্থা হওয়া স্বাভাবিক। গণনায় এইরূপ বিরোধ হওয়ার সাধারণতঃ কয়েকটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) গণনাকারী ও গণনা প্রার্থীর ব্যগ্রতা।

(২) গণকের সূক্ষ্ম বিচার শক্তির ও ভূয়োদর্শনের অভাব।

(৩) উপযুক্ত আয়াস স্বীকারে গণকের আলস্য।

(৪) উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অভাব।

যাহা হউক আমরা এখন পূর্ব্বোক্ত বিরোধের সামঞ্জস্য করিতে অগ্রসর হইব।

জ্যোতিঃশাস্ত্রে আছে— যেমন যোগ অনুসারে অমৃত বিষে ও বিষ অমৃতে পরিণত হয়, সেইরূপ গ্রহগণ অনেক সময় স্বকীয় ফল পরিত্যাগ করিয়া যোগজ ফল প্রদান করে। (১)

(ক) এই কুণ্ডলীতে দুইটী গ্রহ নীচস্থ হওয়াতেই প্রবল রাজযোগ হইয়াছে। কোন গ্রহ নীচস্থ হইলে, নীচস্থ রাশ্যধিপতি ও তাহার সপ্তমাধিপতি গ্রহ চন্দ্র বা লগ্ন হইতে কেন্দ্রবর্ত্তী হইলে জাতকরাজা হয়। যথা—
নীচংগতো জন্মণি যোগ্রহঃস্যাওদ্রাশি নাথোঽপিতদুচ্চনাথঃ।
স চন্দ্র লগ্নাদ্ যদি কেন্দ্রবর্ত্তী রাজা ভবেদ্ধার্ম্মিক চক্রবর্ত্তী।

এস্থলে শনিও কুজনীচস্থ, নীচ রাশির অধিপতি চন্দ্র ও মঙ্গলও কুজের সপ্তমাধিপতি শনি,-চন্দ্র ও লগ্ন হইতে কেন্দ্রবর্ত্তী হইয়াছে সুতরাং উল্লিখিত প্রমাণানুসারে ইহার শ্রেষ্ঠ রাজযোগ হইয়াছে।

* লগ্নেশাষ্টমেশাভ্যাং যদায়ুর্যোগ সম্ভবঃ।
চত্বারিং শাব্দকং খণ্ডং সংগ্রাহ্যং বিজসত্তমঃ। ইতি পরাশরঃ।

(১) যথাহি যোগাদমৃতায়তে বিষং বিষায়তে যদ্যপি সর্পিষাসমং।
তথা বিহায় স্বফলানি খেচরাঃ ফলং প্রযচ্ছন্তিহি যোগজোদ্ভবং।

অপরঃ— দশম স্থানের অধিপতি শুক্র ধন স্থানে মিত্রক্ষেত্রে স্বীয় নবাংশে সুতরাং বর্গোত্তমে বলবান হওয়ায় প্রবল রাজযোগ হইয়াছে। প্রমাণ—যদি দশম গৃহের অধিপতি বলবান হইয়া কেন্দ্রে কোণে বা ধনস্থানে থাকে তবে সেই জাতক বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তিশালী রাজা হইয়া মদস্রাবী কুঞ্জর নিবহ দ্বারা সেবিত হয়। যথা—

দশম ভবন নাথঃ কেন্দ্রে কোণে ধনে বা।
বলবতি যদিজাতঃ ক্ষেত্র সিংহাসনে বা।
সভবতি নরনাথো বিশ্ব বিখ্যাত কীর্ত্তিঃ।
মদগলিত কপোলৈঃ সদা গজৈঃ সেবমানঃ॥

এইরূপ আরও শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা ইহার আরও রাজ যোগের সমর্থন করা যাইতে পারে; প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

জ্যোতিঃকল্পলতিকায় উক্ত হইয়াছে ধন স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক পরের ধনে ধনী যুবতীগত চিত্ত ইত্যাদি হয়

"পর ধনেন ধনী যুবতি চিত্ত পরোঽপি ভবেন্নরঃ।
রজত মাত্রধনী গত শৈশবে কৃশতণুরসিকো বহুজল্পকোঽবা॥"

শনি চতুর্থস্থ হইলে বান্ধবগণের সহিত কলহ হয় এবং জাতক পিতার ধন ভোগ করেনা ইত্যাদি। *

লগ্নে মকর সম্প্রাপ্তে কুম্ভে বা শুভ বর্জ্জিতে।

ইহার ধনস্থানে শুক্র ও চতুর্থে শনি থাকায় ইনি যে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পরের বিত্তে বিত্তবান হইবেন তাহা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত ছিল।

(খ) ইহা পুত্রস্থান সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে সেই বিরোধের এইরূপে সমাধান করা যাইতে পারে।

এই জাতকের উপপদ কন্যারাশি, তাহার সপ্তম মীনের অধিপতি বৃহস্পতি হইতে মঙ্গল নবমে হওয়ায় দত্তকপুত্র যোগ হইয়াছে। প্রমাণ— উপপদের সপ্তমভাব হইতে বা তাহার অধিপতি হইতে কিম্বা সপ্তাংশ হইতে নবমে মঙ্গল কিম্বা শনি থাকিলে দত্তকপুত্র যোগ হয়। যথা 'কুজশনৌ দত্তপুত্রঃ। জৈমিনীসূত্রা ১অঃ।৪।২৮ পরন্তু ইহার পত্নীর বন্ধ্যাযোগ ও দেখা যায়।

প্রমাণ—জাতকের জন্মলগ্ন কুম্ভ বা মকর হইলে যদি শনিদৃষ্টি করে তবে বন্ধ্যা হয়। ইহার জন্মলগ্ন মকর এবং শনির সেখানে পূর্ণ দৃষ্টি।†

(গ) ইহার আয়ু সম্বন্ধে ফল বিপর্য্যায়ের কারণ এই—

ইহার নীচস্থ শনি যোগ কারক হওয়ায় কক্ষ্যাহ্রাস হওতঃ মধ্যায়ু হইয়াছে। জৈমিনী ও পরাশর উভয়েই লিখিয়াছেন—নীচস্থ বা পাপদৃষ্ট শনি যোগ কারক হইলে কক্ষ্যাহ্রাস অর্থাৎ দীর্ঘ্যায়ুস্থলে মধ্যায়ু মধ্যায়ুস্থলে, অল্পায়ু এবং অল্পায়ুস্থলে যৎকিঞ্চিৎ আয়ু হইবে। যথা—

"শনৌ যোগহেতৌ কক্ষ্যাহ্রাসঃ।" "কেবলপাপদৃগ যোগিনিচ"
"দীর্ঘং চেন্মধ্যং, মধ্যং চেদল্পং অল্পং চেন্নকিঞ্চিৎ॥"

এই জাতকের উল্লিখিত সূত্রানুসারে মধ্যায়ু যোগে অল্পায়ুখণ্ডার ৪০ বৎসর স্থির নিশ্চয় আছে। বাকী ৪০ বৎসরের গ্রহস্ফুটাদির অনুপাত দ্বারা ১৬ বৎসর ১১ মাস হয়, তাহা উক্ত ৪০ বৎসরে যোগ করাতে ৫৬ বৎসর ১১ মাস হয়।

সুতরাং মহারাজের ৫৭ বৎসরে মৃত্যু ফলিত জ্যোতিষ সম্মত হইয়াছে।

ইহার পত্নীস্থানের বিচারে কোন বিরোধ নাই। রবিদৃষ্ট নীচস্থ মঙ্গল জায়াভাবস্থ হওয়ায় তীব্র পত্নীহানি যোগ হইয়াছে। বস্তুতঃ এ যোগটী সাধারণতঃ অব্যর্থ। সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে পত্নীর মৃত্যু হয়। যথা—

লগ্নেব্যয়েচ পাতালে যামিত্রে চাষ্টমেকুজে।
স্ত্রীজাতেঃ স্বামিনাশঃস্যাৎ পুংসো ভার্য্যাবিনশ্যতি।

জাতকের যথার্থ জন্ম সময় পাওয়াগেলে বিজ্ঞ জ্যোতিষী মাত্রেই সূক্ষ্ম গণিতের গ্রহস্ফুট ভাবস্ফুট প্রভৃতি দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া জাতক জীবনের অনেক ঘটনা ফলিত জ্যোতিষের দ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ফল—এশাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করার কারণ নাই।

যদুপচিত মন্য জন্মণি শুভাশুভং কর্ম্মনঃ পক্তিং।
ব্যঞ্জয়তি শাস্ত্রমেতৎ তমসি দ্রব্যাণি দীপইব॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন,
জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

---

* চতুর্থে সুতনৌ বন্ধুবর্গৈশ্চ বৈরং ধনং বৈবভুঙক্তে পিতুর্বাহনাদ্যং॥

† শনি দৃষ্টে,যুতে বাপি বন্ধ্যা ভবতি নান্যথা।

সহর বাসে বাতিক।

জাতির মজ্জায় যখন বিলাসিতার ঘুন ধরিতে থাকে তখন মানুষ গুলাকে প্রায়ই সহরের দিকে ভিটা মাটী ছাড়িয়া আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখা যায়। পল্লী দেবীর সহজ সরল স্নিগ্ধ সেবায় তখন আর মানুষের প্রবৃত্তি তৃপ্ত হইতে চাহে না। কৃত্রিম কারুকার্য্য খচিত সহুরে ইমারতের দিকে তাহার প্রবৃত্তি লুব্ধ নয়নে ছুটীয়া চলে। ফল তখন এই দাঁড়ায় যে, নিজের সহ ধর্ম্মিনীর প্রাণের সেবা ছাড়িয়া বাজারে বাজারে টো টো করিয়া ঘুরিলে যেমন ঘর উৎসন্ন যায়, গৃহলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হয়েন, দেশরূপ বিরাট গৃহের সার সর্ব্বস্বভুক্তা পল্লীর উপেক্ষায় তেমি সমগ্র দেশ ব্যাপী একটা অসচ্ছলতা ও অনটন—এক কথায় একটা লক্ষ্মী ছাড়া ভাব জাগিয়া উঠে।

নীতি বলে—ধনী তাহার ধন কেবল নিজে ভোগ করিতে পারে না। তাহার আশে পাশের দশজনের মধ্যেও তাহা কিছু কিছু বর্ত্তে। জগৎ নিয়ন্তার নিয়মই এই। মানুষের ধন, জ্ঞান—যা কিছুই বলা যাক না সমস্তেরই প্রত্যক্ষ না হইলে ও পরোক্ষে তাহার প্রতিবেশীরা দস্তুর মতন অংশীদার। পল্লী মাতার জ্ঞানী ধনী যত রোজগারে বা সক্ষম ছেলে সকলেই যদি সহরের নেশায় বিভোর হন, তবে তাঁহার সংসার লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবেই।

রাজনীতির হিসাবে কষিতে গেলে দেখা যাইবে পল্লীকে বাদ দিয়া কোনও রাজনৈতিক সমস্যারই পাকা মীমাংসা চলিতে পারে না। কয়েকজন মাথাওয়ালা বড় বড় লোকের গলাবাজিতে দিন কয়েকের জন্য মোটরের হাঁপহাঁপানিতে, ফিটনের খটখটানি বাড়ানোতে কোন একটা রাজনৈতিক অধিকারের মত অধিকার পাওয়া যাইতে পারে না। আমাদের সমগ্র সহুরে আন্দোলন গুলি এইরূপ উপর ভাসা গতিকেই যে তেমন আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিতেছে না, ইহা বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হইবে না। আমাদের পঞ্চায়েতি প্রথার পত্তনের উপরই ত লর্ডরিপন প্রমুখ উদার নৈতিকগণ স্বায়ত্ত শাসনের বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি টাকাকড়ি যদি জড়ো হয় সহরে তবে পল্লী স্বাস্থ্য মহাশয় ও যে সেই সঙ্গে তল্পী তাল্পা বাধিবেন তাহার আর কথা কি? কিন্তু সে বেচারার কোথায়ও জায়গা হইতেছে না। পাঁড়াগায়ে তাঁহার খোরাক পোষাক জুটাই বার লোক নাই; সহরেও তাঁহাকে লইয়া এত লোকের টানাটানি যে তিনি তাহাতে একেবারে বিব্রত।

যে কোন দিক দিয়া উন্নতি ভাবিতে হইলেই যে আমাদের পাঁড়া গাঁ গুলির দিকে আগে ত তাকাইতে হইবে এ মোটা কথটা বুঝেন অনেক লোকেই! আবার যাঁহারা বড় বুঝেন তাঁহারাই যে পাঁড়া গাঁ গুলির উপর বড় নারাজ ইহাও বলা যায়।

ইংলণ্ডে এই সমস্যাটা এলিজাবেথের রাজত্ব হইতে দ্বিতীয় চালসের রাজত্বের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত প্রায় দেড়-শত বৎসর ব্যাপিয়া রাজ নৈতিক মহলে খুব ঢেউ তুলিয়াছিল। Game Law তাহারই ফল। জনৈক ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন—এটা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয় যে গবর্ণমেণ্ট সহরগুলি নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ এবং পরিমিত রাখিবার জন্য শক্ত হইতে শক্ত আইন জারী করা সত্ত্বেও সহরের বাড়াত কিছুতেই খাটো করিয়া আনা যাইতেছে না। ওয়েষ্টমিনিষ্টার ধীরে ধীরে লণ্ডনের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে আদত লণ্ডনকে এখন আর তাহা হইতে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না! জেমসের কথাই এখন ফলিতে চলিল দেখিতেছি। ইংলণ্ড শীঘ্রই লণ্ডন হইবে এবং লণ্ডনই হইবে সারা ইংলণ্ড জুড়িয়া।

বিচারপতি বেষ্ট game-law এর সমর্থন করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন "ভদ্র লোকদের গ্রামে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন ও রায়ত জন লইয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকাই উচিত। তাহা হইলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল হইতে পারে। উচ্চ, নীচ, ধনী দরিদ্র, উভয়তঃ সুন্দর পরস্পরোপেক্ষ ভাব দৃঢ় হইয়া সাম্য সংস্থাপনের সুবিধা হয়।"

আর একজন ভদ্রলোক তৎকালীন ইংলণ্ডের অবস্থা

বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—জাঁক জমকে থাকিবার খেয়ালের বশে সহরের দিকে মানুষের বেজায় ঝোক দেখিয়া আমাদের গবর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হইয়াছেন। Hypochondriac ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর মত আমাদের জাতির মাথাটা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রস চুষিয়া লইয়া বে-আন্দাজ মোটা হইয়া পড়িতেছে। ইহা রোধ করিবার জন্য যতই আইনের উপর আইনের খসড়া প্রস্তুত হইতেছে ততই যেন সহরের উপর মানুষের রোখ আরো চড়িয়া উঠিতেছে। সহরে নূতন বাড়ী তৈয়ার করিবার বিরুদ্ধে রাণী এলিজাবেথের আইন গরবাদ যাইবার জোগাড়। রাজা জেমস্ এবং এক চার্লসের পর আর এক চার্লসের হুকুম ও মানুষে আমল দিতেছে না।"

জেমস্ অনেক সময়েই তাঁহার বক্তৃতায় সর্ব্বসাধারণকে পল্লী বাসের উপদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁহার কথা কেহ বড় কাণে তুলিয়া লইত না। তাঁহার এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন ঝাঁকের উপর ঝাঁক ধরিয়া যে সমস্ত ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রী বা নব্য মতের মেয়েদের ফোস্‌লানতে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া সহরে আসিয়া জড়ো হইতেছেন (সহর গুলাই রাজ্যের জঞ্জাল হইয়া দাঁড়াইল) এবং সেখানে দালান কোঠার গাদা বাড়াইয়া, গাড়ী ঘোড়ায়, জিনিষ পত্রে—যথা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ফকীর হইবার পথ ধরিতেছেন, তাঁহাদিগকে সমস্ত রাজ সম্মান হইতে বঞ্চিত করিয়া পল্লীর রায়ত জনকে তাহা সাদরে অর্পণ করিতে হইবে। কথাবার্ত্তার সময় জেমস এ উপমাটী প্রায়ই ব্যবহার করিতেন—ভদ্রলোকের গ্রামের ঘর বাড়ী বাজারের ঘাটের মাল বোঝাই নৌকার মত, দূরে থাকিতে তাহা অকিঞ্চিৎকরই বোধ হয় কিন্তু বাজার কিংবা বন্দরের অবস্থার উপর তাহার প্রভাব কত বড়! সরাসরি সহরে উঠিয়া আসিবার ঝোঁকের উপর আক্রমণ করিয়া একজন ইংরাজ লেখক বলিতেছেন "সকল লোকেরই আজকাল নিজের বাড়ীতে ডায়োগিনিস্ (Diogenes)। এবং পথে ঘাটে রাজা হইবার সাধ। পূর্ব্বে যে টাকায় একজন ভদ্রলোকের বাড়ী বহুলোক থাকিয়া খাইয়া বাঁচিত, সেই টাকা এখনও জলের মত ব্যয় করা হইতেছে—বাবুদের গাড়ী ঘোড়ার কল্যাণে। কতক গুলাকে পেটে 'মারিয়া কয়েকজনের পিঠ রঙ্গাইবার ব্যবস্থা। বাসন পত্রের বদলে এখন নানা রকমের ছাইভস্ম, লিজের বদলে লেস, কোর্ত্তার স্থানে হরেক রকমের কোট সার্ট, শ্যামিজ কামিজ, এই রকম নানা উপায়ে যত টাকা কড়ি জন কয়েকের পেট মোটা করিবার জন্য ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট শুধু যে লণ্ডনের দশ মাইল মধ্যে নূতন বাসেন্দার পত্তন করিতে নারাজ ছিলেন তাহা নহে, কখন কখন কয়েক বৎসরের উঠানো কোঠা ভাঙ্গিয়া নামাইয়া দেওয়াও হইত। প্রতি ছয় সাত বৎসরেই নূতন হুকুম জারী হইত। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে দালান কোঠার উপর কড়া নজর রাখা হইয়াছিল। সময়ে সময়ে শারীরিক শাস্তি ও জরিমানার ধুম ও দেখা গিয়াছে।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোককে এই অপরাধে জরিমানা করিয়া সাজা দেওয়া হইয়াছিল। ষ্টার চেম্বারের (Star Chamber) রিপোর্টে দেখা যায়—

রাজ্ঞী এলিজাবেথ এবং জেমস্ কয়েকবার ঘোষণা পত্র দ্বারা হুকুম করিয়াছিলেন যে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ লণ্ডন সহরে বাড়ী কিংবা বাসা কিছুই করিতে পারিবেন না। কারণ তাহাতে পল্লীর সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

উক্ত ঘোষণা পত্র প্রথম চার্লসের সময় একটু ফেরফার করিয়া এইরূপে জারী করা হইয়াছিল—অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত এবং পদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের পরিবারসহ ইংরেজ জাতির প্রাচীন প্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন করিয়া লণ্ডন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টারে উঠিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন প্রথানুযায়ী গ্রামে বসবাস করাতে তাহারা যে কেবল পদ এবং অবস্থানুসারে রাজসেবা করিতে পারিতেন তাহা নহে, ইহাতে দেশের ঐ সমস্ত অংশের অপেক্ষাকৃত নীচ শ্রেণীর লোক গুলিও তাঁহাদের দ্বারা চালিত, শিক্ষিত এবং বহুরূপে উপকৃত হইত।

রাজা চার্লস উক্ত ভদ্রলোকদিগের উপর সহরে থাকিয়া অর্থের অপব্যয় করিবার জন্য দোষারোপ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, তাঁহারা নিজ নিজ জন্ম ভূমিতে থাকিলে ঐ অর্থে সাধারণের অনেক উপকার হইত। ঐ সমস্ত ভদ্রলোকের সহিত যে সকল অনুচর নগরের এদিক ওদিক দলকে দল আসিয়া বহুত

হইতেছে তাহাদের অধিকাংশই অসচ্চরিত্র এবং তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে সাধারণতঃ যে কয়েকজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয় তাঁহাদের দ্বারা তাহাদিগকে শাসিত রাখা যায় না। ইহাতে শাসন বিভাগের ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে।

ইহার পূর্ব্বে রাজা চার্লস ঘোষণা করিয়াছিলেন। 'যে সমস্ত ভদ্রলোক রাজকীয় কর্ম্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত নহেন তাঁহাদিগকে চল্লিশ দিনের মধ্যে সহর ছাড়িয়া সপরিবারে নিজের নিজের গ্রামস্থ বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং তথায় পাকাপাকিরূপে বসত বাসের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অনেকে শীতকালের জন্য সহরে থাকিতে চাহেন,অত:পর তাহারা সেরূপেও অর্থের অপব্যয় করিতে পারিবেন না!' এই রিপোর্টের সঙ্গে একটা কাগজে বহুসংখ্যক শাস্তি প্রাপ্ত ভদ্রলোকের একটা নামের তালিকা বাহির হইয়াছিল। তাঁহাদের অধিকাংশই যাই যাই করিয়া পুলিশকে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় ছিলেন। কেহবা দুই চারিদিনের জন্য একটু ঘোরাফেরা করিয়া আসিয়া আবার সহরে আড্ডা গাড়িবার যোগাড় দেখিতেছিলেন।

ইংলণ্ডের রাজাসনের উচ্চস্থান হইতে কয়েক বৎসর ধরিয়া উপর্য্যুপরি এক লক্ষ্যে কিরূপ তৎপরতা গ্রহণ.করা হইয়াছিল উদ্ধৃত ষ্টারচেম্বার্সের রিপোর্ট হইতেই তাহা বুঝা যায়। কিন্তু সেগুলি যেন লোকের এককাণ দিয়া যাইয়া আর এককাণ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। পুরাণো খবরের কাগজ গুলার মত দিন কয়েক পরেই রাজার হুকুমগুলিতে মানুষের লক্ষ্য করিবার কিছুই থাকিত না।

ইহার পরে পড়িল বেদম ধর পাকড়ের ধুম। কনেষ্টবল দিগের উপর কড়া হুকুম হইল, বাহিরের যত লোক সহরে আছে, তাহাদের নামের একটা লিষ্ট করিতে হইবে। এবং তাহারা কি বাবদ কতদিনের জন্য সহরে আছে, তাহাও জানাইতে হইবে।

সাসেক্সের মিঃ পামার একজন পাকা আসামী। তাঁহাকে কড়া পাহারায় Star chamber এ রাজ আদেশ লঙ্ঘন করার অপরাধে হাজির করা হইল। ইনি প্রায় ১৫।১৬ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির মালিক! তখনকার দিনে ইহাকে একটা খুব বড় আয়ের সম্পত্তিই বলা যাইত। পামার নিজের পক্ষ সমর্থনার্থ জবাব দিলেন— নাই বলিলেই চলে, অধিকন্তু তাঁহার ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির বাস করিবার উপযুক্ত তাঁহার গ্রামে কোন ঘর বাড়ী নাই; যাঁহা ছিল তাহাও সম্প্রতি আগুণে পুড়িয়া গিয়াছে। জজেরা আসামীর এই সমস্ত উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া দণ্ডের কঠোরতা নাকি অনেকাংশে হ্রাস করিয়াছিলেন। তবে বহুদিবস যাবৎ তাঁহার প্রতি বেশী এবং প্রজাদিগের সহিত কোন সংশ্রব না রাখার দরুন তাঁহাকে পোনর হাজার টাকা জরিমানা করা হইয়াছিল।

সাসেক্সের একজন সম্মানিত ভদ্রলোক শাস্তি পাওয়াতে ভদ্র মহলে একটা আতঙ্কের সাড়া পড়িয়া গেল। একজন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন—আমি দেখিলাম সকলেই পাঁড়াগাঁয়ে ফিরিবার জন্য তল্পীতাল্পা বাঁধিতেছে। সকলের মুখেই খোঁৎ খোঁতানি কি মুস্কিল! পাঁড়াগাঁয়ে যাইয়া কোণাঘেঁসা হইয়া থাকিতে হইবে। ইহার মধ্যে আর এক নোটীশ জারী হইল মোরগ, মুরগী.হাঁস, আণ্ডা, খরগোস কোন সহরের হোটেলেই বিক্রী হইতে পারিবে না। জিতং সর্ব্বং জিতে রসে!

আইনের এই কড়াকড়ি অনেকের পক্ষে খুব অসুবিধা জনক হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকের কাজ কর্ম্মের খাতিরে সহরে থাকা নেহাৎ দরকার; কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। উঠ, জাগ, জিনিষ পত্র প্যাক কর! একজনের লেখায় দেখা যায়—মিঃ নয় (Noy) আজকালকার এর্টনী জেনারেল, একজন পাকা আইনজ্ঞ লোক হইয়া এমন হক্-না-হক্ সাধারণের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলেন কেন?

একজন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন; মিঃ উইলিয়ম জোন্স, লর্ড কভেণ্ট্রি এবং অপরাপর কয়েকজন ভদ্র লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া জানিলাম যে আমি আইনের গণ্ডীতে পড়ি নাই। দিন কয়েক বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম, হঠাৎ মিঃ পামারের সাজার কথা শুনিয়া একেবারে ঘাবড়াইয়া গেলাম। শেষে সহর ছাড়াই ঠিক হইল। জিনিষ পত্রগুলি টানাটানি করাতে বেগ পাইতে তো হইলই অধিকন্তু আমার গর্ভবতী স্ত্রীকে ভীষণ শীতে স্থানান্তরিত করিতে বিষম মুস্কিলে পড়িয়া গেলাম।

ইংলণ্ডের অতীত ইতিহাসের এই খুটিনাটি হইতে কি আমাদের কিছু শিখিবার নাই?

পশ্চিম ময়মনসিংহের উপেক্ষিত প্রাচীন স্মৃতি।

রাজ গোলাবাড়ী।

মধুপুরের নীবিড় অরণ্যে রাজ গোলাবাড়ী অবস্থিত। এই রাজ গোলাবাড়ী রাজা যশোধরের দ্বিতীয় রাজধানী বলিয়া পরিচিত। যোগীর গুফা (গুহা) নামক স্থানে নাকি তাঁহার বিরাট ধনাগার ছিল। যোগীর গুফার মধ্যস্থিত সুরম্য স্থানকে কেহ কেহ তাঁহার প্রমোদ ভবন বলিয়া ও প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা ধনাগারই হউক আর প্রমোদ ভবনই হউক—ইহাযে এক সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় ছিল, তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থিতি দেখিলে এখনও অনুমিত হয়। চতুর্দ্দিকে বহু বিস্তৃত বিলের ভিতর ইষ্টকাদি পরিবৃত এই উচ্চ ভূমি বস্তুতই বিস্ময়োৎপাদক। এই স্থান সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কিম্বদন্তী বিদ্যমান আছে। কিম্বদন্তীর প্রভাবে এই স্থানকে সাধারণের নিকট ভীতি প্রদ করিয়া তুলিয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানের মৃত্তিকাগর্ভ হইতে ইন্দুরের মাটীর সহিত অনেক মূল্যবান ধাতুখণ্ড বাহির হইতে দেখা গিয়াছিল। ইহাতেই এখানে প্রচুর অর্থ নিহিত আছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। রাজগোলাবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ক্ষেত্রে এখন একটী পুষ্করিণী মাত্র বর্ত্তমান আছে।

জনপ্রবাদ বলে—বাকী খাজনা আদায়ের জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব ইব্রাহিম খাঁ তুরুকশোয়ার পাঠাইয়া [illegible] রাজা যশোধরকে মুর্শিদাবাদ ধরাইয়া লইয়া যান। সেখানে রাজা যশোবন্তকে লইয়া যাওয়ার পরক্ষণেই নবাব একজন বিদ্রোহী সেনাপতীকে লইয়া ব্যতীব্যস্ত হন। রাজা যশোবন্ত এই বিদ্রোহী দমনে নবাবের সহায়তা করেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার খাজানা মাপ দেন এবং তাঁহাকে বান ডঙ্কা নিশান খেলাত প্রদান করেন। এই সময় একদিন নিশিথে নবাব অন্তঃপুরে হঠাৎ এক বিকট শব্দ উপস্থিত হইয়া নবাব পুরন্ধ্রীগণের সকলকে আতঙ্কাভিভূত করে। রাজা যশোধর এই শব্দের হেতুভূত একটী পক্ষীকে নৈপুণ্য প্রকাশে বিনাশ করায় নবাব নিরতিশয় সন্তুষ্ট হন। কিন্তু এই সন্তুষ্টিই পরে তাহার ব্যপদেশে অন্তপুর গমন কালে তিনি ষোড়সী নবাব দুহিতার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া তাহার শান্তি হরণ করেন। বলাবাহুল্য রাজা যশোধর অতি সুপুরুষ ছিলেন। নবাব দুহিতার ব্যাকুলতার ফলে রাজা যশোধর নবাবের নিকট হইতে নবাব দুহিতা ও তৎসঙ্গে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি নাখেরাজ রূপে পাইবার সম্ভাবনার বিষয় অবগত হন। তিনি বিবেচনার জন্য নবাবের নিকট দুইদিনের সময় চাহিয়া একেবারে পলাইয়া দেশে আসিয়া পঁহুছেন। তাহার পঁহুছবার কতিপয় দিবস পরেই নবাবের ফৌজ আসিয়া রাজধানী পরিবেষ্টন করে। রাজা যশোধর কয়েকদিন পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়া পরে সপরিবারে নৌকারোহণ করতঃ নৌকার তলদেশ বিদীর্ণ করিয়া কোশা পুষ্করণীতে ডুবিয়া মরেন। নবাবের ফৌজ মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই শোচনীয় সংবাদ নবাব জাদীকে বিজ্ঞাপিত করেন। জন প্রবাদ বলে নবাব জাদী এই দুঃসংবাদে মুর্চ্ছিতা হইয়া জীবন লীলা সংবরণ করেন।

রাজা যশোধরের মৃত্যুর পর তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তি নানাজনে গ্রাস করেন। কতকাংশ ধনবাড়ীর ধনপতির হস্তগত হয়, অপর অংশ—চাকলা পেড়ুয়া রাজা বসন্ত রায়ের হস্তগত হয়। তাঁহার গৃহ দেবতা কানাই বলাই তাঁহার পুরোহিত খিলগাতীর রামকানাই চক্রবর্ত্তী লইয়া যান। মদন গোপাল কান্তমজুমদার লইয়া জান। কানাই বলাই পরে সেনবাড়ীর যাদব বাবুর পূর্ব্বপুরুষের হস্তগত হয়। মদন গোপাল নাটোরের জমিদারের হস্তগত হইবার পর মধুপুরে স্থাপিত হয়। নাটোরের সম্পত্তি নিলাম হইয়া যখন পুটীয়ার হস্তগত হয় তখন সম্পত্তির সহিত তাঁহারা ঠাকুরকেও জবর দখল করেন। মদন গোপাল এতদঞ্চলে অতি জাগ্রত দেবতা। তাঁহার সেবা পূজার খুব সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। মদন গোপালের বাড়ীতে দুপ্রহরে এবং রাত্রিতে বহুসংখ্যক অতিথি সেবার বন্দোবস্ত আছে। এতদঞ্চলে মদন গোপালের প্রচুর সম্পত্তি আছে। পূর্ব্ব একত্রাবস্থানের স্মৃতি রক্ষার জন্য আজ পর্য্যন্ত গোষ্ঠ যাত্রার দিন কানাই বলাই ও মদন গোপাল প্রতি বৎসর মধুপুরে একত্র হয়।

৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
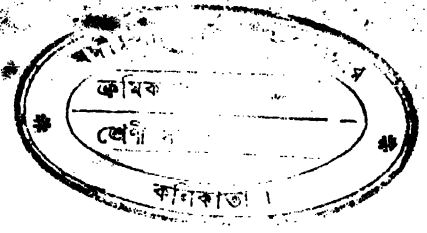
সৌরভ

চতুর্থ বর্ষ } ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩২২। { ষষ্ঠ সংখ্যা।

সভ্যতার আত্মরক্ষা।

এক একটা জাতির জীবনের এক একটা বিশিষ্ট ধারা আছে। ব্যক্তির চরিত্রতার ক্রিয়া কলাপ, তার চিন্তা ও অনুভূতির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে; নাটকে বা উপন্যাসে যেমন, বাস্তব জীবনেও তেমনি—লোকে কি করে এবং কি বলে, তাই জানিয়াই আমরা তার চরিত্র নিরূপণ করি, তেমনই জাতির ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ইতিহাসে তার ক্রিয়া কলাপ, তার চিন্তা প্রণালী, তার সাহিত্য ও শিল্প, তার দর্শন ও বিজ্ঞান, তার ব্যবসা ও বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারাই নিরূপিত হইয়া থাকে। এক কথায় ইহাদেরই নাম সভ্যতা। আমরা জানি এক একটা জাতির এক একটা বিশিষ্ট সভ্যতা থাকে। গ্রীক সভ্যতা, রোমীয় সভ্যতা হিন্দু সভ্যতা, চীন সভ্যতা প্রভৃতি প্রাচীন কালের বহু সভ্যতার কথা আমরা জানি; বর্ত্তমান কালেও জর্ম্মান সভ্যতা, ফরাসী সভ্যতা, ইংরেজ সভ্যতা,—কিংবা ইহাদের সকলের মূলীভূত যে এক সাধারণ সভ্যতা আছে তাকে ইউরোপীয় সভ্যতা বলি; অপরদিকে জাপানী সভ্যতা, আধুনিক চীন সভ্যতা, প্রভৃতি কিংবা ইহাদের সকলের মূলাধার যে এক সভ্যতা-তাকে এসিয়াটিক সভ্যতা বলিয়া থাকি। কিন্তু এই প্রত্যেকটী সভ্যতারই বৈশিষ্ট্য সেই সেই জাতির সাহিত্য ও শিল্পকলা, এবং জীবন পদ্ধতির ভিতরদিয়া প্রকাশ পাইতেছে। গ্রীকদের পরিবারিক ও সামাজিক আচার ব্যবহার, তাদের চিত্র ও স্থাপত্য বিদ্যা, তাদের সাহিত্য ও দর্শন, রোমীয়দের আচার ব্যবহার প্রভৃতি হইতে ভিন্ন ছিল; গ্রীক সভ্যতা ও কাজেই রোমীয় সভ্যতা হইতে ভিন্ন।

এইরূপে পৃথিবীতে বিভিন্ন২ জাতির সঙ্গে পৃথক২ সভ্যতাও ইতিহাসের আদি হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং যেখানে২ জাতিতে জাতিতে লড়াই হইয়াছে, সেখানেই সভ্যতায় সভ্যতায় ও একটা লড়াই ঘটিয়াছে। সেকেন্দর যখন এসিয়ার তখনকার পরিজ্ঞাত দেশ সমূহ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন তাহাতে যে কেবল সেকেন্দর ও তাহার সৈন্যরা জয়ই জয় লাভ হইয়াছিল, তা নয়; ইহা হইতে গ্রীক সভ্যতাও এসিয়ার সভ্যতাকে পরাস্ত করিয়াছিল। রোমীয়েরা যখন ইউরোপের অধিকাংশে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তখন তাতে যে কেবল তাদের সামরিক সৌর্য্যেরই উৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়াছিল, এমন নহে; তাদের আচার ব্যবহার, তাদের শাসন বিধান,—এক কথায় তাদের সভ্যতাও সেই হইতেই অপেক্ষাকৃত অনুন্নত আদিম সভ্যতাকে পরাভূত করিয়াছিল। যে সমস্ত জাতি রোম কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, যেমন ফরাসী ও জর্ম্মাণ জাতি,—তাদের ইতিহাসে, বিশেষতঃ আইন কানুনে রোমের অধীনতার ছাপ এখনও লাগিয়া রহিয়াছে। এক মুসলমানদের জয়ের ইতিহাসে স্থানে২ এই সত্যের কথঞ্চিৎ অন্যতা অনুভূত হয়; যেখানে তারা নিজেদের ধর্ম্ম বদ্ধমূল করিতে পারে নাই, সেখানের সমাজে, সেখানকার সভ্যতায় তারা তত বেশী পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই,—যেমন হিন্দু সমাজে। কিন্তু তথাপি সেখানেও

তারা যা করিয়াছে তাতে তাদের বিগত বিজয়ের সাক্ষ্য রহিয়াছে।

ইতিহাসে যেখানেই দুইটী জাতি পরস্পরের সন্নিকর্ষে আসিয়াছে সেই খানেই উভয়তঃই কিছু না কিছু আদান প্রদান ঘটিয়াছে। আর, যেখানে এই সন্নিকর্ষ পূর্ব্বতন কলহের ফলে ঘটিয়াছে, সেইখানে, বিজেতার রীতিনীতি, তার আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিজিতের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে বিশেষভাবে রঙ্গাইয়া দিয়াছে, —বিজেতার সভ্যতা বিজিতের সভ্যতাকে ন্যূনাধিক বশীকৃত করিয়া লইয়াছে।

তবে যে আজ ইউরোপের বর্ত্তমান সংঘর্ষকে বিশেষ ভাবে দুইটী বিরোধী সভ্যতার সংঘর্ষ বলিয়া মনে করা হইতেছে, তার কারণ কি? প্রকৃতিতে বাঁচিবার অধিকার লইয়া জীবে জীবে যেমন একটা লড়াই হইয়া আসিতেছে, ইতিহাসেও তেমনই টিকিয়া থাকিবার অধিকার লইয়া সভ্যতায় সভ্যতায় একটা কলহ হইয়া আসিতেছে। এই কলহেরই নামান্তর জাতিতে জাতিতে ঝগড়া। কিন্তু তথাপি জীবন যুদ্ধে ব্যাপৃত জন্তু যেমন সব সময় জানে না যে সে ঐরূপ একটা উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে—তাহার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির অন্তঃপ্রেরণা যেমন তাহা দ্বারা তাহারই জীবনের নিমিত্ত আবশ্যক যুদ্ধ ব্যাপারটী সাধন করাইয়া লয়, সভ্যতার কলহেও তেমনই সভ্যতার আশ্রিত জাতি সব সময় নিজের জ্ঞাতসারে ঐ কলহে প্রবৃত্ত হয় না। পূর্ব্বে জাতিতে ২ যে সমস্ত লড়াই হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বদাই একটা সভ্যতার লড়াই ও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বটে, কিন্তু জাতি সব সময় 'আমার সভ্যতা রক্ষা করিব এবং তার বিস্তার করিব' এইরূপ মনে করিয়া লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয় নাই। লড়াইয়ের জয় পরাজয়ের উপর তার সভ্যতার ভাগ্য চিরকালই নির্ভর করিয়া আসিয়াছে; রাজ্য কিংবা অর্থের আকাঙ্ক্ষা, কিংবা প্রভুত্বের স্পৃহা, কিংবা এক দুর্দ্দম জিগীষাই তাকে প্রায় সমর লোলুপ করিয়া তুলিয়াছে। তার ফলে প্রায়ই এমন ঘটিয়াছে যে এক জাতি আর এক জাতির সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা তাহার আচার ব্যবহার, প্রভৃতি অর্থাৎ তাহার সভ্যতা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয় নাই। বরং বিজিতের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া নিবার জন্য, কিংবা তাহার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া জাতীয় ভোগ লালসা চরিতার্থ করিবার জন্যই লড়াই করিয়াছে। রোম যে অত বড় সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, যার ফলে বহু অবান্তর সভ্যতা লুপ্ত কিংবা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাতে সভ্যতা বিস্তার তার স্বকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল না। রোম যে সমস্ত জাতিকে জয় করিয়া নিজের শাসনাধীন করিয়াছিল, তাদের সভ্যতায় জ্ঞাতসারে কখনও হাত দেয় নাই; এবং বিজিতের রীতিনীতি ও আইন কানুন স্পর্শ করে নাই বলিয়াই, রোম তার সাম্রাজ্য এমন সফল করিতে ও এতকাল অক্ষত রাখিতে পারিয়াছিল। ইংরেজ বা ইহুদী জাতির উপর রোম যে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল তার ফলে, ঐ ঐ জাতির আদিম সভ্যতার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এমন নহে; কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তন করা রোমের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। তার উদ্দেশ্য ছিল—রাজত্ব করা, প্রভুত্ব করা, শাসন করা এবং কর আদায় করা। যতদিন সুবিধা বোধ করিয়াছে ততদিন ইংলণ্ডে কর আদায় করিয়া, অসুবিধা উপস্থিত হওয়া মাত্রই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। ইহুদীদের উপর ও রোম বহুকাল রাজত্ব করিয়াছে, কিন্তু তাদের সমাজ ও ধর্ম্ম তাদের পূর্ব্বতন অনুশাসন দ্বারাই চালিত হইয়াছে; তাতে কোন পরিবর্ত্তন করা রোম ইচ্ছা করে নাই। বিজিতের সভ্যতার পরিবর্ত্তন কিংবা বিনাশ ঘটাইতে হইলে যতটা নৈকট্য আবশ্যক, বিজেতা কদাচিৎ তাহা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে যদিও জাতিতে ২ বহু লড়াই হইয়াছে, তবু জ্ঞাতসারে সভ্যতায় ২ লড়াই খুব কমই হইয়াছে।

এক মুসলমানদের ইতিহাসে যত লড়াই দেখা যায়, তার মধ্যে অনেকগুলি এই নিয়মের পরিপন্থী। আদিতে রাজ্য বিস্তার তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; ঈশ্বরের 'প্রেরিত পুরুষ' যে চিরন্তন সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাই জগতে ঘোষণা ও প্রচার করা মুসলমানদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; মানুষের জীবন ধারণের যে এক

নূতন ধারা যে এক নূতন সভ্যতার সন্ধান তাহারা পাইয়াছিল, তাহাই পৃথিবীতে বিস্তার করা তাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু ক্রমে অতি সহজে রাজ্য লালসা এই ধর্ম্ম চিকীর্ষার স্থান অধিকার করিয়া ফেলে। তার ফলে, পরবর্ত্তী যুগে যদিও মুসলমানেরা বহু দেশ জয় করিয়া বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, তথাপি সভ্যতার তেমন নূতন স্থায়ী পরিবর্ত্তন অনেক কম করিয়াছে। ভারতে তাদের সাম্রাজ্য এই সত্যের প্রধান সাক্ষী। সাত শত বৎসরের ও অধিক কাল এদেশে রাজত্ব করিয়া মুসলমান হিন্দু সভ্যতার কোনই পরিবর্ত্তন করে নাই এমন নহে; কিন্তু দেড় শত বৎসর ইংরেজ রাজত্বে যা হইয়াছে, তার একাংশও করিতে পারে নাই।

খ্রীষ্টান ধর্ম্মেরও প্রথম উন্মাদনা যখন তার সেবকদের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া দিয়াছিল, তখন ধর্ম্মেরই জন্য, —শুধু সভ্যতা বিস্তারেরই জন্য লড়াই হয় নাই এমন নহে। অবশ্যই প্রথম খ্রীষ্টানেরা তাদের সহিষ্ণুতা, তাদের ত্যাগ, অপমান ও লাঞ্ছনায় তাদের নির্ব্বিকার ভাব দ্বারাই পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু পরে যখন রোমের সম্রাটের মত পদস্থ ব্যক্তি ও তাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন একটু আধটু রাজকীয় ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা যে তারা দেখান নাই এমন নহে। নিজের সভ্যতার রক্ষা ও বিস্তৃতির জন্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা যে সংগ্রাম করিয়াছেন তার জলন্ত উদাহরণ 'ক্রুজেড'।

তথাপি এই সমস্ত প্রতিপ্রসব হইতে নিয়মেরই দৃঢ়তা প্রমাণিত হইতেছে। ইতিহাসের আদিম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধুনিক সময় পর্য্যন্ত, সভ্যতা বিস্তারকেই লক্ষ করিয়া—নিজের সভ্যতার স্থায়িত্ব ও প্রচার এবং বিজিতের সভ্যতার ধ্বংস কিংবা পরিবর্ত্তনকেই জ্ঞাতসারে লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধ কখনও হয় নাই। চীন অনেকবার ইউরোপীয় সৈন্যের অস্ত্র দণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছে; কিন্তু চীনকে সভ্য করিবার জন্য নয়, তাহার বন্দরে অবাধে বাণিজ্য করিবার জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকা রক্তপাত করিয়াছে। অবশ্যই ব্যবসা করিবার স্থান ও অধিকার লাভ করিয়া পরে, বিজয়ী জাতি সকল তাদের সভ্যতার সরঞ্জাম, তাদের স্কুল কলেজ, তাদের ধর্ম্মপ্রচার সমিতি প্রভৃতিও নিয়া উপস্থিত করিয়াছে; কিন্তু গোড়ায় সভ্যতা স্থাপন করিবার জন্য লড়াই হয় নাই।

আর এখন কি হইতেছে? এখনও কি রাজ্য লালসা, উপনিবেশ কিংবা অর্থের স্পৃহা একেবারেই নাই? এখন কি যুযুৎসু জাতির কেবলই সভ্যতার চিন্তায় মগ্ন? যুদ্ধের জয় পরাজয়ের ফলে অন্য কি কি লাভ লোকসান হইবে, সে কথা কি কেহই মনে স্থান দেয় না? সুতরাং সভ্যতার অতিরিক্ত লাভ লোকসানের কথা একেবারে চাপা পড়িয়াছে, কিংবা মোটে চাপা পড়িয়াছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। আর, যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্যটাই বা কি? যারা প্রথম যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে তারা যে কতকগুলি বর্ব্বর জাতিকে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিবার ইচ্ছা কিছুতেই দমন করিতে পারে নাই, তাও ত নয়। ইংরেজ ও ফরাসী ত আর অসভ্য জাতি নয়, আর জার্ম্মণীও ত একমাত্র সভ্য দেশ নয়, যে একটু সভ্যতার আদান প্রদানের নিমিত্ত এমন একটা অগ্নি-কাণ্ডের সৃষ্টি হইবে! তথাপি, আজ সভ্যতার কথাটা এত বড় হইয়া পড়িয়াছে কেন? যে হারিবে, সে না হয় একটু স্থান হারাইবে; জার্ম্মণী ইতিমধ্যেই তার উপনিবেশ গুলি খোওয়াইয়াছে, কিংবা, কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ দিবে, ফরাসী দেশ একবার জার্ম্মণীকে তা দিয়াছে; কিন্তু কারও সভ্যতার স্থিতি ও বিস্তৃতির বিষয় হঠাৎ এত গরীয়ান্ হইয়া উঠিল কেন?

তার উত্তর এই যে, পৃথিবীর জাতি সকল পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমে আত্মজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে; তারা যে এক একটা সভ্যতার আশ্রয়,—এক এক প্রকার জীবনের ধারা, এক ২ প্রকার চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা যে তাদিগকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে, পূর্য্যমাণ জীবন স্রোত যাদের সে সমস্ত জাতিই এখন একথা বুঝে। এখন পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে তাদের আকাঙ্ক্ষার পূরণের নিমিত্ত, তাদের চিন্তা ও অনুভূতির বিকাশের জন্য, অর্থাৎ তাদের সভ্যতার স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য তাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে; শুধু তাই নয়, তারা যে রকম ভাবে আত্মরক্ষা আবশ্যক বোধ করে, ঠিক

সেই রকম ভাবেই নিজেকে টিকাইয়া রাখিতে হইবে। অন্যের সঙ্গে আপোস করিতে গিয়া কিংবা মিত্রতা রক্ষা করিতে গিয়া যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিবে, নিজের আকাঙ্ক্ষাকে যতটুকু খর্ব্ব করিয়া আনিবে, সেই পরিমাণে তার সভ্যতার ও হানি হইবে

ব্যক্তির জীবনের প্রতি চাহিলে এই সত্যের একটী চিরন্তন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমার ভিতরে যে শক্তি আছে, আমি যদি তার ষোল আনা ব্যবহার করিতে চাই, তাহা হইলে অন্যের সহিত আমার সন্ধিস্থাপন হয় না; আমার শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ, আমার বাসনার পরিপূর্ণ ভোগ,—সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, অন্যকে কম বেশী উপকরণ স্বরূপ ব্যবহার করিতে হয়। গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত যেমন আমরা বহুবিধ দ্রব্যের সাহায্য গ্রহণ করি, অথচ এর মধ্যে কোনটীরই অধীনতা স্বীকার করি না, কিংবা সরঞ্জাম গুলির জন্য কোন কাজ করি না, তেমনই আমার জীবনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যের জন্য ত্যাগ আমার অভিপ্রেত নহে। তবে যে ত্যাগ করা হয়,—আমার সব বাসনা যে আমি চরিতার্থ করিতে চাই না, তার কারণ, সকলই ত আমার মত আত্মম্ভরি; কেহই যদি আত্মম্ভরিতার সীমা স্বীকার না করে, তা-হইলে কারও হয়ত কিছুই রক্ষিত হইবে না। তাই আমাকে কতক ত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু যতটুকু ত্যাগ আমি করি, সেই পরিমাণ আমার হানি। সমাজে ধন, মান, প্রভুত্ব কাহারও ভাগ্যে কম জুটে, কাহারও বেশী। কিন্তু যার কম জুটে, সে যে বেশীটুকুও ভোগ করিতে পারিত না, কিংবা চায় না, এরূপ নহে; কিন্তু তবুও যে সে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পন্থা ছাড়া অন্য উপায়ে তাহা পাইতে চেষ্টা না করিয়া সেই পরিমাণে নিজেকে ছোট করিয়া রাখে, তার কারণ, সে বুঝে যে ঐরূপ পাইতে চেষ্টা করিলে সমাজ বিপন্ন হইবে, এবং তার যা আছে, তাও না টিকিতে পারে। আমি যে অন্যকে হত্যা করিয়া তার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া ধনী না হইয়া অন্য উপায়ে ধনী হইতে চাই, তার কারণ, বড় হইবার ঐ সহজ পন্থা সকলে গ্রহণ করিলে কেহই নিরাপদে থাকিবে না।

তথাপি সমাজে সকলই চায় পরিপূর্ণরূপে নিজেকে প্রকাশ করিতে—নিজের বহুবিধ সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে, নিজের বহুবিধ বাসনাকে চরিতার্থ করিতে, নানাপ্রকার ক্রিয়া দ্বারা নিজের জীবনকে রঙ্গীন করিয়া রাখিতে। জাতিও ঠিক তেমনই চায়, নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি, ক্রিয়া দ্বারা নিজেকে অবাধে বহুধা পরিব্যক্ত করিতে। কিন্তু ব্যক্তির বেলায়, সমাজ এই বাসনার কম বেশী একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়; যে কোন উপায়ে এই সিদ্ধি লাভ সমাজ কখনও সহ্য করেনা বলিয়াই, যাদের নির্দ্দিষ্ট উপায়ের অভাব, তাদের বাসনাকে দমন করিয়া আনিতে হয়। কিন্তু জাতির বেলায় সেরূপ কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই, কোন বিশিষ্ট উপায় ও নির্দ্ধারিত নাই। জাতির এই বাসনা চরিতার্থ হওয়া না হওয়া তার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে। জাতি সর্ব্বদাই চাহিতেছে—নিজের ভিতরে যে শক্তিনিচয় আছে, শিল্প, বিদ্যা, শাসন প্রণালী প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়া দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করিবার যে ক্ষমতা আছে, তার পরিপূর্ণ ক্রীড়া দেখিতে। রাজ্য বিস্তার, উপনিবেশ স্থাপন, ও বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা জাতি একটা অদম্য জীবন স্পৃহারই পরিচয় দেয়—নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসৃত করিয়া নিজের সভ্যতা রক্ষা ও বিস্তারের আকাঙ্ক্ষারই প্রমাণ দেয়। ব্যক্তিতে ২ একত্র হইয়া যে দিন হইতে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন হইতেই জাতি এই লালসার অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। আজ সে নিজের পরিচয় পাইয়াছে, নিজে কি করিতে চাহিতেছে, নিজের ক্রিয়ার ফলে কি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে; তাই আজ জাতির লড়াইয়ে সভ্যতার কথাটা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যক্তিতে ২ যে কঠিন বন্ধনের ফলে জাতির সৃষ্টি হয়, সেটা পৃথিবীতে সব সময়ই ছিল এমন বোধ হয় না। একেবারে অন্যের সহিত সম্বন্ধ বিহীন ব্যক্তি কখন ও ছিল ইতিহাসে কিংবা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও তার প্রমাণ দুর্লভ। কিন্তু তা হইতেই জাতির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না; জন্মমাত্রই মানুষ পরিবারভুক্ত এবং কথঞ্চিৎ সমাজ ভুক্তও হয়; কারণ, জন্মমাত্রই মানুষ নিজের চারিদিকে

আরও মানুষ বর্ত্তমান দেখিতে পায়, এবং তাদের সঙ্গে নিজের ন্যূনাধিক সম্বন্ধের অনুভূতি ও তার হয়। সুতরাং সমাজের ক্রোড়েই তার জন্ম। কোনও একটা সময়ে যৌথ কারবার স্থাপনের মত পরস্পরের সুবিধার জন্য ব্যক্তিতে ২ মিলিয়া সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে, একথা যদিও কেহ ২ বলিয়াছেন, তথাপি তার পক্ষে প্রমাণের একান্ত অভাব। সুতরাং সমাজকে মানুষের আদিম সম্বন্ধ মনে করা যাইতে পারে।

কিন্তু সমাজ হইলেই জাতি হয় না। জাতির জন্য কঠিনতর বন্ধনের প্রয়োজন হয়। নিগ্রোদের, কিংবা মধ্য এসিয়ার দেশ হীন, গৃহহীন, চলিষ্ণু মানব মণ্ডলীরও একটা সমাজ আছে; কিন্তু তারা রাষ্ট্রীয় অর্থে,—যে অর্থে আমরা জাতি শব্দের ব্যবহার করিতেছি, সেই অর্থে জাতি পদবাচ্য নহে। বর্ত্তমানে যারা শক্তিশালী ও সভ্যতাভিমানী, তাদের মধ্যে যে কঠিন বন্ধনে দেহেতে অঙ্গের মত ব্যক্তিকে সমাজের দেহে আটিয়া রাখা হইয়াছে সে বন্ধনের এদের মধ্যে অভাব রহিয়াছে। এদের মধ্যে রাজশক্তিরই অভাব দেখা যায়;—কোন একটা কেন্দ্র হইতে নিঃসৃত অনুশাসন দ্বারা এরা চালিত হয় না; ব্যক্তিবিশেষের কিংবা কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিসমূহের আদেশে ইহাদের জীবন পদ্ধতি গড়িয়া উঠে না; কাহারও আদেশ নয় এমন কতকগুলি সামাজিক আচারই ইহাদের ঐক্য সম্পাদন করে।

প্রাচীন কালে ইহুদীদের মধ্যে জাতিগঠন অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছিল, এবং তার ফলে অনেক কাল ধরিয়া ইহারা নিজেদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যও রক্ষা করিতে পারিয়াছে। বহুকাল রোমের অধীন থাকিয়াও ইহারা নিজেদের সভ্যতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে; এবং তার পরেও দেশ দেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়াও এবং বহু অত্যাচার সহ্য করিয়াও ইহারা এখনও নিজেদের নিজত্ব একেবারে হারায় নাই। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত প্রাচীন ইতিহাসে বিরল।

ইহুদী সমাজে জন্মিয়াও খ্রীষ্ট যে এক নূতন সভ্যতার বীজ সৃষ্টি করিলেন, তাহা সহজেই দেশ কালের সীমা লঙ্ঘন করিয়া মানবের সার্ব্বজনীন সভ্যতার আকার ধারণ করিয়া ফেলিল; সুতরাং ইহার আত্মরক্ষার জন্য জাতিগঠনরূপ উপায়ের আবশ্যক হয় নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্মবিশ্বাস সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ হইলেও একমাত্র উপাদান নয়; সুতরাং যদিও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের চারিদিকে বহুবিধ সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই সকলেরই মধ্যে একই ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া কতকগুলি সাধারণ গুণও রহিয়াছে, তথাপি একা খ্রীষ্টান ধর্ম্মই একটা সভ্যতা নয়। এই হেতু, যদিও বহু জাতিকে আশ্রয় করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম রহিয়াছে তথাপি ইহা কোনও একটী জাতি গঠন করিতে পারে নাই।

বুদ্ধ তেমনই এক সভ্যতার বীজের জীবন পদ্ধতি গঠিত করিবার এক নূতন উপায়ের জনক। তাঁর শিষ্যেরা দেশ বিদেশে এই সভ্যতা বিধায়িনী শক্তি ছড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু কোনও এক বিশিষ্ট জাতি ইহাদ্বারা সৃষ্ট হয় নাই; সুতরাং আত্মরক্ষার কথা তেমন করিয়া কদাপি ভাবিতে হয় নাই। প্রাচীন কালে বৌদ্ধে হিন্দুতে, কিংবা খ্রীষ্টানে মুসলমানে কলহ বহু হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সভ্যতার কথা, জাতিয় জীবনের ধারার কথা তেমন ভাবে কখনও ফুটিয়া উঠে নাই।

আজ পৃথিবীতে জাতীয়ত্বের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়, জাতীয়ত্বের অনুভূতিও অত্যন্ত সতেজ। যেমন করিয়াই হউক বহুজাতি আজ পৃথিবীতে বিদ্যমান। শুধু ধর্ম্মে নয়, শুধু শিল্পে নয়, শুধু জ্ঞানে নয়, শুধু শাসন পদ্ধতিতে নয়,—ইহাদের সবগুলিতে পৃথক্ ও সমবেত ভাবে এক একটা জাতির এক একটা বিশিষ্ট প্রণালী রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতিই আজ তাই সে যে একটা বিশিষ্ট সভ্যতার আশ্রয় একথা পূর্ণ মাত্রায় বুঝিতেছে। এক ব্যক্তি যেমন আর এক ব্যক্তি হইতে পৃথক, জর্ম্মণী তেমনই ফরাসী ও ইংরেজ হইতে পৃথক্। কিন্তু ব্যক্তির বেলায়, একজন যে আর এক জন হইতে পৃথক্, এক জনের জীবনের উদ্দেশ্য ও ধারা যে আর এক জনের উদ্দেশ্য হইতে ভিন্ন, কোনও সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে সব সময় একথা কাহারও মনে জাগে না। জাতির বেলায় ও তেমনই নিজের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হইলেও, সে যে অন্য জাতি হইতে পৃথক্ এবং এই বৈশিষ্ট্যই যে তাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, কোনও বিশেষ সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে জাতি সব সময়

এ কথা মনে জাগাইয়া রাখে না। আজ এই তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাই পৃথিবীর জাতি সকল আজ নিজেদের সত্তা ও সভ্যতার কথা বিশেষ করিয়া ভাবিতেছে।

যাদের একটু মাত্রও জাতীয়তার ভাব জাগিয়াছে, তারা আজ এই প্রলয়ের দিনে,—এই ভাঙ্গাগড়ার দিনে নিজেদের সত্তা ও সভ্যতার কথা একেবারে না ভাবিয়া পারে না। সমাজে আমার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে এবং কোথায় অন্যের অস্তিত্বের সহিত আমার স্বার্থ মিশাইয়া দিতে হইবে, সমাজের অনুশাসন ও তার নীতিজ্ঞান তা অল্প বিস্তর বলিয়া দেয়; কিন্তু জাতির সমাজে আন্তর্জাতিক কানুনের সে ক্ষমতা নাই, সুতরাং জাতিতে জাতিতে মিলিয় বাস্তবিক একটা সমাজও এখন পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই;—ভবিষ্যতে কবে হইবে কিংবা আদৌ হইবে কি না, কেহ জানে না। কিন্তু বর্ত্তমানে যে কাড়াকাড়ি লাগিয়াছে, তাহাতে সকলকেই আপনার নিজত্ব বাঁচাইবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

আমাদেরও একটা সভ্যতা ছিল। কিন্তু কোথায় যে সে সভ্যতার বিশেষত্ব তাহা এখন খুঁজিয়া পাই না। তথাপি হিসাব নিকাশের সময় আসিয়াছে; নিজের কতটুকু রক্ষিত হইয়াছে, এবং কতটুকু রক্ষিত হইলে নিজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা একবার ভাবিতে হয়। আমরা যে আমরা, সে আমাদের সভ্যতা নিয়াই। এই সভ্যতাকে যদি রক্ষা করিতে না পারি, তা হইলেও কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি হিসাবে আমরা বিনষ্ট না হইতে পারি,—তা হইলেও আমাদের পুত্র পৌত্রাদি এই দেশেই হয়ত বাস্তব্য করিবে, কিন্তু আমাদের জাতীয়ত্ব, আমাদের বৈশিষ্ট্য দূরীভূত হইবে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর চেষ্টায় চিন্তা ও জীবনের যে একটা বিশিষ্ট ধারা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, সভ্যতার আজ এই তুমুল জীবন-সংগ্রামের ভিতর দিয়া আমরা কি তাকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিব?

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

স্বরূপ চরিত্র।

এই গ্রন্থ পাঁচালী ছন্দে লিখিত। ইহার রচয়িতা বৈদ্য রঘুদাস সেন, নিবাস ভিটাদিয়া গ্রাম। ইহার মাতার নাম মেধা, পিতার নাম অতিথরাম সেন, ইনি আচমিতার গোস্বামী বংশের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীমন্ত বিদ্যারত্নের শিষ্য। উহা স্বরূপ চরিত্রেই বর্ণিত আছে,—যথা:—

"স্বরূপের চরিত্র লিখিলাম তাঁর বংশাবলী।
গুরুদেব শ্রীমন্ত দেহ চরণ মাথে তুলি॥
আমার গোসাঞি মোরে বড় দয়া কৈল।
তাঁর কৃপাবলে মুঞি গ্রন্থ বিরচিল॥
শ্রীমন্ত সোনারাম গুরুপদে রহু আশ।
স্বরূপ চরিত্র কহে বৈদ্য রঘুদাস॥
মাতা মেধা পিতা অতিথরাম সেন।
ভিটাদিয়া গ্রামে হয় বাসস্থান॥"

মামুদপুরের বৈদ্য সেনবংশ, পূর্ব্বে ভিটাদিয়া গ্রামে বাস করিতেন, পরে মামুদপুরে গিয়া বসতি করেন। বোধ করি রঘুদাস সেন, সেই সেনবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এই গ্রন্থ ১১৬৭ সালের আশ্বিন মাসে রচিত হয়, গ্রন্থকার গুরুদেবের সঙ্গে বৃন্দাবন যাওয়ার সময় নৌকায় বসিয়া গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থে সম্বৎ, শক, বঙ্গাব্দ এই তিনটী সময় দেওয়া আছে। যথা:—

"অদিতি চন্দ্রির আর জীব আত্মা হন। (১৮১৭)
বিক্রম সংবতের এই চলিল যখন॥
পক্ষবসু শূলীচন্দ্র শকের হইল। (১৬৮২)
বঙ্গাব্দের যুন শিব রুদ্র আসিল॥ (১১৬৭)
আশ্বিন মাসেতে আমি রচিলাম গ্রন্থ।
শ্রীগুরু চরণে মন মজাঞা একান্ত॥
গুরুসনে বৃন্দাবন করিলাম গমন।
নৌকায় বসিয়া গ্রন্থ করিলাম রচন॥
গুরুর আজ্ঞায় আমি হঞা কুতুহলী।
রচিলাম এই গ্রন্থ করিয়া পাঁচালী॥
ইতি বৈদ্য রঘুদাস সেন বিরচিত স্বরূপচরিত্র গ্রন্থ সমাপ্ত।"

এই গ্রন্থে স্বরূপ চক্রবর্ত্তী গোস্বামীর চরিত্র বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর প্রকৃত নাম রাম-রাম সান্ন্যাল, গুরুদত্ত নাম স্বরূপ চক্রবর্ত্তী, ইনি বৈষ্ণব সমাজে স্বরূপ চক্রবর্ত্তী নামেই বিখ্যাত ছিলেন। যথা—

নরোত্তম বিলাসে।

"শ্রীস্বরূপ চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞ সর্ব্বমতে।
শ্রীগোবিন্দ সেবা বাস হুসেনপুরেতে॥"

রামরাম নসিরুজিয়ালের অন্তর্গত নওপাড়ার গণিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার চরিত্রও বংশাবলী বর্ণন প্রসঙ্গে গণিত বংশের, নওপাড়ার জমিদার বংশের, আশুড়িয়ার বাগচী বংশের, মসুয়ার মৈত্র ভট্টাচার্য্য বংশের, ও বাণীগ্রামের গোস্বামী বংশের আংশিক কথা লিখিত আছে। রামরাম বা স্বরূপ চক্রবর্ত্তী বাণীগ্রামে বিবাহ করেন, শ্রীমন্ত বিদ্যারত্ন প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণ মাতামহের বৃত্তি পাইয়া আচমিতা গ্রামে বাস করেন, এখন সেই বংশ আচমিতায়ই আছেন।

মামুদপুরের বৈদ্য সেনবংশ বাণীগ্রামের গোস্বামী-গণের শিষ্য। মাতামহের শিষ্য বিধায় বোধ করি রঘুদাস সেন শ্রীমন্ত বিদ্যারত্ন গোস্বামীর শিষ্য হইয়া ছিলেন। মামুদপুরের সেনবংশে আচমিতার গোস্বামীগণের শিষ্য নাই, সুতরাং বোধ হইতেছে রঘুদাস সেনের বংশ নাই।

স্বরূপ চরিত্রে অনেক বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাতিব্রত্য ধর্ম্মই অতিশয় বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

স্বরূপ চরিত্রে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বন্দনা, কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর মহিমা, মণিপুররাজ বংশাদি উদ্ধার, কৃষ্ণ চরণের সৈদাবাদে বসতি, এগারসিন্দুরের রূপনারায়ণ সরস্বতী গোস্বামীর কথা, কুমরপুরের গোকুল চক্রবর্ত্তীর কথা, বেতিলার রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী গোস্বামীর ভজন মহিমা বর্ণন, নিশ্বাস প্রশ্বাসে হরে কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মহিমা বর্ণন, বল্লভ চক্রবর্ত্তীর কথা প্রসঙ্গ ক্রমে রাঢ়ী বারেন্দ্র কুল বর্ণন, কুল সাগর ও কুল রত্নের কথা, রাঢ় বরেন্দ্র দেশ নির্ণয়, আদিশূর রাজার যজ্ঞের বিবরণ, দেশীয় বৈদিকের যজ্ঞে ফল না হওয়ায় কনোজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন, পঞ্চ ঋষির আগমন, পঞ্চ ঋষির বংশ বর্ণন, বল্লাল সময়ে এগার শত ঘর কনোজ ব্রাহ্মণের কথা, রাঢ়ে সাড়ে সাত শত ও বরেন্দ্রে সাড়ে তিন শত কনোজ ব্রাহ্মণ, রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ, দেশীয় বৈদিকের সপ্তশতী নাম হইবার কারণ, কনোজে সপ্তশতী গণের কন্যাদানের কথা, বল্লাল সভার একত্রিংশৎ জন সভা পণ্ডিতের নাম নির্দ্দেশ, ইহাদের সন্তান গণের রাঢ়ে, বারেন্দ্রে কৌলীন্য লাভ, রাঢ়ীয় কুল শাস্ত্র মতে আদিশূরের যজ্ঞকর্ত্তা পঞ্চঋষি, বারেন্দ্রের কুল শাস্ত্রমতে আদিশূরের যজ্ঞকর্ত্তা পঞ্চঋষি, উভয়ের পঞ্চ ঋষিই কুলরত্নের যাজ্ঞিক পঞ্চ ঋষির সন্তান, পঞ্চঋষির সঙ্গীয় ক্ষত্রিয় পঞ্চজনের কথা। সান্ন্যালবংশীয় কুলীন যদু মিশ্রের বংশাবলী, যদু মিশ্রের চামটা হইতে নসিরুজিয়াল নওপাড়ায় আগমন, নসিরুজিয়াল নওপাড়ার জমীদার সনাতন রায় চৌধুরীর কন্যার সহিত যদু মিশ্রের বিবাহ, যদুমিশ্রের নও-পাড়ায় বসতি, সনাতনের পুত্র শুভানন্দ রায়কে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পাঠান মুসলমানের নসিরুজিয়াল রাজ্যগ্রহণ, শুভানন্দরায়ের অধস্তন জ্ঞাতি সন্তান, গোপীবল্লভ রায়ের পুনরায় রাজ্য প্রাপ্তি, আশুড়িয়ার বাগচীও মসুয়ার মৈত্র বংশের কথা, যদুমিশ্রের সন্তানের গণিত নাম হওয়ার কারণ, সান্ন্যালবংশীয় কুলীন শ্রেষ্ঠ গণিত হরিশ্চন্দ্র মিশ্রের পুত্র রামরাম বা স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর বংশাবলী বর্ণন, স্বরূপের গৃহত্যাগ, নওপাড়া হইতে বালকাবস্থায় গোযানে গমন, রামকৃষ্ণ আচার্য্যের সহিত মিলন, রামকৃষ্ণ আচার্য্যের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্যলাভ, রামকৃষ্ণ আচার্য্যের নিকট স্বরূপের দীক্ষা, তাঁহার ভজন মহিমা বর্ণন, স্বরূপের কুম্ভকে অবস্থান, স্বরূপের পূর্ব্বনাম রাম রাম সান্ন্যাল, রামকৃষ্ণ আচার্য্যের রামরামকে স্বস্বরূপে অবস্থিত দেখিয়া, তাঁহার প্রতি স্বরূপ চক্রবর্ত্তী নাম প্রদান, রামরামের স্বরূপ চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাতি লাভ, স্বরূপের সিদ্ধ নাম, স্বরূপের গোবিন্দ জিউর সেবা প্রকাশ, দেশে আগমন, ব্রহ্মপুত্র তীরে হোসেনপুরে বাস, হোসেনপুরে গোবিন্দ জিউর বিশেষরূপে সেবাপ্রকাশ, কোন বৃহৎ পণ্ডিত সভায় সুকঠিন ঈশ্বর বিষয়ক প্রশ্নের সুমীমাংসা করায় স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর বিশেষ সুখ্যাতি লাভ, সেই পণ্ডিত সভায় বাণীগ্রাম হইতে রূপনারায়ণ সরস্বতী গোস্বামীর

পুত্রত্রয় নন্দরাম বিদ্যাসাগর, শ্রীধর তর্কালঙ্কার ও কৃষ্ণজীবন বাণীকণ্ঠ বাচস্পতির আগমন বর্ণন, কৃষ্ণজীবনের বাণীকণ্ঠ নাম লাভের কথা, কৃষ্ণজীবন বাণীকণ্ঠ বাচস্পতির ভ্রাতৃদ্বয় সহ বাণীগ্রামে বাস, বাণীগ্রামের বাণীয়া গ্রাম নামান্তর হওয়ার কারণ, সান্যাল বংশীয় কুলীন রামরাম বা স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর সহিত লাহিড়ী বংশীয় কুলীন কৃষ্ণজীবন বাণীকণ্ঠ বাচস্পতির কন্যা কনকমঞ্জুরীর বিবাহ, কৃষ্ণজীবনের নিকট কনকমঞ্জুরীর দীক্ষা, কনকমঞ্জুরীর প্রতি কৃষ্ণজীবনের কৃষ্ণভজন উপদেশ, গুরুতত্ত্ব, সংক্ষিপ্ত পূজা পদ্ধতি, এবং বিস্তৃত রূপে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বর্ণন, সুরমা, সুশীলা ও সাবিত্রী উপখ্যান, সতীর প্রশংসা ও কুলটার নিন্দা, কনকমঞ্জুরীর স্বামী সেবা, স্বরূপের পুত্রত্রয় শ্রীমন্ত বিদ্যারত্ন, সোণারাম ন্যায়ভূষণ ও গঙ্গারাম তর্কবাগীশের কথা, তাহাদিগের এবং তাঁহাদিগের পত্নীত্রয়ের কনকমঞ্জুরী হইতে মন্ত্র গ্রহণ, পিতার অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীমন্তাদি ভ্রাতৃত্রয়ের মাতামহালয়ে বাণীয়া গ্রামে কিছু দিন বাস, মাতামহ বৃত্তি পাইয়া শ্রীমন্তাদি ভ্রাতৃত্রয়ের আচমিতা গ্রামে বসতি, শ্রীমন্ত বিদ্যারত্ন ও গঙ্গারাম তর্কবাগীশের পুত্র পৌত্রগণের নাম নির্দ্দেশ, স্বরূপের শাখা বর্ণন, বৈষ্ণব, অধিকারী, গোস্বামী, ঠাকুর, চক্রবর্ত্তী ও প্রভুর লক্ষণ, বৈষ্ণব মাহাত্ম্য, অসৎসঙ্গ ত্যাগ, ত্যাগীর কথা। ইতি।

এই পুস্তকখানি অতি উপাদেয় বলিয়া ৺রজনীকান্ত গোস্বামী মহাশয় মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন, সংশোধনের দোষে প্রথম ফর্ম্মাতেই অনেক ভ্রম প্রমাদ বাহির হয়, দুই ফর্ম্মামাত্র ছাপা হইয়া মুদ্রন কার্য্য স্থগিত থাকে, [illegible] তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, ছাপা বন্ধ আছে। পুনরায় ছাপাইতে বাসনা আছে, ভগবানের কৃপা থাকিলে পূর্ণ হইবে।

সুরেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী।

বাসনা।

সে যদি গো ভালবাসিত!
সান্ধ্য গগণে তারকার সনে,
ফুটিয়ে নীরবে হাসিত।
প্রভাত সমীরে বয়ে যেত ধীরে—
কুসুমে ঢালিত প্রাণ,
বন ফুলে হার দিত উপহার,
দিত প্রেম প্রতিদান;
প্রকৃতির বুকে, হাসি ভরা মুখে,
স্মৃতি টুকু তার রাখিত।
সে যদি গো ভালবাসিত!

(২)

কোন্ দূর দেশে রয়েছে বঁধুয়া
ফিরে কি আসিবে আর?
কে কুড়াবে মোর নয়নের নীর—
গাঁথিবে তরল হার?
সে যদি বুঝিত হৃদয় বেদনা
আঁখি জলে মালা গাথিত।
সে যদি গো ভালবাসিত!

(৩)

সে যে সুন্দর শশী নির্ম্মল
ফুল্ল সেফালী বন,
কেন সে বুঝেনা এত যে আমার
আকুল পরাণ মন?
সে যদি বুঝিত, মরমে আমার—
রেণুকণা তার মাখিত।
সে যদি গো ভালবাসিত!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

সের সিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আমরা সেই ঘোর জঙ্গলে আহারাদি কেমন করিয়া সংগ্রহ করিতাম। ইহার উত্তর খুব সোজা। এই লাইন, গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং প্রস্তুত করাইতেছিলেন। কয়েকজন ভারতবর্ষীয় ঠিকাদার গভর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহারা নিকাতে দোকান খুলিয়া আমাদিগকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইত। অবশ্য তাহার মূল্য দিতে হইত। কিন্তু সমস্ত জিনিসেরই দামের হার বাঁধা ছিল। তাহার সামান্য মাত্র এদিক ওদিক হইলে ঠিকাদারের জরিমানা হইত। চাল, আটা, ঘি, তেল, আলু, কুমড়া, দাল, মসলা প্রভৃতি সবই পাওয়া যাইত। এমন কি চা, বিস্কুট, টিনের দুধ পর্য্যন্ত থাকিত। তরকারির মধ্যে আলু ও কুমড়া। কখনও ২ লাউ ও মূলা পাওয়া যাইত। শুনিলাম, নিকার অসভ্য অধিবাসীরা তরকারী বড় একটা ব্যবহার করে না। জঙ্গলে প্রচুর শীকার পাওয়া যায় বলিয়া তাহারা ভাত মাংস ভিন্ন আর কিছু খাইত না। মাছ একবারে পাওয়া যাইত না। টিনে করা সামুদ্রিক মৎস্য মধ্যে ২ মোম্বাসা হইতে আসিত। কিন্তু তাহার দাম অনেক বেশী। অনেকে ইচ্ছা থাকিলেও খাইতে পারিত না। সেখানে একজন লোকের খাইবার খরচ ৫।৬ টাকার অধিক পড়িত না। একটু কষ্ট করিয়া থাকিলে ৩।৪ টাকায় ও চলিত। বস্ত্রাদিও উক্ত ঠিকাদারেরা বিক্রয় করিত; তবে তাহার দাম বাঁধা ছিল না। প্রায়ই আমাদিগকে ঠকিতে হইত। পত্রাদি যাতায়াতের জন্য ঐ জঙ্গলের মধ্যে আমরা যাইবার ২ সপ্তাহ পরে এক ডাকঘর খোলা হয়। রতিকান্ত উহার পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত হন। ইহার জন্য তাহার বেতন ২০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইল।

সে মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা নিকায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। জুন মাসের ১৮ তারিখ অবধি আমরা বেশ সুখে ছিলাম। ১৯ তারিখ রাত্রি ১০ টার সময় আমাদের বাসার উত্তর পশ্চিম দিকে এক বিষম কোলাহল শুনিতে পাইলাম। সে দিন আমার শরীর তত ভাল ছিল না বলিয়া আমি আর উঠিয়া অনুসন্ধান করিলাম না। রতিকান্ত প্রায়ই সকাল ২ শয়ন করিত। সে দিনও তাহাই হইয়াছিল বলিয়া আমি আর তাহাকে উঠাইলাম না। পরদিবস প্রাতঃকালে শুনিলাম নদীর ধারের কুলিদের মধ্যে একজন কুলিকে রাত্রে সিংহে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। সাহেব যখন গল্পটা শুনিলেন, বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল, অর্থলাভে কোনও কুলি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এই ধারণা দূরীভূত হইল।

২০ তারিখ রাত্রি ১১ টার সময় পুনরায় ঐ প্রকার গোলযোগ শুনিতে পাইলাম। সে দিন ও আর কিছু জানিতে পারিলাম না। আমাদের বাসার কাছে যে ৪০০ কুলি থাকিত, তাহাদেরই কয়েকজন কুলি প্রত্যূষে আসিয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল এবং কহিল যে, ১৩ নম্বরের জমাদারকে গত রাত্রে সিংহে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা ৫ জন ও জমাদার একই ঘরে শুইয়াছিল। সিংহ তাহাদের সম্মুখেই জমাদারকে টানিয়া লইয়া যায়। ঘটনাটা এই—তখন রাত্রি প্রায় ১১টা কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাহারা সকলে জাগিয়াছিল। এই সময় হঠাৎ ঘরের একদিককার দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সিংহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। জমাদার ঐ দেওয়ালের কাছেই এক খাটিয়ার উপর বসিয়াছিল। সিংহটা একবারে তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিল। হতভাগা একবার বলিয়াছিল, "আয় আল্লা! তাহার পরই সিংহটা তাহাকে লইয়া অদৃশ্য হইল।

সাহেব তৎক্ষণাৎ ঐ কুটিরে গমন করিলেন ও ভগ্ন অংশ প্রভৃতি দেখিয়া বন্দুক হস্তে সিংহের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। আমরা ১৩।১৪ জন লোক তাঁহার সঙ্গে ২ চলিলাম। লোকটাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল বলিয়া আমরা অনায়াসে যাইতে লাগিলাম। প্রায় এক ফার্লং দূরে এক ঝোপের পাশে যাহা দেখিলাম, তাহা শীঘ্র ভুলিব না। অনেক দূর পর্য্যন্ত রক্ত ও মাংসের ক্ষুদ্র ২ টুকরা চারিদিকে ছড়ান। একদিকে দেখিলাম, হতভাগার মাথাটা পড়িয়া রহিয়াছে। চক্ষের দৃষ্টি কি

ভীষণ! সিংহে ধরিবার সময় তাহার মনে যে কি ভয়ঙ্কর ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট ছবি তখনও চক্ষের মধ্যে বেশ ফুটিয়া রহিয়াছে। ভাল করিয়া চারিদিক পরীক্ষা করাতে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে দুইটা সিংহ দেহ লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। দুইটা সিংহের কথাটা যে আমাদের কল্পনা নয় তাহা পাঠক পরে ভাল করিয়া জানিতে পারিবেন।

যাঁহারা কখনও বৃক্ষের উপর রাত্রিবাস করেন নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন না, ইহা কি কষ্টদায়ক কাজ। ১০।১২ হাত উর্দ্ধে আমাদের প্রত্যেকের জন্য একখানা করিয়া তক্তা বাঁধা হইত। উহার চওড়াই আধ হাতের অধিক হইবে না। উহাই আমাদের শয্যা। বাধ্য হইয়া সমস্ত রাত্রি সজাগ থাকিতে হইত। একটু তন্দ্রা আসিলেই 'পপাত ধরণীতলে'। অথচ সাহেব যতক্ষণ গাছের উপর থাকিতেন, একটি মাত্র বাক্য ব্যয় করিতেন না। সে যদি শব্দ শুনিয়া শীকার ফস্‌কিয়া যায়। আমি কিন্তু এ প্রকার অবস্থায় নিজকে দড়ি দিয়া তক্তার সহিত বাধিয়া ফেলিতাম। সাহেব কি করিতেন ঠিক বলিতে পারি না।

সিংহ গাত্রবস্ত্র লইয়া ছুটিয়াছে।

এরাত্রেও সেই পূর্ব্ব ঘটনার পুনরাভিনয় হইল। দূরে বিষম কোলাহল উঠিল সাহেব সক্রোধে বলিলেন, "সয়তান আবার আমাকে ফাঁকিদিল। আশ্চার্য্য! কেমন করিয়া ইহারা জানিতে পারে বলিতে পারি না। সাহেব যখন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন, তখন আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বলিলাম, "হুজুর! বাঘ সিংহ প্রভৃতির দস্তুর, যেখানে একবার শীকার ধরে, সেখানে আর যায় না।" সাহেব বলিলেন, "হইতে পারে। কিন্তু সব জায়গায় এ নিয়ম চলে না। আমি কয়েক জায়গায় নিজে দেখিয়াছি যে, প্রথম রাত্রে হয়ত শীকারের অর্দ্ধেক খাইয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়, পর রাত্রে আবার আসিয়া উহা খায়। এমন কি যতদিন খাওয়া শেষ না হয়, ততদিন আসিতে থাকে।"

ঐদিন রাত্রে সাহেব ও আমি যেখানে মৃত দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল ঐ স্থানের এক বৃক্ষের উপর সমস্ত রাত্রি বসিয়া রহিলাম। সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে সিংহ নিশ্চয়ই ঐ দেহ খাইবার জন্য ঐখানে আসিবে। কিন্তু তাঁহার ঐ অনুমান বৃথা হইল। রাত্রি ১০ টার সময় হঠাৎ অর্দ্ধ মাইল দূরের একস্থান হইতে ভীষণ চীৎকার ধ্বনি শুনিলাম। কিন্তু সেই রাত্রিকালে সেই ভীষণ জঙ্গল পার হইয়া ঘটনাস্থলে যাওয়া নিরাপদ নয় বলিয়া, আমরা সেই গাছের উপরেই রাত্রি বাস করিয়া কর্ম্ম ফল ভোগ করিলাম।

পরদিন ঐ একই প্রকার গল্প শুনিলাম। ৭ জন কুলি একত্রে শুইয়াছিল। দরজা ভাঙ্গিয়া সিংহ একজনকে ধরিয়া লইয়া যায়। ঐ দিন রাত্রে আবার আমরা ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। বৃক্ষের নিকট দুইটা ছাগল বাঁধিয়া রাখা হইল।

পরং এই প্রকার ব্যাপার উপস্থিত হওয়াতে সকলের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের আবির্ভাব হইল। করিম খাঁ ও মহিনা নিজের ঘর ছাড়িয়া আমাদের ঘরে রাত্রি বাস

করিতে লাগিল। সাহেবের পরামর্শে আমি ও মহিনা শুইবার বিছানার ধারে একটা বন্দুক রাখিয়া দিতাম। চারিদিককার দেওয়াল ও দরজা যতদূর সম্ভব মজবুত করিলাম। করিম বেচারা কিন্তু আমাদিগকে বড়ই বিরক্ত আরম্ভ করিল। রাত্রিকালে সে ঠিক আমার পাশে শুইত। বাহিরে সামান্য শব্দ হইলেই সে একবারে আমার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িত। এক ২ দিন এমন কাণ্ড হইত যে, ঘরে তিষ্ঠান দায় হইত। কিন্তু রতিকান্ত বাহাদুর ছেলে! আমার বিশ্বাস ছিল 'ভাতখোর বাঙ্গালীরা বড়ই ভীরু হয়। কিন্তু এই ভীষণ গোলযোগের সময় একদিনের জন্যও তাহাকে ভীত হইতে দেখি নাই। আফ্রিকায় আসিয়া সে বন্দুক চালান শিখিয়াছিল। সময় পাইলেই সে লক্ষ্য স্থির করিত। এক ২ দিন সাহেব নিজে তাহাকে শিক্ষা দিতেন। রাত্রে কোনও গোলযোগ শুনিতে পাইলে সে বন্দুক লইয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইত। আমরা মানা না করিলে সে নিশ্চয়ই বাহির হইত। সেই ভীষণ জঙ্গলে কয়েকদিন হইতে সিংহ প্রত্যহ একজন না একজনকে লইয়া যাইতেছে, এমন অবস্থায় রাত্রে ঘরের বাহির হওয়া বড় কম সাহসের কাজ নয়।

মহিনা ও করিম যেমন আমাদের ঘরে আসিয়াছিল, সেইরূপ অনেক লোক ঘর বদল করিয়াছিল। এখন এক ২ ঘরে ১০।১২ জন লোক বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সমস্ত ঘর মজবুত করা হইয়াছিল। অনেক স্থানে রাত্রে ঘরের চারিদিকে আগুণ জ্বালাইয়া রাখা হইত। কিন্তু এত করিয়াও উপদ্রব বন্ধ হইল না। প্রত্যেক রাত্রেই একজন করিয়া লোক অদৃশ্য হইতে লাগিল। সাহেব দিনের বেলায় কয়েক দিন জঙ্গলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। ব্যাপার ঠিক সেই ভাবেই চলিতে লাগিল। এইবার আমরা স্পষ্ট বুঝিলাম দুইটা সিংহ এই সমস্ত কাজের নায়ক। একদিন রাত্রে, যখন একটা সিংহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন সেই ঘরের সকলেই দেখিল, আর একটা সিংহ ভগ্ন প্রাচীর পথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আমরা অনেক জায়গায় দুইটা সিংহের পায়ের দাগ দেখিয়াছিলাম।

এই বিপদের সময়ও কিন্তু মধ্যে ২ দুই একটা হাসির ঘটনা উপস্থিত হইত। ইহার মধ্যে তিনটি কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম:—একবার এক হিন্দুস্থানী মহাজন রাত্রি ৮টার সময় গাধার উপর চড়িয়া নিকায় আসিতেছিল। হঠাৎ একটা সিংহ বাহির হইয়া গাধার উপর লাফাইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য আরোহী ও বাহন তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল। গাধার উপর এক বাক্স টাকা পয়সা প্রভৃতি রক্ষিত ছিল। গাধা পড়িবার সঙ্গে ২ বাক্সটাও ঝন্ ২ শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। সিংহটা এই শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাজন বেচারা তখনি পাশের এক বৃহৎ গাছের উপর উঠিয়া পড়িল এবং সমস্ত রাত্রি ঐখানে বসিয়া রহিল।

ইহার দুই দিন পরে প্রায় এইরূপই আর একটা ব্যাপার ঘটিল। একজন ঠিকাদার নিজের তাঁবুর মধ্যে শয়ন করিয়াছিল। এমন সময় একটা সিংহ তাহার তাবুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহার বিছানার দরিখানা টানিয়া লইয়া যায়। পাশের তাঁবুতে আরও দুইজন ঠিকাদার শুইয়াছিল। উহার চীৎকারে তাহারা উপস্থিত হইল, এবং বন্দুক হাতে লইয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া রহিল। সুখের বিষয় সিংহটা নিজের ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য আর উপস্থিত হইল না।

আর একদিন একটা বড় ঘরে ৪ জন কুলি শুইয়াছিল। এমন সময় একটা সিংহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং একটা কুলির ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার গায়ের বস্ত্রখানা ও উপাধানের বালিশটা লইয়া অদৃশ্য হয়। পরদিন ঐ স্থানের অল্পদূরে বালিশটা দেখিতে পাওয়া গেল। সিংহ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াই অবশ্য অত্যন্ত বিরক্তির সহিত উহা ফেলিয়া চলিয়া যায়।

যাহা হউক, ক্রমে ২ সিংহ দুইটা এ প্রকার নির্ভীক হইয়া পড়িল, যে কাহাকেও বা কোন ও প্রকার উপায়কে গ্রাহ্য করিত না। এমন কয়েকবার হইয়াছে যে, সিংহটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র ঘরের লোকে উপর্যুপরি বন্দুক ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু উহাতে বিন্দুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া সে নিজের শীকার হস্তগত করিয়াছে। চারিদিকে আগুণ জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে, তথাপি তাহারা উহা পার হইয়া শীকার হস্তগত করিয়াছে।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

পশ্চিম ময়মনসিংহের উপেক্ষিত প্রাচীন স্মৃতি।

ধনপতি ও ধনবাড়ী।

বহু প্রাচীন কাল পূর্ব্বে ধনপতি ঠাকুর নামে একজন ব্রাহ্মণ জমিদার পুখরিয়া পরগণার সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার বাসস্থানের নামানুসারেই গ্রামের নাম ধনবাড়ী হইয়াছিল। এই বাড়ীর উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এই তিন দিক দিয়াই একটী নদী প্রবাহিত ছিল, এজন্য এ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর ছিল। ঐ নদীর ক্ষীন রেখা আজও ধনবাড়ীতে দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহার স্বাধীন কার্য্য কলাপে তৎকালীন দিল্লীশ্বর ধনপতির বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া আড্ডা করিলেন। সকলেরই ফকিরের বেশ। প্রতিদিনই ইহাদের দল পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। শেষে যখন দলের সকল লোকের আসা শেষ হইল, তখন ইহারা ধনপতির বাড়ীর সম্মুখে প্রকাশ্য ভাবে গোহত্যা করিলেন। তাহার ফলে ধনপতির সহিত ইহাদের প্রবল সংঘর্ষ বাধিল এবং সংঘর্ষের ফলে ধনপতি পরাস্ত এবং বন্দী হইলেন। পরে ইস্পিঞ্জর খাঁ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া দিল্লীতে যাইয়া সম্রাটকে বিজয় বার্ত্তাজ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া ধনপতির সমুদয় সম্পত্তি ভ্রাতৃদ্বয়কে জায়গির স্বরূপ প্রদান করিলেন। উহার কতকাংশ একেবারে লাখেরাজ ছিল। উহা ব্রিটীশ শাসন আমলেও লাখেরাজ স্বকৃত হইয়া আজ পর্য্যন্ত এই বংশের দখলে

ইস্পিঞ্জর খাঁ মনোয়ার খাঁর মসজিদ—ধনবাড়ী।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ইহার উপর নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময় সৈয়দ ইস্পিঞ্জর ও খাঁ সৈয়দ মানোয়ার খাঁ নামক ভ্রাতৃ দ্বয় বোগদাদ প্রদেশ হইতে সৌভাগ্যের অন্বেষণে জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ইহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদিগকে, ধনপতির দমনের জন্য বহু সৈন্য সহ পাঠাইয়াছিলেন। ইস্পিঞ্জর খাঁ সৈন্য সহ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া একবারে আছে। ইস্পিঞ্জর খাঁ অতিশয় দাতা ছিলেন। এই সময় কোনও দুষ্টলোকের চক্রান্তে সম্রাট ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে দিল্লীতে নিয়া কারারুদ্ধ করেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় ক্ষুধার জ্বালায় ইহারা সম্রাটের একটী মেষ হত্যা করিয়া কারাগারের অন্যান্য বন্দীর সহিত একত্রে ভক্ষণ করেন। এই অপ্রতিকর কার্য্য সম্রাটের কর্ণ গোচর হইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং আদেশ

করেন যে তাঁহার অশ্বশালার নূতন আনিত সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্ট অশ্বে এই দুই ভ্রাতাকে আরোহন করাইয়া অশ্বকে যথা নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতে হইবে। সম্রাটের আদেশে এই অশান্ত ও দুষ্ট অশ্বকে দুই ভ্রাতা শিক্ষিত তাতার অশ্বারোহীর ন্যায় এমন নৈপুণ্যের সহিত পরিচালিত করিলেন যে তাহাতে সম্রাট ইহাদের সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সেই মুহূর্ত্তে ইহাদের কারা মুক্তির আদেশ প্রচার করিলেন। এবং ইস্পিঞ্জর খানকে "খানি খানম" (khan i-khanam) এই গৌরব জনক উপাধি প্রদান

মাকুল্যার ভট্টাচার্য্যগণের পূর্ব্ব পুরুষ যদুবীর ভট্টাচার্য্যকে বাঙ্গলা ১০২৫ সালে সনন্দ দ্বারা পোড়াবাড়ী গ্রাম লাখেরাজ প্রদান করেন। উহার এক নকল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক মোকদ্দমা উপলক্ষে পিঙ্গনার প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট ছিল। তিনি লিখিয়াছেন "উহাতে এই মর্ম্মে লিখাছিল—নবগ্রাম দিগরের অন্তর্গত বন্দ পোড়াবাড়ী তোমাকে লাখেরাজ দিলাম।

শ্রীইস্পিঞ্জর খাঁ। শ্রীমনোয়ার খাঁ।
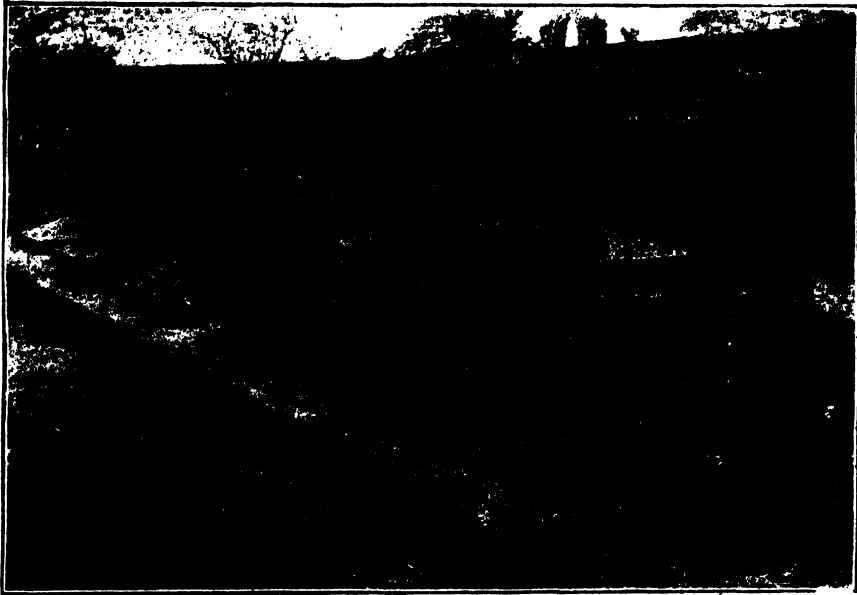
বঃ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস।"

ইস্পিঞ্জর খাঁ মনোয়ারখাঁর সমাধি স্থান—ধনবাড়ী।

পূর্ব্বক ধনবাড়ীতে পুনঃ প্রেরণ করিলেন। ধনবাড়ী প্রত্যাগমন করিয়া ইঁহারা অতি উদারতার সহিত সম্পত্তি শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমদর্শিতা ইহাদের শাসনের মূল মন্ত্র ছিল। তাহার ফলে ইহারা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের সমভাবে ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিগরের কৃষ্ণ বিশ্বাস ইহাদের দেওয়ান ছিলেন। ইঁহারা পুখরিয়া পরগণার ব্রাহ্মণগণকে বহু লাখেরাজ, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। পঞ্চসনার কাগজে পুখরিয়া পরগণার ব্রহ্মোত্তর তালিকায় বহু স্থানে ইস্পিঞ্জর খাঁর নাম পরিদৃষ্ট হয়। পালবাড়ী নিবাসী রক্ষিত ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব পুরুষগণকে ইহারা কাউয়ালরা গ্রামখানি সম্পূর্ণ ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন।

মাকুল্যার ভট্টাচার্য্যগণের ঐ অংশের মালিক নির্ব্বংশ হওয়ায় তাঁহার দৌহিত্র নবগ্রামের শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত ভাদুরী মহাশয় ঐ সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন। ইস্পিঞ্জর খাঁর পরবর্ত্তী বংশধরগণের আমলে অন্যান্য অনেক সম্পত্তির সহিত এই অংশও নাটোরের হস্তগত হয়। নাটোরের প্রথম সময়ে এই নবগ্রাম দিগরের সম্পত্তি নাটোরের একজন কার্য্য কারকের বেতনের জন্য মুজরাই ছিল। পরে ইহা নানা ভাবে বিভক্ত হয়। পোড়াবাড়ী নবগ্রাম দিগর হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র মহাল হয় এবং নবগ্রাম দিগরের নাম লোপ পাইয়া ইহার কতক মহাল লইয়া উহা তরফ মাদারজানীদিগর নামে পরিচিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে উহা ভাদুড়ী জমিদার গণের সম্পত্তি।

এই অঞ্চলে নানা স্থানে নানা দিঘি, পুষ্করিণী, ইষ্টক স্তূপ প্রভৃতির সহিত ইস্পিঞ্জর খাঁ মনোয়ার খাঁর স্মৃতি বিজড়িত আছে। ইস্পিঞ্জর খাঁর পুত্র পিয়ার আলী খাঁ লোক চলাচলের সুবিধার জন্য বহু রাস্তা প্রস্তুত করেন। উহা "পিয়ারআলী খাঁর জাঙ্গাল" বলিয়া প্রসিদ্ধ। অদ্যাপিও লোকে উহাদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকে। ইস্পিঞ্জর খাঁ, মনোয়ার খাঁ ধনবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তাঁহাদের উপাসনার সুবিধার জন্য একটী সুন্দর মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। উহা অদ্যাপি সুন্দর ভাবে রক্ষিত আছে। ইঁহাদের বর্ত্তমান বংশধর মাননীয় খান বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী (বর্ত্তমানে নবাব)। মাননীয় খান বাহাদুরের নাবালকাবস্থায় বাদসাহী সনন্দ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাচীন কাগজ পত্র তাঁহার এক জন আত্মীয়ের আসতর্কতায় বিনষ্ট হওয়াতে মসজিদ নির্ম্মাণের তারিখ স্থির কিছুই জানিতে পারাগেল না। মসজিদেও সময় জ্ঞাপক কোন লিপি বা প্রস্তর ফলক নাই। ইস্পিঞ্জির খাঁ মনোয়ার খাঁর সময়ের সমাধি স্থান এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিদুষী গৌরীবাঈ।

গৌরীবাঈর জীবন নিঃস্পৃহ ত্যাগ, কর্ম্ম ও সাধনার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি,—শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান, সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব সুবাসে ভরপুর। যে অসামান্য ভক্তি ও সাধনা বলে তিনি সমস্ত দুঃখ যন্ত্রনাকে প্রেম ও সৌন্দর্য্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মানন্দে লীন হইয়াছিলেন, তাহা নারী গৌরবের অভ্র ভেদী হিমাচল।

গুজরাতের অন্তঃর্গত গীরপুর নামক ক্ষুদ্র সহরে ১৮১৫ সম্বতে নাগর ব্রাহ্মণ বংশে গৌরীবাঈর জন্ম হয়। বাল্য-বিবাহ প্রদান বিষয়ে নাগর ব্রাহ্মণেরা খুব সুচতুর ; তৎ-ফলেই পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় গৌরীবাঈর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের আট দিবস পরেই গৌরীর বৈধব্য দশা ঘটিল। অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস !

বিবাহের পুর্ব্বে বাল্য ক্রীড়া কৌতুকেই গৌরীর দিন কাটিত ; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার জীবনে এক অভিনব পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। সমস্ত আনন্দ ও হাস্য কৌতুক তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। এই অবস্থায়ই গৌরীবাঈকে বৈধব্যের সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইত।

পঞ্চম বর্ষের বালিকা এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারিলেও দুইদিনের বাদ্যো-দ্যম ও ধূমধামের মধ্যদিয়া কোন জটিল দুর্ঘটনায় তাঁহার সুখ যে চিরতরে বিদায় লইয়াছে, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না।

কি এক বিষাদের ঘনচ্ছায়া তাঁহার মনে মসিলিপ্ত কালিমা ঢালিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দর সুকোমল মুখের হাস্য রেখাটুকুও বিলুপ্ত করিয়া দিল।

যখন তাহার কনিষ্ঠা ভগিণীর বিবাহ কার্য্যের সমস্ত শুভ অনুষ্ঠান হইতে তিনি কুলক্ষণা বলিয়া পরিত্যক্তা হইলেন, তখন কচি কিসলয়ের উপর দিয়া বৈশাখের রুদ্রঝঞ্ঝা যেমন করিয়া বহিয়া যায় গৌরীর তাহাই হইল।

গৌরীর পিতা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। এবম্বিধ নিষ্ঠুরতা তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়াছিল। তিনি যত্নপুর্ব্বক গৌরীর বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হইলেন। কয়েক বৎসর বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি তাহাকে গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইতে লাগিলেন।

বিদ্যাশিক্ষার প্রতি গৌরীর প্রবল অনুরাগ জন্মিয়া-ছিল। তের বৎসর বয়সের সময় হইতে তিনি গৃহের বাহির হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন। তখন অবিশ্রান্ত নানাধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ সদগুণরাশি তাঁহার চিত্তে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন।

অতঃপর তিনি যোগাভ্যাসে মন দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাহার চিত্ত ঈশ্বর ভক্তিতে এতদূর নিবিষ্ট হইল যে অধিকাংশ সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িতেন,—চিত্ত সমাধি আনন্দে তন্ময় হইয়া যাইত।

তাঁহার বিদ্যা ও নানা সদগুণের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তথাকার সামন্ত রাজার কর্ণেও গৌরীর প্রশংসার কথা উঠিল। তিনি আগ্রহ পূর্ব্বক এই মহিলাকে দেখিতে আসিলেন। তাহার সরল স্বভাব ও তীব্র ভক্তির পরিচয় পাইয়া রাজা শিবসিংহ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তিনি তথায় একটী সুন্দর মন্দির ও তৎসংলগ্নে একটী বৃহৎ সরোবর নির্ম্মাণ করাইয়া গৌরী বাঈয়ের নামে উৎসর্গ করিলেন।

১৮৩৮ সম্বত ৬ই মাঘ গৌরীবাঈ এই মন্দিরে স্বীয় ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পরে রাজা শিবসিংহ গৌরীবাঈয়ের উপদেশ অনুযায়ী মন্দির সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালাও নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

চতুর্দ্দিক হইতে বহুসংখ্যক লোক গৌরীবাঈয়ের মধুর উপদেশ শ্রবণ করিতে আসিত। তিনি অধিকাংশ সময়ই স্বীয় ধ্যান ধারণায় তন্ময় থাকিতেন।

একবার এক সাধু মোহন্ত সেই মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তিনি গৌরীবাঈকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তিমার্গে সমুন্নত বুঝিতে পারিয়া স্বীয় বালমুকুন্দের মূর্ত্তি তাঁহাকে অর্পণ করিয়া গেলেন, গৌরী তাঁহার নিকট অনেক নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশ লাভ করেন। প্রস্থান সময়ে সাধু গৌরীকে বলিয়া গেলেন,—"তোমার প্রভু দর্শনে আর অধিক বিলম্ব নাই।"

সেই সময় হইতে গৌরী সমাধি আনন্দে অধিকতর লীন হইতে লাগিলেন, এমন কি একাদিক্রমে পনের দিন পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় আনন্দে মগ্ন থাকিতেন, তৎকাল হইতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র দুগ্ধ পানে জীবন রক্ষা করিতেন।

১৮৬০ সম্বত পর্য্যন্ত তাঁহার এই অবস্থায়ই কাটিল। তৎকালে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণ বিবিধ কবিতা রচনা করেন। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার দর্শনার্থী লোক সংখ্যা এত বর্দ্ধিত হইল যে তাঁহার নির্জ্জন-পূজার্চ্চনায় সময় সময় বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। সকলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবতীর অবতার বলিয়া মনে করিত।

গৌরী ইতঃপর তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। প্রথম তিনি মদনমোহনের বিগ্রহ দর্শনার্থ জয়পুরে উপস্থিত হন।

বারাণসীর রাজা সুন্দর সিংহ ভক্ত ও প্রভূত ধর্ম্ম পরায়ন ছিলেন। তিনি গৌরীবাঈর সৎকারের জন্য পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করেন, গৌরীবাঈ তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া পুরী এবং রামেশ্বর তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শান্তর শোভা সম্পদ শালী গঙ্গার কূলে একখানি পর্ণ কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন।

গৌরীবাঈ স্বীয় ভগ্নি কন্যা চতুরীবাঈয়ের প্রতি সমধিক অনুরক্তা ছিলেন। অল্প বয়সেই সংসার সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া চতুরী বাঈ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

নানা উপদেশ ও সাধু প্রদত্ত বালমুকুন্দ বিগ্রহ চতুরী বাঈকে প্রদান করিয়া গৌরীবাঈ স্বীয় অন্তিম কালের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

১৮৬৫ সম্বতে ৯ই চৈত্র মধ্যাহ্ন সময়ে যখন সমগ্র জন মণ্ডলী রামলীলা উৎসবে মত্ত, তখন গৌরীবাঈ স্বীয় নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দে চিরলীন হইলেন।

গৌরীবাঈর কাব্য অপূর্ব্ব সরলতা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ভক্তির প্রস্রবন। তিনি ৬৫২টী বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণ পদ রচনা করেন। তাঁহার প্রাথমিক রচনা কৃষ্ণবাল লীলা কাব্য ও শিবস্তুতি ব্যতীত অধিকাংশই শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান মূলক।

তাঁহার কব্যাবলী সুন্দর ও শুদ্ধ সরল রচনার জন্য সর্ব্বপ্রসিদ্ধ এবং কাব্য সৌন্দর্য্যে ও তাহা অতুলনীয়।

"বনেশ্বর বিশ্বমা বিলাস্যা ফুলন মেঁ বাস।"
ফুলের মধ্যে যেমন সুবাস তেমনি বিশ্বের মধ্যে বিশ্বেশ্বর বাস করেন।

"চন্দমেঁ তুঁ চৈতন্য, সুরজমেঁ তেজ।"
চন্দ্রের মধ্যে তুমি চৈতন্য, সূর্য্যের মধ্যে তেজ।

"আত্মা অখণ্ড আবে ন জাবে,
জন্ম নহিঁ তো ফির মরণা কয়া।
গরবী ব্রহ্ম সকলমেঁ জাণ্যা,
জাণ্যা তো ভেদ খোলনা কয়া।"

আত্মা অখণ্ড তাহার ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধি ও নাই। জন্ম যখন নাই, তখন মরণ কিসের। গরবী সকলের মধ্যে ব্রহ্মকে জানিয়াছে, জানিয়াছে যখন তখন ভেদ কোথায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

আহার।

ডাঃ পর্ক বলিয়াছেন—"শ্বেতসার অপেক্ষা মাংসজাত খাদ্য সহজে পরিপাক হয়। কাযেই ইহা শরীরের অভাব সত্বর পূরণ করিতে পারে কিন্তু অপর পক্ষে মাংসাশীর শরীর নিরামিষ ভোজি অপেক্ষা অধিক ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

আমরা খাদ্য প্রবন্ধে ইতঃপূর্ব্বে খাদ্যের যে তিনটী উপাদানের কথা বলিয়াছি তন্মধ্যে প্রটিড্ বা নাইট্রজেনিস খাদ্য দ্বারা আমাদের মাংস বৃদ্ধি হয়। লৌহ পটাস ইত্যাদি লবণ দ্বারা মস্তিষ্কের উপাদান ও অস্থি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শ্বেতসার, শর্করা ও চর্ব্বি দ্বারা শরীরের উত্তাপ ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কাযেই আমাদের আহার্য্যে উক্ত তিন উপাদানই থাকা প্রয়োজন। নিম্নে আমরা কতকগুলি খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল দিতেছি। ইহা দ্বারা পাঠক খাদ্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন।

		জল	মাংসজ পদার্থ	স্নেহ পদার্থ	শ্বেত সার বা শর্করা	ধাতব পদার্থ	মোট পরিপোষক পদার্থ
ডাল	মুগের ডাল	১২·৩	২৫·৯	১·৯	৫৩·০	৩·০	৮৩·০
	মটর ডাল	৮·৩	২৩·৮	২·১	৫৮·৭	২·১	৮৬·৭
তরকারি	গাজর	৮৬·৫	১·২	০·৩	৯·২	০·৯	১১·৬
	সালগম	৯০·৩	০·৯	০·১৫	৫·০	০·৮	৬·৮৫
	ফুলকফি	৯০·৩	২·২	০·৪	৪·৭	০·৮	৮·১
	গোল আলু	৭৫·০	২·২	০·২	২১·০	১·০	২৪·৪
	মাস রুম	৯০·৩	৪·৩	০·৩	৩·৭	১·৪	৯·৭
	বিলাতী বেগুন	৯১·৯	১·৩	০·২	৫·০	০·৭	৭·২
	বিট	৮৭·৫	১·৯	...	৯·০	১·২	১১·৪
	বাঁধাকফি	৯০·০	১·৯	...	২·৫	১·২	৫·৬
ফল	কলা	৭৪·১	১·৯	০·৮	২২·৯	১·০	২৬·৬
	আপেল	৮৪·৮	০·৪	০·৫	১২·০	০·৫	১৩·৪
	আঙুর	৭৪·২	১·৩	১·৭	১৪·৭	০·৫	১৮·২
	কিস্‌মিস্‌	১৪·০	২·৫	৪·৭	৬৪·৭	৪·১	৭৬·০
	ডুমুর	১৭·৫	৬·১	০·৯	৬৫·৯	২·৩	৭৫·২
	খেজুর	২০·৮	৬·৬	০·২	৬৫·৩	১·৬	৭৩·৭
	বাদাম	৭·৩	১৪·৬	২·৪	৬৯·০	৩·৩	৮৯·৩
	আখরোট	৭·৩	১৫·৮	৫৭·৪	১৩·০	২·০	৮৮·২
	নারিকেল	৪৬·৬	৫·৫	৩৬·০	৮·১	১·০	৫০·৫
	[illegible] বাদাম	৬·২	[illegible]	৫০·০	৭·৮	৩·০	৮৭·৩

		জল	মাংসজ পদার্থ (Protein)	স্নেহ পদার্থ	শ্বেতসার বা শর্করা	ধাতব পদার্থ	মোট পরিপোষক পদার্থ
মাংস	গোমাংস	৭২·০	১৯·৩	৩·৬	......	৫·১	২৮·০
	গোবৎস মাংস	৭১·০	১৭·০	১১·০	......	১·০	২৯·০
	মেষ মাংস	৬৫·২	১৪·৫	১৯·৫	......	০·৮	৩৪·৮
	শূকর মাংস	৩৯·০	৯·৮	৪৮·৯	......	২·৩	৬১·০
	মৃগ মাংস	৭৫·৭	১৯·৭	১·৯	......	১·১	২২·৭
	কুক্কুট মাংস	৬৭·৪	২৪·২৬	৬·৬৮	......	১·৩৭	৩২·৩১
	মৎস্য	৮৬·১	১১·৯	০·২	......	১·২	১৩·৩
	ঝিনুক ইত্যাদি	৮০·৩৮	৬·০	১·৫	......	২·৬৯	১০·১৯
ডিম	ডিম	৭৪·০	১৪·০	১০·৫	......	১·৫	২৬·০
	ডিম্বলাল	৭৮·০	১২·৪	......	......	১·৬	১৪·০
	ডিম্ব কুসুম	৫২·০	১৬·০	৩০·৭	......	১·৩	৪৮·০
দুগ্ধ	গো দুগ্ধ	৮৬·০	৪·১	৩·৯	৫·২	০·৮	১৪·০
	পনির	৩৬·০	২৮·৪	৩১·১	......	৪·৫	৬৪·০
	দুধের সর	২৮·৬	৪·০	৬৫·০	......	০·৪	৬৯·৪
	মাখন	১২·৬	......	৮৬·৪	......	০·৮	৮৭·২
শস্যাদি	ময়দা	১১·৭	১১·৪	১·৩	৭১·০	৩·০	৮৬·৭
	করণ ফ্লাওয়ার	১৪·২	৯·৩	৫·০	৬৬·৫	২·০	৮২·৮
	জব চূর্ণ	১০·৪	১৫·৬	৬·১১	৬৩·৬	৩·০	৮৯·১
	বার্লী	১৪·৬	৬·৭	১·৩	৭৫·৫	১·০	৮৪·৮
	চাউল	১২·৪	৭·৮	০·৪	৭৯·০	০·৪	৮৭·৬
	সাবু ইত্যাদি	১৪·০	১·৬	০·৬	৮৩·০	০·৪	৮৫·৬

আমাদের দেশী সিম, বেগুন, মুলা, পটল প্রভৃতি তরকারী বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া চিকিৎসক মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ আমাদের দেশে বহু পুষ্টিকর শাক ও সব্জি রহিয়াছে, যাহা সহজ লভ্য বলিয়া আমরা অনেক সময় উপেক্ষা করি। ৫ ফিট্ ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ১ মণ ৩০ সের ওজনের একটি কর্ম্মঠ মানবের নিম্ন লিখিত পরিমাণ শুষ্ক খাদ্যের প্রয়োজন।

প্রটিড	প্রায় ১১½ তোলা।
স্নেহ পদার্থ	৭½ "
শ্বেতসার	৩৫½ "
ধাতব পদার্থ	২½
মোট প্রায়	৫৭ তোলা।

আমরা রুচি ও অভ্যাস অনুসারে এই সকল উপাদান নানাবিধ পদার্থ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকি। "কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত আহার্য্য বস্তু যেন পরিপাকের উপযুক্ত হয়। এবং পাকস্থলি ও অন্ত্রে প্রবেশ করিয়া উহা যে সকল পাকরসের সহিত মিশ্রিত হয় তাহা সুস্থ থাকে এবং ভুক্তবস্তু সহজে পরিপাক করিয়া ফেলিতে পারে।" (Dr Husbad) নিম্নে কতিপয় খাদ্য বস্তুর পরিপাকের সময়ের তালিকা প্রদত্ত হইল।

	ঘণ্টা	মিনিট
ভাত	১	০
কাঁচা ডিম	১	৩০
বারলি ওয়াটার	১	৩০
বন্যপাখীর রোষ্ট	১	৩৫
মগজ সিদ্ধ	১	৩৫
সাগু সিদ্ধ	১	৫৫ (প্রায় ২ ঘণ্টা
টেপিওকা ,,	২	
বারলি ,,	২	
দুগ্ধ ,,	২	
কাঁচা ডিম	২	
সিম ও বিন্স্ সিদ্ধ	২	৩০
ভেড়ার রোষ্ট	৩	
মুর্গির সুপ	৩	
ময়দা ও আটার রুটি	৩	৩০
মাখন	৩	৩০
গোমাংস	৩	৪ ঘণ্টা
মৎস্য (সিদ্ধ)	১½	২½ "
কচিমেষ	৩	
মেষ মাংসের (কবাব)	৩	৩½ ঘণ্টা
মেষ মাংস (সিদ্ধ)	৩	"
রুটি	৩	৪ "
শুকর মাংস	৫	"
পাখী মাংস	২½	৪ "
হংস (কবাব)	৪	৫ "
পনির	৩	৪ "
আপেল	৩	৪ "
বাঁধাকফি	৪	৩০ "
ফুলকফি	৪	৩০ "
গাঁজর	৩	৩½ "
গোল আলু	২½	৩½ "
সালগম	৩½	৪ "
ঘি	৩	৬০ "
আলু	৩	৩০ "
সুসিদ্ধডিম	৩	৩০ "
মুর্গিররোষ্ট	৪	
হাঁসের "	৪	৩০ "

আহার এরূপ পরিমাণ করা উচিত যাহা আমরা পরিপাক করিয়া শরীরে গ্রহণ করিতে পারি। কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে এই "পরমিাণ" ঠিক করিবার কোন উপায় আছে কিনা। তোলা হিসাবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া কঠিন, কারণ ইহা ব্যাক্তগত। নিজের আহারের পরিমাণ নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা ঠিক করা উচিত। এই সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম আছে এবং ইহা অনেকটা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। সুস্থ মনে বসিয়া ধীরে ধীরে আহার করিতে থা কর্লে যথা সময়ে দুই একটি উদ্গার উঠিয়া থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে যে পাকস্থলী পূর্ণ হইয়াছে। কারণ শূন্য পাকস্থলীতে

যে একটু বায়ু জন্মে উহা বহির্গত হইলে বুঝিতে হইবে যে পাকস্থলী পূর্ণ হইয়াছে। আমরা কিন্তু এরূপ আহারে তৃপ্ত নহি। ব্যঞ্জন সুস্বাদু হইলে ব্যঞ্জনের খাতিরে দু মুঠা ভাত অধিক খাইয়া থাকি। তদুপরি অম্বলের সহিত একমুঠা. অতঃপর মিষ্টি থাকিলে পেটে যতটা ধরে আহার করিয়া থাকি। আমাদের পেট ভরার অর্থ-থলের ভিতরে জিনিষ ভরা। থলে ঝাঁকিয়া নাড়িয়া যথা সাধ্য ভর. ছিন্ন না হইলেই হইল। ইহার পরিণাম ফল আমরা হাতে হাতে পাইয়া থাকি। পেটে অসুখ, বদ হজম ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। মোটের উপরে আমরা যত আহার করি, তাহা অপেক্ষা অনেক কম আহার করিয়া অধিক সুস্থ ভাবে জীবন কাটাইতে পারি।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

কুহেলী।

(শেষ অংশ)

আমিই সকলের মনোকষ্টের কারণ হইলাম। মনে হইতে লাগিল যাইয়া ভাল করিনাই, কেন সে বনের পাখীকে ধরিতে গেলাম? বোধ হয় আমার চেয়ে আরও সন্ধানে সন্তর্পণে ননী তাকে ধরিয়া আনিত। কেন এ অনধিকার চর্চ্চায় ব্রতী হইলাম! কথা পারিলাম, ত এ ভাবে পারিলাম কেন? তখন নিজকে নিজে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। আমার নিজের অকর্ম্মণ্যতাই যেন আমাকে অলক্ষ্য হইতে বাণ ছাড়িয়া ধীরে ধীরে শর-শয্যায় শায়িত করিল। ননী সত্য কথাই বলিয়াছিল— পাখী ঘরের চালে চালে ডালে ডালে আছে, সেই ডাল ধরিতে গেলে নাকি একেবারে দেশ ছাড়িয়া পালায়।

ভাবিতে ভাবিতে মনের ভিতর আত্মবিসর্জ্জনের এক প্রবল স্পৃহা জাগিয়া উঠিল. ভাবিলাম দেশ ছাড়িয়া যাইব, যেরূপে পারি সেই নিরাশ্রয়া অনাথা বালিকার উদ্ধার করিব। পাখী ধরিব, নিশ্চয়ই ধরিব। সম্পদ ছাড়িয়া বিপদকে আলিঙ্গন করিতে চলিলাম। আমার এ আত্ম-বিসর্জ্জন পরের জন্য, কুহেলীর জন্য, আর কুহেলীর শোকে যাঁরা জীবন্মৃত তাঁদের জন্য। মনে আনন্দও পাইলাম, খেলা কুতূহলচ্ছলে কর্ণধার যেমন তরঙ্গমুখে তরী চালিত করে, আমি ও আমার জীবন তরণী সংসারের এই এক কর্ম্ম স্রোতে ভাসাইয়া দিলাম।

কত নদ নদী, কত প্রান্তর, কত দেশ কত রাজ্য অতিক্রম করিলাম, কিন্তু কোথাও কুহেলীর কোন সন্ধান পাইলাম না। বর্ষা আসিল। মেঘের গুরু গম্ভীর শব্দে বহুকালের জীর্ণস্মৃতি পুনরায় জাগিতে লাগিল। কুহেলী বলিয়াছিল, আমরা বর্ষাকালে পর্ব্বতে থাকি, আশার মোহিনী মন্ত্রে ভুলিয়া পাহাড়ের দিকে ছুটিলাম, যোগমগ্ন শিলাময় পুরুষ মহাসনে বসিয়া প্রকৃতির ধ্যানে মগ্ন। বিস্তৃত শালবন জটাজুটের ন্যায় শৃঙ্গদেশ বহিয়া নিম্নভূমি পর্য্যন্ত নামিয়াছে। কুহেলী সত্যই বলিয়াছিল পর্ব্বতে কিসের অভাব? বাস্তবিক প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার পর্ব্বত।

নদী, নির্ঝর, উপত্যকা, দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ কোথায় না তাহার সন্ধান করিলাম, শালবনে পেখম ধরা ময়ূরের নাচ দেখিলাম। পার্ব্বত্য নদী স্রোতে বেতস কুসুম সকল ভাসিয়া যাইতেছিল, মনে মনে ভাবিলাম, হয়ত কুহেলীর মালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহারা ভাসিয়া আসিতেছে। আরও অগ্রসর হইলাম। যাহা যাহা দেখিবার সব দেখিলাম. কিন্তু কুহেলীকে দেখিলাম না, সে বনের পাখীকে আর ধরিতে পারিলাম না।

মনের দুঃখ মনে লইয়া সেই যোগমগ্ন মহাপুরুষের আসনতলে শির লুটাইয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পিতামাতা হারানিধি কোলে পাইলেন, সে আনন্দ কথায় প্রকাশ করা যায় না। আর ননী বহুকালের রুদ্ধস্রোত সামলাইতে না পারিয়া আমার পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া মুর্চ্ছিত হইল। আমি তাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। স্নেহের দুলাল ননীর এমনতর অবস্থা আমি আর কখনও দেখি নাই, ননী আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বলিল বড় নিষ্ঠুর তুমি, পিতামাতা তোমার অভাবে মৃতপ্রায়। দেখ দেখি আমাদের ফুল বাগানের অবস্থা কেমন হইয়াছে, তোমার অভাবে সব শূন্যময়— শ্মশান। আমরা তোমার এত পর, আর কুহেলী কি

তোমার এতই আপনার, যার জন্ম তুমি সব ছাড়িয়া দিয়াছিলে? আমি বলিলাম—"কুহেলীর জন্ম নহে, প্রকৃতি আমাকে নিষ্ঠুর করিয়া তুলিয়াছিল, আমি দেশ-ভ্রমণে গিয়াছিলাম।" ননী—"দেশভ্রমণে গিয়াছিলে ত আমাকে সঙ্গে নেও নাই কেন?" আমি বলিলাম—"আমি সেইটা ভুল করিয়াছি; কত স্থান দেখিলাম, কত স্বপ্নদুর্লভ দৃশ্যই দেখিলাম কিন্তু কোথাও শান্তি পাইলাম না। যখনই তোর মুখখানি মনে পড়িয়াছে চখের জলে পথ দেখিতে পাই নাই। ননী, মায়ের কোলের মত শান্তিময় স্থান আর ধরাতলে নাই। যেখানেই গিয়াছি মায়ের স্নেহ, তোর মধুমাখা স্মৃতি স্নেহময় দাদা সম্বোধন—স্মরণ পথে উদিত হইয়াই আমাকে আকুল করিত। ননী কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দাদা! পাহাড় পর্ব্বত ত ঘুরিলে, কোথাও কি কুহেলীর দেখা পাইয়াছ?" আমি বলিলাম—"না ননী, সে বনের পাখীকে আর ধরিতে পারিলাম না।" আমার স্কন্ধ বহিয়া ননীর তপ্ত অশ্রু পড়িতেছিল, আমি স্পষ্টই বুঝিলাম, ননী সে অশ্রু কেবল কুহেলীর উদ্দেশ্যেই ফেলিতেছে।

(৮)

ইহার কিছুদিন পরেই আমাদের বাড়ীতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। সেনাবাসের জমিদার নৃপেন্দ্র বাবুর একমাত্র কন্যা সুধীরার সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়া গেল। বাসর ঘর গুলজার করিয়া ষোড়শী রঙ্গিনীগণ ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। গৃহে আমার নব পরিণীতা পত্নী আর আমি। নিথর নিস্তব্ধ সাড়াশূন্য বিশ্বজগত, আমরা দুই প্রাণী মাত্র জাগিয়া। মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখিবার মানসে ঘোমটা টানিয়া তুলিলাম, প্রজ্জলিত দীপালোকে যাহা দেখিলাম, তাহা সত্য সত্যই অচিন্তনীয়, সেই কুহেলী—সেই মুখ, সেই চোখ। আমার পদতল হইতে বিশ্বপৃথিবী যেন ধীরে সরিয়া যাইতেছিল। ননী যখন কুহেলীকে সাধ করিয়া শাড়ী পড়াইয়াছিল তখন ঠিক এমনই দেখাইয়াছিল। লজ্জায় নববধূ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ঘোমটা টানিয়া দিতেছিল, আমি স্পষ্টই দেখিলাম তার হাতে সেই আংটী। ননী "বিদেশিনী ভগ্নীকে স্মরণ রাখিস" এই বলিয়া এই আংটী কুহেলীর আঙ্গুলে পড়াইয়া দিয়াছিল। আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম তুমি এই আংটী কোথায় পাইলে? সুধীরা লজ্জা বিজরিত আধ আধ স্বরে সর্ব্বপ্রথম আমার সঙ্গে কথা বলিল। সুধীরা বলিল—"আমার ছোট বোন দিয়াছে।" আমি বলিলাম সেকি? তুমি আমার শ্বশুরের একমাত্র কন্যা তোমার আবার ভগ্নী! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি সেই বেদের মেয়ে কুহেলী! আমরা যাদুকরের জালে পড়িয়াছি।"

সুধীরা অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত বলিল "কুহেলী! কুহেলীর নাম তোমরা কোথায় পাইলে? সেকি তোমাদেরও ফাঁকি দিয়াছে?" আমি যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম। আকাশ পাতাল সব যেন আমার কাছে লাটিমের মত ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতেছিল। আমিও ততোধিক বিস্ময়ের সহিত বলিলাম তুমি কুহেলী নও! তবে কুহেলীর বিষয় অবশ্য কিছু জান। সুধীরা বলিল "কুহেলী আমার ছোট বোন।" বলিতে বলিতে তাহার কাজল রেখা ভিজিয়া উঠিল। "আমরা উভয়ে যমজরূপে জন্মগ্রহণ করি, আমি ছোটবেলা হইতে তাহাকে কত ভালবাসিতাম! একদিন কুহেলী ও আমি নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সে বহু দিনের কথা, বহুকাল বিস্মৃত স্বপ্নের ন্যায় ধীরে ধীরে মনের ভিতর জাগিয়া উঠিতেছে। বাড়ী আসিবার সময় আমি একা আসিলাম, কুহেলী আসিল না; শুনিলাম দুর্দ্দান্ত বেদে দস্যু তাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই হইতে আমি জগতে একাকী, বহুদিন গত হইয়া গিয়াছে কিন্তু কুহেলীর জন্য আমার অশ্রুজল এক দিনের জন্যও শুকায় নাই। কুহেলীর স্মৃতি, কুহেলীর মুখ, পাষাণের রেখার মত আমার মনের ভিতর অঙ্কিত ছিল।

"গত বৎসর চৈত্রমাসে সহসা একদল বেদে আসিয়া আমাদের বাড়ীর সামনে প্রান্তরে তাঁবু বাঁধিল। তাদের সঙ্গে ছিল একটি টুকটুকে মেয়ে—কুহেলী, সকলে বলাবলি করিতে লাগিল এই মেয়ে আমার ছোট বোন ইন্দিরা। পিতামাতা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। বাড়ীতে সর্ব্বদা কান্নাকাটির রোল। পাছে বংশমর্য্যাদায় হানি হয়, এই ভয়ে পিতা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না।

এদিকে কুহেলী সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিত; আমাকে দিদি বলিয়া ডাকিত, মাকে মা বলিয়া ডাকিত, সেই কণ্ঠস্বর যেন বহুকালের অপহৃত ইন্দিরার স্নেহমাখা দিদি সম্বোধন স্মরণ করাইয়া দিত। মা সেই অজ্ঞাতকুলশীলা বেদের মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেন। আর আমি কুহেলীকে পাওয়া অবধি যেন আনন্দ সাগরে ভাসিতেছিলাম, আজ বারো বৎসর হইল, যে নদীর তীরে আমার সেই চোখের মণি হারাইয়াছিলাম, সেই নদীতীরে আমার সেই হারানিধি কুড়াইয়া পাইলাম।

"তখন বর্ষা প্রায় আসিতেছিল, দীর্ঘ তিন মাস কুহেলীকে বুকে বুকে কোলে কোলে রাখিলাম, একদিন কুহেলী বলিল দিদি! আমাদের পর্ব্বতে যাওয়ার সময় হইয়া আসিতেছে। ঐ দেখ আমার চিরপরিচিত মেঘগুলি পাহাড়ের দিকে উড়িয়া যাইতেছে, শীঘ্রই আবার শালবনে ময়ূরের নাচ দেখিতে পাইব। ধর, তোমাকে একটী জিনিস দিয়া যাই, এই বলিয়া সে আমার হাতে এই আংটীটী পড়াইয়া দিল। আমি তাহাকে বলিলাম সেকি কুহেলী তুই আমাকে এই আংটী দিস কেন? সে বলিল দিদি, এই শেষ দেখা, শেষ স্মৃতি গ্রহণ কর। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল কুহেলী বলিল—দিদি যাই। কুহেলী চলিয়া যাইতে যাইতে দ্বারের কাছে আসিয়া দুইবার হোঁচট খাইল। বোধ হয় সে চোখের জলে পথ দেখিতে পাইতেছিল না। সেই হইতে কুহেলীর স্মৃতিচিহ্ন বুকে ধরিয়া আসিতেছি।

"এই ঘটনার পরদিন প্রভাতে বৃদ্ধ সর্দ্দার জঙ্গ আসিয়া দরবার গৃহে পিতার চরণতলে লুটিয়া পড়িল। বলিল মহারাজ ক্ষমা করুন, আমার দুর্ব্বিসহ জীবনভার বহন করিবার অল্পই বাকী আছে। আমি আমার সমস্ত জীবনের পাপ কাহিনী আজ আপনার কাছে ব্যক্ত করিব। জীবনে চুরি ডাকাতি অনেক করিয়াছি। ঈশ্বরের দরবারে তাহার বিচার হইবে। আমার উপর শমন জারী হইয়া গিয়াছে। ম্যাদও সঙ্কীর্ণ, তাই আজ আর একটি পাপ কাহিনী আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, সে কুহেলীর কথা। কুহেলী আপনারই মেয়ে, আমিই তাকে হরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু রাজার মুকুট বেদের ঘরে শোভে না। এই দীর্ঘ বারো বছর আমি তাকে বুকে বুকে রাখিয়াছি, এক্ষণে তার বিবাহ কাল উপস্থিত, একটা অসভ্য বেদের কাছে তাকে গচাইয়া দিব, অসভ্য বর্ব্বর বনের বানর, তার গলায় মুক্তার মালা পড়ায়ে দিব, প্রাণ থাকতে তা কখনই নহে, আজ আপনার মেয়ে আপনার পায়ে ফেলিয়া যাইতেছি।

বাবা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে জঙ্গকে আলিঙ্গন করিলেন, জঙ্গ তখন আকুল চিত্তে মাটির উপর আছাড়িয়া পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছিল, সে যেন তাহার করুণ ক্রন্দনে সর্ব্বংসহা বসুমতীকেও কাঁদাইয়া তুলিল।

"জঙ্গ চলিয়া গেলে আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব, জ্ঞাতি বন্ধু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলে মিলিয়া কুহেলীকে ঘরে তুলিয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, পরদিন সকলে শুনিলাম, জঙ্গের মৃত্যু হইয়াছে। অন্যান্য বেদেরা সকলে মিলিয়া বৃদ্ধ জঙ্গকে সমাধিস্থ করিবার জন্য প্রান্তরে কবর খুদিতেছে। আর কুহেলী! কুহেলীর কোন সন্ধান নাই। সে সারারাত্র তাহার মুমূর্ষু পালক পিতার কাছে বসিয়াছিল, একটি বারের জন্য চক্ষের পলক ফেলে নাই, শেষ রাত্রে সর্দ্দার জঙ্গের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেলে সকলে দেখিল কুহেলী নাই!"

স্বপ্নের মত কথাগুলি শুনিতেছিলাম, আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলাম না, সুধীরা তখন আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছিল, আমি দ্রুত পদে বাহিরে চলিয়া আসিলাম, মাঘের শিশির বৃষ্টির মত ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছিল, তরুলতা সেই শিশির স্তূপের ভিতর হইতে এক একবার যেন পাখঝাড়া দিতেছিল। অদূরে তুষারাচ্ছন্ন অটবী বহুকাল বিস্মৃত স্বপ্নের ন্যায় আধ আধরূপে দেখা যাইতেছিল। আমি মানস নয়নে দেখিতেছিলাম, কুহেলী উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে বসিয়া বীণ বাজাইতেছে—গুন গুন স্বরে শোকের গীত গাহিতেছে। ঐ আবার বীণ রাখিয়া শালবনের ভিতর ছুটাছুটী করিতেছে, ঐ নির্ঝরের ধারে, ঐ হ্রদের তীরে, ঐ ঐ সে কুহেলী—একটি পার্ব্বত্য নদী স্রোতে সাঁতার

দিতেছিল, এই নাই। মহাস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল।

আমি হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে টানিয়া লইয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম, মুক্ত জ্যোৎস্না লোকে সেই দীর্ঘনিশ্বাসটী তুষার জাল ভেদ করিয়া একটি পিতৃ মাতৃহীন চির উদাসিনী পল্লীত দুহিতার অন্বেষণে ব্রাহ্মাণ্ড জুড়িয়া ঘুরিতে লাগিল।

ঠিক তখন নিস্তব্ধ প্রান্তর আলোড়িত করিয়া কে যেন উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গাহিতেছিল,—

"জনমের তরে তাহার লাগিয়ে রহিল মরম বেদনা।"

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

ইলিয়ট কৃত ভারত-ইতিহাস।

সোলেমান ও তাহার গ্রন্থের বিবরণ আমরা মাঘের সৌরভে প্রদান করিয়াছি। এবারে আমরা আবুজেইদ প্রণীত গ্রন্থের পরিচয় দিব। আবুজেইদ একজন পারস্য দেশীয় ঐতিহাসিক; তিনি সোলেমানের বিবরণ যথার্থ কিনা জানিতে অভিলাষী হন এবং এই অভিপ্রায়ে বিস্তর ভ্রমণ কাহিনী ও সমুদ্র যাত্রার বিবরণ অধ্যয়ন করেন। তাহার ফলে তিনি সমুদ্র তীরস্থ দেশ সকল ও তত্রত্য রাজন্য বর্গ সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। আবুজেইদ যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে কিয়দংশ নিয়ে দেওয়া গেল।

কুমার (Kumar) * ভারতবর্ষের একটি উপদ্বীপ। এই দেশে লোকের বসতি অতি নিবিড়। এখানে সকলেই পদব্রজে ভ্রমণ করে। এবং সকলেই জিতেন্দ্রিয় ও পান দোষ বির হত। কুমার হইতে জাবাজ † জলপথে দশ দিনের পথ। জাবাজ দেশে কুমারের এক নৃপতির সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। বহুকাল পূর্ব্বে কুমারের শাসনভার এক চঞ্চল স্বভাব তরুণ বয়স্ক নৃপতির হস্তে পতিত হয়। একদিবস নৃপতি প্রাসাদ সন্নিকটে এক নদীর কূলে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে এত সুমিষ্ট বারি বহন করিয়া করিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছিল। পার্শ্বে উজির উপস্থিত ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিবিধ আলাপের পর জাবাজের "মহারাজার" (Maharaja) রাজ্যের প্রসঙ্গ উঠিল। উহার লোক সংখ্যা, সমৃদ্ধি ও অধীন দ্বীপ সমূহের কথা চলিতে লাগিল। এমন সময় অকস্মাৎ নৃপতি বলিয়া উঠিলেন "মহারাজার" মস্তক আমার সম্মুখে একটি পাত্রে দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আমার এই অভিলাষটী পূর্ণ হইলে বড়ই সুখী হই।" কুমারের রাজার এই বাক্য লোক মুখে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল এবং অবশেষে জাবাজের "মহারাজার" কর্ণে পৌঁছিল। ইহা শ্রবণ করিয়া "মহারাজা" উজীরকে সহস্র রণ পোত নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইলে "মহারাজা" স্বয়ং বাহিনীর নায়ক হইয়া কুমার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহারাজার সৈন্যগণ দিবসে বহুবার দন্তধাবন করিত। তাহারা স্ব স্ব দন্ত মার্জ্জনী সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিত। প্রত্যেকে এক একটি দন্ত মার্জ্জনী সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিল। কুমারের রাজা এই অভিযানের কথা কিছুই অবগত ছিলেন না। অজ্ঞাতসারে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণ সকলেই পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। "মহারাজা" প্রজাবর্গের মধ্যে অভয়বাণী ঘোষণা করিয়া কুমারের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। কুমারের রাজা তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল। "মহারাজা" তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তারপর কুমারের মন্ত্রীর উপর অন্য একজন উপযুক্ত নরপতি নির্ব্বাচনের ভার অর্পন করিয়া অনতিবিলম্বে সেই দেশ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বা তাঁহার সৈন্যগণ কুমারের কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না। অতঃপর মহারাজা একটি পাত্রে সেই মস্তক বিধৌত ও গন্ধবিলিপ্ত করিয়া কুমারের নবনির্ব্বাচিত নৃপতির নিকট প্রেরণ করিলেন, সঙ্গে একখানা লিপিও দিলেন। চীনের রাজা ও ভারতের অন্যান্য নৃপতিগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া "মহারাজার" ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তদবধি

* ইলিয়ট সাহেব কুমারকে কুমারিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

† ইলিয়ট সাহেব জাবাজকে যবদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কুমারের নৃপতিগণ প্রত্যহ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজার সম্মনার্থ জাবাজ অভিমুখে ভূমিতে লুঠাইয়া প্রণাম করেন। *

ভারত-বাসিদের দৃঢ় বিশ্বাস মানুষ মরিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। এ বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধ মূল। এই জন্যই বালহরার ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দেখা যায় বহু লোক জীবত অবস্থায় অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করে। কোন ব্যক্তির জরা উপস্থিত হইলে যে কোন আত্মীয়ের নিকট তাহাকে জলে বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে যাক্ঞা করে। মরিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবে এ সম্বন্ধে তাহাদের বিন্দুমাত্র ও সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে সবদেহ দাহ করা হয়।

ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে নিম্ন প্রথাটী প্রচলিত আছে। অভিষেক সময় রাজার সম্মুখে বটপত্রে অন্ন পরিবেশন করা হয়। রাজার তিন চারশত শরীর রক্ষী থাকে, তাহারা স্বেচ্ছায় রাজার আনুচর্য্য স্বীকার করে। রাজা পরিবেশিত অন্ন হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া শরীররক্ষীদিগকে আহ্বান করেন। তাহারা এক এক করিয়া অগ্রসর হয় ও উচ্ছিষ্ট অন্ন হইতে সামান্য মাত্র গ্রহণ করিয়া আহার করে। যাহারা এইরূপে অন্ন গ্রহণ করে তাহারা রাজার মৃত্যুর পর চিতারোহন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। রাজার মৃত্যুর পর এই অঙ্গীকার পালনে কিছুমাত্র বিলম্ব করিতে দেওয়া হয় না।

সরন্দীব (Sarandib) † মূল্যবান প্রস্তরের জন্য বিখ্যাত। রক্ত, পীত, হরিত বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তর পর্ব্বত গাত্রে পাওয়া যায়। অধিকাংশ প্রস্তরই সমুদ্রগর্ভ হইতে জোয়ারের জলে তীরে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ সকল প্রস্তর সংগ্রহ করিবার জন্য রাজার পক্ষ হইতে লোক নিযুক্ত থাকে। সময় সময় পৃথিবী গর্ভ হইতেও খনন করিয়া মণি উত্তোলন করা হয়। সরন্দীবে একটি আইন আছে তদনুসারে সময় সময় পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ গণের (Prophets) জীবনী সংগ্রহ ও সংকলন করেন। ভারতীয়গণ তাহাদের নিকট গিয়া মহাত্মাগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া আনে ও ব্যবহার শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করে। সরন্দীবে য়ীহুদীগণের বহু উপনিবেশ আছে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও তথায় বাস করে। রাজা প্রত্যেককেই স্বীয় ধর্ম্মপালনে স্বাধীনতা প্রদান করেন। এই দেশের নরনারী উভয়েরই মধ্যে ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা অত্যন্ত প্রবল। সময় সময় নবাগত বণিককে রাজ কন্যার প্রেমে পতিত হইতে ও দেখা যায়। এই নিমিত্ত সিরাফের ‡ বিচক্ষণ বণিকগণ জাহাজে যুবক থাকিলে তাহা সরন্দীবে প্রেরণ করেন না। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের আলোচনায় জীবন অতিবাহন করে।

ভারতবর্ষে রাজারা কর্ণে স্বর্ণ খচিত মণিকুণ্ডল ও গলায় বহু মূল্য রক্ত, হরিৎ প্রস্তরের হার ধারণ করে। মুক্তা তাহাদের নিকট অত্যন্ত আদরের সামগ্রী। অধিকাংশ নৃপতির দরবারে অন্তঃপুর চারিণী মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ নাই। দেশীয় ও বিদেশীয় দর্শক গণের নয়ন সমক্ষে তাহাদের মুখের উপর কোন অবগুণ্ঠন দেওয়া হয় না।

শ্রীবিমলানাথ চাকলাদার।

---

* বাগদাদের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আলমাসুদী ও এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

† ইলিয়ট সাহেবের মতে সিংহল দ্বীপ।

‡ [illegible] আবুজেইদের বাসস্থান।

বিষয় সূচী।

Printed by Satish Chandra Rai, at the Jagat Art Press, Dacca.
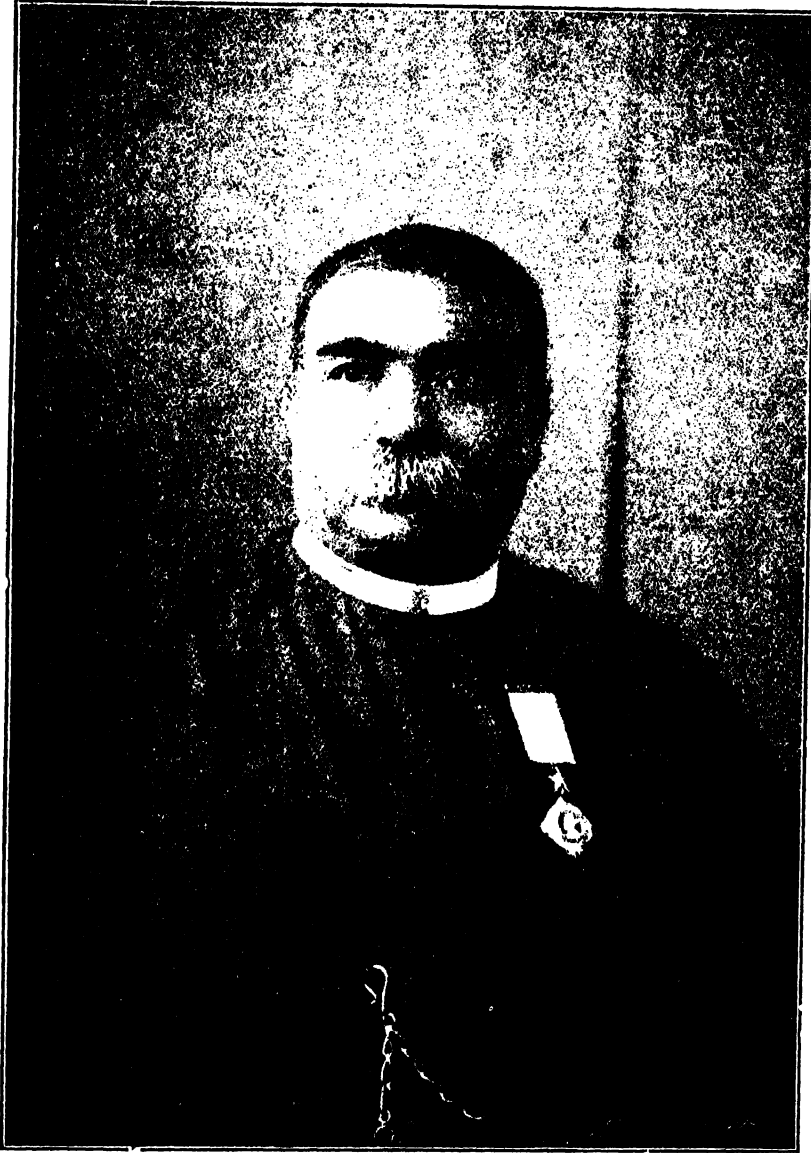
উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি

মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, নাইট, এম-এ, ডি-এল, ডি-এস্-সি, সি-এস-আই, এফ-আর এ-এস, এফ-আর-এস-ই, এফ-এ-এস-বি।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

চতুর্থ বর্ষ } ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩২৩। { সপ্তম সংখ্যা।

উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের

সভাপতির অভিভাষণ।

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশের ভাষা—পূরে কি আশা!"

বঙ্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে, বাঙ্গালী বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙ্গালীর ছেলে, বঙ্গভূমির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকে লজ্জাজনক, কতকটা বা প্রত্যবায়-জনক মনে করিতেন, সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে, সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে।

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বহু মনস্বী বঙ্গসন্তান, বঙ্গবাণীর স্বর্ণমন্দির রচনায় সাহায্য করিয়াছেন, রাজা রামমোহন, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বহু প্রতিভাশালী সারস্বতগণ সেই মন্দির-গাত্র নানাবিধ শিল্প-সৌন্দর্য্যে খচিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন বাঙ্গালীর একটা প্রকৃত স্পর্দ্ধার পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে জাতির নিজের পরিচয়-যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহাবংশের ভগ্নাংশ, সেই প্রাচীন আর্য্যজাতির ভাষা এবং সাহিত্য-ভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয় সাহিত্য-গঠনে সম্পূর্ণরূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত ও সমুন্নত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতায় বাঙ্গালী এখন বঞ্চিত নহে, এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে বঙ্গভাষার যতটা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বর্দ্ধিষ্ণু বঙ্গবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত, এ কথা আমি কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

ক্ষেত্রকর্ষণ পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য হইলেও, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বপন ও উপযুক্ত সেচনাদির দ্বারা অঙ্কুরিত বীজের রক্ষণ এবং পরিবর্দ্ধন, অধিকতর পরিশ্রমসাধ্য ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। অঙ্কুরিত শস্যের আপদ্ অনেক। সেই সমস্ত আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শস্যকে ফলোন্মুখ করিয়া তোলা বড়ই দক্ষতা-সাপেক্ষ। যে সময়ে জলসেচনের প্রয়োজন, তখন জল, যখন আতপ নিবারণের প্রয়োজন, তখন ছায়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমুদয়ের কোন একটির অভাবেই কর্ষিত ভূমি শস্যশালিনী হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও ঐ রীতির অনুসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুশত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ষিত ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের এখন সেই ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সকলেই সুফলের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলুপ-নয়নে চাহিতেছেন। কত আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি ও আদর সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; এমন সময়ে, দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ সময়ে, ঐ কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন কত পূর্ব্বাপর বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা বঙ্গবাসি মাত্রেরই বিশেষ বিবেচ্য। এতদিনের চেষ্টায় যে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র পরিপাটীরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যদ্ বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে তাহা যেন নষ্ট না হয়, তাহার উর্ব্বরতা যেন কতকগুলি আবর্জ্জনা-জনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।

"বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ" কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি।

এতকাল অর্থাৎ প্রায় গত সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভাষা যে ভাবে, যে গতিতে বঙ্গীয় জনসমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল, এখন বঙ্গভাষার সেই গতির ক্ষিপ্রতা ক্রমেই

বাড়িতেছে। পূর্ব্বে ছিল যাঁহারা শিক্ষিত, কি প্রতীচ্য কি প্রাচ্য, উভয়বিধ শিক্ষার কোন একটিতে যাঁহারা সম্পন্ন, বঙ্গভাষার কতিপয় কমনীয় গ্রন্থ সেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির অবসর বিনোদনের উপাদান মাত্র হইত। কার্য্যান্তরব্যাবৃত্ত চিত্তকে কদাচিৎ প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে যাহাদের লইয়া বঙ্গদেশ, যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্তই বাদ পরে, সেই বঙ্গের আপামর সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার আদর কতটা ছিল? এক প্রকার ছিলই না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস, কাশীদাস ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্য-রথীর নাম বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত? শিক্ষিত জনসঙ্ঘের সংখ্যা সাত কোটি বঙ্গবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অতিরঞ্জন হয় না। এই মুষ্টিমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা এত দিন আবদ্ধ ছিল, এখন সেই বঙ্গভাষা অতি ক্ষিপ্র গতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংযত চরণে চলে, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর সেই সঙ্গেই আমাদের সুন্দরী মাতৃভাষা কি উপায়ে সুন্দরীতমা হইবে, তাহাও ভাবিতে হইবে, কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট্ সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্ত্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি,—সর্ব্বপ্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যক। সর্ব্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তাহাকে অসঙ্কোচে "জাতীয় সাহিত্য" বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে, যখন বঙ্গভাষার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি অল্পবিস্তর ভাবে নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ ভাষার গতিকে বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুকূল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য গঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সেই জাতীয় সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কি প্রকারে, কোন্ দিকে জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমি দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে "শিক্ষিত" বলিতে আমরা কি বুঝি? সর্ব্বসাধারণে কোন্ সম্প্রদায়কে "শিক্ষিত" বলিয়া স্বীকার করে? বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে শিক্ষার কেন্দ্র মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, দেশবাসিগণ অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবর্ষের নানা বিপ্লবের মধ্যেও যাঁহারা পরম যত্নে বুকে বুকে রাখিয়া, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররাজি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অধ্যাপকবর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক উচ্চে প্রদান করিয়া থাকেন; যদি অধ্যাপকবৃন্দ আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে উত্তরকালেও সে উচ্চাসনে তাঁহারা অধিকারী থাকিবেন সত্য, কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ধরিলে, বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সত্তার পরিদৃষ্ট হয়। যেখানে হয় ত পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্ত্তমানে সে স্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর দেখা যাইতেছে। যেরূপ ভাবে গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গে, যথায় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব, এমন পল্লী থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের ভবিষ্যৎ জন-মত পরিচালনের এবং জনসাধারণের মত গঠনের ভার উক্ত শিক্ষিতগণের হস্তেই ক্রমে ন্যস্ত হইবে। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপটভাবে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশীদিগের, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পল্লীবাসিগণ তাঁহাদিগের নিকটে অনেক আশা করেন। যে যে পল্লীতে তাঁহাদের বাস, সেই সেই পল্লীর এবং তৎ তৎ সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী। আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকটা দায়ী; কেন না, লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না, সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ পূর্ব্বক যদি তাঁহারা বিবেচনা সহকারে লোকমত পরিচালনা করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতিবেশীরা অম্লান-মনে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। যে যে গুণ থাকিলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষিতগণের শিক্ষাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সমবেদনা পরদুঃখকাতরতা, সত্যপ্রিয়তা, বিনীত ভাব, প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাকেই শিক্ষার চরমফলপ্রাপ্তি বলিতে পারি না। স্বজাতিকে

আত্মমতের অনুকূল করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে স্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যক, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল সামাজিক, বা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্য্যের যেমন একটা তালিকা অন্ততঃ মনে মনে থাকিলেও কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়, সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইতেছে। অবকাশমত কোন ভাবুক ভাবের স্রোতে ভাসিয়া দু'একটি কবিতা রচনা করিলেন, বা চিন্তাপূর্ণ দু'একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত গঠন হইবে না। তপস্যার ন্যায় একাগ্রতা-পূর্ণ চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায়ও বঙ্গভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যদ্ উন্নতির ভার নিহিত। সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দু'একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই ইংরাজী শিক্ষিতগণ যদি একটু আদরের সহিত মাতৃভাষার আলোচনা করেন, মাতৃভাষারই হিতকল্পে মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাকে সুফলের আশা অনেক। দেশের যাহারা উচ্চশিক্ষাবর্জ্জিত, সেই জনসাধারণকে তাঁহারা অতি অল্প আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহসম্পন্ন করিতে পারিবেন। কেন না,—তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মত গঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ বা এক হিসাবে কর্ত্তা হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ঐ মাতৃভাষাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তোলা, ইংরাজী শিক্ষিতগণের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কেন না, তাঁহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, লোক-সমাজের স্পৃহনীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন,—তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের তাঁহাদের আচরিত রীতিনীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই সাধারণকে স্বমতের বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য বড়ই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায় একটি মহতী জাতির-উদীয়মান জাতিরও স্খলন বা অধঃপতন হইতে পারে।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"

এই মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাদক্ষেপ করিতে হইবে। তরণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক। অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী।

যাহারা বঙ্গের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে আবার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, এরূপ আশা কদাচ করা যায় না। তাহাদিগকে, সেই mass অর্থাৎ সাধারণ জনসঙ্ঘকে সৎপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ তাহাদিগকে অসৎপথে—উৎসন্নের পথে অধঃপতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে। সরলবিশ্বাস-সম্পন্ন জনসঙ্ঘের চিত্ত, শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাক্‌চিক্যে বশীভূত করিয়া যে দিকে ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ্ এবং বিপদ্, এই দুইএরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা! যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ্, বিপদ্, উভয়ই নির্ভর করিতেছে,—তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে কত গুরুতর, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশের জন-সঙ্ঘকে যদি সৎপথেই লইয়া যাইতে হয়,—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়,—বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্ম-সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে,—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দোষ—আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে, আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও

দেশাত্মবোধ আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে. সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, পাশ্চাত্য আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। দু'একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ, ইউরোপের ইতিহাস। ইতিহাস অল্পবিস্তর প্রায় সকল জাতিরই কিছু না কিছু আছে। বর্ত্তমান কালে ইউরোপ জগতের অভ্যুদিত দেশ-সমূহের শীর্ষ স্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাপূর্ব্বক দেখিতে হইবে, যে. কেমন করিয়া. কোন্ শক্তির বলে, বা কোন্ গূঢ় কারণে ইউরোপের কোন্ জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, কোন পথে পরিচালিত হওয়ায় কোন্ জাতির কি উন্নতি হইয়াছে, সেই উন্নতির কারণ এবং পথ, আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য কি না, তাহার প্রয়োগে আমাদের এ দেশে কতটা মঙ্গলের সম্ভাবনা,—ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে হয়, এ দেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে সেই পথে আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সেই প্রবর্ত্তনের একমাত্র সহজ পথ,—ঐ সকল কারণ, ঐ সকল উপায় প্রণালী, অতি বিশদরূপে আমাদের মাতৃভাষার দ্বারা সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এই প্রচারের একমাত্র কর্ত্তা, যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাঁহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে, মাত্র তাঁহারাই, অন্যে নহে।

দেশের কল্যাণ কামনায় এবং স্ব মাতৃভাষার পরিপুষ্টি বাসনায় যাঁহারা এই মহাব্রতে দীক্ষিত হইবেন. তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ইউরোপীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রচারকর্ত্তাদের সামান্য ত্রুটীতে আমাদের অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেশের শিক্ষিতগণের প্রতিপদবিক্ষেপেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

যেমন এই অভ্যুদয়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই সঙ্গে দেখিতে হইবে. কোন্ পথে যাওয়ায়, কোন্ দুর্নীতির আশ্রয় বশতঃ, ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত ঘটিয়াছে, বা ঘটিতেছে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন্ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াও কোন্ কর্ম্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে,—পতনের সেই সেই কারণ-নিচয় অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া. সেই সেই সর্ব্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার স্বচ্ছ দর্পণে এই ভাবে দোষগুণের প্রতিবিম্বনপূর্ব্বক দোষের পরিহার ও গুণের গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য জন্মাইতে হইবে।

ইহ কালই জীবনের সর্ব্বস্ব নহে। এই ইহকালকেই একমাত্র সার ভাবিয়া কার্য্য করার ফলে ঐহিকবাদী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব আদৌ নাই বলিলেই হয়, ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত অভাবের ফলেই বর্ত্তমান শোণিততরঙ্গিণী রণভূমিতে ইউরোপ বিপর্য্যস্ত। ইউরোপের ঐ অসদ্ভাবের অর্থাৎ ঐহিকবাদিতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বরং যতটা সম্ভব, উহার দূরে সরিয়া যাইয়া আমাদিগের জাতীয়তা ও চিরস্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া, উহাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশপূর্ব্বক সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। যাহা আছে. মাত্র তাহা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এ দুর্দ্দিনে জাতীয়-সম্পদের যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বতঃপ্রকারে তাহা করিতে হইবে।

তার'পর ইউরোপের সাধারণ সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য—নাটকাদি। আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই অংশে বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত প্রভৃতি জটিল বিষয়সমূহের আলোচনা অপেক্ষা এই সমুদয় আপাতরম্য কাব্যনাটকাদির আলোচনায় ইংরাজী শিক্ষিতগণের অনেকেই কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তারুণ্যের অরুণ আভায় এই সকল বিদেশীয় চিত্র প্রথমতঃ বড়ই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। আমাদের বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখা দরকার যে, পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র তদীয় জাতীয় কাব্যনাটকাদিতে কি ভাবে প্রতিফলিত। ইউরোপের সামাজিক চিত্রাবলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাবভাব, বিন্যাস কৌশল প্রভৃতি আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে গ্রহণ যোগ্য কিনা,—ঐ ঐ চিত্রাবলীর

আদর্শে যদি আমরা স্বকীয় সমাজচিত্রের ছায়াপাত করি, তবে তাহাতে আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি না, অথবা ঐ বিদেশীয় চিত্র আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য কি না,—এই চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া ইউরোপীয় কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়া, উহার যে সকল অংশ উৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় এবং কল্যাণ-জনক, তাহা আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতে হইবে, সাধারণের মানস-সম্পদের উৎকর্ষ বিধান করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে আমার মাতৃভাষারও লাবণ্য বর্দ্ধিত হইবে। যাহা সৎ যাহা সাধু, নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ, তাহা যে জাতির বা যে সমাজেরই হউক না কেন, সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে।

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ"

এইভাবে জাতীয় সাহিত্য যদি গঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের সাহায্যেই আমাদের নবজাতা জাতীয়তা সুগঠিত হইবে, এবং জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত আমরা সমকক্ষতা করিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। ইতিহাস এবং কাব্য-নাটক-উপন্যাসাদি সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, ইউরোপীয় দর্শন এবং অপরাপর কলা (art) প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রয়োজ্য। যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই উত্তম, সুতরাং আমাদের গ্রাহ্য, বা যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই অস্পৃশ্য, সম্পূর্ণভাবে পরিত্যজ্য,—এরূপ কথা বলিতে আমি সাহস করি না। বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বুঝি না, যাহা উত্তম, তাহা যে দেশীয়ই হউক না কেন, সর্ব্বথা গ্রাহ্য ; আর যাহা সর্ব্বথা দোষমুক্ত নহে, তাহা, আত্ম-পর-জ্ঞান বর্জ্জনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সোজা পথ ছাড়া ইহার অন্য কোন সমাধান জাতীয় সাহিত্যের বা সমাজের অনুকূল হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। এমন অনেক প্রথা থাকিতে পারে, অথবা আছেও, যাহা ইউরোপীয় সমাজের কতকটা অনুকূল হইলেও, আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেরূপ প্রথার প্রচলনে প্রয়াস করা যে কেবল পণ্ডশ্রম, তাহাই নহে ; তাহাতে আমাদের স্মরণাতীত কাল হইতে সুসংবদ্ধ সমাজেরও বিশেষ বিশৃঙ্খলা, ঘটিবার সম্ভাবনা। যেমন ইউরোপীয় বিবাহপদ্ধতি। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে উহা যতই সুন্দর ও আপাতরম্য মনে হউক না কেন,—এ দেশের অস্থিমজ্জার সহিত যে সংস্কার অবিভাজ্যরূপে বিজড়িত, ঐ বিবাহপদ্ধতি সেই সংস্কারের এবং সেই সংস্কারপরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত সমাজের পক্ষে কদাচ হিতকরী হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশী পদ্ধতির ঐন্দ্রজালিক চিত্রে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করা অনুচিত। যাহা তোমার সমাজের বা জাতীয়তার পরিপন্থী, তাহাকে আড়ম্বর-পূর্ণ সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে তোমার স্বজাতির আপামর সাধারণকে মজাইও না। মনে রাখিও, তুমি যে পথ আজ নির্ম্মিত করিয়া যাইতেছ, উত্তরকালে তোমারই দেশের শতসহস্র যাত্রী সেই পথে গমনাগমন করিবে। সুতরাং আপাত প্রশংসার ও যশের প্রতি উদাসীন থাকিয়া যাহা তোমার স্বজাতির এবং স্বসমাজের হিতকর, তাদৃশ চিত্র অঙ্কিত কর, তাদৃশ আদর্শ তোমার সাহিত্যের মন্দিরে স্থাপিত কর, যাহার অনুকরণে তোমার ভবিষ্যৎ জাতি সমুন্নত হইবে। তোমার যে বিবাহপদ্ধতি আছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির পদ্ধতি অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ; সুতরাং ঐ উৎকৃষ্ট পদ্ধতির যে যে অংশ অশিক্ষিত, সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ জন-সমাজে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুবোধিত হয় নাই, তাহা তোমার বঙ্গ-সাহিত্যের সাহায্যে ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত কর। এবং পার ত, তোমার সেই উৎকৃষ্ট চিত্রের সম্মুখে বিদেশীয় চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া তুলিয়া ধর, তুলনায় তোমার স্বজাতিকে বুঝাইয়া দাও যে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা তোমার পক্ষে গ্রাহ্য ও তোমার সমাজের অনুকূল। মোহের ঘোরে যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত, তাহার যাহাতে মস্তক শীতল হয়, সেইরূপ ভৈষজ্যের বিধান কর। যাহাতে রোগ বৃদ্ধি হয়, তোমার জাতীয় চিকিৎসা গ্রন্থে তাদৃশ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সমাজকে উৎসন্ন করিও না। তোমার প্রাচীন শাস্ত্রভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি স্তূপীকৃত রহিয়াছে, এখনও যাহাদের আবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই, মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণে এখনও যে সমুদয় রত্নের অতুল কান্তি নিরীক্ষণ করে নাই, তোমার জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে সেই সেই রত্নের মালা গাঁথিয়া তোমার স্বজাতির কণ্ঠে পরাইয়া দাও, তাহাদিগকে বুঝিতে দাও, শিখিতে দাও, দেখিতে দাও, এবং দেখিয়া, তুলনা করিয়া ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে দাও, দেখিবে, তাহারা এদেশের অপরাজিতা বা শেফালিকা ফেলিয়া অন্য দেশের ভায়লেট্ মাথায় করিবে না নিজেদের কি আছে, কি ছিল, ইহা যাহারা না জানে, তাহারাই পরের দ্বারে উপস্থিত হয়। তোমার স্বদেশবাসীদিগকে তোমার প্রাচীন সম্পদের

পরিচয় দাও, বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও, তাহাদের মনে আত্ম-সম্মান উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল। তবেই ত তোমার জাতীয়তা গঠিত হইবে। সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন কর, তবে ত জাতির গঠন হইবে। নতুবা সমস্তই আকাশ-কুসুম।

মনে কর, বিলাতের ব্যবস্থাপক-সভা (বা পার্লিয়ামেণ্ট)। তোমার দেশের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ সভার উপযোগিতা কত দূর, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু বিলাতের লোকতন্ত্র যেরূপভাবে গঠিত, তাহার পক্ষে ঐ সভার উপযোগিতা প্রচুর। সে দেশের পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাই যে এ দেশেরও আবশ্যক, ইহা বলা বড়ই দুষ্কর। দেশভেদে, দেশবাসিভেদে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাভেদে, এবং দেশের শিক্ষা দীক্ষার ভেদে, দেশের পরিচালন সভাসমিতিরও ভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তোমার দেশের পক্ষে তোমার প্রাচীন পদ্ধতিই অনুকূল, না বিদেশীয় পদ্ধতি অনুকূল, তাহা বিশেষ বিচার করিয়া, তোমার জাতীয় সাহিত্যের দর্পণে ঐ উভয় ছবিরই দোষগুণের আলোচনা কর, এবং দেশবাসীদিগকেও বুঝিয়া লইতে দাও যে, কোনটা তাহাদের গ্রাহ্য। মুক্ত পুরুষের ন্যায়, আর্ষ প্রকৃতির ন্যায়, নিরপেক্ষ হইয়া লোকের হিতকামনায় সাহিত্য গঠন কর, দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে। ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আদর্শে যদি তোমার স্বদেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাও, মনে রাখিও, বর্ত্তমান সময়ে তোমার বিফলাশ হওয়াই সম্ভব। হৈমন্তিক শস্যের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত, তাহাতে আশু ধান্যের বীজ বপনে, মাত্র কৃষকের মনস্তাপের বৃদ্ধি হয়, আর সেই সঙ্গে বীজ ধ্বংস ও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে দেশের শাস্ত্রে, শিক্ষায় দীক্ষায় ও রাজনীতিতে রাজা মানব নহে, দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য রাজনীতির ছায়াপাতে সেই দেবতাকে আবার মানবের আসনে অধঃপাতিত করিও না। তোমার প্রাচীন রাজনীতির উজ্জ্বল চিত্র উত্তমরূপে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, প্রতিভার সাহায্যে তাহা তোমার মাতৃভাষায় আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতির সহিত তুলনায় সর্ব্বসাধারণকে বুঝিতে দাও যে, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের রাজনৈতিক ধারণা কত উচ্চ ছিল। গুপ্তহত্যা, রাজবিদ্বেষ এবং রাজদ্রোহ কেবল ঐহিক নহে, পারত্রিক অকল্যাণেরও আকর, এ কথা তোমার ধর্ম্মশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছে। যদি এই সকল কঠিন সমস্যা মাতৃভাষার সাহায্যে সমাধান করিতে পার, তবেই প্রকৃতপক্ষে তোমার মাতৃভাষার সেবা সার্থক হইবে, তোমার জ্ঞানার্জ্জন সার্থক হইবে, আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার সেবা করিয়া তোমার জন্মও সার্থক হইবে। অবশ্য এই কঠিন কার্য্য এক সময়ে, বা একের দ্বারা কদাচ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এই পথে যদি একবার তোমার জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তবে দেখিবে, আরও কত পথিক তোমার প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিবে। পথ যদি উত্তম, সুগম এবং সুশীতল ছায়াসম্পন্ন হয়, তবে তাহাতে কোন দিনই যাত্রীর অভাব হয় না। যাহা ভাল, নিষ্পাপ এবং, নির্দ্দোষ, তাহার সেবা কে না করিতে চায়? সেই সেবায় সেবিতের লাভালাভ কিছুই নাই, কিন্তু সেবকের আত্মতৃপ্তি অপরিসীম এই গুরুতর কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠাতৃগণের মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদে বা মাত্র তাহার উজ্জ্বল অংশের প্রদর্শনেই, আমাদের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না; প্রত্যুত, তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনাপূর্ব্বক, তাহার অসদংশের বর্জ্জন করিয়া সদংশ, যাহা এদেশের অনুকূল, ঐ অংশ, যদি তাহাতে কোনরূপ দোষলেশ না থাকে, তবে তাহাই আমাদের মাতৃভাষার কমনীয় আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হইবে। এইভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রাহ্য অংশগুলি যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই ক্রমে আমাদের বঙ্গভাষা আশাতীত ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। ইউরোপীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকিয়াও এদেশবাসীরা ইউরোপের শিক্ষার উত্তম ফলে বঞ্চিত থাকিবে না, প্রত্যুত, ক্রমেই তৎ তৎ ফলে সম্পন্ন হইবে। প্রাচীন জাপান এই উপায়-বলেই অধুনাতন নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই একটা বিষয়ে সর্ব্বদা আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অশ্বের উপরে নর্ত্তনাদি করিয়া যাহারা দর্শকদিগের প্রীতি ও কৌতুক উৎপাদন করে, তাহারা যেমন প্রধানতঃ সর্ব্বদাই স্মরণ রাখে যে "অশ্বপৃষ্ঠ হইতে স্খলিত না হই" তদ্রূপ আমাদিগকেও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা এই কার্য্য করিতে যাইয়া স্খলিত না হই। অর্থাৎ আমাদের যাহা মজ্জাগত সংস্কার সেই পবিত্র ধর্ম্মভাব হইতে যেন বিচ্যুত না হই। আমাদের রাজনীতি প্রভৃতির কোনটিই ধর্ম্মভাবশূন্য নহে। ভারতবর্ষের মৃত্তিকার এমনই একটা গুণ আছে যে, এখানে ধর্ম্মভাববর্জ্জিত কোন বস্তুই স্থায়ী হইতে পারে না, এপর্য্যন্ত পারে নাই। যাহাদের আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের কোনও চিত্র যদি ধর্ম্মভাব, ব্যঞ্জক না

হয়, তবে তাহা কদাচ বাণীর পাদপদ্মে অর্পণ করা যাইবেনা। সে চিত্র, গোধূলি-গগনের লোহিত মেঘখণ্ডের মত অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী প্রভৃতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; রাম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দধীচি, কর্ণ যাহাদের সাহিত্যের আদর্শ পুরুষ, কবিগুরু রত্নাকর, মহর্ষি দ্বৈপায়ন, কবিকুলরবি কালিদাস, ভবভূতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্য-সঙ্গীতের গায়ক, আর সর্ব্বোপরি, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যাহাদের শ্রৌতসঙ্গীতরূপ অমৃতের নির্ঝর, তাহাদের নবীন জাতীয় বঙ্গসাহিত্যে কোনরূপ অপবিত্র ভাব বা আচার যেন প্রবেশ না করে, তৎপক্ষে সর্ব্বদাই প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন। সকল জাতিরই এক একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক; আছেও। লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভ্যুদয়-শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে যে জাতি অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা স্থির লক্ষ্য ছিল। এবং সেই লক্ষ্য ধরিয়াই, তাহারা ক্রমে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারিয়াছে। লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে, কিছুই অসম্ভব নহে। অতি দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। এই যে ইউরোপ এত অতুল ঐহিক শ্রীবৃদ্ধিতে সম্পন্ন, ইহার কারণ কি? অর্থ বা অর্থকর বাণিজ্য উহাদের একমাত্র লক্ষ্য। আজ যে জাপান এত উন্নত, ঐ অর্থকর বাণিজ্য উহার একমাত্র লক্ষ্য। ঐ লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি আছে বলিয়াই, অন্য কোন বাধা-বিপত্তিতে উহাদিগকে ব্যাহত করিতে পারে না; লক্ষ্য-স্থলে উপনীত হইবার জন্য, প্রাণকেও উহারা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। লক্ষ্য স্থির ছিল বলিয়াই, ধর্ম্মপ্রাণ অগ্নি উপাসকগণ অম্লান বদনে, ইরাণ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন,—আমেরিকার পিউরিটানেরা মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক গহনবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে যে জাতি যে যে বৃহৎ কার্য্যই করুক না কেন, তাহার মূলে কিন্তু একটা স্থির লক্ষ্য থাকা চাই! তাই বলিতে-ছিলাম, আমাদের এই জাতীয় সাহিত্যের মন্দির-নির্ম্মাণেও একটা স্থির লক্ষ্য আবশ্যক। অন্যথা আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। আমাদের সেই লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? কোন্ লক্ষ্যে স্থিরচিত্ত থাকিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিয়া-ছিলেন? কোন্ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া নিবন্ধনই আমরা ক্রমে অধঃপতিত হইতেছি? ইহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য ও বিবেচ্য।

ভারতবর্ষ যে এত উন্নত হইয়াছিল, সে এক-মাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া। যদি ভারতকে আবার বড় করিতে চাও, যদি আবার তোমাদের লুপ্ত সম্পদের বিনষ্ট সম্মানের পুনরধিকার চাও, তবে সেই পিতৃপিতামহের লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির কর। একাগ্রচিত্ত হও, অগাধে তোমার অভিপ্রেত মৎস্যচক্র ভেদ করিতে পারিবে। ধর্ম্মভাব হিন্দু জাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল; ধর্ম্মভাবকেই তোমার বর্ত্তমান জাতীয়তার ও প্রধান লক্ষ্য কর। তোমার সাহিত্য, তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি আচারব্যবহার সর্ব্বত্রই সেই ভারতস্পৃহনীয় ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ কর। দয়া, সমবেদনা পরার্থপরতা, সত্য, তিতিক্ষ, প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে তোমার সাহিত্যকানন যদি সম্পন্ন করিতে পার, তবেই তোমার জাতীয় অভ্যুদয় হইবে। অন্যথা যাত্রার দলের প্রহ্লাদের ন্যায় তুমি ভক্তের ভাণ করিবে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তোমার কোনই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। অন্তরের সমস্ত আবেগ, উৎসাহ ও নির্ভর একত্র করিয়া যদি জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে পার দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে

এইভাবে অন্যের সুচারু ও সদ্ভাবপূর্ণ পদার্থ লইয়া নিজের জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণ ও জাতীয় আদর্শের গঠন ইতঃপূর্ব্বেও হইয়াছে। বঙ্গে ইতঃপূর্ব্বে অতি প্রবলরূপেই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমের নিজের জাতীয় সম্পদ্ আমাদের প্রাচীন সম্পদের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে ছিল না; আমাদের সহিত তুলনা করিলে রোমের প্রাচীন সম্পদ্ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। রোমে যখন জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ হইল, তদানীন্তন প্রধান জাতীর অভ্যুদয় দর্শনে রোমবাসীদের হৃদয়েও যখন জাতীয়তাগঠনের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, জগতে বরণীয় হইবার আকাঙ্ক্ষায় রোমবাসিগণের অন্তঃকরণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা মাত্র নিজের পরিমিত প্রাচীন সম্পদেই আর পরিপুষ্ট থাকিতে পারিল না। পিপাসার্ত্ত হইয়াই যেন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল তখন গ্রীসের চরম উন্নতির সময়। সর্ব্বপ্রকারেও সর্ব্বাংশে গ্রীস তখন জগতের একটা আদর্শ জাতি। বীরত্বে, ধীরত্বে, জ্ঞানে, সম্মানে গ্রীস তখন সকলের শ্রেষ্ঠ। গ্রীসের সেই চরম অভ্যুদয়ের সময়ে রোমের লোলুপ দৃষ্টি গ্রীসের প্রতি পতিত হইল। গ্রীসের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গ্রীসের কলাবিদ্যা, গ্রীসের শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সমস্তই রোম ক্রমে স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে লাগিল। গ্রীসের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই রোম নিজের জাতীয়তা গঠনের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিল দেখিতে দেখিতে রোম গ্রীসের সমকক্ষ, এমন কি অনেকাংশে গ্রীস অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রীসের অনুকরণ করিতে যাইয়া কিন্তু রোম স্বীয় জাতীয়তার বিসর্জ্জন করে নাই। গ্রীসের যাহা কিছু উত্তম পরিচ্ছদ, যাহা কিছু সুন্দর অলঙ্কার, তাহা রোমের জাতীয় ছাঁটে ছাঁটিয়া, জাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া রোম পরিধান করিল এবং নবীন সাজে সাজিয়া রোম যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, তখন রোমের সেই নানারত্নখচিত কিরীটের প্রভায়, প্রাচীন গ্রীস যেন কতকটা হীন প্রভ হইয়া পড়িল। প্রাচীন গ্রীসের অঙ্গে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে সমুদয় জরা-জনিত পলিত ভাব

জন্মিয়াছিল, যাহা কিছু অসুন্দর ছিল, তাহার পরিবর্জ্জন করিয়া রোম গ্রীসকে যেন একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। রোমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের মস্তক হেঁট হইল।

কিন্তু এই গ্রীস্-রোমের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। রোমীয়দিগের নিজের প্রাচীন দ্রব্যসম্ভার তত অধিক ছিল না, তাহাদের গৃহ একপ্রকার শূন্য ছিল,হয়ত গৃহের কোন এক কোণে দু' একটি প্রাচীন পদার্থের কঙ্কাল মাত্র পড়িয়াছিল,তাই রোমীয়গণ দু'হাতে গ্রীসের যতটা পরিয়াছে দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া নিজের শূন্যপ্রায় গৃহপরিপূর্ণ করিয়াছে। তত সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিতে হয় নাই।

আমাদের কথা ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। আমাদের প্রাচীন সম্পদ্ প্রচুর। তাহার ভাণ্ডার অক্ষয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। আমাদের যাহা আছে, তাহার কোন একটিরও মর্য্যাদার হানি হইতে পারে এবং কোন পরস্ব আমরা কদাচ গ্রহণ করিব না। অথচ, আমাদের যাহা নাই, অন্যের প্রচুর আছে, সেইরূপ পদার্থ যদি আমাদের জাতীয়তায় পরিপন্থী না হয়, তবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিব না। রোমের ন্যায় আমাদের গৃহ শূন্য নহে যে, যে, ভাবে পারি, গৃহ পূর্ণ করিব; আমাদের ঘর পরিপূর্ণ, সেই পরিপূর্ণ গৃহের শোভা বৃদ্ধির পক্ষে যাহা অনুকূল, সেই পরিপূর্ণ গৃহের অনুরূপ যে সাজ সরঞ্জাম, তাহা যদি অন্য কোন জাতীর নিকটে পাই, তবে অম্লান হৃদয়ে গ্রহণ করিব। যাহা আমার জাতীয়তার অনুকূল নহে, তাহা কদাচ স্পর্শ করিব না। আমার নিজের জাতীয়তায় কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ হইতে পারে, এরূপ আবর্জ্জনা কদাচ আমার জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গে জন্মিতে দিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিবেচনার সহিত পাদক্ষেপ করিতে পারি, কিংশুক পরিহার পূর্ব্বক কমল চয়ন করিতে পারি, তবেই আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সম্পদ্ এই দুইই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

আমাদের যাহা নিজস্ব, যাহা লইয়া আমরা গৌরব করি, আমাদের সেই জতীয় গৌরবের বস্তু, প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষা, শিল্পকলা, দর্শন ইতিহাস প্রভৃতির যাহাতে কোনরূপে অঙ্গহানি ঘটে, এরূপ কার্য্য যেন আমরা কদাচ না করি,কদাচ যেন জাতীয়তার বিসর্জ্জন না দিই। অথচ যে ভাবে হউক, যদি ঐ ঐ বস্তুর কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি তবে তাহাতে যেন বদ্ধপরিকর হই। নিজের যাহা আছে,তাহা ত আছেই, কেহ তাহা অপহরণ করিতেছে না,সুতরাং সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকিয়া যাহা অন্যের আছে, অন্যে যাহার বলে বলীয়ান্, অথচ আমার নাই, তাহা পাইবার জন্য যদি আমার আন্তরিক আগ্রহ না জন্মে, তবে কদাচ আমি ঐ বলবানের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিব না। কেবল পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বের অতীত সম্পদের আলোচনা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে কোনই ফলোদয় হয় না। নিজের জাতীয় জীবনের শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহার প্রয়াস স্বতঃপরতঃ করিতে হইবে। শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। আমার এই ছিল, আমি এই ছিলাম, এইরূপ ব্যর্থ ও অলস চিন্তায় কোনই লাভ নাই, বরং ক্ষতিই অধিক। এই ভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারি তবেই আমাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, আমরা এই ঘোর দুর্য্যোগেও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ, ধর্ম্মভাব বর্জ্জিত,তাহা উরগক্ষত-অঙ্গুলির ন্যায় পরিহার করিয়া, যাহা সুন্দর, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, মনোহর, যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সদ্ভাবপুষ্প চয়ন করিব, এবং সেই সদ্ভাব-কুসুমে আমার জননী অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃতা করিব, মায়ের সন্তান আমরা মাতৃ-পূজা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। যে বায়ু মধুকণা বহন করে না তাহা আমরা আঘ্রাণ করিব না, যে নদী মধুমতী নহে, তাহার আমরা সেবা করিব না, যে লতা মধুময় কুসুমে কুসুমিত নহে, তাহার প্রতি আমরা চাহিব না। এইভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের অনুকূল হইবে, সহায় হইবে নিঃসপত্নভাবে আমরা পর্ব্বোদিত চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিব। হিমাচল যে দেশের পর্ব্বত, জাহ্নবা যমুনা যে দেশের প্রবাহিনী,সাম যে দেশের সঙ্গীত, রামায়ণ-মহাভারত যে দেশের ইতিহাস আমরা সেই দেশের অধিবাসীর যোগ্যতা লাভ কবিতে পারিব। আপনারা আজ আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন,—বঙ্গবাণীর চরণ প্রান্তে বসিবার সুযোগ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আন্তরিককৃতজ্ঞতাপ্রকাশ পূর্ব্বক আমি আবার বলি, আপনাদের ভাষা, আপনাদের ভাব, আপনাদের চিন্তা—এ সমস্তই সুন্দর হউক, অন্যের অনুদ্বেজক হউক, যাহারা আপনাদের সন্নিকর্ষে আসিবে, তাহাদিগকেও উন্নতির পথে লইয়া, আপনারা নিজে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায়, অবাধিত গতিতে, উন্নতির অমৃতময় পারাবারে মিশিয়া যাউন। নিজের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের বরেণ্য হউন। বিধাতার কৃপায়,

মধু ক্ষরতু তে বিত্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োহস্তু তে॥

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

———

বাঙ্গালী হিন্দু।

আজকাল বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। বাঙ্গালী সমাজের পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার, রীতি নীতি শিক্ষা ব্যবসায় এবং নিম্নশ্রেণীর সহিত উচ্চশ্রেণীর সম্বন্ধ ইত্যাদির যে অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কি মধ্যবিৎ, কি নিম্নশ্রেণী-বাঙ্গালী হিন্দুদিগের মধ্যে যে কতকগুলি কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার নিরাকরণ সম্বন্ধে সকলেরই একটা বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয়। জীবন সংগ্রামের কঠিন সমস্যা মীমাংসা করিতে এই জাতি কি পরিমাণে কৃতকার্য্য বা অকৃতকার্য্য হইতেছে তাহা ভাবিয়া দেখা সুধীগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই নিজেদের সংখ্যা একটী আলোচ্য বিষয়। সমগ্র পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া সেই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিসকল নিজেদের গৌরবাম্বিত বলিয়া মনে করে। খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী লোকগণও নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য মিশনারি প্রভৃতি দ্বারা নিজ নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশতঃই হউক হিন্দু শাস্ত্রকারগণ পর ধর্ম্ম হইতে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। সুতরাং হিন্দুদিগের সংখ্যা জন্ম মৃত্যুর তালিকার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। গত ত্রিশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা কি পরিমাণে অন্য জাতির সংখ্যার তুলনায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

বাঙ্গলা দেশকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পশ্চিম বঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, ও পূর্ব্ববঙ্গ। পশ্চিম বঙ্গে ছয়টী জিলা—বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর হুগলী ও হাবড়া। মধ্যবাঙ্গলায়—চব্বিশ পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোহর। উত্তর বাঙ্গলায়—রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, দার্জ্জিলিং, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদহ ও কোচবিহার এবং পূর্ব্ববাঙ্গলায়—খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নওয়াখালী, চট্টগ্রাম, পার্ব্বতীয় ত্রিপুরা ও পার্ব্বতীয় চট্টগ্রাম—এই কয়েকটী জিলা আছে। ১৮৮১ সন হইতে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসরে বাঙ্গলার কোন অংশে কি পরিমাণে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	প্রতি দশ হাজারে হিন্দুর সংখ্যা				ত্রিশ বৎসরের প্রতি দশ হাজারে হ্রাস বৃদ্ধি।
	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	
পশ্চিম বঙ্গ	৮৩৯৬	৮৩২৮	৮৩১৯	৮২৩৩	—১৬৩
মধ্য বঙ্গ	৫০০০	৫০০০	৫০২০	৫০৫৬	+ ৫৬
উত্তর বঙ্গ	৪০০০	৩৯৭৪	৩৯২১	৩৭৩৮	—২৬২
পূর্ব্ব বঙ্গ	৩৪৭৫	৩৩৬০	৩২৫০	৩০৮৯	—৩৮৬

হ্রাসের সংখ্যা পূর্ব্ব বঙ্গে অনেক বেশী। বৃদ্ধির সংখ্যা মধ্য বঙ্গে প্রতি দশ হাজারে ৫৬জন। ইহার প্রধান কারণ কলিকাতার জন সংখ্যা ও ২৪পরগণার স্থানে স্থানে কলের মজুর সংখ্যা বৃদ্ধি। মধ্য বঙ্গের অন্যান্য জেলার লোক সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিলেও হ্রাসের সংখ্যাই সুস্পষ্ট লক্ষিত হইবে। যথা—

	প্রতি দশ হাজারে হিন্দু	
	১৮৮১	১৯১১
নদীয়া	৪৩৮৮	৩৯৭২
মুর্শিদাবাদ	৫১৭৪	৪৬৮৮
যশোহর	৩৯৬২	৩৮৯৯
২৪ পরগণা	৬২০২	৬২৬৯
কলিকাতা	৬২৬০	৬৭৫০

সমগ্র বাঙ্গলার হিসাব ধরিলে দেখা যায় মোট হিন্দুর সংখ্যা প্রতি দশ হাজারে ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ৪৮২২ হইতে ১৯১১ খৃঃ অব্দে ৪৫২৩ জনে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ

ত্রিশ বৎসরে প্রতি দশ হাজারে ৩৫৯ জন হিন্দু ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য জাতির সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে গত ত্রিশ বৎসরে সমগ্র বাঙ্গলার হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ১৫·৯ মাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা শতকরা ৭৯·৫ বৌদ্ধ ৫৯·২ এবং মুসলমান ৩১·৮ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

গত দশ বৎসরে সমগ্র বাঙ্গলায় মাত্র ৩৪২৩৮৬৬ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি একশত জনে মাত্র ৬·৭ লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে। প্রত্যেক জেলার বিষয় ভিন্ন ভাবে দেখিলে দেখা যায় যে গত দশ বৎসরে বর্দ্ধমানের সদর এবং কালনা মহকুমায় যথাক্রমে শতকরা ২·৮১ এবং ০·৫৩ কমিয়াছে। বীরভুমের সিউড়ি ও দুবরাজপুর থানায় ১৮৯১ হইতে ১৯০১ অব্দের মধ্যে শতকরা ১০ হইতে ১৫ জন লোক বাড়িয়াছিল কিন্তু ১৯০১ হইতে ১৯১১ অব্দে সেখানে ০·৮৭ ও ১·৮২ লোক কম হইয়াছে। মোট জেলায় শতকরা ১৩ জন হইতে মাত্র ৩·৬৮ লোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমায় যেখানে ১৮৯১—১৯০১ সালে শতকরা ৭·১৭ জন লোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল সেখানে ১৯০১—১৯১১ সালে শতকরা ৩·১৩ জন কমিয়াছে। মোট জেলায় শতকরা ৪·৩৭ হইতে মাত্র ১·৯৯জন বাড়িয়াছে। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায় প্রথম দশ বৎসর মাত্র ০·৯০ জন লোক শতকরা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু গত দশ বৎসরে শতকরা ৭·২৬ লোক কমিয়াছে। কাঁথি মহকুমায় প্রথম দশ বৎসর ১০·৫৯ এবং গত দশ বৎসরে ২·৫০ এবং মোট জেলায় ৫·৯৯ স্থলে ১·১৫ বাড়িয়াছে মাত্র।

হুগলীর আমর বাগ মহকুমায় শতকরা ৩·২৩ জন কমিয়াছে এবং তাহার প্রত্যেক থানার লোক সংখ্যাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। নদীয়ার কাহিনী শোচনীয়। সমগ্র জেলার অধিবাসীর সংখ্যা গত দশ বৎসরে শতকরা ২·৪৪ কমিয়াছে। এই জেলার কুষ্টিয়া, মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গায় মোটের উপর শতকরা ৫ জন করিয়া কমিয়াছে। নদীয়ার অবস্থা শোচনীয় হইলেও যশোহরের অবস্থা আরও শোচনীয়। এক নড়াইল মহকুমায় মাত্র শতকরা ২·৫৪ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে· দেখা যায়, কিন্তু সদর, ঝিনাইদহ, মাগুরা এবং বনগাঁওতে শতকরা ৩·৫৫ লোক হ্রাস পাইয়াছে। মুর্শিদাবাদ সদর মহকুমায় শতকরা ০·৬৫ জন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোর মহকুমায় শতকরা ৭·০২ জন লোক ক্ষয় হইয়াছিল। পাবনা জেলায় মাত্র একটী মহকুমা, সিরাজগঞ্জ, তাহার লোক সংখ্যা ১৮৯১—১৯০১ সালে শতকরা ৯·৪২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু ১৯০১—১৯১১ সালে শতকরা ০·৫৭ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঢাকা জেলায় মাত্র শতকরা ৪·৪৬ স্থলে ১·২৫ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার দুইটী থানার লোক সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়াছে। ঘীওর থানায় (প্রথম দশ বৎসর) ৭·৫১ লোক বাড়িয়াছিল। গত দশ বৎসরে তাহাতে শতকরা ১·১৭ লোক কমিয়াছে এবং হরিরামপুর থানায় প্রথম দশ বৎসর ১·১১ বাড়িয়াছিল, গত দশ বৎসরে ৫·৭৯ কমিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার প্রত্যেক মহকুমায়ই ১৮৯১—১৯০১ সাল এবং ১৯০১—১৯১১ শতকরা ৪ হইতে ৭ জন লোকের বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু টাঙ্গাইলে ১২·৮৯ স্থলে ৮·২০হইয়াছে। ফরিদপুরের ভূষণা ও বালিয়াকান্দী থানার লোক সংখ্যা এখনও কম আছে। বাকরগঞ্জের পিরোজপুর মহকুমায় ৬·৫২ বৃদ্ধির স্থলে ০·৫৬ কমিয়াছে।

ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কি প্রকারে ধীরে ধীরে বাঙ্গালি হিন্দুর জন সংখ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব বঙ্গের লোক সংখ্যা কম ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হওয়ার কারণ কি? বঙ্গে অন্য জাতিও বাস করিতেছে কিন্তু তাহাদের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আমার বোধ হয় হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ তিনটি (১) ম্যালেরিয়া (২) অন্নাভাব (৩) উদ্যমের অভাব।

(১) ম্যালেরিয়া—উপরিউক্ত তালিকা পাঠ করিলেই

দেখা যায় যে যে সকল স্থান ম্যালেরিয়ার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই সকল স্থানেই লোক সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্দ্ধমান, নদীয়া, যশোহর, জলপাইগুড়ী, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমা, ঢাকার মাণিকগঞ্জ, বরিশালের পিরোজপুর, পাবনার সিরাজগঞ্জ, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, হুগলীর আরামবাগ ইত্যাদি স্থানে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এবং ইহার ২। ১টী ব্যতীত সমস্ত স্থানগুলিই হিন্দু প্রধান হওয়ায় ম্যালেরিয়ায় হিন্দুর মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইতেছে। লোকে জ্বরে ভুগিতে ভুগিতে কঙ্কালসার হয়, জীবনী শক্তিরও হ্রাস হয়, রোগে ভুগিবার সময় চিকিৎসক পায় না, ঔষধ বা পথ্য পায় না। সুতরাং মৃত্যু অনিবার্য্য হয়।

কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের পল্লীতে লোকের যে সহানুভূতি, যে সহৃদয়তা, যে একপ্রাণতা, যে শ্রমশীলতা বিরাজ করিত তাহা এখন কিছুই নাই। এখন সেখানে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, পরিশ্রম বিমুখতা ইত্যাদির আবাস স্থল হইয়াছে। বিপদে সাহায্য পাওয়া ত দূরের কথা, কিরূপে বিপদ বৃদ্ধি হয় আজ কাল তাহারই চেষ্টা বেশী হইয়াছে। দলাদলিতে পল্লীগ্রামগুলি উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে। একটু অবস্থাপন্ন হইলেই বা একটা চাকুরি হইলেই লোক পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে বাস করিতেছে। সুতরাং পল্লীগ্রামে এখন শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন এবং উন্নতিশীল ব্যক্তির অভাব হওয়ায় তাহাকে আবর্জ্জনা হীন করিয়া, পানীয় জলের সুব্যবস্থা দ্বারা স্বাস্থ্য পূর্ণ করিবার সাধ্য উদ্যম বা প্রবৃত্তি কাহারও নাই। পূর্ব্বে যে মধ্যবিৎ ভদ্রলোক সামান্য তালুক বা জোতের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া "বারমাসে তের পার্ব্বণ" সম্পন্ন করিয়া বাস করিতেন তাহা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। সুতরাং পল্লীগ্রাম এখন অযোগ্য এবং কোলাহল প্রিয় লোকের বাসভূমি হওয়ায় গ্রামের উন্নতির প্রতি কাহার ও লক্ষ্য নাই সুতরাং গ্রামগুলি ম্যালেরিয়া পূর্ণ হইতেছে এবং বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ম্যালেরিয়ার কি কেবল হিন্দুরই মৃত্যু হয়? অন্য জাতির হয় না? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যে স্থান হিন্দু প্রধান, ম্যালেরিয়ার প্রকোপও সেই সেই স্থানেই বেশী। পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুর জন সংখ্যা মুসলমান বা অন্যান্য জন সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। পূর্ব্ববঙ্গের যে সব স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতেও হিন্দুর পরিমাণ পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশী। সুতরাং ম্যালেরিয়া হিন্দুরই বিশেষ ক্ষতি সাধন করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সহ্য করিবার ক্ষমতা অধিক। কথাটি প্রথমে একটু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে বাস্তবিক তাহা নয়। হিন্দুর যাহা পুষ্টিকর খাদ্য যেমন, দুধ, ঘী, মাছ ইত্যাদি—দেশে তাহার অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। অনেক স্থলেই দুধের পরিবর্ত্তে শিশু সন্তানদিগকে বার্লি আহারে বর্দ্ধিত করিতে হইতেছে। ঘৃত দুষ্প্রাপ্য এবং মৎস্যও ক্রমে ক্রমে দেশ হইতে অদৃশ্য হইতেছে। কিন্তু মুসলমানগণ মাংস, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি নিত্য আহার করায় তাহাদের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। হিন্দুরা পুরুষানুক্রমে সাত্বিক আহারে লালিত পালিত হওয়ায় মাংসাদি আহার তাহাদের শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল নহে; সুতরাং দিন দিন ক্ষীণজীবী হইয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। অপর পক্ষে মুসলমানেরা বলকারক খাদ্যের প্রভাবে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলেও সহজে দুর্ব্বল হয় না এবং কিছুকাল পর্য্যন্ত ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিতে সক্ষম হয়। তাহাতে তাহারা অকাল মৃত্যু হইতে নিজকে কতক পরিমাণে রক্ষা করিতে পারে।

(২) অর্থাভাব—ভদ্রলোকদিগের মধ্যে চাকরি এবং আইন ব্যবসায় ব্যতীত আর অন্য কোনও উপায়ে অর্থাগম হয় না। চাকরির সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং আইন ব্যবসায়ীর সংখ্যা সীমা অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া বলা যাইতে পারে। এই দুইটীর মধ্যে হিন্দুর মধ্যবিৎ শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা জীবন যাপন করেন। কিন্তু এখন এই দুইটী ব্যবসায় অর্থ যোগাইতে অসমর্থ হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে। অনেকে কৃষিকার্য্য অপমানজনক জ্ঞান করায় তাহা ত্যাগ করিয়াছে।

সেই ফলে জমি অন্যের হস্তে পতিত হইয়াছে। ছুতোর মিস্ত্রি ইত্যাদি অন্যান্য জাতিও লেখা পড়া শিখিয়া চাকরি ব্যবসা অবলম্বন করিবার জন্য ব্যস্ত।

Mr. B. Folen তাঁহার Supply of Labour in Bengal নামক পুস্তকের এক যায়গায় লিখিয়াছেন, "২০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার কল কারখানায় এবং অন্যান্য কার্য্যে বাঙ্গালীই কাজ করিত এবং উপার্জ্জনের টাকা বাঙ্গালীর ঘরেই থাকিত। কিন্তু ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর স্থান বেহারী এবং পশ্চিম হইতে হিন্দুস্থানী আসিয়া অধিকার করিয়াছে। হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক বলশালী ও কার্য্যক্ষম এবং নিয়মিতরূপে কার্য্য করে। সুতরাং তাহারাই বাঙ্গালীর স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই সকল কার্য্যে এখন ৳ ভাগই হিন্দুস্থানী।"

বাঙ্গালী চাকর পাওয়া যে আজকাল এক প্রকার অসম্ভব, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। জীবন সংগ্রামে যে বাঙ্গালী কিরূপে পিছাইয়া পড়িতেছে তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে বেঙ্গল কাউন্সিলে (Bengal Lagislative Council) একজন ইংরাজ ব্যবসায়ী সভ্য বক্তৃতা ছলে বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিতেছি যে চীনাম্যানেরা ধীরে ধীরে বাঙ্গালী সূত্রধরের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ তাহারা যে শুধু বিশেষ দক্ষ নহে, তাহা নহে, তাহারা তাহাদের পুত্রদিগকে, এই সকল বিষয় শিক্ষা দিতে অনিচ্ছুক। আমি এমন অনেকগুলি সূত্রধরকে জানি যাহারা তাহাদের পুত্রদিগকে এন্‌ট্রান্স্ কিম্বা ফাষ্ট আর্টস্ (First Arts) পাশ করাইয়া আমাদের আফিসে কেরাণীগিরির জন্য আমাকে কত অনুরোধ উপরোধ করিয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কারখানায় সমস্তই বাঙ্গালী হিন্দু এবং ২।১ জন মুসলমান সূত্রধর ছিল, কিন্তু এখন অধিকাংশই চীনবাসী এবং অতি অল্প সংখ্যকই বাঙ্গালী আছে। চীনবাসীরা অত্যন্ত কর্ম্মী, তাহারা ধীরতা ও দক্ষতার সহিত কাজ করে, সময় মত আসিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে কাজ করাইবার জন্য অনবরত তাড়াইতে কিম্বা উত্তেজিত করিতে হয় না। তাহারা বৎসরে একদিন কি দুই দিনের বেশী ছুটী লয় না। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে বাঙ্গালীরা ঠিক ইহার বিপরীত। তাহারা চীনবাসীদের অপেক্ষা কম উপার্জ্জন করে কিন্তু সে যাহা উপার্জ্জন করে তাহার মনিব তাহা অপেক্ষা কম লাভবান হয়। তাহারা নিজের কাজে কোনরূপ যত্ন লয় না বা কোনও মনোযোগ প্রদর্শন করে না এবং অনরবত লক্ষ্য না রাখিলে কাজে ফাঁকি দেয়"।

জাতীয়তার আমরা কত হীন হইয়া পড়িতেছে উপরি উক্ত বক্তৃতাই তাহার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। চায়ের কারবার অধিকাংশই ইংরেজদিগের হাতে। জলপাইগুড়ী ও আসামে বাঙ্গালীদের কতকগুলি অতি সুন্দর ভাবে পরিচালিত চায় বাগান আছে কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালী কারিগর নাই। বাঙ্গালার ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার লোক ভিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উদর পূর্ত্তি করে অথচ শারিরীক পরিশ্রম করিতে তাহারা বিমুখ। রাণীগঞ্জ প্রভৃতি কয়লার খনিতে বাঙ্গালী হিন্দুর দেখা পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী হিন্দু ঘরে বসিয়া থাকিবে, না খাইয়া কঙ্কালসার হইবে, তথাপি যে নূতন চরের জমি লইয়া চাষ আবাদ করিয়া নিজের পরিবার প্রতিপালন করিয়া দশটাকা উপার্জ্জন করিবে তাহা করিবে না। পূর্ব্ববাঙ্গালায় সমুদ্রের ধারে অনেক নূতন চরের উৎপত্তি হয়, কিন্তু কোথাও হিন্দুর বসতি নাই। আসাম এবং আরাকাণে অনেক পতিত জমি আবাদ করিবার জন্য রহিয়াছে; তাহা অন্যান্য লোকে লইতেছে কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দু তাহার ধারে যাইতেও নারাজ। * বিশ্বাস ঘাতকতা এবং অকর্ম্মণ্যতার জন্য অনেকগুলি Joint Stock Company কত দরিদ্র এবং মধ্যবিৎ ভদ্রলোকের টাকার সর্ব্বনাশ করিয়া অকালে লয় প্রাপ্ত হইতেছে। কত গৃহস্থ নিরন্ন হইতেছে।

* চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের অনেক মুসলমান আরকান্, আসাম ও সমুদ্রের ধারে যাইয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া শক্তিশালী হইতেছে কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দু গৃহহইতে এক পা অগ্রসর হইতে অক্ষম।

মধ্যবিৎ বাঙ্গালীদের ঘরে বিলাসিতা প্রশ্রয় পাওয়ায় অর্থের অভাব আরও বেশী হইয়াছে। চারিদিক হইতেই লোক অর্থাভাব বোধ করিতেছে। এই অর্থাভাব বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হওয়ার একটী প্রধান কারণ।

(৩) উদ্যমের অভাব (want of energy)—বাঙ্গালী হিন্দুর কোনও কাজে উৎসাহ নাই, কোনও কাজে দৃঢ়তা নাই। ইউরোপীয় জাতি যে কাজেই অগ্রসর হউক না কেন, তাহাতে তাহারা মনপ্রাণ সমর্পণ করে। আমরা কোন কাজই 'গা লাগাইয়া' করি না বা তাহাতে কোনও অনুরাগ বা উৎসাহ বোধ করিনা। সুতরাং কাজগুলি ভালরূপে সম্পন্ন হয় না। ভালরূপে কাজ করিতে অক্ষম বলিয়া কেহ আমাদের দ্বারা কাজ করাইতেও চাহে না। এক লেখনী ও বাক্য চালনা ব্যতীত প্রকৃত পক্ষেই আমরা কোন কার্য্য করিতে তত পটু নই। সুতরাং Survival of the fittest নীতি অনুসারে আমাদের ক্রম-ধ্বংস বোধ হয় অনিবার্য্য। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে নমশূদ্র, কৈবর্ত্ত, জেলে ইত্যাদি জাতির যে শারীরিক অবস্থা দেখিয়াছি এখন তাহাপেক্ষা তাহাদের যে শারীরিক অবস্থা অনেকাংশে হীন হইয়াছে তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ধীরে ধীরে তাহারা শারীরিক সামর্থ্য হারাইয়া অল্পায়ু হইতেছে এবং ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

উপরিউক্ত কারণগুলি ব্যতীত আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ আছে, যাহার জন্য আমাদিগকে অল্পায়ু হইতে হইতেছে এবং আমাদের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। সেই সব ক্ষুদ্র কারণের মধ্যে (ক) আমাদের সামাজিক রীতিনীতি এবং (খ) আহার বিহার ও পরিশ্রম ইত্যাদির সময় পরিবর্ত্তন (গ) জাত্যান্তর গ্রহণ; (ঘ) অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম, এই চারিটী কারণ উল্লেখ যোগ্য।

কৌলিন্য প্রথার অত্যাচারে ব্রাহ্মণ শ্রোত্রীয় বংশ যে কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা যাঁহারা একটু অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহারাই তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের শ্রোত্রীয়দের মধ্যে ৪।৫ ভাই থাকিলে একজনের বেশী ২।৩ জন ভাইয়ের পক্ষে বিবাহ করা বেশ সঙ্গতি সম্পন্ন লোক না হইলে হইত না। আমাদের চক্ষের উপরই এই প্রকারে কত পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইতে দেখিয়াছি। শ্রোত্রীয়েরা কুলীনে তাঁহাদের কন্যা বিবাহ দিয়া নিজেদের বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। অথচ কুলীনেরা তাঁহাদের কন্যা শ্রোত্রীয়ে বিবাহ দেন না। তাহার ফল এই যে অনেক শ্রোত্রীয় বিবাহ করিতে না পারিয়া বংশ রক্ষা করিতে পারেনা এবং অনেক গরীব কুলীন কন্যা বিবাহ দিতে যাইয়া চির দরিদ্রতা অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে বংশকে হীনবীর্য্য করিয়া ফেলেন। সামাজিক কুরীতি হইতে বহুলোকের জাত্যান্তর গ্রহণ ব্যতীত আরও যে সব কুফল উৎপন্ন হইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহার আলোচনার স্থান ইহা নহে।

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান এবং শীতকালেও ইহা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় শীতপ্রধান নহে। আমাদের দেশে আহারান্তে বিশ্রামের রীতি চির প্রচলিত এবং ঋতু অনুযায়ী আবশ্যক। কিন্তু এখন শৈশব হইতেই ১০টার সময় আহার করিয়া বিদ্যালয় ও শেষে কর্ম্মস্থলে দৌড়াইতে হয় বলিয়া অতি অল্প বয়সেই আজকাল ক্ষুধামান্দ্য (Dyspepsia) রোগে আমরা আক্রান্ত হই। এবং বেশী দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই পরিবার বর্গকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রাবস্থায় রাখিয়া পরলোকের অধিবাসী হই।

স্রোতস্বতী বা পুকুরে স্নান এখন অনেকেরই ঘটিয়া উঠে না এবং আহারাদির নিয়মের ব্যতিক্রম অনেক হইয়াছে। এসব কারণেও যে আমরা স্বল্পায়ু হইতেছি, তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

এখন আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে ইহার প্রতীকারের উপায় কি? এই জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে কি প্রকারে রক্ষা করা যাইতে পারে ইহার মীমাংসা করা সহজ সাধ্য নহে। তবে কতকগুলি ভাব পাঠকগণের সম্মুখে ধরা যাইতে পারে মাত্র এবং তাহা যুক্তি সঙ্গত কিনা সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিয়া লইবেন।

আমার বোধহয় কতকগুলি অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে ধ্বংস হইতে রক্ষার উপায় হইবে না। যে ভাবে আমরা শিক্ষিত হইতেছি, ইহাতে আমাদের জড়তা অনেক পরিমাণে কমিতেছে বটে কিন্তু ইহা

আমাদিগকে Hindu ideal বা জাতীয় ভাব হইতে কতক পরিমাণে বিচ্যুত করিয়াছে। এই শিক্ষায় বিলাসিতার স্রোত এবং নিজ সুখ স্বচ্ছন্দের পরিমাণ বৃদ্ধিকরিয়া স্বার্থত্যাগ এবং দশজনের সুখ স্বচ্ছন্দের বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা কমাইয়া দিয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত Hindu ideal বা হিন্দুভাব বর্দ্ধিত করিতে না পারিলে ধ্বংসের কোনও প্রতীকার হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে না পারিলে তথাকার অধিবাসীদিগকে যে অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এই ম্যালেরিয়া কি প্রকারে দূর হইতে পারে তাহার আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে যদি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া Hindu ideal বা হিন্দুভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারি তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে একজোটে কাজ করিবার উপকারিতা বোধ করিয়া হিন্দুভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত স্বার্থত্যাগের ক্ষমতার দরুণ পল্লীগ্রাম হইতে পানীয় জলের অভাব দূরীকরণ করা, জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। ঋষিবাক্যে আস্থা প্রদর্শন শিক্ষা না করিলে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির ভাব সহজে অপসৃত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মভাব দেশ হইতে অনেক পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় জলাশয় খননাদির কার্য্যের ভার এখন District Boardএর উপর পতিত হইয়াছে। কুপ্রবৃত্তির প্রশ্রয়ে এবং ধর্ম্মহীনতায় হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন পল্লীগ্রামে সে আমোদ একতা বা স্ফুর্ত্তির চিহ্ন মাত্র নাই। সর্ব্বত্রই বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যদি হিন্দুভাব বা ideal রক্ষিত হইত, তাহা হইলে ভাই ভাইকে পরিত্যাগ করিত না, উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি পৈতৃক আবাস ত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে সেই অর্থ অপব্যয় করিতেন না এবং পল্লীগ্রামে "দলাদলি" এত প্রশ্রয় পাইত না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ, নিজেদের পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সামান্য ইংরেজী লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া চাকরির জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইত না। হিন্দু ভাব হইতে বিচ্যুত হওয়ায় বাঙ্গালী হিন্দু কোন ব্যবসায়ই কর্ত্তব্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইতেছে না।

Joint Stock Company পরিচালন করা আমাদের দেশে অত্যন্ত কঠিন কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেননা আমরা কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে সক্ষম নহি। যদি আমরা Hindu ideal বা ভাব হইতে বিচ্যুত না হইয়া ধর্ম্মে আস্থা রাখিয়া জীবন যাপন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে Joint Stock Companyর ব্যবসার পরিচালন করা সহজসাধ্য হইত। তাহা হইলে আমরা অধিক সততার সহিত কার্য্য করিতেও সক্ষম হইতাম।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত আমাদের রক্ত মাংসে অনুপ্রাণিত যে ভাব—যাহাকে আমি Hindu ideal বলিয়া অভিহিত করিতে চাই—তাহার পরিস্ফুরণ না হইলে শুধু এই শিক্ষা এই জাতিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। এই দুই ভাব একত্র বর্দ্ধিত হইলে সামাজিক কুরীতিগুলির মূলচ্ছেদ করিয়া উহা সমাজকে পুনরায় সতেজ করিতে সক্ষম হইবে। আমাদের এই সমাজকে পৃথিবীর অন্য জাতির সংঘর্ষে আসিয়া কি পরিমাণে উদ্যমশীল হইতে হইবে ও কি উপায়ে অধিকতর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজের, দেশের ও দশের উপকার করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহাও সমাজ বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন লোকে দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইবে। সংহার নীতি (Destructive policy) পরিত্যাগ করিয়া গঠন নীতি (Constructive policy) অবলম্বন করিবে। এই দুই ভাব (পাশ্চাত্য শিক্ষা ও Hindu ideal) আমাদের শিক্ষাকে পরিমার্জ্জিত করিলে সমস্ত কাজের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আমরা নিজেদের হাতে অনেক কাজের ভার লইতে সক্ষম হইব। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব ভাব বা ideal আছে, তাহা সেই জাতির প্রাণ; তাহা হারাইলে সেই জাতির জাতীয়তা যাইবে এবং জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত হিন্দুদিগকে কতক পরিমাণে শাস্ত্রীয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা করা উচিত।

উপর্যুক্ত সাধারণ উপায়গুলি ব্যতীত আমার বোধ

হয় আরও কতকগুলি বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আমাদের উচিত। প্রত্যেক সহরে ও পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটী গঠন করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পানীয় জল ইত্যাদির সুব্যবস্থা করা. টেক্‌নিকাল্ বা শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত করা, কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া দরিদ্র কৃষকদিগকে আর্থিক সাহায্য দ্বারা চাষের সুব্যবস্থা করা, ইক্ষু, তুলা প্রভৃতির বহুল পরিমাণে উৎপন্নের চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালী জাতিকে অর্থশালী করিতে হইলে তাহার জন্য ছোট ছোট Industry বা ব্যবসায় করিবার সুযোগ তাহাদিগকে দিতে হইবে। জাপানে Cottage Industry বা ছোট ছোট ব্যবসায় উন্নতি লাভ করায় জাপানী বাণিজ্য আজকাল এত দূর উন্নত হইতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ন্যায় বা আইনের কূটতর্ক সমাধান করিবার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ছোট ছোট ব্যবসায়ের উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের জন্য নিযুক্ত হইলে বাঙ্গালীর দারিদ্র্য অনেক পরিমাণে দূর হইবার সম্ভাবনা ছিল। ন্যায় বা আইনে সমস্ত শক্তির অপব্যয় না করিয়া ব্যবসায়ে সেই শক্তির প্রয়োগ করা এখন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শুধু সাহিত্য-ঘটিত শিক্ষা এবং চাকরির দ্বারা আজ কালকার কঠোর জীবন সংগ্রামের দিনে কোন জাতিরই টিকিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সহিত হিন্দু শাস্ত্রীয় শিক্ষার সংমিশ্রণে কঠোর জীবন সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত হইয়া কৃষি,শিল্প ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে বাঙ্গালী হিন্দু ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী।

ভক্ত কবি লালমামুদ।

ময়মনসিংহ জেলার পল্লী কবিদিগের গীতি কবিতা লইয়া একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিব মনে করিতেছিলাম, এমন সময় ভক্ত কবি লালমামুদের কথা মনে পড়িল। তাই অত্র লালমামুদকে লইয়াই বঙ্গীয় সাহিত্য প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম।

ময়মনসিংহের নেত্রকোণা বিভাগে নারায়ণ ডহরের সন্নিকট বাওইডহর গ্রামে কোন এক দরিদ্র মুসলমান গৃহে লালমামুদ জন্মগ্রহণ করেন। লালু ও কালু এই দুই ভাই এক পরিবারে ছিলেন। বয়সে লালু ছোট, কালু বড়। এই লালুই আমাদের লালমামুদ।

শিশুকাল হইতেই লালুর লেখা পড়ার দিকে একটুকু টান ছিল। গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িয়া লালু যৎসামান্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপর বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক পত্রিকাদি পড়িতে পড়িতে একটুকু অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গীতি কবিতা গুলিতে গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

লালু গাজির কীর্ত্তন করিতেন। এবং হিন্দুধর্ম্মের গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি লীলা গ্রন্থ পাঠ করিয়া লালু কিছু কিছু কবিগান করিতে আরম্ভ করেন। দিন দিন তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল। কবিতা-রস মাধুর্য্যে লালমামুদ ক্রমে আনন্দোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

হিন্দুধর্ম্ম-গ্রন্থ, ভগবদ্‌লীলা গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠ করিতে করিতে লালুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিয়া পড়িল। ক্রমে তিনি হিন্দুর মত আচার ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

তিনি আপন বাটীর নিকটস্থ নদীতীরে একটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষ মূলে তুলসী স্থাপন করিয়া রীতিমত সেবা পূজা আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য তদবধি তিনি আপন হাতে পাক করিয়াই খাইতেন। প্রাগুক্ত বটবৃক্ষ মূলেই তাঁহার রন্ধন কুটীর ছিল। অন্য কেহ তাঁহার রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না।

খোল, করতাল সংযোগে প্রত্যহই দুবেলা আনন্দ কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। সাময়িক আরতি ও নাম সংকীর্ত্তনেরও বিরতি ছিলনা।

লালু মৎস্য মাংস বর্জ্জনপূর্ব্বক সাত্ত্বিক আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই লালুর হরি ভক্তির কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। লালুকে দেখিবার

জন্য, এবং তাঁহার সুমধুর শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ জন্য নানা স্থান হইতে সাধু বৈষ্ণবের সমাগম হইতে লাগিল। লালু আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আগন্তুক সাধু সজ্জনের সেবা করিতেন। তাঁহার আশ্রমে কেহই অভুক্ত থাকিতে পারিতেন না।

লালু সাধুসেবার জন্য পাক পাত্র ও অন্যান্য বাসন পত্র, বিছানা স্বতন্ত্র করিয়া লইলেন।

নিকটস্থ অশিক্ষিত মুসলমানেরা লালুকে পাগল মনে করিলেও কালু ও লালুর মা তাঁহার পবিত্র চরিত্রের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা যথাসাধ্য লালুর সৎকর্ম্মের সহায়তা করিতেন।

সর্ব্বদা হরিসংকীর্ত্তনে ও কৃষ্ণকথায় লালুর ভজন বাটী এক অভিনব আনন্দ কোলাহলে মুখরিত থাকিত।

লালমামুদ সাধু বৈষ্ণবের পায় দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতেন। তিনি নিজকে সর্ব্বদা অপরাধী মনে করিয়া সকলের নিকট অতিশয় নম্রভাবে থাকিতেন। তাঁহার দৈন্য ও বিনয় পূর্ণ কাতরোক্তি শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন।

ভক্ত পরিবেষ্টিত লালমামুদ খোল বাজাইয়া যখন উচ্চ কণ্ঠে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন, কি ভাব বিহ্বল চিত্তে আবেগময়ী ভাষায় ভগবল্লীলা মাধুর্য্য বর্ণন করিতেন, তখন আমরা লাল মামুদকে গৌরলীলার হরিদাস ঠাকুরের দ্বিতীয়াবতার মনে করিতাম।

অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অষ্ট সাত্বিকের একটা না একটা লালুর লাগাই থাকিত।

শ্রীপাট বড়তলী নিবাসী শ্রীল বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামি ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আমি জীবাধম দুই একবার লালু সাধুর দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।

গোসাই প্রভু, লালুর ভক্তি প্রণত চিত্তের ভাব মাধুর্য্যে আত্মহারা হইয়া, লালুকে সস্নেহ প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

তদবধি আমি লালুর সঙ্গানন্দ-সুখের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, সময় সময় তাঁহার আশ্রম বাটীতে উপস্থিত হইয়া নাম কীর্ত্তন ও ভক্তি কথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতাম।

আজ প্রায় বিশ বৎসর হইল লালু এই মায়িক জগতের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কোন্ এক অজানা আনন্দ ধামে চলিয়া গিয়াছেন।

লালুর পবিত্র হৃদয়ে কোন্ দৈব শক্তির প্রভাবে এমন কমনীয় কবিত্ব কৌমুদীর বিমলচ্ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মোহান্ধ মানব আমরা কি বুঝিব?

লালু আমার সঙ্গে দুই তিন বার কবিগান করিয়াছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক অতি সুমধুর ছড়া পাঁচালী বলিতে পারিতেন। কণ্ঠস্বরও অতি মিষ্টছিল।

কবিগানে প্রবিষ্ট হইয়া লালু গাজীর কীর্ত্তন ছাড়িয়া দিলেন। দুঃখের বিষয় এই, লালু যৌবনেই জীবন লীলা সম্বরণ করাতে অধিক দিন কবিগান করিয়া যাইতে পারেন নাই। অদ্য পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় লালু ময়মনসিংহের একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা হইতেন সন্দেহ নাই।

যে দিন গোস্বামী প্রভু লালুর আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইদিন লালু তাঁহার রচিত গানের একখণ্ড খসড়া বহি দেখাইয়াছিলেন। সেই বহি হইতে নিম্নলিখিত গীতটী গাইয়া লালমামুদ আমাদিগকে কাঁদাইয়া দিয়াছিলেন।

দয়াল হরি কৈ আমার,
আমি পড়েছি ভব কারাগারে, আমায় কে করে উদ্ধার॥
ষড় রিপুর জ্বালা প্রাণে সহ্য হয় না আর।
শত দোষের দোষী বলে, জন্ম দিলে যবন কুলে,
বিফলে গেল দিন আমার,
আমি কুল ধর্ম্মে পরম ধর্ম্ম ভুলে কত কল্লেম কদাচার॥
যদিও তুমি আল্লা খোদা, তুমি লক্ষ্মী তুমি সারদা,
সত্ব রজ ত্রিগুণের আধার,
তবু হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাক্‌তেপ্রাণ কাঁদে আমার॥
দীনহীন লালমামুদে, ঠেকিয়ে সংসার গারদে,
মনের খেদে, বল্‌তেছে এবার,
জীবনান্ত কালে—হরি বলে প্রাণ যায় যেন আমার॥

লালমামুদের আর একটী গীত।

প্রভো, বিশ্ব মূলাধার,
অনন্ত নাম ধর তুমি, তোমার হয় অনন্ত আকার।

কখন সাকারেতে বিরাজ কর, কখন নিরাকার ॥
কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ বলে বনমালী,
কেহ খোদা আল্লা বলি, তোমাকে ডাকে সারাৎসার!
নামের গুণে পারের দিনে সকলি হয় পার ॥
অনন্ত নাম ধরে ধরে, ভক্তে বাঁধ ভক্তি ডোরে,
তোমারে টানে অনিবার,
তুমি দয়া করে ঘুচাও নাথ মনের অন্ধকার।
হিন্দু কিম্বা হোক্ মুসলমান,—
তোমার পক্ষে সবই সমান,
আপন সন্তান জাতির কি বিচরে?
ভক্ত, সকল জাতির শ্রেষ্ঠ, চণ্ডাল কি চামার ॥
জন্ম নিয়া মুসলমানে, বঞ্চিত হব শ্রীচরণে,
আমি মনে ভাবিনা একবার,—
(এবার) লাল্‌মামুদে হরেকৃষ্ণ নাম করেছে সার ॥

উপর্য্যুক্ত গীতদ্বয়ের ভিতর হইতে লালমামুদের নির্ম্মল চিত্তের বিমল ভাব ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় পরিস্ফুট হইতেছে। এই দুইটী গীতের মৌলিক ভাব একরূপই।

গীতের ভাবে বুঝা যাইতেছে, ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়। তাঁহার নাম অনন্ত। তিনি ইচ্ছাময়, সাকার নিরাকার সকল অবস্থাতেই থাকিতে পারেন। জীব তাঁহার অনন্ত নামের যে কোন নাম ধরিয়া পরিত্রাণ পাইতে পারে। ভক্ত জনে আপন আরাধ্য বস্তুকে পুরুষ বা প্রকৃতি মনে করিতে পারেন। তাহাতে কোন দোষের কারণ নাই।

ঈশ্বরের নিকট জাতি ভেদ নাই। সকলেই তাঁহার সন্তান। তবে ভক্ত জনই সকল জাতির শ্রেষ্ঠ। যাহার যে নামে রুচি জন্মে, সে সেই নামেই ডাকিতে পারে।

বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে এই দুইটী গীতের মধ্যে অনেক গুলি সত্য ও অনেক গুলি তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এতগুলি তত্ত্ব সাধারণ দুইটী গীতে প্রকাশ করা অল্প কবিত্বের পরিচায়ক নহে।

তবে লালমামুদের প্রথম গীতের অন্তরার পদে কিছু হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশিত হইতেছে।

"শত দোষের দোষী বলে, জন্ম দিলে যবন কুলে" এই পদটীর ভাবে বুঝা যায়,—লালমামুদ মনে করিতেছেন, "আমি বহু পাপ করিয়া মুসলমান জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।"

যখন ভক্তিই সকল ধর্ম্মের চরম সাধ্য, ইহাও লাল মামুদের গীতের উদ্দেশ্য, তখন নবীন কবির এই অল্পাপরাধ ভাবগ্রাহী মহজ্জনের নিকট অবশ্যই মার্জ্জনীয় হইবে মনে করি।

এই দুইটী গীত শ্রবণান্তর আমরা তাঁহার রচিত আর একটী কবিগাণ শুনিতে চাহিলে, তিনি স্বরচিত নিম্নলিখিত গীতটী শুনাইলেন।

চিতান—সখি সনে, স্বভবনে বসে আছেন রাই।
এমন সময় কালে, জয় রাধা শ্রীরাধা বলে,—
বংশীধ্বনি করিলেন কানাই।
লহর—শুনে সেই বাঁশরী, ধৈর্য্যহারা রাই কিশোরী,
পড়িলেন ঢলে,—অমি ধেয়ে সখি সকলে,—
কোলে তুলে রাই রতনে, জিজ্ঞাসে মধুর বচনে,
এমন হলে কি কারণে, বল্‌গো মন্‌খুলে ॥
মিল—ললিতার গলে ধরি কমলিনী কয়—
নারীর প্রাণে আর কত সয়, নিদারুণ বাঁশীর আকর্ষণ।
মহড়া—আর যেন বাজায় না বাঁশী
শ্যামকে যেয়ে কর গো বারণ।
ধুয়া,—শুন্‌লে শ্যামের মোহন বাঁশী, আমি যে কি সুখে ভাসি,—তোরা জানিস্‌নে,
দারুণ শ্যামের বাঁশী পশিয়া প্রাণে,—
কুলমান কলঙ্কের ভয়,—লজ্জা ধৈর্য্য আর যত হয়,
সকলি মোর কাড়িয়া লয়—আমি হই পাগলীর মতন ॥
খাদ—পরাধিনী নারী আমি, ঘরে গুরুজন।
লহর,—যদি ননদিনী—কৃষ্ণ প্রেমের বিবাদিনী,—
শুনে এ সকল,—তবে হবে বড় অমঙ্গল,
আমায় দেখ্‌লে ধৈর্য্য হারা, অমি হাতে লবে খাড়া,
দায় হইবে রক্ষা করা জীবন কেবল।
মিল,—দারুণ প্রেমের ফাঁসী, বাঁশী নিদারুণ,
কুলনারী করিতে খুন্, কোন্ বিধি করিল গঠন।
ঝুমুর,—সখি আর সহিতে নারি।

শ্যামের বাঁশী হৈল প্রাণের বেরী ॥ পরাণ ধরিয়া টানে, নিষেধ বাধা নাই মানে,—বল না কি করি? শুনিলে সে ধ্বনি, শুন গো সজনী, বুঝিনা বাঁচি কি মরি ॥

পরচিতান,—সুধা বিষে, আছে মিশে, বাঁশরী রবে। আমার যে যন্ত্রনা, প্রাণে জানে আর কেউ জানে না,— বল সখি কি উপায় হবে?

লহর,—বাঁশীর মিঠাতে প্রাণ, আকুল করে থাকে না জ্ঞান, বিষে পুড়ে যায়,—এখন হবে বল কি উপায়,— মনে কয় যে দিবা নিশি, শুনি শ্যামের মধুর বাঁশী, মধুর সঙ্গে বিষে আসি, পরাণ পোড়ায়।

(মিল,—পূর্ব্ববৎ, খাদের।")

এই গীতটীর আদ্যন্ত সমালোচনা করিয়া দেখিলে, স্থানে স্থানে ভাবের উচ্ছ্বাস ও কবিত্বের ঝঙ্কার যে অতি সুন্দর রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইবে।

বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীমতীর উৎকণ্ঠা অতি বিশদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বংশীধ্বনি যে বিষামৃতে মিশ্রিত, নবীন মুসলমান কবি পর চিতানের লহরে তাহাও শ্রীমতীর উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

ধুয়ার পদে কবি শ্রীমতীর ভাব লইয়া বলিতেছেন,— "সখি গো! এই নিদারুণ বংশীধ্বনি আমার প্রাণের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া কুল কলঙ্কের ভয়, লজ্জা, সতীধর্ম্ম, ধৈর্য্য প্রভৃতি সকল হরণ করিয়া লইয়া যায়। আমি এই সকল সম্পদ হারা হইয়া উন্মাদিনী হইয়া পড়ি। আমার এই অবস্থা বিপর্য্যয় দর্শন করিলে, ননদিনী আমাকে কাটিয়া ফেলিবে।

মরিলাম ক্ষতি নাই, কিন্তু জন্মের মত আমার প্রাণ বল্লভের সেবা সুখ হইতে যে বঞ্চিত হইব, ইহাই আমার বড় দুঃখ।

সখি, আমি যখন, বাঁশী শুনিয়া স্থির থাকিতে পারি না, তখন তো তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) বংশীবাদন না করাই উচিত। সখি তোমরা যাইয়া শ্যামকে বাঁশী বাজাইতে বারণ কর।"

এইরূপ মধুর ভাব লইয়া একজন মুসলমান কবির কবিত্ব প্রকাশ করা কি অসম্ভব কথা নয়?

লালমামুদের আরোও অনেক গুলি গীত ও পয়ারাদি ছন্দে রচিত কবিতা ছিল, বর্ত্তমানে অনুসন্ধান করিয় আর তাহা পাওয়া যাইতেছেনা।

এইরূপে যে দেশের কত মণিমাণিক্য ধূলায় মিশিয় লোক চক্ষুর অগোচর হইয়া পড়িতেছে, তাহার সংখ্যা আছে কি?

এখন আমরা লালমামুদের একটী গৌর পদ গাহিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

সোণার মানুষ ন'দে এলো রে,—
ভক্ত সঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে, ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে ॥
(ও তাঁর,) সোণার বরণ, রূপের কিরণ,
দেখ্‌তে নয়ন ঝরে ॥

(গৌর) হরি নামের বন্যা আনি, ধন্য করেছে ধরণী, বিরাম নাই আর দিন রজনী, নামের স্রোত চল্‌ছে ধীরে ধীরে, কলির জীবকে ভাসাইয়া নিচ্ছে প্রেম সাগরে ॥

সোণার মানুষ সোনার বরণ,—সোণার নূপুর সোণার চরণ, চারিদিকে সোণার কিরণ, ছুটেছে আলোকিত করে,—কত লোহার মানুষ সোণা হৈল গৌর অবতারে।

যাঁরা ভজে সোণার মানুষ, তাঁরাও হবে সোণার মানুষ, লালমামুদের হৈল না হুস্,—এখন আর দোষ দিবে কারে?—সে যে সারা জীবন কাটাইল, রঙ্গের বাজারে ॥

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এতদিন পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০ কুলি এক সঙ্গে থাকাতে এই উপদ্রব আমরা ততটা অনুভব করিতে পারি নাই। কিন্তু অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে পুলের ১৫০০ কুলি নদী পার হইয়া অন্য পারে চলিয়া যাওয়াতে সিংহের আক্রমণ মোটে ৪০০ লোকের উপর সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। আবার আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সিংহদ্বয় নদীর পরপারে আদৌ যাইত না। ইহাতে আমাদের

কুলিরা অত্যন্ত ভয় পাইয়া উঠিল। তখন সাহেব কয়েকদিন সরকারি কাজ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া প্রত্যেক ঘরের চারিদিকে খুব শক্ত 'বোমা' (কাঁটার গাছের বেড়া) প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। ইহাতে দুই চারিদিন অত্যাচার বন্ধ হইল বটে, কিন্তু পুনরায় প্রায় সেই ভাবে আরম্ভ হইল। তখন আদেশ হইল যে, চৌকিদারেরা * রাত্রি ৯টার পর মাচানের উপর হইতে ১৫।২০ মিনিট অন্তর বড় ২ তেলের টিন সজোরে বাজাইতে থাকিবে ও মাঝে ২ বন্দুকের আওয়াজ করিবে। আমাদের নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হওয়া ছাড়া এই আদেশে আর কিছু ফল হইল না। যখন এত করিয়াও কিছু হইল না, তখন কুলিদিগের বিশ্বাস হইল যে, ইহারা কখনও সিংহ নয়। জঙ্গলের কোনও অপদেবতা এইভাবে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

একদিন শুনিলাম, রেলওয়ে ষ্টেসনের মধ্যে রাত্রিকালে সিংহ ঘুরিয়া বেড়ায়। আমাদের সাহেব ও ব্রক সাহেব (ইনি সমস্ত লাইনের ডাক্তার) এই খবর পাইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে আমাকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেসন অভিমুখে রওনা হইলেন। তখন মোটে সন্ধ্যা হইয়াছে, অথচ সমস্ত নিস্তব্ধ ও ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। আমি সকলের পশ্চাতে ছিলাম বলিয়া আমার প্রাণটা ছম্ ছম্ করিতেছিল। ষ্টেসনের কাছে একটা মাল ওয়াগন্ দাঁড়াইয়াছিল আমরা তাহার মধ্যে আশ্রয় লইলাম। একদিকের দরজা একবারে বন্ধ করিয়া অন্য দরজার অর্দ্ধেকটা খোলা রাখিলাম। ১১ টা পর্য্যন্ত আমরা বসিয়া রহিলাম, সিংহ মহাশয় দেখা দিলেন না। তখন আমার সাহেব গাড়ী হইতে বাহির হইয়া একবার ষ্টেসনের চারিদিক ঘুরিয়া আসিবার প্রস্তাব করিলেন। ভাগ্যক্রমে, ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বারণ করাতে তিনি নিরস্ত হইলেন। ইহার দুই তিন মিনিট পরে দেখিলাম, একটা বৃহৎ সিংহ ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কর্ণেল সাহেব সেই অন্ধকারে যতদূর সম্ভব লক্ষ্য স্থির করিয়া বন্দুক চালাইলেন। পর মুহূর্ত্তে সিংহ অদৃশ্য হইল।

ইহার অর্দ্ধঘণ্টা পরে ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "দেখত, যেন একটা কিছু নড়িয়া বেড়াইতেছে।" অত্যন্ত গভীর অন্ধকার বলিয়া আমরা বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তবে অনুমানে বোধ হইল যেন একটা কিছু চলিয়া বেড়াইতেছে। স্পষ্ট কিছু না দেখিলেও আমরা বিশেষ সাবধান হইলাম এবং সতর্ক ভাবে বসিয়া রহিলাম। ঠিক এই সময়ে এক প্রকাণ্ড সিংহ গাড়ীর অর্দ্ধ উন্মুক্ত দরজা লক্ষ্য করিয়া লম্ফ দিল। সাহেবেরা প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া সঙ্গে ২ দুইটা বন্দুক গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এই ঘটনায় বোধ হয় ভীত ও হতভম্ব হইয়া সিংহ গাড়ীর মধ্যে না পড়িয়া গাড়ীর বাহিরে যাইয়া পড়িল। তাহার উপর গুলি লাগিল কিনা তাহা বুঝা গেল না, কারণ চক্ষের নিমিষে সে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। উহার লম্ফের সঙ্গে ২ বন্দুক না চালাইলে সেদিন সিংহটা আমাদের মধ্যে একজনকে না একজনকে যে লইয়া নিয়া জলযোগ করিয়া ফেলিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

উপর্য্যুক্ত ঘটনার পর সিংহদ্বয় নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে অদৃশ্য হইল। প্রথম দুই চারিদিন আমরা সকলে পূর্ব্বের মত ভয়ে ২ রাত্রিবাস করিলাম। কিন্তু যখন তাহাদের আর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, তখন হিন্দুরা একদিন নাচ, গান, তামাসা দ্বারা দেবতার পূজা করিলেন। মুসলমানেরাও একদিন পীরের কথা উপলক্ষে খুব ধূমধাম করিলেন। দুই স্থানেই সাহেব নিজে বহুক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করিলেন।

এইবার রেলের কাজের বিষয়ে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। লোহার, ছুতার, রাজমজুর প্রভৃতি কারিকরেরা প্রায় সকলেই হিন্দুস্থান হইতে আসিয়াছিল। তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার সময় অবশ্য কাহাকেও পরীক্ষা করা হয় নাই। তাহার ফল কিন্তু হাতে ২ ফলিল। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তাহাদের মধ্যে

* ইহারা প্রথমে রাত্রিকালে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু সিংহের অত্যাচার আরম্ভ হইবার পর তাহারা এক উচ্চ মাচানের উপর বসিয়া থাকিত। প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া বন্দুক থাকিত।

প্রায় অর্দ্ধেক আমারই মত কারিকর; এমন কি অস্ত্র পর্য্যন্ত ধরিতে জানে না। তখন একদিন সাহেব সকলের পরীক্ষা লইলেন। প্রকৃত কারিকরেরা তাহাদের পদে বহাল রহিল, জুয়াচোর দিগকে কুলিশ্রেণীতে নিযুক্ত কর হইল। এই জুয়াচোরেরা প্রায় সকলেই পঞ্জাবের আফগান বা পাঠান। কয়েকজন হিন্দু জমাদারের কৌশলে তাহাদের চালাকি বাহির হইয়া পড়ে বলিয়া, ইহার পর তাহারা অবসর পাইলেই হিন্দুদিগের সহিত কলহ করিত, এবং তাহাদের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিত।

একদিন বেলা ২ টার সময় একজন হিন্দু জমাদার উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া সংবাদ দিল যে, কয়েকজন পাঠান দুইজন হিন্দুকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতেছে। সাহেব তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে ধাবিত হইলেন। আমিও পশ্চাত ২ ছুটিলাম। দেখিলাম; প্রকৃতই ২ জন হিন্দুকে বেদম-ভাবে প্রহার করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে একদিকে বিষম কাতরাণির শব্দ শুনিয়া সাহেব সেইদিকে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন একজন পাঠান একখানা চার পায়ের (দড়ির খাট) উপর শুইয়া আছে। তাহার আপাদ মস্তক একখানা চাদরে আবৃত। সাহেব আসাতে আরও কয়েকজন পাঠান অগ্রসর হইয়া কহিল, "হুজুর! ঐ দুইজন হিন্দু এই পাঠানকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল বলিয়া, আমরা উহাকে বাঁচাইতে গিয়া ঐ দুজনকে দুই চারিটা মারিয়াছি। এ লোকটাকে এমন মারিয়াছে যে, এ বাঁচে কিনা সন্দেহ।" এই সময় একজন হিন্দু জমাদার সাহেবকে নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিল, "হুজুর! ইহার কিছুই হয় নাই। উহার সমস্ত বাহানা।" সাহেব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বটে, আচ্ছা, আমি ঔষধ দিতেছি।" ইহার পর সাহেব উক্ত পাঠানের নিকট গিয়া কহিলেন, "সমসের খাঁ! তোমার কি হইয়াছে?" সমসের গোঁঙাইতে ২ কহিল, "হুজুর, আমি—উঃ! বাবারে! আমি গেলাম, আমি আর বাঁচিব না। বাবারে—মারে!" সাহেব বলিলেন, আচ্ছা! আমি ঔষধ দিতেছি" সমসেরের বন্ধুরা দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল—সাহেব কি ভাবে কি করে, তাহা দেখিবে বলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাহেব একজন লোককে কতকগুলা করাতের গুঁড়া আনিতে বলিলেন। উহা আনীত হইলে সাহেব উহা সমসেরের খাটিয়ার তলায় রাখাইয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। উহার গায়ে যখন আগুনের আঁচ লাগিল তখন সমসের এক লম্ফ দিয়া খাটিয়া হইতে লাফাইয়া পড়িল, এবং উর্দ্ধশ্বাসে একদিকে পলায়ন করিল। তাহার বন্ধুরা এই ব্যাপারে অত্যন্ত লজ্জিত হইল।

এই রেলের কাজ করিতে যে কি প্রকার বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার জন্য আমি আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

তখন একটা পাহাড়ে পাথর কাটা হইতেছিল। বেলা একটার সময় সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া সেইস্থানে গমন করিলেন। গিয়া দেখি, চারিদিক নিস্তব্ধ। যে স্থানে পূর্ব্বদিন প্রায় ১৫০ লোকের পাথর কাটার শব্দে কান পাতা দায় হইয়াছিল, সেই স্থান আজ একবারে চুপ চাপ। ব্যাপার কি? সাহেব দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় আমাদের করিম-খাঁ আসিয়া বলিল "হুজুর! এখানকার সমস্ত মিস্ত্রিরা ষড়যন্ত্র করিয়াছে যে, আপনাকে খুন করিবে। আপনি পাহাড়ের মধ্যে যাই-বেন না।" সাহেব বলিলেন, "বটে!" তারপরই তিনি আমাকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, কারিকরেরা সকলে নিজের ২ জায়গায় বসিয়া আছে। কাজ একবারে বন্ধ। সাহেব উপস্থিত হওয়াতে প্রায় ৫০।৬০ জন লোক আসিয়া সাহেব ও আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সাহেব তাহাদিগকে কাজ বন্ধ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময় একটা লোক আসিয়া তাঁহার উপর পড়িল। সাহেব তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ এক প্রকাণ্ড পাথরের উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার ফল ফলিল। মিস্ত্রিরা কাজ আরম্ভ করিল। সাহেব ফিরিয়া আসিবা মাত্র তাহারা আবার কাজ বন্ধ করিল। তখন সাহেব পুলিসের সাহায্যে কয়েকজন প্রধান পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পাঠাইলেন। ইহার পর ষড়যন্ত্র থামিয়া গেল।

—•—

নাম গান।

ওরে শান্ত, হৃদয় পান্থ,
আসিছে মরণ,
সেই নামগান, সেই হরিনাম
বুঝিবি কখন ?
সূর্য্য হেরিছে অতীতের পথ
পশ্চিমে শশী চায়,
সীমন্তিনীর সিন্দুর রেখা
সীমান্তে মিশে যায়।
আসে নিশীথিণী মেঘ বিহ্বলা,
আকাশে বিকাশে দ্রুত চঞ্চলা,
মৃত্যু মুখর জীমূত মন্দ্র
ধ্বনিছে সঘন,
সেই নাম গান, সেই হরিনাম
বুঝিবি কখন ?

শিথিল অঙ্গ জড়িত জিহ্বা,
মৃত্যুর আধ কথা,
অশ্রু সিক্ত অন্তিম দশা,
বৈতরণীর ব্যথা;
হয় নি কি শোনা শোক সঙ্কুল
শত ক্রন্দন রোল,
শব দেহ বাহী শ্মশান বঁধুর
"বল হরি হরি বোল" ?
দেখ্ ফিরে দেখ্ জ্বলে মুখাগ্নি,
শিখা কম্পিত শ্মশান বহ্নি,
কোথা পতি আর পুত্র পত্নী—
কে কার এখন ?
সেই নাম গান, সেই হরিনাম
বুঝিবি কখন ?

সঙ্কীর্ত্তনে শত বন্দনে
উঠে বৈষ্ণব গান,
অন্তর কাঁপি প্রান্তর ছাপি
অম্বরে বাজে তান।
একই তন্ত্রে, একই মন্ত্রে
সবাই পাগল পারা,
দ্বন্দ ভুলিয়া, পরাণ খুলিয়া
হয়রে আত্মহারা।
গভীর মন্দ্রে বাজে মৃদঙ্গ,
প্রাণের ছন্দে নাচেরে অঙ্গ,
নাহিরে শঙ্কা নাহি আসঙ্গ,—
মায়ার বাঁধন।
সেই নামগান সেই হরিনাম
বুঝিবি কখন ?

বৃন্দাবন খেলা গোবর্দ্ধন লীলা
গোপিনীর অকুলতা,
সেত নয় সুধু নিশার স্বপন
সে ত নয় উপকথা।
যে নামে দেবতা তেত্রিশ কোটী
ছত্রিশ জাতি এক,
ধর্ম্মে কর্ম্মে সে কুরুক্ষেত্রে
ধর্ম্ম ক্ষেত্র দেখ।
পায়না যাহারে গীতার রচনা,
নর দেবতার শত আরাধনা,
আহ্বান যার ডাকে শতবার
মিশাতে আপন—
সেই নামগান, সেই হরিনাম
বুঝিবি কখন ?

কভুসে রাখাল, কভু ননীচোরা
কভু বা রাধিকা সঙ্গে
কভুবা মত্ত সারথির বেশে
উন্মাদ রণ রঙ্গে।
কখনো বাজায় মোহন মুরলী
কখনো চক্রধারী—
কখনো রাজার সজ্জা, কখনো
বিশ্ব প্রেমের ভিখারী।

কভু সে চক্রী কভু সে উদার
কভু নিরাকার কভু সে সাকার,
জীবনে সঙ্গী সাধনে সিদ্ধি
মরণে মিলন—
সেই নামগান সেই হরিনাম
বুঝিবি কখন?

বিশ্ব যাহার বিরাট মূরতি,
প্রকৃতি যাহার বেশ—
মহা হুঙ্কারে নাম ঝঙ্কারে
নাহি আদি নাহি শেষ।
সৃষ্টি যাহার চরণে মিলায়
শাস্ত্র যেথায় মূক,
ভক্ত ভৃগুর চরণ চিহ্নে
শোভিছে যাহার বুক,
একের মাঝারে পৌরুষ প্রীতি,
মিলে যেন সেই পূর্ণ মূরতি,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
করিতে সাধন—
সেই নামগান সেই হরিনাম
বুঝিবি কখন?

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

এক হইতে দশ পর্য্যন্ত সংখ্যা বাচক শব্দের উৎপত্তি বিচার।

সংস্কৃত ভাষায় 'এনং' শব্দ দ্বারা ইহা বা এই বুঝায়; সেইরূপ 'এক' শব্দে এক সংখ্যা এবং 'অহং' শব্দে আমি বুঝায়। দেখা যায় অনেক আর্য্য ভাষায় 'এনং' শব্দই সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে 'এক' সংখ্যা বুঝাইতেছে এবং 'এক' শব্দ অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়া "আমি" বুঝাইতেছে। নিম্নে উদ্ধার করিয়া দেখান গেল।

সংস্কৃত ভিন্ন অপর ভাষায় এক অর্থে ও আমি অর্থে

সংস্কৃত	এনং	এক
গ্রীক	Ein	Ego
গথিক	Ain	Ik
ল্যাটিন	Oinos, unus	Ego
প্রাচীন প্রুশীয়	Ains	
এংগ্লোস্যাক্সন্	An	Ic
জর্ম্মান্	Ein	Ich
গেলিক্	Aon	
ডেনিস্	Een	Jeg
আইসল্যাণ্ড	Einn	Ek
রুশিয়ান	Ia	

ইহা হইতে মনে হয় যে প্রাচীন কালে আর্য্যগণ 'এক' শব্দ দ্বারা 'আমি' বুঝিতেন। 'এক' শব্দেরই অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া 'এন' শব্দ দ্বারা তাঁহারা এক সংখ্যা প্রকাশক শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ সংখ্যা বাচক শব্দের উৎপত্তির পূর্ব্বে আমি বাচক শব্দের উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক মনে করি। সংস্কৃতে সম্ভবতঃ প্রাচীন শব্দের সংস্কার হইয়াছিল বলিয়া 'এক' এর পরিবর্ত্তে অহং শব্দ দ্বারা আমি বুঝান হইয়াছে; সেইজন্য আমাদের অনুমান সমর্থন করিতেছে না। কিন্তু তুমি ও দুই সংখ্যা বাচক শব্দ তুলনা করিলে দেখিতে পাইব আমাদের অনুমান এখানে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নাই। নিম্নে বিভিন্ন আর্য্য ভাষায় তুমি ও দুই শব্দের রূপ দেখান গেল।

সংস্কৃত	ত্বং	দ্বি
পারসিক (জেন্দ)	তু	দ্ব
ল্যাটিন	Tu	Duo
গ্রীক	Tu	Dvo
গথিক	Tu	
এংগ্লোস্যাক্সন	Du	Twa, Tu, Twam
জর্ম্মান	Du	Zwei
ডেনিস	Du	To
আইস্ল্যাণ্ড	Tu	Tva, Tvo
গেলিক	To	Da, Do
রুসিয়ান্	Tui	Dva
বাঙ্গালা	তুই	দুই

"আমির" সহিত তুলনায় 'তুমি' দ্বারা দুই জন বুঝায়। সেইজন্য দুই সংখ্যা বাচক শব্দ 'ত্বং' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে আমাদের অনুমান। উদ্ধৃত তালিকা আমাদের অনুমান সমর্থন করে।

সকল আর্য্য ভাষায় তিন শব্দের রূপ প্রায় তুল্য। আমরা মনে করি 'তদ্' শব্দের রূপ হইতে তিন সংখ্যা বাচক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ 'সে' বলিতে তৃতীয় ব্যক্তি বুঝায়। পুরাতন জেন্দ ভাষায় তিনকে 'সে' বলে। সংস্কৃতে যাহাকে 'স' বলে জেন্দ ভাষায় তাহাকে হো বা হা বলা হয়। দেখান যাইতে পারে সংস্কৃতের 'স' স্থলে জেন্দ ভাষায় 'হ' উচ্চারিত হইত; যেমন মাস=মাহ। অতএব হো বা সো অর্থে তিনি এবং এই শব্দের অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া 'সে' শব্দে তিন বুঝাইয়াছে। আমরা অনুমান করি অনেক ভাষায় 'তদ্' শব্দের বহুবচন 'তে' হইতে তিন সংখ্যাবাচক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। নিম্নে দেখান গেল।

	একবচন	বহুবচন	
সংস্কৃত	স	তে	ত্রি
পারসিক	হো		সে
ল্যাটীন			Tres
গ্রীক			Treio
এংগ্লোস্যাক্সন্		They	Treo, Try, Tir
জর্ম্মান		Ste	Drei
লিথুনিয়ান			Trys
রুশিয়ান			Tri
গেলিক			Tri
ডেনিস			Tre
আইসল্যাণ্ড			Trir
গথিক			Treis
বাঙ্গালা		তিনি	তিন

অতএব বলিতে পারা যায় আমি, তুমি ও তিনি বা তাহারা হইতে এক, দুই ও তিন সংখ্যা বাচক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

আর্য্যদিগের মধ্যে অগ্নিতে যজ্ঞ করা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। সেই যজ্ঞের বেদি চৌকনা বা চতস্র ছিল। এই চতস্র আকারে চারি ধার আছে বলিয়া তাহার নাম হইতে চারি সংখ্যা বাচক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কোন ২ ভাষায় উহাতে অগ্নির নামও যুক্ত আছে দেখা যায়।

	চারি	চতুর্থ	চতস্র
সংস্কৃত	চতুর্ (চত্বার)	তুরীয়	
পারসিক	চাহার্	Khtuiria (zend)	
ল্যাটিন	Quatuor		
গ্রীক	Tettares		
এংগ্লোস্যাক্সন	Feower		
জার্ম্মান	Vier		
লিথুনিয়ান্	Keturi		
রুশিয়ান	Chetvero		
গেলিক	Ceithair		Ceteora
ডেনিস	Fire		(Irish)
আইস্ল্যাণ্ড	Fiorir		
গথিক	Fid-vor		

ক্যাম্ব্রো-বৃটানিক Pedwar, Padair

উপরে এংগ্লোস্যাক্সন্, জর্ম্মান, গথিক ও ক্যাম্ব্রো-বৃটানিক ভাষায় wer, vier, wor, war প্রভৃতি অংশে চত্বার শব্দের "বার" বিভক্তির আকার দেখা যায়।

আমাদের হাতে পাঁচটী অঙ্গুলি আছে। পাঁচটী অঙ্গুলি যুক্ত হাতের নাম সংস্কৃত ভাষায় পাণি। গ্রীক ভাষায় ইহাকে Palmy ও ল্যাটিন ভাষায় Palma বলা হয়। ইংরাজীতে ইহাই Palm নামে অভিহিত। জার্ম্মান ভাষায় Fuhlem ও এংগ্লো স্যাক্সন্ ভাষার Folm শব্দে পাণিকেই বুঝায়। পারসিক ভাষায় পাণিকে পঞ্জা কহে। পাঁচ সংখ্যা বাচক শব্দ সংস্কৃতে পঞ্চ, পারসিকে পঞ্জ, গ্রীকে পেন্তা, ইহারা পাণি শব্দের বিকারে যে উৎপন্ন তাহা বেশ বুঝা যায়। এংগ্লো স্যাক্সন্ প্রভৃতি ভাষার Fif, Funf, Fimm, শব্দ ও ঐ ২ ভাষায় পাণি বাচক শব্দের পরিবর্ত্তনে উৎপন্ন হইয়াছে দেখা যাইতেছে। ল্যাটিন ভাষায় পাঁচ সংখ্যা বাচক কুইন্কে শব্দ সম্ভবতঃ অঙ্গুলি বাচক কোন শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

সংস্কৃত	পঞ্চন্
পারসিক	পঞ্জ

গ্রীক	Penta
ল্যাটিন	Quinque
এংলো স্যাক্সন্	Fif
জার্ম্মান	Fimf
লিথুনিয়ান	Penki
আইসল্যাণ্ড	Fimm

সংস্কৃত ষষ্ শব্দে ছয় বুঝায়। ষষ্ হইতে ষট উৎপন্ন। অপরাপর ভাষায় "সেক্স" (বা sex) শব্দের সহিত ষষ্ শব্দের মিল দেখা যায়। সম্ভবতঃ শুষ্ হইতে ষষ্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। অপরাপর ভাষায় শুষ্ শব্দের রূপ দেওয়া যাইতেছে।

গ্রীক—Sauso.

ল্যাটিন—Siccus.

স্লাভোনিয়ান—Suchati.

লিথুনিয়ান—Susu ; sausia ; sausas.

শুষ্ অর্থে শোষণ করা। আমরা যে যে অঙ্গ দ্বারা শোষণ বা গ্রহণ করি সে গুলি—দুইটী কর্ণ, দুইটী চক্ষু, নাসিকা ও মুখ এই ছয় অঙ্গ। এই ছয় অঙ্গকে সেইজন্য শোষণকারী বলা যাইতে পারে। সেই জন্য শুষ্ হইতে ষষ্ শব্দ উৎপন্ন ও ছয় অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আকাশে যে সপ্তর্ষি মণ্ডল বর্ত্তমান, তাহার ৭টী নক্ষত্র আর্য্যজাতির নিকট বিশেষ পরিচিত। এই ৭টী নক্ষত্রই সপ্ত শব্দের উৎপত্তির মূল। সপ্ত শব্দ সপ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। "সপেম" অর্থে পরিচর্য্যা বা যজ্ঞ করা। "সপ্ত" অর্থে যিনি যজ্ঞ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডল, ২৫ সূক্তের ১১শ ঋকে আমরা সপ্তভ্যঃ শব্দ প্রাপ্ত হই। সায়ন তাহার অর্থ হোত্রাভ্যঃ বলিয়াছেন। আকাশে যে সপ্ত ঋক্ষ বা Great bear নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যায়, বৈদিক আর্য্যগণ তাহাদিগকে প্রাচীন ৭ জন অঙ্গিরা ঋষি মনে করিতেন। তাঁহারা সপ্ত অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছেন। তাঁহারা সংখ্যাতেও ৭ জন। সপ্ত শব্দ এইরূপে ৭ সংখ্যাকে বুঝাইয়াছিল।

অষ্টন্ শব্দ আমাদের মনে হয় ইষ্ট শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইষ্ট অর্থে যজ্ঞ। এক প্রকার যজ্ঞ ছিল তাহার নাম অষ্টকা (১)। পূর্ণিমার ৮ দিন পরে অর্থাৎ অষ্টমী তিথিতে পূর্ব্বপুরুষদিগের জন্য একটী যজ্ঞ করা হইত। এই যজ্ঞের নাম হইতেই অষ্টন্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে মনে হয়। এই অনুমান যথার্থ হইলে সকল আর্য্যজাতির ভিতর এই অষ্টকা শ্রাদ্ধ প্রচলিত ছিল; কারণ দেখা যায় সকল আর্য্য ভাষায় আট সংখ্যার এক প্রকার নাম বর্ত্তমান। পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য।

নবন্ শব্দ কিরূপে নয় বুঝাইতেছে, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত হইব। ঋগ্বেদে 'নু' ধাতু গমন করা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব নবন্ অর্থে গমন করিবার যোগ্য দিক্। বৈদিক যুগে দশ দিক্ স্বীকৃত হইয়াছিল। এই দশ দিকের মধ্যে নিম্ন দিক নির্ঋতি বা মৃত্যু দেবতার। এই দিকে পাপীগণ গমন করে। অতএব নবন্ অর্থে গমনযোগ্য ৯টী দিক্। এই ৯ দিক্ হইতে নবন্ শব্দে ৯ সংখ্যা বুঝাইয়াছে। অপর কতকগুলি আর্য্য ভাষায় নী ধাতু হইতে নয় সংখ্যা-বাচক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে মনে করি। নী ধাতুর অর্থও লইয়া যাওয়া।

দশন্ শব্দের প্রথমা বিভক্তিতে দশ শব্দ প্রাপ্ত হই। আমাদের মনে হয় দিশ্ শব্দ হইতে দশন্ বা দশ উৎপন্ন হইয়াছে। দিকের জ্ঞান মানবের মনে প্রথম উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব। দিক্ দশটী বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব দিক মনে করিলেই দশএর জ্ঞান হয় এবং দশ শব্দ দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার দশ শব্দও দিশ শব্দ হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়। এ্যাংলোস্যাক্সন্ প্রভৃতি ভাষার tien, tyn, tig প্রভৃতি শব্দ পর্য্যালোচনা করিলে দিক্ ও টিগ্ শব্দে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। যদ্যপি আমরা সংস্কৃতে বিংশতি, ত্রিংশতি, নবতি প্রভৃতি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করি, তবে উহাদের "তি" বিভক্তি ইংরাজী twenty,

(১) The eighth day after fullmoon specially that in the months Hemanta and Sisir on which the progenitors or manes are worshipped. (Asv. Gr. ; Mn. ; etc.) Ashtaka is therefore also a name of the worship itself or the oblation offered on those days. (Kans. etc. XV. 16. 2 ; S. Br. &c) Mr. William's Dictionary.

thirty,.........ninety প্রভৃতির "তি" বিভক্তির অনুরূপ দেখিতে পাই। নবতি অর্থে নব গুণ দশন্ এবং Ninety অর্থে nine times tig বা ten। অতএব দেখা যাইতেছে যে দিক্ ও tig শব্দের দি ও ti অংশ তি ও ti রূপ লাভ করিয়া রহিয়া গিয়াছে। বোধ হয় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে ten শব্দ tien শব্দ হইতে এবং tien শব্দ tigen হইতে উৎপন্ন। আর tigen ও দশন্ শব্দ দ্বয় দিশং (বা দিক্) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (১)

পাঠকদিগের সুবিধার জন্য পরিশিষ্টে * বিভিন্ন আর্য্য ভাষার সংখ্যা বাচক শব্দের তালিকা প্রদান করিলাম।

আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। } শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম,এ

---

(১) All from Teut. type tehen. Idg type dekem, origin unknown. Skeat's Etymological Dictionary.

জগু খুড়া।

সম্পদের মাঝখানে জগুখুড়া আসিয়া রায় বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন সে নিরাশ্রয়। রায় বাড়ীর ছোটকর্ত্তা বিনোদমোহনের স্নেহদৃষ্টি এই আর্ত্তের উপর পতিত হইল। বিনোদের আশ্রয় পাইয়া সে অপরিচিত দরিদ্র বাঁচিয়া গেল।

তখন রায়দের প্রতাপে লোকে "গর্ভিণীর গর্ভ পাতের" আশঙ্কা করিত। ছোট বাবু বিনোদমোহন তখন প্রথম শ্রেণীর ডিপুটি। মধ্যম প্যারীমোহন বাড়ীতেই দেশের জমিদারের নায়েব। সুতরাং একজন সহরে হাকিম একজন গ্রাম্য হাকিম। কমলার কৃপা কণা তখন অজস্রধারায় বর্ষিত হইতেছিল। দোল-দুর্গোৎসব, বার পূজা, তের পার্ব্বন হিন্দুগৃহের যাহা নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য তাহার কোনটীরই ক্রটী নাই। সংসার বেশ চলিতেছে।

জোয়ার আসিলেই তারপর ভাটার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে—ইহা স্বাভাবিক। রায় বাড়ীতে যখন লক্ষ্মী

---

* পরিশিষ্ট।

সংস্কৃত	এক	দ্বি { দ্বৌ, দ্বা	ত্রি	চতুর্ (চত্বারঃ)	পঞ্চন্	ষষ্	সপ্তন্	অষ্টন্	নবন্	দশন্
পারসিক	এক্	দু	সে	চাহার (chahar)	পঞ্জ	ষষ্	হপ্ত	{ হশ্‌ৎ, অষ্ট (জেন্দ)	নুহ, নব (জেন্দ)	দহ
ল্যাটিন্	Einus	duo	tres	quatuor	quinque	Sex	Septem	Octo	nonem	decem
গ্রীক	Oinos	dvo	treio	{ Tessares, Tettares	Pente	{ ex, Sex	Epta	Okto	enea	deka
এংলো-স্যাক্সন্	an	{ Twa (f), Twegen (m), Twa (n) Tu, Twain(dative)	treo, try, tir	feower	fif	{ Six, Syx, Siex	{ Seofon, Seofone	Eahta	{ Nigon, Nigen	{ tien, tyn, tig, (Twen-ty)
জারমান	ein	zwei	drei	vier	fimf	Sechs	Sieben	acht	neun	Zehn
লিথুনিয়ান্	...	{ du, dwi	trys	keturi	Penki	Szeszi	Septyni	...	...	deszimtis
রুষিয়ান্	..	dva	tri	chetvero	......	Shest (e)	Sem (e)	...	...	desiat (e)
গেলিক	aon	{ da, do	tri	ceithir	......	Se	Seachd	Ochd	Naoi	deich
ডেনিস্	een	to	tre	fire	......	Sex	Syv	Otte	Ni	Ti.
আইস্ল্যাণ্ড	einn	{ tveir, tva, tvo	trir	fjorir	fimm	Sex	{ Sjo, Sjan	atta	niu	{ Tiu, Tigr

করুণ দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন তখনই তাহার পশ্চাতে থাকিয়া অলক্ষ্মী উপহাস করিতেছিল ; সহসা লক্ষ্মীর দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইল। অবসর বুঝিয়া অলক্ষ্মী আপন আধিপত্য বিছাইয়া লইল।

বিনোদমোহন তখন ট্রেজারী অফিসার। সহসা এক দিন সেখানকার ট্রেজারী হইতে বহু টাকা সরিয়া গেল। তার জের—৮০ হাজার টাকার চাপে বিনোদমোহনের চাকুরি গেল। সুধু তাহাই নহে। বিত্ত সম্পত্তি ক্রোক হইল। দেখিতে দেখিতে এক আঘাতেই রায়দের গৌরব শ্রী মুহূর্ত্তে কোথায় মিশিয়া গেল। লোকে বলিতে লাগিল—"পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে গেল।

ধনের ঘরে যখন শনি তখন একদিন শেষরাত্রে শমনও আসিয়া রায়ের বাড়ী ঘেড়াও করিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রায় পরিবার তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি ফেলিয়া ছুটীয়া চলিল। বিনোদের এক মাত্র শিশু পরেশনাথকেই এই পরিত্যজ্য সিংহাসনে বসাইয়া সমন স্বরাজ্যে চলিয়া গেলেন। নাবালক শিশুর গার্ডিয়ান নিযুক্ত হইল সেই আশ্রিত জগু।

জগু দারিদ্র্যের প্রবল আক্রমণ হইতে প্রাণপণ যত্নে আশ্রয় দাতা প্রতিপালকের শেষ স্মৃতির দায়ীত্বটুকু গ্রহণ করিয়া জগতে কৃতজ্ঞতার জলন্ত দৃষ্টান্ত কি ভাবে রাখিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্যই সেই দুধের শিশুটীকে তাহার হৃদয়ের প্রতি স্নেহ কণায় অভিষিক্ত করিয়া মানুষ করিতে লাগিল।

পৃথিবীতে এমন একদল লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম্ম। তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্য এমন অক্ষম মানুষ চায় যে লোক নিজের ভার যোল আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই স্বেচ্ছা সেবকেরা নিজের কাজে কোন সুখ পায় না কিন্তু আর এক জনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা, তাহাকে সকল রকম সঙ্কট হইতে রক্ষা করা, লোক সমাজে তাহার প্রতিপত্তি বৃদ্ধিকরা প্রভৃতি পরের উপকারে তাহাদের পরম উৎসাহ—অসীম সুখ। ইহারা যেন একপ্রকার পুরুষ-মা—তাহাও পরের ছেলের। আমাদের জগু খুড়া সেই দলের লোক।

খতিয়ান করিয়া দেখিতে গেলে জগুর এজগতে আপনার বলিবার কেহ নাই। যার কেহ নাই দুনিয়ায় সমস্তই তার আপন। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, সেবা, যত্ন সবই তার হৃদয়ে ক্রীড়া করে কিন্তু সেগুলি সে দিবে কাহাকে? সাধারণের মত তার ভাগ্য ছিল না। পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র ভাই ভগ্নি কিছুই তাহার নাই সুতরাং সে কি লইয়া বাঁচিয়া থাকে? অপার্থিক স্নেহ করুণা সে কাহার উপর প্রকাশ করে; তাই দেবতা তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। স্নেহ প্রবণ হৃদয়ের গুণে সে পরের ছেলেকে নিতান্ত আপনার করিয়া বেশ সুখ শান্তিতে বাস করিতে লাগিল।

(২)

দীপ্ত সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে বাহিরে খাঁ খাঁ করিতেছে। বাঙ্গালার দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকার বক্ষ ভেদ করিয়া যে প্রশস্ত রাজপথ চলিয়াছে তাহারই একটী দ্বিতল কক্ষে মেয়ে মজলিশ বসিয়াছে। লোক তিনটী, কিন্তু চারুলতা একাই সহস্র।

ইন্‌স্পেক্টর পত্নি চারুলতা তাহার মাকে সঙ্গে করিয়া ছোট ভগ্নি মাধুরীর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে।

দ্বিপ্রহরে মেয়ে মহল অরক্ষিত। চারু ইলেকট্রীক ফেনের কলটা জোড়ে বাড়াইয়া দিয়া সম্মুখের চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। নীচে মা বসিলেন, মাধুরী নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন স্বর একটু চড়াইয়া চারু বলিল "বাঃ তোদের বাড়ী ঘর গুলিতো বেশ ফিট্‌ফাট্। মাধুরী, জামাই বাবু কোথায়?"

মাধুরী নীরব থাকিয়া বলিল "জগু খুড়ার জন্য কি আর কোন জিনিস নড় চড় হবার জো আছে, তিনি যে সর্ব্বদাই এটা না ওটা—একটা কাজে লাগিয়াই আছেন"।

"মাধুরী, তুই নাকি হেমিণ্টনের বাড়ীতে গিয়া নিজে পছন্দ করিয়া ব্রেসলেট আনলি, কৈ, দেখা দেখি, দেখি তোর কেমন পছন্দ। এবার বড়দিনে যদি যাই"—

মাধুরী দিদির কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিল "ওমা আমি কেন হেমিণ্টনের বাড়ী যাইব। উনিই তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়া আনিয়াছিলেন। খুড়া আসুন দেখাইতেছি।"

মুখ বিকৃতি করিয়া চারু বলিল "সে'কি সিন্ধুকের চাবিটী পর্য্যন্ত হাত ছাড়া করিয়াছিস? তুই কেমন গিন্নি হলি রে? এত পরের অধীন থাকা, উঠতে বসতে হুকুম নিয়া কাজ করা"—।

বৃদ্ধা একটু অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন "এত দেখিয়া শুনিয়া পাশ করা জামাইর নিকট বিবাহ দিলাম, মেয়েটী সুখে থাকবে; আর সে কিনা, পাড়া গাঁয়ের হাবা মেয়ের মত খুড়া বলতেই অজ্ঞান।"

চারু মায়ের কথায় ঝঙ্কার দিয়া বলিল "বেশত, আছে থাক্। বাড়ীতে কত লোক থাকে, সেও থাক। কিছু দিতে হয়—দেও, বেশ। কিন্তু এত—কেন?"

মাধুরী একটু লজ্জিত হইয়া অন্য কোঠায় উঠিয়া গেল। মা ও মেয়েতে বসিয়া অনেকের শ্রাদ্ধ শেষ করিলেন। ততক্ষণে মাধুরী তাহাদের জন্য বেশ জল খাবার সাজাইয়া আনিল।

মা বিস্মিত হইয়া বলিল "মাধুরী তাড়াতাড়ি এত খাবার সংগ্রহ করিলি কি করিয়া?"

মাধুরী অবাক হইয়া বলিল "কেন খুড়া যে বাসায় আছেন। তাঁকে সংবাদ দেওয়ায় তিনিই সব ঠিক করিয়া দিয়াছেন। আমাকে ত কিছুই করিতে হয় নাই।"

শুনিয়া চারুলতা একটু মৌনভাব অবলম্বন করিল। তাহার নিজের কর্ত্তৃত্বে এত সত্বর এতগুলি সংগ্রহ করা সে সহজ মনে করিল না।

সে দিন অনেকক্ষণ বসিয়া তাহাদের কথা বার্ত্তা হইল। মেয়েদের উপর পুরুষের যে অযথা কর্ত্তৃত্ব এটাও যে ইঙ্গিতে না উঠিল, এমন নহে। চারুলতা একটু স্বাধীনা মেয়ে তাই মাধুরীর প্রাণেও স্বাধীনতা বনামে উচ্ছৃঙ্খলতার একটু আভাষ দিবার প্রয়াস পাইল। কথাগুলি মাধুরীর হৃদয় দ্বারে যে আঘাত একেবারেই করিল না এমত নহে।

পর দিন চারুলতা দ্বিপ্রহরে পুনরায় মাধুরীর গৃহে আসিল এবং মাধুরীকে লইয়া রমনা লাট প্রাসাদের দিকে বেড়াইতে যাইবে বলিল। মাধুরী জগু খুড়ার অনুমতি ব্যতীত যাইতে সাহসী হইল না। সে অনুমতি প্রার্থনা করিল। জগু খুড়া সাহ্লাদে অনুমতি দিল। এইরূপ ক্রমে ২।৩ দিন উপরি উপরি তাহার নিকট অনুমতি চাহিল, জগু খুড়া বিনা বাক্য ব্যয়ে অনুমতি প্রদান করিল। তারপর আর তাহার নিকট কোন জিজ্ঞাসা না করিয়া চারুলতা আসিলেই মাধুরী তাহার সহিত বাহিরে যাইতে লাগিল।

কয়েক দিন দেখিয়া একদিন জগু খুড়া তাহার প্রতিবাদ করিল। মাধুরী কোন উত্তর দিতে সাহসী হইল না। পরদিন যখন চারুলতা আসিল মাধুরী বাহির হইতে অস্বীকার করিয়া তাহাকে সকল ঘটনা বলিল। চারুলতা ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল "কি এত কর্ত্তৃত্ব একটা চাকরের। পরেশ মুখ দিতে দিতে লোকটাকে এত বেয়াদব করিয়াছে। আমার ভগ্নি আমার সঙ্গে যাবে তাতে আবার তার কর্ত্তৃত্ব! ছোট মুখে বড় কথা।"

নীচের কক্ষে তখন জগু খুড়া বসিয়া কলিকার আগুনে ফুঁ দিতেছিল। আগুনটা বেশ দপ্ দপ্ করিতেছিল। এখন বুড়া আরামে বসিয়া টানিবে, এমন সময় দুষ্ট বাতাস এই কথাগুলি জগু খুড়ার কাণে পৌঁছাইয়া দিল। তিনি অন্য মনস্কভাবে কলিকায় ফুঁ দিতে লাগিলেন।

চারুলতার উদ্দীপনা পূর্ণ কথায় মাধুরীর চিত্ত একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সেও বলিল "লোকটা বুড়া বলে সবাই একটু খাতির করে, কেউ কিছু বলে না, কিন্তু কেউ ভাবে না আজ জবাব দিলে কাল থাকবার ঠাঁই কোথায়?"

চারুলতা মাধুরীর কথায় সায় পাইয়া তাহাকে একটু তিরস্কারের ভাবে বলিল "তুই ইবা তাকে জিজ্ঞাসা করতে গেলি কেন? পরেশ যখন নাই তখন তোর উপর আবার কর্ত্তা কে এ বাড়ীতে? তুই তোর ইচ্ছা মত কাজ করবি। উনি সে দিন মফস্বলে গেলেন আমিও নারায়ণগঞ্জ হইতে বেড়াইয়া আসিলাম। কই কাকেত জিজ্ঞাসাটীও করি নাই। একটু কর্ত্তৃত্ব নিজে করিয়া লইতে হয়। তিনি অনুমতি দিবেন, তবে যাব —সে দিন গেছে। কোন কুকর্ম্ম তো করি নাই। ভাই ভগ্নির সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা বৈধ নয়?"

(৩)

সে দিন দ্বিপ্রহরে মাধুরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চারুলতা বলিয়াছিল আজ তাহাকে লোহার পুল দেখাইবে। জগু খুড়োর অমতে মাধুরী বাহির হইতে ইচ্ছুক ছিল না, এদিকে না গেলেও চারু তাহাকে তাহার দুর্ব্বলতার জন্য বকিবে ও নিন্দা করিবে। এ সকল কথা ভাবিয়া চারু ঘুমাইয়া থাকাই সর্ব্বপেক্ষা নিরাপদ মনে করিয়াছিল। যথা সময়ে চারুলতার কনেষ্টবল চিহ্নিত গাড়ী আসিয়া মাধুরীর দরজায় দাড়াইল।

গাড়োয়ানের বাক্স হইতে কনেষ্টবল অনেক ডাক হাঁক করিল কিন্তু কেহই শুনিল না কিম্বা বাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল না। চারুলতা মনে করিল জগু নিশ্চয়ই দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং মাধুরীকে বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছে। চারু ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেল।

পরদিন চারুলতার পত্র পাইয়া মাধুরী একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে নিজে নিদ্রিত ছিল, কিছুই জানে না; দিদির কথাইবা অবিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া কিন্তু দিদির কথানুসারে জগু খুড়াকে জবাব দিবার মত তত খানি সাহস সে সহজে সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারিল না। তবে সে জগু খুড়ার উপর সহজেই একটু একটু অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল—কাজে কর্ম্মে জগু খুড়ার উপর কৈফিয়ত তলব এবং তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে ক্ষান্ত হইল না।

মাধুরীর মনের ভাব বুঝিতে বৃদ্ধের কাল বিলম্ব হইল না। একদিন সে সত্য সত্যই মুখ ফুটিয়া কথাটী জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল। জগু খুড়া জানিত তাহার বক্ষ শোনিতে গড়া এই ক্ষুদ্র জীর্ণ তরী সদৃশ সংসার খানাকে সে বহু চেষ্টায়, বহু তপস্যায় আজ কিনারায় আনিয়াছে, যদি এখন একটা ঝাপটা বাতাসে এই তরী খানা তল হইয়া যায় তবে সর্ব্বপেক্ষা অধিক কষ্ট তাহার প্রাণেই লাগিবে। তাই সে সরল ভাবে মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করিল "মা তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ কেন?"

মাধুরী প্রথমে ইহার কোন উত্তর করিল না। তারপর হটাৎ বলিয়া ফেলিল "আপনার একটু সংযত হইয়া চলা উচিত। সম্বন্ধের গৌরব—" মাধুরীর অনভ্যস্ত চিত্তায় আর অধিক কথা বাহির হইল না। তাহার অন্তরে যেন কে সজোরে সাবল মারিতে লাগিল।

মাধুরীর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ প্রমাদ গণিল। এরূপ কথা তাহাকে পরেশও যে বলিতে সাহস পায় না। বৃদ্ধ স্নেহ মাখা স্বরে বলিল "মা তোমার কথায় প্রতিবাদ করি আমার কি সাধ্য। আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

'আপনি আমার দিদিকে সে দিন—" মাধুরী এবারও আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

বৃদ্ধ কিছুই বুঝিল না। তবে ব্যাপার খানা অনেক দুর গড়াইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল। সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল "না হয় একটা অন্যায় করিয়াছি। আমিত একটা অপরাধ করিলে মাপও পাইতে পারি।"

মাধুরী বৃদ্ধকে যাহা বলিবে বলিয়া অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছিল, তাহার কিছুই এখন তাহার স্মরণ পথে আসিল না। সে কাঁপিতে লাগিল। এবার নিজকে সামলাইয়া দিদির চিঠির লিখিত আদেশ পালন করিতে উদ্যত হইল।

মাধুরী গলা পরিস্কার করিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"ঠাকুর বিদায় করিয়াছেন, প্যাদা মফস্বলে পাঠাইয়াছেন—এখন এ সাত গোষ্ঠীর পিণ্ডি করে কে? আমার ত মানুষের শরীর।"

মাধুরী অনেক খানি বলিয়া ফেলিয়াছে। জীবনে সে বোধ হয় এত কথা একত্র করিয়া বলিতে শিখে নাই। কুমন্ত্রণা লোককে এত খানিও উদ্ধত করিয়া তুলিতে পারে। এক শ্বাসে কথাগুলি বলিয়া মাধুরী ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

সহসা এইরূপ অপ্রত্যাশিত আচরণে বৃদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। মাধুরীর শারীরিক অসুখের আভাষ পাইয়া বৃদ্ধ ব্যস্ত ভাবে বলিল "সে কি মা তোমার কোন অসুখ হইয়া থাকে আমাকে বল, আমিই

আজ রান্না করিব। অপরিচিত ঠাকুর চাকরের পাক কি খাইতে আছে মা, তাতে যে কত অনিষ্ট হয়।"

মাধুরীর স্কন্ধে আজ অলক্ষ্মী চাপিয়াছিল। সে বৃদ্ধের মুখের উপরই বলিয়া ফেলিল "তবে আপনার হাতেই বা খাইতে যাইব কেন ?"

বৃদ্ধ আর থাকিতে পারিল না। দুই হাত মাথার দুই পার্শ্বে স্থাপন করিয়া বসিয়া পড়িল। বিশ্ব বসুন্ধরার সকল জিনিসই যেন আজ তাহার সমক্ষে বিষধর সর্পের মত ক্রূর ও হিংস্রক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একটু চিন্তা করিয়া বৃদ্ধ বলিল "তবে মা কি করিতে হইবে ? একটা ঠাকুরই দেখিব কি ?

মাধুরী বলিল—"না—আমার ভাত আমিই রাঁধিয়া খাইতে পারিব।" মাধুরীর ভাবান্তর দেখিয়া বৃদ্ধ তাহার কথায় সায় দিয়াই বলিল—"আমি না হয় ২।১ দিন হোটেলেই খাইবার বন্দোবস্ত করিব। কাতর শরীরে তুমি রাঁধিয়া খাইবে কেমন করিয়া ছেলেটাই বা খাইবে কি ? কৈলাস ডাক্তারকে লইয়া আসি তবে, পরে যাহা হয় হইবে।"

মাধুরী বলিল—"ডাক্তারের আমার প্রয়োজন নাই।"

মাধুরী থামিয়া পড়িল। কিন্তু চারুর উত্তেজনা এঞ্জিনের ষ্টীমের মত তাহাকে ভিতর হইতে সজোরে ঠেলিতেছিল। অনভ্যাস বশতঃ বিশেষতঃ সম্মুখে তেমন রাস্তা না পাওয়ায় এটায় সেটায় ধাক্কা খাইয়া হঠাৎ হুইসিলের শব্দের ন্যায় যেন সে বলিয়া ফেলিল "যাইবার বেলায় চাবিটা রাখিয়া যাইবেন।"

মাধুরী অনেক দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছে। ইহার পর ক্লান্ত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে দিদির আদেশ প্রতিপালন করিতে যথেষ্ট করিয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধ যদি চাবিটা না দিয়া চলিয়া যায়, তবে এখন উপায় ? মাধুরী ক্লান্ত হৃদয়ে কেবল তাহাই ভাবিতেছিল। মাধুরী ইহার অধিক আর কিছুই করিতে পারিবে না।

দ্বিপ্রহরে আহারের সময় জগু খুড়াকে পাওয়া গেল না। খোকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমি দাদু ভা খাই, দাদু ভা খাই।" জননী শিশুকে খাওয়াইতে পারিলেন না। অনাহারে বালক ঘুমাইয়া পড়িল।

(৪)

পনর দিন পর পরেশ মফস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বাসায় পা দিয়াই তাহার মনে হইল সকলই যেন কেমন পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! বাসার সে বিমলতা নাই—চতুর্দ্দিক কেমন একটা রুক্ষ রুক্ষ বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে তিনি বহুবার মফস্বলে গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিয়া কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন নাই। পরেশ সংবাদ দিয়া আসিয়াছেন, তথাপি তাঁহার জন্য সে বৃদ্ধ আশা পথ চাহিয়া নাই—এ কেমন ?

উপর হইতে দুই তিনটী রমণীর কলহাস্য বাতাসে ভরিয়া নামিয়া আসিল। কিন্তু কই সে স্নেহমাখা স্বর ত আসিল না। পরেশ উচ্চৈস্বরে ডাকিল "জগু খুড়া"। কেহ সাড়া দিল না—চতুর্দ্দিক নীরব।

সে ধ্বনিতে মাধুরীর প্রাণের শান্তিভঙ্গ করিয়া দিল। চারুলতাও একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

আশঙ্কায় পরেশের মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে চকিতভাবে জগু খুড়ার গৃহের দিকে দৃষ্টি করিল, গৃহের তালা বাহির হইতে বদ্ধ। আর কোন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। সে ধীরে ধীরে উপরে যাইতেছিল এমন সময় খোকা নামিয়া আসিল। পরেশ খোকাকে কোলে করিয়া উপরে উঠিল। ইত্যবসরে সুযোগ পাইয়া খোকা আধ আধ স্বরে বলিল "বাবা দাদু ভা না খাই।" পরেশ খোকার কথার অর্থ তেমন বুঝিতে পারিল না।

উপরে উঠিলে চারুলতা আসিয়া পরেশনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিল। পরেশ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল— "জগু খুড়া কোথায় ?"

চারু অবাধে বলিয়া ফেলিল "তিনি বোধ হয় কোথায় গিয়াছেন।"

জগু খুড়া বাসা ফেলিয়া নড়িবার পাত্রই নয়, সুতরাং পরেশনাথের প্রাণে একটা খটকা বাধিয়া গেল। কিন্তু সময়ের সংকীর্ণতায় কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি পরেশনাথ আফিসে চলিয়া গেলেন।

চারুলতা পরেশনাথকে খুব ঠকাইয়াছে ভাবিয়া হর্ষোদীপ্ত মুখে কহিলেন "মাধুরী দেখ দেখি কেমন চাল,

তুই কি এমনভাবে পারবি। পুরুষ মানুষকে ঠকাইতে কি বড় বেশী কিছু লাগে?"

মাধুরী কোন উত্তর করিতে সাহসী হ'ল না। সে শুধু বলিল—"দিদি তুমি আজ চলিয়া যাও; কাল আমিই তোমার বাসায় যাব।"

চারুকে বিদায় করিয়া দিয়া মাধুরী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে পরেশের মেজাজ জানিত, তাই এখন ঘটনাটাকে কিরূপে ধরিলে কি ফল ফলিবে সে চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যায় মিটি মিট গ্যাস লাইট যখন রাজপথে জ্বলিতেছিল তখন পরেশ আফিসের কাজ শেষ করিয়া বাসায় আসিলেন। তখনও তাহার বাহির আঙ্গিনায় দীপ জ্বলিয়া উঠে নাই। বাসার এ দৈন্যতার কারণ খুজিয়া বাহির করিতে পরেশের অধিক বেগ পাইতে হইল না। জগু খুড়ার অনুপস্থিতি ইহার একমাত্র সাক্ষ্য। ভৃত্যকে দীপ জ্বালিবার হুকুম দিলে সে বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়াও আলোর আসবাব পত্র বাহির করিতে সক্ষম হইল না। গৃহিনীও বেগতিক দেখিয়া নাকের জলে চক্ষের জলে এক হইবার উপক্রম হইলেন। ফলে যে পর্য্যন্ত জগু খুড়া না আসিল সে পর্য্যন্ত আঙ্গিনায় আলো জ্বলিল না।

পরেশ গৃহে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন "কোথায়"। মাধুরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাড়াইল।

পরেশ একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিল "জগু খুড়া কোথায়?"

মাধুরী বলিল "আমি কেমন করিয়া বলিব"?

পরেশ—"দুপ্রহরে কখন আসিয়া খাইয়াছেন"।

মাধুরীর মুখে কথা সরিল না।

পরেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন"কখন আসিয়াছিলেন?

মাধুরী—"আমি দেখি নাই"।

পরেশ—"খাবার দিয়াছে কে?

মাধুরী—"তিনি এখানে খান নাই।

পরেশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"কেন"?

মাধুরী কোন কথা বলিতে সাহস পাইল না।

পরেশ বুঝিল একটা কিছু ঘটনা হইয়াছে। বলিল "মাধুরী তুমিতো এমন ছিলে না—দুদিনের ভিতর এমন পরিবর্ত্তন"। মাধুরী নীরব। পরেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "এখানে থাকেনও না কি"?

মাধুরী নত মুখে বলিল "বাসায়ই থাকেন।"

পরেশ উত্তেজিত স্বরে বলিল "তুমিই কি তাঁহাকে বাসায় খাইতে নিষেধ করিয়াছ"?

মাধুরী কোন কথা বলিতে পারিল না।

পরেশ বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কোন কথা বলিবার ইচ্ছা হইল না। ঘটনাটাও তাহার নিকট একটা প্রহেলিকার মত বোধ হইল। মাধুরীর স্বভাবত এরূপ নহে। তখন চারুর কথা পরেশের মনে হইতে লাগিল। চারুকে আসিয়াই সে গৃহে পাইয়াছিল। সে বুঝিল স্বাধীন-চেতা চারুরই পরামর্শে মাধুরী এই অঘটন ঘটাইয়াছে, তাই সে একটু নরম সুরে বলিল "তুমি তাকে বিদায় করবার কে? এ কর্ত্তৃত্ব তোমায় কে দিল? আমি তোমার ভার তাঁর উপর দিয়াছিলাম বই তাঁর বোঝা তো তোমার ঘাড়ে দিয়া যাই নাই।"

মাধুরী কোন কথা বলিল না।

পরেশ একটা ব্যথা ভরা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল "বল দেখি তুমি কার পরামর্শে এ কার্য্য করিয়াছ। মানুষ বাহিরের উত্তেজনা না পাইলে সব আঘাত সহ্য করিতে পারে। জগু খুড়া এমন কি অন্যায় করিয়াছে যে তুমি তাকে দুদিন বাদে বিদায় দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে না।"

পরেশের কথার ভিতর এমন একটা কাতরতা ছিল যাহাতে মাধুরীর অন্তর স্পর্শ করিল। মাধুরী মৌনভাবে থাকিয়া করুণ স্বরে বলিল "আমি তাকে তেমন কিছু বলি নাই"। একটু থামিয়া অভিমান ভরে বলিল "তবে আমাকে কি চিরকাল সকলের দাসীবৃত্তিই করিতে হইবে"।

পরেশ বুঝিল ব্যাপার সোজা নহে। বলিল "দেখ তুমি কর্ত্তৃত্ব করিতে শিখিতেছ। কিন্তু কর্ত্তব্যটা হেলায় পদ দলিত করিতে একটুও ইতঃস্ততঃ কর নাই। তুমি গৃহের কর্ত্রী স্বীকার করি কিন্তু কর্ত্তৃত্ব খাটাইবার পূর্ব্বে কর্ত্রীর কর্ত্তব্যটা বুঝিতে পারিয়াছিলে কি? 'গায় ন' মানে আপনি মোড়লী' করিতে গেলে পদে পদে

এইরূপ গোল যোগই ঘটে। তুমি জান না কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ" ?

পরেশের বেদনা বিজড়িত স্বর মাধুরীর হৃদয়ের পরতে পরতে একটা অব্যক্ত বেদনা জাগাইয়া দিল। সে অশ্রু বিগলিত নয়নে পরেশের দিকে চাহিয়া রহিল।

অশ্রু সিক্ত ব্যাকুল আবেগে পরেশ বলিল "জগু খুড়া আমার কে ? তোমার পিতা শত সহস্র মুদ্রা বিনিময়েও আমায় পাইত না যদি এই নিঃস্ব আমার প্রাণ দান না করিত। তুমি আমার স্ত্রী। আর আমি—তার কাছে ঋণী বলিলে কিছুই হয় না—আজীবন বিক্রীত—সুতরাং তুমি তার ক্রীত দাসী। তুমি গর্ব্ব কর—তুমি কর্ত্রী, আমি গর্ব্ব করি—আমি তার মত লোকের ক্রীতদাস। আজ দুপয়সা হাতে পড়িয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করিও না মাধুরী। দিন সমান যায় না। সত্যই বলছি সে কথা মনে হলে আজও আমার"—

পরেশের মুখে আর কথা সরিল না। চক্ষে অশ্রু দেখিলে মানুষের হৃদয় সর্ব্বদাই বিগলিত হয়। এতো স্বামীর কাছে স্ত্রী, স্ত্রীর কাছে স্বামী। পরেশের চক্ষে জল দেখিয়া মাধুরীর প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পরেশ বলিল 'জগতে মানুষের হাতে কৃতজ্ঞতা এমনি ভাবে লাঞ্ছিত হয়। হায় অদৃষ্ট—সে বার—তুমি এখন ডিপুটীর স্ত্রী বলিয়া গর্ব্ব কর তবে এক দিনের কথা শুন—সে বার বি, এ, পরীক্ষা দিব। জগু খুড়াই আমার আশ্রয় পালক—এক কথায় পিতা মাতা। বি এ পরীক্ষার দিন ঘরে এক মুষ্টি চাউল নাই। ভোরে উঠিয়া জগু খুড়া বাহির হইয়া গেল।"

"বেলা চড়িয়া উঠিল। আমি রান্না বসাব মনে করিয়া উনুন ধরাতে গিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ। এক মুষ্টিও চাউল নাই—উপায় ! কখন কি হইবে ?

"আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। মাঝে মাঝে আমাদের এরূপ ভোগিতে হইত। কিন্তু আজ যে আমার পরীক্ষা, ১০টায় যাইতেই হইবে।

"একটু পরে বাহিরে যাইয়া দেখি জগু খুড়া একটা বিশাল মোট মাথায় করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে দাইল, চাউল তরি তরকারী সমস্তই। সে তাড়াতাড়ি পাক শেষ করিয়া আমায় খাইতে বসাইল কোন অসুবিধা ভোগ করিতে দিল না। মায়ের মত আদর করিয়া খাওয়াইল।" বলিতে বলিতে পরেশ নাথের স্বর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় জগু খুড়াও ঘুমাইবার জন্য স্বীয় কক্ষে উপস্থিত হইল। তখন উপর হইতে বাতাস সেই মিলিত কণ্ঠ স্বর তাহার কর্ণে পৌঁছাইয়া দিল। জগু খুড়া আর স্থির থাকিতে পারিল না সে দৌড়াইয়া উপরে আসিয়া ডাকিল—"খোকা"

পরেশ নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না।

জগু খুড়া স্বাভাবিক স্নেহ মাখা স্বরে বলিল—"পরেশ তুমি কখন আসিলে, তোমার শরীর ভাল আছে তো ?"

সেকথার উত্তর না দিয়া পরেশ ভগ্নস্বরে বলিল—"কাকা আপনি দুপরে কোথায় ছিলেন ? বাড়ীতে খান নাই কেন ?"

জগু খুড়া তার ভাঙ্গা হৃদয় হাসির রূপালি তবকে মুড়িয়া বলিল—'আমার নিমন্ত্রণ ছিল, তাই বাসায় খাই নাই।"

জগু খুড়ার উত্তর শুনিয়া, অশ্রুধারায় মাধুরীর চতুর্দ্দিক ঝাপসা হইয়া গেল। সে জগু খুড়ার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। বৃদ্ধ একটু পিছাইয়া বলিল "মা একি পুত্র কি কখনও মার উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারে। তুমি যে এসংসারের লক্ষ্মী। উঠ মা।"

অশ্রুসিক্ত ব্যাকুল ভীত কণ্ঠে মাধুরী বলিল "না কাকা আমার মত হালকা স্বভাবের স্ত্রী কখনও লক্ষ্মী হইতে পারে না। সে সেবা পরায়ণা দেবীর অটল আসনে বসিবার যোগ্য আমি নই। মায়ের অপরাধ ক্ষমা কর কাকা।'

"সেকি তুমি কাঁদিতেছ মা" বলিয়া জগু খুড়া মাধুরীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

আসন্ন বিপদের মেঘের উপর মাতৃ ভাবের অমৃত জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিয়া কে যেন মাধুরীর হৃদয় স্বর্গের সুষমাতে রঞ্জিত করিয়া দিল। সে আপনা আপনি পুনরায় বলিল —"কাকা আমায় ক্ষমা করুণ"।

মাতৃ সম্বোধনে মাধুরীর যেন সন্তান বাৎসল্য জাগিয়া উঠিল। সে যেন হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

এসংসারে কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য সূত্রের ভিতর দিয়া প্রেম, স্নেহ ও ভালবাসার পুণ্য মন্দাকিনী স্রোত প্রবাহিত হয় তাহা কেহ জানে না—তাতে অবগাহন করিয়া মানুষ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া নবজীবন লাভ করে। আজ ক্রন্দনের প্লাবনে মাধুরীর হৃদয় পবিত্র হইয়া গেল। মাধুরী আপন ভুল বুঝিয়া লইল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সংবাদ।

গত ১৯ ও ২০ চৈত্র উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশন মাননীয় বিচারপতি ডাক্তার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির অভিভাষণ "সৌরভে" মুদ্রিত হইল। এবার সম্মিলনে অনেক দেখিবার, শুনিবার ও শিখিবার বিষয় ছিল। উত্তর বঙ্গ সম্মিলনের দশম অধিবেশন বগুড়ায় সম্পন্ন হইবে।

আমরা গভীর শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণ, আমাদের অকৃত্রিম সুহৃদ বাবু ব্যোমকেশ মুস্তাফী আর ইহ জগতে নাই। গত ১৯ শে চৈত্র প্রাতঃকালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার কল্যাণ ও সেই শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রাণে শান্তিদান করুন।

একখানি পত্র।

সম্পাদক মহাশয়; উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হইতে ফিরিয়া আসিয়া যশোহরের নিমন্ত্রণপত্র দেখিলাম। দেখিতেছি রায় যদুনাথ তাঁহার নিমন্ত্রণপত্রে বাহাদুরী প্রকাশ করিতে ক্রটী করেন নাই। তিনি তাঁহার ঐ মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্রে কলিকাতা ও খুলনাবাসী দিগের যাতায়াতের সময় ও সুবিধা দেখাইয়া দিয়াছেন। উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গের "বঙ্গালেরা" যে কোন পথে যশোহর আগমন করিবে তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। কলিকাতা বাসীদিগকে নির্ব্বোধ মনে করায় ও "বঙ্গাল"দিগকে সুবোধ ও অভিজ্ঞ মনে করায় রায় বাহাদুরের বাহাদুরী আছে। ইহাও কি "কাবুলী দাওয়াইর" নিদর্শন? আপনি না সম্মিলন পরিচালন সমিতির একজন সভ্য? আপনি কি বলেন? আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রায় যতীন্দ্রনাথইবা কি বলেন?

শ্রীর, চ, ব, বি, এ।

সমালোচনা।

History of the Mymensigh Raj Rajeswari Water Works শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার প্রণীত, মডেল লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—।০ আনা।

ইহা ময়মনসিংহ জলের কলের একখানা ইতিহাস। মহারাজা সূর্য্যকান্ত দেশ হিতকর যত অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ময়মনসিংহ নগরে এই রাজরাজেশ্বরী জলের কল প্রতিষ্ঠা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান।

বঙ্গের স্থানে স্থানে কত সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি বুকে লইয়া পড়িয়া আছে কেহ তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখে না। কালে উহা বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া যায়—প্রকৃত ইতিহাস জানিবার উপায় টুকু পর্য্যন্ত থাকে না। কত বাধাবিপত্তির মধ্যদিয়া ময়মনসিংহের এই জলের কল বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে উমেশ বাবু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। এই মহদনুষ্ঠানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া তিনি ইহাতে অনেক অপ্রকাশিত পূর্ব্ব বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থে ৫ খানা হাফটোন চিত্র আছে। ইহার মুদ্রণ ও বহিরাবরণ পরিপাটী ও সুন্দর হইয়াছে।

History of the Charitable Dispensaries in the District of Mymensingh—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ দে প্রণীত।

উল্লিখিত গ্রন্থের ন্যায় এখানাও এ জেলার এক শ্রেণীর সদনুষ্ঠানের একখানা বিবরণ পুস্তক। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্র হইতে এজেলার দাতব্য চিকিৎসালয় গুলির বহু অপ্রকাশিত বিবরণ প্রদান করিয়া ময়মনসিংহবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয় বহন করিয়া যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নীতি ও সদুপদেশ পূর্ণ একখানা উপাদেয় গ্রন্থ—পুস্তক পাঠে আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই উপকৃত হইবেন।

রত্নরেণু—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। গ্রন্থকার কতকগুলি মূল্যবান প্রবাদ কথা ও উপদেশ এ গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন। মূল্য দেড় আনা।

আনন্দাশ্রু—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত। আনন্দাশ্রুতে অশ্রু আছে।
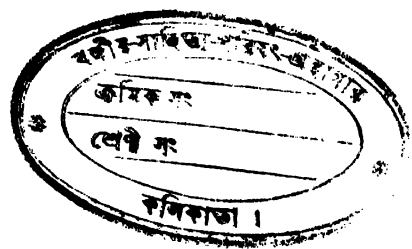
নবম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিগণ।

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ,
সভাপতি—দর্শনশাখা।

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ,
সভাপতি—সাহিত্যশাখা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু,
সভাপতি—ইতিহাসশাখা।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু,
সভাপতি—বিজ্ঞানশাখা।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।
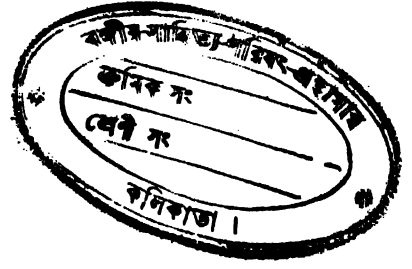
সৌরভ

চতুর্থ বর্ষ } ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। { অষ্টম সংখ্যা।

জ্ঞান ও কর্ম্ম।

জ্ঞান ও কর্ম্মের কলহ অতি পুরাতন জিনিষ। এখন বরং তাহা অনেক কমিয়া আসিয়াছে,—অন্ততঃ তার তীক্ষ্ণ ধার কতকটা মন্দীভূত হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীন কালে, কি ভারতে কি গ্রীসে, এবং তার পরও খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র ইউরোপীয় চিন্তায় ও জীবনে, এ উভয়ের দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান দেখা যায়। এখন যদিও মানুষের জীবনে এদের দ্বৈধ ততটা তেমন ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তথাপি চিন্তায়, দর্শন ও ধর্ম্ম-বিষয়ের গবেষণায় তাহা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। আর এ কথা যদি সত্য হয় যে জাতির জীবনে যে যে স্তর ভেদ থাকে, ব্যক্তির জীবনও সেই সেই সোপানের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠে, তা হইলে, জাতির মানসিক জীবনে যে দ্বৈধ বোধ হইয়া গিয়াছে, ব্যক্তির মনেও সেই বিরোধ-বোধ না আসিয়া পারে না। জাতি ও ব্যক্তির জীবনের ধারা এবং তার গঠন প্রণালী ও অভি-ব্যক্তি যে এক, নানা প্রমাণে আজ তাহা স্থিরীকৃত হইতেছে। বিবর্ত্তনবাদীরা বলেন যে মানুষের দেহ অধস্তন ইতর জন্তুর দেহ হইতে ক্রমে আবির্ভূত হইয়াছে; বাইবেল যে বলে ঈশ্বর তাঁর নিজের মূর্ত্তির মত করিয়া মাটী দিয়া মানুষের দেহ সৃজন করিয়াছিলেন এবং তাতে নিজের নিঃশ্বাস দ্বারা প্রাণবায়ু সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভুল। মানবজাতি যে যে অন্তান্তর জাতির ভিতর দিয়া, যে যে দৈহিক পরিবর্ত্তন লাভ করিয়া তার বর্ত্তমান দৈহিক গঠনে পৌছিয়াছে, ক্রম-বিকাশ ভূয়োভূয়ঃ পর্য্যবেক্ষণের পর ইহা দেখাইতে পারিয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই ভ্রূণাবস্থায় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সেই সেই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসেও তেমনই দেখা যায় যে মানুষের মন বহু স্তরের ভিতর দিয়া চলিয়া নিজের উন্নতির ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছে; একান্ত আস্তিকতার পর একান্ত নাস্তিকতা, এবং নাস্তিকতার পর আবার বিচার-সিদ্ধ আস্তিক্য আসিয়াছে; ব্যক্তির মনেও ন্যূনাধিক এই সব অবস্থা-ভেদ আসিয়া থাকে। সুতরাং জাতির ইতিহাসে যাহা হইয়া গিয়াছে, ব্যক্তির ইতিহাসে তাহার পুনরাভিনয় একেবারে না হইয়া পারে না। জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধের কথা ভাবায় কাজেই কোন দোষ নাই। কারণ জাতির জীবনে তাহা মন্দীভূত হইলেও ব্যক্তির জীবনে পুনরাবির্ভাব অসম্ভব নহে।

বৈদিক যুগের দিনে মানুষের মন কর্ম্মের দিকেই ঝুকিয়া পড়িয়াছিল বেশী; পুত্রই হউক কিংবা স্বর্গই হউক, যজ্ঞরূপ কর্ম্ম দ্বারাই তাহা লাভ করিতে পারা যায়, ইহাই ছিল তখনকার বিশ্বাস। পশুহনন এবং মন্ত্রোচ্চারণ এবং হবি হবনই ছিল তখনকার মতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির একমাত্র উপায়। ধর্ম্মের অর্থ ছিল কর্ম্ম। এই বিশিষ্ট প্রকারের কর্ম্ম আচরণ করিতেন যিনি, তিনিই ছিলেন ধার্ম্মিক। এই কর্ম্মরূপ উপাদান দ্বারাই পুণ্যাত্মার জীবন গঠিত হইত। কারণ হইতে যেমন কার্য্যের উৎপত্তি, এবং প্রতিবেধক কোন কারণান্তর

বর্ত্তমান না থাকিলে যেমন এই কার্য্যের উৎপত্তি না হইয়া পারে না, তেমনই কর্ম্ম হইতেই জীবনের যা কিছু বাঞ্ছনীয় বস্তু তার জন্ম, এবং কর্ম্ম সুষ্ঠু সম্পন্ন হইলে তার ফল না দিয়া পারে না; এই ছিল তখনকার বিশ্বাস। কিন্তু উপনিষদের দিনে দেখিতে পাই মানুষের মন জ্ঞানের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। "যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে, তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।" চারিদিক বন্যার জলে ভাসিয়া গেলে যেমন ক্ষুদ্র জলাধারের উপকারিতা, জ্ঞানীর নিকট সমস্ত বেদেরও সেই উপযোগিতা। তখন মনে করা হইতে লাগিল, কর্ম্মদ্বারা যা কিছু লাভ করা যায় তাহা ভঙ্গুর, একদিন না একদিন তার নাশ হইবেই; জ্ঞান দ্বারাই কেবল স্থায়ী সুখ,—চিরন্তন মুক্তি লাভ করা যায়। আদর্শ জীবন সুতরাং এখন আর কর্ম্মের উপাদানে গঠিত হওয়া উচিত নয়, জ্ঞানের ভিত্তির উপরই তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মবিদ্ বলিতে লাগিলেন, 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে'; বৈদিক ক্রিয়ার জ্ঞান ও জ্ঞান, কিন্তু তাহা কর্ম্মমূলক জ্ঞান,—তাহা 'অপরা বিদ্যা'; 'পরা বিদ্যা';—ব্রহ্ম-বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাহা দ্বারাই শ্রেয়ঃ লাভ হইতে পারে; যাহা প্রেয়ঃ, যাহা ক্ষণিক, কিংবা সময়ে ভঙ্গুর সুখের হেতু, অপরা বিদ্যায় সেই কর্ম্মের কথাই বলে; কিন্তু মানুষের পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ, যাহা মানুষের বাস্তবিক অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, পরা বিদ্যা হইতে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই তাহা পাওয়া যায়। এইরূপে কর্ম্মের বিরুদ্ধে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইল।

কিন্তু কর্ম্ম তাহাতেও লোপ পাইল না; পশুহনন তাহাতেও নিবৃত্ত হইল না। বিচার পূর্ব্বক মীমাংসায় পুনর্ব্বার স্থিরীকৃত হইতে লাগিল কর্ম্মের ফল দিবার যে ক্ষমতা আছে, দেশ কালের সহিত তাহা সম্পর্কহীন না হইতে পারে, কিন্তু তাহা কখনও বিনাশ হয় না; জ্ঞান তাহাকে ভস্ম করিয়া দিতে পারে না; উপযুক্ত, অনুকূল অবস্থা ঘটিলেই কর্ম্ম তাহার ফল প্রসব করিবে। কর্ম্মই কর্ম্মকে ধ্বংস করিতে পারে; পাপ যেমন কর্ম্ম, পুণ্যও তেমনই কর্ম্ম; পাপ কর্ম্মকে পুণ্য-কর্ম্মই লোপ করিয়া দিতে পারে; কিন্তু তা না হইলে, কর্ম্ম তাহার ফল দিবেই। কর্ম্ম ছাড়া মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সুতরাং বেদ যে কর্ম্মের বিধান দিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করা উচিত। কর্ম্মই ধর্ম্ম, কর্ম্ম ছাড়া মানব-জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না; কারণ যাহাই অভিলাষ করি না কেন, কর্ম্মই তাহার একমাত্র উপায়। অন্তঃপ্রবৃত্তির প্রেরণায় যে কর্ম্মের দিকে মানুষের মন প্রবৃত্ত হইতেছিল, দার্শনিক সূক্ষ্ম বিচারে পূর্ব্ব মীমাংসা তাহারও জয় ঘোষণা করিলেন। কর্ম্ম সুতরাং মরিল না। কর্ম্মই ব্যক্তি ও সমাজের জীবনের একমাত্র—অন্ততঃ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া গৃহীত হইল। জ্ঞানের যাহা স্থান রহিল, তাহা শুধু 'কিং কর্ম্ম কিম কর্ম্মেতি'—এই বিচারে। কিন্তু এই বিচারে মানুষের একমত হওয়া কঠিন, কারণ তত্ত্বদর্শীরাও ইহাতে ভুল করেন,—'কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ'; অধিকন্তু, 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং'। সুতরাং 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। কিন্তু মহাজনেরা কোন পথে গমন করিয়াছেন, সাধারণকে তাহা মানিতে হইবে; মহাজনেরা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা যদি আবার বিচার করিয়া স্থির করিতে হয়, তা হইলে পূর্ব্ববৎ 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'—হইবে। সুতরাং লোকের উপকারার্থ ঋষিরা কখনও মনুর নিকট কখনও পরাশরের নিকট, কখনও যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট গিয়া ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা বেদ জানেন, তার মর্ম্ম সম্যক্ আগত আছেন; ইঁহারাই সর্ব্বসাধারণের বিচারে যে মতভেদ হইতে পারিত তার নিরাকরণ করিয়া বলিয়া দিতে পারেন, লোকের কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, আর কোন্ কর্ম্ম না করা কর্ত্তব্য। সুতরাং ইঁহারাই হইলেন ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক, আর ইঁহাদের কথিত বিধানই হইল 'সংহিতা'। ইঁহারা একা যখন কোন মীমাংসা করিতে না পারিতেন, তখন ইঁহাদের সংসদ্ বসিত; অনেকে নৈমিষারণ্যে কিংবা অন্যত্র একত্র বসিয়া ধর্ম্মের মীমাংসা করিতেন। কখনও ২ হয়ত ইঁহারা বেদের বিধানের বিরুদ্ধে কিংবা তার অতিরিক্ত ও কিছু বলিয়াছেন, তাহাও লোকের গ্রহণ করা উচিত, কারণ তাহাও বেদের

তুল্য,—'সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ ভবেৎ'। কর্ম্ম সুতরাং বাঁচিয়া রহিল, এবং বাংলা দেশে এই কর্ম্মের বিশেষ ভাবে নিয়ামক—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য।

কিন্তু জ্ঞানের আগুণ যজ্ঞের ধূমে আচ্ছন্ন হইল না। বেদান্ত কর্ম্মকে একেবারে উড়াইয়া দিলেন না সত্য, কিন্তু কর্ম্ম-লভ্য যা কিছু তাহা সমস্তই ত নশ্বর। জ্ঞানে যা পাওয়া যায় তার ত বিনাশ নাই; জ্ঞানেইত আত্মার একান্ত বিশ্রাম, জ্ঞানেই ত তার মুক্তি। কর্ম্মদ্বারা আত্মা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাইতে পারে, দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ করিতে পারে, মর্ত্ত হইতে স্বর্গে, কিংবা চন্দ্রলোক হইতে ধ্রুবলোকে গমন করিতে পারে; এর বেশী কর্ম্ম দিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মলোকে গেলেও আত্মার নিষ্কৃতি নাই—'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন, আবার আত্মাকে জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে, এবং দেহ ধারণ করার যে ফল সেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। এক জ্ঞানই আত্মাকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে। এক জ্ঞানই সমস্ত কর্ম্মফল ভস্ম করিয়া দিয়া আত্মার পরমার্থ লাভের পথ করিয়া দিতে পারে।

বেদান্ত-ডিণ্ডিম জ্ঞানের এই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিলেও কর্ম্ম একেবারে লোপ পায় নাই। জীবনে সহস্র দুঃখ থাকিলেও জীবন চায় না—এরূপ জীবিত প্রাণী পাওয়া যায় না। সুতরাং কর্ম্মের দিকেই বরং মানুষের আকর্ষণ বেশী। তথাপি কর্ম্মী জ্ঞানের মূল্য অস্বীকার করিতে পারেন না। জ্ঞানীও কর্ম্মকে বাদ দিয়া পারেন না। কর্ম্ম ছাড়া জীবন যাত্রা অসম্ভব, কর্ম্মছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকা যায় না.—'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ' —সুতরাং কর্ম্মহীন, শুধু জ্ঞানময় জীবন অসম্ভব। গীতায় তাই জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই মানব জীবনে যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া এদের কলহের মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

শুধু ভারতের ইতিহাস নয়, ইউরোপের ইতিহাসেও জ্ঞান ও কর্ম্মের এই বিরোধ দৃষ্ট হয়। সক্রেতিস্ এবং তাঁহার শিষ্য প্লেটো কর্ম্মের চেয়ে জ্ঞানকেই বড় মনে করিতেন। সত্যের অনুসন্ধান ও তার জ্ঞান যে জীবনের সকল চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য, কর্ম্ম-পূর্ণ জীবনের চেয়ে তাহা বড়। জ্ঞানের চেয়ে বড় পুণ্য আর কিছুই নাই।

ষ্টোয়েকদের মধ্যেও এই জ্ঞানেরই পূজা দেখা যায়। জ্ঞানী পুরুষ তাদের মতে শ্রেষ্ঠ এবং উপাস্য, কর্ম্মী নয়। সত্যের নিদিধ্যাসন মানব জীবনের সর্ব্বোচ্চ ব্রত; এঁদের মতে ইহার বড় পুণ্য আর কিছু হইতে পারে না।

গ্রীকদর্শনে একদিকে যেমন জ্ঞানের পূজা দেখা যায়, অপরদিকে তেমনই কর্ম্মের মূল্য ও স্বীকৃত না হইয়াছে এমন নয়। সক্রেতিসের সমসাময়িক আর এক দার্শনিক সম্প্রদায়—সফিষ্টগণ চূড়ান্ত সত্যের অনুসন্ধান নিষ্ফল মনে করিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুত ব্যক্তি হিসাবে—সমাজের দশজনের সহিত নানারূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ একজন হিসাবে, নিজের করণীয় কর্ম্ম করাকেই প্রত্যেকের জীবনের প্রধান ও একমাত্র ধর্ম্ম মনে করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ে পরস্পরের সহায়তা করা—পরস্পরের জন্য কাজ করিয়া সমাজ রক্ষা করা, পরের উপকার করা সুতরাং কর্ম্মদ্বারা পরের উপকার করার মত ক্ষমতা অর্জ্জন করা, মানুষের কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। আমি সমাজে আছি এবং সমাজে থাকিয়া পাঁচ রকম কাজ করি; তাতে আমার যেমন লাভ হয়, আমি যেমন সুখে বাস করিতেছি, সমাজেরও তেমনই লাভ হয়,সমাজও তেমনই কাজ পায়। আমি জ্ঞাতসারে সমাজের উপকারের জন্য কোন কাজ না করিতে পারি, কিন্তু যা করি তা হইতেই সমাজ কিছু না কিছু উপকার পাইয়া থাকে। আমি যদি সমাজ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী কিংবা বানপ্রস্থী হই, যদি অন্যকে রোগ মুক্তির কবচ দিয়া কিংবা কবে ছেলে হইবে বলিয়া কিংবা ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া নিজের জীবিকা অর্জ্জন করি, তা হইলে সমাজ সে উপকার টুকু পায় না। শুধু নিজের জীবন যাত্রার নিমিত্ত করণীয় কার্য্য হইতেই যেখানে সমাজ উপকার পায়, সেখানে যদি উপকার করিবার ইচ্ছাটীও আসিয়া জুটে, তাহা হইলে আরও মনোরম হয়। এই পরোপকারের ইচ্ছায় রঞ্জিত করিয়া জীবনের কর্ম্ম করিয়া যাওয়াকেই প্রাথমিক খ্রীষ্টানেরা জীবনের প্রধান ধর্ম্ম মনে করিয়াছিল। কিন্তু এই কর্ম্মের আদর্শ

অনেক কাল তাদের সম্মুখেই বিরাজ করে নাই। আত্মা ও দেহ, বন্দী ও বন্দনের এক দুঃসম্বন্ধের বৈর-খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মজ্জাগত বিশ্বাস। তার ফলে দেহের জন্য, দৈহিক সুখের জন্য যা কিছু করা যায়, খ্রীষ্টান তাহাকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। সমাজের মানুষ যে সমস্ত কাজ করে, তার ষোল আনাই দেহ রক্ষার উপযোগী—তার সমস্তের ই মূলে ঐহিক কুশলের ইচ্ছা বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ইহলোকে যাহা মঙ্গল, পরলোকে তাহা হইতেই অমঙ্গল,—দেহের পক্ষে যাহা ভাল আত্মার পক্ষে তাহাই মন্দ; ঐহিক মঙ্গল হইতে কখনও পারলৌকিক শ্রেয় আশা করা যায় না। কাজেই খ্রীষ্টানেরা ক্রমে ঐহিক ক্রিয়া কলাপের উপর বীতরাগ হইয়া উঠিল! লোকালয়ের বাহিরে সমাজের সহিত যথা সম্ভব সম্পর্কহীন হইয়া ভগবচ্চিন্তায় জীবন যাপন করাই তাদের আদর্শ হইয়া পড়িল। সর্ব্বত্র যেমন, খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরাও তেমনই কর্ম্ম হইতে জ্ঞানকেই বড় মনে করিতে লাগিলেন।

এখন আবার পাশ্চাত্য নীতি-শিক্ষকেরা কর্ম্মকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন। আদর্শ-জীবন—কর্ম্ম-জীবন; কর্ম্ম ছাড়া শুধু জ্ঞান কার্য্য হীন কারণ, সুতরাং তাহার মূল্য কম; কর্ম্মেতেই বাস্তবিক পুণ্যলাভ, কর্ম্মই আদর্শ জীবনের ধর্ম্ম। গৃহে, রাষ্ট্রে, সমাজে ব্যক্তির বহুবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম রহিয়াছে; এইসব কর্ত্তব্য তাহাকে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে; তাহাতেই তার পুণ্য, শুধু জ্ঞানে কখনও ধর্ম্ম হয় না।

কর্ম্ম ও জ্ঞানের কলহ সুতরাং মানুষের ইতিহাসে অতি প্রাচীন ব্যাপার। কিন্তু প্রাচীন হইলেও ইহা চির নূতন, এখনও ইহার বিরতি হয় নাই। অবশ্যই কর্ম্ম যেমন সকলের এক নয়, তেমনই সব দেশে সব সময়ে একই প্রকার জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা হইয়াছে, এমনও নয়। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা যে জ্ঞানকে বড় মনে করিয়াছেন, উপনিষদ্ তাকে বড় বলেন নাই। তথাপি উভয়েই জ্ঞানকে এবং জ্ঞানীকেই পূজ্য মনে করিয়াছেন। কোন্ জ্ঞান বড়, কি প্রকার জ্ঞানে আত্মার নিঃশ্রেয়স-লাভ হয়, দেশভেদে ও কালভেদে এই নিয়াও বিবাদ হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব ইহা অপেক্ষা সাধারণ।

এ দ্বন্দ্বের শেষ কোথায়? এ কলহের মীমাংসা কি? গীতা উত্তর দিবেন, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ের সমন্বয়। পাশ্চাত্য নীতিজ্ঞেরাও এই কথাই বলিবেন। জ্ঞানহীন কর্ম্ম পশুর আচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেক সম্পন্ন মানুষের আচার নহে; আর, কর্ম্মহীন জ্ঞান নিষ্ফল, কারণ ক্রিয়াহীন জীবন অসম্ভব, এবং এই জীবনের ক্রিয়াকে যে জ্ঞান নিয়মিত না করে, তাহার অস্তিত্বে কোন লাভ নাই। মানব জীবনের আদর্শ সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়। কিন্তু এ আদর্শ কয় ব্যক্তির কিংবা কয় জাতির জীবনে পাওয়া যায়?

বই পড়িয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করিয়াছেন, ভারতের দর্শন যখন একবাক্যে জীবনকে দুঃখময় এবং জন্ম গ্রহণ করাকে মহা-কষ্টের কারণ মনে করিয়াছে, তখন ভারতবাসীর জীবনের আদর্শ জ্ঞান। এরূপ মনে করা যুক্তিহীন নহে, কিন্তু ভারতের দর্শন ভারতবাসীর জীবনে কতটুকু আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে তাহা পূর্ব্বে নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। জ্ঞানের কথার চেয়ে ভারতবাসী কর্ম্মের কথা, অনুষ্ঠানের কথাই বেশী বলিয়াছে। ফলে, ভারতবাসীর জীবন অনুষ্ঠান বহুলই রহিয়াছে। পূর্ব্ব-মীমাংসা ও সংহিতার দেশে, তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের দেশে, জ্ঞানের চেয়ে কর্ম্মের পূজা বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। এই কর্ম্মও আবার বিধানের শৃঙ্খলে জড়িত। ব্যক্তি নিজের বিবেচনায় যাহা ভাল মনে করিবে তাহাই করিবে এমন নহে; ব্রাহ্ম মূহুর্ত্তে গাত্রোত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া শয়ন পর্য্যন্ত, উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাদান পর্য্যন্ত, জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত, কি কি অনুষ্ঠান তাহার কর্ত্তব্য শাস্ত্রই তাহা বলিয়া দিয়াছে। কখন, কি, এবং কোন্ মুখে বসিয়া আহার করিতে হইবে, কোন্ সময় অর্থ চিন্তা করিতে হইবে, কখন এবং কিরূপ কন্যা বিবাহ করিতে হইবে, কি দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিতে হইবে, কখন এবং কিরূপ স্থানে মূত্র পুরীষ ত্যাগ করিতে হইবে এ সমস্তেরই বিধান শাস্ত্রে রহিয়াছে। কে কোন্ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিবে,

কে চিকিৎসা ব্যবসায় করিবে এবং লবণ ও মাংস কে বিক্রয় করিবে না, এ কথা বলিতে ও শাস্ত্র ভুলেন নাই। কর্ম্মই ধর্ম্ম, কিন্তু যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম নহে, সংহিতার বিধান বিহিত এই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। এপ্রকার জীবনে জ্ঞানের স্থান অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ। বিধান-বিহিত কর্ম্মই জীবনের একমাত্র অবলম্বন, এবং কর্ম্মই একমাত্র আদর্শ।

সাধারণের পক্ষে এই বিধানই যথেষ্ঠ। তার চেয়ে যাঁরা অর্জ্জন করিতে চান তাঁদের জন্য বৈদিক, তান্ত্রিক কিংবা যোগশাস্ত্র বিহিত উপাসনা পদ্ধতি। তাহাও কর্ম্ম বহুল। আসন প্রাণায়াম, মন্ত্রোচ্চারণ বলিদান প্রভৃতি কর্ম্মই উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম জীবনের সহায়ক। যোগসূত্র ও যোগশাস্ত্রে একটু পার্থক্য রহিয়াছে; সব সময় তা ধরা হয় বলিয়া মনে হয় না। পতঞ্জলির যোগ সূত্রে জ্ঞানের কথা, ধ্যান ধারণার কথাই বেশী; যদি ও তাতে আসন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়ার কথা একেবারে বাদ যায় নাই। কিন্তু ঘেরণ্ড সংহিতা, শিব সংহিতা প্রভৃতি যে যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ তাতে বেশীর ভাগই, আসন, প্রাণায়াম, বস্তিশোধন, অন্তর্ধৌত প্রভৃতি ক্রিয়ার কথা। সুতরাং যোগশাস্ত্রে ও এক বিশিষ্ট প্রকারের কর্ম্মকেই বড় মনে করা হইয়াছে। আর যে শাস্ত্রে পঞ্চমকার সাধনের কথা বিবৃত হইয়াছে, সেই তন্ত্রশাস্ত্রে যে কর্ম্মই প্রধান তাহা সহজেই অনুমেয়।

সুতরাং ভারতে জ্ঞানের কথা বহু থাকা সত্বেও, হিন্দুর জীবন কর্ম্মবহুলই রহিয়া গিয়াছে। বেদান্তে সত্যলিপ্সার যে অপ্রতিহত চেষ্টা দেখা যায়, হিন্দুর জীবনে তার প্রভাব তন্ত্র ও সংহিতার প্রভাবের চেয়ে অনেক কম। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়কেই যদি উচ্চ আদর্শ মনে করা হয়, তা হইলে শুধু কতকগুলি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের যে আদর্শ, তাকে খাটো মনে করিতেই হইবে। তা ছাড়া, এ সমস্ত কর্ম্মই ব্যক্তির নিজের উন্নতির জন্য। সংহিতার দান, ব্রাহ্মণ ভোজন, জলাশয় খনন প্রভৃতি যে কর্ম্মের উপদেশ রহিয়াছে তাহাতে পরের উপকার হয় সত্য; কিন্তু এ সব বিধান বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিকট কতটুকু ঋণী এবং মোটে ঋণী কিনা ঐতিহাসিক সে প্রশ্ন তুলিতে পারেন; তা ছাড়া, ইহাতেও বাস্তবিক পরার্থ চেষ্টাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই, পরের উপকার হইবে সে জন্য নয়, তোমার জন্য হইবে সেই জন্য ইহা কর। অবশ্যই যে ভাবেই করা হউক, কর্ম্মের ফল এক; কিন্তু ফল এক হইলেই মূল্য এক হয় না। উপকথায় বানর যে মানুষকে আহত করিবার জন্য লেবু ছুড়িয়া মারিতেছিল তাহাতে মানুষের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বানরের পুণ্য হয় নাই।

প্রতীচীর নিকট আমরা একটা মস্ত কথা শিখিয়াছি যে মানুষ সমাজ-ভুক্ত; একথাটা আগে কেউ জানিত না এমন নয়; কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ অর্থ আমাদের কর্ম্ম-বিধিতে ধরা হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ চলে। সমাজে যে পরস্পরের সহিত আদান প্রদান, পরস্পরের সহিত বৈষয়িক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া, তাহাতে সত্য ও পরার্থ চেষ্টা মিশ্রিত করিয়া দিয়াই যে বাস্তবিক ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হয়, একথা বোধ হয় বর্ত্তমান যুগের নীতি জ্ঞানের বিশেষ কথা। তোমাতে আমাতে টাকা পয়সা জমী জমা নিয়া যে বৈষয়িক সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার নিমিত্ত আমাদের উভয়েরই কতকগুলি কাজ করিতে হয়; এই কর্ম্মে সত্য, পরোপকারের ইচ্ছা প্রভৃতি যদি বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে, ইহা বলিদান কিংবা প্রাণায়ামের চেয়ে পুণ্যতর, একথা বোধ হয় প্রতীচীই বলিয়াছে। সত্য কিনা তাহার বিচার চলে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ইহাই নৈতিক আদর্শ। সুতরাং কর্ম্মবহুল হইলেও আমাদের জীবনে যে উচ্চ কর্ম্ম অনুসৃত হয় না, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একথা বলিতে পারেন।

এই সামাজিক সম্বন্ধ স্বীকার না করার ফলে আমাদের বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মের মূলে একটা স্বার্থপরতা বর্ত্তমান রহিয়াছে, নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে এরূপ মনে হইতে পারে। আমরা যজ্ঞ করি, কেন, না নিজের স্বর্গ লাভের জন্য; আমরা পশু বলি দেই, কেন না অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য; আমরা প্রাণায়াম করি, কেন না নিজের দেহ নীরোগ রাখিবার জন্য এবং কতকগুলি দৈহিক শক্তি লাভ করিবার জন্য; আমরা যোগাভ্যাস করি, কেন, না আত্মার ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য; এ সকলের মূলেই স্বার্থ ছাড়া পরার্থ দেখা যায় না। নিজের আত্মার উন্নতি করাই মানুষের চরম ও শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য,

সে বিষয়ে মোটের উপর মতভেদ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ও যে আত্মোন্নতির কথা বলেন নাই, তা নয়। নিজে অধার্ম্মিক থাকিয়া অন্যের ধর্ম্মাচরণের সুবিধা করিয়া দিতে পৃথিবীকে এ পর্য্যন্ত কোন নীতিজ্ঞই উপদেশ দেন নাই। সুতরাং ইহা প্রকারান্তরে স্বার্থপরতা হইলেও দূষণীয় নহে। তথাপি, ইউরোপীয় নীতিবিদ্ যে কোন উপায়ে ক্রিয়া কলাপ দ্বারা আত্মার সুখ ও শক্তি বৃদ্ধি করাকেই উচ্চ উদ্দেশ্য মনে করেন নাই! ব্যক্তির যে সমস্ত শক্তি ও প্রকৃতি আছে সেগুলিকে যথাযথ ব্যবহার করিয়া তাদের উৎকর্ষ উৎপাদন করা চারিত্র-নীতি-সম্মত ধর্ম্ম। তথাপি আমাদের এই গুলির উৎকর্ষ সিদ্ধির জন্য যে ক্রিয়া কলাপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাতে সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই, সমাজের সম্পর্কে আসিয়া মানুষ যে সমস্ত কাজ করে, তাদের ভিতর দিয়াই যে এগুলিকে উৎকৃষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে তাহা বলা হয় নাই। কিন্তু নব্য যুগের পাশ্চাত্য নীতিজ্ঞান এই সামাজিক দিকটীরই উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

সমাজের প্রতি প্রতীচীর এই পক্ষপাত যুক্তিহীন এরূপ মনে করা কঠিন। তথাপি আমরা সম্পূর্ণরূপে ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, এমন বোধ হয় না। তার ফলে, বর্ত্তমানে দেশে অনেকের মধ্যে ধর্ম্মের যে ধারণা দেখা যায় তাহা শুধু ব্যক্তির নিজের জন্য কতকগুলি ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু নহে। ধ্যান, জপ, কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা ব্যক্তি নিজের মনে একটা অবস্থা বিশেষ আনয়ন করিবার চেষ্টা করে; মনের এই অবস্থা আনয়নের জন্য অনেক সময় অস্বাভাবিক উপায়ও অনুমোদিত হয়, যথা মদ্য ও সন্ন্যাসী মহলে গাঁজা। এই সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা মানুষের আত্মা একটা শক্তি লাভ করে, ইহাই বিশ্বাস; এবং এই শক্তিলাভই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, সুতরাং তার উপায় যে সব কর্ম্ম তাহা সমস্তই করণীয়। কর্ম্মকে আমরা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি সত্য, কিন্তু সে সমাজে মানুষের কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তা নয়,—এ এক বিশিষ্ট শ্রেণীর কর্ম্ম। এবং এই কর্ম্ম করিতে পারিলেই ব্যক্তি নিজের জীবন চরিতার্থ মনে করে; সামাজিক জীবনে তাহাকে যে কর্ম্ম করিতে হয়, ধর্ম্মে ও সত্যে তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা তত আবশ্যক বোধ করে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত হয় ত বলিবেন ইহা নীতিজ্ঞানের অভাব সূচনা করে।

আমরা যে কর্ম্মকে বড় করিয়াছি, তাহাতে তেমন দোষ দেখা যায় না; কিন্তু জীবনের সমস্ত কর্ম্মে ধর্ম্ম সাধন করিতে চেষ্টা না করিয়া যে কেবল বিশিষ্ট শ্রেণীর কর্ম্ম দ্বারা আত্মোন্নতি ইচ্ছা করি, ইহাই ভুল। আমরা কর্ম্মকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি, ফলে জীবনটা যেন পরস্পর সম্বন্ধ বিহীন কোঠায় কোঠায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে;—ইহাতে ধর্ম্মের কোঠা ও জীবনের অন্য কর্ম্মের কোঠা পৃথক্। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনি বুঝিতে পারেন যে জীবনটা একজনের সুতরাং এক; এক শ্রেণীর কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম ও আর এক শ্রেণীর কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন হয় না, কীর্ত্তন দ্বারা ধর্ম্ম ও চুরি দ্বারা টাকা রোজগার করা যায় না; জীবনের সমস্ত কর্ম্মের ভিতর দিয়া একই স্থুল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা চাই, এবং সে উদ্দেশ্য ধর্ম্ম সঙ্গত হওয়া চাই; তা না হইলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয় না। বাজার সওদা করা যে ধর্ম্ম, তার ভিতর ধর্ম্ম-অধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে; কেবল ভজনের বেলায় অশ্রুপাত দ্বারাই ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। একথাটা এদেশে কেহ বুঝে না, এমন নহে; কিন্তু সে বুদ্ধি কাজে খাটে না। কারণ আমাদের দেশে এখনও যিনি জ্ঞানী, তিনি জ্ঞানী, আর যিনি কর্ম্মী তিনি কর্ম্মী, যিনি ধার্ম্মিক তিনি ধার্ম্মিক, আর যিনি বৈষয়িক তিনি বৈষয়িক, শুধু তাই নয়, এক জনই যখন ধার্ম্মিক তখন ধার্ম্মিক, কিন্তু বিষয় চিন্তার বেলা ধার্ম্মিক হইতে নারাজ। আমাদিগকে আবার জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় ভাল করিয়া করিতে হইবে।

আমরা এখানে আদর্শের কথাই বিবেচনা করিয়াছি; কোন্ দেশে এ আদর্শ কার্য্যে কতটুকু পরিণত করিয়াছে, এ প্রশ্ন যেন কেহ না তুলেন। আমাদের আদর্শের মধ্যেই যে এই সমন্বয়টা হয় নাই, ইহাই কষ্টের কারণ।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

স্ত্রী কবি সুলা গাইন। *

প্রকৃতির লীলা কাননে "স্ত্রী কবি" বসন্তের ফুল্ল মল্লিকা। সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে, সৌরভে গৌরবে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু এই প্রকার কবি কুসুম, পরিমাণে বেশী ফুটেনা, অতি অল্প। সাহিত্য-সংসারে এই দুর্লভ জিনিসটির আদর অত্যধিক। আমাদের বর্ণিত "সুলা-গাইন"ও এই জাতীয় একটি ফুটন্ত কবি কুসুম ছিলেন। অনেক দিন হইল ঝরিয়া পড়িয়া প্রকৃতির ধ্বংস লীলার নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন বটে,—কিন্তু অদ্যাপিও তাহার গন্ধটুকু মানুষের মনের মধ্যে লাগিয়া রহিয়াছে।

নমোশূদ্র বংশীয়া সুলাগাইনকে আমরা নেত্রকোণা হইতে ৬ ছয় মাইল পূর্ব্বদিকে, 'সত্রশির' গ্রামে বাস করিতে দেখিয়াছি। সুলা যখন প্রৌঢ়ে পদার্পণ করিয়াছেন,—আমরা তখন বাল্যের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে ধূলি ধূসরিত।

সুলার স্বামী সুলাকে বিবাহ করিয়া অল্পদিন পরেই নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে, সুলা তাঁহার ভগ্নীপুত্রের বাড়ীতে থাকিয়া সারাজীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

চতুরা সুলা আপন স্বামী-শোক-সন্তপ্ত ব্যাকুল প্রাণটাকে যাবজ্জীবন ভগবল্লীলা কীর্ত্তন রসে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অন্তর্জ্জগতের দুঃসহ দুঃখরাশি সর্ব্বদা বাহ্য জগতের অলীক সুখাবরণে আবৃত রাখিয়া, সাধারণ সমক্ষে প্রসন্নময়ী মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেন। আমরা সকল সময়ই সুচরিত্রা সুলার বদন মণ্ডলে আনন্দ জ্যোৎস্নার প্রলেপ মাখা দেখিয়াছি।

স্বামী অবশ্য দেশান্তরে জীবিত আছেন,—এই ধারণার বশবর্ত্তিনী সুলা, মরণকাল পর্য্যন্ত সধবার সাজে সজ্জিতা ছিলেন। শঙ্খ সিন্দূর পরিহিতা বৃদ্ধা সুলাকে দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীতিলাভ করিতাম।

মায়িক জগতের স্বামী-সুখ বঞ্চিতা সুলা, অনন্ত কালের জন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় স্বামীত্বে বরণ করিয়া, চিরকাল ভজনানন্দ সুখে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্রের উপর কোনরূপ কলঙ্ক কালিমার ফোটাও ছিল না।

সুলা বালিকা বয়সে 'সত্রশির' নিবাসী ছাড়ুনাথের নিকট যৎসামান্যরূপ বাংলা লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। সেই শিক্ষার ফলে ভক্তিমতী সাধ্বী সুলা, কৃষ্ণ লীলার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া, গোপিনী কীর্ত্তনের একজন উৎকৃষ্ট গাইন হইয়া উঠিলেন। এবং সমবয়স্কা কয়েক জন সঙ্গিনী লইয়া, খেলা কীর্ত্তনের (গোপিনী কীর্ত্তনের) দল করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের একটী সদুপায় করিয়া লইলেন।

সুলা দেখিতে বড় একটা সুন্দরী ছিলেন না। না হইলেও তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের নির্ম্মল ভাব প্রতিভায় তাঁহাকে সর্ব্বদা মনোহারিণী মূর্ত্তিতে সাজাইয়া রাখিত। সুলার কণ্ঠ স্বর শ্রুতি মধুরতায়, কোকিলের কুহুতানাপেক্ষা উপরে ভিন্ন নীচে ছিল না। নানাবিধ শিল্প কার্য্যেও সুলার সুখ্যাতি ছিল। সুলাকে সকলে "ষোল আঙ্গুলে শাখা" বলিত।

অল্পদিন মধ্যেই সুলার নাম প্রতিষ্ঠায় এবং কীর্ত্তন কৃতিত্বের যশো-সৌরভে দেশ ছাইয়া পড়িল। কোন বাড়ীতে অন্নারম্ভ, উপনয়ন কি বিবাহাদি হইলে, সেই বাড়ীতে সুলার গান হইবে কিনা, সকলেই তাহার অনুসন্ধান লইত। এবং সুলাকে আনিয়া কীর্ত্তন করাইবার জন্য সেই বাড়ীর কর্ত্তাকে অনুরোধ করা হইত। ক্রমে সুলার সুমধুর "গোপিনী কীর্ত্তন" ভদ্র-বিশিষ্ট ও অবস্থাপন্ন লোকের শুভ ব্যাপারাদির অঙ্গীভূত হইয়া উঠিল।

সুলা একপালা কীর্ত্তনে অবস্থা ভেদ ১০।১৫।২০।২৫৲ টাকা পারিশ্রমিক এবং তা ছাড়া কত থাল, লোটা, কলসী ও বস্ত্রালঙ্কার পুরস্কার পাইতেন।

যখন সুলা গাইন দেশ যুড়িয়া লোকের মুখে উঠিয়া পড়িলেন, তখন রাজা-জমীদারের বাড়ী হইতেও কীর্ত্তনের জন্য সুলার ডাক আসিত। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রায় সকল রাজা জমীদারের বাড়ীতেই সুলার সুললিত কীর্ত্তন সুধা বর্ষিত হইয়াছে।

খাগড়া রাজবাড়ীর কোন রাণী মা সুলার কৃষ্ণলীলা

* "গাইন" শব্দ লিঙ্গভেদে রূপান্তরিত হয় না।

কীর্ত্তনে সন্তুষ্টা হইয়া,—সুলাকে সত্রশির গ্রাম মধ্যে কতক খানি বাড়ী জমী লাখেরাজ দিয়াছিলেন।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন "এ সব তো সুলার গুণ-গরিমা ও কীর্ত্তন কৃতিত্বের কথা,—তাঁহাকে "স্ত্রীকবি" উপাধি প্রদানের কারণ কি?"

কারণ এই —যে সকল কৃষ্ণলীলার পদ কীর্ত্তন করিয়া সুলা "গ্রাইন" হইয়াছিলেন, তৎ সমস্তই তাঁহার স্বরচিত ছিল। তিনি বন্দনা, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বাল্য লীলা, পতুনা বধ, গোষ্ঠলীলা, গোপাল বন্ধন, যশোদার খেদ প্রভৃতি বিষয় ধরিয়া অতি সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রায় ব্রজ গোপীর খেদ শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইত।

কৃষ্ণলীলার পালা প্রস্তুত করিয়া সুলা পদ্মা পুরাণও কিছু কিছু রচনা করিয়াছিলেন। গীতছন্দে পদ্মাপুরাণ গাইতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। নারায়ণ দেব ও দ্বিজ বংশীদাসের পয়ার ত্রিপদীর পশ্চাতে সুলা স্বরচিত অতি উৎকৃষ্টতর পয়ার লাচাড়ি লাগাইয়া লইতেন।

সুলার অন্তঃকরণে যে স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তির অঙ্কুর গজাইয়া ছিল, তাঁহার রচিত সরস পদাবলীই তাহার বর্ত্তমান সাক্ষী। এই সকল পদাবলী হইতে তাঁহার (সুলার) অদ্ভুত কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

ভাব বিকাশ ও রস সঞ্চারে সুলার স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা ছিল। পদগুলির ভিতর যেমন ভাব-রসের সমাবেশ,—তেমনি কবিত্বের ঝঙ্কারও পরিস্ফুট। সুতরাং সুলা সাহিত্যিক সমাজে কবির আসন পাইবার উপযুক্ত। এজন্য সুলাকে "স্ত্রী কবি" উপাধি ভূষিত করা হইয়াছে।

পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য নিম্নে কতকগুলি পদ লিখিয়া সুলার কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছি। পদগুলি পয়ার ছন্দে রচিত হইলেও অনেক স্থলে অক্ষর গণনায় পয়ারের রীতি উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে। কোন ছত্রে ১২ অক্ষর,—কোন ছত্রে ১৬ অক্ষর,—আর কোন কোন ছত্রে বা ১৭।১৮ অক্ষর। বোধ করি পদগুলি রাগিণী সংযোগে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে।

রায়মণি নাম্নী একটী বৃদ্ধা বৈষ্ণবী যৌবনে সুলার দলের গায়িকা ছিল, সেই বৈষ্ণবীর নিকট হইতে আমি নিম্ন লিখিত পদ সকল লিখিয়া লইয়াছিলাম। অল্পদিন হইল বৈষ্ণবী কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, থাকিলে বোধ হয় তাঁহার নিকট হইতে এই প্রকার আরোও অনেক পদ পাওয়া যাইত। শুনিতেছি সুলার স্বহস্ত লিখিত একখান পদাবলী পুস্তক সত্রসির গ্রামে আছে, যদি অনুসন্ধানে পাওয়া যায়—আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

বন্দনা।

দিশা,—আমি প্রথমে বন্দনা করি শ্রীগুরুরচরণ।
কৃপা করি দিলা গুরু মন্ত্র মহাধন॥
এই দেহ ছিল আমার পাষাণ সমান।
মন্ত্র দিয়া কৈলা গুরু ফুলের বাগান॥
আমি লোহা গুরু আমার পরশ রতন।
পরশে করিলা গুরু, আমাকে কাঞ্চন॥
দ্বিতীয়ে বন্দনা করি, শিক্ষাগুরুর পায়।
কৃপা করি জ্ঞানদান, যে কৈলা আমায়।
অজ্ঞানেতে ছিলাম আমি, অন্ধের সমান।
দয়া করি দিলা গুরু, মেলিয়া নয়ান॥
তৃতীয়ে বন্দনা করি, দেব নারায়ণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর ভার্য্যা দুই জন॥
হরগৌরী বন্দিলাম, কৈলাস পর্ব্বতে।
মহাবিষ্ণু বন্দিলাম, ক্ষীরদের জলেতে॥
ব্রহ্মা ঠাকুর বন্দিলাম, সৃষ্টি অধিপতি।
পালনের কর্ত্তা বন্দি, বিষ্ণু মহামতি॥
সংহারের কর্ত্তা বন্দি, দেব পশুপতি।
তান ভার্য্যা বন্দিলাম, গঙ্গা আর পার্ব্বতী॥
দশ দিক বন্দিলাম, দশদিক পাল।
আনন্দে বন্দনা করি, নন্দের গোপাল॥
কর যোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর ব্রাহ্মণ।
যাঁহার চরণ গুণে, তরে ত্রিভুবন॥
পিতা মাতা বন্দিলাম সংসারের সার।
যাহার প্রসাদে আসি, দেখিলাম সংসার॥

সরস্বতী মাতা বন্দি যুড়ি দুই হাত।
যাহার প্রসাদে আইলাম, সভার সাক্ষাৎ ॥
সভার চরণ বন্দি, গলে দিয়া বাস।
পদভঙ্গে কেহনা, করিবেন উপহাস ॥
করিবেন সকলে মিলিয়া আশীর্ব্বাদ।
পদভঙ্গে কেহ না লইবেন অপরাধ ॥
স্বামীর চরণ বন্দি, ভক্তি যুক্ত হৈয়া।
বিদেশেতে গেলা, আর না আইলা ফিরিয়া ॥
যেখানে সেখানে থাক, মোর প্রাণ পতি।
তোমার চরণে যেন, থাকে মোর মতি ॥
যাহবার হইয়াছে, কপালের লেখা।
মরণের দিনে দিও, এদাসীরে দেখা ॥
রাধাকৃষ্ণ বন্দিলাম, মধুর বৃন্দাবনে।
যাঁর নামে কীর্ত্তন করিব, এইখানে ॥
বৈষ্ণব ঠাকুর বন্দি, দয়ার সাগর।
কৃপা কর প্রভু মোরে, আমি সে পামর ॥
ছাড়ুনাথের পায় বন্দি, লুটাইয়া ধরা।
হাতে ধরি যে মোরে, শিখাইলা লেখা পড়া ॥
কি জানি বন্দনা আমি কিবা জানি গান।
কৃপা করি মানরক্ষা কর ভগবান ॥
চণ্ডালিনী বলে প্রভু না করিহ ঘৃণা।
শ্রীচরণে দিও স্থান, সুলার প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

দিশা,—জন্মিলা অনাদি কৃষ্ণ
শুভলগ্ন পাইয়া।

কৃষ্ণ পক্ষ অষ্টমী তিথি, নক্ষত্র রোহিণী।
শুভলগ্নে জনমিলা, কৃষ্ণ গুণ মণি ॥
ভাদ্র মাসে নিশা কালে, কংস কারাগারে।
হইল কৃষ্ণের জন্ম, দৈবকীর ঘরে ॥
দেবগণ করে তখন, পুষ্প বরিষণ।
ত্রিশ কোটি দেবদেবীর, আনন্দিত মন ॥
ছাওয়ালের রূপ যেন, কোটি কোটি চান।
শুভক্ষণে জনমিলা, পূর্ণ ভগবান ॥

অপরূপ রূপ দেখি, দৈবকিনী কয়।
কেন বিধি দিল মোরে এ হেন তনয় ॥
বসুদেব বলে পুত্র দেব অবতার।
মনুষ্য বলিয়া মনে, না হয় আমার ॥
আসিয়া দেখিলে কংস, লইবে কাড়িয়া।
পাষাণে আছাড় দিয়া, ফেলিবে মারিয়া ॥
এই পুত্র রাখি আসি, নন্দ ঘোষের ঘরে।
যেমতে দুরন্ত কংস, জানিতে না পারে ॥
পুত্র কোলে করি বসু, হইল বাহির।
ঘোর অন্ধকার নিশি, চিত্ত না হয় স্থির ॥
ফুটি ফুটি বৃষ্টি পড়ে, পিছলয়ে পাও।
শোকে ভয়ে বসুর, কম্পিত হৈল গাও ॥
সাবধানে চলে বসু, অতি ধীরে ধীরে।
কতক্ষণে উপনীত, যমুনার তীরে ॥
কণা কণা বৃষ্টিপড়ে, ছাওয়ালের শিরে।
ফণা মেলি অনন্ত, শিরেতে ছত্র ধরে ॥
যমুনার তরঙ্গ দেখি, বসু পাইল ভয়।
অকূল অগাধ নদী, কেমনে পার হয় ॥
ভবপারের কর্ত্তা হরি কোলেতে করিয়া।
চিন্তাযুক্ত হৈল বসু, পারের লাগিয়া ॥
অগাধ গম্ভীর কাল, যমুনার মাঝে ॥
ঘোর অন্ধকার নিশি, কাল মেঘের সাজে ॥
চিন্তাযুক্ত বসুদেব পড়িল বসিয়া।
উপরেতে কাল মেঘ, উঠিল গর্জ্জিয়া।
বসুদেবের দুঃখে কান্দে, দেবতা সকল।
ছুটিছে পবন অতি, হইয়া প্রবল ॥
বিজুলীর ছটা হৈল, বসুর সহায়।
বিজুলী পশরে বসু, দেখিবারে পায় ॥
এক শৃগালিনী, সেই যমুনার জলে।
হাটিয়া যমুনা পার, হয় অবহেলে ॥
দেখিয়া তো বসুদেবের, সাহস বাড়িল।
জলধর কোলে করি, জলেতে নামিল ॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা, দেব অগোচর।
জানিয়া দেবের কার্য্য, গাঙ্গে দিল চড় ॥
হেন কালে চক্রধারী, কিচক্র করিল।

মধ্য যমুনার জলে, পড়িয়া গেল ॥
শিরে করাঘাত করি, বসুদেব কান্দে।
বসুর কান্দনে কান্দে, সূর্য্য আর চান্দে ॥
পাইয়া নিধি হারাইলাম, আমি অভাগিয়া।
পুত্র হেন ধন দিলাম, জলে ডুবাইয়া ॥
জল মধ্যে বসুদেব, করে অন্বেষণ।
খুজিতে খুজিতে পায়, আপন নন্দন ॥
পুত্র কোলে করি বসু, তীরেতে উঠিল।
দরিদ্র হঠাতে যেন, মহারত্ন পাইল ॥
অন্ধ যেন চক্ষু পাইয়া, আনন্দিত মন।
পুত্র পাইয়া বসুদেবের, হইল তেমন ॥
মৃত্যুদেহে প্রাণ পাইল, বসুদেব ঠাকুর।
দেখিয়া পুত্রের মুখ, আনন্দে বিভোর ॥
পুত্র কোলে করি বসু, তীরেতে উঠিল।
ধীরে ধীরে নন্দ গৃহে, উপস্থিত হৈল ॥
যশোদার ঘরে যাইয়া, করে দরশন।
কন্যা এককোলে রাণী, ঘুমে অচেতন ॥
পুত্র থৈয়া কন্যা লৈয়া, বসু গেল ঘরে।
দিল নিয়া সেই কন্যা, দুষ্ট কংসা সুরে ॥
বসু বলে কংসরাজ, কর অবধান।
এই কন্যা হইয়াছে, নাহি সুসন্তান ॥
এত শুনি কন্যা লৈয়া বসুদেব যায়।
পাষাণে আছাড় দিয়া মারিবারে চায় ॥
শূন্যে উড়ি যায় কন্যা, দেবীরূপ ধরি।
কংসেরে বলয়ে কিছু, তিরস্কার করি ॥
ওরে দুষ্ট কংসাসুর, তোর নাই ভয়।
তোরে যে বধিবে সেই, আছে নন্দালয় ॥
আমারে বধিতে তোর, কিছু সাধ্য নাই।
হের দেখ শূন্যপথে, আমি চলি যাই ॥
এত কহি মহামায়া, হৈল অন্তর্দ্ধান।
দুর্গা বলে অন্তকালে, পদে দিও স্থান ॥

গোষ্ঠ।

দিশা,—আয়রে কানাই যাই ধেনু
চরাইতে।

প্রভাতে উঠিয়া যত, ব্রজের রাখাল।
নন্দ ঘোষের দ্বারে আইল, লৈয়া ধেনুপাল ॥
আবা আবা ধ্বনি করে, যত রাখুয়াল।
শ্রীদাম সুদাম ডাকে, আয়রে গোপাল ॥
বলরাম সিঙ্গাধরি ঘনডাক ছাড়ে।
আয়রে কানাই ভাই, আয় শীঘ্র করে ॥
নিত্য নিত্য তোরে কোথা, সাধি নিবে ভাই।
আইসরে গোপাল শীঘ্র গোচারণে যাই ॥
তুই না গেলে কানন মাঝে, যায় না ধেনু।
কাণ পাতিয়ে আছেরে, শুনিতে তোর বেণু ॥
শুনিয়া বাঁশীর গাণ ধেনু চলে বনে।

*   *   *   *

রাখালের আবাধ্বনি, শুনি নন্দ রাণী।
কোলেতে তুলিয়া লৈল, কৃষ্ণ গুণ মণি ॥
গোপালেরে কোলে করি, নন্দরাণী কয়।
বনেতে দিবনা আজি, দুঃখিনীর তনয় ॥
শুনরে শ্রীদাম সুদাম, শুন হলধর।
আজি গোষ্ঠে নাহি দিব, পুত্র জলধর ॥
সাত নাই, পাঁচ নাই, একটী ছাওয়াল।
পাছে আছে শত্রু আমার, কংস রাজা কাল ॥
শ্রীদাম সুদাম বলে, কিবল জননী।
না দিলে গোপাল মোরা, ত্যজিব পরাণি ॥
সাধে কি গোপাল তোর, বনে নিতে চাই।
রাখালের জীবন ধন, তোমার কানাই ॥
মরিলে পরাণ পাই, গোপালের গুণে।
জানিনা গোপাল তোর, কিবা মন্ত্র জানে ॥
সাবধানে রাখিব, না যাব দূর বনে।
সকালে সাজায়ে দেমা, তোর কৃষ্ণ ধনে ॥
এতশুনি নন্দরাণী সাজায় গোপালে।
বয়ান ভাসিছে রাণীর নয়নের জলে।

বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিতে সাহস করিলাম না।

এই সমস্ত পদের সমালোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং কেবল মাত্র কয়েকটী পদ লিখিয়াই স্থগিত রহিলাম।

একজন পল্লীবাসিনা স্ত্রীলোক কর্তৃক এরূপ সরল ভাষায় পদাবলী রচিত হওয়া বাস্তবিক বিস্ময়জনক ব্যাপার।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

নূতন ও পুরাতন।

যাহার অভাব যাহার দৈন্য, চায় ত সেহি জন,
পরিপূর্ণ নহে যাহার পূর্ব—পুরাতন!
নব বর্ষ—নূতন হর্ষ—নূতন আশা তার,
কেবল যাজ্ঞা—কেবল ভিক্ষা—কেবল হাহাকার!
কল্পতরু পুরাতনে অভাব আমার নাই,
নূতনের অনন্ত ভাণ্ডার নিত্য নূতন পাই।
কোথায় এমন পুরাণ গিরি নূতন হিমালয়,
শক্তিরূপা কন্যা যাহার অসুর করে জয়!
কোথায় হেন কালো মেয়ে জন্মে কাহার ঘরে,
শত্রু বধি উন্মাদিনী মুণ্ডমালা পরে।
কোথায় এমন রাজপুতানী কল্লে জহর ব্রত,
কোথায় এমন সহগমন হিন্দু নারীর মত!
আত্রেয়ী মৈত্রেয়ী যেমন ব্রহ্ম পরায়ণা,
তেম্‌নি কোথায় ব্লেভাটাস্কী ম্লেচ্ছের ললনা?
কোন্ দেশের সাবিত্রী পতির জীবন অবসানে,
বাঁচাইয়া মরা পতি যম জিতিয়া আনে?
মিরন্দা ও ডেস্‌ডিমনা কোথায় এমন আছে,
কণ্বমুনির বনে যেমন বাকল বাজে গাছে!
পরের হিতে বুকের অস্থি কল্লে কেবা দান,
কোথায় আছে এমন তর ঋষি পুণ্যবান!
কোথায় বা আতিথ্য এমন কোথায় কর্ণ দাতা,
বাপে মায়ে করাত দিয়ে ছেলের কাটে মাথা!
কোথায় সে ভীম দেখ্‌লে যেবা নারীর অপমান,
অত্যাচারীর বক্ষ চিরি রক্ত করে পান!
কাদের এমন পিতামহ ভীষ্ম মহাবীর,
এমন নূতন শরশয্যা কোথায় পৃথিবীর?
কার বা এমন কালো ছেলে জন্মে কারাঘরে,
মায়ের যাহার পায়ের শিকল অম্‌নি খসে পড়ে!
রণক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে কোথায় বল হয়,
চিতার উপর গীতার এমন ধর্ম্ম সমন্বয়!
কোন্ দ্বীপে জন্মেছে কোথায় এমন দ্বৈপায়ন,
অতুলন কীর্ত্তি যার ভারত অতুলন!
বইছে কোথায় পুণ্যতোয় বাল্মীকি তপস্যায়
পর্শে যার ধ্বংস শাপ নবজীবন পায়।
সিন্ধু বেঁধে শত্রু রাজ্য কল্লে আক্রমণ,
নর বানরে কোথায় সখ্য কোথায় এমন রণ!
সর্ব্বগতি পুষ্পরথ সে—স্বর্গে মর্ত্তে উড়ে,
জেপেলীনত উইয়ের মত ভুঁইয়ের উপর ঘুরে!
কোথায় এমন শক্তিশেল আর কোথায় নাগপাশ
কোথায় এমন ভীষণ বজ্র বিশ্ব ভুবনত্রাস!
কোথায় এমন পবনাস্ত্র বরুণ ব্রহ্মবাণ,
"তরলাগ্নি" "বিষবাষ্প"—কোথায় সে বিজ্ঞান!
কোন্ দেশেতে কোথায় আছে এমন তপোবন,
জগৎ আলো করে যাহার বিজ্ঞান দর্শন!
কোথায় এমন দস্যু ডাকাত বিশ্বের আদি কবি,
নূতন ছন্দে আঁক্‌লে প্রথম প্রথম বাণীর ছবি!
অদ্ভুত বিচিত্র এমন নূতন কোথায় আর,
সর্ব্ব আদিম পুরাতন এ, এমন আছে কার?
আমার যাহা শ্রেষ্ঠ—পূর্ণ—অপূর্ণ তা নয়,
সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন আমার সকল সমুদয়!
আমার বিদ্যা আমার জ্ঞান আমার যাহা—সব,
চির সত্য আত্ম তত্ত্ব নিত্য অভিনব!
নাইক তাহার ধ্বংস বিনাশ নাইক তাহার ক্ষয়,
ফুলের সঙ্গে মূলের মত বীজের ভাবোদয়!
লুপ্ত নয় সে যোগ তপস্যা সুপ্ত ভাবে আছে,
গুপ্ত ভাবে হোমের শিখা হিয়ায় [illegible]!
অস্থি তাহার সমিধ কাষ্ঠ, মজ্জা তাহার [illegible],
জল্‌ছে যজ্ঞ জাতির বুকে স্বপ্নে দেখে কবি!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নবেম্বর মাস। তখন আমরা নদী হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে কাজ করিতেছিলাম। এখানেও সেই রকম গভীর জঙ্গল। কিন্তু জল কোথাও নাই। আমাদের সঙ্গে এখন প্রায় ২০০০ কুলি। অথচ একবিন্দু জল পাইবার কোনও উপায় নাই। কূপ খনন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু পাহাড়ে জায়গা বলিয়া কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। তখন প্রত্যহ দুইবার করিয়া নদী হইতে মাল গাড়ী করিয়া জল আনিয়া সকলকে দেওয়া আরম্ভ হইল। জল দিবার সময় যে কাণ্ড হইত, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ২০০০ লোক একত্রে আপনাপন জলপাত্র লইয়া গাড়ীখানা ঘেরিয়া দাঁড়াইত। আগে লইবার জন্য সকলেরই চেষ্টা। এমন দিন ছিল না, যে দিন ২০।২৫ জনের মস্তকে বা অন্য কোনও স্থানে আঘাত না লাগিত। এই গোলযোগ বন্ধ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু কিছুই হইল না। তখন সাহেব হাল ছাড়িয়া দিলেন।

প্রত্যহ সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে জলের গাড়ী আসিত, এবং পর দিবস প্রাতঃকালে ফিরিয়া যাইত। গাড়ীখানা সমস্ত রাত্রি এক পাশে দাড়াইয়া থাকিত। এক দিন প্রাতঃকালে ড্রাইভার গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখে একখানা জলের ওয়াগনের মধ্যে হইতে বিষম শব্দ আসিতেছে। নিয়ম ছিল, সকলকে জল দিবার পর ওয়াগনের দরজা খুলিয়া রাখা। কিন্তু দেখা গেল যে, উহার দরজা বন্ধ। ড্রাইভার তখন আরও ৬।৭ জন লোক সঙ্গে লইয়া উহার ঠিক সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং দরজা খুলিয়া দিলেন। একি ব্যাপার! দরজা খুলিবামাত্র এক বৃহৎ সিংহ লম্ফ দিয়া বাহির হইল। এই ব্যাপার দেখিবামাত্র সকলে উচ্চরবে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই কারণেই বা দিনের আলো দেখিয়াই হউক, সিংহটা কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পলায়ন করিল। খুব সম্ভবতঃ জল পান করিবার জন্য সিংহটা উহার ভিতরে গিয়াছিল, [illegible] কোনও কারণ বশতঃ দরজাটা বন্ধ হইয়া যায়।

প্রায় দেড় মাস পরে সিংহ আবার দেখা দিল। তখন সকলের মধ্যেই বিলক্ষণ আতঙ্কের আবির্ভাব হইল। সাহেব তখন সিংহ ধরিবার এক ফাঁদ প্রস্তুত করাইলেন। উহা দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল—এক দিকে ফাঁদ, অন্য দিকে আর একটি ঘর। উহার মধ্যে প্রত্যহ রাত্রে চারি জন বন্দুকধারী সিপাহী বসিয়া থাকিত। উহা প্রস্তুত হইবার তিন দিন পরে রাত্রি একটার সময় একটা সিংহ ফাঁদে আবদ্ধ হইল। পাশের কামড়ায় সিপাহীরা সিংহের ভীষণ গর্জ্জনে এত ভয় পাইয়া গেল যে, প্রথমে তাহারা একদিকে দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ১০।১৫ মিনিট পরে তাহারা কতকটা স্থির হইয়া বন্দুক চালাইতে লাগিল। তখন পর্য্যন্তও তাহারা সামলাইতে পারে নাই, এইজন্য গুলিগুলা ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছুটিতে লাগিল একটাও সিংহের দিকে গেল না। অবশেষে একটা গুলি সিংহের কামরার একটা গরাদেতে লাগাতে উহা ভাঙ্গিয়া গেল। সিংহ মহাশয় তখন সকলকে রম্ভা প্রদর্শন করিয়া চম্পট দিলেন।

ইহার পর সাহেব প্রায় প্রত্যহই আমাকে সঙ্গে লইয়া সিংহ শিকার করিতে বাহির হইতেন। কিন্তু সমস্ত রাত্রি গাছের উপর বসিয়া থাকায় কষ্ট ভিন্ন আর কিছু লাভ হইল না। এবারেও দুইটা সিংহ আসিয়াছিল, এবং প্রায় প্রতি রাত্রেই কাহাকেও না কাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কয়েক দিবস পরে ব্যাপার আরও ভীষণ হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে, একটা সিংহ বাহিরে অপেক্ষা করিত অপরটা ভিতরে যাইত। এখন কিন্তু দুটাই ভিতরে যাইতে আরম্ভ করিল, এবং প্রত্যেক রাত্রে দুই জন করিয়া লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এইভাবে কত লোক যে সিংহের উদরস্থ হইল তাহা বলা যায় না। শেষে সিংহদ্বয় এতদূর সাহসী হইয়া উঠিল যে, শিকার লইয়া কুটিরের ১০।১৫ গজ দূরে বসিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনেকবার বন্দুক ছোঁড়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহারা কিছুমাত্র ভীত হইত না, বা স্থানত্যাগ করিয়া পলাইত না।

প্রত্যহ এইভাবে লোকক্ষয় হওয়াতে সকলের মধ্যে

অত্যন্ত আতঙ্কের আবির্ভাব হইল। এক দিন তাহারা সকলে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং কহিল যে, সুদূর ভারত হইতে তাহারা সরকারের কাজ করিবার জন্যই আসিয়াছে, সিংহের উদরে প্রবেশ করিবার জন্য নয়। দেশে গিয়া যদি ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি তাহার চারি গুণ বেতনেও এমন স্থানে আর কাজ করিবে না। সাহেব তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। প্রায় ১৫০০ লোক সেই দিনই রেলে চড়িয়া মোম্বাসা ফিরিয়া গেল। আমাদের করিম খাঁও উহাদের সঙ্গী হইল। ইহার পর সাহেবের অনুমতি অনুসারে আমি ও রতি সাহেবের সহিত একত্রে রাত্রিবাস করিতে লাগিলাম। অনেকে ষ্টেসনের পাকা বাড়ীতে আশ্রয় লইল, অনেকে গাছের উপর ঘর প্রস্তুত করিল। এই সময় আমাদের সহিত ১০০র অধিক লোক ছিল না। কাযে কাযেই, রেলের কাজ একবারে বন্ধ হইয়া গেল। তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত অন্য কোনও কাজ না থাকাতে কারিকরেরা ঘর প্রস্তুত করিতে লাগিল। কতকগুলা ঘর গাছের উপর, কতকগুলা উচ্চ মাচানের উপর, এবং কতকগুলা মৃত্তিকার নিম্নে প্রস্তুত হইল।

সাহেব বুঝিলেন যে, সিংহ দুইটা মারা না পড়িলে কুলিরা কেহই আর ফিরিয়া আসিবে না। তিনি প্রথমে মোম্বাসায় আদেশ পাঠাইলেন—যেন কোনও রেলের কুলি বা কারিকরকে ভারতবর্ষে যাইতে দেওয়া না হয়। যতদিন পর্য্যন্ত ইহারা মোম্বাসায় বসিয়াছিল, ততদিন কিন্তু সরকার উহাদিগকে পুরা হারে বেতন দিয়াছিলেন। কাজ করে নাই বলিয়া বেতন কাহারও কাটিয়া লওয়া হয় নাই।

আমাদের সাহেব জেলার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হোয়াইট্-হেড সাহেবকে সিংহ শিকার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হোয়াইট হেড সাহেব লিখিয়া পাঠাইলেন তিনি ডিসেম্বর মাসের ২রা তারিখে রাত্রি ৭টার সময় আমাদের এখানে আসিবেন। গাড়ী সন্ধ্যা ছয়টার সময় সাভো ষ্টেসনে আসিত বলিয়া বড় সাহেব আমাকে ৫টার সময় ষ্টেসনে পাঠাইলেন। ডিসেম্বর মাস ৫টার আগেই সন্ধ্যা হয়। আমি যখন ষ্টেসনের কাছে আসিলাম, তখন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। আমার সঙ্গে রতিকান্ত ছিল। আমাদের দুজনের কাছেই বন্দুক ছিল।

এক রশি দূর হইতে আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, তখনও পর্য্যন্ত ষ্টেসনে আলো দেওয়া হয় নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া আমরা থমকিয়া দাঁড়াইলাম। এই সময়ে অদূরবর্ত্তী একটা ঘর হইতে কেহ বলিয়া উঠিল "ষ্টেসনে যাইওনা, ওখানে সিংহ আসিয়াছে।" ঐ কথা শুনিয়া আমরা দুইজনে সে স্থান হইতে দ্রুতপদে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলাম। ভাগ্যক্রমে, আমরা নিরাপদে ফিরিয়া গেলাম।

রাত্রি ৯।টার সময় হোয়াইট হেড সাহেব আসিলেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত ভীত হইলাম। তাঁহার পোষাক ছিন্ন ভিন্ন, পৃষ্ঠের দক্ষিণ দিকে এক ভীষণ ক্ষত; মুখ শুষ্ক—দেখিলেই বোধ হয় খুব ভয় পাইয়াছেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "এক গ্লাস ব্রাণ্ডি—শীঘ্র!" পুরা এক গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিবার পর যেন তাঁহার দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তাহার পর বড় সাহেব তাঁহার দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি একটা সিগার ধরাইয়া কহিলেন, "গাড়ী আজ লেটে আসিয়াছিল। প্রায় ৮টার সময় আমরা সাভো পঁহুছিলাম। ষ্টেসনে শুনিলাম অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একটা সিংহ ষ্টেসনের মধ্যে আসিয়াছিল। এমন অবস্থা হইয়াছিল যে সকলকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিতে হইয়াছিল প্রায় এক ঘণ্টা কাল চারিদিকে ঘুরিয়া সিংহটা নিজেই চলিয়া যায়। আমার সঙ্গে একজন দেশী চাকর ছিল। ষ্টেসনের সকলেই আমাদিগকে এই রাত্রে ষ্টেসন ছাড়িতে নিষেধ করিল। আমি শুনিলাম না। আমি আগে আগে, পশ্চাতে আমার চাকর লণ্ঠন লইয়া—এই ভাবে কিয়দ্দূর আসিবার পর হঠাৎ একটা সিংহ আসিয়া আমার পৃষ্ঠের উপর পড়িল। আমি অবশ্য এপ্রকার,

ব্যাপারের জন্য একবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আমি পড়িয়া গেলাম, আমার হাতের বন্দুকটা ভরাই ছিল, পড়িয়া গিয়া সজোরে আওয়াজ হইল। সিংহটা বোধ হয় ইহাতে ভয় পাইয়া আমাকে ছাড়িয়া দিল, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে চাকরটাকে লইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার পর আমি যে কেমন করিয়া এত দূর আসিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না।" পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে সাহেব অধিক জখম হন নাই, অল্পে অল্পে নিস্কৃতি পাইয়াছেন। সাভোর সিংহের অত্যাচারের কথা বহু দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর দিন আরও কয়েক জন সাহেব সিংহ শিকার উদ্দেশে আমাদের কাছে উপস্থিত হইলেন।

৬ জন সাহেব ও ১১ জন দেশী (হিন্দুস্থানী) ক্রমাগত পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান ও চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কয়েকবার রাত্রিকালে সিংহদ্বয়কে দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, দুইজন সাহেব শিকার করিতে আসিয়া সিংহের শিকার হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ দিবস বাহিরের সাহেব ও দেশী শিকারীরা সকলেই চলিয়া গেল। সিংহ দুইটার অত্যাচার আবার পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল। প্রায়ই তাহারা দুই একজন করিয়া লোক ধরিয়া লইয়া যাইত। শেষে এমন হইল যে, দিনের বেলায় পর্য্যন্ত তাহারা বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বড় সাহেব যে দিকে থাকিতেন, সে দিকে তাহারা আদৌ যাইত না।

সাহেবেরা চলিয়া যাইবার দুই দিন পরে সন্ধ্যার সময় আমি সাহেবের চা প্রস্তুত করিতেছি, এমন সময় একজন সোয়ালী (এই দেশের অধিবাসী) অতি দ্রুত পদে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "সিম্বা! সিম্বা!" (সিংহ! সিংহ!) সাহেব 'ব্যাপার কি' জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, "আমরা দুইজনে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিলাম। সঙ্গে আমাদের, একটা গর্দ্দভ ছিল। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা সিংহ আসিয়া গাধাটাকে আক্রমণ করে। আমরা পালাইয়া যাই। আমার বোধ হয়, সে সেইখানে বসিয়াই গাধাটাকে খাইতেছে।" সাহেব তখনই রওনা হইলেন। সঙ্গে আমি, রতিকান্ত ও আরও ১০ জন লোক লইলেন। সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রি। চারিদিকের পথ ঘাট বেশ দেখা যাইতেছিল। যখন আমরা ঘটনাস্থলের নিকটে উপস্থিত হইলাম, তখন সাহেব কেবল আমাকে ও রতিকে লইয়া অগ্রসর হইলেন।

কিয়দ্দূর গমনের পর আমরা হাড় চিবাইবার ঘড় ঘড় শব্দ বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। আমরা খুব সন্তর্পণের সহিত চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা শুষ্ক ডাল আমি মাড়াইয়া ফেলাতে 'মট্' করিয়া শব্দ হইল। সিংহটা তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ হইল। প্রায় ৫।৭ মিনিট সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু আর কোনও শব্দ শুনা গেল না। তখন সাহেব সঙ্গের সকলকে আহ্বান করিলেন এ প্রকার ঘটনার জন্য বোধ হয় তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কারণ দেখিলাম, আমাদের সঙ্গের লোকেরা কয়েকটা বড় বড় মশাল ও ঢোল লইয়া গিয়াছে। অবিলম্বে আরও কয়েকজন লোক সংগ্রহ করা হইল। ইহারা সকলে মশাল জ্বালিয়া খানিকটা স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া সাহেবের নিকট হইতে প্রায় ২॥ ফার্লং দূরে উপস্থিত হইল, এবং ঢোল বাজাইতে বাজাইতে ও সজোরে চীৎকার করিতে করিতে আবার সাহেবের দিকে আসিতে লাগিল। সাহেব যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল। সিংহটা নিকটেই কোথাও লুকাইয়া ছিল। ঐ ভীষণ শব্দে সে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া সাহেবের দিকে আসিতে লাগিল। একটা গাছের আড়ালে সাহেব ও আমরা দুইজনে দাঁড়াইয়াছিলাম। সিংহটা যখন প্রায় ২০ গজ দূরে উপস্থিত হইল, তখন সাহেব লক্ষ্য স্থির করিয়া বন্দুক ছাড়িলেন। কিন্তু একি! আওয়াজ হইল না। কেবল বারুদটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সিংহটা অবশ্য এতক্ষণ আমাদিগকে দেখে নাই। এইবার তাহার নজর পড়িল। তাহার পশ্চাতে যদি এই সময় লোক গুলা ভীম রবে চীৎকার না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় সে তাহাদিগকে আক্রমণ করিত। কিন্তু তাহা না

করিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং অনুচ্চস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

সাহেবও এই আকস্মিক ঘটনায় যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সেইখানে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু রতিকান্ত ব্যাগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "আর একটা নল রহিয়াছেত, এইবার সেইটা চেষ্টা করুণ। সেটায়ও যদি আওয়াজ না হয়, তাহা হইলে আমার এই ভরা বন্দুকটা লইবেন। কিন্তু শীঘ্র করুন।" সাহেবের যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে লক্ষ্য স্থির করিয়া দ্বিতীয় ব্যারেলটা চালাইলেন। ভীষণরবে শব্দ হইল। সিংহটা ও অতি ভীষণ ভাবে একবার গর্জ্জন করিয়া জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইল। সে দিন তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

পরদিন দিনের বেলায় আমরা নিহত ও অর্দ্ধ ভক্ষিত গাধাটাকে বাহির করিলাম। সাহেব উহাকে সরাইলেন না। বলিলেন, "সিংহ নিশ্চয়ই আজ রাত্রে ইহা খাইতে আসিবে। আমি মাচানের উপর তাহার অপেক্ষায় থাকিব।" কিন্তু মাচান বাঁধা যায় কোথায়? নিকটে কোনও বড় গাছ ছিলনা। তিনি কিন্তু মৎলব ছাড়িলেন না। চারি কোণে চারিটা খোঁটা পুতিয়া তাহার উপর মাচান বাঁধা হইল। উহার উচ্চতা প্রায় ৮ হাত হইল। দুইজন লোক তাহাতে অনায়াসে বসিতে পারে—তাহার উপযুক্ত স্থান রাখা হইল।

এ দিন ঠিক সন্ধ্যার সময় তিনি রতিকে সঙ্গে লইয়া মাচানের উপর আরোহন করিলেন। এই ঘটনার কথা পরে রতির মুখে যেমন শুনিয়াছিলাম, তাহা এইঃ—রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত কাহারও সাড়াশব্দ পাইলাম না। সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে তখন কি যে নিস্তব্ধতা তাহা আর কি বলিব। আমরাও দুজনে নীরবে বসিয়াছিলাম। রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটার সময় জোৎস্না ডুবিয়া গেল। চারিদিক একবারে গভীর অন্ধকারে ভরিয়া গেল। এই সময় বোধ হয় আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সাহেব আস্তে আস্তে আমার গায়ে হাত দেওয়াতে আমি চাহিয়া দেখিলাম। সাহেব একদিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইলেন। দেখি, আমাদের মাচানের নীচেই দুইটা বড় বড় চক্ষু যেন বিদ্যুতের মত চমকাইতেছে। সাহেব খুব অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সিংহ! নড়িওনা।" তখন বুঝিলাম সিংহ শিকার করিতে আসিয়াছি এখন সিংহ আমাদিগকে শিকার করিবার উপক্রম করিতেছে। মাচানটা নিতান্ত কম মজবুত। উচুও বেশী নয়। সিংহটা যদি লম্ফ দেয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। এই সময় সাহেব বন্দুক চালাইলেন। সিংহটা গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইল। কিন্তু অদুরেই আমরা তাহার যন্ত্রণাসূচক কাতরধ্বনি শুনিতে পাইলাম। দুই এক মিনিট পরে উহা ক্রমে ক্রমে নীরব হইল।"

আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সাহেব উপর্য্যুপরি দুইবার বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। ইহা তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত। আমরা প্রায় ১৫ জন লোক নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিলাম। উহা শুনিবামাত্র আমরা সকলে মশাল লইয়া ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে মাচানের নিকট উপস্থিত হইলাম। সাহেব ও রতি নীচে নামিয়া আসিলে আমরা শুনিলাম যে, একটা সিংহ হত হইয়াছে। তাঁহার নির্দ্দেশ মত আমরা জঙ্গলের মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে প্রবেশ করিলাম, এবং দেখিলাম, অদূরে সিংহটা পড়িয়া আছে। প্রথমে আমরা কয়েকটা ঢিল ছুড়িলাম, এবং যখন বুঝিলাম যে সে সত্য সত্যই সিংহ লীলা শেষ করিয়াছে তখন আমরা তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। সে রাত্রে আমাদের সকলের কি আমোদ, কি স্ফূর্ত্তি! সে রাত্রে কেহই ঘুমাইলাম না। নাচ, গান, তামাসায় কাটিয়া গেল। কুলীরা সাহেবকে স্কন্দের উপর বসাইয়া নাচিতে নাচিতে তাহার শিবিরে উপস্থিত হইল।

পরদিবস দেখা গেল যে, সিংহটা তাহার মস্তক হইতে লেজ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৯ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং উহার উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট। ইহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে ইহা কি প্রকার প্রকাণ্ড ছিল। সাহেব যদি নিবারণ না করিতেন, কুলিও অন্যান্য সকলে উহার দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিত। পিশাচ যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

সেকালের বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা ও বঙ্গসমাজ।*

সে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা। তখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে খ্রীষ্টান মিশনারিদিগের প্রভাব। মিশনারিরা মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন করিয়া, বর্ণমালার পুঁথি ছাপাইয়া, সাহিত্য ও ব্যাকরণ লিখিয়া, অভিধান বাহির করিয়া, বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষা শিক্ষা দিতেছিলেন। বাঙ্গালী তখন বাঙ্গালা লিখিতে পারিত না, ছাপার পুঁথিও ভাল করিয়া পড়িতে পারিতন। বাঙ্গালা উন্নত গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা মুন্সি রামমোহন সব কালেক্টরের মুন্সিখানার দেওয়ানী ছাড়িয়া বেদান্ত দর্শন ও উপনিষদের অনুবাদ করিতে করিতে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের মক্স করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রভাকরের গুপ্ত কবি "রাতে মসা দিনে মাছি" তাড়াইয়া কলিকাতায় বর্ণমালা শিক্ষা করিতেছিলেন; "আলালী ভাষার" জন্মদাতা টেকচাঁদ তখন সবে হাটি হাটি পা পা করিয়া চলিতে শিখিতেছিলেন; বাঙ্গালা 'শিশু শিক্ষার' রচয়িতা মদন মোহন জননীর ক্রোড়ে স্তন্য পানে রত, তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জননীর জঠরে অবস্থিত; বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তি ও সম্পদ দাতা অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই—বাঙ্গালা সাহিত্যের তেমন দুর্দিনে—মুসলমানী বাঙ্গালায় লিখা কবিওয়ালা রাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য,' ও গোলক বসুর "হিতোপদেশ"ই ছিল যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; চণ্ডীচরণের "তোতার ইতিহাস"ই যখন ছিল বাঙ্গালা ভাষার আদরের জিনিস; বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী ও বঙ্গ সাহিত্যের মুখ রক্ষার জন্য যখন উৎকলী পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তেমনি উৎকলী দণ্ড ভাঙ্গা "অতি উৎকট মহা শব্দটী" ভাষায় বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা দেখাইয়া নবাগত সিভিলিয়ান বিচারপতি দিগকে ভীত করিতেছিলেন—বঙ্গ সাহিত্যের তেমন শোচনীয় দিনে—বাঙ্গালার একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ কলিকাতা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। সে পত্রের নাম—

"বেঙ্গল গেজেট।"

বেঙ্গল গেজেটের সেই ভট্টাচার্য্য সম্পাদকের নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালা ১২২৩ সালে, ইংরেজী ১৮১৬ অব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য খ্রীষ্টান মিশনারিদিগের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। এজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা সগর্ব্বে বলিতে পারি যে বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন বাঙ্গালী!

'বেঙ্গল গেজেট' উঠিয়া গেলে ১৮১৮ অব্দের এপ্রিল মাসে মার্সম্যান প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিসনারিগণ শ্রীরামপুর হইতে "দিগ্দর্শন" নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ও গবর্ণমেণ্ট দপ্তরে মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার কার্য্য রীতিমত চলিতেছিল। ভট্টাচার্য্য গঙ্গাধর সেই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হইয়াই পত্রিকা পরিচালনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি, অবগত হইবারও এখন কোন উপায় নাই। কিন্তু মার্সম্যান সাহেবেরা "দিগ্দর্শন" বাহির করিয়া যে বিপদ গণিতেছিলেন তাহা উক্ত মার্সম্যানের স্বলিখিত বৃত্তান্ত হইতেই অবগত হওয়া যায়।

"দিগ্দর্শন" বাহির হইলে মিসনারি দিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। কেরীসাহেব গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে পত্রিকা বাহির করিবার বিরোধী ছিলেন। "দিগ্দর্শন" বাহির হইবার পর যখন গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন প্রতিবাদ বা কৈফিয়ৎ তলপ' হইল না, তখন মার্সম্যান একখানা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রও বাহির করিতে উৎসুক হইয়া পড়িলেন। ইহাতেও কেরীসাহেব বিরোধী হইলেন। শেষ আপোষ মীমাংসায় পত্রিকা বাহির করাই স্থির হইলে মার্সম্যান ঐ সনের ২৩শে মে শ্রীরামপুর হইতেই সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ" বাহির করেন।

* উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের রঙ্গপুর অধিবেশনে পঠিত।

'সমাচার দর্পণ' বাহির হইলে মার্সম্যান তাহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া একখানা দর্পণ সহ ঐ অনুবাদ গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব হেষ্টিংস নিকট পাঠাইলেন তিনি তাহা পাঠ করিয়া মার্সম্যানকে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করেন এবং ১৮১৮ অব্দের ১৯শে আগষ্ট পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার কঠোর প্রথা উঠাইয়া দিয়া সাহিত্যচর্চ্চা ও সাময়িক পত্রিকা পরিচালনের পথ সুগম করিয়া দেন।

'দিগ্দর্শন' মাসিক পত্রে রামমোহন রায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন, এই সময় মিসনারিদিগের সহিত তাঁহার বেশ, সৌহৃদ্য ছিল। ১৮১৯ অব্দে কলিকাতার মিসনারিরা "গস্পেল ম্যাগাজিন" নামে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বপূর্ণ একখানা মাসিক পত্র বাহির করেন, এই পত্রে ও 'সমাচার দর্পণে' হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথা প্রকাশিত হইতে থাকিলে রামমোহন রায় "সংবাদ কৌমুদী" নামে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে "ব্রাহ্মণ সেবধী" নামে আর একখানা মাসিক পত্র বাহির করিয়া তাহাতে মিসনারিদিগের পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের প্রতিবাদ করেন।

এই সময় রামমোহন রায় বেদান্ত প্রতিপাদ্য একেশ্বর-বাদ হিন্দু-সমাজে প্রচার করিতে উদ্যত হন। "সংবাদ কৌমুদীতে"এই মত প্রচারিত হইতে থাকিলে,হিন্দুসমাজে মহাবিপ্লবের সূচনা হয়। অপরদিকে উইলিয়ম এডাম্ নামে তাঁহার জনৈক খ্রীষ্টান বন্ধুকে তিনি একেশ্বরবাদে দীক্ষিত করেন। এই কার্য্যে মিসনারিদিগের সহিতও তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময় তাঁহার সতীদাহ-নিবারণ বিষয়ক প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে আলোচিত হইতেছিল; এই তিন দিক রক্ষা করিবার জন্য তিনি "সংবাদ কৌমুদীতে" প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 'সতীদাহ নিবারণের' সপক্ষে ও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিপক্ষে যখন কৌমুদীতে প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল তখন তাঁহার সহকারী বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "সংবাদ কৌমুদীর" কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেবের দলে যাইয়া, হিন্দু সমাজের দল ও বল বৃদ্ধি করিলেন। সহমরণ প্রথার সমর্থন জন্য ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া রাজা রাধাকান্তদেব হিন্দু ধর্ম্ম সভা হইতে "সমাচার চন্দ্রিকা" সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন।

এই দলাদলি উপলক্ষে আরও দুইখানা সংবাদ পত্রিকা ও কয়েকখানা পুস্তক পুস্তিকার উদ্ভব হইয়াছিল। এই পত্রিকাদ্বয়ের একখানা কৃষ্ণমোহন দাসের "সংবাদ তিমির নাশক," অপরখানা নীলরতন হালদারের "বঙ্গদূত"।

উভয় পক্ষ দশ বৎসরের অধিককাল এইরূপ মত-বিরোধের তুমুল তর্কে আত্ম-নিয়োগ রাখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের জীবনসঞ্চারে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই দলাদলি চলিত থাকা কালেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সুপ্রসিদ্ধ "সংবাদ প্রভাকর" সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়; এবং বঙ্গ সাহিত্যকে রসসিঞ্চনে সজীব করিয়া তুলিতে থাকে।

প্রাগুক্ত দলাদলির সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব হইলেও ঐ সকল দুরূহ ধর্ম্মকথার বাদ প্রতিবাদে তিনি যোগদান করিলেন না; পরন্তু তিনি সকল সমাজের উপরই ব্যঙ্গ করিয়া কাব্য গড়িতে লাগিলেন।

বলিতে গেলে ঈশ্বর গুপ্তই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছিলেন। 'প্রভাকরের" হাস্য ও ব্যঙ্গ-রসের লেখাই ছিল সেই আকর্ষণের বিষয়। ঈশ্বর চন্দ্র যে শুধু বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের প্রতিই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছিলেন তাহা নহে; বাঙ্গালা সাহিত্যের এক যুগ প্রবর্ত্তন এবং সেকালের সাহিত্য সমাজ গঠন এ দুটীও তিনি প্রভাকরের সাহায্যে করিয়াছিলেন।

এই যে আমরা আজ সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছি, এইরূপ সাহিত্য-সম্মিলন, বান্ধব সম্মিলন বা পূর্ণিমা সম্মিলনের ন্যায় অনুষ্ঠান ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম করিয়াছিলেন। ১২৫৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'প্রভাকর' কার্য্যালয়ে এইরূপ একটী সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। তিনি সহরের এবং মফঃস্বলের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে ও পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মিলনে উপস্থিত করিতেন। সম্মিলনে প্রবন্ধাদি পাঠ, আলাপ পরিচয় ও ভোজের ব্যবস্থা ছিল।

এই সময় অক্ষয়কুমার দত্ত ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তৎপর অক্ষয়কুমারের ন্যায় কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যকার দীনবন্ধু ও মনোমোহন, কাঙ্গাল হরিনাথ, সোমপ্রকাশের দ্বারকানাথ, হতভাগ্য কবি দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতিও 'প্রভাকরের' দপ্তরে শিক্ষানবীশ ও ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য হইয়াছিলেন।

সাহিত্য জগতে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব প্রকৃতই মৃত বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাণে এক নবীন উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাকরের পদানুসরণে অল্পকাল মধ্যেই প্রায় ২০।২৫ খানা সাময়িক পত্র বাহির হইয়া পড়িল, এবং কোন কোন পত্র বাহির হইয়া বঙ্গ সাহিত্যে অভিনব কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করিল। বঙ্গ সাহিত্যে এই সমবেত উদ্যম বঙ্গ-ভাষার পক্ষে প্রচুর কল্যাণকর হইয়াছিল—মৃত বঙ্গভাষাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাজ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিল ?

১৮৩০ অব্দে 'প্রভাকর' প্রকাশিত হইবার পরই প্রেমচাঁদ রায় "সংবাদ সুধাকর" ও ব্রজমোহন সিংহ "সংবাদ রত্নাকর" বাহির করেন। ১৮৩১ সনে বেণীমাধব দের "সার সংগ্রহ," প্রসন্নকুমার ঠাকুরের "অনুবাদিকা," মৌলবী আলি মোল্লার "সমাচার সভা রাজেন্দ্র," দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির "জ্ঞানান্বেষণ", পি রায়ের "সংবাদ সুধাকর" প্রভৃতি ৫।৬ খানা পত্রিকা বাহির হয়।

১৮৩২ সনে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়লঙ্কারের 'শাস্ত্র-প্রকাশ", গঙ্গাচরণ সেনের "বিজ্ঞান সেবধিশ", জ্ঞানচন্দ্র মিত্রের "জ্ঞানোদয়", মহেশচন্দ্র পালের "সংবাদরত্নাবলী", এবং "পাশাবলী" প্রভৃতি আরও ৬।৭ খানা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

এই সময় রাজধানী কলিকাতায় পত্রিকা প্রচারের এইরূপ ধুম থাকিলেও সুদূর মফঃস্বলে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থান এবং হুগলী, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ ব্যতীত বিশাল বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানেই এই সকল পত্রিকা যাওয়া দূরে থাকুক, ছাপার পুঁথিও প্রবেশ করিতে পারে নাই। দেশের এই অবস্থা উল্লেখ করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের সেই একেশ্বরবাদে দীক্ষিত বন্ধু উইলিয়ম এডাম্ গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে দেশে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করেন। উইলিয়ম এডামের এই প্রস্তাব সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল আলোচনা করিয়া উক্ত এডামকেই এবিষয়ের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী এডাম তাহার প্রথম রিপোর্ট প্রদান করেন। এই রিপোর্টে বাঙ্গালা দেশের পল্লিগ্রাম সমূহে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাদানের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল তাহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছিল।

ঐ সনেই সার চার্লস মেটকাফ্ গবর্ণর জেনারেল হন। এডামের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান তখনও চলিতেছিল। মেটকাফ্ পূর্ব্ব হইতেই মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। তিনি গভর্ণর জেনারেল হইয়াই ১৮৩৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে বঙ্গীয় মুদ্রা যন্ত্রগুলি অবিশ্রাম পত্রিকা প্রসব করিতে লাগিল। এই বৎসরই বেণীমাধব দের "সংবাদ সংগ্রহ", হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়", কালীশঙ্কর দত্তের "সংবাদ সুধা-সিন্ধু" প্রভৃতি কতকগুলি পত্রিকা বাহির হইল।

ইহার পর "সংবাদ দিবাকর," "সংবাদ গুণাকর", "সংবাদ সৌদামিনী', "সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়", "ভৃঙ্গদূত" "সংবাদ অরুণোদয়", "সুজন রঞ্জন", প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বাহির হইলে পর, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ "সংবাদ ভাস্কর" ও "সংবাদ রসরাজের" আবির্ভাব হয়।

১৮৩৮ সনের ২৮শে এপ্রিল এডাম্ সাহেবের শেষ রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হয়। ঐ রিপোর্টে আপাততঃ তখন কোন ফল না ফলিলেও বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রগুলি সে সময় অবিশ্রান্ত পত্রিকা প্রসব করিতে থাকায়, রাজ-পুরুষদিগের বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যুগপৎ কৃপা ও সম্ভ্রম দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। ফলে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা ভাষাকে পার্শি ভাষার পদে অভিষিক্ত করিয়া সম্মানিত করিলেন; পার্শি ভাষা

বাঙ্গালার রাজকীয় দপ্তর হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

গবর্ণমেণ্ট মৃত বঙ্গভাষাকে রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, ঐ সনের জানুয়ারী হইতেই মার্সম্যান সাহেবের সম্পাদকতায় "বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট গেজেট" ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুগ্রহ লক্ষণ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রদর্শন করিলেন এবং ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গদেশ যুড়িয়া ১০১টী বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করতঃ এডামের রিপোর্টের সম্মান রক্ষা করিলেন।

"সংবাদ ভাস্কর", এবং "সংবাদ রসরাজ" আবির্ভূত হইয়াই 'সংবাদ প্রভাকরের" সহিত তুমুল সাহিত্যিক কুরুক্ষেত্রের সূচনা করেন।

"রসরাজের" সম্পাদক ছিলেন "প্রভাকরের" লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্য সুহৃদ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, "ভাস্করের" ও তিনিই সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন।

ভাস্করে প্রথমে বেশ সুরুচি সঙ্গত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। "রসরাজের" সহিত "প্রভাকরের" সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেলে "প্রভাকর" "ভাস্কর" উভয়ই পঙ্কে নিমগ্ন হইতে থাকেন। তখনকার এই সকল রচনা পাঠ করিয়া ইংরেজী শিক্ষিত বাবুরা নাসিকা কুঞ্চিত করতঃ বাঙ্গালা রচনা অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন।

এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্বে "প্রভাকর" পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে বুঝিয়া, গুপ্ত কবি রসরাজের সহিত দ্বন্দ্ব পাকাইয়া তুলিবার জন্য "পাষণ্ড পীড়ন" নামে আর একখানা অভিনব পত্রিকা বাহির করেন। তখন "রসরাজ" ও "পাষণ্ড পীড়নে" যে উত্তর প্রত্যুত্তর লিখিত হইত। তাহার উল্লেখ করিয়া সেকালের একজন সুধী পাঠক লিখিয়াছেন —'সে অভদ্র অশ্লীল ব্রীড়াজনক উক্তি প্রত্যুক্তির বিষয় স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়। ইহাতে বঙ্গসাহিত্য জগতে এরূপ অশ্লীলতার স্রোত বহিয়াছিল যাহার অনুরূপ নিকৃষ্ট রুচি আর কোনও দেশের ইতিবৃত্তে দেখা যায় না।"

১৮৩৯ সনের জানুয়ারী হইতে বাঙ্গালা ভাষা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে রাজকীয় কার্য্যালয় সমূহে দ্বিতীয় ভাষা রূপে গৃহীত হইলে, তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অল্পে অল্পে দেশীয় জনগণের মনে হইতে লাগিল।

সে সময়ে বাঙ্গালার পল্লিগ্রাম সমূহে দেশীয় ভাষা শিক্ষার অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় ছিল তাহা উইলিয়ম্ এডামের রিপোর্টেই প্রকাশিত হইয়াছিল। সুদূর মফস্বলে সে সময় বঙ্গভাষার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবেশ না করিলেও রাজধানীতে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এবং মিসনরিদিগের অবস্থিতির স্থান সমূহে তাঁহাদিগের চেষ্টায় লোকে বাঙ্গালা শিখিতে ও বাইবেলের মুদ্রিত উপদেশ পাঠ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে কলিকাতার এই রাশি রাশি বাঙ্গালা পত্রিকার ও ২।১ খানা সেই সেই স্থানে গৃহীত ও পঠিত হইত।

এই সমস্ত পাঠক উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোক ছিলেন, তাহার কারণ উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজীনবীশেরা তখন বাঙ্গালা ভাষা পড়িত না; সে ভাষায় যে পাঠ করিবার ও জানিবার কিছু আছে, তাহা বিশ্বাস করিত না।

এই সময় বঙ্গীয় সমাজের রুচি কবির টপ্পা ও খেয়ালের উপরই আবদ্ধ ছিল। অশ্লীল গালাগালি, কবির লড়াই, চুটকী খেউর সাধারণের পাঠের ও উপভোগের সামগ্রী ছিল। সমাজের এইরূপ অবস্থায় কিরূপ ভাবে পত্রিকা চালাইলে অধিকাংশ লোকে পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া পত্রিকা পড়িবে এবং তাহাতে পত্রিকার ও পরমায়ু বৃদ্ধি হইবে, ইহা যিনি না বুঝিয়া পত্রিকা চালাইতে অগ্রসর হইয়াছেন—পৈত্রিক অর্থের জোর না থাকিলে তিনি পত্রিকা চালাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই জন্য 'প্রভাকর' ও "ভাস্করের' পূর্ব্বে যতগুলি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মিসনারিদিগের "সমাচার দর্পণ" রাজা রামমোহন রায়ের "সংবাদ কৌমুদী" ও রাধাকান্ত দেবের "সমাচার চন্দ্রিকা" ব্যতীত কোন পত্রই দীর্ঘজীবী হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্ত ও তদীয় বন্ধু গৌরীশঙ্কর সমাজের অবস্থা ও রুচি প্রত্যক্ষ করিয়াই "প্রভাকর" ও "ভাস্কর" "রসরাজ" ও "পাষণ্ড পীড়নকে" সেই সাময়িক রুচির স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এবং তাহাতেই বোধ হয় তাঁহারা আমরণ তাঁহাদের পত্রিকাগুলিকে জীবিত রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

'প্রভাকর" ও "ভাস্কর" প্রভৃতি পত্রিকা যে কেবল অশ্লীল ও কুরুচি সম্পন্ন লেখায় পূর্ণ থাকিত তাহা নহে এই উভয় পত্রে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক লেখক ছিলেন। এই পত্রিকাগুলিতে এবং সে কালের অন্যান্য পত্রিকায় উচ্চ নীতি কথাও যথেষ্ট থাকিত--তথাপি সে কালের শিক্ষিত লোক ও ইয়ংবেঙ্গলের দল বাঙ্গালা পত্রিকা অপাঠ্য বলিয়া ত্যাগ করিতেন। বাঙ্গালা বুলি মুখে আনা অসভ্যতা মনে করিতেন। তাহার কারণ সে কালের আদর্শ।

১৮১৭ অব্দের ২০ জানুয়ারী হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলেই সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহাদিগের ছেলেদিগকে ইংরেজী শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করেন। এই শিক্ষার ফল সে কালে এই হইয়াছিল যে যুবকেরা যাহা কিছু ইংরেজের আচরণীয় তাহাই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিল। ইংরেজী কায়দায় চলা, ইংরেজী কায়দায় বলা, ইংরেজী ধরণে স্নান, ইংরেজী সুরে গান, ইংরেজের মত চাওয়া ও টেবিলে বসিয়া খাওয়া—এমন কি স্কুল কামাই করিয়া মদ্যপান করাও যুবকেরা সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া অভ্যাস করিল।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সেই যুগের একজন "এজু"। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন উহাতে দোষ নাই। আমি কালেজের গোলাদিঘাতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিক কবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদিঘীর রেল টপকাইয়া উক্ত কবাব কিনিয়া আনিয়া আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কার্য্য মনে করিতাম।"

এই সময় বসু মহাশয়ের বয়স ছিল ১৫।১৬বৎসর মাত্র। এই বয়সে তিনি পাছে অপরিমিত মদ্যপায়ী হইয়া উঠেন, সে জন্য রাজ নারায়ণ বাবুর পিতা তাঁহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া বসিয়া নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় মদ্যপান করিতেন।

ইংরেজের আচরণ অনুকরণ করাই তখনকার সভ্যতার লক্ষণ ছিল। তাই সে কালের যুবকগণ দেশীয় প্রথা, দেশীয় ভাব, দেশীয় ধর্ম্ম, দেশীয় ভাষা এমন কি পিতামাতা আত্মীয় স্বজনকে দেশীয় ডাকে ডাকা পর্য্যন্ত অসভ্যতা মনে করিতেন।

এই রকম যখন দেশীয় যুবকগণের মনে সংস্কার দাড়াইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে ব্যবস্থা সচিব মেকলে সাহেব তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্যে প্রচার করিলেন :—That a single shelf of a good Europian library was worth the whole native literature of India and Arabia."

মেকলের এই উক্তি আলোচনা করিতে যাইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "বলা বাহুল্য কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, প্রভৃতি হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তঃকরণে মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যে কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্ব্বত্র ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন, বলিতে লাগিলেন যে—এক্ সেল্ফ ইংরেজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই"।

কেবল যে সে কালের ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুকালেজের যুবকেরাই এইরূপ চাল অবলম্বন করিলেন তাহা নহে, সংস্কৃত কালেজের পড়ুয়ারা ও সময়ের গুণে দেশীয় ভাব বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পণ্ডিত মদনমোহন তর্কলঙ্কার মহাশয়ের কথাই উল্লেখ করিতেছি তিনি তখন সংস্কৃত কলেজে পরিতেন, কিন্তু কোট পেণ্টুলন না পড়িয়া কোথাও যাইতেন না। স্বর্গীয় রাজ নারায়ণ বসু মহাশয় তাহার এই সময়ের মালদহ ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনায় লিখিয়াছেন—তর্কালঙ্কার মহাশয় একটী হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন কোট ও পেণ্টুলন পরা, হাতে বন্দুক কিন্তু মাথায় টিকি ফরফর্ করিয়া বাতাসে উড়িতেছে। দৃশ্যটা দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছিল।"

বাঙ্গালার নবীন উদীয়মান যুবক দলের যখন মনের ভাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল; তখন অপুষ্ট অব্যক্ত ভাষায়

লিখিত সেকালের বাঙ্গালা পত্রিকা--বিশেষতঃ "প্রভাকর." "ভাস্কর," "রসরাজ,"ও "পাষণ্ড পীড়নের খেয়াল" কাব্য" যে তাহাদিগের ঘৃণার সামগ্রী হইবে তাহার কি আর কথা আছে ?

ইহাদের সকলেই যে দেশীয় ভাষাকে ঘৃণা করিতেন ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা নহে। কাহারও কাহারও প্রাণে স্বদেশ হিতৈষণার ভাবও বিলক্ষণ ছিল। বাবু রামগোপাল ঘোষ ছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন। ইনি, বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনে মিলিত হইয়া দেশী ভাষায় জ্ঞান সংগ্রহ ও দেশী সাহিত্যকে উন্নত করিতে "জ্ঞানান্বেষণ" নামে একখানা পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ইহারা কেহই বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন না সুতরাং 'জ্ঞানান্বেষণ" ইংরেজী বাঙ্গালা দ্বিভাষিক-রূপেই চলিয়াছিল।

"জ্ঞানান্বেষণ" উঠিয়া গেলে ইহারাই "Bengal Spectator" বাহির করেন; এখানাও ইঙ্গ-বঙ্গ দ্বিভাষিক ছিল। এই ইঙ্গ বঙ্গের দল বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের বাগান বাটীতে সাহিত্য সম্মিলনী সভা করিয়া মাতৃভাষার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলে, হিন্দু কলেজের অপর ছাত্র রসিককৃষ্ণ "জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ," হিন্দু কলেজের আর কতিপয় যুবক "সর্ব্বরস রঞ্জিনী" ও হিন্দু কলেজের পণ্ডিত জ্ঞানচন্দ্র মিত্র "জ্ঞানোদয়" পত্রিকা বাহির করিয়া বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিতে অপরাপর ছাত্রদিগকে আহ্বান করেন। ইহার কিছুকাল পরে হিন্দু কলেজের ছাত্র সীতানাথ ঘোষও "জগবন্ধু" পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন।

মোটকথা, বাঙ্গালার উচ্চ শিক্ষিত লোকদিগের অনেকেরই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা পত্রিকার প্রতি ঘৃণার ভাব ছিল। ঐ ভাব "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রচারের পরে অনেকটা মন্দীভূত হইতে থাকে।

"সংবাদ ভাস্কর" ও "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" প্রচার কালের মধ্যে উপর্য্যুক্ত Bengal Spectator," জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ," "সর্ব্বরস রঞ্জিনী" ও "জ্ঞানোদয়" ব্যতীত ভবানী চট্টোপাধ্যায়ের "জ্ঞানদীপিকা," শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারত বন্ধু." নীলকমল দাসের "ভৃঙ্গদূত" অক্ষয়কুমার দত্তের "বিদ্যাদর্শন," শ্রী নারায়ণ রায়ের "অয়নবাদ দর্শন" প্রভৃতি আরও কয়েকখানা সাময়িক পত্রিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় উদ্ভূত হইয়া লয় পাইয়া যায়। অতঃপর "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার"আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্যে নূতনযুগ প্রবর্ত্তিত হয়।

রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত দেশ হিতৈষী ব্যক্তিগণ দেশী ভাষাকে ঘৃণা না করিলেও দেশীয় পত্রিকার অপরিপুষ্ট ভাষা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' যখন দেখা দিল তখন এই সকল লোক তাঁহার ভাষা পাঠ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বাহির হইলে অনেক উচ্চ শিক্ষিত যুবক বুঝিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা ভাষাতেও গভীর ভাব প্রকাশ করা যায় এবং তাহারও একটা শক্তি আছে। কিন্তু তথাপি তাঁহারা তাহার চর্চ্চায় অধিক অগ্রসর হইলেন না; বরং ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেই অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিলেন। তাহার কারণ বাঙ্গালা প্রবন্ধ ইংরাজেরা পড়িতেন না, ইংরেজী প্রবন্ধ তাঁহারা পড়িতেন এবং উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ হইলে লেখককে প্রচুর সম্মানিতও করিতেন। এইরূপ প্রলোভনের কয়েকটা কারণ ও তখন ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটী বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্তি।

হিন্দুকালেজের "এজু" দিগের মধ্যে কিশোরীচাঁদ ছিলেন একজন। তিনি ১৮৪২ অব্দের "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় "রাজা রামমোহন রায়" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী হেলিডে সাহেব কিশোরীচাঁদকে ডাকাইয়া নাগোরের ডিপুটী মেজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। এইরূপ ভাবী প্রলোভনে সেকালের "এজুর" দল প্রায় সকলেই ইংরেজী রচনারদিকে অধিকতর নিবিষ্ট ভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অনেকেই উচ্চপদলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যাহারা কোন চাকুরীর প্রত্যাশী ছিলেন না তাহারাও সম্মান

লাভের জন্য ইংরেজী লিখিয়া ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করিতে লাগিলেন, রাজনারায়ণ বসু তাহার অনুসরণ করিলেন; মধুসূদন দত্ত ইংরেজীতে কবিতা লিখিতেছিলেন এইবার "Captive Lady" লিখিতে আরম্ভ করিলেন; এই পরিবারের গোবিন্দ দত্ত "Cherry Blosom" ও শশীদত্ত "Vision of Smeru" লিখিয়াছিলেন, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মনু সংহিতার ইংরেজী অনুবাদ করিতে লাগিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, "এসিয়াটিক সোসাইটীর" "জার্ণেলে" ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। ভোলানাথ চন্দ, রাজেন্দ্র দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বানার্জি সকলি ইংরেজীতে লিখিতে লাগিলেন।

"তত্ত্ববোধিনীর" প্রচারের পর যখন ইহাদেরও কেহ কেহ অল্পে অল্পে আসিয়া বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের সে দুর্দ্দিন ক্রমেই অপসারিত হইয়া যাইতে লাগিল।

ব্রাহ্মসমাজ হইতে "তত্ত্ববোধিনী" বাহির হইলে হিন্দুসমাজে আন্দোলন উপস্থিত হয়। হিন্দুদিগের সভা সমিতিগুলি হইতে "নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা," 'ধর্ম্মরাজ', "হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়," "হিন্দু বন্ধু" প্রভৃতি পত্র বাহির হইতে থাকে। এই সকল পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রীষ্ট সমাজ—উভয়সমাজের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে, তখন খ্রীষ্টান মিসনারীদিগের পক্ষ হইতে রেভারেণ্ড ডবলিউ স্মিথ "সত্যার্ণব," এম টাউন সেণ্ড "সত্যপ্রদীপ" রেভারেণ্ড জে, ওয়েঙ্গার 'উপদেশক," "ইবেঞ্জিলিষ্ট' প্রভৃতি পত্রিকা বাহির করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাধান্য ঘোষণা করিতে থাকেন। মুসলমান সাহিত্যিকগণও বসিয়া রহিলেন না, তাঁহারা মৌলবী রজবালীকে সম্পাদক করিয়া "জগদ্দীপক ভাস্কর" বাহির করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান সমস্ত সমাজই যখন স্ব স্ব চিন্তা ও ভাব বঙ্গভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন তখন বাঙ্গালা সাহিত্য অল্পে অল্পে ভাব প্রকাশক হইয়া শক্তিশালী হইতে লাগিল।

এই দলাদলির সময়ই পাষণ্ড পীড়ন, দুর্জ্জন-দমন মহানবমী, কাব্যরত্নাকর, ভৈরব দন্ড, আক্কেল গুড়ুম, রস মুদ্গার, রস সাগর' প্রভৃতি আরও কতকগুলি অভিনব পত্রিকা জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্র বন্ধনে কাষ্ঠ বিড়ালীর সাহায্যের ন্যায় বঙ্গ ভাষার সাহায্য করিয়াছিল।

আধুনিক সুধী লেখকগণ আমাদের শেষ উল্লিখিত পত্রিকাগুলিকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক প্রভাকর, ভাস্কর, ও রসরাজের ন্যায় এগুলির অসংযত ও অশ্রাব্য ভাষা বাঙ্গালার নৈতিক বায়ুকে প্রচুর পরিমাণে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এবং শিক্ষিত সমাজের চক্ষে বাঙ্গালা পত্রিকা গুলিকে হেয় এবং অশ্রদ্ধেয় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কি এই সকল অশ্লীল এবং অশ্রাব্য লেখা দ্বারাও ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষে কোন সাহায্য হয় নাই?

অশ্লীল এবং অশ্রাব্য কথাকেও ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিতে ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ সম্ভারের প্রয়োজন। শব্দ সমূহের মনোরম যোজনা সাহিত্যিক কলা-কৌশল সাপেক্ষ। ঐরূপ লেখা সমাজের অহিতকর হইলেও কোন নবীন সাহিত্যের পুষ্টি বিধানের পক্ষে তাহা যথেষ্ট সাহায্যকারী। ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" ও মদনমোহনের "বাসবদত্তাকে" নিতান্ত আবর্জ্জনার জিনিষ বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সকল বিষয়েই দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া বিচার করিতে হইবে। আর মনে রাখিতে হইবে "সুদৃশ্য রোমনগরী একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই।" বাঙ্গালার "বঙ্গদর্শন" ও বাঙ্গালা ভাষা রাজকীয় সনন্দ পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হয় নাই।

দলাদলি এবং খেউর চুটকীতেও সাহিত্য ভাব-প্রকাশক ও শক্তিশালী হয়।

এই সময়ে আরও নানা বিষয়ে অনেক রকম দলাদলি

চলিয়াছিল ; তাহাতেও কতকগুলি সাময়িক পত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল ; আন্দুল হইতে বাবু রাজনারায়ণ মিত্র "কায়স্থ কিরণ" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট 'কিরণের' প্রবন্ধ সকল মনোমত না হওয়ায় তিনি ১৮৪৮ সনে "মুক্তাবলী' নামে আর একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া "কায়স্থ কিরণে" প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের প্রতিবাদ করেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন চরম সীমায় উঠিয়াছিল। রক্ষণশীল দলের প্রতিবাদে ও শ্লেষকারীদিগের বিদ্রূপ রচনায় সাময়িক সাহিত্য কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রভাকরে গুপ্তকবি বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ—

"যত ছুড়ীগুলি তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এ.বি শিখে বিবি সেজে বিলাতি বুল কবেই কবে।
আর কিছুদিন থাকরে ভাই ! পাবেই পাবে দেখ্‌তে পাবে,
আপন হাতে হাকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

এই কঠোর বিদ্রূপের প্রতিবাদ করিবার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৫০সনে "সর্ব্ব শুভকরী" নামে একখানা পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকার ভাষা "তত্ত্ববোধিনীর" চেয়েও উচ্চ দরের হইয়াছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় সর্ব্ব শুভকরী' সম্বৎসর কালও জীবিত থাকিয়া সাহিত্যের সেবা করিতে পারে নাই। ইহার পর ১৮৫৬ সনে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত করিলেও কয়েক খানা পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। এইরূপ সাময়িক উত্তেজনার ফলেও সেকালে বিস্তর পত্রিকার উদ্ভব হইয়াছিল।

হিন্দু সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ ও অপরাপর সমাজের দলাদলি চলিতে থাকা কালে নিরপেক্ষ থাকিয়া যে কয়-খানা সাময়িক পত্র পরিচালিত হইয়াছিল ও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষনীয় বিষয় দ্বারা বঙ্গসমাজের তৃপ্তি বিধান করিয়াছিল, তাহার মধ্যে "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ১৮৫১ অব্দে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই মাসিক পত্রিকা খানা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই "বিবিধার্থ সংগ্রহের" চিতাভস্ম হইতেই ১৮৬২ অব্দে "রহস্য সন্দর্ভ" উদ্ভূত হয়।

ইতোমধ্যে ১৮৫৩ অব্দ হইতে গুপ্ত কবি "প্রভাকরের" একটা মাসিক সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রভাকরের প্রভায় ভবিষ্যৎ নবীন যুগের সাহিত্য প্রতিভার পূর্ব্বাভাষ উষার অরুণ কিরণের ন্যায় সমুদ্ভাষিত হইয়া উঠে। এই সময় বঙ্কিম, দীনবন্ধু মনোমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি প্রভাকরের দপ্তরে বঙ্গ সাহিত্যের শিক্ষানবীশ রূপে অবতীর্ণ হন। এই দলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন কবি দ্বারকানাথ অধিকারী।

প্রভাকরে বঙ্কিম, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের মধ্যে যে সাহিত্যিক প্রতিযোগতা চলিয়াছিল, দ্বারকানাথ তাহাতে সর্ব্বপ্রথম পুরস্কার লাভ করেন। কুণ্ডীর তৎকালীন সাহিত্যপ্রিয় ভূমধিকারী ৺কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী এই পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

হায় দুর্ভাগ্য দ্বারকানাথ, তোমার নিকট পরাজিত বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর "দুর্গেশ নন্দিনী" ও "নীল দর্পণ" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া তুমি অমর নিবাসে চলিয়া গেলে !

১৮৫৪ সনে বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম সুলেখক "আলা-লের ঘরের দুলাল" প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার মিলিত হইয়া "মাসিক পত্রিকা" নামে একখানা কাগজ বাহির করেন। ইহাই ছিল প্রথম স্ত্রী পাঠ্য মাসিক পত্রিকা। ইহার অন্যূন দশ বৎসর পরে ১৮৬৩ সনে বর্ত্তমান সময়ের জীবিত মহিলা-পাঠ্য পত্রিকা "বামা বোধিনী" বাহির হইয়াছিল।

ঐ সনেই কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি হইতে "গ্রাম বার্ত্তা প্রকাশিকা" ও ১৮৬৪ সনে বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়া হইতে "শিক্ষা দর্পণ" মাসিক পত্র বাহির করেন।

এই সময়ে (১৮৬৪ অব্দে) ব্রাহ্মসমাজে প্রাথমিক গোলযোগের সৃষ্টি হইলে কেশবচন্দ্রের উদার মতাবলম্বী দল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল সমাজ হইতে পৃথক হইয়া গিয়া "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" গঠন করেন এবং সেই সমাজ হইতে "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রচার করিতে আরম্ভ

করেন। এই "ধর্ম্মতত্ত্ব" আজও জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছে।

অতঃপর ১৮৬৭ সনে "নবপ্রবন্ধ" ও "অবোধবন্ধু", ১৮৬৮ সনে "অবকাশ-বন্ধু", 'হিতসাধক', "জ্ঞানরত্ন" এবং ১৮৬৯ সনে খ্রীষ্টান মিসনারিদিগের "জ্যোতিরিঙ্গণ" প্রভৃতি বাহির হয়।

দুঃখের বিষয় আমাদের আলোচিত রাশি রাশি মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে মাত্র তিনখানা পত্রিকা অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া সাহিত্যের সেবা করিতে সমর্থ হইতেছে। সে তিন খানার নাম (১) "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", (২) "বামা বোধিনী পত্রিকা", (৩) "ধর্ম্মতত্ত্ব।" ১ম খানা ৮০ বর্ষে, ২য় খানা ৫৪ বর্ষে, ৩য় খানা ৫২ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

ইহার পর এক মধুর বসন্ত প্রভাতে নবীন যুগের আগমনের সাড়া পড়িয়াগেল। বঙ্গবাসী পুলক বিহ্বল চিত্তে শুনিতে পাইলেন—

আগামী ১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে "বঙ্গদর্শন" নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইবে। সে পত্রের সম্পাদক হইবেন—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লেখক হইবেন—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামদাস সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি।

১২৭৮ সালের চৈত্রমাসে ভবানীপুর মুদ্রাযন্ত্রের ব্রজমাধব বসু এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। তখন "দুর্গেশ নন্দিনী" ও "নীল দর্পণ" বাঙ্গালাদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছে—বাঙ্গালা "বঙ্গদর্শনের" সাদর সম্ভাষণের জন্য উৎফুল্ল চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই নবযুগের বার্ত্তা প্রদান করিতে যাইয়া আজ আর আপনাদিগকে অধীর করিয়া তুলিব না।

সন্ন্যাস রোগ।

রাধানগরের জমীদার মধুসূদন লাহিড়ীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রেমতোষের নামটি প্রেমতোষ হইলেও প্রেমের অভাব তাহাতে ষোল আনা ছাড়িয়া আঠার আনায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রায় চারি পাঁচ বৎসর যাবৎ তাহাদের বাটীতে প্রজাপতির দোহাই লইয়া বহু দায়গ্রস্থের আনাগোনা আরম্ভ হইলেও এ পর্য্যন্ত প্রেমতোষ কিছুতেই তাহাদের কোন আব্দারই রক্ষা করিল না। সেরূপ আব্দার রক্ষা করিবার বিপক্ষে তাহার কোনও যুক্তি না থাকিলেও সে যেন কোন খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হয় নাই। তাহার একমাত্র আপত্তি এই—বিবাহ করিলেই মানুষ মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত হইয়া পড়ে। তা ছাড়া তাহার উদার উন্মুক্ত হৃদয়রাজ্যে আর এক জন আসিয়া ভাগ বসায় এটা মোটেই তাহার অভিপ্রেত নহে। তাহার এই কার্য্য কেবল খেয়াল হইলেও সে দৃঢ়তার সহিত তাহার অভিভাবকগণকে জানাইয়াদিল যে তাহার বিবাহের জন্য যেন কোনওরূপ চেষ্টা না হয়; আর যদি একান্তই হয় বেশ,—তাহার দরুণ সকলকে পস্তাইতে হইবে।

* * * *

সে দিন চৈত্রসংক্রান্ত উপলক্ষে প্রেমতোষের মা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তাহার সহিত তাহার ছেলেবেলার 'গঙ্গাজল' অধুনা সুরমার মার সাক্ষাৎ হইল। সুরমাকে দেখিয়া তাহার মনে হইল—অমন সুন্দরী মেয়েটীর সঙ্গে যদি প্রেমতোষের বিবাহ হয়, তবে বেশ মানায়।

সুরমার মা বয়সে প্রেমতোষের মার চেয়ে ছোট। নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি প্রেমতোষের মাকে বলিলেন "দিদি, তোমার প্রেমতোষকে যদি আমায় দাও, আর আমার সুরমাকে তোমায় দি,—কেমন হয় তবে?"

দিদি ত তাহাই চান; বলিলেন তোমার যে টুকটুকে মেয়ে আমার তো খুবই সাধ যে এই কাজটী হয়। কিন্তু তাহা ত হবার যো নেই, আজকাল ছেলেদের যত অনাসৃষ্টি আবদার। বলে 'বে কর্ব্বে না'। সুরমা এতক্ষণ অঙ্গুলিতে অঞ্চল জড়াইয়া পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মাটী খুঁড়িতে-

ছিল। সুরমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া প্রেমতোষের মা বলিলেন, "আচ্ছা, ছেলেকে আমি ভাল করে বুঝিয়ে বলব। দেখি কি হয়, আর মেয়েও তো তোমার খুব বড় হয়ে যায়নি—যে রাখ্‌তে পার না, কিছুদিন না হয় দেখা যাক্।" * * *

গৃহিণী সে দিন ছেলেকে কাছে ডাকিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বাছা! মার মনে দুঃখ দিয়ে তোর লাভ কি? আমার বড় সাধ টুকটুকে সুন্দরী একটী বৌ আসে।" প্রেমতোষ কথাটা বড় একটা কানে তুলিল না। এ কথায় ও কথায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু কি করা যায়? রাত্রে শুইয়া শুইয়া প্রেমতোষ ভাবিল—কি করা যায়?

পরদিন সকাল হইতে আর প্রেমতোষকে পাওয়া গেল না। বিছানার উপর একখানা পত্র পাওয়া গেল, তাহাতে লিখা ছিল—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

বাবা, আজ বিদায়গ্রহণ করিলাম, গৃহস্থাশ্রমে আমার স্পৃহা নাই। আমার জন্য বৃথা অন্বেষণ করিবেন না। ইতি

সেবকাধম—প্রেমতোষ।

পত্রপাঠ করিয়া ব্যাপার বুঝিতে অতঃপর আর কাহারও বাকী রহিল না। * * * *

প্রেমতোষ চলিয়া যাইবার ২।৩ দিন পরে মধুসূদনবাবু একখানা দৈনিক বসুমতী লইয়া দেখিতে পাইলেন, তাহার এক স্থানে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "ভয়ানক ডাকাতি" "দশ হাজার টাকা লুণ্ঠন" "সন্দেহে একজন যুবক গ্রেপ্তার" ইত্যাদি ইত্যাদি। বিবরণটী পাঠ করিয়াই মধুসূদন বাবু কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। তাহার সম্বন্ধী ভবতারণ বাবু কলিকাতা পুলিশ কোর্টের একজন বড়দরের উকীল। তাহার চেষ্টায় ও যত্নে এবং তাহারই জামিনিতে অতি কষ্টে মধুসূদন বাবু যুবককে ৪।৫ দিন পর হাজত হইতে খালাস করিয়া আনিলেন। তাহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ না থাকায় পুলিশ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়বার দিন পুলিশ তাহার পকেট তাল্লাস করিতে যাইয়া যে নোট বুক পাইয়াছিল তাহাতে লেখা ছিল—

"অনভ্যাস বশতঃ দুই দিনের পথশ্রমে ও উপবাসে শরীরকে খুবই কষ্ট দিয়াছি।

মৌনী সন্ন্যাসীর বিপদ অনেক—প্রত্যক্ষ বিপদ কনেষ্টবলের হাতে লাঞ্ছনা ও শেষ হাজত বাস।

সন্ন্যাস অপেক্ষা গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।"

* * * *

২০শে বৈশাখ সুরমার সহিত প্রেমতোষের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রেমতোষ আর কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই। বিবাহের পর প্রথম আলাপই নাকি সুরমা করিয়াছিল। সুরমা একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তবে নাকি গৃহস্থাশ্রমে স্পৃহা ছিল না?"

প্রেমতোষ একটু হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল—"সন্ন্যাসীর কি দোষ, দ্রব্যে ঘটায়—হাজতের জিলিপি সে স্পৃহাকে শুধরাইয়া দিয়াছে।"

শুনিয়াছি ইহার পর প্রেমতোষের সন্ন্যাস স্পৃহা আর দেখা যায় নাই।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ।

উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন।

বিগত ১৯শে ও ২০শে চৈত্র রংপুরে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য ১৮ই চৈত্র শুক্রবার বারবেলা ও দিক্‌শূল দোষ অগ্রাহ্য করিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে রওনা হইলাম।

ময়মনসিংহ ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল গেলেই বাইগনবাড়ী ষ্টেশন। ষ্টেশনটীর নামে প্রত্নতাত্ত্বিকের একটু ভাবিবার বিষয় আছে। শুনিতে পাই সে কালে ইহার নাম ছিল বেগমবাড়ী। মুসলমান রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বেগমদের প্রাধান্য লোপ পায়। বেগমদের অবনতির সহিত এ স্থানে বেগুন তরকারির অত্যন্ত আদর হইতে থাকে, এজন্য স্থানটীর নাম হইল বেগুনবাড়ী। অবশেষে রেলওয়ে কর্ত্তাদের হাতে পড়িয়া নামটীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সাহেবেরা নাচ তামাসা যত ভালবাসেন, বেগুন

তত ভালবাসেন না, এজন্য বেগুন শব্দটী বহু বচনাত্মক হইয়া বাইগণ (অর্থাৎ বাইনাম ধারিণী গণিকা সকল) নামে অভিহিত হইয়াছে। তবে "গণ" শব্দের মূর্দ্ধণ্য 'ণ' টী দন্ত্য 'ন' তে পরিবর্ত্তিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যে রেলওয়ে সাহেবেরা আমাদের সাহিত্য পরিষদের মেম্বর হইয়া আমাদের দেখাদেখি এখন প্রাচীন বাঙ্গলা হাতে লেখা পুঁথি পাঠ করিতেছেন এবং তাহাতেই তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে যে বাঙ্গলাতে মূর্দ্ধণ্য 'ণ' নাই। যাই হউক যেখানে চৌধুরা শব্দ ইংরেজীতে cowdry (কাউড্রি) হয়, সেখানে বেগমবাড়ী বাইগন বাড়ী হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

তারপর দুই তিনটী ষ্টেশন পরেই আমরা শিংজানি ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। এই নামটী দেখিয়া বোধ হইল যে এখানে কোন বড় লোক শিংমাছের বিবাহ দিয়াছিলেন। "জায়ায়া নিঙ্" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে শিং জায়া যস্য সঃ এই বহুব্রীহি সমাসে "শিংজানি" পদ সিদ্ধ হওয়ার ত কোন বাধা দেখা যাইতেছে না; যথা যুবজানিঃ; ব্যাকরণ চুঞ্চু মহাশয়েরা ইহা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। ইতর প্রাণির বিবাহ দিতে মাঝে মাঝে বড় লোকের টাকা ব্যয় করিবার খেয়াল বা সখ হইয়া থাকে। শুনিয়াছি কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী কোন স্থানের রাজা এক বিড়ালের বিবাহে লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই নজিরটা এক্ষেত্রে খাটে কিনা পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

ইহার পর কতিপয় ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আমরা প্রদ্যোত নগর উপস্থিত হইলাম। এখানে কলিকাতার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের জমিদারী। এখানকার মণ্ডা উৎকৃষ্ট। বৈকালে ৪ টার সময় জঠরাগ্নি কিঞ্চিৎ উদ্দীপিত হওয়ায় কয়েকটী মণ্ডা ভক্ষণ করিরা জঠর জ্বালা নির্ব্বাপিত করিলাম। এখানে এই খাঁটি জিনিষ দর্শনে বোধ হইল যে প্রদ্যোত ঠাকুর মহাশয়ের জন্মস্থানের দ্যোতি এখনও এখানে আসিয়া পহুঁছায় নাই—রাজধানী হইতে বহুদূরে অবস্থিত বিধায় এখনও এখানে সভ্যতার ভেজাল আসিয়া প্রবেশ করে নাই। তার পর আমরা ময়মনসিংহ জিলার শেষ সীমায়—বাহাদুরাবাদ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এই ষ্টেশনটী যমুনা বা যবুনানদীর তীরে অবস্থিত। এই যমুনা পুণ্যতোয়া জাহ্নবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ভৌগোলিক মজুমদার ভায়ার এখনও প্রত্নতত্ত্বে অধিকার জন্মে নাই, তাই তিনি ঠাওর না পাইয়া, স্বীয় ভূগোলে "যমুনা বা যবুনা" লিখিয়াই খালাস পাইয়াছেন। এই নামটী হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে এই জিলাতেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। আমার এই ধারণা যে নির্ঘাত সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যমুনার পশ্চিমতীরে শ্রীকৃষ্ণের যৌবন ও প্রৌঢ়লীলা-ভূমি মথুরা (পাবনা জিলায়) দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এবং আমরা বহু অনুসন্ধানে পূর্ব্বতীরে বৃন্দাবনের এবং আর একটী গুপ্ত-বৃন্দাবনেরও সন্ধান পাইয়াছি; কালের কুটিল গতিতে ও নদী স্রোতের পরিবর্ত্তনশীলতা হেতু এই উভয় স্থানই বর্ত্তমান যমুনা হইতে কিছুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

এই যমুনা তীরস্থিত মথুরা-বৃন্দাবনই যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মথুরা-বৃন্দাবন তাহার প্রমাণ জন্য নিম্নলিখিত নজিরটী সাদরে গৃহীত হইতে পারে। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম বর্ণন করিয়া কোন কবি লিখিয়াছেন:—

"তমসার তীরে শোভে নন্দন-নগর।"

এই কবিতাটী পাঠ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক মীমাংসা করিলেন যে বাল্মীকি লণ্ডন নগরে বসিয়া রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, যেহেতু তমসার সহিত টেমসের (Thames) সাদৃশ্য আছে এবং নন্দনের আদি ন' টীকে "ল" এর মুদ্রাকর প্রমাদ ধরিয়া লইলেই নন্দন London হয়। দ্বিতীয় নজির—কালিদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধীয় নূতন গবেষণা। "সুতরাং" ময়মনসিংহের পশ্চিমে প্রবহমানা এই যমুনা তীরেই যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল ছিল এবিষয়ে এখন আর বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই।

আমরা যমুনা বাহিয়া সন্ধ্যার সময় তিস্তামুখ ঘাটে পহুছিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম আমাদের জন্য চমৎকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে—আমাদের জন্য গাড়ী রিজার্ভ (Reserved) করা হইয়াছিল; একটী ভদ্র লোকও রংপুর হইতে পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিনিধি দিগকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। চমৎকার বন্দোবস্ত। আমি

পূর্ব্বে যে যে সম্মিলন ক্ষেত্রে গিয়াছি, কোথাও এরূপ সুবন্দোবস্ত দেখি নাই। শুনিলাম রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট গুপ্ত মহাশয়ের ক্ষমতাতেই এই সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। গাড়ী রিজার্ভ (Reserved) থাকাতে আমাদের সুনিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। আমরা রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় রংপুর ষ্টেশনে পহুঁছিলাম।

ইংরেজী হিসাবে রাত্রি ১২টার পর হইতেই ১লা এপ্রিল বা all fools' day আরম্ভ হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বারবেলা ও দিক্‌শূল লইয়া আমরা রওয়ানা হইয়াছিলাম, এখন এই দুইটীর সহিত all fools' day ও যুক্ত হইল। আমরা এই ত্র্যহস্পর্শ মস্তকে লইয়া রংপুর ষ্টেশনে পা দিলাম।

ত্র্যহস্পর্শের ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। আমি পূর্ব্বদিন প্রাতে ৯টার সময় আহার করিয়া রওনা হইয়াছি। এই ১৭½ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রদ্যোত-নগরের গুটী দুই মণ্ডা ছাড়া আর কিছুই উদরস্থ হয় নাই। মনে করিয়াছিলাম যে রংপুর ষ্টেশনে গেলেই বৈশ্বানর শান্ত হইবে, কিন্তু এখানে আসিয়া সকলেই নিরাশ হইলাম। যে সব ভদ্রলোক ও ছাত্র ভলাণ্টিয়ার আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন, তাহারা বলিলেন যে সহর ২½ মাইল দূরে, একখানা ঘোড়ার গাড়ীও ষ্টেশনে নাই; রাত্রি শেষে কলিকাতা মেলের সময়, গাড়ী পাওয়া যাইবে। ষ্টেশন গৃহে আমাদের জন্য ঘুমাইবার বেশ সুবন্দোবস্ত রাখা হইয়াছিল। অগত্যা আমরা শয্যার সদ্ব্যবহার করিতেই মনোযোগী হইয়া পড়িলাম। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ধূমপায়ী ছিলেন, তাঁহারা হুকা হুকা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ চা খোর ছিলেন, তাঁহারা চাচা ডাকিতে লাগিলেন। এগুলি "fools day'র ফল বলিয়া সম্পাদক ভায়া নীরবে শয্যা লইয়া নাসিকার আশ্রয়ে সরবে নিদ্রা ঘোষণা করিলেন।

রাত্রি ৩½ টার সময় ভলাণ্টিয়ারদের চীৎকারে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তখন বহু ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়াছে। আমরা ৪ টার কিছু পরে আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট Camp এ উপস্থিত হইলাম। ডাকবাঙ্গলার প্রশস্ত আঙ্গিনায় আমাদের জন্য উৎকৃষ্ট Camp খাটান হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে উৎকৃষ্ট চা ও জল খাবার উপস্থিত হইল। উহা উদরস্থ করিয়া আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। এখন এক কথায় বলিয়া রাখি যে আহারের,—মৎস্য মাংস, লুচি, মিষ্টান্নের, এবং জল খাবারের,—সোডা, লেমনেড, বরফ কলাফলাদি প্রভৃতির বেশ বন্দোবস্ত হইয়াছিল এত অল্প কথায় এবিষয়টা বলিতেছি বলিয়া রাসবিহারী ভায়ার প্রতি বড় অবিচার করা হইল; কি করি, স্থানাভাব।

শনিবার—মধ্যাহ্ন কৃত্যের ও তদনন্তর কিঞ্চিৎ বিশ্রামের সময় বাদ দিয়া—সমস্তদিনই সভার কার্য্য চলিল। সভাপতি স্যার আশুতোষের অভিভাষণে বাঙ্গালী জাতির প্রতি বহু সার গর্ভ উপদেশ ছিল। প্রবন্ধ রচক-গণের প্রবন্ধ পাঠে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সেই সনাতন প্রথাই অবলম্বিত হইয়াছিল। ফলে সকল প্রবন্ধই 'কবন্ধ' হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইলে সমস্তটাই পাঠ করিতে দেওয়া উচিত; আর যদি কবন্ধ করাই আবশ্যক হয়, তবে প্রবন্ধটা পূর্ব্বাহ্নেই রচকের হস্তে দেওয়া উচিত; এরূপ করিলে পড়িবার সময় পাঠককে সভার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেকুবের ন্যায় খতমত খাইতে হয় না। প্রবন্ধ ভাল না হইলে উহা পাঠ করিতেই দেওয়া উচিত নহে। এ অনুরোধ আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনকে পুনঃ পুনঃ করিয়া নিরাশ হইয়াছি। আশা করি উত্তর বঙ্গ সম্মিলন এ বিষয়ের ঔচিত্যানুচিত্য বিবেচনা করিবেন।

সন্ধ্যার সময়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাজা মহেন্দ্র রঞ্জন প্রদত্ত সান্ধ্য সম্মিলন যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইল। রাত্রিতে নাট্যাভিনয়ের ও ব্যবস্থা ছিল।

সম্মিলনের দ্বিতীয় দিবস, রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে ১০½ টার সময় সভাপতি মহাশয় কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যে কলিকাতা যাওয়া স্থির করিয়া সভাপতিত্ব ত্যাগ করিলেন এবং ঐ কার্য্যভার শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের উপর সমর্পণ করিয়া গেলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সমাসোক্তি অলঙ্কারে রচিত বঙ্গীয় কবির কবিতাটী স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইল:—

"দিবস হইল শেষ, শশধরে কমলেশ—
আপনার রাজ্যভার দিলা।"

সভাভঙ্গের পর Camp এ আসিয়া ভয়ে ভয়ে কূপোদকে স্নান ও কিঞ্চিৎ কূপোদক পান করিলাম। রংপুরে জলের কল নাই। জলাভাবহেতু রাস্তায় জল দেওয়ার ভাল বন্দোবস্ত নাই। সহরটীকে a town of dust বলিলেই হয়।

রবিবার অপরাহ্ণ ২½ টার সময় সভাতে পুনরায় উপস্থিত হইলাম। একটী মহিলার সুললিত প্রবন্ধ ভারপ্রাপ্ত সভাপতির অনুমতিক্রমে অপর একব্যক্তি পাঠ করিলেন। প্রবন্ধটীতে কণ্যাপণ গ্রহণের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য ছিল। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর উঠিয়া ওজস্বিনী ভাষায় প্রবন্ধটীর সমর্থন করিয়া কন্যাপণ গ্রহণের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিলেন। ইহার পর সভাপতির আদেশে ঐতিহাসিক মৈত্রেয়, পণ্ডিত যাদবেশ্বর ও অধ্যাপক নিয়োগী, তিন জনে, ক্রমে ইতিহাসের, ধর্ম্মের ও বিজ্ঞানের দিক্ হইতে বাঙ্গালী জাতির পরিচয় প্রদান করিলেন। ইঁহারা মুখে বাঙ্গালী চরিত্রের বেশ বিশ্লেষণ করিলেও সম্মিলনের কার্য্যে কিন্তু প্রকৃত বাঙ্গালী চরিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সহরে বহু উকিল, মোক্তার, ডেপুটী, মুন্সেফ, সবজজ প্রভৃতি আছেন, কিন্তু সম্মিলনের কার্য্যের প্রতি ইঁহাদের সহানুভূতি তেমন লক্ষিত হইল না। সম্পাদক সুরেন্দ্র বাবু, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুনীন্দ্র বাবু, উকীল রাসবিহারী এবং বাঙ্গালী জজ মিঃ মল্লিক, ইঞ্জিনিয়ার মিঃ দত্ত, কৃষিতত্ত্ববিৎ মিঃ চক্রবর্ত্তী ও মিঃ লাহিড়ী এবং সর্ব্বোপর বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গুপ্ত ব্যতীত অপর কাহারও বিশেষ সহানুভূতি এ সম্মিলনে দেখিলাম না। ঢাকার ভায়ারাও আশা করি সতর্ক হইবেন।

সম্মিলনের প্রথম দিন পূর্ব্বাহ্ণে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গুপ্ত, জজ মিঃ মল্লিক ও ইঞ্জিনিয়ার মিঃ দত্ত সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই দেশীয় পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ ও ইঞ্জিনিয়ার চেয়ারে উপবেশন না করিয়া মঞ্চোপরি বিস্তীর্ণ গালিচার উপরে—চেয়ারে উপবিষ্ট জনগণের পদতলে উপবেশন করিয়া বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রচলিত কথা আছে "মানের গোড়ায় ছাই দিলে মান বাড়ে।" আমরা উচ্চ রাজপুরুষদিগের এইরূপ ব্যবহার দর্শনে অত্যন্ত প্রীত ও আশান্বিত হইয়াছি। রংপুর সাহিত্য-সম্মিলনে এগুলি দেখিবার বিষয় ছিল।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে যখন সভার কার্য্য চলিতেছিল, তখন একটা ঘটনার দিকে মঞ্চোপরি আসীন সমুদয় লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় তাজহাটের রাজা সকলকে সান্ধ্যসম্মিলনে আহ্বান করিয়াছিলেন, কয়েকখানা নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করা বাকী ছিল। মঞ্চোপরি উহা বিলি করা হইল। এক ভদ্রলোক স্বীয় নবার্জ্জিত উপাধিটী খামের উপর লিখা ছিল না বলিয়া প্রথমে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন তখন উপাধিটী নামের সহিত সংযোজিত হইলে, উহা গ্রহণ করিলেন!

সভাভঙ্গ হইতে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল। আমরা তাজহাটের রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি camp এ ফিরিলাম।

এখন রংপুর হইতে ফিরিবার পালা। মনে করিলাম ব্রাহ্মস্পর্শের ফল আর ভোগ করিতে হইবেনা; কিন্তু এখন যাহা ঘটিল তাহা অতীব শোকাবহ। * * * * ফিরিবার সময় কোন ডেলিগেটই আর ঘোড়ারগাড়ী পাইলেন না। ভলাণ্টিয়ারেরা ও ডেলিগেটেরা সকলেই হাতে বগলে ও মাথায় মোট লইয়া রাত্রি ১০টার পরে ২½ মাইল পথ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া চলিয়া তবে যাইয়া গাড়ী ধরিলেন, এই রাত্রিতে রংপুরের ভলাণ্টিয়ারেরা প্রকৃত মনুষ্যত্বই দেখাইয়াছিল। তাহাদের সাহায্য না পাইলে বহু ডেলিগেটকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইত। অতি কষ্টের মধ্যেও আমি আনন্দভরে বিদায়সঙ্গীতটী একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া গাহিলাম :—

"ফেটে যায় মাথা ট্রাঙ্কের ভরে অশ্রুসলিলে গণ্ড ভাসে।"

ষ্টেশনে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত পথেই ঘরের ধন আসিয়া ঘরে পঁহুছিলাম।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

———

মৃগনাভি। *

(সমালোচনা)

আজ কাল গল্প লেখা, অনেক পরিচিত, অপরিচিত, শক্তিশালী ও শক্তিশূন্য সাহিত্যিকের সখ, কাহারও বা ব্যবসায়। গল্প-সাহিত্য রচনা দ্বারা লোক শিক্ষার সহায়তা করিবার শক্তি এবং প্রবৃত্তি সকলের নাই। যে ২।১ জন শক্তিশালী সমাজ হিতৈষী সাহিত্যিক সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্য-সাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ। উন্নত আদর্শ প্রচার উদ্দেশ্যে, মনোরম আখ্যায়িকা রচনা করিবার জন্য অল্প-শক্তিশালী লেখকেরাও চেষ্টা করিলে, তাঁহাদের প্রয়াস সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ না করিতে পারিলেও, সে জন্য তাঁহারা নিন্দনীয় হইতে পারেন না, বরং আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাদের উদ্যমের প্রশংসা করিতেই প্রস্তুত আছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক অক্ষম লেখকও আজ কাল নানা কুৎসিৎ চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহা জন সমাজে প্রদর্শন করিতে কিছু মাত্র শঙ্কা কি লজ্জা বোধ করিতেছেন না।

কবিরা চিরদিনই 'নিরঙ্কুশ', এখন এ দেশের সাহিত্যিকেরাও নিরঙ্কুশ। এযুগে কাহারও স্বেচ্ছা বা স্বাধীনতায় বাধা দিবার কাহারও কোন অধিকার নাই। বিশেষতঃ সম্প্রতি 'বঙ্গ-সাহিত্য-সম্রাট' কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেনঃ—"উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্যই উপন্যাস লেখা। সাদা কথায়, গল্প লিখ্‌ব, আমার খুসি। এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে, সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।"

আবার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও বলিতেছেন,—সাহিত্য সৃষ্টি একটি আর্ট বিশেষ। আর্ট ধর্ম্ম প্রচার করে না, মত প্রতিষ্ঠা করে না, সমাজ সংস্কার বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ যাহাতে হয়, তার প্রতি দৃষ্টি রাখে না। শুনিয়া বা পড়িয়া কে কি ভাবিবে বা করিবে, তার সঙ্গে এই লক্ষ্যের সম্বন্ধ নাই। কবির

কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ।

কাব্য বা নাট্য বা উপন্যাস পড়িয়া, কিংবা চিত্রকরের চিত্র অথবা ভাস্করের ভাস্কর্য্য দেখিয়া, কে কি ভাবিবে বা করিবে, তাহার বিবেচনা আর্টের নয়। ধর্ম্মত নীতির নামে রস সৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টার মতন আর কিছু এমন আত্মঘাতী হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না।" বিপিন বাবুর মতে,—রস সৃষ্টিকারী মাত্রেই

---

* শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এ, প্রণীত। আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

স্বতঃত্রব নিরঙ্কুশ। "রসঃ বেসঃ",—বেদের উক্তি—আর তা কেই বা না জানে? সুতরাং বীভৎস রস শ্রষ্টা সাহিত্যিকও সমাজে সমাদরনীয়, বরেণ্য। আর আদি রস, সেত সকল রসের শিরোমণি কারণ তাহার নামেইত প্রাধান্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিতে বসিয়া পাপের স্বাভাবিক পরিণতি ভীষণ দুঃখ দুর্গতিপূর্ণ বলিয়া প্রদর্শন করেন না, পরন্তু নানা মোহন ভাষায় ও ভাবে, ইঙ্গিতে কামান্ধ কুহকী কুক্কুর ও নারী ধর্ম্ম বিবর্জ্জিতা পাপ পিশাচিনীর নারকীয় লীলা-বিলাস বর্ণনা করিয়া, পাঠক পাঠিকাকে পাপের প্রতি প্রলুব্ধ করিতেই প্রয়াসী হন, তাঁহাদিগকেও আর নিন্দা করিবার যো নাই। চিন্তাশীল সমাজতত্ত্বজ্ঞ সুলেখক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় অশেষ এবং অসহনীয় দুঃখভরে বলিতেছেন :— "সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য-সেবার উদ্দেশ্যই 'অগ্রসর' হওয়া অর্থাৎ, ব্যক্তির ও জাতির উন্নতি সাধন করা। হিতকারী গ্রন্থ না লেখা, এক দোষ। আবার অহিতকারী গ্রন্থ লেখা তদপেক্ষা গুরুতর দোষ। লোমহর্ষণ অশ্লীল প্রণয় চিত্র, গত দশ বৎসরে আমাদিগের গ্রন্থকারগণ বহুবার অঙ্কিত করিয়াছেন। দুই জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ঐ কালের মধ্যে স্ব স্ব রচনায় সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ রসিকতা অন্ততঃ দশ বারো বার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উপন্যাস গল্প প্রভৃতি সদ্ভাব পূর্ণ, হিতকর আদর্শ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, অথবা মানবচরিত্র গঠনের নিমিত্ত প্রায়ঃ লিখিত হয় না। তাঁহারা দেশের দিকে চাহিয়া কিছু লিখিতেছেন, এরূপ বলিবার উপায় নাই যাহার কিছুই বলিবার নাই, সেও কত কথা বলিতেছে, যাহার কিছু লিখিবার নাই, সেও কত কি লিখিতেছে।" কিন্তু শশধর বাবুর এবম্বিধ কাতর ক্রন্দনে, অনুনয় বিনয়ে আমাদের দেশের এ যুগের প্রমত্ত প্রচণ্ড "সাহিত্যিকেরা" কৃপা করিয়া কর্ণপাত করিবেন, সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে কি? পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বিরাট বিশাল মহাকাব্য মহাভারত রচয়িতা এবং অন্যান্য সমস্ত সদ গ্রন্থকারেরই গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য মূল সত্য ও নীতি ছিল, "যতোধর্ম্ম-স্ততোজয়ঃ" কিন্তু এ যুগের রসিক রসস্রষ্টারা সেরূপ নীতির ক্ষুদ্র গণ্ডীতে স্ব স্ব শক্তিকে আবদ্ধ ও সঙ্কুচিত করিয়া "আত্মঘাতী" হইতে সম্মত হইবেন কি?

লোক-শিক্ষা ও সংস্কারের অসাধারণ শক্তি দিয়া বিধাতা যাঁহাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত, আচরিত কর্ম্মের বিসদৃশ বিরোধ নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া সুধী সমাজ বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া দেশের দুর্ভাগ্যই মনে ভাবিতেছেন এবং নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। যাঁহাদের প্রচারিত মত নিমেষে সুরলোক হইতে নীচে নামিয়া ক্রমে নরলোক ছাড়িয়া নীচাদপি নীচ নিরয় নিবাসেও "রস" এবং "তত্ত্ব" সংগ্রহ করিয়া বিশ্ববাসীকে দুই হস্তে দান করিবার জন্য বিকট ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে, তাঁহাদিগকে, "সাহিত্য হইতেছে জীবন সৃষ্টি (creation of life)। জীবন সৃষ্টির দিক হইতেই সাহিত্যের বিচার।" এ কথা বলিয়া কেহ বুঝাইতে পারিবেন কি? "আমাদের নব্য সাহিত্যকগণ সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতিকে পদদলিত করাই আর্টের আদর্শ ভাবিতেছেন" দেখিয়া পরিতাপ করিতে পারি, কিন্তু কেহ কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিব না, বিপন্থকে সুপথে আনিতে পারিব না, সে কথা সুনিশ্চিত।

যাক্, সে দুঃখ করিয়া বিশেষ কোন লাভ হইবে, আশা নাই। গল্পের প্রতি এখন এদেশের লেখক এবং পাঠক উভয় পক্ষেরই অত্যধিক অনুরাগ, আগ্রহ। বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা এবং গল্প রচনা কেহ কেহ অত্যন্ত সহজ সাধ্য বলিয়া মনে ভাবেন। সেই জন্যই আজ কাল এদেশে গল্প এবং কবিতা রচনার এত আধিক্য। দুঃখের বিষয়, মা সরস্বতী সকল সাহিত্যিককে সমান শক্তিদান করেন নাই। যাহা হউক গল্প রচনায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের স্থান যে সকলের উর্দ্ধে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তারপর নগেন্দ্র গুপ্ত, দীনেন্দ্র কুমার, প্রভাত কুমার, হেমেন্দ্র প্রসাদ, কুমার সুরেশ চন্দ্র, সরোজনাথ, শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি অতি অল্প কয়েকজনও পাঠক সমাজে বেশ পরিচিত এবং প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের গল্প লেখকদের মধ্যে কুমার সুরেশ চন্দ্র বিশেষ গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছেন, সে বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নাই। তাঁহার

গল্পগুলির ভাব এবং ভাষা উভয়ই অতি উচ্চাঙ্গের এবং পরম উপভোগের বস্তু। তাঁহার নব প্রকাশিত গল্পের পুস্তক "মৃগনাভির" ভূমিকায় তিনি আত্ম শক্তিকে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করিয়া যে পরিমাণ ভয়-বিনয়ের ভাষায় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় তাহা অসঙ্গত হইয়াছে। "হৃদয়ে কস্তুরী ফোটে নাই" ভাবিয়া তাঁহার পরিতাপ করিবারও কোন কারণ আছে, আমাদের মনে হয় না। তাঁহার এই মৃগনাভির নমুনা দেখিয়া আমাদের এতই আশা ও আনন্দ হইয়াছে, যে তাঁহাকে কি বলিয়া অভিনন্দন করিব ভাবিয়া পাইতেছি না।

মৃগনাভিতে আটটি ছোট গল্প আছে। "যাদুকর" বস্তুতই যাদুকর। পিতা মাতার হৃদয়ে অলক্ষিতে সন্তান বাৎসল্য কিরূপে অঙ্কুরিত হইয়া নিত্য বর্দ্ধিত ও বিপুলায়তন হয়, গ্রন্থকার অতি কৌশলে তাহার ক্রম-বিকাশ পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। গল্পটির আদ্যো-পান্তই মহা রহস্যময়। শেষের চারিটি ছত্র না পড়া পর্য্যন্ত পাঠক মাত্রেই 'বিদেশাগত' যাদুকরকে চিনিতে জানিতে না পারিয়া অসহনীয় উৎসুক্যে ক্রমেই অধিকতর অস্থির হইতে থাকিবেন। গ্রন্থকার অতিশয় নিপুণতার সহিত এক ছত্রে,—একটি কথায়, সকল ঔৎসুক্যের পরিসমাপ্তি করিয়া পাঠককে পরিতৃপ্ত ও পুলকিত করিয়াছেন। "প্রেসক্রপসনে" পতি-প্রাণা হিন্দু নারীর একটি উজ্জ্বল-মধুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তৃতীয় গল্পে "হীরার মূল্যে" "কামিনী কাঞ্চনের" একার্দ্ধ যে বস্তুতঃ কত অকিঞ্চিৎকর, শ্রীভগবানের কৃপা হইলে দুঃসাহসী নারকীয় নরহন্তার হৃদয়েও তাহা অকস্মাৎ উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়—পাপী নিমেষে নবজীবন লাভ করে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ প্রাণপ্রদ পুণ্যকথা গল্পচ্ছলে শুনিলেও, আমাদের ন্যায় বিষয়-বিষ-বিদগ্ধ কত শত তৃষিত নরনারীও প্রাণে একটা অমৃতময় শান্তি ও শিক্ষা লাভ করিতে পারে। "দান পত্রের" বেলা ও হেনা—দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত-স্বভাবা নারী চিত্র। একটি প্রাচ্য অপরটি প্রতীচ্য ভাবাপন্ন। হেনা, অর্থ-সর্ব্বস্ব, একটি নীচ হৃদয়া নারী,—অপর দিকে বেলা, প্রকৃত প্রণয়ের পরিপূর্ণাবয়বা পুণ্য প্রতিমা। এই মহিয়সী মহিলার আত্ম বিসর্জ্জনের মহিমা যেমন মনোমুগ্ধকর তেমনি মধুর। "ষড়যন্ত্রে" আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গের, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কার দুষ্ট এক যুবক, অনেক ঠেকিয়া, অবশেষে আপনার স্ত্রীর মুখেই শুনিলেন ও শিখিলেন যে "কোর্টসিপ না ক'রে বিবাহ হ'লেও বিবাহের পরেও ভালবাসা হ'তে পারে এবং বিবাহের পরেও চেষ্টা করলে মেয়েরা লেখা পড়া থেকে আরম্ভ ক'রে সবই শিখতে পারে। কিন্তু এত বড় মোটা কথাটা যার মাথায় ঢোকে না, সেও আপনাকে অতিশয় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব'লে মনে ভাবে। এই বড় দুঃখ ও আশ্চর্য্যের কথা!" এই পাঁচটি গল্পই বৈচিত্র্যে ও লক্ষ্যে, ভাবে ও ভাষায়, কল্পনায় ও কবিত্বে সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় এবং গ্রন্থকারের হৃদয় মন ও বুদ্ধির, স্বাস্থ্য, শুদ্ধি ও শক্তির পরিচায়ক, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শেষের তিনটি গল্পেরও ভাষা সরল সরস ও চিত্তাকর্ষক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

পসরা—হেমেন্দ্রকুমার রায় গুপ্ত প্রণীত। বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য একটাকা আকার ডবল ক্রাউন ষোল পেজি—১৫২ পৃষ্ঠা।

পুস্তক খানির ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। গ্রন্থকার নবীন হইলেও পসরাতে তাহার লেখনীর কৃতিত্ব আছে। ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর। ইহার অনেক গল্পেই করুণ রসের ভিতর দিয়া সমাজের চিত্র ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে। জীবনের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা হইতে যে কি অনর্থ ঘটিতে পারে গ্রন্থকার একটী গল্পে তাহা বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"রাজগীতা বা বঙ্গোচ্ছ্বাস"—শ্রীযামিনী কিশোর রায় গুপ্ত এম্ এ বি এল্ প্রণীত। ঢাকা পাটুয়াটুলী মহিম সনাতন লাইব্রেরী হইতে শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই রাজগীতার মূল্য বাঁধাই এক টাকা আকার ডবল ক্রাউন ষোল পেজি ৯০ পৃষ্ঠা। রাজগীতা একখানি কাব্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার বিচার বিভাগের উচ্চপদে কর্ম্মব্যূহের মধ্যে

থাকিয়াও যে কবিতার চর্চ্চা করিতে অবসর পাইয়াছেন ইহাতে আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। এ গ্রন্থে আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের ও ভারতের ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমানের সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। সম্রাট দম্পতী, শ্রীকৃষ্ণ, লর্ডবেণ্টিঙ্ক, লর্ডকর্ণওয়ালিশ, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধদেব, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড কারমাইকেল, স্যর আশুতোষ প্রভৃতির সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। প্রকৃতির বর্ণনা গুলি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব—শ্রীঅভয় কুমার গুহ এম, এ, বি, এল, প্রণীত। মূল্য দুই টাকা।

বাণী মন্দিরকে মণি মরকতে সুশোভিত করিবার জন্য বাঙ্গালী ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে নিত্য নব নব গ্রন্থরাজিতে বাঙ্গালা সাহিত্য কানন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ তাহার মধ্যে একখানা। ইহা সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করিতেন প্রাচীন ভারতে সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই, অভয় বাবু গভীর গবেষণা বলে ঐ মত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন—প্রাচীন ভারতে সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের যেরূপ অনুশীলন হইয়াছিল সেরূপ আলোচনা অতি অল্প দেশেই হইয়াছে। এইগ্রন্থ প্রণয়নে গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী। আমরা এই গ্রন্থের সাদর অভিনন্দন করিতেছি।

ঝালঝাল তত্ত্ব—লেখক শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্ল বর্ম্মণঃ, ছত্রপুর, ময়মনসিংহ। প্রকাশক শ্রীদীননাথ মল্ল বর্ম্মণঃ। মূল্য ॥৵০ আনা। গ্রন্থকার বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে প্রাচীন পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। লেখায় গবেষণার পরিচয় আছে।

সংবাদ।

গত ৮ই, ৯ই বৈশাখ যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আগামী দশম সম্মিলন বাকীপুরে বড়দিনের বন্ধে সম্পন্ন হইবে স্থির হইয়াছে।

বিষয় সূচী।

সৌরভ

চতুর্থ বর্ষ } ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩২৩। { নবম সংখ্যা।

ধর্ম্ম দর্শন ও নাস্তিকতা।

ধর্ম্মের যাহা প্রাণ তাহাই ভগবান। ভগবান ব্যতীত ধর্ম্ম সম্ভবে না—ইহাই আমাদের এবং অধিকাংশ দার্শনিকের বিশ্বাস। কিন্তু প্রফেসর সিলির মতে ভগবান-শূন্য ধর্ম্ম সম্ভবপর। আমাদের জীবনের কার্য্যকলাপ হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে বহির্জ্জগতের উপর আমাদের চিন্তা ও কার্য্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমরা প্রায় সকল বিষয়েই বাহ্য জগৎ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই কথাটা মনুষের মনে কোন না কোন ভাবে বিরাজিত আছে। এবং এই জন্যই আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন যথাসাধ্য মানিয়া চলি, এবং অনেকটা ভয়ও করি। এই ভীতি ও অধীনতার ভাব হইতেই প্রফেসর সিলির মতে ধর্ম্মের উৎপত্তি। প্রকৃতির কর্ত্তা বলিয়া একজন ভগবান ধরা নিতান্ত আবশ্যক। যদি কেহ ভগবান নামের যোগ্য হন, তবে তিনি প্রকৃতি। আর যাহা আমরা ধর্ম্মের অথবা ভগবানের নিয়ম বলি তাহা প্রাকৃতিক নিয়ম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ইংরেজ দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ বিশ্ব জগতের ক্ষুদ্রতম অংশের কীটাণুকীট আমরা, আর ভগবান অনন্ত অসীম। কেমন করিয়া জানিব ভগবান কেমন—তিনি আছেন কি নাই? ভগবান সম্বন্ধে কোনও সংবাদ দেওয়া আমাদের জ্ঞানের পক্ষে অসম্ভব। তিনি অজ্ঞেয়। ভগবান যদি অজ্ঞেয় হন তবে ধর্ম্মের অবস্থা কেমন দাঁড়ায় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তথাপি স্পেন্সার সাহেবের মতে এ জগৎ একটী অনন্ত অজ্ঞেয় শক্তির বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা সকলে ভীতি ও শ্রদ্ধা লইয়া এই অজ্ঞেয় অনন্ত শক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান। ধর্ম্ম বলিয়া আমরা যাহা কিছু বুঝি তাহা এই অবস্থার অনুভূতি হইতেই জাগিয়া উঠে।

কোমটের (Comte) প্রচারিত মনুষ্য ধর্ম্মও (Religion Humanity) ভগবান শূন্য। তিনি বলেন যে আমাদের জ্ঞান রাজ্য, এই বিশ্বের সমস্ত বস্তু বা প্রাণির সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। জ্ঞানের সাধ্য নাই যে তাহা এই বিশ্ব অতিক্রম করিয়া একটা অশরীরী (spiritual) জগতে চলিয়া যায়। কিন্তু এই বিশ্বের সমস্ত বস্তু ও প্রাণী বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্যই এই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট। সুতরাং মানব জাতির উন্নতি ও বিকাশ অমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। এই মানবাত্মার সম্মান ও অর্চ্চনাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের জন্য একজন অশরীরী ভগবান অনুমান করা সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক।

বৌদ্ধ ধর্ম্মও এযাবৎ নিরীশ্বর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতের কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু কৃতী সন্তানের প্রযত্নে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে সেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই সকল মহামান্য প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণার প্রতি বহুল সম্মান প্রদর্শনান্তর আমরা বলিতে বাধ্য যে তাঁহাদের মতটা এখনও সর্ব্ববাদী সম্মত ভাবে গৃহীত হয় নাই। যে ব্যক্তি ব্যাপক সত্তার

(general term) অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই তিনি যে এক অনন্ত জগৎ ব্যাপক পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের জানিবার এখনও অনেক কথা আছে। এক অভেদ্য প্রায় কুহেলিকা এই বিশ্ব বিখ্যাত ধর্ম্মটিকে ঘিরিয়া আছে।

বুদ্ধদেব যে ভগবান সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কথা তাহার শিষ্য মণ্ডলীকে বলিয়া যান নাই এবং সে সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কোনও কথা বিশেষ ভাবে কেহও লিপিবদ্ধ করেন নাই এ কথা স্বীকার করিতে বোধ হয় কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। এমন একদিন গিয়াছে যখন সকলে বুদ্ধ দেবকে শূন্যবাদী (nihilist) বলিয়া জানিত। এখন ওল্ডেনবার্গ প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ দার্শনকদের প্রযত্নে বুদ্ধদেব এই অপবাদটী হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। Oldenberg লিখিয়াছেন—"He who enquires...for what the oldest tradition teaches us to regard as the teachings of Buddha.. ...will find in it not a single sentence of these contemplations of the Nothing. Neither expressed nor unexpr ssed, neither in the fore-ground nor in the furthest back ground of the religious thought of that circle had the idea of nothing any place. The sentences of the sacred truths show this plainly enough: if the world is weighed by the Buddhists and found wanting, the reason is not that it is a fallacious apparent something, but in reality empty nothing; the reason is simply that it is full of suffering and nothing but suffering."

অর্থাৎ প্রাচীনতম বৌদ্ধ পুস্তক এবং উপদেশ বাক্য গুলি আলোচনা করিলে এই শূন্যবাদের কল্পনার আভাস পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না। তবে পবিত্র বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহে এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে যে 'কিছুই না' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে জগৎ ভরা কেবল দুঃখ ও দৈন্য, জরা ও মৃত্যু। দুঃখ কষ্ট ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই। এই জন্যই বৌদ্ধ মতে জগৎটা কিছুই নয়। জগতের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু মূল্য নাই। কি করিয়া এই সমস্ত দুঃখ ও দৈন্য, জরা ও মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া যায় অর্থাৎ কি করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা এবং ঈশ্বর আরাধনা যে নির্ব্বাণ প্রাপ্তির উপায়, তাহা বুদ্ধদেব কখনও বলিয়াছেন কিনা সন্দেহ। সেই জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নিরীশ্বর বলিলে যে বেশী অন্যায় করা হয় তাহাতে বোধ হয় না। তবে পরবর্ত্তী বৌদ্ধ সম্প্রদায় বুদ্ধদেবকে ভগবানের আসনে বসাইয়া পূজা হোমাদি করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। বস্তুতঃ মানবাত্মা ভগবানের একটা কোন না কোন কল্পনা না করিয়া পারে না। আমাদের জীবন মন ভগবানের কল্পনা করিতে বাধ্য। সেইজন্য ভগবানের কল্পনাকে ডেকার্ট (Descartes) necessary Idea বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মকে স্থায়ী, পরিপূর্ণ এবং প্রাণময় ও উন্নতিশীল করিতে হইলেই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবান-শূন্য ধর্ম্মে আমাদের আত্মার কোনও তৃপ্তি হয় না। ভগবানকে চিন্তা এবং অর্চ্চনা করিলে আমাদের অর্দ্ধেক দুঃখ জ্বালা দূরীভূত হয় এবং অসহ্য কষ্ট ও যন্ত্রনার মধ্যেও শান্তি পাইতে পারি। যাহারা কর্ম্মবাদী অর্থাৎ Pragmatist তাহাদের সত্যের ও সঙ্গতির মানদণ্ড কর্ম্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহে। এই মানদণ্ডের পরীক্ষাতে ও ভগবানের অস্তিত্ব এই দলের নিকট খাঁটি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাহারা বুঝিতে পরিয়াছে যে ভগবানে বিশ্বাস করিলে হৃদয়ে ও বাহুতে অনেক সাহস ও শক্তি পাওয়া যায় এবং তজ্জন্য লোকের কর্ম্মতৎপরতা ও ভক্তিভরে সুশৃঙ্খলরূপে কর্ম্ম করিবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং কর্ম্মজনিত ক্লেশ বহুল পরিমাণে লাঘবিত হইয়া হৃদয়ের উৎসাহ ও আগ্রহকে সম্পূর্ণরূপে বিমলিন রাখিয়া এবং বর্দ্ধনশীল করিয়া বাঁচাইয়া রাখে। ভগবানে বিশ্বাস না থাকিলে জাগতিক নিয়ম-বদ্ধ কর্ম্ম-প্রণালীর কি অভূতপূর্ব্ব শোচনীয় পরিণাম হইত তাহা এই কর্ম্মবাদীরা বিশেষরূপে উপলব্ধি

করিয়াছেন। এবং সেই জন্যই তাঁহারা বলিয়া থাকেন "If there be no God we should make one" অর্থাৎ যদি ঈশ্বরাস্তিত্ব অসত্য হইয়া দাঁড়ায় তবে আমাদিগকে কর্ম্মের জীবন ও বর্দ্ধনের জন্য একজন ঈশ্বর প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

জার্ম্মাণীর দেশ-বিদেশ খ্যাত ঋষি প্রকৃতি সুবিজ্ঞ দার্শনিক ক্যাণ্ট (Kant) তাহার বিচক্ষণ বিচার প্রণালী দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন যে theoretical reasoning দ্বারা অর্থাৎ যাহাতে আমরা বহির্জগতের দেশ কাল নিয়মাবদ্ধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকি সে বিচার প্রণালী দ্বারা আমরা কোন কিছুরই প্রকৃত অবস্থা অর্থাৎ things-in-themselves জানিতে পারি না। ভগবানকেও এইরূপ বিচার প্রণালী দ্বারা জানিতে পারা তাহার নিকট একবারেই অসম্ভব বলিয়া বোধহয়। তবে তিনি যে ভগবানকে একবারে অবিশ্বাস করেন তাহা নয়। ধর্ম্ম পরতন্ত্র বিচার প্রণালী (practical reasoning) বলিয়া অপর একটী জ্ঞান পথ তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এবং এইরূপ বিচার দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যদ্যপি আমরা ভগবানের অস্তিত্ব সাধারণ বস্তুর ন্যায় প্রমাণ করিতে না পারি তথাপি তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। নতুবা আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মময় জীবন পরস্পর বিরোধী সমস্যার নানা নিকেতন হইয়া আমাদের আপনার বলিতে যাহা কিছু তাহা সকলই অবাস্তব করিয়া তুলিত। কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের সত্যতা সম্বন্ধে আমরা কোনও প্রমাণের অপেক্ষা রাখি না। সুতরাং ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই।

ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে বুদ্ধদেব ব্যতীত বৃহস্পতি ও কপিল মুনি তাহাদের প্রচারিত চার্ব্বাক ও সাংখ্য দর্শনে যে মত প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে ঈশ্বরাস্তিত্বের বিরুদ্ধেই অনেক কথা বলা হইয়াছে। চার্ব্বাকের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র দর্শনকে কেহই মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে সমর্থিত বলিয়া গণ্য করেন না। স্থূলেন্দ্রিয় অতিরিক্ত আমাদের সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ও আছে এবং স্থূলেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু সমূহের ন্যায় সূক্ষ্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমূহেরও সত্যতা আছে। বরং সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের উপরেই স্থূলেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান সমূহ প্রতিষ্ঠিত। এখন যদি স্থূলেন্দ্রিয় অতিরিক্ত কোনও ইন্দ্রিয় স্বীকার করা যায় তবেই ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরাস্তিত্বের কথা আসিয়া পড়ে, এবং অপরাপর দার্শনিকেরা যে সমস্ত বিচার প্রণালী অবলম্বনে ঈশ্বর সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাসী ও কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন আমরাও সেইরূপ বিচার দ্বারা সেশ্বরবাদী হইতে বাধ্য হই, এবং ভগবান অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ থাকে না।

কপিল মুনির সাংখ্যদর্শনে যে প্রকৃতি পুরুষবাদ সমর্থিত ও বর্ণিত হইয়াছে তাহা দ্বৈতবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে এখনকার দিনে দর্শনজগতে এই মতটী সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত ও অগ্রাহ্যভাব বলিয়া বর্ণিত হয়। কারণ মনোবিজ্ঞানের হিসাবে দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট সত্তার ভিতরে কোনমতে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। এই সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে। এ প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বর্ত্তমানে ইহাই বলিয়া রাখিতে চাই যে এই দ্বৈত পদটী মানব মনের সন্তুষ্টি বন্ধন করিতে অসমর্থ হওয়ায় ইহার স্থানে এই প্রকারই একটা সেশ্বর দর্শনের আবির্ভাব হয়। তাহাতে ভগবানের স্থানে এক প্রধান পুরুষ কল্পিত দেখা যায়। এই প্রধান পুরুষ অপরাপর পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অপরাপর পুরুষসমূহ এই প্রধান পুরুষের অধীন। চার্ব্বাক দর্শনের মূল গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় না। একমাত্র সর্ব্বদর্শন সংগ্রহেই তাহার কঙ্কালসার বর্ত্তমান আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর এই দর্শনের উপর কেমন আস্থা ও ভক্তি ছিল।

এই কয়টী দর্শনের অবস্থা ও পরিণতি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিলে বেশ বুঝা যায় যে ভগবান ব্যতীত ধর্ম্ম কি দর্শন হওয়া এক প্রকার অসম্ভব! এবং ভগবান শূন্য ধর্ম্ম কি দর্শন প্রচার করিলে তাহা মোটেই টিকিয়া থাকিতে পারে না স্পেন্সার, কোমট্ সিলি প্রভৃতির মত বেশী দিন টিকিয়া থাকিয়া বহুসংখ্যক নর নারীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্যান্য নিরীশ্বরবাদও বেশী দিন ভগবানকে অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারে

নাই। এ বিশ্বের সহিত ভগবানের তুলনা সম্ভবপর হইলে বলিতাম ভগবান এমন একটী প্রাণ ও জ্ঞানময় সমতলক্ষেত্র যেখানে ছোট বড় প্রাণী জ্ঞানী প্রভৃতি বিশ্বের জাগতিক পদার্থ নিচয়ই আসিয়া মিলিত হয়। ইহার উপরেই সকল পাহাড় পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত। ইহার ভিতরই যাবতীয় রত্নরাজি লুক্কায়িত। এই অপূর্ব্ব সমন্বয় ক্ষেত্রে সকলকেই আসিতে হইবে। এক অদৃশ্য বন্ধনে ইহার সহিত সকলেই কোন না কোনরূপে আবদ্ধ। মানুষ হাজার চেষ্টা করিলেও নাস্তিক জগতে বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই অপূর্ব্ব সমতলক্ষেত্রে তাহাকে কোন না কোন প্রকারে আসিতেই হইবে। দীর্ঘকাল স্বপ্নভঙ্গের পর নির্ঝর যেমন উদ্দাম গতিতে সকল বন্ধন টুটিয়া সাগরের দিকে ছুটিয়া যায় মানবাত্মাও নাস্তিকতার স্বপ্নমোহ ছুটিয়া গেলে তেমনি বেগে ও আগ্রহের সহিত ভগবানের দিকে অবিশ্রান্ত গতিতে ধাবিত হয়; কোনও বাধা বিপত্তি মানে না। তখন প্রাণের ভিতর বাঁশরী সঙ্গীতের ন্যায় এক অপূর্ব্ব আনন্দ ধ্বনি বাজিয়া উঠে। সে আনন্দে প্রাণ এমন ভাবে মাতিয়া যায় যে নাস্তিকতার কথা তখন মনে হইলে কেমন একটু বিজাতীয় ঘৃণা ও উপহাসের ভাবটাই মনে হয়।

ভগবানই যদি ধর্ম্মের প্রাণ হয় তবে এই ভগবানের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা একটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে দাড়ায়। তিনি কেমন করিয়া এই বিশ্ব রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি কি অবস্থায় থাকিতেন এবং সৃষ্টির পরেই বা তাঁহার কি অবস্থা দাঁড়াইল, এবং সৃষ্ট জগতই বা কেমন করিয়া কোথায় চলিতে লাগিল, তাহা না জানিলে আমাদের জ্ঞানস্পৃহা মিটে না এবং প্রাণও অজ্ঞান অন্ধকারের আবরণ মুক্ত হয় না। আমরা যখন ভগবানের জীব তখন তিনি আমাদের কর্ম্মাকর্ম্মের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ পাপ করিলে আমরা কি শাস্তি পাইব এবং পুণ্য ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেই বা আমাদের কি লাভ এবং পুরস্কার মিলিবে তাহাও জানিতে ইচ্ছা হয় এবং তাহার প্রয়োজন আছে। এই সঙ্গে আরও একটী বৃহৎ প্রশ্ন আসিয়া পড়ে :—আমরা সকলেই ভগবান সম্ভূত। তিনি সুন্দর, আনন্দ ও মঙ্গলময়। তাঁহার তৈয়ারী জীব জন্তু প্রভৃতি তাঁহারি মত নির্ম্মল ও সুন্দর হওয়াই স্বাভাবিক। তবে জগতে দুঃখ, কষ্ট, জরা, মৃত্যু, শোক সন্তাপ কেন? মানুষ তবে পাপ করে কেন? যত দিন এই পাপ ও দুঃখ কষ্টের সমস্যার একটা সুন্দর ব্যাখ্যা না পাওয়া যাইবে ততদিন ভগবানকে সত্যং, শিবং, সুন্দরং, ঠিক অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিব না। আর যত দিন এই তিনটী বিষয়ে ভগবান সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে ততদিন আমাদের অবস্থাটী অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ের পথও অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সুতরাং এইকয়েকটী সমস্যাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্যতম। মৃত্যুর পর জীবন আছে কি না তাহাও জানা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা কি বিশ্বাস করিব যে আমাদের জীবন ঠিক বাষ্পের মত ক্ষণিক, মুহূর্ত্তের জন্য তাহা ভাসিয়া উঠে এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়, এবং তাহার চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান থাকে না। আমাদের জীবন যদি এমনই ক্ষণস্থায়ী হয় তবে চার্ব্বাকের মত ইন্দ্রিয়পন্থী হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার ফলস্বরূপ ধর্ম্মের ও ন্যায়ের নৌকা অগাধ জলধিতলে নিমজ্জিত হয়। এই সমস্যাটীর সমাধান না করিতে পারিলে আমাদের আত্মার ও ব্যক্তিত্বের স্বরূপও হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত দুরূহ হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য অপরাপর সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই এমনই কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া যায় যে পদে পদে ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়া সত্য ও অসত্যের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে হয়। স্থির বিশ্বাসটী আর হয় না। সুতরাং আত্মার স্বরূপ, জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে আত্মার অবস্থা কি ছিল, মৃত্যুর পরেই বা আত্মার অবস্থা কি দাঁড়াইবে এবং আত্মা অবিনশ্বর কি না এই সমস্ত বিষয়ে মোটামুটি একটী ধারণা না রাখিলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান একবারেই অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

তবে এই সমস্ত বিষয় জানিতে হইলে কয়েকটী কথার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত সঙ্গত।

প্রথমতঃ আমাদের মনে রাখা উচিত আমরা সান্ত; অনন্ত বা ভগবান নহি এবং আমাদের জ্ঞানও তদনুরূপ।

কোন কিছুই আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি না। ক্ষুদ্রতম বস্তুটীর সহিত বিশ্বজগতের সকল বস্তু বা প্রাণীর যে অসংখ্য সম্বন্ধ আছে তাহা নিরূপণ করা কোনমতেই আমাদের শক্তি বা সময় সাপেক্ষ নহে। সকল বিষয়েই আমাদের আংশিক জ্ঞান সম্ভবপর।

দ্বিতীয়তঃ মনে রাখিতে হইবে আমরা সবজান্তা নই। এ বিশ্বের অনেক বিষয়ই আমাদের জ্ঞানপথে পতিত হয় নাই। বিশ্ব মানবের মধ্যে যে সমস্ত তথ্য বিরাজিত আছে তাহার অত্যন্ত ক্ষুদ্রাংশই আমরা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়াছি বা হইব। অধিকাংশ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তাহাদের গন্ধ পাই সত্য কিন্তু তাহারা যে কি তাহা বুঝিতে পারি না। আরও দেখিতে হইবে যে এ বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুটী অন্যান্য জ্ঞাত অজ্ঞাত সকল বস্তুর সহিতই এক অলঙ্ঘনীয় বন্ধনে আবদ্ধ আছে। যতদিন তাহাদের একটীও অজ্ঞাত থাকিবে ততদিন আমরা কিছুই সম্পূর্ণভাবে জানিতে পারিব না।

তৃতীয়তঃ আমাদের মনে রাখিতে হইবে আমরা ভগবান সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে পারি না। ন্যায়-শাস্ত্রের বিবিধ প্রমাণদ্বারাও ভগবান সম্বন্ধে কিছুই নিরূপণ করা যায় না। এই বিষয়ে সকল প্রমাণই প্রথমতঃ একটা ধরিয়া লওয়া গোছের অর্থাৎ Hypothetical; অবশেষে যদি দেখা যায় এইরূপ প্রমাণ দ্বারা আমাদের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হয় এবং আমাদের জীবন, চিন্তন ও কর্ম্মের সহিত ইহার সামঞ্জস্য থাকে, তবেই ইহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এই বিচার প্রণালী দ্বারাই বিজ্ঞান জগতের অনেক সত্য আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হয়। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার তেমন বিশেষ কিছুই নাই তবে ইহাতে সন্দেহকে একবারে নিরাশ করিয়া দিতে পারে না। সকল বিষয়েই একটু না একটু অনিশ্চয়তা থাকিয়া যায়।

চতুর্থতঃ আমাদের সকল কথা ও চিন্তা দেশ ও কালের নিয়মাবদ্ধ। ভগবান এবং ধর্ম্মজগতের অন্যান্য অনেক বিষয় এই নিয়মের বহির্ভূত। সুতরাং আমাদের চিন্তা প্রণালী দ্বারা ভগবানকে পাইতে গেলে অথবা ভগবান সম্বন্ধে কোনও তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গেলে, দেশ কাল নিয়মের ভিতর দিয়া দেখিয়া অনেক গণ্ডগোলের ভিতর পড়িয়া যাই। এই গোলমালটুকুর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলে আমরা ভগবান সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিব কি না সন্দেহ

পঞ্চমতঃ আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে এ জগতের সৃষ্টি রহস্য একমাত্র ভগবানই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। পরন্তু এই রহস্যটী না জানিলে কিছুই ভাল করিয়া জানাও যায় না, বুঝাও যায় না। আমরা উহার আভাস মাত্র পাইয়া থাকি। আমাদের যে স্বরূপ কি, তাহা এই সৃষ্টি রহস্য না জানিলে ঠিক অভ্রান্তভাবে জানা সুকঠিন। সেই জন্য সকল জ্ঞাতব্য বিষয়েই কিছু না কিছু অনাঘ্রাত ও অজ্ঞাত কুহেলিকা থাকিয়া যায়। এই কয়েকটী কথা মনে রাখিয়া আমাদিগকে ধর্ম্ম-দর্শনের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইবে নতুবা আর উপায় নাই।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম, এ, বি, এল।

অভিনব রোগ নির্ণয় প্রণালী

আয়ুর্ব্বেদ মতে আমাদের দেশে পূর্ব্বে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করা হইত। অভিজ্ঞ কবিরাজগণ

ডাঃ বসু চক্ষু তারকা হইতে রোগ নির্ণয় করিতেছেন

নাড়ী টিপিয়া রোগীর শরীরের যাবতীয় রোগ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিতেন।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশ সমূহ হইতে আমাদের দেশে নানাবিধ রোগ নির্ণয় প্রণালীর আমদানী হইয়াছে। রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করা হয়। রোগীর দেহের রক্ত, মলমূত্র ইত্যাদি অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করা হয়। আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও এক্সরে (Xray) দ্বারাও রোগ নির্ণীত হইয়া থাকে। রোগভেদে এই সকল প্রকার প্রণালী হইতেই ফল পাওয়া যাইতেছে।

একটী কাল রেখা অঙ্কিত হইতেছে দেখিতে পাইল। সে তখন ঐ পেঁচার পা সাবধানে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে মুক্তি দিল। ঐ পেঁচা তাহাদের বাগানেই ছিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে পেক্‌জেলী পূর্ব্বে এই পেঁচার চক্ষুর যে অংশে কালদাগ দেখিতে পাইয়াছিলেন সেই অংশেই সাদা আঁকাবাকা রেখা লক্ষ্য করিলেন। অবশেষে পেকজেলী একজন চিকিৎসক হ'লেন এবং সেই পেঁচার চক্ষুর কথা স্মরণ করিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে চক্ষু

ডাঃ বসু অষ্টিওপ্যাথি প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেছেন।

ডাঃ বসু অষ্টিওপ্যাথি প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেছেন।

কিন্তু চক্ষু তারকা পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করার প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব। এই প্রণালী হাঙ্গেরী দেশীয় ইগনাজ পেকজেলী নামক একব্যক্তি অতি সামান্য ঘটনা হইতে উদ্ভাবন করেন। তিনি যখন এগার বৎসরের বালক তখন একটী পেঁচা ধরিবার জন্য বাগানে প্রবেশ করেন। পাখী আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বালকের হস্তেনখরাঘাত করাতে বালক পাখীর পা ভাঙ্গিয়া দেয়। যখন বালক ও পেঁচা উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইয়াছিল তখন বালক পাখীর চক্ষুর নিম্নভাগে

তারকা হইতে রোগ নির্ণয়ের এই নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

চক্ষু গোলকের স্বচ্ছ আবরণের পশ্চাতে চক্ষু তারকা বেষ্টিত যে মাংস পেশী আছে তাহাই সমস্ত অবয়বের দর্পণ স্বরূপ। দেহাভ্যন্তরে কোন পরিবর্ত্তন হইলে তাহার লক্ষণ এইস্থানে নানারূপ রেখাকারে প্রতিফলিত হয়। ঐ সকল রেখা পরীক্ষা করিয়া শরীরের যাবতীয় পরিবর্ত্তন যথার্থভাবে ধরা যাইতে পারে। এমনকি শরীরের কোন অংশ বেদনাযুক্ত হইলে রোগী যদি প্রকাশ

করিয়া বলিতে না পারে তবে তাহাও চক্ষু পরীক্ষায় বুঝা যায়। যে সকল শিশু কথা বলিতে পারে না চক্ষু দেখিয়া অতি সহজেই তাহাদের অসুস্থতা নির্ণয় করা যায়।

প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ডাক্তার এন্, কে, বসু বি,এস্‌সি, এম্. ডি, কলিকাতায় এই অভিনব প্রণালীতে রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা দ্বারা বহুরোগী নিরাময় করিতেছেন। ইনি আমেরিকার ডাক্তার দক্ষতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য স্বরূপ ডাক্তার লিণ্ডলার সেনিটরিয়ম হইতে প্রকাশিত পুস্তিকার এক অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। শিকাগো লুইস ইনষ্টিউটের অধ্যাপক ডাক্তার বসুর নিকট লিখিয়াছেন, "সম্প্রতি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত আমার একজন সুস্থও সবলকায় বন্ধুকে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া তাহার পূর্ব্বের কোন রোগ নির্ণয় করিতে পারেন কিনা তাহা দেখিবার জন্য আপনার

ডাঃ বসু ইলেক্‌ট্রো থিরেপী চিকিৎসা করিতেছেন।

ডাঃ বসু বালিকার শরীরাভ্যন্তরে যন্ত্র সাহায্যে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করাইতেছেন।

লিণ্ডলার সেনিটরিয়মে প্রধান চিকিৎসক ও ন্যাশনেল মেডিকেল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। আমাদের অত্যন্ত আনন্দের কথা যে ইনি পূর্ব্ববঙ্গের লোক। ঢাকা জিলায় বারদী গ্রামে ইঁহার নিবাস। এই অভিনব রোগ নির্ণয় প্রণালী ইনই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আনয়ন করেন এবং ইনি আমাদের দেশে উক্ত প্রণালীমতে একমাত্র চিকিৎসক।

ইঁহার চক্ষু তারকা পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় বিষয়ে নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। কেবল মাত্র চক্ষু পরীক্ষা করিয়াই আপনি নিম্নলিখিত ঘটনা গুলি বলিতে পারিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহার শরীরের অনেক অংশে আয়োডিন দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার নাসিকার ভিতরে ক্ষত হইয়া মধ্যস্থ আবরণে ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ জানুতে তিনি আহত হইয়াছিলেন, এবং তাহা এখনও দুর্ব্বল। বর্ত্তমানে তিনি অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছেন এবং উদরের অভ্যন্তরে

দক্ষিণদিকে প্রদাহে অনেকদিন কষ্ট পাইয়াছেন। এই সমস্ত কথাই সত্য। ইহার একটিও আমার বন্ধুর আকৃতি, মুখের ভাব, বা চলিবার ধরণ দ্বারা আপনার নিকট প্রকাশিত হয় নাই। আপনি কেবল চক্ষু তারকা

অষ্টিওপ্যাথি চিকিৎসা।

দেখিয়াই এই সকল বলিতে পারিয়াছেন।" ইঁহার চিকিৎসা প্রণালীর নাম—অষ্টিওপ্যাথীক স্নায়ুচিকিৎসা। দেহে ব্যাধি প্রবেশ করিলে স্নায়ু সমূহের ক্রিয়া মন্দীভূত ও বিকৃত হয় এবং স্নায়ুকেন্দ্রে অনুরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মেরুদণ্ডস্থিত স্নায়ুজাল হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সেখানকার স্নায়বিক অবস্থান সহজেই নির্ণয় করিতে পারেন। অষ্টিওপ্যাথী অনুসারে স্নায়ুকেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক পীড়ন দ্বারা স্নায়ুর অবস্থা সতেজ করিয়া শরীরে রক্তের বেগ বৃদ্ধি করা হয়; তাহাতে শরীরস্থ রোগের নিদানস্বরূপ আবর্জ্জনা রাশি স্বাভাবিক উপায়ে দেহ হইতে বহিস্কৃত হইয়া যায়। এই উপায়ে দেহস্থ বিবিধ যান্ত্রিক বিকৃতিও সুন্দর রূপে নির্ণীত হইয় সহজে এই চিকিৎসা দ্বারা আরাম হয়।

ইহা ছাড়া হোমিওপ্যাথী, হাইড্রোপ্যাথী বা জল চিকিৎসা, ইলেক্‌ট্রো থিরেপী বা বৈদ্যুতিক চিকিৎসা,

অষ্টিওপ্যাথি চিকিৎসা।

সিরাম থিরেপী বা রক্তের রসভাগ দ্বারা চিকিৎসা ইত্যাদি নানাপ্রকার নূতন চিকিৎসা প্রণালীতে ইনি অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ।

শ্রীবিমলানাথ চাকলাদার।

বীর।

শ্রম-শ্রান্তির নাই বিরতি ভ্রূক্ষেপ নাহি করে,
দুঃখ দৈন্যের নাই অবধি তথাপি নাহি ডরে।
হৃদয় দলি' ব্যর্থ-বেদন আঁখির কোণে আসে
দশের মাঝে দশের মত তবু যেজন হাসে।
মৃত্যু যাহার মাত্র সুহৃদ—তারেও নাহি চায়
ভবের মাঝে বীর বটে সে প্রণমি তা'র পায়।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী।

সের সিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইহার চতুর্থ দিবস রাত্রি ৮টার সময় আমি ও রতিকান্ত আমাদের ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি, এমন সময় দরজায় কেহ বাহির হইতে ধাক্কা দিল। আমি বলিয়া উঠিলাম কে-রে? কেহ জবাব দিল না, কিন্তু ধাক্কা সমান ভাবে চলিতে লাগিল। আমি বিরস হইয়া দরজা খুলিবার জন্ত উঠিলাম, কিন্তু রতি আমাকে মানা করিয়া পাশের একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ খুলিয়া দিল। বাহিরে চাহিয়া দেখি, একটা প্রকাণ্ড সিংহ দরজার কাছে বসিয়া রহিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ হইতে আজ ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করিলেন!

রতি নিজের বন্দুক লইয়া তাহার দিকে লক্ষ্য স্থির করিতে না করিতে সে অদৃশ্য হইল। পাশের একটা ঘেরা জায়গায় দুইটা ছাগল থাকিত। দুই চারি মিনিট পরে সেখান হইতে করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। পর মুহূর্ত্তেই কড়মড় আওয়াজ পাইয়া বুঝিলাম, সিংহ মহাশয় জলযোগ করিতেছেন।

পর দিবস সাহেব ও আমরা দুইজন সিংহের সন্ধানে বাহির হইলাম। সিংহ সেইস্থানে বসিয়াই একটা ছাগল উদরসাৎ করিয়াছিল, অপরটাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহাতে তাহার পশ্চাদনুসরণ আমাদের পক্ষে খুব সহজ হইয়াছিল। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলাম, একটা ঝোপের মধ্যে ছাগলের মৃতদেহ রহিয়াছে। একটাতেই তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হওয়াতে ইহাকে আর স্পর্শ করে নাই। উহার চারিদিকে আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধান করিলাম, কিন্তু সিংহের কোনও চিহ্ন পাইলাম না। তখন সাহেব পূর্ব্বের মত ছাগলের দেহের নিকট এক মাচান প্রস্তুত করাইলেন। সন্ধ্যার সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া উহার উপর উঠিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার পর সিংহটা অতি সন্তর্পণের সহিত আসিতেছে দেখিলাম। অল্প ক্ষণের মধ্যেই আমরা বুঝিলাম, তাহার লক্ষ্য ছাগল নয়, আমরা।

সিংহটা যখন মাচানের প্রায় ৫। ৬ গজ দূরে আসিল তখন সাহেব বন্দুক চালাইলেন। বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গে সিংহ পড়িয়া গেল। সাহেব তৎক্ষণাৎ আবার বন্দুক ছুড়িলেন। তাহা লাগিল কিনা ঠিক বুঝা গেল না। কারণ পরমুহূর্ত্তে সে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। পরদিবস প্রাতঃকালে আমরা তাহার অনেক সন্ধান করিলাম, কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

এই ঘটনার পর কয়েক দিবস পর্য্যন্ত সিংহটা আর দেখা দিলনা। আমরা ভাবিলাম, হয় সে মরিয়াগিয়াছে, নতুবা ভয় পাইয়া সাভো ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়াগিয়াছে। কিন্তু ২৭এ ডিসেম্বর আমাদের এ ভ্রম দূরীভূত হইল। ঐদিবস রাত্রে আমি ও রতিকান্ত শয়নের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় অদূরবর্ত্তী এক গাছের উপর হইতে ভীষণ কলরব শুনিতে পাইলাম। এই স্থানে বলিয়া রাখি যে, ঐ গাছের উপর একটা ঘর প্রস্তুত করিয়া ৫ জন কুলী বাস করিত। সন্ধ্যার সময় তাহারা মই লাগাইয়া উহার উপর আরোহন করিয়া মই তুলিয়া লইত। রাত্রে সহস্র কার্য্য পড়িলেও আর নামিত না।

আমার ঘরের একটা জানলা ঐদিকে ছিল। উহা খুলিয়া দিলাম, কিন্তু অন্ধকার বলিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কেবল কলরব শুনিতে পাইলাম। রতি চীৎকার করিয়া উহাদের গোলোযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিল বটে,কিন্তু প্রথমে কোন কথা শুনা গেল না। তাহার পর শুনিলাম, একটা বৃহৎ সিংহ আসিয়া গাছের তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং এক এক বার লম্ফদিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই অন্ধকার রাত্রে বাহিরে গিয়া সাহায্য করি এমন দুঃসাহস আমাদের ছিল না। রতি আমার পরামর্শে ঐ গাছ লক্ষ্য করিয়া দুইবার বন্দুক চালাইল। সে রাত্রে আর কোনও গোলোযোগ শুনিলাম না।

পরদিবস রাত্রিকালে সাহেব ও আমি ঐ বৃক্ষের উপর আশ্রয় লইলাম। তলায় একটা ছাগল বাঁধিয়া রাখা হইল। রাত্রি ৮টার সময় সিংহ মহাশয় উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল, প্রথম প্রথম সিংহেরা কিপ্রকার সাবধানতা ও চতুরতার সহিত কাজ করিত, শেষটা কিন্তু তাহা বজায় রাখিতে পারে নাই

ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, প্রথম প্রথম অনেক লোক ছিল, এইজন্য প্রত্যহই কাহাকেওনা কাহাকে উদরসাৎ করিত। এখন লোক সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছিল এবং যাহারা ছিল তাহারাও এমন ভাবে থাকিত যে শীঘ্র কাহারও অনিষ্ট করিতে পারিত না। শীকারের এই অভাব হওয়াতেই তাহারা শেষে যখন তখন, যেখানে সেখানে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল,এবং এইজন্য তাহাদেরও সিংহলীলা শেষ হইয়াছিল।

সাহেব প্রস্তুতই ছিলেন। পশুরাজ উপস্থিত হইবা মাত্র তাহার সম্বর্দ্ধনা হইল। এই আকস্মিক ব্যাপারে সে একবার ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং তাহার পরই পলায়ন করিল। সে রাত্রে তাহার আর সাক্ষাৎ পাইলাম না। পরদিবস প্রাতে আমরা তাহাকে চারিদিকে সন্ধান করিতে লাগিলাম। সিংহটার গুরুতর জখম হইয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল। যে পথে পলাইয়াছিল, উহা রক্তের ধারায় চিহ্নিত করিয়া গিয়াছিল। আমরা ঐ চিহ্ন ধরিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে যখন এক ঝোপের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন উহার ভিতর হইতে গর্জ্জন শব্দ শুনিয়া আমরা দাঁড়াইলাম। ভাল করিয়া দেখিবার পর বুঝিলাম যে, সিংহটা একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া আছে। সাহেব আগে, আমি তাঁহার পশ্চাতে। আমাদের দুজনের হাতে এক একটা বন্দুক। একটা বৃহৎ বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া সাহেব বন্দুক চালাইলেন। সিংহের দক্ষিণ পাটা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সে সবেগে সাহেবের দিকে ধাবিত হইল। সাহেব উহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় নলটা চালাইলেন, কিন্তু তাড়াতাড়িতে তাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। তিনি তখন পশ্চাদ্দিকে হাত বাড়াইলেন - উদ্দেশ্য আমার হাতের বন্দুক গ্রহণ করা।

সিংহটা যে মুহূর্ত্তে সাহেবের প্রতি ধাবিত হইল, আমি ভয়ে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া তখনই পাশের গাছটার উপর আরোহণ করিলাম। বন্দুকটা আমার হাতেই রহিল। উপরে একটা ডালের উপর বসিয়া যখন নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু তখন আর ভুল সংশোধনের উপায় নাই। একবার ভাবিলাম নীচে লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু পরক্ষণেই সিংহের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক চালাইলাম। ভগবানকে শত২ ধন্যবাদ যে, এক গুলিতেই সিংহ লুটাইয়া পড়িল, আর উঠিল না।

উপর্য্যুক্ত সিংহদ্বয় সম্বন্ধে লণ্ডনের Spectator পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, এইখানে তাহার কিয়দংশ উঠাইয়া দিলাম :-"It is curious that the Tsavo lions were not killed by poison .....From the story of the Tsavo River we can appreciate their services to man even at this distance. When the jungle twinkled with hundreds of lamps, as the shout went on from camp to camp that the first lion was dead, as the hurrging crowds fell prostrate in the midnight forest laying their heads on his feet, and Africans danced savage and the ceremonial dances of thanks giving. Mr. Patterson must have realised in no common way what it was to have been a hero and deliverer in the days when men was not yet undisputed lord of the creation, and might pass at any moment under the savage Dominions of the beasts."

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কোনও সময়ে এই দেশে আরব জাতিরা আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা আসিয়া এখানকার আদিম অধিবাসীদিগের স্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া যে নূতন জাতির সৃষ্টি করে তাহারাই আজকাল 'সোহালী' নামে প্রসিদ্ধ। সোহালী শব্দের অর্থ 'সমুদ্র তীরবর্ত্তী অধিবাসী'। ইংরেজ অধিকৃত পূর্ব্ব আফ্রিকার কূলের (British East Africa) ইহারাই প্রধান অধিবাসী। যাহারা জঙ্গলে থাকে, তাহারা প্রায়ই উলঙ্গ থাকে। সহরবাসী সোহালীরা সামান্য লেঙ্গট পরিয়া লজ্জা নিবারণ করে। উপকূলস্থ নগর সকলের সহিত ভিতরের যে বাণিজ্যের আদান প্রদান হয়, তাহাতে ইহারা কুলীর কার্য্য করে।

ইহাদের মেজাজ বড় প্রফুল্ল। একবার কুলিগিরি করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত খরচ হইয়া যায় ততদিন আর কাজ করে না। শেষে যখন একবারে কপর্দ্দক শূন্য হইয়া পড়ে, তখন আবার মোট ঘাড়ে করে। দেশী মদ্য পান করিয়া দিবারাত্রি নৃত্যগীত করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। ইহাদের মত খোসমেজাজী জাতি আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই। মাথায় হয়ত দুইজনের বোঝা; সমস্ত দিন গমন করিয়া প্রায় ২০।২৫ মাইল অতিক্রমের পর যখন উহারা বিশ্রাম করিতে বসে তখন উহাদের হাস্য কলরব শুনিয়া কেহ মনে করিতে পারিবে না যে উহারা সমস্তদিন এত কঠিন পরিশ্রম করিয়াছে। ইহারা সকলেই মুশলমান কিন্তু নানা প্রকার ভূত প্রেতের পূজায় ইহারা বিশেষ নিপুন। তবে ইহারা কোনও প্রকার মূর্ত্তি পূজা করে না।

অন্যান্য অসভ্য জাতিদিগের ন্যায় ইহাদের বিবাহ প্রথা একটু নূতন রকমের। প্রাপ্ত বয়স্ক না হইলে ইহাদের বিবাহ হয় না। যে পুরুষ যে রমণীকে বিবাহ করিতে চায়, সে প্রথমে ঈসারায় তাহার প্রার্থিতাকে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে। যখন উভয়ের মন বিনিময় হয়, তখন একদিন রাত্রিকালে নায়ক নায়িকাকে কোলের উপর উঠাইয়া লইয়া গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে। পরদিন উভয়ের অভিভাবকেরা দুইজনকে খুঁজিয়া বাহির করে। ঐদিন সমস্ত লোক একত্র হইয়া পানাহার ও নৃত্যগীতে অতিবাহিত করে। বিবাহের কোনও প্রকার বিশেষ অনুষ্ঠান নাই। এই বিবাহ বন্ধন যখন তখন ভঙ্গ হইতে পারে। স্বামী বা স্ত্রী যে কেহ ইচ্ছা করিলে পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক হইতে পারে। ব্যভিচারের বিশেষ কোনও সাজা নাই। তবে কেহ বল পূর্ব্বক কোনও রমণীর নারীধর্ম্ম নষ্ট করিলে, তাহাকে ক্ষতিপূরণ জন্য একটা বা দুইটা ছাগল দিতে হয়।

এখানে 'ওয়া-তয়তা' নামক আর এক রকম অসভ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও সোহালীদিগের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণের, কিন্তু দেখিতে আরও কুৎসিৎ। অনেকটা কাফ্রিদিগের ন্যায়। একবার আমি ও রতি এক 'তয়তা গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। রতিকান্ত পুরা বাঙ্গালীর বেশে এবং আমি ঢিলা পাজামা, কোট ও পাগড়ী পরিয়া গিয়াছিলাম। গ্রামের প্রধান আমাদিগকে বিশেষ আদরের সহিত তাঁহার বাড়ী লইয়া গেলেন।

গ্রামের সমস্ত ঘর বাড়ী মাটির—ছাউনি পাতার। প্রধানেরও তাই,তবে তাঁহার অধীনে তিনখান ঘর ছিল। গ্রামের মধ্যে একাধিক ঘর আর কাহারও ছিল না। আসবাব ইত্যাদি হয় মাটির, নচেৎ হাড়ের। মাথার খুলির পানপাত্র অনেকের ঘরেই দেখিলাম। মেয়েরা হাড়ের চুড়ী, হাড়ের হার, হাড়ের মল, এবং হাড়ের মাকড়ী খুব ব্যবহার করে। কটিদেশে একখণ্ড বস্ত্র ভিন্ন অঙ্গের অপর কোনও আবরণ দেখিলাম না। রতিকান্ত পান করিবার জন্য জল চাওয়াতে একজন স্ত্রীলোক এক বৃহৎ মরার খুলীতে জল লইয়া উপস্থিত হইল, এবং নিজে প্রথমে জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিয়া পরে রতিকে প্রদান করিতে উদ্যত হইল। আমাদের চক্ষু স্থির! জলপান মাথায় রহিল। পরে শুনিলাম, এ দেশের ইহাই প্রথা।

প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া বুজরুক থাকে। একাধারে সে-ই পুরোহিত, কবিরাজ ও ওঝা। পূজা পাঠ, চিকিৎসা, ঝাড়ন প্রভৃতি সমস্ত কাজ ইহার হাতে। পীড়ার সময় ইহারা প্রায়ই মন্ত্রাদি ব্যবহার করে। ঔষধের ব্যবহার খুব কম। কাহারও পীড়া হইলে বুজরুক মহাশয়কে আহ্বান করা হয়। তাঁহার দর্শনীর ব্যবস্থা প্রথমেই করিতে হয়। এক আধ সের চাউল বা দাউল, বা কোনও তরি তরকারিই প্রায় তাঁহার দর্শনী নির্দ্দিষ্ট হয়। গ্রামের সর্দ্দার পীড়িত হইলে একটা মুরগী বা ছাগল দেওয়া হয়। অনেক স্থানে ইহারা রক্তমোক্ষণ করে। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতির ভয় নিবারণের জন্য এই বুজরুকেরা একপ্রকার কাল রংএর গুঁড়া ব্যবহার করে। ইহাদের বিশ্বাস, এই গুঁড়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিলে কোনও প্রকার হিংস্র জন্তু সেখানে আসিতে পারে না। দেশে সময়ে বৃষ্টি না হইলে ইহারা মন্ত্র পড়িয়া বৃষ্টি আনয়ন করিবার পর্য্যন্ত ভান করে। এই শ্রেণীর লোক প্রায়ই চতুর হয়। তাহারা আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া

প্রায়ই বৃষ্টির উপযুক্ত সময় বুঝিতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত না ঐসময় উপস্থিত হয়, গ্রামের লোককে নানাপ্রকার অছিলায় ভুলাইয়া রাখে। যখন বুঝে যে দুই একদিনের মধ্যে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। তখন মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া নানাপ্রকার তুক্‌তারা করিতে আরম্ভ করে।

এদেশে বহুবিবাহ পুরুষদের মধ্যে অত্যধিক প্রচলিত। এখানে পুরুষের বিবাহে অর্থ ব্যয় করিতে হয় বলিয়া বহুবিবাহ প্রধানতঃ শ্রীশালী লোকদিগের মধ্যেই অধিক প্রচলিত। এদেশে লোকের স্ত্রীর সংখ্যা দ্বারা তাহার পদমর্য্যাদা নিরূপিত হয়।

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এখানে সর্ব্বাঙ্গে চর্ব্বিমর্দ্দন করিয়া থাকে। পুরুষেরা ঐ চর্ব্বির সহিত লাল রংএর মৃত্তিকা লেপন করে। স্ত্রীলোকেরা লোহার তার হাতে ও পায়ে জড়াইয়া অলঙ্কারের সাধ মিটাইয়া লয়। কানে বড় বড় হাড় নানাপ্রকার রংএ রঞ্জিত করিয়া ধারণ করে। যাহারা সহরে থাকে ও কোনও সাহেবের নিকট কাজ করে তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ অনেকটা উন্নত হইয়াছে এমন কি অনেককে আম হ্যাট, কোট পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি।

আহারাদি বিষয়ে ইহাদের কোনও প্রকার বাচবিচার নাই। গম এদেশে জন্মায় বটে, কিন্তু ইহারা তাহা ব্যবহার করে না। কোনও কোনও স্থানে চাউল ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বর্ষা এদেশে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জঙ্গলের মধ্যে বাস করে বলিয়া সকলেই ঘোর মাংসপ্রিয়। ১০।১৫ দিনের পচা মাংস পর্য্যন্ত ইহারা বিশেষ আদরের সহিত ভক্ষণ করে। টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতিও ইহাদের নিকট অতি উপাদেয় আহার। রন্ধনের প্রথা বড় একটা নাই। অগ্নিতে দগ্ধ হইলেই যথেষ্ট হইল। তবে আম মাংস ভক্ষণ করিতে আমি কাহাকেও দেখি নাই।

ইহাদের ধর্ম্মমতটা যে কি, তাহা আমি বোধ হয় ঠিক বুঝিতে পারি নাই। তবে ইহাদের মধ্যে অনেকেই যে animists বা ভূতোপাসক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহাদের একটা ক্ষীণ ধারণা আছে। তিনিই যে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ইহারা জ্ঞাত আছে। তবে তাঁহার বিষয়ে আর কোনও সংবাদ ইহারা রাখে না বা রাখা আবশ্যক মনে করে না। ইহারা বহুতর অপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করে। কাহারও কোনও বিপদ বা পীড়া হইলে গ্রাম্য পুরোহিতের সাহায্যে তাহাদিগের উপাসনা করে। কখনও অপদেবতাদিগের উদ্দেশে মুরগি, ছাগল প্রভৃতি বলি প্রদান করে। আমাদের রেলের কাজে অনেকগুলি এই দেশীয় লোক কুলির কাজ করিত। সিংহের উপদ্রবের সময় উহারা প্রায়ই অপদেবতার পূজা করিত এবং তদুপলক্ষে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত নৃত্যগীতাদি চলিত। ইহাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর ইহাদিগের সকলকেই নরকে যাইতে হইবে। সেখান হইতে সকলকে আবার এই জগতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

আমাদের রেল আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই এদেশে মিশনরিরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অজস্র অর্থব্যয়ে ও অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণে এ দেশের অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। মিশনরিরা ইহাদের জন্য স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া ইহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করিতেছেন। স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। চেষ্টার কোনও প্রকার অভাব নাই। কিন্তু মিশনরিদিগের মুখেই শুনিলাম যে, আশানুরূপ ফল হইতেছে না। ইহারা এপ্রকার ঘোর অসভ্য যে, কোনও শিক্ষাই ইহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছে না। প্রাচীন ধারণা ইহারা কোনওমতে ছাড়িতে পারিতেছে না। আমরা স্বচক্ষে অনেক খ্রীষ্টানকে দেশীয় পূজায় যোগদান করিতে দেখিয়াছি। অথচ তাহারাই আবার প্রত্যেক রবিবারে গীর্জ্জায় বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করে। তবে ধন্য অধ্যবসায় মিশনরিদিগের! তাঁহারা বিন্দুমাত্র নিরাশ হন নাই। স্বদেশ, স্বজন প্রভৃতি ছাড়িয়া এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়াছেন। এমন অনেক স্থান আছে, যাহার ৭০।৮০ মাইলের মধ্যে আর কোনও ইংরাজ নাই। একা তিনি এই অসভ্যদিগের উন্নতির আশায় এই ঘোর বিদেশে বেশ প্রফুল্লভাবে দিন কাটাইতেছেন। যে প্রকার দেখিলাম, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে আফ্রিকার সমস্ত অসভ্য জাতি খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

খোকা

(১)

মাটীর পুতুল হাতী ঘোড়া টুপি টোপা দিয়ে
খেল্‌ছিল মোর সোণামাণিক মেনি বিড়াল নিয়ে।
একলা আমার সংসারের কাজ—দোসর নাইকো আর,
তাইতে যাদুর কোণে উঠার সখ মিটানো ভার।
হাতের কাজটী হাতে করি—চটু করে তার পানে
এক লহমা লইগো চেয়ে, প্রাণের বিষম টানে।

(২)

কখন দিচ্ছে ঘোড়ার মাথা মুখের ভিতর পুরে,
পায়ের জুতা মাথার টুপী ফেল্‌ছে ছুঁড়ে দূরে।
আর আধ আধ গান গাইছে মেনির পানে চেয়ে,
অভিমানের মেঘে কখন মুখ্‌টা আস্‌ছে ছেয়ে।
তুলসি তলা লেপার হাঁড়ি কাৎ করিয়ে ভূমে,
কাদায় পড়ে সোনার নিধি পড়্‌ছে ঢলে ঘুমে।

(৩)

চোক্‌টী বুজে বসে আছে মেনি তাহার পাশে,
মিটু মিটিয়ে দেখ্‌ছে কখন কেউনি আবার আসে।
পুতুল গুলি আশ্‌ পাশে তার যাচ্ছে গড়াগড়ি,
একটু যেন সোয়াস্তিতে নিদ্রা দিচ্ছে পড়ি।
পাঁচ রঙের আর কাঠের বলুটী দূরে আছে পড়ে,
মাণিক যেন ঘুমিয়ে আছে অভিমানের ভরে।

(৪)

রইল পড়ে হাতের কাজ সব আর কিগো হাত চলে,
বাছায় হেরে চোক্‌ দুটী আজ আস্‌ছে ভরে জলে।
আকাশের চাঁদ পেতাম যদি পাশাপাশি তার
দেখ্‌তাম দুয়ের মাঝে কেমন কোমলতা কার।
দেখ্‌তাম যারে বুকে ধরে প্রাণ্‌টা শীতল হয়,
যাদুমণির পাশে আমার চাঁদের পরাজয়।

(৫)

রাঙা অধর হাসির রেখায় কেমন যায় গো দেখা,
দেখ্‌তে যে চাও, চুপ্‌টা করে রূপ্‌টা দেখো একা।
কোমল দুটী আঁখির পাতা হাসি দিয়ে মাখা,
পাত্‌লা মেঘে শরৎকালের চাঁদটী যেন ঢাকা।
শতদলের শয্যাপেতে নীল সাগরের বুকে,
লক্ষ্মীরাণীর বক্ষ পরে ঘুমায় যদি সুখে,
তার চেয়ে এই মাটীর উপর যাদুর শোভা কত!
ভগবানের চরণ তলে মাথা করে নত—
দিবানিশি ভিক্ষা মাগি রক্ষ "নারায়ন"
ধূলায় ধূসর 'নন্দকিশোর' মায়ের আঁচলের ধন।

শ্রীকুন্দমালা দেবী।

ময়মনসিংহে কবিগান।

কবিগান যে কোন্ সময় হইতে ময়মনসিংহের সঙ্গীত-প্রিয় প্রাণগুলির উপর স্বীয় রূপ-মাধুর্য্যের সুধাধারা ঢালিয়া আসিতেছে, এবং কোন্ সময় হইতে যে, মান, মাথুর, যোগী, ভোর, গোষ্ঠ, "শক্তিশেল", রাম বনবাস, নিমাই সন্ন্যাস ও পূর্ব্বরাগ বাসক সজ্জা প্রভৃতি রসাত্মক কবিগানগুলি পল্লী কবি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া, বঙ্গীয় গীতি সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছে, ইহা আমরা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারিব না। তবে অনেকে অনুমান করেন যে, ময়মনসিংহের বোরগ্রাম নিবাসী বিখ্যাত কবি নারায়ণ দেবের "পদ্মাপুরাণ" বা "মনসার ভাসান" রচনার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই এ জেলায় কবিগানের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে।

দুই চারিটী প্রাচীন কবিগানের ভাষাও পদ্মাপুরাণের ভাষার সাদৃশ্য দর্শনে কোন কোন বিজ্ঞব্যক্তি বলেন, 'ময়মনসিংহের কবিগান পদ্মাপুরাণের সম-বয়স্ক। সে যাহা হউক, কবিগান যে বহুকাল হইতেই ময়মনসিংহে প্রচলিত হইয়াছে, এ কথায় আর সন্দেহ নাই।

যখন "এণ্টুনি" সাহেব বিলাতী গলায় কবিগানের চেতান ধরিয়াছিলেন,—যখন সীতানাথ চক্রবর্ত্তী, ভোলা ময়রা, হরিদাস বৈরাগী প্রভৃতি কবিগণ কলিকাতা সহরে কবিগানের তুফান তুলিয়াছিলেন,—যখন ঢাকা জয়দেবপুর রাজ বাড়ীতে দিবা-রাত্রি কবির আখ্‌ড়াই বাজিত, তখন ময়মনসিংহেরও প্রায় সকল বাজার, বন্দর, এবং পল্লীগ্রামের স্থানে স্থানে কবিগানের আনন্দ স্রোত খুব্‌ সজোরে চলিতেছিল।

আমি ছোটবেলায় প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে কবিগান সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি। এবং তাঁহারাও বৃদ্ধ-মুখে কবি-কথা অনেক শুনিয়াছেন, বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব কবিগান যে ময়মনসিংহের একটী পূর্ব্বতন সঙ্গীত সম্পদ, একথায় দ্বিরুক্তি নাই।

এখন আমার বয়স প্রায় বাইটে পঁহুছিয়াছে। যখন আট দশ বৎসরের বালক ছিলাম, তখন ময়মনসিংহের পল্লীতে পল্লীতে বহু প্রাচীন কবিগণকে কবিগান করিতে

দেখিয়াছি। তখনকার কবিগণ মধ্যে আমতলার লোচন কর্ম্মকার, চাইরগতিয়ার হারাইল বিশ্বাস, তারাচাপুরের চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, দগ্‌দগার কানাই নাথ, বলাই নাথ,—ঘাটাইলের হরেকৃষ্ণ নাথ, সত্রশিরের ছাড়ুনাথ, কালীপুরের লোকনাথ চক্রবর্ত্তী ও শক্তিগ্রাম কপালি প্রভৃতি কবিগণ বিশেষ খ্যাত ছিলেন।

তৎপর রামু, রামগতি ও রামকানাইর সময়। ইঁহারা কিছুকাল কবিগান দ্বারা ময়মনসিংহকে আনন্দ মুখরিত রাখিয়া আনন্দ ধামে চলিয়া গেলে, বর্ত্তমানে পূর্ব্ব ময়মনসিংহে কোন ভাল কবিওয়ালা দেখা যায় না। পশ্চিম ময়মনসিংহে একমাত্র বিরুণীয়ার—হরি হর।

রামু, রামগতি, রামকানাইর সময়ে যে সকল প্রত্যুৎপন্ন মতি সম্পন্ন নবীন কবিওয়ালার অভ্যুদয় দর্শনে প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছিল,—একে একে তাঁহারাও ময়মনসিংহের বুক খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

শম্ভু জেলে, কালীচরণ দে, পরাণ কর্ম্মকার, রামদয়াল নাথ, হরচন্দ্র আচার্য্য, গোবিন্দ আচার্য্য, কৃষ্ণমোহন মালী ও কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি নূতন কবিরা অঙ্কুরেই কালকুঞ্জরের পদাঘাতে দলিত হইয়া গিয়াছেন। এখন বেতাটীর কালীকুমার ধর,—হাপানিয়ার সাধু সেখ, গোবিন্দপুরের ঈশান দত্তই আশার আলো।

অতি পূর্ব্বে বর্ত্তমান সময়ের মত ঢোল-কাঁশী সংযোগে কবিগান করা হইত না। তখন খোল, করতাল, আর বেহালার প্রচলন ছিল। এখনকার মত তখন কবিগানে ছড়া-পাঁচালী এত অতি মাত্রায় হইত না; কেবল দলের বিশ্রামের জন্য দু' চা'র কথা বলা হইত মাত্র। এখন যেমন কথার কাটা কাটি হয়,—চালাকী চাতুরী প্রদর্শন করা হয়,—কৌশল পূর্ণ উত্তর করিয়া "বাহাবা" লওয়া হয়, তখন তা' না লইয়া কেবল গান, গানের জওয়াব, টপ্পা, টপ্পার জওয়াব হইত। ইহাতেই কবিগণের কৃতিত্ব প্রকাশের স্থল বহু বিস্তৃত ছিল।

ছড়া পাঁচালীর মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া মধ্য সময়টাতে কবিগানে কিছু অশ্লীলতার আধিপত্য জন্মিয়াছিল। সুতরাং ভদ্রলোকেরা অনেক সময় কবিগানের নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন। ভগবানের কৃপায় অর্দ্ধ-সভ্য-কবিদিগের সেই সংক্রামক ব্যাধি প্রায় সারিয়া গিয়াছে।

ভদ্রলোকেরা যেমন অশ্লীলতার দুর্গন্ধে কবিগান হইতে মনকে তুলিয়া লইয়াছিলেন,—তেমনি এখন আবার কবিগানের ভিতর ভক্তিরসের প্রাণারাম সুগন্ধ লাভে সন্তুষ্ট হইয়া মনোনিবেশ করিয়াছেন।

কবিওয়ালাদের আদব-কায়দা, সৌজন্য-শিষ্টাচার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন আর অমার্জ্জিত অপভাষা ব্যবহারে কেহ কবিগানকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন না। কবিগান সভ্য সমাজের সম্মুখে নূতন শ্রীধারণ করিয়া দাঁড়াইতেছে। সুখের কথা বটে।

এখনকার মত পূর্ব্বেও দুইদলে 'লড়ক' * লাগিত। জেদের উপর নির্ভর করিয়া এই লড়ক দুই তিন দিন পর্য্যন্ত থাকিত।

আক্ষেপের বিষয় আমাদের প্রাচীন কবিদিগের রচিত লীলারসাত্মক গান গুলি আর পাওয়া যাইতেছেনা। বহু চেষ্টায় যদিও দুই একটী পাওয়া যায়, তাহাও অঙ্গহীন। কোনটার বা চিতান আছে মহড়া নাই,—কোনটার বা মহড়া আছে লহর নাই।

কোন কোন গানের আদ্যন্ত শূন্য, কেবল মধ্যের পদ গুলি আছে। এই সকল আয়াস লব্ধ অঙ্গহীন গীত সমূহের যে যে অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—তাহা এত মধুর যে আস্বাদ করিবা মাত্র অবশিষ্টাংশের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

নিম্নে দু' একটী গীতের লব্ধাংশ সৌরভের সহৃদয় পাঠক পাঠিকার গোচরার্থ লিখিয়া দিলাম।

গীত।

চিতান,—শ্রীরাধিকার মান,—ভাঙ্‌তে শ্রীনিবাস।
পারাণ,— পায়ে ধরে, ধরায় পড়ে,—
তবু রাধার না পায় আশ্বাস।
লহর,—রাধানাথ,—রাধার মানে
পেয়ে অপমান,—হত জ্ঞান,—

---

* 'লড়ক' শব্দটীর প্রাদেশিক অর্থ—যুদ্ধ। কেবল গান যুদ্ধেই 'লড়ক' শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, অন্য যুদ্ধে নয়।

কিছুই না পেয়ে সন্ধান,—
ভাসে দু'টী চক্ষের জলে, চলিতে দু' পা পিছলে,
রাই ব'লে রাই কুণ্ডের জলে, প্রাণ ত্যজিতে যান।
মিল,—(দেখে) কৃষ্ণ আকুল, সব শোকাকুল
গকুল বাসী যত,—
চন্দ্রাদাসী আসি বলে, "ও কি করেছ!
মহড়া,—বিপদ ভঞ্জন,—বল কি বিপদে পড়েছ?
ধুয়া,—চন্দনের বিন্দু ভালে, ইন্দু যেমন সিন্ধু জলে,
তেম্নি দেখ্‌তে পাই,—
শশী মুখে কালো শশী,—
সুধা মাখা মধুর হাসি নাই;—
চন্দ্র যেমন রাহুগ্রস্ত, তেম্নি মত দেখি ব্যস্ত,
কি ভাবেতে এত ত্রস্ত, কোথায় চলেছ?
(বিপদ ভঞ্জন! বল কি বিপদে পড়েছ?)
খাদ,—কি ভাবে কি মনোদুঃখে অসুখে আছো?
লহর,—কেন হে!—ঝর ঝর ঝরে দু' নয়ন,—
মনমোহন,—একি দেখি কুলক্ষণ?
কৃষ্ণ তোমার কান্না দেখে, কোকিল কাঁদে তমাল বৃক্ষে,
পশু-পাখী মনের দুঃখে ধরায় অচেতন।
মিল,—তোমার নয়নে না ধরে বারি,—
উৎকণ্ঠিত মন,—মধুসূদন!
বল কি ধন, হারা হয়েছ?
(বিপদ ভঞ্জন! বল কি বিপদে পড়েছ?)
অন্তরা,—একি বিপরীত! চিত্ত বিচলিত,
কেন,—কেন বনমালী।
আমি তোমার দাসী চন্দ্রাবলী।
যোগী ঋষি যোগে—জপে কৃষ্ণ নাম,
অনায়াসে অন্তে পায় মোক্ষ ধাম,
বল বল শ্যাম,—রাধা কা'র নাম,
উন্মত্ত হয়েছ যে বোল বলি।"

এই গীতটীর অপরাংশ অর্থাৎ পরচিতান ও পর চিতানের লহর-মিল পাওয়া যাইতেছে না। এবং এই গীতটীর উত্তরের পর যে পাল্‌টা গীত ছিল, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছি না।

পল্লী কবি কৃত এই গীতটীর মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর ভাবের সমাবেশ দেখা যাইতেছে।

শ্রীমতী রাধিকা সারাটা দিনের উদ্যোগে, গোপনে গোপনে বিশাখাদি সখি সমূহের সহায়তায় কৃষ্ণ সেবার জন্য ফুল তুলিয়াছেন, ফুলের মালা গাঁথিয়াছেন, চন্দনাদি সুগন্ধি সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন, যমুনার সুশীতল জল কর্পূর দ্বারা সুবাসিত করিয়া সোণার ডাবর ভরিয়া রাখিয়াছেন, ক্ষীর সর, নবনীত (জটিলা-কুটিলা না দেখে মতে) সকাল বেলায় অতি যত্নের সহিত সংগোপনে এক স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন।

এইরূপে কৃষ্ণ-সঙ্গ-সুখ-লালসায় কৃষ্ণগতপ্রাণা কমলিনী প্রস্তুত হইলেন; এবং "কৃষ্ণ অবশ্যই আসিবেন", বংশীরবে এই সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়া উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে সারাটা দিবস কাটাইয়া, যামিনীর দ্বিতীয় যামে রঙ্গিনী রাই সঙ্গিনী গণ সঙ্গে লইয়া নিকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন।

কর্ম্মকুশলা সখিগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সুন্দর ফুল দিয়া শয্যা রচনা করিয়া ফেলিলেন। তৎপর সকলে মিলিয়া ভগবানের আগমন পথ চাহিয়া রহিলেন।

সারাটা রাত্রি আসার আশে অতিবাহিত হইয়া গেল, কৃষ্ণ আসিলেন না। নিরাশার মর্ম্মন্তুদ বেদনায় কমলিনী কাহিল হইয়া পড়িলেন; সখিগণও নিরানন্দ নীরে ডুবিয়া গেলেন। কৃষ্ণ সেবার সামগ্রী সকল অতি সকালেই, যমুনার জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে! কৃষ্ণ আশা দিয়া আর আসিলেন না, এ দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই, আনন্দোদ্ভাসিত-কুঞ্জ-কুটির বিষাদ কালিমায় ছাইয়া গেল!!

নিশি ভোরে পাখীরা প্রভাতী গীত গাহিয়া সুপ্ত জগতকে জাগাইয়া তুলিতে লাগিল, বিরহবাণ বিদ্ধা কুরঙ্গিনী শ্রীরাধিকা শয্যা ছাড়িয়া নিকুঞ্জের এক প্রান্তে পড়িয়া আছেন। সখিরা সকলে মিলিয়া এখন মানে মানে রাইকে লইয়া গৃহে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

এমন সময় বহু বল্লভ লম্পট শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ সারা নিশি জাগিয়া, চন্দ্রাবলী সেবা-সাধ পূর্ণ করণান্তর শ্রীমতীর কুঞ্জ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত।

নাগররাজ কপট হাস্যের আবরণে আপন সংক্ষুব্ধ চিত্তের ভীতি ভাব লুকাইয়া রাখিবার বিফল চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চতুরা সখিগণের নিকট তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরা পড়িতে আর বিলম্ব হইল না। চন্দ্রাবলীর সম্ভোগ চিহ্ন সকল শ্রীমতী পক্ষের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিল। সখিরা ব্যঙ্গ ছলে শ্রীকৃষ্ণকে নানা মত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীকৃষ্ণের শঠতা বুঝিতে পারিয়া মান করিয়া বসিলেন,—সে মান সহজ মান নহে, দুর্জ্জয় মান।

কৃষ্ণ অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া সখিগণের নিকট হইতে কুঞ্জ প্রবেশের অনুমতি পাইলেন। কুঞ্জে যাইয়াই দেখেন; রাই শশী মান রাহুগ্রস্তা হইয়া অধোবদনে ধরাসনে বসিয়া আছেন ভাব দেখিয়া কৃষ্ণের প্রাণ উড়িয়া গেল। আর উপায় নাই। কিছুকাল আপন অপরাধের ও শ্রীমতীর কষ্ট চিন্তা করিয়া মানাপনোদন জন্য অতি করুণ ভাষায় স্তুতি করিতে লাগিলেন। দয়ার আশায় দর দর চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না, অগত্যা বেগতিক দেখিয়া,—"দেহিপদপল্লবমুদারং" বলিয়া, শ্রীমতীর পাদপদ্ম ধরিয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। তথাচ শ্রীমতীর নিকট মানত্যাগের কোন আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন না।

গীত রচয়িতা কবি, এখান হইতেই গীতের চিতান পারাণ সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা,—

"শ্রীরাধিকার মান, ভাঙতে শ্রীনিবাস। পায়ে ধরে, ধরায় পড়ে, তবু রাধার না পায় আশ্বাস॥"

এখানে পাঠক বলিতে পারেন, যে, কেবল মাত্র কৃষ্ণ যে রাধার পায় ধরিয়াছিলেন, এই স্থান হইতে ধরিয়া বলিলেই হইত, ইতিপূর্ব্বে এত কথা লিখিবার প্রয়োজন ছিল কি?" কি করি? মানের কথা মনে করিতেই, মানের কারণগুলি আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। সুতরাং লেখনীর গতিরোধ করা তখন মাদৃশ অনভিজ্ঞ লেখকের অসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

পায় ধরিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া নাগর বুঝিতে পারিলেন, যে "আমা হইতে এই দুর্জ্জয় মানভঞ্জন সম্ভবপর নহে। তবে আর রাধা-উপেক্ষিত এই পাপ জীবন লইয়া গকুলে বাঁচিয়া থাকিব কেন? রাধা বলিয়া রাধাকুণ্ডের জলে প্রাণত্যাগ করাই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।" এই বলিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণ প্রাণত্যাগ করিবার জন্য রাধাকুণ্ডের দিকে যাইতেছেন।

কবি, শ্রীকৃষ্ণের এই স্বগত ভাবটী নিজের উক্তিতে প্রথম লহরে অতি পরিষ্কার করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যথা,—

লহর—"রাধানাথ, রাধার মানে পেয়ে অপমান, হতজ্ঞান, কিছু না পেয়ে সন্ধান, ভাসে দুটী চক্ষের জলে চলিতে দু'পা পিছলে, রাই বলে রাইকুণ্ডের জলে, প্রাণ ত্যজিতে যান।'

এই লহরটীতে যে কেবল কৃষ্ণের স্বগত চিন্তা প্রকাশ পাইযাছে, এমন নহে, রাধা-মানের অপমান জনিত শোকের চিত্রটীও অতি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ রাধা রাধা বলিয়া রাধাকুণ্ডের দিকে যাইতেছেন, পথে চন্দ্রাবলীর সহিত সাক্ষাৎ। চন্দ্রা শ্রীকৃষ্ণের ভাবান্তর ও অবস্থা দৃষ্টে হাস্যমুখে পরিহাসচ্ছলে বলিতেছেন, "নাগরমণি আমার, কোথায় কি করিয়াছ? তোমার এ দশা কেন? বিপদ ভঞ্জন! বলতো শুনি কি বিপদে পড়িয়াছ?"

গীতের মিল ও মহড়ার পদে এই ভাব। এই গীতের জওয়াব করিতে হইলে, বিপক্ষ পক্ষকে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে চন্দ্রাবলীর উপর্য্যুক্ত প্রশ্নেরই উত্তর করিতে হইবে।

গীতের প্রশ্নটী এতই কৌশল পূর্ণ ও কঠিন যে উত্তর দাতাকে অনেকক্ষণ মাথা ঘামাইতে হইবে।

কৃষ্ণচন্দ্র, রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুই নায়িকারই প্রেমের পুতুল। কিন্তু, রাধার নিকট চন্দ্রাবলীর প্রণয়ের কথা গোপন, চন্দ্রাবলীর নিকট রাধা প্রণয়ের কথা গোপন। সারানিশি চন্দ্রার কুঞ্জে আনন্দে কাটাইয়া হঠাৎ প্রাতঃকালে কৃষ্ণের এমন দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইবার কারণ কি?

এই কারণটী কোনমতেই কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কাছে

বলিতে পারেন না। অথচ প্রশ্নও এই, "বিপদ ভঞ্জন, বল কি বিপদে পড়েছ ?"

পাঠক! এখন ভাবিয়া দেখুন, মুস্কিল কত ? এস্থলে অবশ্য কৃষ্ণকে প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া চাতুরী বাক্য দ্বারা চন্দ্রাবলীকে প্রবোধ দিতে হইবে ; ব্যপার সহজ নহে।

চন্দ্রাবলীর নিকট কৃষ্ণ আসল কথা গোপন করিলেও, চন্দ্রাবলীর বুঝিতে বাকি ছিল না, বিষয়টী কি ?

শেষের মিলের পদে ও অন্তরার পদে চন্দ্রাবলী স্পষ্টই বলিয়াছেন, "মধুসূদন, বল কি ধন হারা হয়েছে ?" অন্তরায়, "বল বল শ্যাম, রাধা কার নাম, উন্মত্ত হয়েছ যে বোল বলি।"

নিশি ভোরে রাধার কুঞ্জে গিয়া, কৃষ্ণ যে শ্রীরাধার দুর্জ্জয়মানে অবমানিত, লাঞ্ছিত হইয়াছেন, এ কথাটী চন্দ্রাবলী বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিয়াই, পরিহাস বাক্যে বলিতেছেন, "মধুসূদন, বল কি ধন, হারা হয়েছ ?" "বল বল শ্যাম, রাধা কার নাম" ইত্যাদি।

এই গীতের ধুয়ার পদটিতে কি সুন্দর উপমা দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণ কালো, আর চন্দন বিন্দু শুভ্র, গোলাকার ; কবি এই দুইটীকে সমুদ্র ও চন্দ্রের সঙ্গে উপমিত করিয়া বলিতেছেন "চন্দনের বিন্দুভালে, ইন্দু যেমন সিন্ধু জলে—তেম্নি দেখতে পাই।"

তৎপর বলিয়াছেন, "চন্দ্র যেমন রাহুগ্রস্ত, তেম্নিমত দেখি ব্যস্ত" এখানেও উপমাটী মন্দ হয় নাই। কৃষ্ণচন্দ্র রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মত অতি ব্যস্ত। ধুয়ারপদে আরো আছে, "শশীমুখে কালো শশী, সুধামাখা মধুর হাসি নাই।" কি সুন্দর !

ধুয়াটীতে যেমন উপমার মধুর আস্বাদ আছে, তেমনি অনুপ্রাসেরও মনোমুগ্ধ কর সুগন্ধ আছে।

মনে ছিল এইরূপ দুই-চারিটী গীত লিখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব ; কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়া যায় আশঙ্কায় আর লিখিতে সাহস হইল না।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

খাদ্য।

(সামিষ ও নিরামিষ)

অনেক সময়ে প্রশ্ন হয় যে আমাদের আহার সামিষ হওয়া উচিৎ কি নিরামিষ হওয়া উচিৎ।

ইহার উত্তর বলিতে হয় যে সামিষ কি নিরামিষ বুঝিনা। আহার আহারের উপযোগী জিনিষ হওয়া উচিৎ। জীবহত্যা উচিৎ কিনা সে সম্বন্ধে ভিন্ন ২ সম্প্রদায়ের ভিন্ন ২ মত, কিন্তু খাদ্য যে শরীর পরিপোষণোপযোগী হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কথাটা একটু পরিস্কার করি। যদি কেহ বলেন যে চক্রকে পিচ্ছিল রাখিতে হইলে স্নেহ পদার্থের প্রয়োজন, তাহা হইলে জীব-হত্যা উচিৎ কিনা এই প্রশ্ন উঠে কিনা সন্দেহ। ঐ পিচ্ছিল রাখিবার কাজ তিল, সর্ষপ, নারিকেল প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন তৈল, অথবা প্রাণিগণের মেদ কিম্বা জান্তব পদার্থজাত ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে।

মানবের জীবন ধারণ ও শরীর পোষণের জন্যই আহারের প্রয়োজন। প্রতিনিয়ত আমাদের শরীর ক্ষয় হইতেছে, এই ক্ষতি পূরণ না করিলে আমাদের দেহ অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, একমাত্র আহারের দ্বারাই এই ক্ষতি পূরণ হইতে পারে। প্রতিদিন আমাদের শরীর হইতে প্রায় ২½ সের জল, প্রায় ⁄১ সের অন্যান্য জিনিষ এবং ২ তোলা পরিমাণ যবক্ষার যান(Nitrogen) ও ১ পোয়া অঙ্গার (Carbon) বাহির হয়।

ফুস্ ফুস দ্বারা অধিকাংশ কার্ব্বণ ও আমাদের গৃহীত অকসিজন বাহির হয়। মূত্রের সহিত প্রায় সমস্ত নাইট্রোজেন ও প্রায় ২½ তোলা আন্দাজ ধাতব লবণ বাহির হইয়া থাকে। ঘর্ম্মের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ ও কার্ব্বনিক এসিড এবং মলের সহিত প্রায় ৩৫ রতি পরিমাণ লবণ বাহির হইয়া থাকে।

নিম্ন তালিকায় দৈনিক ক্ষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

	জল	নাইট্রজেন	কার্ব্বন	অন্যান্য
ফুস ফুস হইতে	১ পোয়া	—	১ পোয়া	½ সের
মূত্র যন্ত্র ,,	১¼ সের	১¼ তোলা	¼ তোলা	১ ছটাক
চর্ম্ম ,,	১½ সের	—	½ তোলা	২ তোলা
মল ,,	৮ তোলা	৩½ আনি	২½ তোলা	২¼ তোলা

দৈনিক আহারের দ্বারাই আমাদের এই ক্ষতি পূরণ করিতে হয়। এই অভাব পূরণের জন্য কি পরিমাণ আহারের প্রয়োজন তাহা বিচার করিতে হইলে এই নাইট্রজেন ও কার্ব্বন ক্ষয়ের পরিমাণ দ্বারাই করিতে হয়।

দৈনিক আমাদের শরীর হইতে মোটামুটি ১½ তোলা নাইট্রজেন ও ১ পোয়া কার্ব্বন ক্ষয় হইয়া থাকে।

এই নাইট্রজেনের ক্ষয় কেবল মাত্র মাংসজ (Protied) দ্রব্য দ্বারাই পূরণ হইতে পারে। যে খাদ্যে ছানা, এলবুমিন (albumen) প্রভৃতি না থাকে তাহা কখনও নিত্য খাদ্যরূপে পরিণত হইতে পারে না. কারণ তাহা দ্বারা আমাদের শরীরের ধ্বংসের পূরণ হয় না। অপর পক্ষে যে সকল খাদ্যে এলবুমিন প্রভৃতি পদার্থ থাকে তাহা লঘুপাক হইলে নিত্য খাদ্যরূপে আমাদের শরীর পরিপুষ্ট করিতে পারে। দুগ্ধ ঐ জাতীয় খাদ্য। সেই জন্যই মানব জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

মানব শরীরে বহু পরিমাণে মাংসজ (Protied) পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই জন্যই আমাদের শরীর পরিপোষণের জন্য এরূপ খাদ্য আহার করা প্রয়োজন যাহাতে প্রচুর পরিমাণে মাংসজ পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। এই খাদ্যের সহিত শরীর পোষণ উপযোগী খনিজ পদার্থেরও প্রয়োজন। মাংসজ (Protied) ও খনিজ (mineral) পদার্থ খাদ্যে থাকিলে মেদ (fat) কিম্বা শ্বেতসার (Carbo Hydrates) ব্যতীত ও শরীর পরিপোষিত হইতে পারে।

মাংসজ পদার্থ শরীরের অক্‌সিজনের সহিত মিলিত হইয়া কার্ব্বলিক এসিড্ এমোনিয়া ও জলে পরিণত হয়।

মাংসজ পদার্থে শতকরা ১৫ ভাগ নাইট্রজেন ও ৫৩ ভাগ কার্ব্বন থাকে। সুতরাং ১৩০ গ্রেণ মাংসজ পদার্থ আহার করিলে তাহাতে ২০ গ্রেণ নাইট্রজেন ও ৭০ গ্রেন কার্ব্বন গ্রহণ করা হয়, কিন্তু দৈনিক আমাদের শরীর হইতে ২৭০ গ্রেণ কার্ব্বন বাহির হইয়া যায়। কাজেই ঐ কার্ব্বন পূরণ করিতে হইলে আমাদের আরও ২০০ গ্রেণ কার্ব্বন গ্রহণ করা উচিৎ। এই অতিরিক্ত কার্ব্বন আমরা মেদ কিম্বা শ্বেতসার হইতে গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু ঐ অতিরিক্ত কার্ব্বন আমাদের উভয়বিধ খাদ্য হইতে গ্রহণ করিলে ভাল হয়। কারণ মেদে শত করা ৮০ ভাগ এবং শ্বেতসারে ৪০ ভাগ কার্ব্বন থাকে।

উহাদের একটা হইতে আমাদের প্রয়োজনের সমস্ত কার্ব্বন গ্রহণ করিতে হইলে পরিপাক যন্ত্রের উপরে অত্যন্ত অধিক চাপ দেওয়া হয় এবং তাহা দ্বারা নানারূপ উদরের পীড়া হইতে পারে।

যাঁহারা কেবল মাত্র শাক সবজি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে অত্যন্ত অধিক আহার করিতে হয়। কাজেই আহার্য্য হজম করিতে তাঁহাদের অধিকাংশ রক্ত পাকস্থলির নিকট সঞ্চালিত হইয়া থাকে। সেজন্য অতিরিক্ত মস্তিষ্কের কাজ করিলে তাঁহাদের বদ হজম হইয়া থাকে। অতিরিক্ত আহারের দ্বারা তৃণ ভোজী জীবের মত তাঁহাদের পাকস্থলি ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

একমাত্র মাংস কিম্বা একমাত্র শাক সবজির উপরে নির্ভর করিতে হইলে আমাদিগকে উহা অতিরিক্ত পরিমাণে আহার করিতে হয় কিন্তু তাহা দ্বারা পরিণামে নানারূপ ব্যাধি হইবার আশঙ্কা থাকে। কাজেই ঐরূপ অতিরিক্ত এক জাতীয় খাদ্য অপেক্ষা আমাদের দুগ্ধ, ডিম্ব, শাক-সবজি, মৎস্য, মাংস, ডাল, ফল, মূল প্রভৃতি নানারূপ খাদ্য আহার করিলে ভাল হয়।

এই আহার্য্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা অন্যদিক দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিতে পারি। ভগবান আমাদের দেহে যে সকল যন্ত্রাদি দিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটীরই একটা

উদ্দেশ্য আছে। আমরা আহার্য্য গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম দন্তদ্বারা নিষ্পেষণ করিয়া থাকি। এই দাঁত সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর কার্য্য, কর্ত্তন করা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্য, ভেদ ও ছিন্ন করা ও তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্য, পেষণ করা। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দাঁতকে কুকুর দাঁত বলিয়া থাকে। এই শ্রেণীর দাঁত কেবল শৃগাল কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুতে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই ইহাদের কার্য্যও যে মাংসাশী জীবের অনুরূপ হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তি সঙ্গত।

আমরা যখন মানব দেহে তৃণ ভোজী গো মহিষাদির মত এবং মাংস ভোজী ব্যাঘ্রাদির মত উভয় বিধ দন্ত দেখিতে পাই তখন আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে ভগবান আমাদিগকে উভয় বিধ আহার গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিবার উপযোগী করিয়া সৃজন করিয়াছেন।

ইতর প্রাণীর মধ্যে বানরের সহিত মানুষের অনেক সাদৃশ্য আছে। ছোট জাতীয় বানর ফল, শস্য, পোকা, মাকড় ইত্যাদি আহার করে। এবং বড় বানর পাখীর ডিম ও পাখী ভক্ষণ করিয়া থাকে।

মানবের অনুরূপ জীব প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত হইয়া যেরূপ ভাবে জীবন ধারণ করিতেছে, মানব সেইরূপ জীবন ধারণ করিলে বোধ হয় প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না বরং প্রকৃতির অনুরূপেই চলা হইয়া থাকে।

আমরা যে দিক দিয়াই বিচার করি মিশ্র খাদ্যই যে আমাদের প্রকৃতির অনুমোদিত খাদ্য তাহা সহজে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী মাত্রেই জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া জল পান করে এবং গো মহিষাদি তৃণ ভোজী প্রাণী ওষ্ঠ দ্বারা চুম্বন করিয়া পান করিয়া থাকে। মানবও আংশিক ওষ্ঠ দ্বারা পানীয় পান করে, কাজেই তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মে নিরামিষ ভোজী। এ কথার ভিতরে কথঞ্চিৎ সত্য নাই এরূপ নহে। মাংসাশী প্রাণীগণ প্রাণী হত্যা করা মাত্র উহার রক্তটুকই আগ্রহের সহিত পান করে। মাংস অধিক ভক্ষণ করে না। ঐ রক্ত পাত হওয়া মাত্র জমিয়া যায়, কাজেই উহা জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া খাইতে হয়। এই অভ্যাস হেতু ইহারা পানীয় মাত্রই লেহন করিয়া খাইয়া থাকে। জিহ্বার লেহন ক্রিয়া অধিক হয় বলিয়া উহাদের জিহ্বা অপেক্ষা কৃত লম্বা হয়।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

রিক্ততা।

আমারে যে দাওনি কিছু
তাইত সবার মাঝে
আস্‌তে পেলেম তোমার দ্বারে
ভিখারিণীর সাজে।
পথের পরে অবহেলে
যা ছিল তা' এলেম ফেলে,
তুচ্ছ করে এলেম যত
রিক্ততারি লাজে।

আমায় তুমি দাওনি কিছু
কেউযে আমার নাই,
তোমায় এত আপন করে
নিতে পেলেম তাই।
আজ্‌কে আমার বুকের কাছে
সকল আশা জড়িয়ে আছে,
তোমায় শুধু পাইযে আজি
যেমন করেই চাই।

আমায় তুমি রেখেছ যে
পথের ধূলার পরে
মাখ্‌তে পেলেম পায়ের ধূলো
তাইত এমন করে।
করেছ যে সবার নীচু
দাও নি মোরে— দাও নি কিছু,
তাইত পেলেম চরণ তোমার
রিক্ত জীবন ভরে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

বাহাদুর সঙ্গী।

ব্যবসায় ডাক্তারি হইলেও গত দুই বৎসর যাবত জমিদারের মোসাহেব হইয়া বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিলাম। মুনিবের একটা প্রয়োজনীয় কার্য্যে আমাকে এক'দিনের জন্য কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। ভোরে সিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্য উদ্ধার করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাত্রি আটটায় আবার আসিয়া সেকেণ্ড ক্লাস বার্থে পূর্ব্ব দিনের রাত্রি জাগরণের জের মিটাইলাম।

ফাল্গুন মাস। কলিকাতায় শীত না থাকিলেও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় তখনও মাঘের জের চলিতেছিল। তুষার কণায় গোয়ালন্দের পদ্মা ও জাহাজ প্রায় ঢাকিয়া পড়িয়াছিল। সিয়ালদহে যে গাত্রবস্ত্র বেগে পুরিয়াছিলাম, তাহা খুলিয়া গায়ে জড়াইয়া কোনমতে ষ্টীমারে উঠিলাম।

প্রভাত বসন্তের রৌদ্রের রেখা তখন সোণার মত চারিদিকে কেবল ঝিকমিক করিয়া উঠিয়াছে। আমি ষ্টীমারের এদিক ওদিক ঘুরিতেছি। এমন সময় দেখি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র উন্মনস্কভাবে যেন কি অনুসন্ধান করিতেছে। তাহার পাংশু বদনমণ্ডল ও নিরাশ দৃষ্টি। সে এবার Matriculation দিয়াছিল সুতরাং তাহাকে সেখানে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম না। সে আমাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "ঠাকুর কাকা আমি আসিতেছি। আমার এই পোর্টমেণ্ট ও বিছানাপত্র রহিল।" আমি তাহাকে বললাম তুই কোথা হইতে আসিলি এবং কোথায় যাইতেছিস, এগুলিইবা কার? সে দৌড়িয়া ছুটিতেছিল, নামিতে নামিতে আমার কথার উত্তরে কেবল বলিল "আমি আসিতেছি; সব বলিব।"

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, সে কোন জিনিষ ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়াছে। এরূপ ছুটা স্বাভাবিক।

আশঙ্কা ও উদ্বেগে মনটা বড়ই নিস্তেজ হইয়া গেল। আমি পাড়ের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এঞ্জিনের সো সো শব্দ, কুলিদিগের চীৎকার, প্যাসেঞ্জারের কোলাহল, 'চাই বিছানার চাদর', 'খেজুর গুর চাই'—এদিকে আমার মন কোন প্রকারেই আকৃষ্ট হইল না।

কলিকাতা গিয়া পাগর কিনা ও গঙ্গাস্নান-পারিবার সথ ছিল, সময়ের অভাবে তাহা পারি নাই। গোয়ালন্দ হইতে খেজুরগুর লইতে পারিলে কাজ হইত, কলিকাতার চিহ্ন অন্ততঃ কিছু লইয়া যাইতে পারিতাম কিন্তু আমার উদ্বিগ্ন প্রাণ সে দিকে কিছুতেই নিবিষ্ট হইল না।

ষ্টীমার ছাড়িবার পূর্ব্বে বার বার হুইসেল পড়িল। যখন বাষ্প কম্পিত হইয়া উঠিল; সিড়ি টানিয়া তুলিল, তখন তাড়া পাইয়া বিক্রেতাদল ছুটিয়া পালাইল কিন্তু কই, সুকুমার ত ফিরিল না। মনে হইল, নামিয়া একবার খুজিয়া আসি। তাহা আর পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে চাকার আঘাতে জলরাশি চুর্ণ ও মথিত করিয়া ষ্টীমার ছাড়িয়া গেল। তখন আমার মনের ভাব কিরূপ হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। দাদা ছেলেটাকে পোষ্য দিয়াছেন, তাই তাহার জন্য মনটা একটু বেশী চঞ্চল হইয়া পড়িল। ঘরের ছেলে হইলে হয়ত তেমন হইত না।

তখন সহসা আমার মনে হইল, সে বা অন্য পথ দিয়া আসিয়া উপরে উঠিয়াছে বা নীচে আছে। আমি চারিদিক ঘুরিয়া দেখিবার জন্য পায়চারী করিয়া করিয়া নিরাশ হইলাম।

এদিকে ঘুমের কিছু অপ্রাচুর্য্য ছিল। ডেকের শয্যাগুলি সকলই ক্রমে অধিকৃত হইয়া গেল। একটী স্থান পাইবার প্রত্যাশায় সত্বর যাইয়া বেগটীকে সেইস্থানে রাখিয়া স্থানটুকু অধিকার করিয়া বসিলাম। তারপর দুই জন খালাসীর সাহায্যে সুকুমারের মালপত্র গুলি উপরে উঠাইয়া কেবিনে গিয়া দেখি আমার রাত্রির অপরিচিত সহচর যুবকটী তাহার যষ্টিখানা কেবিনের একখানা বেঞ্চের উপর লম্বিত করিয়া রাখিয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছেন।

আমিও শয়ন করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু মনের উদ্বেগ আমাকে পুনরায় জাহাজখানা অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্যগ্র করিয়া তুলিল; আমি ভদ্রলোকটীকে

আমার জিনিসগুলি দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পুনরায় বাহির হইলাম।

নিস্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি কেবিনে আসিয়া বেগ হইতে কম্বলখানা খুলিয়া বিছাইব এমন সময় আমার পশ্চাৎ হইতে যেন একটা লোক আমার পা আকড়াইয়া ধরিল। আমি ফিরিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। একটী ষোড়শী সুন্দরী যুবতী কাঁদিয়া আমার পায় প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি স্তম্ভিত হইলাম। ষ্টীমারের ঢেউ লাগিলে তীরলগ্ন ঢেউগুলির মধ্যে যেমন একটা ভয়ানক লাফালাফি পড়িয়া যায় এই তরুণীও সেইরূপ আমাদের হৃদয়ের কাছে একটা বিস্ময়ের তরঙ্গ চাঞ্চল্য প্রবাহিত করিয়া দিল। অপরিচিত ভদ্রলোকটী উঠিয়া বসিয়া পড়িলেন। মেয়েটি কাঁদিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'আমি ত তোমায় চিনিলাম না মা; বোধ হয় তুমি ভ্রম করিয়াছ।"

সেই যুবতী বলিল "আমি আপনাকে চিনিয়াছি। আপনি দুইবার জাহাজ ঘুরিয়াছেন দেখিয়াছি।"

"তুমি আমাকে কেমন করিয়া চিনিলে?"

বালিকা তাহার বাড়ী ও বাপের নাম বলিল। আমি চিনিলাম। বলিলাম "তোমার নাম কি কিরণ?"

সে যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল "না আমার নাম কনক। তিনি আমার দিদি; তাঁর মেয়ের অন্নারম্ভে আমরা আসিয়াছিলাম। মেজদাদা আমাকে নিতে আসিয়াছিল। তাহাকে আমি পাইতেছি না।"

এতক্ষণে আমার সব উদ্বেগ কাটিল; কিন্তু ছেলেটা গেল কোথায়?

আমি বলিলাম "কোন চিন্তা নাই মা, এখানে বস।"

আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলাম "সুকুমার তবে তোমাকে তালাস করিতেই উপরে গিয়াছিল। সে বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। নারায়ণগঞ্জ না পৌছিয়া টেলিগ্রাম করিবার আর কোন উপায় নাই। কিরণের স্বামী কোথায় থাকে?"

কনক নতমুখে বলিল "শিবনিবাস।"

আমি বলিলাম "তবে তোমাকে না পাইয়া সুকুমারও বোধ হয় তথায়ই যাইবে।"

আমি এখানে কিরণের স্বামীর এরূপ ছেলে ছোকরার সঙ্গে মেয়ে পাঠাইয়া দিবার বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। তারপর কনককে বলিলাম "তুমি একটু ঘুমাও।" কনক ঘুমাইল না।

আমি তখন সুকুমারের মানসিক উদ্বেগের কথা ভাবিতে ভাবিতে একটু ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হুইসেলের শব্দে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি আমার সহযাত্রী বিছানার উপর শরীরটা মেলিয়া দিয়া কনককে লোলপ লোচনে দেখিতেছেন আর মাঝে মাঝে খবরের কাগজের লেখার উপর চক্ষু ন্যস্ত করিয়া আবেগে সময় কাটাইতেছেন। কনক জানালার পার্শ্বে বসিয়া পদ্মার লহরী লীলা গণিতেছে। তাহার মুখ সূর্য্য রশ্মি সম্পাতে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। মনস্বী বঙ্কিম সত্যই বলিয়াছেন "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।" তাই রূপ যৌবন সম্পন্না রমণীর প্রতি সাধারণের তৃষিত দৃষ্টি সর্ব্বদাই নিপতিত হইতে দেখা যায় এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্যের বলবতী আকাঙ্ক্ষা মানুষ মাত্রেরই উদিত হয়। দীনহীন কাঙ্গালের হৃদয় ভেদী হাহাকার কেহ গ্রাহ্য করেনা। আমাকে নড়িতে দেখিয়া আমার সেই সহযাত্রীটী সচকিত ভাবে বলিলেন "কেমন ঘুম হলো।"

আমি চক্ষুটা কচলাইয়া হাই ছাড়িয়া বসিয়া বলিলাম "মন্দ হয় নাই।"

তিনি আগ্রহ ভরে বলিলেন "বেলা অনেক হইয়াছে, স্নান আহার করিবেন না কি?"

আমি—"একেবারে নারায়ণগঞ্জ যাইয়া স্নান করিব।"

তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন "সেখানে গিয়া আজ সময় পাইবেন না ত। আজ জাহাজ একটু দেড়িতে ছাড়িয়াছে। চলুন এখানেই স্নানের ব্যবস্থা করি। বলিয়া তিনি তাহার অনুচরকে জল আনিয়া বাথরুমে রাখিতে আদেশ করিলেন।

বাস্কেট হইতে তৈলের শিশি ও টুথ পাউডার খুলিয়া আমাকে দিলেন এবং বলিলেন "কাপড় দিব কি?"

আমি বলিলাম "আপনার এত করিবার প্রয়োজন নাই।"

আমি নিজ বস্ত্র খুলিয়া লইলাম এবং উভয়ে যাইয়া বাথরুমে স্নান করিলাম। কাপড় ছাড়িবা মাত্র তিনি বলিলেন "কাপড় রাখিয়া যান, আমার লোক আছে, সেই আপনার কাপড় ধুইয়া আনিবে।"

বাবুটীর অনুরোধে আমি বাধ্য হইয়া কাপড় খানা রাখিয়া আসিলাম। বাথরুম হইতে বাহির হইয়া আসিবার কালে তিনি আর্দ্দালীকে বলিয়া আসিলেন একটী স্ত্রীলোক ও স্নান করিবেন। তাঁহার জন্য জল আনিয়া রাখিয়া দাও। কেবিনে যাইয়া আয়না ও চিরুণী আমার হাতে দিলেন, আমি নিঃসঙ্কোচে তাহা গ্রহণ করিলাম। তিনি কনককে স্নান করিবার জন্য বলিতে আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। কনককে স্নান করিবার জন্য বাথরুমে দিয়া আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কনক স্নান করিল।

আমি যখন কনককে লইয়া কেবিনে ঢুকিলাম তখন দেখি সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটী আমাদের খাবার জন্য বিস্তর ফল, ও লুচি সন্দেশ সাজাইয়া রাখিয়া নিজে বসিয়া আছেন। আমি তাহার আদর আপ্যায়ন দেখিয়া আশ্চর্য্য ও লজ্জিত হইলাম। ভদ্রলোকটীর সহিত অল্পেতেই যথেষ্ট আত্মীয়তা হইয়া গেল সুতরাং অতঃপর আর নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলাইল না। দেখিলাম তাহার বাস্‌কেটের উপর লিখা আছে—R. M. Das—Dy. Magistrate.

আমি বিনীত ভাবে বলিলাম—"আপনার এ সুজনতা ও অনুগ্রহ ভুলিতে পারিব না।"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "সেকি আমার অতিরিক্ত আছে বলিয়াইত দিতে পারিয়াছি। আমি না খাইয়াতো আর আপনাকে দিতেছি না। সময় মত হয়ত আবার আপনার খাবারও খাইতে হইবে; যখন ময়মনসিংহ যাইতেছি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "সে সৌভাগ্য কি আমার মত দরিদ্রের পক্ষে সম্ভব।" তিনি আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইলেন এবং কনকের নিকট আর একটী পাত্র রাখিয়া তাহাকে তাহা দিতে আমাকে ইঙ্গিত করিলেন।

তখন খাইতে খাইতে বলিলাম। "কালই আমি কোন বিশেষ কাজে কলিকাতায় গিয়াছিলাম, আজ ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার জন্য পাক করিয়া লোক জন সব বসিয়া থাকিবে।"

আমার কথায় বাধা দিয়া তিনি বলিলেন "আপনি কোথায় নামিবেন?"

আমি বলিলাম "কাওরাইদ।"

"তাহলে আপনার বাড়ী বোধ হয় কিশোরগঞ্জ মহকুমায়?"

আমি বলিলাম "হাঁ আমার বাড়ী কিশোরগঞ্জ। আপনি কখনও সেখানে গিয়াছেন কি?"

তিনি বলিলেন "আমি সেখানে ছোটবেলা আমার বাবার সঙ্গে থাকিয়া পড়িতাম। সে বহু দিনের কথা। আচ্ছা, এখনও কিশোরগঞ্জের সে ঝুলন মেলাটা জমে কি? নদীটাতে বারমাস জল থাকে?" এইরূপ আরও তিনি অনেক প্রশ্ন করিলেন।

আমি একে একে তাঁহার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে লাগিলাম। কোন প্রশ্ন করিতে পারিলাম না আলাপে সালাপে বেশ বুঝিলাম, তিনি কিশোরগঞ্জের সহিত বিশেষ পরিচিত। কনক তখন কেবিনের জানালায় ঠেস দিয়া নদীর দিকে তাকাইয়া দাড়াইয়াছিল।

ভদ্রলোকটী কনকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "ইনি আপনার কে?"

"ইনি আমার দূর সম্পর্কিত আত্মীয়া। তার পিতা কিশোরগঞ্জের উকীল। এই মেয়েটী বড়ই দুঃখী। ইহার দুই ভগ্নির বিবাহ এক দিনেই হয়। পিতা বহু টাকা ব্যয়ে কন্যাদিগকে পাত্রস্থা করেন। বড় জামাই চাকরে, ছোটটা—মেয়েটাকে বিবাহ করে আর জিজ্ঞাসা করে নাই। আপনাদের শিক্ষিত লোকের কথা আর কি বলিব?"

ভদ্রলোকটী অতি আগ্রহ ও সহানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টিতে কনকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আ-হা-হা, সে কেমন বলুন দেখি?—ওকে খেতে বলুন না।" বলিয়া ভদ্র লোকটী চক্ষু হইতে চসমাটি লইয়া রুমালে মুছিয়া পুনরায় চক্ষে দিয়া ঘন ঘন আমার দিকে ও কনকের দিকে চাহিয়া ঘটনাটী শুনিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন।

আমি যতদুর জানিতাম অতি সংক্ষেপে তাহাকে বলিলাম—"ছেলেটা পড়িত বি.এ; বিবাহের সময় টাকা লইয়া গোলমাল হয়. যাই হউক কোনমতে বিবাহ হইয়া যায়। ইহার পর আর ইহার পিতা মাসে মাসে টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ায় মেয়েটাকে আর গ্রহণ করে নাই।"

ভদ্র লোকটী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। আমি বলিলাম "মেয়েটী সেই হইতে আজ ৪ বৎসর পিত্রালয়ে। তার ভগ্নীর একটী ছেলে হইয়াছে তাহার অন্নারম্ভেই সে গিয়াছিল।"

আমি আবার আরম্ভ করিলাম—"যে কথা বলিতেছিলাম—আমার ভাতিজা যাহাকে ইহার মামা পোষ্য গ্রহণ করিয়াছেন—ইহাকে ভগ্নীর বাড়ী হইতে নিয়া আসিতেছিল—সে ছেলেটা গোয়ালন্দে রহিয়া গিয়াছে। এই মেয়েটীকে কিশোরগঞ্জ পাঠাইতে হইবে, আমি এইরূপ "চক্রচ্ছবে" পড়িয়াছি।'

আমার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটী সোয়াস্তির ভাবে বলিল "বাহাদুর সঙ্গী বটে! ভাগ্যে আপনি ছিলেন, নতুবা উপায় হত কি?"

আমি বলিলাম—"এখন আমি মুস্কিলে পড়িয়াছি। আমার জন্য কাউরাইদ নৌকা আসিবে। রান্না প্রস্তুত থাকিবে। মুনিবের কার্য্যে গিয়াছিলাম, এখন তাহাকে সংবাদ না পাঠাইলে নয়। জরুরী কাজ। ছেলেটা রহিল গোয়ালন্দে। এই মেয়েটীকে পাঠাইতে হইবে কিশোর গঞ্জে। আমার নামিতে হইবে কাউরাইদ। বড়ই গোলমালে পড়িয়াছি।"

ভদ্রলোকটী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "এক কাজ করুন, নারায়ণগঞ্জে যাইয়া শিবনবাসে ও কিশোরগঞ্জে দুইখানা টেলিগ্রাম করুন। আর মেয়েটীকে বাড়ীতে নিয়া পঁহুছাইয়া দিন।"

গল্পে গল্পে অনেক সময় কাটিয়া গেল। বাহিরে গিয়া হাত মুখ ধুইলাম।

উপরে নির্ম্মল বায়ু নীচে পদ্মা বসন্তাগমে উচ্ছ্বাস ভরে তরতর বেগে সাগর সঙ্গমে ছুটীয়া চলিয়াছে। রৌদ্রচঞ্চল বায়ুর ভিতর দিয়া পল্লি লক্ষ্মীর শ্যামল সম্পদ দেখিতে দেখিতে আমরা আসিয়া মেঘনার কাল শীতল জলধারা যেখানে পদ্মার স্বচ্ছ শুভ্র সলিল রাশির সহিত মিলিত হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছে সেই সঙ্গত বারি রাশি পার হইলাম। বসন্তের মধ্যাহ্ন রৌদ্রজ্জ্বল আকাশ ধুম কলঙ্কিত হইয়া বিপরীতদিকে চলিয়াছে। দুইধারে পল্লির নীল প্রান্তর পশ্চাতে সরাইয়া, জলকণার উপর রামধনুর রং ফলাইয়া জাহাজ সবেগে ছুটীয়াছে। আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। রবিকর সম্পাতে নদীবক্ষ ঝলমল করিতেছে। হাজার মনি মহাজনী নৌকা খরস্রোতে পালের জোরে লক্ষ্যপানে ছুটিয়াছে; ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া জেলেরা মাছ ধরিতেছে, আর জাহাজের ঢেউ লাগিয়া তীর সংলগ্ন ডিঙ্গি গুলির মধ্যে একটা ভয়ানক লাফালাফি পড়িয়া গিয়াছে আমার সহযাত্রীটীও দেখিতে ছিলেন। একটু অগ্রসর হইয়া আমার নিকটে আসিলেন। তারপর কথায় কথায় কনক ও আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। বুঝিলাম লোকটা বেশ আলাপী ও ভদ্র।

অদূরে পূর্ব্ববঙ্গের কর্ম্মচেষ্টার বিরাট ব্যূহ—নারায়ণগঞ্জ—চঞ্চল রৌদ্রে কাচের মত ঝকমক করিতেছে। বেলা দেড়টার সময় যখন শীতল লক্ষ্মার শীতল বারিতে ঢেউ তুলিয়া 'গুর্খা' আসিয়া নারায়ণগঞ্জের নিম্নে দাঁড়াইল, তখন ময়মনসিংহ ম্যালট্রেণ খানাও সজ্জিত হইয়া হুকুমের প্রতীক্ষায় প্লাট ফারমের পাশে আসিয়া দাড়াইয়াছে। তখন সরকারী, বেসরকারী সাহেব-মেম,কুলি-বাবু, স্ত্রী পুরুষ প্লাট ফরম হইতে জেটী পর্য্যন্ত বোঝাই। পোষাকের চাকচিক্যে রং বেরঙ্গের কাপড়ে ষ্টেসনটা বাইয়োস্কোপের চলন্ত ছবির মত বোধ হইতেছিল।

আমি কনককে সঙ্গে করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া নামিলাম। ভদ্রলোকটীও আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিয়া আসিলেন। তাঁহার আর্দালীকে আমাদের সকলের জিনিসপত্র গুলি যথারীতি দেখাশুনা করিয়া আনিবার ভার দিয়া আসিলেন।

ভদ্রলোকটী আমাকে টেলিগ্রাম করিতে উপদেশ দিয়া কনককে লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন;

আমি ষ্টেশনে ঢুকিলাম। টেলিগ্রাম করিয়া আসিয়া দেখি বাবুটী কনকের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়া সব ঠিক ঠাক করিয়া বসিয়া আছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

ডাক উঠিলে গাড়ী অধিকক্ষণ অপেক্ষা করে না। গাড়ী তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ঢাকা ষ্টেসনে গাড়ী থামিল লোকজন নামিল, উঠিল গাড়ী ঢাকা ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়া দিলে আমি কনককে বলিলাম "মা আজ না হয় চল আমাদের সেখানে; কাল ভোরে তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব।" কনক নিরাশার হৃদয়ে কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল "গফরগাঁও আমার জন্য গাড়ী আসিবে পূর্ব্ব হইতেই ঠিক আছে। আপনি আমাকে বাড়ীতে দিয়া পরে বাড়ীতে—" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষে জল দেখা গেল।

আমি বলিলাম "এখন উপায়!"

ভদ্রলোকটী আগ্রহ সহকারে বলিলেন "কেমন"?

আমি—"মেয়েটী আজই বাড়ী যাইতে চায়, এদিকে আমিও আজ বাড়ী ফিরিতে না পারিলে কাজ নষ্ট হয়; এখন উপায় কি করি?"

ভদ্রলোকটী মাথা নাড়িয়া বলিল 'উহার আজই পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার ইচ্ছা স্বাভাবিক। বিপদে পড়িলে মানুষ একেবারে নিরাশ হয়, বিশেষ স্ত্রীলোক। তারপর একেবারে সম্পদের মাঝখানে না গেলে তৃপ্তি হয় না। আপনিই তাকে লইয়া আজ তাহাদের বাড়ীতে যান। কাওরাইদ নামিয়া আপনার নৌকা ও লোক বিদায় করিবার উপায় করুন।"

আমি কি করিব চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভদ্র লোকটী বলিল "আমার যদি সময় থাকিত তবে আপনাদের সাহায্য করিতে পারিতাম; কিন্তু কি করি; উপায় নাই।"

আমি শেষে কাউরাইদ নামিয়া নৌকা বিদায় করিয়া আসিব ঠিক করিয়া প্রস্তুত হইলাম ও কনককে সাহস দিয়া বলিলাম "তোমাকে গফরগাঁ পঁহুছাইয়া ফিরা গাড়ীতেই আমি চলিয়া আসিব।"

কাউরাদই আসিয়া গাড়ী থামিল। এখানে ইঞ্জিনে জল লইবে; কাজেই ১৪।১৫ মিনিট অপেক্ষা করিবে। আমি তাড়াতাড়ি করিয়া নৌকায় খবর দিতে চলিলাম ও বিছানা পত্র সব ষ্টেসনে নামাইলাম। ভদ্রলোকটী আমার সকল জিনিস ষ্টেসনে নামাইয়া দিলেন। আমি নৌকাঘাটে দৌড়িয়া রওয়ানা হইলাম। ষ্টেসন হইতে ঘাট ৭।৮ মিনিটের রাস্তা আমি দৌড়িয়া ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখি, বাড়ী হইতে খবর জানিবার জন্য আমার মুনিব তাঁহার কোন বিশিষ্ট আত্মীয়কে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে আমার অবস্থা ও সরকারী কাজের কথা জানাইতে একটু গৌণ হইল। সহসা বংশি ধ্বনীতে আমাকে চমকাইয়া দিল। আমি তখনই দৌড়িয়া রওয়ানা হইলাম। হায় আমি ষ্টেশন কম্পাউণ্ডে পৌছিবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দূর হইতে দেখিলাম কনকের সজল চক্ষুর বুভুক্ষুদৃষ্টি আমার অনুসন্ধান করিতেছে। আর ভদ্রলোকটী —সতৃষ্ণ নয়নে মুখ বাড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি ষ্টেশন ঘরের আড়ালে পড়িয়া গেলাম। তারপর গেইট পার হইতে যাইয়া হোচট্ খাইয়া পড়িয়া গিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম।

আমার পাছে পাছেই আমাদের সরকারী কর্ম্মচারিটী আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম, তিনি আমার মাথায় জল দিয়া ও বাতাস করিয়া আমার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ষ্টেসন মাষ্টার ও যাত্রীরা ভিড় করিয়া আসিয়া আমার সহিত সহানুভূমি প্রকাশ করিল। কোন ফল হইল না। গাড়ী ততক্ষণে অনেক পথ চলিয়া গিয়াছে।

আমি সুস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম 'সুকুমারের খুড়া মহাশয় আমি—সুতরাং আমার ও ভ্রাতষ্পুত্রের ন্যায়ই বাহাদুর সঙ্গী না হইবার ত কোন কারণ নাই।"

নৌকায় আসিয়া উদ্বেগে সময় কাটাইয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে পুনরায় গফরগাঁও যাত্রা করিলাম। রাত্রি দশটায় আবার ফিরিয়া আসিব বলিয়া নৌকা রাখিয়া গেলাম।

গফরগাঁয় যাইয়া আমাদের পরিচিত "পরাণ মুদীকে' জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম কনককে লইবার জন্য তাহার

পিতা 'বাইকে' কিশোরগঞ্জ হইতে আসিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গাড়ী করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

নিশ্চিন্ত মনে আমিও উদ্দিষ্ট পথে বাড়ী ফিরিলাম।

এই গল্পের উপসংহার ভাগ লিখিবার জন্য আমরা সৌরভের গ্রাহক ও পাঠকগণকে আহ্বান করিতেছি। যাঁহার রচনা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে তাঁহাকে পুরস্কৃত করা যাইবে। গল্পের শেষ অংশ শ্রাবণের সৌরভে প্রকাশিত হইবে; সুতরাং ২০শে আষাঢ়ের মধ্যে তাহা আমাদের হস্তগত হওয়া প্রয়োজন। সৌঃ সঃ।

উইলিয়ম কেরি।

(১)

ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষা সমূহের মধ্যে বঙ্গভাষা আজ নিজ গৌরবে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এই বঙ্গভাষার উন্নতি ও বিস্তৃতির মূলে পাশ্চত্য দেশাগত কয়েকজন মনীষী ধর্ম্ম প্রচারকের প্রভাব উতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গভাষা অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ। সেই মনিষীগণের মধ্যে একজন ছিলেন উইলিয়ম কেরি। আজ আমরা সংক্ষেপে সেই মহাত্মার কর্ম্মময় জীবনের আলোচনা করিব।

১৭৬১ খৃঃ অব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডের নর্দামটন্‌শায়ার প্রদেশান্তর্গত পলারস্‌বাড়ী নামক গ্রামে উইলিয়ম কেরি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। যেরূপ শিক্ষা গ্রাম্য-স্কুলে প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা উইলিয়মকেরি তদ্রূপ শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬ বৎসর বয়সের সময় তিনি মনে মনে পাটীগণিতের অঙ্ক কষিতেন এবং পড়িতে শিক্ষা করিবার পর তিনি বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থনিচয় অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বাল্যকালেই তাঁহার বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার স্পৃহা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রকোষ্ঠ কীট পতঙ্গাদিতে পরিপূর্ণ থাকিত; তন্মারা তিনি উহাদের গতিবিধি ও ক্রমোন্নতি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। রাস্তায় চলিবার সময় তিনি সমস্ত লতা গুল্মাদি মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেন। বাল্যকালেই দেখা গিয়াছিল যে তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করিতেন, তাহা সমাপন না করিয়া প্রতি নিবৃত্ত হইতেন না। সমবয়স্কগণের সহিত তিনি বাল্য ক্রীড়ায়ও পারদর্শীতা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার আচার ব্যবহার পল্লীজনোচিত হইলেও তাঁহার অবয়ব অতিশয় সুন্দর ছিল এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির রেখা যেন তাঁহার বদনে দেদীপ্যমান ছিল।

দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় কেরি একখানি লাটীন ভাষার গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলেন; তিনি অবিলম্বে ঐ গ্রন্থের সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করিলেন এবং তৎসঙ্গে ঐ পুস্তকের অন্তর্গত যে সাধারণ ব্যাকরণ সন্নিবেশিত ছিল তাহাও আয়ত্ত করিলেন। তাঁহার পিতা দুরিদ্রতা নিবন্ধন পুত্রের জ্ঞানানুশীলনে কোন সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেন না। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি হেক্‌লিটন নগরে জনৈক চর্ম্মকারের নিকট শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হইলেন।

যদিও এই কার্য্যে কেরির জ্ঞানার্জ্জনের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা অপ্রতিহত ভাবে বিরাজমান ছিল। চর্ম্মকারের বিপণিতে যে সামান্য কয়েক খণ্ড পুস্তক ছিল, তাহাতে তিনি একখণ্ড বাইবেলের নিউটেষ্টেমেণ্টের টীকাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের স্থানে স্থানে গ্রীক্ শব্দ সন্নি-বেশিত ছিল। তিনি গ্রীক্‌ভাষার বর্ণমালার সহিত পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি অধ্যয়ন সময়ে ঐ গ্রীক্ বর্ণ মালার নক্সা দেখিয়া দেখিয়াই তাহা অঙ্কিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং যখন তিনি গ্রামান্তরে পিতৃদর্শনার্থ গমন করিতেন তখন ঐ গ্রামের টম্‌ জোন্স নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ গ্রীক্ অক্ষরগুলি কি তাহা জানিয়া আসিতেন। এইরূপে অল্পে অল্পে তিনি গ্রীক্ ভাষাও শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিংশতি বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই উইলিয়ম কেরি, মিঃ উল্ড নামক জনৈক বণিকের ভগ্নীর সহিত উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থাতেও

এই অপরিণত বয়সে বিবাহ করা যে অজ্ঞতা জনক হইয়াছিল শুধু তাহাই নয়, তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষেও মহা অশুভ জনক হইয়াছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিনী অশিক্ষিতা ছিলেন। কেরি জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত যে পরিশ্রম করিতে সক্ষম করিতেন, তাহা তাঁহার পত্নীর মনঃপূত হইত না; সুতরাং তদীয় পত্নী, তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা ছিলেন। বিবাহের পর কেরি হেক্‌লিটন নগরে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র কুটীর ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে মিঃ ওল্ডের মৃত্যুর পর তদীয় ব্যবসায় কেরি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কুটীরের সান্নিধ্যে অবস্থিত একটি স্থানে কেরি অশেষ পরিশ্রমের সহিত একটি উদ্যান নির্ম্মাণ করিলেন এবং ইহা হইতে তিনি ব্যবসায় অপেক্ষা অধিক লাভবান হইলেন। এদিকে ব্যবসায় মন্দীভূত হওয়ায় তিনি পণ্যসমূহ নিতান্ত অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে তিনি জররোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮ মাস কাল শয্যাগত ছিলেন। তিনি রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াই অবশিষ্ট পণ্য দ্রব্যাদি বিক্রয় পূর্ব্বক অন্ন সংস্থানার্থ দুর্ব্বল দেহে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই বিপন্ন অবস্থায় জনৈক দয়ার্দ্র-হৃদয় ব্যক্তির সহায়তা তাঁহাকে অনশনের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি পিডিংটন নামক গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই স্থানটী সেঁৎসেতে থাকায় তিনি কম্পজ্বরে আক্রান্ত হন, তাহা তাঁহাকে চিরদিনের জন্য কেশহীন করিয়া ফেলে।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে কেরি-মোলটন নামক স্থানে একটী স্কুলের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই স্কুলের ছাত্রবৃন্দের সহিত তাঁহার অত্যধিক সৌহৃদ্য ছিল; অতিরিক্ত প্রশ্রয় প্রাপ্ত হেতু, ছাত্রবৃন্দ তাঁহার শাসনের বহির্ভূত হইয়া উঠিল; ক্রমে স্কুলের অবস্থা শোচনীয় হইতে লাগিল। ফলে, কেরি উক্ত পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর কেরিকে পাদুকা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। তিনি পাদুকাপূর্ণ ঝুলি স্কন্ধে লইয়া ৮।১০ মাইল দূরবর্ত্তী নর্দ্দামটন নগরে পাদুকা বিক্রয়ার্থ গমন করিতেন।

কেরির ন্যায় উচ্চ আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে পাদুকা বিক্রয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করা সম্ভবপর ছিল না; সুতরাং তিনি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়সে লিচেষ্টার নগরে গমন করেন। এইখানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মিঃ আরণল্ডের সহিত পরিচিত হন। মিঃ আরণল্ডের লাইব্রেরীতে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক গ্রন্থনিচয় সংগৃহীত ছিল। কেরি তাহাতে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় তিনি লিচেষ্টারের গির্জ্জায় ধর্ম্মযাজকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি কিরূপে তৎকালে সময় বিভাগ করিয়া কার্য্য করিতেন, তাহা তাহার নিজের লিখিত বিবরণ হইতে প্রদত্ত হইল।

"সোমবারে—আমি নানাভাষা শিক্ষা করিতাম এবং কিছু অনুবাদ করিতাম। মঙ্গলবারে—বিজ্ঞান, ইতিহাস অধ্যয়ন করিতাম এবং রচনা লিখিতাম। বুধবারে—বক্তৃতা করিতাম। বৃহস্পতিবারে আমি বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। শুক্রবার ও শনিবারে ভগবানের কার্য্যে (খৃষ্টধর্ম্ম সম্মত কার্য্যাদিতে) নিযুক্ত থাকিতাম। আমার খ্রীষ্টিয় স্কুল প্রাতঃকালে ৯টার সময় আরম্ভ হইত; শীতকালে ৪টা ও গ্রীষ্মকালে ৫টা পর্য্যন্ত থাকিত।"

ভারতবর্ষে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার জন্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে লণ্ডন নগরে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। কেরি ও মিঃ টমাস্ নামক জনৈক অস্ত্র-চিকিৎসক এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। মিঃ টমাস্ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া কেরির নিকট পত্র লিখিলেন যে, বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্য সুবিধাজনক হইবে। এই লিপি প্রাপ্ত হইয়া কেরি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া মিঃ টমাসের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন। লণ্ডন নগরে এই সমিতির এক অধিবেশনে মিঃ টমাস্ উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটী বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া কেরি এতদূর আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, তিনি তদীয় ভবিষ্যৎ সহযাত্রীর গ্রীবাদেশ বাহুপাশ

দ্বারা বেষ্টন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। অতঃপর এই সমিতিতে নির্দ্ধারিত হইল যে, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার জন্য কেরি আগামী বসন্ত ঋতুতে বঙ্গদেশে যাত্রা করিবেন।

বঙ্গদেশে যাত্রা করার এক নূতন বিঘ্ন উপস্থিত হইল। কেরি যখন তাঁহার পত্নীর নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন তখন তাহার পত্নী তাঁহার স্বদেশ পরিত্যাগে বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। পক্ষান্তরে, কেরি ভারতবর্ষে আগমন করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন; তিনি পুত্র কলত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বকই যাত্রা করিবেন এরূপ মনস্থ করিলেন। ভারতবর্ষে মিশন সংস্থান করতঃ পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া কেরি তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইলেন।

এক্ষণে প্রধান সমস্যা উপস্থিত হইল কিরূপে ভারতবর্ষে গমন করা যায়? যেহেতু তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রদত্ত অনুমতি পত্র ভিন্ন কেহ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইত না। ঐ অনুমতি-পত্রপ্রাপ্তি পক্ষেও অশেষ অসুবিধা ছিল; কোম্পানী সহসা কাহাকেও উহা প্রদান করিতেন না। ইহার দুইটী কারণ ছিল। প্রথম কারণ—ইংলণ্ড তৎকালে প্রায়ই সমরে লিপ্ত থাকিতেন; তখন ইংলণ্ডের শত্রুগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ পূর্ব্বক রাজন্যবর্গকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহী করা সম্ভবপর ছিল। দ্বিতীয় কারণ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই ভারতবর্ষে বাণিজ্য সম্পর্কে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল সুতরাং অন্য কেহ বাণিজ্যার্থে এ দেশে আগমন করিলে কোম্পানীর স্বার্থহানি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এজন্য ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পার্লিমেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক এই আইন হইয়াছিল যে উপযুক্ত সনন্দ ভিন্ন যে কোনও ইউরোপীয় ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবে, সে গুরুতর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

যাহা হউক "অক্সফোর্ড" নামক পোতের অধ্যক্ষ কেরিকে বিনা সনন্দেই ভারতবর্ষে লইয়া যাইবার জন্য স্বীকৃত হইলেন। ২০০ পাউণ্ড জাহাজের ভাড়া সাব্যস্ত হইল। জাহাজ রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে পোতাধ্যক্ষ এই মর্ম্মে একখানা লিপি প্রাপ্ত হইলেন যে সনন্দ অপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া রওয়ানা হইলে তাঁহাকে বিপদাপন্ন হইতে হইবে। কারণ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এইরূপ এক আইন পাশ হইয়াছে যে বিদেশ হইতে যে সকল পোত ভারতবর্ষে আগমন করিবে, তাহাদের প্রত্যেক পোতাধ্যক্ষকে আরোহীবর্গের নামের তালিকা প্রদান করিতে হইবে এবং তাহারা যে ইংলণ্ড হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক রীতিমত সনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও প্রদর্শন করিতে হইবে। যদি কেহ তাহাতে অসমর্থ হয় তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এবং পোতাধ্যক্ষকে শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং "অক্সফোর্ড" জাহাজের অধ্যক্ষ অবিলম্বে কেরি ও তাঁহার সঙ্গীয় মিশনারিগণকে জাহাজ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। কেরি ভগ্নহৃদয়ে উপকূলে অবতরণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও কেরি নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি লণ্ডনের কাফিখানায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কোনও বৈদেশিক জাহাজ ভারতবর্ষে গমন করিবে কি না। এইরূপ অনুসন্ধানে তিনি সংবাদ পাইলেন ডেনমার্ক দেশীয় একখানা জাহাজ সম্প্রতি কোপনহেগেন্ নগর হইতে যাত্রা করিয়াছে, উহা ভারতবর্ষে গমন করিবে। তৎকালে দিনেমারদিগেরও এ দেশে দুইটী ক্ষুদ্র অধিকার ছিল এবং তাহাদিগকে জাহাজে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হইত। এই জাহাজের ভাড়া প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ১০০ পাউণ্ড, বালক বালিকাদিগের জন্য ৫০ পাউণ্ড ধার্য্য ছিল। কেরি ও টমাস্ সাহেব নর্দ্দাম্‌টন শহরে গমন করিলেন। উদ্দেশ্য—অর্থ সংগ্রহ করা এবং কেরির পত্নীকে তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষে গমন করিবার জন্য শেষবার অনুরোধ করা। এবার কেরির পত্নী স্বীকৃত হইলেন; তিনি তাঁহার ভগিনীকেও সঙ্গে লইতে চাহিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের যাওয়ার ব্যয় ৬০০ পাউণ্ড প্রয়োজন। তাঁহাদিগের হস্তে তৎকালে "অক্সফোর্ড" জাহাজের অধ্যক্ষ হইতে ফেরৎ প্রাপ্ত মাত্র ১৫০ পাউণ্ড ছিল। কিন্তু কেরি ভারতবর্ষে যাইবার এই সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ না করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যে

কিছু সামান্ত সম্পত্তি ছিল, কেরি তাহা বিক্রয় করিলেন। তাহাতে মাত্র ১৮ পাউণ্ড ১০ শিলিং হইল। ইহার উপর তিনি ৩০০ পাউণ্ড চাঁদা প্রাপ্ত হইলেন। যাইহউক অর্থের অভাব হেতু ভৃত্যগণের খাদ্য আহার করিবেন ইহাই স্থির করিয়া তাঁহারা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে "করুণ প্রিন্সেসা মেরিয়া" নামক ডেনমার্ক দেশীয় জাহাজে আরোহণ করতঃ ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন।

১১ই নবেম্বর তারিখে উক্ত জাহাজ আসিয়া কলিকাতা বন্দরে পঁহুছিল। "করুণ প্রিন্সেসা মেরিয়া" ডেন্‌মার্ক দেশীয় পোত এবং ডেন্‌মার্ক দেশীয় বন্দর হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছে সুতরাং তাহার পোতাধ্যক্ষকে আরোহীবর্গের নামের তালিকা প্রদান করিতে হইল না। কেরি ও টমাস্ নির্ব্বিঘ্নে নগরে প্রবেশ করিলেন। এবং একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় অবস্থান করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিধায় একমাস পর কেরি অল্প ব্যয়সাধ্য স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে হুগলী সহরের প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী বেণ্ডেল নামক স্থানে বাসা পরিবর্ত্তন করিলেন। তথায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের কোন সুবিধা না হওয়ায় তিনি পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিলেন। তখন কেরির যথেষ্ট অর্থাভাব ঘটিয়াছিল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশীয় জনৈক সহৃদয় ব্যক্তি মাণিকতলায় অবস্থিত তদীয় একটী বাড়ীতে কেরিকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।*

এই সময়ে কেরির আর্থিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল; তিনি তখন ৫০০৲ ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক সুন্দরবনে কৃষিকার্য্যদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে মনস্থ করিলেন।

মিঃ টমাস্ এই সময়ে মালদহে জনৈক নীল কুঠীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার সহকর্ম্মী কেরি নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। টমাস্ সাহেব কুঠীর অধ্যক্ষকে অনুরোধ করিয়া কেরির জন্য একটী চাকুরী ঠিক করিয়া দেন। কেরি মাসিক ২০০৲ বেতনে মদনাবতী নামক স্থানে নীল কুঠীর তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে কেরি ইংলণ্ডস্থ সমিতিকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে তাহার আর কোনও সাহায্যের প্রয়োজন নাই। তিনি যে সাহায্য তথা হইতে প্রাপ্ত হইতেন ঐ অর্থ যেন বাইবেলের নিউ টেষ্টেমেণ্টের বঙ্গানুবাদে নিয়োজিত হয়।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে কেরি মালদহে পৌঁছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নিউ টেষ্টেমেণ্টের বঙ্গানুবাদ মুদ্রণ করার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে "মিশনারী সোসাইটী" নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ কেরি সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে তাঁহার এই পত্র বিলাতে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই নিউ টেষ্টেমেণ্টের বঙ্গানুবাদ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কলিকাতার তদানীন্তন মুদ্রণ কার্য্যের ব্যয়ের হার অনুসারে দশ সহস্র খণ্ড পুস্তকের জন্য ৪৩৭৫০৲ খরচ পড়িবে। বিলাত হইতে বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া জনৈক মিশনারীকে মুদ্রাকর কার্য্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে কেরি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলেন যে কলিকাতায় দেশীয় ভাষা সমূহের মুদ্রনের অক্ষর প্রস্তুত হইয়াছে। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইবার পর একখানি কাষ্টের অক্ষরে প্রস্তুত মুদ্রাযন্ত্র বিক্রয় হইবে কলিকাতায় এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল। মিঃ কেরি অবিলম্বে ৪০ পাউণ্ড মূল্যে এই মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিলেন। মদনাবতী নীল কুঠীর অধ্যক্ষ নিজের পকেট হইতে এই মুদ্রাযন্ত্রের মূল্য প্রদান পূর্ব্বক তাহা মিশন কার্য্যে দান করিলেন। মদনাবতী কুঠীর একটী প্রকোষ্ঠে ইহা স্থাপিত হইল।

কিছুদিন কুঠীর অধ্যক্ষ কলিকাতায় কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া যাওয়ায় তিনি মদনাবতী কুঠী পরিত্যাগ

* ইহার বিংশতি বৎসর পরে যখন কেরি কলিকাতায় প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন উপযুক্ত ভদ্রলোকটীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। কেরি পূর্ব্ব কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া তাঁহার সেই আশ্রয় দাতাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সাহায্যে উক্ত ভদ্রলোকের অবস্থা বেশ সচ্ছল হইয়াছিল।

করিলেন। সুতরাং কেরিও চাকুরী পরিত্যাগ এবং বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী চারিটী পুত্র ও পত্নীসহ কেরি শ্রীরামপুরে উপনীত হন। শ্রীরামপুরের তদানীন্তন ডেনিশ্ গবর্ণর কেরিকে সাদরে গ্রহণ করেন। পরদিন রবিবার বিধায় কেরি উপাসনা করিয়া অপরাহ্নে এই নগরে প্রথম বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেন।

শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইয়া কেরি একটী ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন এই বাড়ীতে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপনের বা স্কুল প্রতিষ্ঠার কোন সুবিধা ছিল না। তৎকালে শ্রীরামপুরে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। নদীতে প্রত্যহ ৬।৭ খানা পোত বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ থাকিত। কলিকাতায় তৎকালে দেউলিয়া আদালত (Insolvancy Court) প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় কলিকাতার দেউলিয়াগণ দলে দলে আসিয়া এখানে বাস করিত; এই সকল কারণে শ্রীরামপুরে বাড়ী ভাড়া অত্যধিক ছিল। মিশনারীগণের বাসস্থানের উপযোগী কোন বাড়ীই মাসিক ১২০৲ টাকার কমে পাওয়া যাইত না। কেরি শ্রীরামপুরের পঁহুছিবার এক সপ্তাহের মধ্যেই ছয় সহস্র মুদ্রা মূল্যে একটী বাড়ী ক্রয় করিলেন; তৎকালে কিন্তু তাঁহার হস্তে উহার অর্দ্ধেক টাকাও ছিল না। যাহা হউক তিনি ইংলণ্ডের সমিতি হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এই বাড়ীর সান্নিধ্যে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপনের জন্য একটী গৃহ এবং অদূরে একটী উদ্যান নির্ম্মিত হইল। বাড়ীর মূল্য পরিশোধ করিয়া মিশনারীদিগের হস্তে ছয়টী পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য মাত্র ২০০ পাউণ্ড অবশিষ্ট রহিল।

মদনাবতী হইতে আনীত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল। এই যন্ত্রে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে সর্ব্বপ্রথম বাইবেলের বঙ্গানুবাদের মুদ্রিত প্রথম ফর্ম্মা বাহির হইয়াছিল।

শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন।

বাণী সেবকের জীবন সংগ্রাম।

বাণী সেবকগণের প্রতিভার প্রচ্ছন্ন আবরণের ভিতর দিয়া প্রায়শঃই দারিদ্র্যের তীব্র জ্বালা ফুটিয়া বাহির হইতে চায়। সৌভাগ্যলক্ষ্মীর স্বর্ণপ্রাসাদে উঠিবার জন্য লোকে নানা পথের পথিক হয় এবং ন্যুনাধিক পরিমাণে তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিয়া থাকে; কিন্তু লোলালক্ষ্মী সপত্নী তনয়দিগের প্রতি কৃপা কটাক্ষ ক্ষেপণে বড়ই নারাজ। অনেক কবি এবং লেখকের লেখনীর ভিতর দিয়া "দারিদ্র্যদোষে গুণরাশী নাশী" এই মর্ম্মধ্বনি বাহির হইতেছে। সভ্যতালোক দীপ্ত আধুনিক জগত আজিও এই নিরন্ন বাণী উপাসকদিগের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য সুপালন করিতে অগ্রসর হওয়া সমীচীন বোধ করিতেছে না। পণ্ডিতের প্রতিভারশ্মি রাশী প্রভাবে জগতের অজ্ঞান অন্ধকার ছিন্নভিন্ন হইতেছে, কিন্তু ওই বুভুক্ষক্লিষ্ট শীর্ণদেহ তাঁহার জীবন দীপ্ত তৃণাবাসের জীর্ণ-শয্যার উপর ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইতেছে!

জগতে সাহিত্যবীরদিগের জীবনযাপন কি কঠোর ও মর্ম্মন্তুদ!

যাইল্যাণ্ডার নামক গ্রীক পণ্ডিত ডায়ন কেশিয়াস নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট এক বেলার অন্ন সংস্থান হেতু দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, আঠার বৎসরের সময় আমি যশোলাভ করিবার জন্য তৎপর হই। কিন্তু পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমাকে খুঁজিতে হইয়াছিল—কি করিয়া আমি দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে পারি।

স্পেনদেশীয় বিখ্যাত সুরসিক লেখক কার্ভেন্টিস্ অন্নের কাঙ্গাল ছিলেন। পর্ত্তুগালের মৌনবাণী সাধক বীর হৃদয়ী কামোয়েঁ জীবনোপায় বর্জ্জিত অবস্থায় লিসবনের হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। লুসিয়াড নামক কাব্যের প্রথম সংস্করণে লর্ড হলাণ্ড জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে তাঁহার মৃত্যুকালীন অবস্থার বিবর যাহা সংগ্রহ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কি তীব্র অরুন্তুদ। সন্ন্যাসী অবশ্য বীরসাহিত্যিকের মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "এমন বিদ্বান ও

অসাধারণ প্রতিভাবান পণ্ডিতের কি চরম দুর্দশা! আমি লিসবনের হাসপাতালে রুগ্ন ও শায়িত অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার শবাবরণ করিবার জন্য একখানা বস্ত্রও জুটিল না। যিনি দূর ভারতে স্বীয় যশোরশ্মি জাল বিস্তার করিয়াছিলেন দুস্তর জলধিপারে পর্তুগালের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই ভীষণ পরিণাম। যাঁহারা অহোরাত্র আত্মহারা হইয়া বাণীর সেবায় রত, তাঁহারা ইহা হইতে শিক্ষালাভ করুন।

শেষ জীবনে কামোয়েঁ আর কবিতা লিখিতেন না; এজন্য কেহ তাহার নিকট অভিযোগ করিয়াছিল। তিনি তদুত্তরে তাহাকে বলিয়াছিলেন—আমি যখন যুবা ছিলাম, আমার প্রচুর রক্ত ছিল যথেষ্ট খাইতে পাইতাম; তখন বন্ধুবান্ধবও আসিয়া জুটিত নানাদিক হইতে। সে কাল গিয়াছে, এখন আমার মনে শান্তি নাই, পেটে ভাত নাই; বলুন, এমন অবস্থায় কি কাব্য লিখিবার সাধ থাকে? এই দেখুন, আমার চাকরটী জ্বালানী কাঠের জন্য আমার নিকট দুইটী পয়সা চাহিতেছে, আমার তাহাও দিবার সামর্থ্য নাই। কামোয়েঁ দারিদ্র্য জ্বালায় এইরূপ দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন কিন্তু তাঁহার স্বজাতিয়েরা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে খুব বড় নাম দিয়াছিল! জগতে আদর্শ কৃতজ্ঞতার ইহাই শেষ সীমা!

বাংলার কবি বার্নসের ন্যায় মর্ম্মস্পর্শী স্বরে গাহিয়াছেন 'আমি ম'লে তোমরা আমার চিতায় দিও মঠ!'

হল্যাণ্ডের সেক্সপীয়র খ্যাতিভাজন পণ্ডিত ও কবি ভনডণ্ডেল (The Dutch Shakespeare) কয়েকখানি বিয়োগান্ত কাব্য লিখিয়া দারিদ্র্যক্লেশ ক্লিষ্ট অবস্থায় নবতিবর্ষবয়ঃক্রমে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার শ্মশানবন্ধু হইয়াছিলেন চৌদ্দজন কবি। তাঁহারা যদিও ভণ্ডেলের ন্যায় কবিত্ব যশোভাজন হইতে পারেন নাই কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহার দারিদ্র্যের ভাগী হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন!

বিখ্যাত রোমীয় পণ্ডিত ট্যাসো এমন টানাটানিতে পড়িয়াছিলেন যে তাঁহাকে এক সপ্তাহের আহার যোগাড় করিবার দায়ে তদীয় কোন বন্ধুর নিকট এক ক্রাউন ভিক্ষার জন্য হাত বাড়াইতে হইয়াছিল। 'ভিক্ষাতরে বাড়াতনি আতুর অঞ্জলি' পেটের দায়ে এ বড়াই খাটে না।

ট্যাসোর একটী সনেটে তাহার দুঃখকাহিনী বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে, সনেটটী তাঁহার বিড়ালকে লক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছে। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন 'বিড়াল! তুমি আঁধারে সুস্পষ্ট দেখিবার ভাগ্য পাইয়াছ; আমাকে তোমার চক্ষুর শক্তি দাও, আমি প্রদীপের অভাবে চোখে দেখিয়া কবিতা লিখিতে পারি না।'

আলফোন্সোর বদান্যতার জোরে এরিষ্টো একখানা ছোট ঘরের তলে মাথা রাখিতে পারিয়াছিলেন; ঘরখানা দেখিয়া স্নেহ বলিয়াছিলেন 'যিনি কাব্য জগতে সমুন্নত সৌধরাজীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র গৃহ কি তাঁহার উপযুক্ত? ইহার উত্তরে তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন। শব্দ এবং পাথরের ইমারত সমান হইতে পারে না। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই তো।

ইটালীর সাহিত্যরত্ন কার্ডিনাল বেন্টিভোগলিও অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়া অতি দৈন্যদশায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার শুভ্র যশোজ্যোতিঃ ছাড়া জগতে তিনি আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাড়ী, ঘর, ভিটামাটি সবই দেনাদারের কাছে বেচিয়া গিয়াছিলেন।

পণ্ডিত পম্পোনিয়াস লিটাসের নাই-বলিতে-কিছুই ছিল না। তাঁহার বন্ধু প্লাটিনা তদীয় রন্ধনবিষয়ক পুস্তকের বিষয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন 'যদি পম্পোনিয়াসের দৈবক্রমে দুইটী ডিম চুরি যায়, তাহা হইলে বেচারা যে পয়সা দিয়া আর দুইটী খরিদ করিবে এমন শক্তিও তাহার নাই'।

আল্‌ড্রোভাণ্ডাসের জীবনী অত্যন্ত মর্ম্মপীড়ক। ঐতিহাসিক সত্য-নির্ণয়ার্থ তিনি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছিলেন; আপনার গাঁইটের পয়সা দিয়া বহু শিল্পী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু য়ুরোপের যে নগরীর সম্মান বাড়াইবার জন্য তিনি অকাতরে জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, সেখানেই নিঃস্ব অবস্থায় তাঁহাকে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল!

বিখ্যাত ফরাসীকবি রায়ার একখানি জীর্ণকুটীরে বাস করিতেন। তাঁহার পুস্তক প্রকাশক তাঁহাকে কিছু কিছু অর্থ দিত, তাহাতেই তাঁহার মুখে হাত উঠিত। তাহার সমসাময়িক কোন গ্রন্থকারের লেখনী মুখে কবির সহজ সরল জীবনযাপনের এইরূপে সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে।

'গ্রীষ্মকালে একদিন আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম—সহর ছাড়িয়া একটু দূরে। তিনি আমাদিগকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিলেন এবং নানা বিষয় গল্প জুড়িয়া দিলেন। তাঁহার কয়েকখানি বই দেখাইলেন। তিনি অতিমাত্র দরিদ্র হওয়া সত্বেও কোথা হইতে যেন কি করিয়া আমাদিগের দিব্য জলখাবারের যোগাড় করিয়া ফেলিলেন। আমরা একটা ওকগাছের ছায়ায় বসিলাম; টেবিলক্লথ ঘাসের উপর বিছাইয়া দেওয়া হইল। কবির মধুরভাষিনী সুহাসিনী পত্নী আমাদিগকে কিছু টাটকা দুগ্ধ, পরিষ্কার জল এবং রুটী আনিয়া দিলেন। কবি নিজে একটী টুকরীতে করিয়া কিছু চেরী লইয়া আসিলেন। এইরূপে আমাদের আর রাজভোগের না-জাই পড়িল কি? আমরা যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম, তখন তাঁহার অন্তরে চাপা দারিদ্র্যদুঃখের কথা ভাবিয়া আমরা আমাদের চোখের জল সামলাইতে পারিলাম না!'

ফরাসীদেশের মার্জ্জিত রুচি লেখক ভজিলাস আজীবন সাহিত্য-সেবা করেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার সাধনার ধন অপ্রকাশিত পুস্তকখানি ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া গিয়াছিলেন না। দেনাদারেরা নাকি তাহার শবটীও সার্জ্জারি পড়ুয়া ছেলেদের কাছে বিক্রী করিয়া ছাড়িয়াছিল!

ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই রাসাইন (Racine) এবং বোইলোকে মাসিক ভাতা দিয়াছিলেন। একদিন তিনি রাসাইনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আজকাল সাহিত্যিকদের নূতন খবর কি? রাসাইন তদুত্তরে বলিলেন, মহারাজ! কর্ণেলীর বাড়ীতে বড় মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়া আসিলাম, তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত কিন্তু তাহার এক চামচ ঝোলেরও সংস্থান নাই! ইহা শুনিয়া রাজা কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; পরে তিনি অন্তিম-শায়িত কাববরের জন্য অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কবিবর ড্রাইডেন তিনশত পাউণ্ডেরও কম মূল্যে টনসনের নিকট দশ হাজার কবিতা বিক্রয় করিয়াছিলেন। প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্ সিমন ও কলী আকফোর্ডের আর্লের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে তদীয় দুঃখ-দুর্দ্দশার গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। তিনি শেষ জীবনে দেনার দায়ে কেম্ব্রিজ সহরের গারদে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার 'হিষ্ট্রী অব দি সারাসেন্সের' প্রথম খণ্ড ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে বাহির হয়। ইহার দশ বৎসর পরে উক্ত পুস্তকের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ভূমিকায় তিনি যে বাণী সেবক সুলভ দৈন্য জয়িনী শক্তির অধিকারী ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি লিখিয়াছেন—অনেকে মনে করিতে পারেন যে কারাগারে বন্দীর কঠোর জীবন যাপনকালে সাহিত্যিকের পক্ষে তাঁহার ব্রতপালন করা অত্যন্ত কঠিন। আমি কিন্তু ইহা মানিয়া লইতে চাই না। যে শক্তির সঞ্জীবনী ধারা দৈন্যের পেষণে নিষ্কাশিত হইয়া আমার হৃদয় উপছিয়া ফেলিতেছে সে সুখানুভবের তুলনা কি কোথায়ও মিলে? আমি সুখী, আমি এখানে খুব স্বাধীনতা পাইয়াছি। সে-ই প্রকৃত ঐতিহাসিক যে বীর চরিত্র চিত্রন করিতে যাইয়া নিজের জীবনের উপর দিয়া তাহা ফলাইয়া তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারে। আমি আমার এই যন্ত্রণা লাঞ্ছনা এবং দৈন্যের জন্য অনুমাত্র দুঃখিত নহি বরং সন্তুষ্ট। কারণ আমি জ্ঞানকে ধন হইতে উচ্চে স্থান দিয়াছি। জ্ঞান লাভ করিতে হইলেই ধনকে এবং শারীর সুখকে উপেক্ষা করিতে হইবে।

ভারতের অতীত ইতিহাস এই দৈন্য গর্ব্বে ভরা। ভারত বাণীর বিনোদিনী বীণা হইতে লক্ষ্মীর প্রতি উপেক্ষার সুরে বাজিতেছে—

তবৈব বাহা স্তব নৃত্যগীতে।

নিত্যবর্ত্তমান মহাকাল ও উদাত্তস্বরে বলিতেছেন—

বিদ্যার্থিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবো লোলুপন্তঃ

সাধক কঠোর সাধনায় জগতের সে সমস্যা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন—

যেয়ে প্রেতে বিচীকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।

সন্ধান মিলিয়াছে তাঁহার, যাঁহাতে জ্ঞানৈশ্বর্য্য একাধারে বিদ্যমান।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

কৃত্তিবাস স্মৃতি।

কার স্মৃতি ? স্মৃতি তাঁর প্রস্তরে পাষাণে
অমরত্ব যাঁর পায়ে পড়ে লুঠাইয়া ?
স্মৃতি তাঁর পৃথিবীর জড়ের বন্ধনে
মনোময় মহারাজ্য যে গেল স্থাপিয়া ?
যাঁহার মধুর দিব্য কোমল ঝঙ্কার,
জাগাইল ধীরে শিশু-সুখ-সুপ্ত হিয়া
নবীন আদর্শ ধরি সম্মুখে তাহার
উন্নত করিল চিত্ত ভক্তি-প্রেম দিয়া ?
যুবকের দৃপ্তবুকে যেবা প্রতিষ্ঠিল—
মধুর দাম্পত্য প্রেম উন্নত মহান্‌
দুর্গম সংসার পথে যে খুলিয়া দিল
কঠোর-কর্ত্তব্য-কর খর খরশান।
বৃদ্ধের বিষণ্ণ মুখে যে আনিল হাসি,
বৈকুণ্ঠ সম্ভোগ-সুখ-স্বপন আঁকিয়া ;
কৃত্তিবাস, কৃত্তিবাসসম শঙ্কানাশী
উদ্ধার করিল ন'র রাম নাম দিয়া।
কল্পনা কমল কম কুসুমের হারে
রাম সীতা যুগ্মমূর্ত্তি যে জন সাজা'ল,
নানাবর্ণে, নানাছন্দে, নানা অলঙ্কারে
বিভূষিত করি গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিল ;
যে যুগল রূপ মধু মাধুরী পিয়াসে
লুব্ধ ভৃঙ্গ আসে ছুটি দেশান্তর হ'তে
মানব মানস মজে, ভবক্ষুধা নাশে
বৈদেহী রাঘব পদ বন্দন' সঙ্গীতে।
তাঁরি স্মৃতি ! তাঁরি অর্ঘ্য দীন আয়োজন
মানসমন্দির পটে জাগে যাঁর ছবি,
বঙ্গ-গুরু, বঙ্গমার অঞ্চলের ধন
বাঙ্গালীর কৃত্তিবাস বিচক্ষণ কবি !

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

বিষয় সূচী।

Printed by Satish Chandra Rai at the Jagat Art Press, Dacca. Published by Kedarnath Majumdar, Mymensingh.

সৌরভ

চতুর্থ বর্ষ } ময়মনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩২৩ { দশম সংখ্যা।

সের সিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

নবম পরিচ্ছেদ।

একদিন প্রাতঃকালে সাহেব চা পান করিতেছেন এমন সময় একখানা ডুলি আসিয়া তাঁবুর সম্মুখে থামিল ও একজন মেম তাহার ভিতর হইতে নামিয়া একবারে তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ব্যাপারটা আমার নিকট একটু আশ্চর্য্যজনক মনে হইল। মেমেরা প্রায়ই ডুলি চড়েনা। সংবাদ না দিয়া কাহারও তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করা ও তাঁহাদের নিয়ম বিরুদ্ধ। ব্যাপারটা কি?

ডুলি বাহকদিগের মধ্যে তিনজন ঐ দেশীয় এবং একজন হিন্দুস্থানী মুসলমান। আমি তখন ঐ মুসলমানকে পাকড়াও করিলাম। তাহাকে এক ছিলিম তামক খাওইবামাত্র তাহার মুখ খুলিয়া গেল। সে তখন যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই ঃ—

"এইস্থান হইতে প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণে রুটা গ্রাম। উহার সাহেব ঐস্থানে মিশনরির কাজ করেন। মেম সাহেব তাঁহারই স্ত্রী। সাহেবের দুই সন্তান। কন্যাটি বড়, বয়স প্রায় ৭ বৎসর, ছেলেটির বয়স প্রায় ৩ বৎসর। সাহেবের একখানা খড়ের বাড়ী আছে বটে, কিন্তু তিনি তাঁবুর মধ্যে শুইতে ভালবাসিতেন। কাল রাত্রে সাহেব তাঁবুর মধ্যেই শয়ন করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে দুই খানা খাট ছিল। এক খানাতে তিনি ও মেম সাহেব ও অপরখানাতে পুত্র কন্যা শয়ন করিয়াছিলেন। রাত্রি বোধ হয় তখন ১০টা। সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এই সময় হটাৎ মেমের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তাঁহার বোধ হইল যেন কেহ তাঁবুর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি সাহেবকে জানাইলেন। তাঁবুর অল্প দূরে একজন চৌকিদার শুইত। সাহেব তাঁবুর ভিতর হইতে ডাকিয়া তাহাকে জানাইলেন এবং তাঁহার তাঁবুর বাহিরে কে বেড়াইতেছে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন।

"ইহার কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে একটা সিংহ আসিয়া ঐ স্থানের চারিদিকে প্রত্যহ রাত্রে ঘুরিয়া বেড়াইত। চৌকিদার তাহা জানিত। সেই জন্য ঘর হইতে বাহির না হইয়াই বলিল, "হুজুর! কোনও ভয় নাই। ও একটা গর্দ্দভ। আপনি ঘুমান।" ইহার কিয়ৎকাল পরে সাহেব মেম দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি ১১টার সময় মেম সাহেবের হটাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। পার্শ্বে চাহিয়া দেখেন সাহেব নাই। তিনি তখনি উঠিয়া তাঁবুর বাহিরে আসেন। তাঁবুর দরজার ঠিক পার্শ্বে কতকগুলা খালি কাঠের বাক্স পড়িয়াছিল। মেম সাহেব বাহিরে আসিয়া দেখেন, সাহেবের মৃতবৎ দেহ ঐ বাক্সের স্তুপের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। মেম সাহেব প্রথমে মনে করিলেন সাহেব মূর্চ্ছা গিয়াছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত তখন তিনি চিৎকার করিয়া চৌকিদারকে ডাকিলেন। সে নিজের ঘরের জানালা উন্মুক্ত করিয়া কহিল, "হুজুর! আমি যাইতে পারিব না। আপনার পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড সিংহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।" মেম সাহেব দেখিলেন, সত্য সত্যই তাঁহার তিন চারি হাত দূরে একটা বৃহৎ সিংহ দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক এই সময় চৌকিদার ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করাতে ভাগ্যক্রমে সিংহটা পলায়ন করিল। তখন চৌকিদার এবং আমরা

কয়েকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। সাহেবকে যখন তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেলাম, তখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমরা সমস্ত রাত্রি বন্দুক হাতে করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিলাম। সিংহটা সমস্ত রাত্রি তাঁবুর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। এক এক বার যখন নিতান্ত তাঁবুর দরজার নিকট উপস্থিত হইত, তখন আমরা বন্দুকের আওয়াজ করিয়া উহাকে তাড়াইতে ছিলাম। তাহাকে যদি ঐ ভাবে তাড়ান না হইত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সাহেবের মৃতদেহ লইয়া যাইত। প্রাতঃকালে আমরা সাহেব ও মেম সাহেবকে লইয়া রওনা হইলাম।"

ইহার পর সাহেবের কবর হইবার পর মেম সাহেব ও তাঁহার পুত্র কন্যাকে তাঁহার দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পরে শুনিলাম মিশনরি সম্প্রদায় হইতে মেমকে যাবজ্জীবনের জন্য একটা পেন্‌সন্ দেওয়া হইয়াছিল।

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে আমাদের রেলের কাজে একজন শিখ বালক যে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছিল তাহা এইখানে বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঐ সময়ে আমরা সাভো নদীর উপর পুল প্রস্তুত করাইতে ছিলাম।

সাভো নদীর বিস্তৃতি সাধারণতঃ ২৫।৩০ গজের অধিক হইবে না। কিন্তু বর্ষাকালে উহা এক এক সময় প্রায় ৩০০।৪০০ গজ পর্য্যন্ত চওড়া হইত। এই জন্য উহার পুল নিতান্ত ক্ষুদ্র হয় নাই। উহার জন্য কোম্পানিকে ৭টা স্তম্ভ (Pillars) নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। পুলের জন্য ওভারসিয়ার, সাব-ওভারসিয়ার, মিস্ত্রি, ছুতার, লোহার প্রভৃতি সমস্তই ভারতের লোক। সাহেব সর্ব্বসমেত ৫ জন। উহাতে যে সমস্ত কুলি কাজ করিত, তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক ভারতবাসী, অবশিষ্ট এই দেশের লোক। এক এক দল কুলির উপর এক এক জন সর্দ্দার থাকিত। ইহারা প্রায় সকলেই ভারতের লোক।

ষষ্ঠ স্তম্ভটা নদীর ঠিক অপর পারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা প্রস্তুত হইয়াছে। ১ম হইতে ষষ্ঠ স্তম্ভ পর্য্যন্ত গারটার পাতা হইয়া লাইন বসান হইতেছে। ৫ম হইতে ৬ষ্ঠ স্তম্ভ পর্য্যন্ত লাইন বসানের কাজ তখনও শেষ হয় নাই। কতকগুলা লাইন ৫ম স্তম্ভ হইতে বাহির হইয়া ষষ্ঠ স্তম্ভের অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে মাত্র। এইভাবে কতকগুলা লাইন ২৫। ৩০ হাত পর্য্যন্ত বাহির হইয়া আছে। এইরূপে একটা লাইনের প্রায় ৩ হাত দূরে উপর হইতে দুইগাছা মোটা দড়ি ঝুলিয়া আসিয়া একবারে নীচে নদী পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ঐ লাইনের উপর হইতে নদীর দূরত্ব প্রায় ২৫০ হাত হইবে। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আমি নিম্নে ইহার চিত্র প্রদান করিলাম।
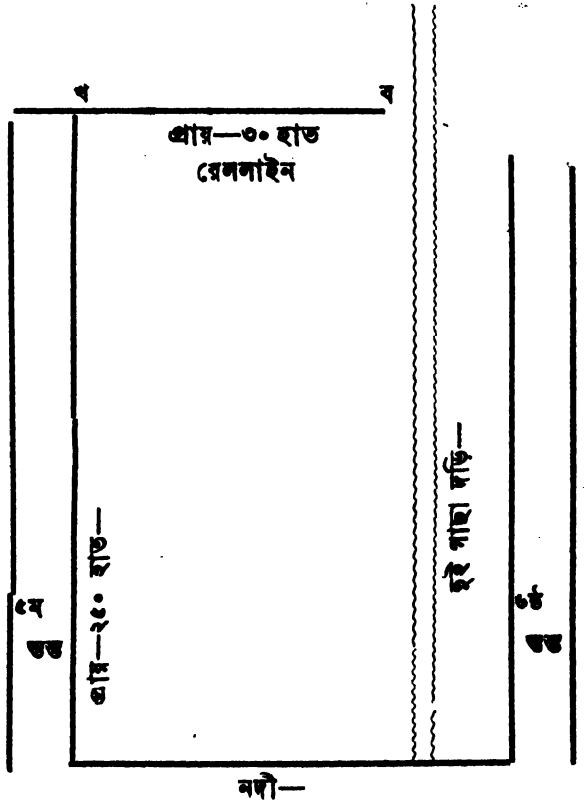
লাভ সিংহ একজন কুলি সর্দ্দার। তাহার অধীনে প্রায় ৬০ জন কুলি। ইহাদের মধ্যে প্রায় ২০।২২ জন পাঠান ছিল। ইহারা সকলেই লাভ সিংহের উপর চটা ছিল। কারণটা যে কি তাহা আমার ঠিক জানা ছিল না। কারণ যাহাই হউক, এই পাঠানেরা সকলেই কয়েক দিন হইতে লাভ সিংহের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছিল। লাভ সিংহ ইহা জানিতে পারিয়াছিল কিন্তু ঠিক ঘটনাটা তখনও পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই বলিয়া কোনও প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারে নাই।

লাভ সিংহের অধীনে একটি পঞ্জাবী বালক কাজ করিত। তাহার নাম অমরনাথ। ইহার বয়স বোধ হয় ১৮। বালক প্রাণপণে কাজ করিত বলিয়া লাভ সিংহ তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত। একদিন সন্ধ্যার পর কয়েকজন পাঠান একটি ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতেছে, এমন সময় অমরনাথ ঐ গৃহের একটি ক্ষুদ্র জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ভিতর হইতে যে ভাবে কথা হইতেছিল, তাহা সে বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইল। অর্দ্ধ ঘণ্টা দাঁড়াইবার পর সে যাহা শুনিল তাহার মর্ম্ম এই—ঐ দিন রাত্রি ৭॥ টার সময় লাভ সিংহ বড় সাহেবের বাঙ্গলায় যাইবে। রাত্রি প্রায় ৮॥ টার সময় সে যখন ফিরিবে, তখন উহাদের কয়েকজন পথি মধ্যে এক ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং লাভ সিংহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেই উহারা উহাকে যুগপৎ আক্রমণ করিবে।

এই ভীষণ পরামর্শ শুনিয়া অমরনাথের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অসাবধান হইয়া সে এমন ভাবে এক শব্দ করিয়া উঠিল, যাহা ভিতরের পাঠানদের কর্ণগোচর হইল। তাহারা তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া অমরনাথকে দেখিতে পাইল। সে যে লাভসিংহের লোক তাহা উহারা বিশেষ ভাবেই জানিত। একণে উহাকে ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা বলিয়া উঠিল, "শালা লাভসিংহের চর। শালাকে ধর। আজ উহাকে খুন করিব।" উহাদের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অমরনাথ সবেগে পলায়ন করিল।

একে রাত্রিকাল, তাহার উপর প্রাণের ভয়। অমরনাথ জানিত যে, উহাকে ধরিতে পারিলে পাঠানেরা খুব সম্ভব খুন করিয়া ফেলিবে। সেইজন্য সে সম্মুখে যে রাস্তা দেখিল, তাহাই অবলম্বণ করিল। ঐ রাস্তা বরাবর ৫ম স্তম্ভের উপর চলিয়া গিয়াছে। কিয়দ্দূর যাইবার পর সে যখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল তখন আর ফিরিবার উপায় নাই। তাহার পশ্চাৎ ২ যে পাঠানেরা আসিতেছে তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল।

যখন সে স্তম্ভের উপর উঠিল, তখন সে মুহূর্ত্তের জন্য একবার দাঁড়াইল। তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া পাঠানেরা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল এবং কহিল, "শালা খুব ফাঁদে পড়িয়াছে। আর কোথায় পলাইবে।" কথাটা সত্য। ঐ স্তম্ভ হইতে নামিতে ও উঠিতে ঐ একই পথ। এ অবস্থায় তাহার ধরাপড়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। অমরনাথ আবার দৌড়িতে আরম্ভ করিল। এবার সে রেলের লাইন অবলম্বন করিয়া ছুটিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্তম্ভের অপর পার্শ্বে খ চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হইল। এবার তাহাকে বাধ্য হইয়া গতিরোধ করিতে হইল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া পাঠানেরা আবার হাসিয়া উঠিল, এবং শীকার হস্তগত ভাবিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া কয়েকটা চুরুট ধরাইতে আরম্ভ করিল।

ইতোমধ্যে কিন্তু অমরনাথ নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল। সে বুঝিল ধরা পরিলে শুধু যে তাহার প্রাণ যাইবে এমত নহে। তাহার মনিবকেও উহারা হত্যা করিবে। সে তখন ঐ রেলের লাইন অবলম্বনে ব চিহ্নিত স্থান অভিমুখে অগ্রসর হইল। ব্যাপারটা একবার ভাবিয়া দেখুন। রেলের লাইন কি প্রকার চওড়া হয় তাহা সকলেই জানেন। উভয় দিকে ধরিবার কিছুই ছিল না। ঐ স্থান হইতে ২৫০ হাত নিম্নে নদী পর্য্যন্ত শূন্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই ১৮।১৯ বৎসরের বালক, সেই অন্ধকার রাত্রে ৫।৫॥ ইঞ্চি লাইনের উপর দিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইল। পাঠানেরা তাহার ঐ দুঃসাহসিক কাজ দেখিয়া প্রথমে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। যখন সে ২০।২২ হাত চলিয়া গেল, তখন তাহাদের মুখে কথা ফুটিল। তাহারা হাজার হউক পাঠান। বীরত্বের সম্মান করিতে ভুলে না। প্রথমে তাহারা সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল "সাবাস্ ভাই! সাবাস্!" তাহার পর বলিল, "অমরনাথ! তুমি ফিরিয়া আইস। আমরা তোমার কোন অনিষ্ট করিব না।" অমরনাথ কিন্তু তাহার উত্তর দিল না অথবা হয়ত সে উত্তর দিতে পারিল না। সে সময়ে তাহার সমস্ত প্রাণ ঐ কার্য্যের উপর। হয়ত কথা কহিলেই সে পড়িয়া যাইত।

অমরনাথ বরাবর লাইনের শেষে ব স্থানে উপস্থিত হইল। সেদিন কি তিথি ছিল, আমার মনে নাই, কিন্তু অতি অল্প জোৎস্না যে ছিল, তাহা আমি এখনও ভুলি

নাই। সে ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ঐ দড়ি ধরিবার জন্ত চেষ্টা করিল কিন্তু নাগাল পাইল না। দড়ি দুই গাছা উহার নিকট হইতে প্রায় ৩ হাত দূরে ছিল। তখন সে সম্মুখ দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িল। তবুও পাইল না। ব্যাপারটা একবার মনে ২ ভাবিয়া দেখুন। একখানা লাইনের উপর সে দাঁড়াইয়া। ২৫০ হাতের মধ্যে তাহার আর কোনও অবলম্বন নাই। এমত অবস্থায় সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়া যে কতদূর অসম সাহসিকের কাজ,তাহা বোধ হয় কাহাকেও আর বুঝাইতে হইবে না।

দুইবারের চেষ্টাতেও সে যখন কৃতকার্য্য হইল না তখন সে মুহূর্ত্তকাল থামিয়া কি ভাবিল। তাহার পর পকেট হইতে তামাক খাইবার পাইপটা বাহির করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিল। এবং তৃতীয়বার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। এবারেও সে অকৃতকার্য্য হইল না বটে, কিন্তু ইহা বুঝিল যে আর অতি সামান্য চেষ্টা করিলেই সফল কাম হইবে। তখন সে পুনরায় সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। ধন্ত ভগবান! এবারে সে দড়িটা পাইপে আটকাইয়া নিজের নিকট লইয়া আসিল। তাহার পর সে দড়ির সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল। যখন ১০০ হাত নামিয়া আসিল, তখন সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং হাত ঘোর রক্তবর্ণ হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সে আবার নামিতে আরম্ভ করিল। যখন সে প্রায় ২০০ হাত অতিক্রম করিল, তখন তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। শরীরে আর বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না। দুইটি হস্ত তালু একবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে ঘন ২ শ্বাস ফেলিতেছে। আরও ৫।৭ হাত যাইবার পর সে আর পারিল না। দড়ি ছাড়িয়া সে সবেগে যাইয়া নদীর বালুকা চড়ের উপর পড়িল।

ভাগ্যক্রমে ঠিক ঐ সময়ে আমি ও লাভসিংহ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিতেছি। হটাৎ ঐ শব্দে আমরা প্রথমে চমকিয়া উঠিলাম। অমরনাথ আমাদের নিকট হইতে ১০।১২ হাত দূরে পড়িয়াছিল। আমরা কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাহার নিকট আসিলাম। আমার পকেটে দিয়াশলাই ছিল। তাড়াতাড়ি আলো জালিয়াই আমরা উহাকে চিনিতে পারিলাম। লাভসিংহ প্রথমে যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে দুইহাতে উঠাইয়া লইল এবং সাহেবের বাড়ী খুব নিকটে বলিয়া আমরা দুইজনে তাহাকে লইয়া ঐদিকে ধাবিত হইলাম।

আমরা যখন সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি লিখিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তখনও পর্য্যন্ত কিছুই জানিতাম না। এইজন্ত শুধু বলিলাম 'হুজুর! এ লোকটা পড়িয়া গিয়াছে'। সাহেব তখনই অমরনাথকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন, এবং কহিলেন "কোন স্থান ভাঙে নাই। কিন্তু হাত এমন ক্ষত বিক্ষত হইল কেন ?" আমরা ইহার ঠিক উত্তর দিতে পারিলাম না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাহার জ্ঞান হইল। চক্ষু খুলিবা মাত্র সে আমাকে দেখিতে পাইল। এবং ক্ষীন অথচ অত্যন্ত ব্যাগ্র ভাবে কহিল, "আরদালি সাহেব! লাভসিংহ" অত্যন্ত শ্রান্তি প্রযুক্ত আর বলিতে পারিল না। ২।৩ মিনিট পরে আবার কহিল. "পাঠানেরা লাভসিংহকে হত্যা করিবে।" আবার চুপ করিল।

সাহেব তাহার এই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে খানিকটা ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া দিলেন। সঙ্গে ২ ফল পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সে ধীরে ২ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। সাহেব সমস্ত শুনিলেন, এবং সে রাত্রে লাভসিংহ ও অমরনাথকে আমার ঘরে থাকিবার আদেশ দিলেন। পরদিবস তিনি পুলিসের সাহায্যে ১১ জন পাঠানকে গ্রেপ্তার করাইলেন। উহাদের মধ্যে দুইজন আমাদের পক্ষে সাক্ষী দেওয়াতে সমস্ত ঘটনা বেশ পাকা ভাবে প্রমাণ হইল এবং ৯ জন পাঠানের বেশ কঠিন শাস্তি হইল।

আমরনাথকে নগদ ২৫০ টাকা পুরস্কার ও ৪০ টাকা বেতনে পুলিস দারোগার পদ দেওয়া হইল।

পাণ্ডুনগরে দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্র দেবের অভ্যুদয়কাল নির্ণয়। *

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দন দেবের অভ্যুদয়কাল সম্বন্ধে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, মালদহের স্বনামখ্যাত পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের প্রাপ্ত 'মহেন্দ্র দেব' নামাঙ্কিত একটী ও 'দনুজমর্দ্দন দেব' নামাঙ্কিত অপর একটি, ও যশোহর, খুলনার ইতিহাস' লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রাপ্ত একটী—এই তিনটী প্রাচীন রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে উক্ত সমস্যা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সমাধান যোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি পাণ্ডুনগরাধিপ মহেন্দ্র দেব নামক রাজার শাসনকাল ও দনুজমর্দ্দন দেবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচার লইয়া অপর একটী নূতন সমস্যা আমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "দেব বংশম্" নামক একখানি নবাবিষ্কৃত কুলগ্রন্থ এবং প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট ঢাকা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত H. E. Stapleton সাহেবের নিকট স্থিত মহেন্দ্রদেব নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রা এই সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে।

রাধেশ বাবুর প্রাপ্ত মুদ্রাদ্বয়ের একটির প্রথম পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীমহেন্দ্রদেবস্য" অপর পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ পাণ্ডুনগর—শকাব্দা * ৩১ *", এবং অপরটির প্রথম পৃষ্ঠায়"শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ পাণ্ডুনগর—শকাব্দা * *৩৯" খুব পরিষ্কার ভাবে খোদিত আছে। মহেন্দ্রদেব নামাঙ্কিত মুদ্রাটির সহস্রক স্থানটি ক্ষয়প্রাপ্ত ও একক স্থানটী অস্পষ্ট এবং দনুজমর্দ্দনদেব নামাঙ্কিত মুদ্রাটির মর্দ্দনের 'ন' অক্ষর ও শকাব্দের সহস্রক স্থানটি ক্ষয়প্রাপ্ত ও শতক স্থানটী অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রাধেশ বাবু কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাদ্বয় সাধারণের গোচরীভূত হইবার পর পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল যে পাণ্ডুনগর বা বর্ত্তমান হজরত পাণ্ডুয়া নামক স্থানে কোন সময়ে মহেন্দ্র দেব ও দনুজমর্দ্দন দেব নামক দুই ব্যক্তি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্র দেব ও দনুজমর্দ্দন দেবের আবির্ভাব কাল লইয়া ঐতিহাসিক মহলে নানাপ্রকার বাদানুবাদের সূত্রপাত হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে সতীশবাবুর মুদ্রাটী আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐতিহাসিকগণ দনুজমর্দ্দন দেবের সময় সম্বন্ধে একরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে এক নূতন সমস্যার উৎপত্তি হইল। সতীশ বাবুর মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দন দেব—১৩৩৯ শকাব্দা—চন্দ্রদ্বীপ" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ" অঙ্কিত ছিল। সুতরাং রাধেশ বাবুর মুদ্রার শকাব্দ সংখ্যার শতক ও সহস্রক স্থানে যে যথাক্রমে "৩" ও "১" এবং পূর্ণশকাব্দ সংখ্যা যে "১৩৩৯" তাহা অনুমাণ করা কষ্ট-সাধ্য হইল না। কিন্তু সতীশ বাবুর মুদ্রাটী "চন্দ্রদ্বীপ" হইতে মুদ্রিত হওয়ার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া নানা জনে নানাপ্রকার কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমান ঐ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ একরূপ মানিয়া লইলেন। রাখাল বাবু প্রবাসী পত্রিকায় তাঁহার মত যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন আমরা সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—"........সমসুদ্দিন ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে (গৌড়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় উত্তর বঙ্গের ভাটুরিয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ বা কংশ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং বিদ্রোহী হইয়া মুসলমান রাজাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহার পর পাচ বৎসর কাল রাজধানী ফিরোজাবাদ অর্থাৎ পাণ্ডুনগরে সাহাবুদ্দিন বয়েজিদ শাহের নামে মুদ্রাঙ্কিত হইত। কেহ কেহ বলেন পদচ্যুত রাজার পুত্র বয়েজিদ সাহকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহার নামে গণেশ বা কংশ বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। অপরাপর ঐতিহাসিকেরা বলেন যে রাজা গণেশ বা কংস মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সাহাবুদ্দিন বয়েজিদ সাহ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়েজিদ সাহের পর রাজা

* উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের রঙ্গপুর অধিবেশনে পঠিত।

গণেশ বা কংসনারায়ণের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জালালুদ্দিন মহম্মদ সাহ নাম গ্রহণ করেন ও ১৪১৪ হইতে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। যদুর রাজত্ব পূর্ব্বে মুয়াজ্জমাবাদ (ময়মনসিংহ) ও চাটগাঁও (চট্টগ্রাম) ও দক্ষিণে সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জালালউদ্দিন মহম্মদ সাহের নিম্নলিখিত টাকশালগুলিতে মুদ্রিত রৌপ্যমুদ্রা কলিকাতার যাদুঘরে আছে—(১) ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া বা পাণ্ডুনগর) (২) সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) (৩) মুয়াজ্জমাবাদ (ময়মনসিংহ) (৪) ফতেহাবাদ (ফরিদপুর) (৫) চাটগাঁও (চট্টগ্রাম)।

"যে বৎসর রাজা গণেশ বা কংশ নারায়ণের মৃত্যু হয় সেই বৎসরেই মহেন্দ্রদেবের মুদ্রাটী (পাণ্ডুনগরে) প্রস্তুত হইয়াছিল। * * * অনুমান হয় রাজা গণেশ বা কংস নারায়ণের মৃত্যুর পর যদু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে মহেন্দ্র দেব বিদ্রোহী হইয়া পাণ্ডুনগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করেন। ইতিহাসে কথিত আছে যদু পাণ্ডুনগর বা ফিরোজাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী পুনরায় গৌড়ে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহাও হইতে পারে যে মহেন্দ্রদেবের ভয়ে যদুকে ফিরোজাবাদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মহেন্দ্রদেব সম্ভবতঃ দনুজমর্দ্দনের পিতা। দনুজমর্দ্দন দেব সম্ভবতঃ পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াই যদু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছিলেন ও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পাণ্ডুনগরে ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে দনুজমর্দ্দন দেবের যে মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় তাহার রাজ্য প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। দনুজমর্দ্দন দেবের রাজত্ব বরেন্দ্রভূমি হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল না—তাহার প্রধান কারণ এই যে ১৩৩৯ শকাব্দে (১৪১৭—১৮ খৃঃ—৮২১ হিঃ) ফতেহাবাদ ও সাতগাঁও জালালউদ্দিন মহম্মদ সাহের হস্তগত ছিল। কারণ উক্ত বৎসরে পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ে মুদ্রাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দনুজমর্দ্দন দেব বোধ হয় রাজ্য প্রাপ্তির বৎসরেই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপন করিয়া স্বনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া হস্তচ্যুত হইলেও সাহাবুদ্দিন ও জালালউদ্দিন মহম্মদ সাহের অনেক মুদ্রার খোদিত লিপিতে ফিরোজাবাদে খোদিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। হিঃ ৮১৬ হইতে ৮১৯ (১৪১৩—১৬ খৃঃ) পর্য্যন্ত মুদ্রিত মুসলমান মুদ্রা ফিরোজাবাদে মুদ্রিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।" (প্রবাসী ১২শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ৩৮৭—৩৮৮পৃঃ)

উদ্ধৃত অংশে রাখাল বাবু মহেন্দ্র দেবকে দনুজমর্দ্দন দেবের পিতা বলিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি "দেববংশম্" নামক বটুভট্টকৃত একখানি নবাবিষ্কৃত কুলগ্রন্থও তাঁহার ঐরূপ অনুমানের যাথার্থ্য সমর্থন করায় কেহ কেহ রাখাল বাবুর উক্ত মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেছিলেন এবং ঐতিহাসিক বিষয়ে কুলশাস্ত্রের প্রমাণের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইতিমধ্যে রাখাল বাবু তাঁহার "বাঙ্গলার ইতিহাস" প্রথম ভাগের ১৩১ পৃষ্ঠায় মহেন্দ্রদেব সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মত প্রত্যাহার করিয়া লিখিলেন—"স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার চিত্র দেখিয়া আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে উক্ত মুদ্রা ১৩৩৬ শকাব্দা অর্থাৎ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। ঢাকা বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন (H. E. Stapleton) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত খুলনা জেলায় আবিষ্কৃত দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রাদর্শন করিতে আসিয়া আমাকে মহেন্দ্র দেবের অনেকগুলি রজতমুদ্রা দেখাইয়াছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রা ১৩৪০ হইতে ১৩৪৯ শকাব্দের (১৪১৮—১৪২৭খৃঃ) মধ্যে কোন সময়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। কারণ এই সকল মুদ্রার সহস্রাঙ্কের স্থানে ১, শতাঙ্কের স্থানে ৩, দশাঙ্কের স্থানে ৪ অঙ্কিত আছে। প্রায় সকল মুদ্রাতেই একাঙ্কের স্থান কাটিয়া গিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে পাণ্ডুয়ার আবিষ্কৃত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রায় "শকাব্দা ১৩৩৬" পাঠ করিয়াছিলাম কিন্তু মহেন্দ্র দেবের আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পাণ্ডুয়ার মুদ্রার তারিখের প্রকৃত পাঠোদ্ধার হয় নাই। ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ যে মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এখন কোথায় আছে বলিতে পারা যায় না। মূল মুদ্রা পরীক্ষা না করিয়া পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা উচিত নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদে

দনুজমর্দ্দন দেবের যে মুদ্রা রক্ষিত আছে, তাহাতে স্পষ্ট শকাব্দা ১৩৩৯ লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন মহেন্দ্র দেবের যে মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার তারিখের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে তিনি ও আমি এক মত হইয়াছি। এই সকল মুদ্রা যে ১৩১৮ হইতে ১৪২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল নবাবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে মহেন্দ্র দেব দনুজমর্দ্দনদেবের পরবর্ত্তী; পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। সুতরাং মহেন্দ্র দেবের সহিত যদি দনুজমর্দ্দন দেবের কোন সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলেও তিনি দনুজমর্দ্দন দেবের পিতা হইতে পারেন না। সুতরাং বটুভট্টের দেববংশের ঐতিহাসিক অংশ গুলি বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে না।" রাখেশ বাবুর আবিষ্কৃত মুদ্রাদ্বয় এক্ষণে আর পাইবার উপায় নাই। তিনি উক্ত উভয় মুদ্রাদ্বয়ের আলোক চিত্র সহ যে বিবরণ 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' (১৩১৭ সাল, ২য় সংখ্যা, ৭০ পৃষ্ঠা) প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার তারিখের একক সংখ্যাটী তিনি "৬" বলিয়াই পাঠ করিয়াছেন কিন্তু চিত্রে একক স্থানের সংখ্যাটি নিতান্ত অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। তাহা "৯" হইলেও হইতে পারে। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ষ্টেপল্‌টন সাহেবের নিকট মহেন্দ্রদেব নামোঙ্কিত যে সকল মুদ্রা দেখিয়াছেন তাহাতে টাকশালের নাম ও "চণ্ডীচরণ পরায়ণ" কথাগুলি অঙ্কিত আছে কিনা জানিতে পারিলে আমাদের আলোচ্য 'মহেন্দ্রদেব' ও ষ্টেপল্‌টন সাহেবেন 'মহেন্দ্রদেব' অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বুঝিবার সুবিধা হইত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে রাখাল বাবু ঐ দুইটী প্রধান বিষয় সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই।* ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা যে রাজা দনুজমর্দ্দন দেবই চন্দ্রদ্বীপের রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাহা হইলে [চণ্ডীচরণ পরায়ণ] দনুজ মর্দ্দন দেবের প্রথমতঃ পাণ্ডু নগরে বা পাণ্ডুয়ায় ১৩৩৯ শকে অভ্যুদয় হয় এবং তথা হইতে ঐ শকাব্দেই তিনি চন্দ্রদ্বীপে গিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ণিত মুদ্রাদ্বয় হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয়। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুও তাহাই অনুমান করিয়াছেন। এরূপ স্থলে পাণ্ডু নগরাধিপ (শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ) মহেন্দ্র দেবকে উক্ত দনুজমর্দ্দন দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কারণ তাঁহাদের মতে মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দন দেবের পরবর্ত্তী হইলে তাঁহার মুদ্রায় "পাণ্ডুনগর" অঙ্কিত না থাকিয়া চন্দ্রদ্বীপই অঙ্কিত থাকিত। পাণ্ডুনগরে প্রাপ্ত মহেন্দ্র দেবের মুদ্রায় ও দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রায় "পাণ্ডু নগর" এবং সুন্দরবনে প্রাপ্ত দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রায় "চন্দ্রদ্বীপ" অঙ্কিত থাকায় ইহাই দাঁড়াইতেছে যে মহেন্দ্র দেব ও দনুজমর্দ্দন দেব উভয়েই পাণ্ডুনগরে রাজত্ব করিতেন। অধিকন্তু দনুজমর্দ্দন দেব পাণ্ডু নগর হইতে চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া নূতন রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র দেব ও দনুজমর্দ্দন দেব উভয়েই পাণ্ডুনগরে রাজত্ব করিয়া থাকিলে উভয়ে যে একই সময়ে তথায় রাজত্ব করেন নাই, একজন অপরের পরে রাজত্ব করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এরূপ স্থলে রাখাল বাবুর মুদ্রার সাক্ষ্য ঠিক হইলে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে ১৩৩৯ শকাব্দে দনুজমর্দ্দন দেব পাণ্ডুনগর অধিকার করিবার পর তিনি মহেন্দ্রদেব কর্ত্তৃক ঐ শকাব্দেই পাণ্ডুনগর হইতে বিতাড়িত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবং তৎপর মহেন্দ্রদেব ১৩৩৯ শকাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৪০ হইতে ১৩৪৯ শকাব্দ মধ্যে যে কোন সময় পর্য্যন্ত পাণ্ডু নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে হিঃ ৮১৬ হইতে ৮১৯ (১৪১৩—১৪১৬ খৃঃ অব্দ—১৩৩৫ হইতে ১৩৩৮ শকাব্দ) পর্য্যন্ত কতকগুলি মুদ্রা ফিরোজাবাদে মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতক সাহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ ও কতক জালালুদ্দিন মহম্মদ সাহের নামাঙ্কিত। রাখাল বাবুর মতে ঐ সময় (১৩১৩ হইতে ১৬ খৃঃ) পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া জালালুদ্দিনের হস্ত-

* রঙ্গপুরে এই উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে রাখাল বাবু আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে Stapleton সাহেবের আবিষ্কৃত মহেন্দ্র দেবের মুদ্রাগুলিতেও "চণ্ডীচরণ পরায়ণ" ও পাণ্ডুনগর উৎকীর্ণ আছে। (লেখক)

চ্যুত হইলেও তিনি তাঁহার মুদ্রায় ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া) নামযুক্ত মোহরাঙ্কিত করাইতেন। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত ধরিয়া লইলে এরূপ অসঙ্গত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়না। কারণ ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া) হস্তচ্যুত হইবার পরে ঐনগরের নাম সংযুক্ত মুদ্রা প্রকাশ করা কোন রাজার পক্ষেই গৌরবের বিষয় হইতে পারেনা। এবং এরূপ ঘটনা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। আমাদের বোধ হয় রাখাল বাবু মহেন্দ্রদেবের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই ঠিক। অর্থাৎ মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দন দেবের পরবর্ত্তী। সম্ভবতঃ (যদু) জালালুদ্দিন মহম্মদ সাহ ১৪১৬ খৃঃ (১৩৩৮ শকাব্দ) পর্য্যন্ত পাণ্ডুনগরে নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করেন এবং তথা হইতে মুদ্রা প্রচার করেন—এই জন্যই তাঁহার ঐ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মুদ্রিত মুদ্রার ফিরোজাবাদের (পাণ্ডুয়ার) নাম অঙ্কিত দেখা যায়। তৎপর ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে (১৩৩৯ শকাব্দে) দনুজমর্দ্দনদেব জালালুদ্দিনকে বিতাড়িত করিয়া পাণ্ডুনগর অধিকার করেন এবং ঐ বৎসরেই তথা হইতে স্বনামে মুদ্রাপ্রচার করেন। অধিক সম্ভব ঐ বৎসরেই মহেন্দ্র দেব দনুজমর্দ্দন দেবকে পাণ্ডুনগর হইতে বিতাড়িত করিয়া পাণ্ডুনগর অধিকার করেন এবং তথা হইতে স্বনামে মুদ্রা প্রচার আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ দনুজমর্দ্দন দেব পাণ্ডুনগর হইতে বিতাড়িত হইয়া দলবল সহ চন্দ্রদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ঐ ১৩৩৯ শকাব্দেই তথায় নূতন স্বাধীন রাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতঃ স্বনামে মুদ্রাপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। মহেন্দ্র দেব দনুজমর্দ্দন দেবের সহিত কিরূপ সম্পর্কান্বিত ছিলেন তাহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বটুভট্টের "দেববংশম্‌" কৃত্রিম বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। এই গ্রন্থের শেষ অংশ যে, কৃত্রিম এবিষয় যথেষ্ট প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং দেব বংশের প্রমাণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। তাঁহাদের তুল্য উপাধি ও উভয়ের মুদ্রায় "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ" মুদ্রিত থাকায় তাঁহাদিগকে এক বংশীয় বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, রাজা দনুজমর্দ্দন দেবই যে ১৩৩৯ শকাব্দে পাণ্ডুনগর হ। পাণ্ডুয়া হইতে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান শাসন পর্য্যুদস্ত করেন, এবং তৎপর ঐ শকাব্দেই তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া মহেন্দ্র দেব যে ১৩৩৯ শকাব্দ হইতে অন্ততঃ ১৩৪০ শকাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ডুনগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহা রাখেশ বাবুর প্রাপ্ত মুদ্রা ও রাখাল বাবুর উল্লিখিত মুদ্রার প্রমাণ হইতে সঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি.এল.।

প্রাচীন পুঁথির পরিচয়।

নিমাই সন্ন্যাস।

এখানা একখানা হস্তলিখিত পুঁথি। ১২০৯ সনের ২১শে বৈশাখ জিলা ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত গচিহাটা গ্রামের পাড়া আতরতপা নিবাসী প্রসিদ্ধ নন্দী মজুমদার বংশীয় ৺ বিষ্ণুরাম নন্দীর হস্তে গুণপাড়া নিবাসী কুবির বণিক্যের দোকানে বসিয়া লিখিত। তৎকালে দোকানদার মহাজনদিগের ঘর পুঁথি লেখক ও পাঠকদিগের আড্ডা ছিল. ইহার প্রমাণ আরো পাইয়াছি।

এই পুঁথি ব্যক্তিবিশেষের রচিত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচিত পদাবলীর সংগ্রহ মাত্র। অধিকাংশ পদাবলীই বাসুদেব ঘোষ কৃত। নরোত্তম দাস, রসিকআনন্দ, গৌরি দাস এবং লোচনআনন্দ কৃত পদাবলীও দৃষ্ট হয়—

"বাসুদেব ঘোষে ভণে, কান্দ শচী অকারণে"।
রসিক আনন্দ বাণী, শোকানলে দয় প্রাণী'।
"ধায় গৌর রাঢ় দেশে, নিত্যানন্দ রায় পাশে,
বাসুঘোষে স্থির নাহি বান্ধে।"
"বাসুদেব ঘোষ ধায় কান্দিতে কান্দিতে।"
"কহে নরোত্তম দাস, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস,
যুগভরি রহিল ঘোষণ।"
"গৌরিদাস, করত হাস, জীব উদ্ধারে।"
"কি মোর দুঃখের কথা, কহিতে অন্তরে ব্যথা,
ধিক ধিক নরোত্তম দাস"।

"বাসুদেব ঘোষে কয়, শুনিতে হৃদয় দয়"।
"লোচন আনন্দে বলে, প্রভু নীলাচলে চলে,
ক্রন্দন উঠিল শান্তিপুরে।"

গ্রন্থের প্রারম্ভ ভাগ এই পুঁথিতে নাই। গৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিয়া গেলে বিষ্ণুপ্রিয়া জাগিয়া শয্যাপাশে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া শচীর মন্দিরের দ্বারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—বাসুদেব ঘোষকৃত এই করুণ রসপূর্ণ অধ্যায় হইতে এই পুঁথির আরম্ভ। গৌরাঙ্গের শান্তিপুর পরিত্যাগ ইহার সমাপ্তি। আমার নিকট এই নিমাই সন্ন্যাস পুঁথি এক খণ্ড ছিল, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা হারাইয়াছি। তাহাতে গ্রন্থের আদি ও মধ্যভাগ ছিল, শেষভাগ ছিল না। বাল্যকালে উহার অধিকাংশই আমার কণ্ঠস্থ ছিল। প্রারম্ভ ভাগ আজিও স্মৃতিতে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"বিহার করয় গৌর লয়ে শিশুগণ।
সুরধুনী তীরে ফিরে সদা উচাটন॥
খোল করতালে গৌর সাজন করিয়া।
তার মাঝে মাঝে নাচে গৌর বিনোদিয়া॥
বৃন্দাবন লীলা যার পড়য়ে স্মরণ।
ভূমিতলে পড়ে প্রভু হয়ে অচেতন॥
কৃষ্ণকথা আলাপন সহিতে সন্ন্যাসী।
মনে প্রভু দাঁড়াইল হইতে সন্ন্যাসী॥
পরস্পর কহে সবে শচীর গোচর।
বুঝিলাম গৌর তব না রহিবে ঘর॥
কিশোর বয়সকালে দেখিছি যেমত।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি হরি পদে রত॥
সর্ব্বদা সন্ন্যাসী সঙ্গে করে আলাপন।
বাউলের প্রায় দেখি সদা উচাটন॥
শচী বলে সাবধান হও নদীয়াবাসী।
পাছে বুঝি যায় নিমাই হইয়া সন্ন্যাসী॥
সাত নহে পাঁচ নহে এক গৌরহরি।
তিলেক না হেরিলে যে রহিতে না পারি॥
সুরধুনী তীরে যদি যায় গৌর রায়।
পাছে পাছে যায় শচী বলিয়া নিমাই॥
কাঙ্গালের ধন যেন রাখয়ে যতনে।
সতত রাখয়ে শচী আপন সদনে॥
শুইলে না আসে নিদ্রা শচীর নয়নে।
নিরবধি ব্যস্ত শচী নিমাইর কারণে॥
নিদ্রাকালে শুইয়া থাকে।
নিমাই নিমাই বলি ডাকে॥
শচী বলে বিষ্ণুপ্রিয়া হও সাবধান।
নদীয়া আন্ধার করি যাবে গৌরচান্দ॥
নবদ্বীপে আসিয়া ভারতি উপনীত।
শচীর মন্দিরে আসি হইলা উপস্থিত॥
* * * *
ভারতি দেখিয়া শচী উঠে চমকিয়া॥
নিতি নিতি সন্ন্যাসী আইসে আমার ভবনে।
কোন্‌দিন জানি নিমাই যায় কার সনে॥
ভারতিকে দিলা শচী বসিতে আসন।
ভোজন সামগ্রী আনি দিলা ততক্ষণ॥
ভোজন করিলা গোঁসাই আনন্দিত মনে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাহান সদনে॥"

ইতঃপর ক্রমাগত ভাবে আর আমার স্মরণ হইতেছে না, মাঝে মাঝে দু একটি মধুরপদ স্মরণ হয় মাত্র। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ অধিকাংশই স্মরণ আছে তাহা আলোচ্য পুঁথির সহ ঐক্য হয়। কোন কোন পদ ইহাতে নাই, যথা—

"যতেক মোহন্ত মুনি, স্নানে আইল সুরধুনী
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, নদীয়া আন্ধার করি,
শচী কান্দে বাহির মন্দিরে॥"

শচী নিদ্রাগতা, নিমাই বাহির হইতে ডাকিয়া বিদায় লইতেছেন। শচী সাড়া দিলেন না। তখন—

"প্রভু বলে চন্দ্রসূর্য্য তোমরা হইও সাক্ষী।
দাঁড়াইয়া মায়ের আগে মা বলিয়া ডাকি॥"
উত্তর না দিল মাও রহিল শয়নে'...............

ইত্যাদি পদগুলি স্মরণে না আইসাতে আক্ষেপ হয়। ভাষার মাধুর্য্য প্রদর্শনার্থ স্মৃতি হইতে ৪টি সূত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"কাঞ্চননগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধুনী তীরে শোভে পরম সুন্দর॥

তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গ নাগর।
নবীন রূপের তনু রসের সাগর॥"

এতদঞ্চলের প্রাচীনকালের ভদ্রলোকদের অনেকেরই ব্যাকরণ জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তাঁহারা ভূরি ভূরি সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন, এবং পুঁথি পড়া অনেকের নিত্যকর্ম্ম ছিল। সুতরাং তাঁহাদের শব্দজ্ঞান জন্মিত, কিন্তু বর্ণশুদ্ধি হইত না। আলোচ্য গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। উকার ও ওকারের, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের, নকার ও ণকারের, এবং 'স'কার ত্রয়ের যথেচ্ছ বিনিময় ইহাতে বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান আছে।

এই পুঁথির পদাবলী কর্ত্তাগণ অধিকাংশই পশ্চিম-বঙ্গবাসী হইলেও, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা প্রচুর পরিমাণে ইহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রতিলিপিকারকই এজন্য প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে বর্ত্তমান সময়ে অনেক শব্দ যাহা পূর্ব্ববঙ্গের স্বকীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা প্রাচীনকালে উভয় বঙ্গের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। নিম্নোদ্ধৃত সূত্রগুলিতে উভয়বিধ দৃষ্টান্তই আছে—

"প্রদীপ জ্বালিয়া হাতে, বিচারিল (অনুসন্ধান করিল) মন্দিরেতে"।
"পুছিলেক (জিজ্ঞাসা করিল) নিমাইর বার্ত্তা"।
"শচীরাণী পুছে তায়"।
"লড়ি আতে (হাতে) বৃদ্ধলোক আসিলেক ধাইয়া"।
"প্রবেশিল দুখের সায়রে (সাগরে)"।
"মুণ্ডন করিয়া কেশ, অন (হ'ল) অতি প্রেমাবেশ"।
"সমাই (সবাই) গৌরাঙ্গ মুখ চায়"।
"সমাই বিরস মন"।
"ধারা বয় বুক মুখ বাইয়া (বহিয়া)"।
"কিলাগি নিমাইচান্দে ছাড়িল আমারে"।
"না যাইমু (যাব) অদ্বৈত ঘরে জলে প্রবেশিব"।
"ই (এই) বেশ কে করিল"।
"ইনা (এই যে) দুঃখ কহিমু (কহিব) কাহাতে"।
"ইনা (ইহা) নাকি সহা যায়"।
"ই (এই) ডোর কপিন প্রভু প্রেমের বিকাশ"।
"এম (হেন) রূপ দেখি তবে কান্দে শচীমায়"।
"বাসুদেব ঘোষে কয়, শুনিতে হি প্রাণদয় (দাহ), মরিবাম (মরিব) গৌরাঙ্গ ভাবিয়া"।

শ্রীচন্দ্রকিশোর তরফদার।

গৌড়ের ভগ্নাবশেষ।

বাঙ্গালীর গৌরব নিকেতন গৌড় নগরীর ভগ্নাবশেষ মাত্র এখন দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভগ্নাবশেষ দেখিলে মন বিষাদে পূর্ণ হয়। গৌড়ের অতীত গৌরবের স্মৃতি আমাদিগকে পীড়িত করে। এই ভগ্নাবশেষও নয়ন রঞ্জন। গৌড় নগরীর ভগ্নাবশেষ মুসলমান শাসন কর্ত্তা ও সুলতানদের বিপুল প্রতাপ ও সমৃদ্ধির নিদর্শনরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজন্যবৃন্দের সমস্ত নিদর্শন কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই।

গৌড় সুদীর্ঘকাল বঙ্গীয় মুসলমান শাসন কর্ত্তা এবং সুলতানদের রাজধানী ছিল? তাঁহারা শোভা ও সম্পদের আধার সৌধমালা দ্বারা গৌড় নগরী ভূষিতা করিয়াছিলেন। এই সকল সৌষ্ঠবশালী অট্টালিকার কতকগুলি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশই ভগ্ন দশায় পতিত অথবা বিনষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট গৌড়ের অট্টালিকা সমূহের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তদুপলক্ষে মুসলমান আমলের প্রধান প্রধান অট্টালিকা সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করিতেছি।

গৌড় নগরী বর্ত্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত। গৌড় অতি প্রাচীন নগরী, ইহার প্রতিষ্ঠার সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন। মুসলমান বিজয়ের প্রথম হইতেই গৌড়ের বিবরণ তাহাদের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে। মুসলমানগণ বঙ্গবিজয় সম্পন্ন করিয়া হিন্দু রাজধানী গৌড় নগরীতে আপনাদের শাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? তদবধি গৌড় নগরী ন্যূনাধিক তিনশত বৎসর কাল মুসলমান শাসন কর্ত্তা ও সুলতান-দের বাসস্থান ছিল। এই সময় মধ্যে তথায় বহু সংখ্যক অতুল সৌষ্ঠবশালী অট্টালিকা নির্ম্মিত

হইয়াছিল। গৌড়ের মুসলমান শাসন কর্ত্তৃগণ প্রথমতঃ দিল্লীর মুসলমান নরপতি বৃন্দের আদেশাধীন হইয়া বঙ্গদেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, অতঃপর তাঁহারা দিল্লীর অধীনতা পাশ উন্মোচন করিয়া সুলতান উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়, সম্ভবতঃ ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে ফেরোজাবাদ নামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ফেরোজাবাদ অতি অল্পকাল রাজধানী ছিল। সাত বৎসর পরে তদানীন্তন সুলতান ফেরোজাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌড় নগরে গমন করেন। এই সময় হইতে পাণ্ডুয়া বা ফেরোজাবাদ বঙ্গদেশের দ্বিতীয় রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল। চিরখ্যাত সেরশাহ বঙ্গদেশ অধিকার পূর্ব্বক গৌড় পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় মাইল দূরে গঙ্গা নদীর তীরে তাণ্ডা নাম্নী নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। কোন্ সময় গৌড় নগরী পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। রিয়াজ-উস-সালাতীন নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেরশাহের পরবর্ত্তী সোলেমান কেরাণী গৌড়ের জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর বোধ করিয়া তাণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। সোলেমান কেরাণীর পর বায়েজিদ খাঁ এবং বায়েজিদ খাঁর পর দাউদ খাঁ বঙ্গদেশের অধিপতি হন। দাউদ খাঁ মদ গর্ব্বিত হইয়া উঠেন এবং জয়লিপ্সু হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের সীমায় গোলযোগের সূত্রপাত করেন। পাঁচ হাজারী মনসবদার মৈনাম খাঁ তৎকালে জৌনপুরের শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। আকবর তাঁহাকে দাউদখাঁর বিনাশ সাধন করিতে আদেশ করেন। মৈনাম খাঁ অনেক যুদ্ধের পর দাউদখাঁকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন। অতঃপর দাউদখাঁ সন্ধির প্রস্তাব করেন। মৈনামখাঁ দাউদ খাঁকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অতঃপর তিনি মহা সমারোহে তাণ্ডা নগরীতে প্রবেশ করিয়া শাসনপ্রবৃত্ত হন।

গৌড়ের ভগ্নাবশেষ।

মৈনামখাঁ কিয়দ্দিবস অন্তে গৌড় নগরী পরিদর্শন জন্য গমন করেন। তিনি গৌড় নগরীর শোভা ও সম্পদ দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং তাণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া তথায় পুনর্ব্বার শাসন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় গৌড় নগরীর অট্টালিকা সকল সংস্কৃত হয়। কিন্তু তথাকার জল বায়ু সহ্য না হওয়াতে মৈনামখাঁ অচিরে রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তথায় ভয়ঙ্কর মারীভয় উপস্থিত হয় এবং তাহাতে সমস্ত গৌড় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বদায়ুনি লিখিয়াছেন, দিল্লী হইতে

বহু সহস্র লোক বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একশত লোকও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে নাই। জন প্রবাদ আছে, "অজ গৌড় বা গোড়।" এই যে গৌড় নগরী মহামারীতে জন শূন্য হইয়াছিল, তারপর সেখানে আর জন বসতি স্থাপিত হয় নাই। মোগল শাসন

ফিরোজ মিনার।

কর্ত্তৃগণ গৌড়ে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার তাণ্ডায় গমন করেন।

(১) গৌড়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌধের নাম সোণা মসজিদ। দিল্লীর পাঠান আমলের নির্ম্মিত অনেক মসজিদের সহিত সোণা মসজিদের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সোণা মসজিদের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনও যাহা আছে। তাহা নির্ম্মাতার প্রকৃষ্ট সুরুচি এবং সৌন্দর্য্য বোধের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সোণা মসজিদের অঙ্গ সৌষ্ঠব সাধন জন্য কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর ব্যবহৃত হইয়াছিল। গৌড়ের প্রখ্যাত নামা সুলতান হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নশরৎ শাহ ৯৩২ হিজিরীতে সোণা মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মসজিদের স্থানে স্থানে সোণার কারু কার্য্য ছিল বলিয়া ইহা সোণামসজিদ আখ্যা লাভ করে।

(২) নশরৎ শাহের দ্বিতীয় কীর্ত্তি কদম-রসুল মস্‌জিদ। কদমরসুল মসজিদ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া প্রতিষ্ঠাতা নশরৎ শাহের জয় ঘোষণা করিতেছে। মসজিদের অভ্যন্তরে পবিত্রাত্মা মহম্মদের পদচিহ্ন অঙ্কিত এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপিত থাকায় ইহার নাম কদমরসুল হইয়াছে। এই পাথর খানি পূর্ব্বে পাণ্ডুয়া নগরীতে শাহ জালালউদ্দীন তাব্রিজের গৃহে ছিল। সুলতান হোসেন শাহ তথা হইতে উহা গৌড়ে আনয়ন করেন। প্রাগুক্ত জালাল উদ্দীন অথবা অন্য কোন সাধু পুরুষ পাথর খানি আরব দেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা পাথর খানি মুর্শিদাবাদে লইয়া যান। মিরজাফর উহা পুনর্ব্বার স্বস্থানে স্থাপিত করেন।

(৩) ফতেখাঁর সমাধি ভবন গৌড়ের একটি প্রধান দর্শন যোগ্য স্থান। প্রস্তর নির্ম্মিত তোরণ-দ্বার দিয়া সমাধি ভবনে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণের সম্মুখ এবং পার্শ্বদেশ নীল ও শ্বেত টালির সুবিন্যস্ত মিশ্রণে নির্ম্মিত এবং তাহার দৃশ্য অতি সুন্দর। সমাধি ভবনের চারিকোণে প্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ গোলাপ পুষ্প চতুষ্টয় স্থাপিত আছে। সমাধি ভবনের পার্শ্বস্থিত চূড়া সকলে বৃক্ষলতা পুষ্প প্রভৃতি অদ্ভুত ভঙ্গীতে খোদিত হইয়াছে। তাহার পশ্চাদ্ভাগে প্রাচীর বেষ্টিত ভূমি, এখানে

সুলতান হোসেন শাহ এবং অন্যান্য রাজ বংশীয়দের দেহ সমাহিত হইয়াছিল। উক্ত প্রাচীরও নীল এবং শ্বেত টালির সুবিন্যস্ত মিশ্রণে নির্ম্মিত।

বড় সোণা মসজিদ।

(৪) গৌড় দুর্গের পূর্ব্বদ্বার দিয় বহির্গত হইলে অর্দ্ধ মাইল দূরে উত্তর দিকে একটি সুন্দর মিনার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ইহা ফিরোজসাহের মিনার। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, পীর আদা নামক একজন সাধু পুরুষের বাস জন্য ফিরোজশাহ এই মিনর নির্ম্মাণ করেন। পীর আদা মিনারের সর্ব্বোচ্চ কক্ষে বাসকরিতেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদিগকে নমাজে আহ্বান করিয়া আজাম দিবার জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(৫) ছোট সোণা মসজিদ আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু এই মসজিদই গৌড়ের মণি রূপে বর্ণিত হইতে পারে। গৌড়ের সমস্ত সৌধই অল্পাধিক ভগ্ন হইয়াছে। এক মাত্র ছোট সোণা মসজিদই অক্ষুণ্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহারও প্রাঙ্গন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে স্থান দিয়া রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ছোট সোণা মসজিদ চতুষ্কোণ হইলেও কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি, পঞ্চদশ সংখ্যক গুম্বুজ ইহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সমস্ত মসজিদটি শৃঙ্গের ন্যায় মসৃণ ও উজ্জ্বল প্রস্তর গঠিত। ছোট সোণা মসজিদের বহির্ভাগে সুন্দর ও বিস্তৃত কারুকার্য্য চিত্রিত, অন্তর্ভাগের সমস্ত অংশে নানাবিধ সুন্দর কারুকার্য্য খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম কোণে একখানি সিংহাসন পরিদৃষ্ট হয়। সুলতান হোসেন শাহ কর্ত্তৃক এই সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে একলক্ষী মসজিদ, ছত্রিশ গড় এবং আদিনা মসজিদ জন বিরল পাণ্ডুয়া নগরীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। একলক্ষী মসজিদে সুলতান গিয়াসউদ্দীন, তাঁহার পত্নী ও পুত্র বধূর দেহ সমাহিত হইয়াছিল। হিন্দু মন্দির ভগ্ন করিয়া তাহার

ছোট সোণা মসজিদ।

আদিনা মসজিদ।

ব্যয়িত হইয়াছিল। রিয়াজ-উস-সালাতীনের রচয়িতা গোলাম হোসেন আদিনা মসজিদ দেখিয়া স্বগ্রন্থে তাহার সুগঠন এবং নানাবিধ কারু কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ৭৬৬ হিজিরী অব্দে আদিনা মসজিদের নির্ম্মাণ কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। রিয়াজ-উস-সালাতীনের মতে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই সুলতান কাল-গ্রাসে পতিত হন এবং তজ্জন্য অর্দ্ধ কার্য্য অসমাপ্ত থাকে। কিন্তু এই মত যথার্থ নহে। আদিনা মসজিদের প্রস্তর ফলকে ৭৭০ হিঃ ৬ই রজা (১৩৬৯ খৃঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী) ও সেকন্দরের নামাঙ্কিত মুদ্রায় ৭৯২ হিজিরী অব্দ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মসজিদ নির্ম্মাণ না হইতে হইতে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি অসম্ভব। আদিনা মসজিদের মধ্যে কয়েক স্থানে ভগ্নদেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এজন্য বিভারিজ সাহেব অনুমান করেন যে, সেকন্দর সাহ একটি দেব মন্দিরকেই মসজিদে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই প্রস্তর রাশি দ্বারা একলক্ষী মসজিদ সজ্জিত করা হইয়াছিল। এই মসজিদের প্রস্তরে এরূপ চিহ্ন সকল লক্ষিত হয়, যদ্দ্বারা ঐ সমস্ত যে হিন্দু মন্দির হইতে গৃহীত, হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়।

পাণ্ডুয়ার গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরে ছত্রিশ গড় নামক ভগ্ন প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়। জন প্রবাদ এই যে, ছত্রিশ গড়ে সুলতান সেকন্দর শাহ বাস করিতেন। একটি দীর্ঘিকার পার্শ্বে ছত্রিশ গড় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ছত্রিশ গড় অতি সুরক্ষিত ছিল, অদ্যাপি ইহার চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় দুর্গের নানা চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

ছত্রিশ গড় হইতে এক মাইল পশ্চিমে আদিনা মসজিদ বিদ্যমান রহিয়াছে। আদিনা মসজিদও সেকন্দর

কদম রসুল।

মসজিদের বিস্তৃত বর্ণনা রেভেনশা এবং কানিংহাম সাহেবের গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষা।

(১)

গত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে "বাঙ্গলা ভাষা" শীর্ষক একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম যে বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাংগলা, বাংলা এবং বাঙ্‌লা এই কয়েক বানানের মধ্যে বাঙ্গলা বানানটাই প্রশস্ত, কেন না যদিও প্রত্যেকটারই উচ্চারণ বাঙ্‌লা তথাপি বাঙ্গলা বানানটায় মূল বঙ্গশব্দের সহিত অধিক সাদৃশ্য আছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমার যুক্তি সমালোচনা করিয়া বৈশাখের প্রবাসীতে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে "বাংলা" বানানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে তিনিই "বাংলা" বানানের প্রবর্ত্তক, সুতরাং বাংলাই ঠিক বানান। অপর যুক্তিগুলি তামাসা ও বিদ্রূপ। সুতরাং কোন্ বানানটা ভাল সে বিষয় সাহিত্যসেবীগণই বিচার করিবেন। আমি তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার অধিক আমার বলিবার কিছু নাই। আমি কেবল তাঁহার অন্যান্য মন্তব্য সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব।

রবীন্দ্র বাবুর মতে বাঙ্‌লা শব্দটায় চারিটী মাত্রা আছে। মাত্রা শব্দ ইতঃপূর্ব্বে রবীন্দ্র বাবু syllable অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও সেই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। আর কোন সাহিত্যিকই বোধ হয় পুরামাত্রায় কিছু না হইলে এমন কথা বলিবেন না যে বাঙ্‌লা শব্দটায় চারিটা syllable আছে।

"বাঙ্গলা" বানান করিলে কিরূপ দুর্দ্দশা হইবে তাহার একটা উপমা রবীন্দ্র বাবু দিয়াছেন। তাহা এই "ঝিঙা না ভাজিয়া ভাজিলে ঝিঙ্গা ছন্দ তখনই ফুঁকিবে শিঙ্গা।" এই উৎকৃষ্ট কবিতাটী কি ছন্দের এবং সেই ছন্দের লক্ষণ কি কোন সাহিত্যিক বলিতে পারেন?

রবীন্দ্র বাবু বলেন যে ইংরেজী ভাষায় বানানের সহিত উচ্চারণের সম্পর্ক নাই কিন্তু আমাদের ভাষায় আছে। আমি ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা লিখি লক্ষ্মী অর্থাৎ লকৃষ্‌মী কিন্তু উচ্চারণ করি লক্‌খী, লিখি পদ্ম বলি পদ্দ বা পদ্দঁ। সাহিত্যিকগণ দেখুন আমরা কেমন ঠিক্ লিখনানুযায়ী উচ্চারণ করি।

রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে "প্রাচীন বাঙালী বানান সম্বন্ধে নির্ভীক ছিলেন।" কিন্তু যাঁহারা অ্যা এবং কী লেখেন তাঁহারা কি কম নির্ভীক?

রবীন্দ্র বাবু আরও লিখিয়াছেন যে ফোর্ট উইলিয়মের সাহিত্যিক শাসনের ফলে এখনও বাঙ্গালীর অশ্রুপাত হইতেছে। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি যে মহাত্মারা বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রবর্ত্তক ছিলেন তাঁহাদিগেরই অবিবেচনার ফলে এখন আমাদের বিড়ম্বনা হইতেছে। ইহা কি ঠিক কথা? আমার বিশ্বাস যে তাঁহারা যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই পথ অনুসরণ না করিলে বঙ্গদেশের এক এক প্রদেশে এক এক রূপ সাহিত্যিক ভাষা জন্মগ্রহণ করিত। সেটা কি দেশের পক্ষে ভাল হইত?

(২)

আমি প্রবাসীতে কয়েকটা শব্দের বানানের কথা লিখিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাহা উপলক্ষ্য করিয়া আষাঢ়ের প্রবাসীতে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমি তৎসম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আশা করিয়াছিলাম প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় আমাকে আরও কিঞ্চিৎ স্থান দান করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্যিক ভ্রম প্রদর্শন করিতে দিতে যে সাহিত্যিক পত্রিকার সম্পাদক অসম্মত হইবেন ইহা বিস্ময়কর।

খাওা দাওা।

আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পত্রিকান্তরে লিখিয়াছিলাম যে খাওআ বানানটা ভুল, খাওয়া লেখা উচিত এবং তাহাও পূর্ব্বকালের ন্যায় সংক্ষেপে খাওা লিখিলে ভাল হয়, কেননা আমি রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহে পড়িয়াছিলাম যে পূর্ব্বে খাওা লিখিত হইত। আমি এই বানানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করি নাই এবং নিজেও খাওা দাওা লিখি নাই। কেবল একটা "উপন্যাস" মাত্র করিয়াছিমাম। রায় মহাশয় আমার প্রতিবাদ করিয়া সেই পত্রিকাতেই

লিখিয়াছিলেন "সেন মহাশয়ের হওা, খাওা বানানের পক্ষ হইতে পারি না! কারণ স্বরবর্ণ স্বরবর্ণে যুক্ত হইতে পারে না। আর দোষ এই নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যতীত আর কেহ এমন বানান করে না।" ইহার পর প্রবাসীর প্রবীণ সম্পাদক খাওা দাওা লিখিলে আমার প্রস্তাবের সমর্থন পাইয়া লিখিয়াছিলাম যে সর্ব্বপ্রধান সাহিত্যিক পত্রিকার সম্পাদক যখন খাওা দাওা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন রায় মহাশয় যে বলিয়াছিলেন যে "ওকারের গায়ে আকার দিয়া অশিক্ষিত লোকেরাই লিখিয়া থাকে সুতরাং সেরূপ বানান করা কখনই উচিত নহে" এম ত বোধ হয় রায় মহাশয় প্রত্যাহার করিবেন। রায় মহাশয়ের কথা বলিয়া আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা উদ্ধৃতির চিহ্ন মধ্যে দেওআতে আমার অসাবধানতা হইয়াছে, যেহেতু তিনি ঠিক সেই কথা বলেন নাই। তবে ইহার অর্থের সহিত তাঁহার যথাযথ উক্তির পার্থক্য নাই। তাঁহার কথা syllogism এ পরিণত করিলে এই শেষ কথাই দাঁড়ায়। কিন্তু সে কথা যাউক। খাওা দাওা বানানের বিরুদ্ধে রায় মহাশয় যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অনেক গুলিই সঙ্গত। তাঁহার সেই যুক্তি প্রবাহ দেখিয়া প্রবাসী সম্পাদক একেবারে খাওা দাওা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং আর কিছু বলার প্রয়োজন নাই।

রায় মহাশয়ের অন্যান্য কথা।

রায় মহাশয় বলেন "বাঙ্গালা ভাষা একটা স্বরের পর আর একটা স্বর বসাইতে চায় না।" এই সূত্র (generalisation) টা ঠিক্ নহে। বাঙ্গলায় বহু শব্দ আছে যাহাতে এক স্বরের পর আর এক স্বর বসিয়া থাকে, যথা এই, ওই, উই, খাই, শুই, খাও, যাও, ইত্যাদি।

রায় মহাশয় বলেন যে মা শব্দ মাতৃ বা মাতা হইতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা না হইতেও পারে। নেপালীরা মাকে আম্মা বলে। ইহা বোধ হয় অম্বা শব্দ হইতে হইয়াছে। অথবা অম্মা শব্দই সংস্কৃত হইয়া অম্বা হইয়াছে। বাঙ্গালা মা বোধ হয় অম্বা শব্দেরই অধিক নিকটবর্ত্তী।

রায় মহাশয় বলেন মা শব্দের সম্বন্ধে "মার" বলা অপেক্ষা "মায়ের" বলায় ভক্তি বেশী প্রদর্শিত হয়। ইহা একটা নূতন আবিষ্কার। কলিকাতায় "মার" সমধিক প্রচলিত। "মায়ের" তত প্রচলি ত নহে। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে 'মার" প্রচলিত। পায়ের এবং পার উভয়রূপই প্রচলিত। কিন্তু "পায়ের" বলিলে যে চরণের গৌরব বাড়ে তাহা ত বোধ হয় না।

"বাঙ্গালা" বানানটা যে আমি অশুদ্ধ বলিয়াছি এমন মনে পড়িতেছে না। আমি রায় মহাশয়ের দোষ ধরিয়া ছিলাম "লোপ" শব্দ প্রয়োগের—এখনও ধরিতেছি। তাহা পূর্ব্বেও স্পষ্টরূপে বলিয়াছি, এখনও আবার বলিতেছি। অদর্শন কেই লোপ বলে যথা পাণিনি "অদর্শনং লোপঃ।" সুতরাং যাহা দেখা যায় তাহার লোপ হইয়াছে বলা যায় না। রায় মহাশয় বলেন যে "বাঙ্গালা" শব্দটার দ্বিতীয় আকার লুপ্ত হয়। অথচ তিনি লেখেন "বাঙ্গালা"। কিন্তু বাঙ্গালা লিখিলেইত তাহার মধ্যে আকার দেখা গেল; তাহা হইলে তাহার লোপ হইল কই? তিনি যদি বলিতেন যে সেই আকারটা অনুচ্চারিত থাকে তাহা হইলে তাঁহার সহিত কোন বিরোধই হইত না। Beauty শব্দের a অনুচ্চারিত বা silent থাকে কিন্তু তাহার লোপ হয় ইহা বলা যাইতে পারে না। গামোছা শব্দের "ও" লুপ্ত হয় বলিয়া গামছা লিখিত হয়। কেহই গামোছা লেখে না।

আমার মত বা (রায় মহাশয়ের ভাষায়) সূত্র এই যে "দেশের সকলে যদি কোন শব্দকে একই রূপে উচ্চারণ করে এবং সেই শব্দ যদি সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে তাহার বানান উচ্চারণানুযায়ী হওআ উচিত।" সেই জন্যই যখন সমস্ত বাঙ্গালীই বঙ্গকে বাঙ্‌লা বলেন তখন এক হিসাবে আমাদের বাঙলা লেখাই উচিত। কিন্তু যখন আমরা বহু শব্দে ঙ্গ কে ঙ রূপে উচ্চারণ করি বিশেষতঃ ঙ্গ্ যখন আমাদের মুখে সর্ব্বদাই ঙ্ রূপে উচ্চারিত হয় এবং যখন মূল বঙ্গ শব্দে ঙ্গ আছে তখন অন্য হিসাবে "বাঙ্গলা" অধিক বিশুদ্ধ। ঙ্গ তে হসন্তের চিহ্ন দিই নাই তাহার কারণ এই যে বাঙ্গলার উচ্চারণ যে বাঙ্‌লা তাহা স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছিলাম। বিশেষতঃ কতগুলি শব্দের মধ্যাক্ষরে আমরা হসন্তের চিহ্ন দিই না; যথা ভিমরুল, বোলতা, আমড়া, পাতলা, পয়সা ইত্যাদি।

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন "ঙ টা অনুনাসিক বর্ণ। অন্য ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হওয়াই ইহার ধর্ম; অন্য ব্যঞ্জনের তুল্য ইহা পৃথক্ আসন পায় না।" এই সূত্র রচনা করিবার সময়ে রায় মহাশয় নিশ্চয়ই ব্যাকরণের তিঙন্ত, যঙন্ত, ঙান্ত, উদঙ্ প্রভৃতি শব্দের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

বাঙ্গলায় অনুস্বারের উচ্চারণ ঠিক ঙ র মত। রায় মহাশয় ইহা মানেন না কিন্তু দেশের অন্য কেহই বোধ হয় ইহা অস্বীকার করিবেন না। ং এবং ঙ র উচ্চারণ আমরা অভিন্ন রূপে করি কিন্তু সংস্কৃতে অনুস্বারের উচ্চারণ অন্যরূপ। অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণের প্রায় অনুরূপ। একটা প্রভেদ এই যে চন্দ্রবিন্দু লঘুস্বরে যুক্ত হইলে স্বরটা লঘুই থাকে, কিন্তু অনুস্বার যুক্ত হইলে লঘু স্বর গুরু হইয়া যায়। সুতরাং "বাংলা" বানান অশুদ্ধ। তাহা ছাড়া আর একটা কথা এই যে যাঁহারা 'বাংলা" লেখেন তাঁহারা 'বাঙালী" লেখন। হয় বাঙ্‌লা, বাঙালী লেখা উচিত না হয় বাংলা, বাংআলী লেখা উচিত। ইদানীং যে কলিকাতায় বাঙ্গালীকে বাঙালী, বাঙ্গলাকে বাঙলা, রঙ্গীনকে রঙীন, হাঙ্গরকে হাঙর বলে ও লেখে তাহা রায় মহাশয় অবশ্যই অবগত আছেন। কেবল কলিকাতা কেন, সমস্ত উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ব্ববঙ্গেও সেই উচ্চারণ। রায় মহাশয় এগুলিকে বাঙ্গলা ভাষা সম্বাদী উচ্চারণ বলেন না। কিন্তু তিনি না বলিলে কি হয়? বাঙ্গলা ভাষা এখন এক জনের অঙ্গুলী সঙ্কেতে চলে না। এখন তাহা সাধারণ তন্ত্র।

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে অনুস্বারে একটু গ্ আছে। কিন্তু অনুস্বারে মোটেই গ্ নাই—সংস্কৃত অনুস্বারেও নাই, বাঙ্গলা অনুস্বারেও নাই। বাঙ্গলা অনুস্বারে গ্ আছে বলিয়া ভ্রম হইবার কারণ এই যে তাহা ঙর মত উচ্চারিত হয়। কিন্তু ঙ তেও গ নাই। ইংরেজীতে ঙ দ্যোতক কোন বর্ণ নাই—উহা ng দিয়া লিখিত হইয়া থাকে। পারসীতেও ঙ না থাকায় ঙ্গ স্থলে নুন এবং গাফ্ লিখিত হয়। পারসীতে সর্ব্বদাই গাফ উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইংরেজীতে ng যুক্ত অনেক শব্দ আছে যাহাতে g অর্থাৎ গ উচ্চারিত হয় না যথা—ring, bring, hanger, singer, wronger প্রভৃতি। কোন কোন শব্দে g উচ্চারিত হয় যথা—finger, hunger, linger প্রভৃতি। অনুস্বার বর্জনের প্রস্তাব আমি কখনই করি নাই। অনুস্বার বর্জন কখনই হইতে পারে না। যদি অনুস্বারের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে গ থাকিত তাহা হইলে কিং+তু, কিন্তু হইত না। অথবা সং+জীবনী, সঞ্জীবনী হইত না। অনুস্বারে যদি গ থাকে তাহা হইলে king, bring, sing, Shillong, Darjeeling প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গলায় লিখিতে হইলে কিং, ব্রিং, সিং শিলং, দারজিলিং লেখা অনুচিত, যেহেতু সেই শব্দগুলিতে মোটেই গ নাই। ইংরেজী শব্দ কয়েকটায় যে গ নাই তাহা ইংরেজী অভিধান হইতে প্রমাণিত হইবে। দারজিলিং, শিলংএ যে গ নাই তাহা আর পাঁচ দশ জনকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে। King শব্দে যে গ নাই তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। King Emperor এই দুইটী শব্দ দ্রুত উচ্চারণ করিলে কিঙেম্পরর হয় কিন্তু কিঙ্গেম্পরর হয় না। Shillong, Darjeeling এ গ নাই বলিয়া এখন অনেকে শিলঙ্, দারজিলিঙ্ লিখিয়া থাকেন। অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণটা ঙ, ঞ, ণ, ন, ম অনুনাসিকগুলির প্রত্যেকটার নিকটবর্ত্তী অথচ কোনটারই সহিত অভিন্ন নহে। এই জন্যই অনুস্বারের পর কোন স্পর্শবর্ণ থাকিলে অনুস্বার সেই বর্ণের বর্গের পঞ্চম বর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

রায় মহাশয় কয়েকটা নূতন বাঙ্গলা কথনের দোষ ধরিয়াছেন। "অমুক স্থানে পুস্তক প্রাপ্তব্য," "কবিতার ভিতর দিয়া কবির চিন্তা দেখা," "বাঙ্গলা ভাষা প্রাকৃতের মধ্য দিয়া সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে" "মস্তিষ্কের অপব্যবহার" এই কথন (expression) গুলি তাঁহার মতে বাঙ্গলা নহে। এই গুলির ঠিক বাঙ্গলা কি হইবে রায় মহাশয় বলিয়া দিলে বঙ্গ সাহিত্যের উপকার হইত, কেন না কথনগুলি বড়ই প্রচলিত হইয়া যাইতেছে। আমার নিজের আপত্তি কেবল সাধু ভাষায় "মধ্য" শব্দ পরিবর্ত্তে "ভিতর" (হিন্দী ভীতর) শব্দের ব্যবহারে। "ব্যবহার" শব্দের অর্থ কাজে লাগান, বা প্রয়োগ। সুতরাং হাত পার ব্যবহার, মস্তিষ্কের অপব্যবহার প্রভৃত

কখনত দোষযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। Through শব্দের অনুবাদ "মধ্য দিয়া" ব্যতীত অন্যাক্ষরে আর কি হইতে পারে তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।

ভাষার উন্নতি তবেই হয় যদি তাহাতে নূতন শব্দ জন্মে এবং যদি তাহাতে পুরাতন শব্দের অর্থব্যাপ্তি এবং কখন কখন অর্থ পরিবর্ত্তন হয়। "এবং", "সুতরাং", "উপন্যাস" প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃতে এক অর্থ বাঙ্গলায় অন্য অর্থ। সংস্কৃত সম্মেলন শব্দটা বাঙ্গলায় সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। বহু সাহিত্যিক ব্যক্তিও অশুদ্ধ সম্মিলন শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন। যশোহরের সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বীয় বক্তৃতায় শুদ্ধ করিয়া সম্মেলন লিখিয়াছিলেন বলিয়া এক পত্রিকাতে তাঁহার প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ করা হইয়াছে। ভাষার এইরূপ অর্থ বিস্তৃতি সাধারণতঃ অপণ্ডিতদিগের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা যেখানে কোন্ শব্দটা প্রয়োগ করিতে হইবে ভাবিয়া কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে এডিসনের (Addison) মত দুই চারি দিন বিলম্ব করেন, অপণ্ডিতেরা সেখানে শুদ্ধাশুদ্ধের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যে কোন শব্দ দ্বারা কাজ চালান। কালে সেই অশুদ্ধ শব্দই চলিয়া যায়।

রায় মহাশয় বলেন যে ভাষার প্রত্যেক ধ্বনির দ্যোতক পৃথক্ একটা অক্ষর থাকা উচিত। তিনি নিশ্চয়ই ভাবিয়া দেখেন নাই যে তাহা হইলে প্রতি ভাষায় কতগুলি অক্ষর থাকার প্রয়োজন। হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় যত অক্ষর আছে তাহাদ্বারা সেই দুই ভাষার সমস্ত ধ্বনি ব্যক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলায় যত অক্ষর আছে তাহাদ্বারা আমাদের সকল ধ্বনি প্রকাশ করিতে পারা যায় না। ইহার উপর আবার অন্য ভাষার শব্দ প্রবেশ করায় সেই শব্দগুলির উচ্চারণ দ্যোতক আরও অধিক অক্ষরের প্রয়োজন হয়। তাহা হইলে বহুশত অক্ষর সৃষ্টি করিতে হয়। কিন্তু আমি অক্ষরের সংখ্যা বাড়ান উচিত বলিয়া মনে করি না। একজন লোক রাখিলে যদি চাকর, বামুন, দরোয়ান, মালী সকলের কাজ চলিয়া যায় তাহা হইলে অধিক লোকের প্রয়োজন কি? ইংরেজীতে এক A অক্ষর fate, fat, fare, fall, fast, far, many, what এই আটটা শব্দে আটটা পৃথক্ ধ্বনি ব্যক্ত করে। অথচ ইংরেজীতে মোটে ছাব্বিশটা অক্ষর। বৈদিক সংস্কৃতে যত অক্ষর ছিল তাহার কয়েকটা বাদ দিয়া লৌকিক সংস্কৃতের বর্ণমালা প্রস্তুত হইয়াছে। লাটিনে ইংরেজী V উচ্চারণদ্যোতক কোন বর্ণ নাই কেন না ইংরেজী V মহাপ্রাণ, লাটিনের Vর উচ্চারণ Wর অথবা সংস্কৃত P র মত। গ্রীকে দিগম্মা নামক যে অক্ষর ছিল, বর্ত্তমান গ্রীক বর্ণমালায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। চীনে আট সহস্র অক্ষরের পরিবর্ত্তে এখন আটচল্লিশটা মাত্র অক্ষর দিয়া কাজ চলিতেছে। সুতরাং এই অল্পীকরণের যুগে আমাদের যে পঞ্চাশটা অক্ষর আছে তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অভিধানে উচ্চারণ দেখাইবার জন্য এই অক্ষরগুলিতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন (diacritical mark) যুক্ত করিয়া দিলেই কাজ চলিবে। যদি সাধারণ সাহিত্যের জন্য ইংরেজী V এবং বাঁকা একারের নিতান্তই প্রয়োজন হয় তাহা হইলে V স্থানে aesthetic আপত্তি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বজন পরিচিত দেবনাগরের P লওয়াই উচিত। রায় মহাশয় ভিন্ন আর কাহারও ইহাতে আপত্তি হইবে না। আর বাঁকা এটা বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বকার জড়া হাতের আ (অর্থাৎ আ) দ্বারা ব্যক্ত করিলে মন্দ হয় না। ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত বাঁকা এ স্থলে য ফলা আকার (্যা)ভিন্ন গত্যন্তর নাই। "অ্যা" একটা কিম্ভূত কিমাকার monster বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জন যুক্ত হইতে পারে, ব্যঞ্জনে স্বর যুক্ত হইতে পারে, স্বরে স্বর যুক্ত হইতে পারে কিন্তু স্বরের সহিত ব্যঞ্জন যুক্ত হওআর কি কোন অর্থ হইতে পারে?

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

আত্ম-হারা।

কি প্রীতি রাগিণী ধ্বনিছ নিয়ত
কে তুমি প্রভাতে সাঁঝে?
চঞ্চল করি চিত্ত আমার
প্রবেশি মরম মাঝে।

আলোড়িত করি হৃদয় সিন্ধু,
কে তুমি ঢালিছ অমিয় বিন্দু,
ক্ষুধিত মরম উঠিছে ভরিয়া
নিমেষ চকিত-লাজে।
যবে গৃহ কোণে বসি বাতায়নে,
চেয়ে হেরি দূর গগনের কোণে,
তোমারি প্রীতি রাগিণী হৃদয়ে
থেকে থেকে শুধু বাজে।
নীরবে বিজনে বসি ফুলবনে,
গাঁথি যবে মালা একা আনমনে,
ছড়াইয়ে দিয়ে যাও ফুলরাশি
সেই আকুলিত সাঁঝে,
চকিতে চমকি কুসুম তুলিতে,
ভুলে যাই মোর মালাটী গাঁথিতে,
তোমারি পরশ ভেবে ফুলভার
তুলে লই হৃদি মাঝে।
চুম্বিতে গিয়ে দেখি ফুলবাস
চুরি গেছে, শুধু আছে ম্লান হাস,
তার সনে প্রাণ চুরি গেছে, এই
দেহ শুধু পড়ে আছে।

শ্রীবিভাবতী সেন।

সেকালের বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ।

জাতির ভিতর চিন্তাশীল সুলেখক প্রস্তুত হইলেই জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি হয়—তখন সেই সাহিত্যে বিবিধ মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক প্রভৃতি সংবাদ, সাহিত্য ও সমালোচন পত্রাদি জন্মগ্রহণ করিতে পারে। জাতির ভিতর সুসাহিত্যিক বা সুলেখক সৃষ্টি না হইলে সৎগ্রন্থের আবির্ভাব বা সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব কখনই সম্ভবপর নহে।

ইংলণ্ডে যখন প্রথম সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হয়, তখন ইংরেজী সাহিত্যে গৌরবময় এলিজাবেথিয়ান-যুগ। অতঃপর সমুন্নত আগষ্টিয়ান যুগে ইংরেজ জাতির প্রথম সাময়িক সাহিত্যগুলি বাহির হইয়াছিল। ফরাসী সাহিত্যেরও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দশ লুইর কাব্য-সাহিত্য-সমুজ্জ্বল যুগে ফরাসীজাতির প্রাথমিক সংবাদ পত্র এবং সাহিত্য পত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সাময়িক পত্রের জন্য লেখা চাই, এবং লেখার জন্য লেখক প্রয়োজন। সুতরাং জাতীয় সাহিত্যের উন্নত-সময় ব্যতীত সাময়িক পত্র-পত্রিকা পরিচালিত হইতে পারে না।

বাঙ্গলায় বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রচারে কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল।

বাঙ্গলায় যখন প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে পারেন এমন লোক বাঙ্গালায় কেহ ছিলেননা—সাহিত্য নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত এমন মুদ্রিত পুস্তকও ছিল না, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অমূল্য কবিতা নিচয়, কৃত্তিবাস কাশীদাসের রামায়ণ মহাভারতের অমৃত লহরী এবং বৈষ্ণব যুগের রস সাহিত্য পুরুষাণুক্রমে কাষ্ঠফলকের নিষ্পেষণে থাকিয়া থাকিয়া বাঙ্গালীর গৃহকোণে ধ্বংস ও জীর্ণ হইতেছিল; কচিৎ কোন কোন স্থানে কায়া পরিবর্ত্তনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল মাত্র। অপেক্ষাকৃত আধুনিক রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র রস বিভোর-প্রাণগুলিকে বিমুগ্ধ করিতে ভাবুকজনগণের রসনাগ্রে সময় সময় গীত হইত মাত্র।

বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যের এ দুর্গতির কারণ বঙ্গদেশে বাঙ্গালা লেখাপড়ার তখন একেবারেই চর্চ্চা ছিল না। ইংরেজ দেশ অধিকারের সনন্দ লইয়া চলিত পারস্য ভাষাকেই দ্বিতীয় রাজভাষার সম্মান প্রদান করিলে দেশময় পুনরায় সেই প্রচলিত পারস্য ভাষারই পঠনপাঠন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পারস্য ভাষা না শিক্ষা করিলে বাঙ্গালীর ছেলে কোম্পানীর কাছারীতে, ব্যবসায়ীর আড়তে কিম্বা দেশীয় জমিদারের সেরেস্তায় কার্য্য করিতে পাইত না। সুতরাং বাঙ্গালী অভিভাবকগণ তাহাদের স্ব স্ব ছেলেদিগকে পূর্ব্বমত পারস্য ভাষাই শিক্ষা দিতে লাগিলেন, বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন

বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীর নিকট চির অপরিচিত এবং চির অনাদৃতই রহিয়া গেল।

ইয়ুরোপীয় বণিকেরা এদেশে আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা তাঁহাদের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। তদনুসারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার জন্য দুই এক খানা প্রয়োজনীয় পুস্তক তাঁহারা নিজেরাই লিখিয়াছিলেন এবং নানা উপায়ে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ক্রমে ইংরেজ মিশনারিগণও অজ্ঞ বাঙ্গালীর সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা এবং বাঙ্গালীকে বাইবেলের সুসমাচার পাঠ করাইবার জন্য তাহাদিগকেও বঙ্গভাষা শিক্ষা দান করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। এদেশে তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালা পুস্তকও মুদ্রিত হইত না। উক্ত মিসনারি মহাত্মাগণই প্রথম বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া ও লিখাইয়া বিলাতে বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া তাহাদ্বারা তথা হইতে সেই সকল পুস্তক মুদ্রিত করাইয়া আনিয়া এদেশীয় দিগকে তাহাদের মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন এবং নিজেরাও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। এবং অবশেষে ১৭৯৩ অব্দে এদেশে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া বাঙ্গালা কাঠের অক্ষরে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ব্রতী হন।

অতঃপর ইংলণ্ড হইতে আগত ইংরেজ সিভিলিয়ান দিগকে দেশী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে ১৮০০ অব্দে কলিকাতার ফোর্টউইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের জন্য বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িলে, এই সহৃদয় মিসনারিগণই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ লিখিয়া ও লিখাইয়া সেই অভাব দুরীভূত করিয়াছিলেন। এইরূপে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা মিসনারিদিগের চেষ্টাতেই—বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও—সজীব থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে জন্য আমরা মিসনারিদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

এই সময় এবং তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই ছিল—ইয়ুরোপীয়দিগের ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ, ফোর্টউইলিয়াম কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী বিবিধ শ্রেণীর গ্রন্থ ও মিসনারিদিগের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যালয় সমূহে পাঠের বর্ণমালার পুঁথি, ধারাপাত ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক। উচ্চশ্রেণীর সুসাহিত্য তখন কিছুই ছিল না।

মিসনারিদিগের যত্ন চেষ্টায় যখন বাঙ্গালা ভাষার পুঁথি এইরূপে লিখিত ও প্রচারিত হইতে ছিল—সেই সময়, ১৮১৬ অব্দে বঙ্গদেশে প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্র পরিচালিত হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং বাঙ্গালার প্রথম সাময়িক পত্র পরিচালন সময় বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এই প্রথম বাঙ্গালা পত্রিকা খানা একজন বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮১৮ অব্দে মিসনারিগণ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর হইতে আর একখানা বাঙ্গালা সাময়িক পত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন, সে পত্রের নাম ছিল "দিগদর্শন।"

এই সময়, বাঙ্গালা সাহিত্যের এই প্রাথমিক মিসনারি যুগে বাঙ্গালা ভাষায় কি কি পুস্তক ও পত্রিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কুতুহলী পাঠকগণের বোধ হয় তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে; আমরা তাঁহাদিগের কৌতূহল নিবারণের জন্য ও আমাদের সেকালের জাতীয় সাহিত্যের অবস্থা প্রদর্শন জন্য ঐ সকল পুস্তক পত্রিকার পরিচয় নিম্নে প্রদান করিতে চেষ্টা করিলাম।

উদ্ভিদ মাত্রেই যেমন বৃক্ষ নহে; সেইরূপ পুস্তক মাত্রেই 'সাহিত্য' নহে। কিন্তু যে স্থলে মোটেই সাহিত্য নাই, সেখানে অঙ্ক পুস্তক বা অভিধানই সাহিত্যের আসন অধিকার করিবে; তাহাকে স্থানচ্যুত করিবে কে? কেন না, "পাদপ হীন দেশে এরণ্ডই দ্রুম"।

(১) বাঙ্গালা ভাষার প্রথম পুস্তক একখানা 'ব্যাকরণ ও অভিধান'। ১৭৪৩ খ্রী অব্দে এই গ্রন্থখানা মুদ্রিত হয়। তখন বাঙ্গালা অক্ষর মুদ্রাযন্ত্রে আবিষ্কৃত হয় নাই। পর্ত্তুগীজ বণিকেরা চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া তথাকার

লোকের মুখে যেরূপ প্রাদেশীক বাঙ্গালা শুনিয়াছিল. ঐরূপ প্রাদেশীক বাঙ্গালায় রোমান অক্ষরে এই পুস্তকখানা মুদ্রিত করিয়াছিল। পুস্তকের প্রচ্ছদ পত্রে পুস্তকের নাম ও পরিচয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে— 'Vocabulario em Idioma Bengalla ePortuguez dividido em duas Partes dedicado as Excellent e Rever. Senhor D. F. Miguel de Favora Arcebs po de Evora do Concelho de Sua Magestade Foy Delegencia do Padre Fr. Manoel da Assumpcam Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental—Lisbon"

রোমান অক্ষরে মুদ্রিত এই বাঙ্গালা গ্রন্থের ১ পৃষ্ঠা হইতে ৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং ৪৭ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা—পর্ত্তুগীজ অভিধান, অবশিষ্ট ৩০৭ পৃষ্ঠা হইতে ৫৫৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা অভিধান। পর্ত্তুগীজেরা বাঙ্গালা শিখিবার জন্যই এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিল, এই গ্রন্থের বাঙ্গালার নমুনা এইরূপ ঃ—

বাঙ্গালা শব্দ।	যেরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।
মুই যাইবাসছি	Moui Zeibasschee
মুহর খোওয়া দওয়া	Mouhore khoah dohah

অর্থাৎ আমি যাইতেছি আমার খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি।

২ ও ৩—দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থ বেণ্টো সাহেবের "প্রার্থণা মালা ও প্রশ্নমালা।" ইহাই তখন কার সাহিত্য পুস্তক। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ট বেণ্টো এই গ্রন্থ দ্বয় লণ্ডন নগরে মুদ্রিত করেন। বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে এই দুখানিই আদি পুস্তক। তখনো বাঙ্গলায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং লণ্ডন নগরের বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রে এই পুস্তক ছাপা হইয়াছিল। গ্রন্থকার বেণ্টো পূর্ব্বে রোমান কাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রটেষ্টাণ্ট দলভুক্ত হইয়া এই গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। ইহার পূর্ব্বে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লিপজিকে জন ফ্রেডারিক্ ফ্রিজ (Johann Friedrich Fritz) ১০০টী ভাষার বর্ণমালা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকের নাম "Orientalisch and Occidentalischer Sprachmeister" (অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাধিকার) এই পুস্তকের ৮৪ পৃষ্ঠায় যে বঙ্গীয় বর্ণমালা প্রদত্ত হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন তাহা জর্জ্জ জেকবকার প্রণীত Aurenckszeb (ঔরঙ্গজেব) গ্রন্থ হইতে গৃহীত। বর্ণমালার উপরে লিখিত আছে—"Alphabetum Bengalicum et Jentivicum".

৪র্থ গ্রন্থ—হলহেড সাহেবের ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণের নাম "A Grammar of the Bengali Language." ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে Sir Charles Wilkins হুগলী হইতে বাঙ্গালা অক্ষরে এই ব্যাকরণ খানা প্রকাশ করেন। গ্রন্থকারের নাম Nathaniel Brassey Halhed. উইলকিন্সের উপদেশে পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক হুগলীর একব্যক্তি এই পুস্তকের জন্য কাঠের বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিল। বাঙ্গলা দেশে বঙ্গাক্ষরে ইহাই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। এই পুস্তকের আবরণী পত্রের শীর্ষ দেশে লিখিত আছে—

"বোধ প্রকাশং শব্দ শাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী।"

প্রচ্ছদ পত্রের মধ্যস্থলে আছে

"ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নযযুঃ শব্দ বারিধেঃ।
প্রক্রিয়া তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নর কথং॥"

গ্রন্থের প্রারম্ভে ইংরেজী ভাষায় একটী দীর্ঘ ভূমিকা আছে। গ্রন্থাভ্যন্তরে গ্রন্থকার উদাহরণ প্রদর্শন স্থলে সর্ব্বত্রই রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি হইতে কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৫ম গ্রন্থ—আইন H. P. Forster সাহেবের কৃত ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্ট রেগুলেশনের বঙ্গানুবাদ। এখানিও কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থের আকার ৪০০ পৃষ্ঠা মূল্য ২৫৲ টাকা. মুদ্রণের সময় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

(৬) রামতারক রায় সঙ্কলিত—"সদর দেওয়ানী আইন বিধি"। গ্রন্থকারের নিবাস চুঁচুড়া। গ্রন্থকার ১৭৯৬ অব্দে ইংরেজী আইন গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া সে কালের বাঙ্গালায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের আকার ৭৬ পৃষ্ঠা।

৭—"নিজামৎ আইন বিধি"—গবর্ণমেন্টের পৃষ্ঠ পোষকতায় রাধারমন বসু Sadar Dewany Nezamaut Cercular Orders গ্রন্থ অবলম্বনে ১৭৯৬ অব্দে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। গ্রন্থের আকার ২২১ পৃষ্ঠা।

৮—"Vocabulary in Two parts, English and Bengalee and Vice versa" by H. P. Forster. Senior Merchant of the Bengal Establishment. অর্থাৎ ফরষ্টার সঙ্কলিত ইংরেজী বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা ইংরেজী ২ ভাগে বিভক্ত অভিধান। এখানি Ferris and coর মুদ্রাযন্ত্র হইতে ১৭৯৯ অব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম অভিধান গ্রন্থ।

৯—ফরষ্টারের অভিধান — ১৭৯৯ অব্দে মুদ্রিত হয়। এই অভিধান ও দুই খণ্ডে বিভক্ত ; ইহাতে প্রায় ১৮০০০ শব্দ প্রদত্ত হয়, ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ৬০৲টাকা।

১০—"বত্রিশ সিংহাসন"—সাহিত্যের অন্তর্গত উপাখ্যান গ্রন্থ। শ্রীরামপুরের মিসন প্রেসে ১৮০১ অব্দে এই গ্রন্থ প্রথমবার মুদ্রিত হয়। রচয়িতার নাম নাই। ১৮০২ অব্দেই এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হয়।

১১—হিতোপদেশ—গোলকনাথ বসু প্রণীত, সাহিত্য পুস্তক। ১৮০১ অব্দে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। আকার ডিমাই ৮ পেজি ১৪৭ পৃষ্ঠা। এই পুস্তক প্রায় ২০০০০ হাজার বিক্রয় হইয়াছিল। নিম্নে এই পুস্তক হইতে ইহার ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইল।

"মগদ দেশে ফুল্লোৎপল্ল নামে সরোবর থাকে। তাহাতে অনেক কাল শঙ্কট বিকট নামে দুই হংস বসতি করে আর তাহাদিগের সখা কম্বগ্রীব নামে কচ্ছপ বাস। অনন্তর এক দিবস ধীবরেরা আসিয়া সে স্থানে কহিল যে এস্থানে আজি বাস করিয়া কল্য প্রাঃকালে মৎস্য কচ্ছপাদি নষ্ট করিব। তাহা শুনিয়া কচ্ছপ দুই হংসকে কহিল হে মিত্রেরা ধীবরদিগের কথোপকথন শুনিলা। এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? হংসেরা কহিল পুনর্ব্বার তাহা জন্ম প্রাতঃকালে যাহা উপযুক্ত হয় করা যাইবে। কচ্ছপ বলিতেছে সে কথা কিছু নয়, যে হেতুক এই স্থানে আমি ব্যতিক্রম দেখিয়াছি।"

১২—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত—রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন পণ্ডিত ছিলেন। কেরি সাহেবের উপদেশে তিনি এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। রাজীবলোচনের এই গ্রন্থ সে কালের বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য নিধি। ইহার ভাষা সে কালে এমনই আদর লাভ করিয়াছিল যে গ্রন্থকার তাহার জন্ম বঙ্গ সাহিত্যের 'এডিসন' বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই পুস্তক ১৮০১ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে ১৮১১ অব্দে গবর্ণমেণ্ট বিলাত হইতে পুনর্মুদ্রিত করিয়া আনেন। এই গ্রন্থের ভাষার নিদর্শন প্রদত্ত হইল।

'পরে নবাব স্রাজেরদৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন কোন মতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরি হইল অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির করিয়া নৌকাপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইংরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালি খান মুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইঙ্গরাজী পাতাকা উঠাইয়া দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ মহাশয়ের দিগের জয় হইল। তখন সমস্ত লোক জয়ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল।"

১৩—তোতা-ইতিহাস লং সাহেব এই পুস্তককে হায়দর বক্স নামক কোন মুসলমান লেখক কর্ত্তৃক পারস্য ভাষা হইতে অনুদিত গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন গ্রন্থকার ঢাকা নিবাসী এবং গ্রন্থখানা ১৮০১ অব্দে কলিকাতার কোন মুসলমানের প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল। "বিশ্বকোষে" লিখিত হইয়াছে "তোতা-ইতিহাসের রচয়িতা চণ্ডীচরণ মুন্সী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সি ছিলেন। সংস্কৃত পারসী ও বাঙ্গালা এই তিন ভাষাতেই চণ্ডীচরণের অধিকার ছিল।" আমরা যে "তোতা ইতিহাস" পাঠ করিয়াছি তাহাতে প্রচ্ছদ পত্র ছিল না। পুস্তক খানা পারস্য ভাষার অনুবাদ হইলেও অনুবাদে সংস্কৃত শব্দেরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। ভাষার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"যখন সূর্য্য অস্ত গেলেন এবং চন্দ্র উদয় হইলেন

তখন খোজেস্তা মনোদুঃখেতে কাতরা হইয়া তোতার সন্নিধানে বিদায় চাহিতে গেলেন। তোতা খোজাস্তাকে স্তব্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক কই তুমি এখন স্তব্ধ কেন আছ? খোজেস্তা উত্তর করিলেন যে নিত্য রাত্রিতে আপন মনোদুঃখ তোমাকে জানাই কিন্তু এক দিবসও বন্ধুর নিকট যাইতে পারিলাম না এমন দিন কবে হইবে যে আমি যাইয়া প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি তুমি এই রাত্রিতে বিদায় দাও তবে যাই নতুবা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিজ গৃহে যাইয়া বসিয়া থাকি।"

১৪—"সাগর দ্বীপের শেষ নৃপতি মহারাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র"—রামরাম বসু এই গ্রন্থের প্রণেতা। ইহার নিবাস ছিল চুঁচুড়ায়। অল্প বয়সেই পারস্য ও আরবি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন। পরে ইংরেজী শিখিয়া কেরি সাহেবের মুন্সি হন। অবশেষে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইঁহাদ্বারা মিসনারিগণ অনেক খৃষ্ট ধর্ম্মের পুস্তক লিখাইয়াছিলেন। ইঁহার লেখায় পারস্য ভাষার প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের জন্যই তিনি প্রতাপাদিত্য চরিত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮০১ অব্দে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। মুশলমান রাজত্বকালে হিন্দু রাজাদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা অবগত হইবার জন্য জর্ম্মানেরা এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভাষার নমুনা এইরূপঃ—

"শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ। আমরি সহিত হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর একস্থান তাহার নাম নহবৎখানা তাহাতে অনেক অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্রে দিবারাত্রি সময়ানুক্রমে যন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে। নহবৎ খানার উপরে ঘড়ীঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়ীতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদ্গার মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।"

১৮৫৩ অব্দে পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার এই গ্রন্থের ভাষা সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৫—"Bengalee Grammar" by W. Carey. অর্থাৎ কেরি সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ। হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণের পর ইহাই বাঙ্গালা ব্যাকরণের দ্বিতীয় গ্রন্থ। ১৮০১ অব্দে ইহার ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরে ইহার আরও তিনটী সংস্করণ হইয়াছিল।

১৬—"জ্ঞানোদয়" রামরাম বসু সঙ্কলিত খৃষ্টিয় ধর্ম্ম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে হিন্দুর আচার ও ধর্ম্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টানের আচার ও ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে ১৮০১ সনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৭—Missioneries Address to the Hindoos অর্থাৎ হিন্দুদিগের প্রতি পাদরীদিগের সম্ভোধন। রাম রাম বসু কৃত খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ। ১৮০১ সনে মুদ্রিত।

১৮—Colloquies বা কথোপকথন। জন সাধারণের কথিত বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে ইংরেজেরা সহজে বুঝিতে পারেন তজ্জন্য ডবলিউ কেরি এই পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে তৎকালের কথিত বাঙ্গালা ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ আছে। গ্রন্থের বিষয় সূচী এইরূপ—সাহেব ও খানসামা, সাহেব ও মুন্সী, পরামর্শ, ভোজনের কথা, ভ্রমণ, পরিচয়, ভূমি, মহাজন ও আসামী, বাগান করিবার হুকুম, সুপারিসি, মজুরের কথাবার্ত্তা, খাতক মহাজনী, ঘটকালি হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন, তিয়রিয়া কথা, ইজারার পরামর্শ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের কথা, কার্য্য চেষ্টার কথা, কন্দল, যাজক ও যজমান, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে কথা, জমিদার ও রায়তে বৈঠাক কথোপকথন ইত্যাদি। এগুলি যথাযথ উচ্চারণের সহিত লিখিত হইয়াছে। ভাষার নমুনা স্বরূপ স্ত্রীলোকের কন্দলের একাংশ উদ্ধৃত হইলঃ—

"হালো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস, তোরা শুনছিস্ গো এ আঁটকুড়ী রাঁড়ির কথা। *" তিন কুল খাগি। * * তোর ভালডার মাতা খাই। হালো ভালো ডা খাগি, তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।"

উত্তর—"থাকলো ছাড়ুকপালি গিদেরী থাক্। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেল্যান কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর ইটা ভিটা কিছু

থাক্‌বে। ** তখন তোমার কোন্ বাপে রাখে তা দেখব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক, তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজ রাত্রেই মরে। হা বউ রাঁড়ি তোর সর্ব্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।"

প্রত্যুত্তর—"ওলো তোর শাপে আমার বাঁপার ধূলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারো দুয়ারী ভাগানী হাট বাজার কুড়ানী, খানকী, যা তোর গালাগালিতে আমার কি হবে লো কুঁদলী।"

সে কালের মিসনারি সাহেবেরা বাঙ্গালী জাতির পারিবারিক জীবনের চিত্র সংগ্রহ করিতেও যে কিরূপ চেষ্টা করিয়াছেন এ পুস্তকে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থের আকার ডিমাই ৮ পেজি ২২৪ পৃষ্ঠা। ১৮০১ সনের ৪ঠা আগষ্ট শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে কাঠের অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

ঊষায়।

ছড়িয়ে জগতে জাগরণ গাথা
   সুপ্ত নিথর গগন পথে,
ঐ নেমে আসে ধীরে ঊষা রাণী
   স্নিগ্ধ মধুর আলোর রথে।

উদয় দেউলে পড়ে গেছে সাড়া—
   রূপসী ঊষার গোলাপী হাস্য,
লঘু নীল ঐ বিতানের তলে
   ফুল বালিকার বিলোল লাস্য।

ঘুচে গেছে যত জড়তা আঁধার
   জাগিল অমল শ্যামল পৃথ্বী—
কোয়েলা পাপিয়া খোলে একতান
   ঝঙ্কৃত করিল কানন বীথী।

মেদুর সমীরে কুসুম সুরভি
   সুধীর গরবে ভাসিয়া আসে,
ঊষার গোলাপী অধর পরশে
   নীরবে কানন-নিকুঞ্জ হাসে।

কুলু গেয়ে যায় তরলা তটিনী—
   নাচায়ে অযুত লহরী মালা।
আকাশের কোণে সোণালী অঞ্চল
   সুনীল বসনা পাহাড়ী বালা।

আঁধারে সুপ্ত তামসী রজনী
   মিশিল আলোর কোমল বক্ষে;
জাগো নিদ্রা মগ্ন হের ক্ষণ কাল
   প্রেম বিগলিত সজল চক্ষে।

শ্রীসুধেন্দুমোহন ঘোষ।

বাহাদুর সঙ্গী।

(২)

সম্পাদক মহাশয়;

গল্পের উপসংহার ভাগের জন্য আপনি বারংবার তাগিদ দিতেছেন। 'সময় উপস্থিত না হইলে কোন কার্য্যই হয় না।" এই মহাজন বাক্যে যদি আপনার বিশ্বাস থাকে তবে বোধ হয় আর আমার ক্রটীর কথা মনে লইয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না। উপসংহার পাঠাইতেছি। তৎপূর্ব্বে একটু ভূমিকা করিব। আশা করি ভূমিকাটীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তৎপর উপসংহারটী প্রদান করিবেন।

ডাক্তারের ভূমিকা।

বাড়ী পহুছিবার পর দিনই সুকুমার আসিয়া আমার নিকট পঁহুছিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, কনককে লইয়া আমি এ পথেই আসিয়াছি। আমি তাহাকে অগ্রেই জানাইলাম "কনককে তাহার পিতা আসিয়া গফরগাঁও হইতে লইয়া গিয়াছেন—আমার সেই জন্য একদিন বিলম্ব হইল।" আমি তখন আর আমার ক্রটীর কথাগুলি তাহাকে বলিলাম না। তাহার গোয়ালন্দে থাকিবার

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল "নূতন কাপড়ের এই বেগটী উপরের তাকের উপর রহিয়া গিয়াছিল। ২০৲ টাকার দুইখানা নোটও তাহাতে ছিল। মাল নামাইয়া লইবার সময় ভুলে তাহা লওয়া হয় নাই। ষ্টীমারে পা দিয়াই আমার সে কথা মনে হইল; আমি কনককে উপরে রাখিয়া আসিয়া মালগুলি নীচে ফেলিয়াই যাইব মনে করিতেছিলাম; এমন সময় আপনাকে দেখিলাম। গাড়ীতে গিয়া বেগটী পাইলাম না। শুনিলাম ষ্টেসনের একজন পাইয়াছে। আমি ষ্টেসনে গিয়া ষ্টেসন মাষ্টারকে জানাইলে তিনি অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। এই সময় যাহারা বেগটী লইয়াছিল তাহারা চক্রান্ত করিয়া আমাকে একটু বিপদে ফেলিতে চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে ষ্টীমার ছাড়িয়া দেয়। যাহা হউক আমি ষ্টেসন মাষ্টারের অনুগ্রহে অনাহত ভাবে বেগটী পাইয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া পড়ি। তিনি কিশোরগঞ্জ বিস্তৃত ভাবে একটী টেলিগ্রাম করিয়া দিয়া আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

সুকুমার যখন ষ্টীমার হইতে তীরে যায় তখন কনকের কথা আমাকে বলিয়া যায় নাই। সে কথা উল্লেখ করিয়া আমি তাহাকে এখন নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করিতে পারিতাম কিন্তু তেমন সাহস আমার ছিল না। সুতরাং তাহাকে আর কিছু প্রশ্ন করিলাম না। সে স্নান আহার করিয়া চলিয়া গেল।

ইহার প্রায় ১৪।১৫ দিন পরে আবার একটা মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে ময়মনসিংহ যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমাদের বিচারক ছিলেন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রথীন্দ্র মোহন দাস।

যথা সময়ে হাজিরা দেওয়া গেল। হাকিম তখনও আসিয়া পৌছেন নাই, আমরা বটতলায় হাটাহাটি করিতে লাগিলাম। ১২টায় হাকিম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তখন এজলাসে একটা বেঞ্চের উপর বসিয়াছিলাম। হাকিমের দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। দেখিলাম হাকিম রথীন্দ্র বাবুই আমাদের সেই সহযাত্রী R. M. Das. আমি মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলাম।

আমাদের মোকদ্দমাটা একটু তাড়াতাড়ি করিবার জন্ত পেস্কার বাবুকে বার বার অনুরোধ করা হইতেছিল কিন্তু তিনি একটু কিছু বেশী দাবী করিতেছিলেন। অগত্যা নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া সময়ের অপেক্ষাই করিব স্থির করিলাম। জানিনা কি কারণে হাকিমের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে আমাদের নথির উপরই পড়িয়া গেল। সাক্ষীর ডাক পড়িল। কাঠগড়ায় উঠিলাম যথারীতি হলপের কাজ শেষ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন পেস্কার বাবু হাত পাতিলেন। হাকিম টিফিনে গিয়াছেন। পেস্কার বাবুর সঙ্গে দেনা পাওনার একটু বাক বিতণ্ডা হইতেছিল এমন সময় চাপরাশি আসিয়া বলিল "বাবু আপনি কি ডাক্তার বাবু। বাবু আপনাকে ওয়াটিন রুমে ডাকিয়াছেন। আমার সঙ্গে আসুন।"

কথাটা আমার নিকট যেমনই হউক না কেন এই সংবাদটা পেস্কার বাবুর বড় মনঃপুত হইল না, ইহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তিনি ইহার পর আর কোন কথা না বলিয়া সরিয়া পড়িলেন।

টিফিন রুমে প্রবেশ করিবা মাত্র ডিপুটী বাবু উঠিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলাম "ভাল আছেন ত?

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এই একমত আছি, এখানে কাজের ভিড়ে মরিবার অবসর নাই।"

নানা কথার পর তিনি আমাকে বৈকালে তাহার বাসায় নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি তাহার আপ্যায়ন উপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করিলাম না—হাকিমদের সঙ্গে একটু চিনা পরিচয়ে সম্মান আছে।

আফিস হইতে আসিয়া তাড়াতাড়ি অন্যান্য কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যার পর আমন্ত্রণে ছুটিলাম।

ব্রহ্মপুত্রের তীরে, মাঠের ধারে মেহগিনি রোডের পাশেই ডিপুটী পাড়া। তাহারই একখানা বাড়ীতে রথীন্দ্রমোহন বাবু বাস করেন। বাড়ী খানা দেখিতে বেশ ফিটফাট—গৃহ স্বামীর সৌন্দর্য্য জ্ঞানের ও সৌখিন রুচির পরিচায়ক। আমি যখন পৌছিলাম তখন রাত্রি হইয়াছে। জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। রথীন্দ্রমোহন বাবুর বাড়ীর সম্মুখেই বিশাল মাঠ তাহার পরেই ব্রহ্মপুত্র নদ জ্যোৎস্না বিধৌত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

বেশ্ গল্প গুজব চলিতেছিল। উজ্জ্বল দীপালোকে বাহির হইতে দেখিয়া চিনিলাম—একজন আমাদের স্বগ্রাম-বাসী উদীয়মান সাহিত্যিক ভবতোষ বাবু, অপর গৃহ স্বামী রথীন্দ্র বাবু, আর দুজনকে চিনিলাম না। ভবতোষ বাবু পড়িতেছেন, আর সকলে তাহা শুনিয়া হাসিতেছেন। টিকা টিপ্পনী বেশ চলিতেছিল। সহসা হু হু করিয়া হাসির ঝড় বহিয়া গেল, আমিও ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

ভবতোষ বলিল "আসুন, এতক্ষণ যে আপনারই কথা হইতেছিল।"

আমি একটু বিস্মিতের ভাবে বলিাম "সে কেমন"?

একটী ভদ্রলোক বলিলেন "নুতন সাহিত্যিক কি না, যা কিছু শুনেন, দেখেন—তাতেই হাত কপচায়—"

অপর একটী ভদ্রলোক অর্দ্ধ-দগ্ধ সিগারেট ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন "দেখুন ভবতোষ বাবু আপনার গল্পটী বেশ হইয়াছে, তবে জানেন কি—আমাদের দেশী স্ত্রীলোক নিয়া চলা ফিরা করা আর একটা ট্রাঙ্ক নিয়া যাওয়া একই কথা। চালক শূন্য হইলে আর এক পা এ দিক সে দিক নড়চড় হইবার আশা বৃথা। ট্রাঙ্কটা একটা অচল বোঝা হইলেও ওজন করিয়া ছাড়িয়া দিলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইবে; কিন্তু এই সজীব পদার্থগুলাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়াও নিস্তার নাই। এ বিষয়ে আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে একটু শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। রেল জাহাজ যখন আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়াছে, তখন যাহাতে পরপুরুষের সঙ্গেও আপদে বিপদে আলাপ পরিচয় করিতে পারে, তার জন্য গল্পটাতে একটু ইঙ্গিত দিবেন। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে ডাক্তার বাবুর কি মত? দেখুন দেখি ব্রাহ্ম মেয়েরা কেমন পেরেড করিয়া সটান চলিয়া যায়, কুলিকে চাবুক দিতে চায়। এমন না হইলে কি এ যুগে এ সব কাষ্ঠ পুত্তলিকা লইয়া চলা যায়।"

সকলে হু হু করিয়া হাসিয়া উঠিল। অন্য একটী—বোধ হয় মুনসেফ বাবু, বাড়ী কলিকাতার দিকে—বলিলেন "আ মশায়, সেদিকে তাঁরাও বেশ সাবধান, তাদের ঘরে ডবল পর্দ্দা ঝুলছে। তাঁরা বক্তিতায় লিবারেল কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে হিন্দুর চেয়ে দশগুণ কনসারভেটিব, যান দিখিনি আমাদের সেদিক মন্দ নিশে কোন্ কাজের—যান দিখিনি তীর্থক্ষেত্রে—সে সকল স্থানে হিঁদু মেয়েদের স্বাধীনতা দেখে অবাক হবেন্।"

ভবতোষ হাসিয়া বলিল "আমার মতে "পথে নারী বিবর্জ্জিতা"। ডাক্তার বাবুই ঠিক।"

আমি তাহার দিকে চাহিলাম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এদিকে আমার গাড়ীর সময় যাইতেছিল। পরদিন কিশোরগঞ্জে অন্য একটী মামলায় হাজির হইতে হইবে। তাই তাড়াতাড়ি বিদায়ের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম।

যথা সময়ে চব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া উঠিলাম। হাত মুখ ধুইয়া অন্যান্য সকলেই চলিয়া গেল; আমিও ভবতোষ বাড়ীর ভিতরের একটী কামরায় বসিলাম। দেখিলাম ভবতোষ রথীন্দ্রমোহনের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। বাতিটী সম্মুখে রাখিয়া দরজা পিছন করিয়া বসিয়া আমি তাম্বুল ও তাম্রকূটের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। কখন ভবতোষ উঠিয়া গেল, টের পাইলাম না। আমি মনোযোগের সহিত টেবিলের উপরের একখানা কাগজ দেখিতেছি, আর তামাকু টানিতেছি। সহসা চাহিয়া দেখি জড়ি পেড়ে মিহি ঢাকাই শাড়ী পরিহিত একটী স্ত্রীলোক আমাকে প্রণাম করিয়া উঠিল। তাহার হাতের সোণার চুড়ি ঝণাৎ করিয়া বাজিয়া উঠিয়া যেন আমাকে তাহার আগমন বার্ত্তা প্রদান করিয়া বিশেষ সতর্ক করিয়া দিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। সে রমণী অতি মৃদুস্বরে বলিল "ডাক্তার কাকা বাড়ীর সকলে ভাল তো।" আমি দেখিলাম—কনক।

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল; হৃৎপিণ্ড বন্ধ হইতে উদ্যত। প্রথমে মনে হইল, আমি ভ্রম দেখিলাম কিন্তু চক্ষু কচলাইয়া আবার চাহিয়া দেখিলাম। বাতির উজ্জ্বল আলোকে বেশ দেখিলাম—রক্তমাংসের জীবিত মানুষ—কনক।

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কনককেও

কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলাম না; কিইবা জিজ্ঞাসা করি? এমন সময় ভবতোষ ডাকিল ডাক্তার বাবু গাড়ী আসিয়াছে। আর বেশী দেড়ি নাই, তাড়াতাড়ি চলিয়া আসুন।

"কনক ভাল আছেতো"—কেবল এই মাত্র বলিয়াই আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। ইহার পর কনক যাহা বলিল তাহা আমার কর্ণরন্ধ্রে বেশী প্রবেশ করিল না। আমি মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া এবং প্রতি কথায় মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া কোন মতে তাহার নিকট হইতে উঠিয়া আসিয়া হাফ ছাড়িলাম সত্য, কিন্তু আমার প্রাণের ভিতর তখনও কে যেন সজোরে হাতুরি পিটিয়া প্রশ্ন করিতেছিল। "একি?"

দরজায় গাড়ী প্রস্তুত ছিল। ভবতোষকে বলিলাম "একটু আমার সঙ্গে আইস তোমার সঙ্গে কথা আছে।" সে চটী পায়, এক কাপড়েই তাহার প্রবন্ধের কাগজ পত্রগুলি গুছাইয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে আমি কনক সম্বন্ধে আমার প্রহেলিকা ভাঙ্গিবার জন্য তাহাকে প্রশ্ন করিলাম। সে হাসিয়া তাহার হাতের কাগজ পত্রগুলি দেখাইয়া বলিল "এই দেখুন, পড়িলেই জানিতে পারিবে; এ নিয়াইতো হাসি ঠাট্টা চলিতেছিল।

আমি তাহার হস্ত হইতে প্রবন্ধটী লইয়া খানিক পড়িয়াই বুঝিতে পারিলাম আমার কৃতিত্বের কথাই রথীন্দ্র বাবু তাহার বন্ধু উদীয়মান সাহিত্যিক ভবতোষকে বলিয়াছিলেন এবং তাহাই ভবতোষ গল্পাকারে লিখিয়া লইয়া গিয়া আজ দরবারে পেশ করিয়াছিল এবং সেই উপলক্ষেই আমার প্রসঙ্গ ও শেষ হিন্দু স্ত্রী ও ব্রাহ্ম সমাজের আলোচনা। এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম হাসি ঠাট্টার ইতিহাস।

গাড়ী ছাড়িবার বিলম্ব নাই। আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া ট্রেণে উঠিলাম। সুস্থ হইয়া বসিয়া ভবতোষকে বলিলাম "কিন্তু কনক সম্বন্ধে কি?"

ভবতোষ বলিল "সেটাও ইহাতে আছে। দেখিতেই পাইবেন।"

"তবে এটা আমি নেই" বলিয়া আমি তাহা গোটাইয়া পকেটে রাখিতে লাগিলাম।

ভবতোষ বলিল "কিন্তু পড়িয়াই কাল পাঠাইয়া দিতে হইবে। দেখিবেন কোন সাহিত্যিকের হাতে না পড়ে। আজ কাল গল্পের Plot এর বড় দুর্ভিক্ষ। "সৌরভ" সম্পাদক আজ দুই মাস যাবত অনুরোধ করিতেছেন, Plot এর অভাবে এত দিন ধরা দেই নাই, বাল্য-সতীর্থ রথীন্দ্র মোহনের নিকট হইতে এই গল্পটী শুনিয়া আগামী রবিবার সম্পাদক মহাশয়কে গল্পটী দিব প্রতিশ্রুতি দিয়াছি।"

আমি বলিলাম—'সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আমার জানা নাই। কিন্তু আমিও তো এই গল্পটীর যত দূর জানি, তাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয় ছাপা হয় নাই। যাহা হউক এখন বিদায় হই। আমি বরং তোমার নামেই গল্পের শেষ অংশ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিব। তুমি তদ্বির করিয়া ছাপাইও।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

* * * *

সম্পাদক মহাশয়, আমার অপরাধ লইবেন না। জমিদারী কাজ কর্মের ঝঞ্ঝাটে এত ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে আপনি পুন পুনঃ গল্পের উপসংহার ভাগ পাঠাইতে অনুরোধ করা সত্বেও কোন উত্তর দিতে পারি নাই। পূর্ব্বে উত্তর দিতে পারি নাই—উপসংহার ভাগ তখন আমি জানিতাম না। এখন দিতে পারিতেছি না—সময়ের অভাবে ভূমিকা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। যাহা হউক আপনি উপসংহার ভাগ না পাইয়াও যে এত দিনে গল্পটী বাহির করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অদ্য সুহৃদ্বর ভবতোষ রায়ের লিখিত এই গল্পের শেষ অংশ আমার এই প্রয়োজনীয় ভূমিকা সহ সৌরভের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশ জন্য পাঠাইতেছি। দেখিতেছি আপনি আমার উপর বিশ্বাস হারা হইয়া উপসংহার ভাগের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া লেখক আহ্বান করিয়াছেন। লেখা পুরস্কার যোগ্য হইলে তাহা ভবতোষেরই প্রাপ্য। ইতি—

* * * *

পুঃ গল্পের প্রথম ভাগের সহিত মিল রাখিবার জন্য

ভবতোষের লিখিত উপসংহার ভাগের ব্যক্তিগণের নামও স্থানের নামগুলি এক করিয়া দিলাম।

গল্পের উপসংহার।

(শ্রীভবতোষ রায় লিখিত।)

ডিপুটীর উক্তি।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি উদ্বিগ্নচিত্তে চাহিয়া দেখি আমার সঙ্গী ডাক্তার বাবু গাড়ী ধরিতে না পারিয়া যেন নিরাশ দৃষ্টিতে গাড়ীর পানে তাকাইয়া চলন্ত গাড়ীটাকে অভিসম্পাত করিতেছেন।

যুবতী তাহার সঙ্গিটীকে হারাইয়া বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রমণীর পক্ষে এরূপ চঞ্চলতা স্বাভাবিক। কিছুক্ষণ নিরুপায় ভাবে বাহিরের চলন্ত দৃশ্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সে মাথা তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। তাহার সে সময়ের বিষাদক্লিষ্ট মুখ ও কোমল দৃষ্টি আমাকে মুহূর্ত্তকালের জন্য অভিভূত করিয়া ফেলিল। তখন চলন্ত জানালার সাসির ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে সোণালি রৌদ্র রমণীর বিমুক্ত কেশ গুচ্ছের উপর আলোর মুকুট পরাইয়া দিয়া হাসিতেছিল। কিন্তু তাহার মুখে বেদনার চিরন্তন সুরটাই যেন মর্ম্মরিত হইয়া সেই নিরাশার কথা ব্যক্ত করিতেছিল।

অবলা নারী জাতির উপর বলবান পুরুষ জাতির সহানুভূতির আগ্রহ অতি প্রবল। কোমলের প্রতি সবলের এই সুন্দর সম্পর্কটী একান্ত মধুর বলিয়াই রমণীকে আপনার অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইতে পুরুষের এত আনন্দ। যে আনত তাহার কাছে পদানত হইয়া, যে ধরিতে যায় তাহাকে ধরা দিয়া, যে আশ্রয়প্রার্থী তাহাকে আশ্রয় ভিক্ষা দিয়া, প্রাণের যে স্বাভাবিক সার্থকতা তাহাই পুরুষকে নারী মর্য্যাদায় অনুপ্রাণিত করে। ফলে যেখানে ব্যবধান এবং তাচ্ছিল্য ছিল সেখানে ঘনিষ্টতা এবং আপ্যায়ন সজীব হইয়া মধুরতায় মণ্ডিত হয়।

এই স্বভাবজাত কর্ত্তব্য জ্ঞানের সুবর্ণ সুযোগ হাতের কাছে পাইয়া আমার উৎসাহ একটু বাড়িয়া গেল। আমি সহানুভূতির স্বরে বলিলাম "আপনি ভয় পাইবেন না; টেলিগ্রাম করা যখন হইয়াছে, লোক নিশ্চয়ই আসিবে। আমিই এখন আপনার সঙ্গী। আমিই আপনাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিব। এ দায়ীত্ব এখন আমার।"

যুবতী লজ্জায় ম্লান ও ভয়ে সঙ্কোচিত হইয়া গিয়াছিল। কোন উত্তর করিল না।

ইঁহাকে ৮ ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে দেখিয়া আসিতেছিলাম; সুতরাং ইঁহার সাময়িক স্বভাব বুঝিবার আমার বড় বেশী বাকী ছিল না। স্ত্রীলোকটী এত স্বল্পভাষী যে অতঃপর আর ইহার নিকট হইতে কোন কথার জবাব পাওয়া অসম্ভব মনে করিতেছিলাম। যাহা হউক আমি একটু চেষ্টা করিলাম। শুনিয়াছি স্ত্রীলোক পিত্রালয়ের নাম করিলে কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না, তাই আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করিলাম "আপনার পিতাইত আসিবেন, না?"

স্ত্রীলোকটী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, সঙ্গে সঙ্গে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "খুব সম্ভব তিনিই আসিতে পারেন।"

আমি বলিলাম "তিনি না আসিলে কি করা যাইতে পারে বলুন দেখি?" যুবতী নিরাশ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিলেন। আমি বলিলাম "যেরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন লোকের সঙ্গে আপনি যাত্রা করিয়াছিলেন, যদি পথে ভগবান এই ডাক্তার বাবুকে জুটাইয়া না দিতেন তবে কি উপায় হইত?" তারপর একটু থামিয়া বলিলাম, "আপনি লেখা পড়া জানেন কি?"

এখন আমার কথায় উত্তর না দেওয়া বোধ হয় শিষ্টাচার বিরুদ্ধ মনে করিয়া নেহাৎ অনিচ্ছা সত্বেও মহিলাটী বলিলেন "অল্প স্বল্প জানি, বেশী না।"

আমি বলিলাম "আপনি শিবনিবাস হইতে আসিয়াছেন—কার বাসা হইতে—বলিতে পারেন কি?"

যুবতী অতি মৃদুস্বরে বলিল "হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাসা হইতে।"

আমি একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম "ও সেই হরচন্দ্র বাবু যাহার বাড়ীতে সে দিন খুব ধুমধাম হইয়া গেল—তাহার ছেলের অন্নারম্ভে—না? আমার একটী বন্ধুর সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি সেখানে না যাইতে পারিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। আপনি সে অনু-

রোগ চিঠিখানা দেখিলে বোধ হয় সে বাড়ীর লোকের হস্তাক্ষর চিনিতে পারিবেন।"

যুবতী একটু উৎফুল্ল ভাবে বলিল "সেই বাড়ীর কাহারও লিখা হইলে চিনিব বোধ হয়।" আমি আগ্রহের সহিত আমার বেগ খুলিয়া মেরি কেরোলির "God's good man" খানা খুলিয়া তাহাতে Page mark স্বরূপ যে চিঠিখানা রাখিয়াছিলাম তাহা তাহার হস্তে দিলাম। তিনি পরম আগ্রহে তাহা গ্রহণ করিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং পড়িতে যাইয়া যেন চমকিত হইয়া গেলেন। বিস্ময় এবং লজ্জা যেন যুগপৎ তাহার চক্ষে মুখে খেলা করিতে লাগিল।

আমি একটু চাপা হাসির সহিত বলিলাম "আমার বন্ধুর পত্রখানা এখন দিন; তাহার পুস্তকখানা আমি পড়িতে আনিয়াছিলাম, তাহাতে এই পত্রখানা পৃষ্ঠাচিহ্ন স্বরূপ রহিয়াছে। পুস্তকের সহিত পত্রখানা তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। এ হস্তাক্ষর কি আপনি জানেন?"

যুবতী মাথা তুলিয়া চাহিলেন না, কোন উত্তরও দিলেন না।

আমি পুনরায় বলিলাম—"পত্রখানার নীচে যাঁহার নাম তাঁহাকে কি আপনি জানেন?"

এইবার যুবতী একটু মাথা তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "তিনিই আমার দিদি।"

আমি বলিলাম "যাঁহার নিকট চিঠিখানা লিখিত হইয়াছিল, তিনিও তবে আপনার সম্পর্কিত কেহ অবশ্যই।"

যুবতী নীরব।

আমি—"এ হস্তাক্ষরও আপনার দিদির কি?"

যুবতী কোন উত্তর করিলেন না।

তাহার মুখ চাপা পড়িয়া গেল দেখিয়া আমি নিরাশ হইলাম। তখন আমি নূতন করিয়া কথা তুলিবার জন্য বিনীতভাবে বলিলাম "তবে আমার বন্ধু নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিয়া কাজটা ভাল করেন নাই। বাস্তবিক তার অবসর বড় কম। তার পক্ষে আমি সাক্ষী—আমার চিঠিখানা ফেরত দিন।"

যুবতী আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। বরং সেই চিঠিখানাকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সংস্থাপন করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চোখে মুখে যেন একটু একটু করিয়া কৌতুকের চাপা হাসিই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে যুবতী ধীরে ধীরে আমার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—সে দৃষ্টিতে আমাকে যেন আরব্যোপন্যাস বর্ণিত কোন এক স্বপ্ন-পুরীর অজানা রাজকুমারীর অতীত কথা স্মরণ করাইয়া এক স্বপ্নজড়িত মধুর অতীতের স্মৃতির মধ্যে টানিয়া আনিল। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। এমন অবস্থায় পড়িলে দুর্ব্বল পুরুষের যাহা হইবার আমার তাহাই হইল। বার দুই দৃষ্টি বিনিময়ের পর আমার কণ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হইল, বক্ষের ঘন স্পন্দনের মধ্যে হৃদয় নামক জিনিসটার যেন কোন খুজ খবরই পাওয়া যাইতে লাগিল না। এতদিন আমার চিত্তের যে শাখাটা শুষ্ক কামনা লইয়া গগনে পবনে শান্তি খুজিয়া মরিতেছিল, সে যেন আজ অকস্মাৎ অযাচিতভাবে আমারই হৃদয় দ্বারে ফলে পুষ্পে ভরিয়া উঠিল। আমি নয়নের সম্মুখে রঙীন নেশার এক স্বপ্নজড়িত মধুর বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। আমার বুভুক্ষু প্রাণ হইতে একটা মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আনিয়া আমাকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। এমন সময় আমার সেই সাধের রঙ্গভূমির চিত্রপট পরিবর্ত্তিত হইল। গাড়ী গফরগাঁ ষ্টেসনে আসিয়া থামিল।

গাড়ী থামিলে আমি বলিলাম "মুখ বাহির করিয়া দেখুন দেখি আপনার কেউ আসিয়াছেন কি না? আমি ততক্ষণ বাহিরে গিয়া দাঁড়াই।"

যুবতী মুখ বাহির করিয়া তাহার চঞ্চল দৃষ্টি এদিক ওদিক সঞ্চালন করিতে লাগিল। আমি একটী উৎসুক দৃষ্টিপূর্ণ ভদ্রলোককে ইণ্টার ক্লাসের স্ত্রীলোকের কামরায় অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত দেখিয়া তাঁহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যুবতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাইলাম।

ভদ্রলোকটীকে দেখিয়া যুবতীর ভয় ও বিষাদক্লিষ্ট বদনে অকস্মাৎ আনন্দের রেখা পড়িয়া গেল। আমি বুঝিলাম — ইনিই যুবতীর আশ্রয় স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছেন। আমি নিজেই একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে

বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি শিবনিবাসের কোন মহিলার অন্বেষণ করিতেছেন কি?" তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিলেন "আজ্ঞে, হাঁ মহাশয়। আপনি তবে—"

আমি তাঁহার শেষ কথায় মনোযোগ না দিয়া বলিলাম "আসুন আপনি, তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আছেন।"

তৎক্ষণে যুবতীটী মুখ ভিতরে লইয়া নিজ উন্মত্ত আগ্রহকে অপেক্ষাকৃত দমন করিয়া সংযত হইয়া বসিয়াছিলেন।

ভদ্রলোকটী গাড়ীতে উঠিলে যুবতী তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। আমি আমার সঙ্গীয় লোকটাকে বলিলাম—ইনি নামিয়া গেলে কুলি দিয়া তাঁহাদের মোট গুলি দেখিয়া শুনিয়া নামাইয়া দিও। ভদ্রলোকটী আমার দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিলেন, তারপর যুবতীকে লইয়া নামিয়া গেলেন।

যুবতী নামিবার পূর্ব্বক্ষণে যেন তাহার আহত বুকের মধ্যে একটা বেদনার দুঃসহ ভাবের আবেশ সামলাইয়া একটা নিরাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সে দৃষ্টির বিনিময়ে যেন আমার হৃদয় রাজ্যের অর্দ্ধেক স্থান শূন্য বোধ হইতে লাগিল। আমি শিষ্টাচারের বিনিময়ে ভদ্রলোকটীর সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া ষ্টেসনের ২য় শ্রেণীর কামরায় তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া আসিলাম।

আমি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের জিনিস পত্র গুলি নামাইয়া দিতেছিলাম, এমন সময় সেই ভদ্রলোকটী আসিয়া আমার নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। বুঝিলাম তিনি যুবতীর নিকট তাহার ডাক্তার খুড়ার অবস্থা শুনিয়াই আমার নিকট আসিয়াছেন।

আমিও তাঁহাকে যতদূর সম্ভব বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া মানুষের স্বাভাবিক কর্ত্তব্যের কথা নিবেদন করিলাম। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি আপনার কে হন?" তিনি বলিলেন "আমার কন্যা।"

আমি একটু লজ্জিত হইলাম। একটু বিপদও গণিলাম। তিনি বলিলেন 'আজ প্রাতে আমি সুকুমারের এক বিস্তৃত টেলিগ্রাম পাইয়া নিজেই অস্থির হইয়া আসিয়া পড়িয়াছি। সে জিনিস পত্র হারাইয়া বিপদে পড়িয়াছি। তাহার টেলিগ্রামেই জানিতে পারিয়াছি যে কনক ও ডাক্তার এক ষ্টীমারেই আসিতেছিল, আজ আপনি না থাকিলে কি দশা হইত, তাহা একমাত্র ভগবান জানেন।"

তিনি কথা বলিতে বলিতে কৃতজ্ঞতায় গদ গদ হইয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম 'তবে এখন আপনি যান গাড়ী ছাড়িবার বোধ হয় সময় হইয়াছে।

আমার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটী বলিলেন—"কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যও অন্ততঃ আপনার সম্বন্ধে দু একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

আমি বাহুল্য কথা পরিহার জন্য নিজেই বলিলাম "আজ্ঞে আমার পরিচয়? আমি ময়মনসিংহ যাইতেছি, বদলি হইয়া—বোধ হয় কিছু দিন তথায় থাকিবও। আপনারা তো প্রায়ই সেখানে বোধ হয় যাইবেন। দেখা সাক্ষাৎ হইবে।"

আমি আস্তে আস্তে গাড়ীতে উঠিতেছিলাম, ভদ্রলোকটী পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন "ইঞ্জিন জল লইতে গিয়াছে। এখানে আরও দশ মিনিট বিলম্ব হইবে। কাওরাইদেই জল লওয়া হইত; আজ সেখানে জল লওয়া হয় নাই। বোধ হয় এই বিশ্বাসেই ডাক্তার গাড়ী ধরিতে পারে নাই।"

আমি বলিলাম "তাই সম্ভব।"

ভদ্রলোকটী বলিলেন—"আপনি সেখানে কি কাজে যাইতেছেন।" আমি বিনীতভাবে বলিলাম—"ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কাজ।"

ভদ্রলোকটী আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন—"আপনার নামটীও জানিতে চাহিতেছি।"

আমি—গলা পরিস্কার করিয়া বলিলাম—'রথীন্দ্র মোহন দাস।" ভদ্রলোকটী হা করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়াই প্রশ্ন করিলেন—"পিতার নাম?"

"স্বর্গীয় রাজমোহন দাস।" ভদ্রলোকটী সেইভাবেই

বলিলেন—"আমাদের হরিহরপুরের কাননগু রাজমোহন দাস ?"

আমি জুতার আগায় মাটী খুঁটীতে খুঁটীতে মাটীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া নতমস্তকে বলিলাম—"আজ্ঞা হাঁ!"

যেন বিস্ময়ের একটা যবনিকা সেই ভদ্রলোকটীর চোখের সম্মুখ হইতে কেহ টানিয়া লইয়া গেল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাসে হৃদয়ের সমস্ত গুরুভার শূন্যে উড়াইয়া দিয়া—আমার দক্ষিণ বাহুটীকে তাহার বাম হস্তের স্নেহ স্পর্শে পুলকিত করিয়া দিয়া বলিলেন—"রথীন্দ্র—তুমি ?" —বাষ্পে তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল।

আমি স্পন্দনহীন জড় পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ভদ্রলোকটী সেই ভগ্ন কণ্ঠেই বলিলেন—"কোন অপরাধ করিয়াছি বাবা আমি—যে আমার এ বয়সেও এ কষ্ট লাঞ্ছনার শেষ হইবে না ?"

ভদ্রলোকটীর অবস্থা দেখিয়া আমিও যেন কেন ঠিক থাকিতে পারিতেছিলাম না। অলক্ষিতে আমারও চষমার নীচে একবিন্দু জল কিছুক্ষণ লুকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়া হটাৎ আসিয়া ঝড়িয়া পড়িল। আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

এই সময় শেষ ঘণ্টা বাজিল। আমি তাড়াতাড়ি করিতে যাইয়া একেবারে থতমত খাইয়া ভদ্রলোকটীর পায়ে ধরিয়াই প্রণাম করিয়া ফেলিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। তাহার সে বিদায়ের দীর্ঘনিশ্বাস যেন আমার সমস্ত পুরস্কারকে মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত করিয়া আমার উপর দিয়া বহিয়া গেল।

আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। এই সময় আমার দৃষ্টি চসমার উপর দিয়া একটু দূরে নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম অদূরে—স্বল্প অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে আশা ও আকাঙ্ক্ষার যেন দুটী সজল উৎসুক দৃষ্টি আমার হৃদয়টাকে আমা হইতে সজোরে টানিয়া ছিন্ন করিয়া লইয়া তাদের অজেয় বাহাদুরীর পরিচয় দিতেছে। বাহাদুর সঙ্গী বটে!

দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি হৃদয়ের মধ্যে পদ্মার ভাঙ্গা গড়ার ন্যায় একটা বিশাল বিচিত্র ভাঙ্গা গড়া লইয়া আসিয়া ময়মনসিংহ পঁহুছিলাম।

* * * *

বসন্তকাল। প্রকৃতি পুষ্পে পল্লবে সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া রাজত্ব করিতেছিল, আমার মনোরাজ্যে যেন তাহার বিন্দু বিসর্গও সাড়া দিতেছিলনা। আজ সহসা যেন বসন্তের মাতাল হাওয়া আমার আবদ্ধ হৃদয়ের কপাট খুলিয়া সারা প্রাণে একটা অভিনব পুলক জাগাইয়া খেলা করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের প্রকৃতিও যেন চারিদিক হইতে শুভ বাসন্তীর আগমন বার্ত্তা পুলক বিহ্বল চিত্তে আমাকে প্রদান করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি আফিসের কাজ শেষ করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সেই দিনকার ষ্টেশনের ভদ্রলোকটী আমার ইজি চেয়ারে শুইয়া গুড়গুড়িতে তামাকু সেবন করিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি সে দিনের ন্যায়ই একটা অভিনয় করিয়া ফেলিলাম। তারপর একদিকে সরিয়া স্বীয় সাহেবিয়ানা ছাড়িলাম।

একটী বালিকা আমার নিকট আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলে সে আপনি আসিয়া ধরা দিল। তারপর সেই অপরিচিত বালিকা তাহার বালিকা সুলভ ভাষায় বলিল "আপনি আমাদের জামাই বাবু।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম "কে বলিল।" সে তখন উত্তর করিল "বাবা বলিয়াছে, জামাই বাবু সাহেব সাজিয়া আসিবে। আপনি নাকি খুব বাহাদুর!"

আমি বলিলাম "তোমার দিদি আমাদের চেয়ে ও বেশী বাহাদুর।"

সে আর একদিকে চাহিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি চক্ষু ফিরাইয়া দেখি মূর্ত্তিমতী বাসন্তী যেন রূপে রসে গন্ধে মাধুর্য্যে বিকশিত হইয়া আমার দীন ভবনকে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

খুকুর কথাঃ— স্বর্গীয়া চারুবালা দেবী ও দিদিমা লিখিত। মূল্য—এক টাকা।

খুকুর কথা আরম্ভ করিয়াছেন মা, সমাপ্ত করিয়াছেন দিদিমা। অকালে অল্পবয়সে চারুবালা দেবী স্বর্গে চলিয়া গেলেন, খুকুর সব কথা বলিয়া যাইতে পারিলেন না—এইখানেই করুণরসের আরম্ভ। মা তিন বৎসরের খুকুর শিশু-জীবনের শৈশব মূর্ত্তি আঁকিয়া গিয়াছেন। শিশু পা ফেলিতে মায় মনে কত মুক্তা গড়াইয়াছে, একটু ভাঙ্গা কথায় স্বর্গ হইতে কত নন্দনবন নামিয়া আসিয়াছে, একটু হাসিতে কত ফুল ফুটিয়াছে, সরল সহজ কথায় পুস্তকখানির পাতায় পাতায় সে চিহ্ন রহিয়াছে। এইসঙ্গে চারুবালা দেবীর যে একখানি যশোদা মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অতি মনোহর। খুকুর ন্যায় মেধাবী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক অধিক জন্মেনা। কি আবৃত্তি, কি চিত্র, কি নূতন নূতন কথায়—খুকু যে বিশেষত্ব দেখাইয়াছে তাহাতে পাঠকের বিস্ময় উৎপন্ন করিবে। তাহার দিদিমা যে অংশ লিখিয়াছেন, তাহা আরও করুণ। সে অংশ পড়িতে খুকুর চিত্ত ও চরিত্র ভাবিয়া যেরূপ অবাক্ হইতে হয় অন্যদিকে এই মাতৃহীন বালকের মায়ের অব্যক্ত অন্বেষণের কথাগুলি পড়িয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। খুকু কল্পিত চরিত্র নয়, তাহার সত্য জীবনের সত্য কথা অতি সহজ ভাবে এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার ইহাই উহার প্রধান গুণ।

খুকুর কথায় ১২ খানি হাফটোন চিত্র আছে। চিত্রগুলিতে বইখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। আমরা বইখানি পড়িয়া সুখী হইয়াছি। যে কোন মাতা, যে কোন পিতা, যে কোন ভাই-ভগ্নি খুকুর কথা পড়িয়া সুখী হইবেন।

নিবেদন—বর্ত্তমান যুদ্ধে পত্রিকা পরিচালন বহু ব্যয় সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে তথাপি আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অমারা মাতৃভাষার সেবায় ও গ্রাহকগণের মনস্তুষ্টির জন্য বিধি মত চেষ্টা করিতেছি। আমাদের এই চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা নূতন ব্লক প্রস্তুত করাইয়া আনাইতে পারিতেছিনা, অনবরত চিঠি লিখিয়া লিখিয়া নিরাশ হইতেছি। সে জন্য দুইমাস যাবত সৌরভের মুখপত্রে কোন ছবি দিতে পারিতেছি না। আশাকরি সহৃদয় গ্রাহকগণ সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

বিষয় সূচী।

Printed by Satish Chandra Rai at the Jagat Art Press, Dacca. Published by Kedarnath Majumdar, Mymensingh.

সৌরভ

চতুর্থ বর্ষ } ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩২৩। { একাদশ সংখ্যা।

রঘুনাথ গোঁসাই।

"এমন বৃন্দাবন ছাড়া হৈলাম
কপাল দোষে।
অর্থ নাই সামর্থ্য নাই, ভিক্ষা করার সাধ্য নাই,
কেমনে ব্রজে যাই,
মনে ভাবি তাই, দৈব মায়ায় ভুলে
রইলেম শেষে।
ইহা রঘুর মনে উঠে কত, যদি কেহ ব্রজে যেত,
তার সঙ্গেতে যেতেম, গোবিন্দ হেরিতেম,
পড়ে রৈতেম ব্রজের রজের আশে।"

রঘুনাথের ভণিতাযুক্ত এমন আর্ত্তি-আকুলতা, ব্যথা ও বিরহের অসংখ্য করুণগীতি, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সংযোগ স্থলে আটীয়া, তালেপাবাদ, চান্দপ্রতাপ, সুলতানপ্রতাপ, মকিমপুর প্রভৃতি কতকগুলি পরগণার কৃষিক্ষেত্রে ও কৃষকপল্লীতে, উদাসীন বৈরাগী সন্ন্যাসীদিগের আখড়ায়, এবং ভক্ত গৃহস্থের ভজনমন্দিরে আজিও শুনিতে পাওয়া যায়। রঘুর স্বরভঙ্গীতে এক অপূর্ব্ব উদাস্তের সঞ্চার করে। উহা গায়ককে ভাবাবিষ্ট করিয়া শ্রোতাকে তন্ময় করিয়া তোলে।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত কালিয়াকৈর গ্রামে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকুলে রঘুনাথের জন্ম হয়। রঘু, যাজনব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। "চক্রবর্ত্তী", ইহার বংশগত উপাধি ছিল। সিদ্ধাবস্থার ইনি রঘুনাথ গোস্বামী নামে পরিচিত হন।

রঘুনাথের জন্ম হইলে ইঁহার পিতামহ গল্প করিয়া বলিয়াছিলেন, এই বালক সিদ্ধিলাভ করিবে কিন্তু ইহার বংশ থাকিবে না। পিতামহের এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইয়াছিল। রঘু আমরণ কৌমার্য্যব্রত রক্ষা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবদিগের ভজনপদ্ধতি দুই প্রকার। এক, 'শুষ্কমত' বা গোড়ীয়ার মত; ইহাতে ভগবানকে ঈশ্বর জানিয়া বিধিমতে তাঁহার ভজনা করা হয়। ইহাতে "তুমি মহান্, আমি ক্ষুদ্র" "তুমি প্রভু আমি দাস" "তুমি ঈশ্বর, আমি জীব"—সাধক এই ভাবনা করেন। দ্বিতীয়—রসের ভজন; ইহাতে বেদাচার নাই, বিধিনিষেধের বন্ধন নাই, সাধক আপনার প্রাণের আকুলতায় তাঁহার প্রাণারামকে পতি ভাবেন। আরও এক গ্রাম উচ্চে উঠিলে পতি নহে—উপপতি জানিয়া, কামুকা কুলটার ন্যায় প্রাণের টানে—কেবলই হৃদয়ের আরামের জন্য—তাঁহাকে পাইতে চাহেন। এ ভাবের ভজনে ভগবান, ঈশ্বর নহেন, তিনি সখা, তিনি পতি—তিনি মধুর, মনোহর, রমণ। এ মতকে পঞ্চরসিকের মত বলে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব প্রভৃতি পাঁচ জন রসিক ভক্ত এ পথে—এ সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাই গোপীভাব। ইহাই বৈষ্ণবের সহজ ভজন। কিন্তু এ পথে আসিতে হইলে শুষ্কপথ দিয়া আসিতে হয়। আগে বৈধীভক্তি—বিধি নিষেধের অধীন হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তন। শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে চিত্ত তন্মুখী হইলে তবে রসের পথে যাইবার অধিকার হয়। মহাপ্রভু

চৈতন্যদেব গুরুমত—নামকীর্ত্তন, সাধারণের নিকট প্রচার করিতেন; রসের ভজন, অন্তরঙ্গ ভক্ত—স্বরূপ ও রামরায়কে লইয়া নিভৃত মন্দিরে হইত। (১)

রঘুনাথ এই দ্বিবিধ পথেই সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রঘুনাথের কতকগুলি গান, নামকীর্ত্তনের পদ, ইহা ভক্তি, বৈরাগ্য ও আত্মনিবেদনের ভাবে পূর্ণ। তাঁহার—"কবে ব্রজের ধূলা লাগ্‌বে আমার গায়"। গাইতে গাইতে এখনও ভক্ত সাধকের অশ্রুপাত হয়। "কৃষ্ণ এসে হও কাণ্ডারী ঢেউ দেখে মোর ভয় লেগেছে।" বলিয়া ভক্ত, কাতর প্রাণে যখন কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকেন, তখন সে গান শুনিয়া মনে হয়, সত্য সত্যই রঘুনাথ, ভবসাগরের তীরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তাহার পারের কাণ্ডারীকে এমনই করিয়া ডাকিয়া পার হইয়া গিয়াছেন। তিনি অন্তিম দশায়—

"রোগেতে তনু জীর্ণ হৈল,
আমার সাধন গেল, ভজন গেল,
সকল গেল।"

বলিয়া যে নির্ব্বেদপূর্ণ কাতর ধ্বনি করিয়াছিলেন, এখনও জরাজীর্ণ শতবৃদ্ধ সেই গান গাইয়া—রঘুনাথের ভাবে অনুভাবিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন।

সেকালে সাধারণ যাজনিক ব্রাহ্মণগণ যেরূপ দশকর্ম্মের শিক্ষা পাইয়া থাকেন, রঘুনাথের শিক্ষা তাহার অধিক ছিল না। কিন্তু তিনি অপণ্ডিত হইয়াও পণ্ডিত জনের ও দুষ্প্রাপ্য কবিত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। ভক্তি তাহাকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল; ভগবৎকৃপা এই মূককে বাচাল করিয়া তুলিয়াছিল। রঘু, অশাস্ত্রদর্শী হইয়াও শাস্ত্রের অগম্য পরম তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

রঘুনাথকে দেখিয়াছেন, এমন দুই একটী অতিবৃদ্ধ এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারা বলেন গোস্বামী স্থূলকায়, প্রসন্নবদন, ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইত। হায়, সেই সাধক, ভক্ত পল্লীকবির দেহ অনেক দিন হয় পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। আর তাঁহাকে দেখিবার উপায় নাই।

রঘুনাথের বংশ নাই, ভিটা ও নাই। তাঁহার সকল লোপ হইয়াছে, আছে কেবল লোকের মুখে মুখে তাঁহার প্রাণের কথা—কতকগুলি গান। আর আছে একখানি কাগজ, যাহাতে রঘুনাথ স্বরচিত দুইটি পদ, স্বীয় মাতুল ঢাকা জেলার ভাসুয়ান নিবাসী কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্ত্তীর নিকট একখানি পত্র সহ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

মাতুল হইলেও কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্ত্তী, ভাগিনেয়কে ৺ঠাকুর মহাশয়ের (নরোত্তম ঠাকুরের) অবতার বলিয়া মনে করিতেন। কেবল কৃষ্ণকান্ত নহে, সে সময়ে অনেকেই গোসাঁই রঘুনাথকে ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রকাশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। গোসাঁই রঘুনাথ কিন্তু একথায় নিতান্তই সঙ্কোচিত হইতেন। সেই সঙ্কোচ প্রকাশের নিমিত্তই পত্রখানি লিখিত হইয়াছে।

ইহার মধ্যে যে দুইটি পদ আছে, উহার একটিতে রঘুনাথ গৌরাঙ্গকে গগন এবং অন্যটিতে সাগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিজের মতে পদ দুইটি মনোহর হইয়াছিল, তাই, মাতুলকে এ দুইটি পদ 'বইয়ে' লিখিয়া রাখিতে বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

দশম পরিচ্ছেদ।

ইহার কিয়দ্দিবস পরে আমাদের পুল শেষ হইয়া গেল। যে সময়ে পুল নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছিল, সে সময়ে রেলের কাজ পুলের অপর পারেও চলিতেছিল। পুল শেষ হইবার পর দেখা গেল যে অপর পারে প্রায় ১৩ মাইল কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে। রেল তখন কলিটি প্লেনের (Plains) ভিতর দিয়া যাইতেছিল। আমরা অবশ্য ঐ স্থানে যাইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলাম। ইহার ৫।৭ দিন পরে প্রায় ৪০০০ কুলি ইউগণ্ডা ও সুদান প্রদেশ হইতে আসিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। সুদান সময়ের কথা এখনও হয় ত অনেকের মনে আছে। ঐ স্থানের

---

(১) বাহিরঙ্গ লোক মধ্যে নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লৈয়া রস-আস্বাদন। চৈতন্য চরিতামৃত।

মুসলমান অধিবাসীরা মেহদি নামক জনৈক সর্দ্দারের প্ররোচনায় ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। গর্ডন সাহেব অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া খার্তুম সহরে গমন করেন ও আশ্চর্য্য শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শনের পর হত হয়েন। ইহার পর ভারতবর্ষ হইতে একদল শিখ সৈন্য সহ কিচ্‌নার্ বাহাদুর গমন করেন। তাঁহারা সুদান ও ইউগণ্ডা জয় করিয়া ফিরিতেছিলেন। উহাদের দ্রব্যাদি লইয়া এই কুলিরা কয়েক দিন অগ্রে এইস্থানে উপস্থিত হইল।

ইহাদের মধ্যে প্রায় ২৫০০ ঐ দেশীয় ও ১৫০০ ভারতবর্ষীয়। ঐ দেশীয়দের মধ্যে কেহই রেলগাড়ীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিত না। এখানে আসিয়া তাহারা প্রথমে যে কি প্রকার বিস্মিত হইল, তাহা আধুনিক পাঠকদের অনেকে হয়ত বুঝিতে পারিবেন না। আজকাল আমরা যদি সহসা আকাশকে নীচে নামিয়া আসিতে দেখি, তাহা হইলে যে পরিমাণ আশ্চর্য্যান্বিত হই, উহারা বোধ হয় তাহার অপেক্ষাও অধিক বিস্মিত হইয়াছিল। উহারা যে সময়ে এইস্থানে উপস্থিত হইল, তখন একখানি ইঞ্জিন কয়েকখানা মালগাড়ী লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উহারা আসিয়াই সমস্ত গাড়ীখানাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। আমাদের বড় সাহেব আমাদের রতিকান্তকে বলিলেন "একটা তামাসা দেখিবে?" তিনি উহাদিগকে লাইনের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া ইঞ্জিনের উপর উঠিলেন এবং বাঁশীটা সজোরে বাজাইয়া দিলেন। ফল অতি অদ্ভুত হইল। উহারা উহা শুনিবামাত্র প্রথমে সটান শুইয়া পড়িল। তাহার পর আবার বাজিবামাত্র উহারা অতি ক্ষিপ্রভাবে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। বহু দূরে যাইয়া যখন তাহারা গতি স্থগিত করিল, তখন সাহেব গাড়ী চালাইয়া দিলেন। উহারা মুখব্যাদন করিয়া যে প্রকার অবাক্ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা দেখিয়া আমরা কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অবশেষে তাহাদের মধ্যে সমালোচনা আরম্ভ হইল। "কি প্রকারে গাড়ী চলিতেছে", ইহাই তাহাদের সমালোচনার বিষয়। কেহ বলিল, 'উহার মধ্যে একটা হাতী বসিয়া আছে।' অপর বলিল, 'না, না, উহার মধ্যে বড় ২ ঘোড়া আছে।' এই ভাবে নানা প্রকার বাদানুবাদ চলিতে লাগিল।

একদিন আমরা দেখিলাম, একদল জেব্রা আমাদের শিবিরের অদূরে চরিতেছে। সাহেব হুকুম দিলেন, 'উহাদিগকে ঘেরিয়া ফেল, এবং দুই একটাকে জীবন্ত ধরিবার চেষ্টা কর।' প্রায় ২৫০ লোক সমস্ত দলকে ঘেরিয়া ফেলিল, এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা চেষ্টার পর ৩টা জেব্রা ধরা পড়িল। উহার মধ্যে ২টা ৫।৭ দিনের মধ্যে মরিয়া গেল। একটা ৭।৮ মাস পর্য্যন্ত সাহেবের নিকট ছিল কিন্তু একদিন সে পলাইয়া গেল। জেব্রাটা রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ ছিল। ঐ সময়ে একদল জেব্রা উহার নিকট দিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে আমাদের জেব্রাটা এ প্রকার উৎসাহিত হইয়া পড়িল যে বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করিয়া উহাদের সহিত মিলিত হইল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এখন ঐ কুলিদের কথা—উহারা দ্রব্যাদি লইয়া মোম্বাসা চলিয়া গেল। ঐ সময়ে আমাদের এই স্থান হইতে মোম্বাসা পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ রেলগাড়ী ছিল না বলিয়া উহাদিগকে পদব্রজে গমন করিতে হইল। দ্রব্যাদি পৌঁছাইয়া দিয়া যখন উহারা ফিরিয়া আসিল তখন উহাদের অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তাহাদের সে চেহারা আর ছিল না। অধিকাংশই অস্থি কঙ্কাল সার হইয়া পড়িয়াছে। অনুসন্ধানে শুনিলাম, উহাদের মধ্যে আমাশয় অতি ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। ৪০০০ কুলির মধ্যে পথে প্রায় ১৫০০ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অবশিষ্টের মধ্যে প্রায় ১২।১৩ শত লোক আক্রান্ত হইয়াছে।

সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের জন্য পৃথক বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিলেন, এবং যথাসাধ্য চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। আমাদের সঙ্গে একজন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন্ ও দুইজন সব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন। রতিকান্ত ইহাদের সহিত যোগ দিল। এই চারিজন লোক দিনরাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশেষ সুফল পাইলেন না। অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রায় ১০০০ লোক মরিয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এদেশীয় লোকেরা এই ভীষণ সময়ে বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা ভাবিত হয়

নাই। কেহ আক্রান্ত হইলে ইহারা তাহাকে পৃথক একস্থানে রক্ষা করিত। এবং সব ফুরাইয়া গেলে দূরে জঙ্গলের মধ্যে উহাকে পুঁতিয়া ফেলিত। নিতান্ত নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতেও উহারা বিশেষ শোক প্রকাশ করিত না। কাহারও মৃত্যু হইলে আমরা যেমন অধৈর্য্য হইয়া পড়ি ইহাদের মধ্যে সে প্রথা নাই।

আমাদের রতিকান্ত ঐ সময়ে যে কি ভাবে পরিশ্রম করিয়াছিল, তাহা আমি বলিয়া উঠিতে পারিনা। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—সে স্বহস্তে সেই অসভ্য ভূতের মত লোক গুলার বিষ্টা নিজের হাতে পরিষ্কার করিতেছে। দেখিয়া আমারও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিত। এই কাজের জন্য সাহেব কিন্তু তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সকলের নিকট তাহার প্রশংসা করিতেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি বিলাতের কোনও Society হইতে রতিকে একটা সোণার মেডেল পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করাইলেন, এবং কেরাণী হইতে একবারে তাহাকে ওভারসিয়ার করিয়া দিলেন। এখন হইতে সে মাসে (ভাতা ও বেতন সমেত) প্রায় ৩০০।৩৫০ টাকা পাইত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আমাদের মধ্যে ৫০।৬০ জন মসাই কুলির কাজ করিত। অন্যান্য অনেক প্রকার অসভ্য জাতি আমাদের মধ্যে ছিল বটে, কিন্তু ইহাদের ব্যবহারে এমন কিছু ছিল, যাহাতে সকলেরই নজর ইহাদের উপর পড়িত। ইহাদের সুন্দর চেহারা বটে, কিন্তু বর্ণ কাল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন সুদৃঢ় যে দেখিলেই মানুষের মত মানুষ বলিয়া মনে হয়। এমন দিন ছিল যখন আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলের অধিকাংশ স্থান উহাদের অধীন ছিল। ইহাদের নাম শুনিলে অন্যান্য অসভ্য জাতিরা আতঙ্কে কাঁপিতে থাকিত। এখনও পর্য্যন্ত এ প্রদেশের সমস্ত অসভ্য জাতিরা মসাই-দিগকে বিশেষ সম্মান করে। ইহারা অন্যান্য কোনও জাতির সহিত আজ পর্য্যন্ত আদান প্রদান করে না।

লেনানা এখন ইহাদের সর্দ্দার। মসাইরা ইহাঁকে রাজার ন্যায় ভয় ও ভক্তি করে। শুনিলাম, ইনি প্রাচীন রাজ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর আদেশ সমস্ত জাতি এখনও অতি সম্মানের সহিত পালন করে। আমি একদিন সাহেবের সহিত এই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ইহাঁর চেহারাটা বাস্তবিকই রাজার মত। সাহেবের সহিত তিনি যে ভাবে দেখা করিলেন ও আলাপ পরিচয় করিলেন তাহাতে ইহাঁর অসভ্যের মত বস্ত্রাদি না থাকিলে, ইহাঁকে কেহ অসভ্য মনে করিত না। তিনি যে একজন রাজা তাহা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে প্রকাশ পাইল। সাহেবকেও ধন্যবাদ যে, তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করিলেন না।

রাজা সাহেবকে কথায় ২ বলিলেন, "শুনিয়াছি আপনারা আজকাল পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া লোকের পদমর্য্যাদা স্থির করেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এদেশের সমস্ত লোকই আপনাদের চক্ষে অত্যন্ত হীন। আমরা কিন্তু মানুষের মনকে তাহার পদমর্য্যাদার মানদণ্ড মনে করি। এদেশে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রকোপ। এইজন্য আমরা পোষাকের উপর আদৌ দৃষ্টি রাখি না। আমার বিশ্বাস আপনারা যদি এদেশে কয়েকশত বৎসর বাস করেন, তাহা হইলে আপনারাও আমাদের মত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবেন।"

মসাইদিগকে অতি শৈশবকাল হইতে কষ্ট সহিষ্ণু হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা শিশুকাল হইতেই রৌদ্রে ও হিমে পড়িয়া থাকে। অনেক শিশু এইজন্য অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হয় বটে, কিন্তু তজ্জন্য ইহারা বিন্দুমাত্র দুঃখিত হয় না। ইহারা বলে, যে শিশু রৌদ্র ও হিম সহ্য করিতে পারে না, তাহার বাঁচিয়া থাকা লজ্জার কথা। প্রাচীন স্পার্টানদিগের কথা অনেকে জানেন। ইহাদের শিশু পালন পদ্ধতি অনেকটা সেই প্রকার। আজ পর্য্যন্ত ইহারা এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছে।

বালকেরা অষ্টম বর্ষে উপস্থিত হইবা মাত্র, উহাদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা ও সঙ্গে ২ কোনও অর্থ করি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। তখন ইহাদিগকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় থাকিতে হয়। ভাল ২ খাদ্য দ্রব্য, তামাক, চুরুট, চা, মদ্য প্রভৃতি আদৌ ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না।

তখন গ্রামের প্রায় সমস্ত বালক ও যুবক এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া আপনাদিগকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত রাখে। দিনের মধ্যে কেবল দুইবার মাত্র গৃহে যাইয়া আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করে। দেশের বড় লোকেরা এমন কি রাজার ছেলেরা পর্য্যন্ত এইভাবে জীবন যাপন করে।

ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে ইহারা প্রায়ই দেশের অন্যান্য জাতির সহিত বিবাদে লিপ্ত থাকিত। কোনও গ্রাম অধিকার করিতে সমর্থ হইলে ইহারা প্রথমেই ঐ স্থানের সমস্ত পুরুষ দিগকে হত্যা করিয়া ফেলিত। রাত্রিকালে মদ্যাদি পান করিয়া ঐ গ্রামের রমণীদিগকে লগুড়াঘাতে বধ করিত। বালক বালিকা পর্য্যন্ত বাদ যাইত না। মোট কথা এই যে, যুদ্ধে ইহারা কখনও কাহাকে বন্দী করিত না। এখন অবশ্য এই অসভ্য প্রথা রহিত হইয়াছে এবং যাহাতে উহারা কাহারও সহিত কলহ না করে, সে বিষয়ে বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়।

ইহারা চাষ বাস করে না বটে, কিন্তু শীকার কার্য্যেও বিশেষ নিপুণ নয়। গোমাংস এবং দুগ্ধ ইহাদের প্রধান খাদ্য। পূর্ব্বে রুটি বা ভাত খাইবার ইচ্ছা হইলে অন্য কোনও গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া আনিত। এখন তাহা বন্ধ হইয়াছে বলিয়া সময়ে ২ ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। যাহারা অবস্থাপন্ন তাহারা প্রত্যহ প্রায় অর্দ্ধ পোয়া গো রক্ত পান করে। রক্ত তাজা হইলেই ভাল হয়। না পাইলে বাসি রক্তও পান করে। এই সমস্ত কারণ বশতঃ ইহারা সকলেই একাধিক গো বা মহিষ পালন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গো মহিষাদির সংখ্যা দ্বারা সামাজিক মর্য্যাদা স্থির হইয়া থাকে। ইহারা যে প্রকার গভীর অরণ্যময় স্থান সকলে বাস করে, তাহাতে শীকার দ্বারা অনায়াসে ইহারা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না হইলে ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না। ইহাদের মধ্যে যাহারা শীকারের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে সমাজে অতি হেয়ভাবে থাকিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রথা এই যে, ইহাদের বিবাহ হইলে নীচের পাঁটির সম্মুখের দুইটা দাঁত উঠাইয়া ফেলিতে হয়। এ প্রকার না করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়। ইহাদের মধ্যে পুরুষেরা প্রায়ই মস্তক কেশ শূন্য করিয়া রাখে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ইহারা কর্ণের ছিদ্র বড় করিয়া তাহাতে নানা প্রকার অলঙ্কার ধারণ করে। শেষে এই ছিদ্র প্রায় ৫।৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়িয়া যায়। পুরুষেরা প্রায়ই পায়ে ছোট ২ ঘুঙুর বাঁধিয়া দেয়। চলিবার সময় রুমু ২ ঝুমু ২ শব্দ হইলে ইহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। ইহাদের মেয়েরা হাতে ও পায়ে লোহার বা তামার তারের চুড়ি ও মল ব্যবহার করে। এই অলঙ্কার দ্বয়ের বিশেষত্ব এই যে এক হাতের বা পায়ের চুড়ি ব মল একই টুকরা তারে প্রস্তুত। তাহাকেই ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ৫।৭ গাছা মল বা চুড়ী প্রস্তুত হয়।

ইহারা মৃতদেহ দাহ বা কবর দেয় না। মৃত্যুর পর সকলে কয়েক ঘণ্টা মৃতদেহকে ঘেরিয়া বসিয়া শোক প্রকাশ করে। ঐ সঙ্গে নৃত্যগীতাদিও হইয়া থাকে। উহা অবশ্য শোক জ্ঞাপক। তাহার পর গ্রাম্য পুরোহিত মহাশয় আসিয়া মৃতের আত্মার কল্যানার্থ মন্ত্রাদি পাঠ করেন এবং একটা ছাগল বা মেষ বলিদান দেওয়া হয়। তাহার পর সকলে দেহটাকে গ্রামের বাহিরে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলিয়া আসে। ঐ দিনই মৃতের প্রিয় দ্রব্যাদি নিকটস্থ কোনও নদী বা হ্রদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসে। শুনিলাম ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে অবস্থাপন্ন লোকের মৃত্যুর পর তাহার প্রধানা স্ত্রী এবং ভৃত্যকে পর্য্যন্ত মৃতের সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়া হইত। দেশের রাজা মরিলে ইহারা কিন্তু অনেক সময় কবর দেয়, এবং কবরের উপর একটা স্তূপ নির্ম্মাণ করে। ইহাদের দেশে এ প্রকার স্তূপ মধ্যে ২ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে মসাইদের ন্যায় সুশ্রী ও সবল জাতি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে দুঃখের বিষয় ইহাদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ইংরেজ বহুতর চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের কোনও চেষ্টাই সফল হইতেছে না।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

পূজা। *

আজি—যার তরে
সাজাইয়া থরে থরে
আঁখি জল-ঝরা অর্ঘ্য ডালা,
শরতের সায়াহ্ন-নিরালা
নামিল হেথায়,
পূজা তার আজিকে কোথায় ?

আঁখি মেলে চাই
দেখি—সবি আছে সে কেবল নাই !
বেদনা কাঁদিয়া কহে প্রাণে,
এইখানে সে যে এইখানে
ওরে পথ হারা,
এত পরাণের প্রীতিধারা
যার তরে বহে
কোন কালে সেকি দূরে রহে ?

আপনারে করে যেই জন
লিখিল প্রেমের নিকেতন
তার গুরুভার
মরণ কি পারে বহিবার ?

মৃত্যু ক্ষীণ বল
বহিবারে সক্ষম কেবল,—
আপনাতে জড়াইয়া থাকা,
সংসারের মলিনতা মাখা,
সঙ্কুচিত প্রাণ ;
নত যে রে তাহার নিশান
সেথা চিরকাল,—
ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রেমে সুবিশাল,—
নিখিলের দুঃখ সুখ মাঝে
প্রাণ যেথা রিক্ত হয়ে রাজে।

যেমন ঘুমায়
গগনে নিবিড় নিরালায়
শরতের শুভ্র মেঘ ভার,
নিঃশেষিয়া খুলি আপনার
সকল পরাণ
বরষায় করি বারি দান ;—
সেই মত আজ
প্রেম তার করিছে বিরাজ,
বিরামের পরিপূর্ণতায়,
আমাদেরি মিলিত হিয়ায়।

আমাদের স্নেহ
ভুলি যবে তুচ্ছ নিজ গেহ,
নিখিলের উদার অঙ্গনে
বাঁধে সবে গাঢ় আলিঙ্গনে ;—
আমাদের আশা
ঘুচাইতে বিশ্বের পিপাসা
হয় যবে আবেগ চঞ্চল ;
সেই স্নেহ আশার, তরল
অমৃত সরস
শ্রান্তি-হারা নিবিড় পরশ
অন্তরের পশি অন্তস্তলে
প্রেম তার জাগায় বিরলে।

আশা অভিলাষ
সে বুকের আকুল তিয়াস
মিশে আছে আমাদেরি প্রাণে ;
সে আশারে সফলতা দানে
মোরা তারে পাই,
জাগিয়া সে রয়েছে সদাই
আমাদের জাগরণ মাঝে ;
বীণা তার শত সুরে বাজে
সারা বাঙ্গালার
প্রভাতের খুলিয়া দুয়ার।

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন-হলে আনন্দমোহনের স্মৃতিসভায় পঠিত।

তাই ওগো তাই
পরাণে পরশ যার পাই
মৃত্যু যারে করিতে বহন
পারিবে না, পারেনি কখন,
পূজা যে তাহার
ক্ষণিকের নহে,—নিত্যকার।

পলকের অশ্রুঝরা গান
মৃতের স্মৃতির তরে দান
আজি এ সন্ধ্যার
মিলনের নহে উপহার।

অন্তরের শান্তিভরা দেশে
জাগিয়া যে আছে অনিমেষে
তাহার সম্মান
শুধু—আপনারে দেওয়া অনন্ত পরাণ।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

সে কালের মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ।

(শেষ অংশ।)

১৯—Vocabulary in two parts Bengalee and English by H. P. Forster. Senior Merchant of the Bengal Establishment. অর্থাৎ ফরষ্টর সঙ্কলিত বাঙ্গালা ইংরেজী অভিধান। ১৮০১ সনে মুদ্রিত। ৪৪২ পৃষ্ঠায় অন্যূন সাড়ে ষোল শত শব্দ সম্বলিত।

২০—মিলার সাহেবের অভিধান—১৮০১ অব্দে মুদ্রিত, মূল্য বত্রিশ টাকা।

২১—লিপিমালা—রামরাম বসু প্রণীত, ১৮০১ অব্দে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থখানা দুই ভাগে বিভক্ত ও ২২৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ভূমিকায় গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ :—

"সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে—এ হিন্দু স্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ। কার্য্যক্রমে এ সময় অন্যান্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেকের অবস্থিতিও এই স্থানে। এখন এস্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা। তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত রহিলে রাজক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না। ইহাতে তাঁহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এভুমির যাবতীয় লেখা পড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নামক পুস্তক রচনা করা গেল। প্রথম ধারা দুই তিন অধ্যায়। তাহার প্রথমতো রাজগণ অন্য রাজারদিগকে লেখেন। তাহার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বক দ্বিতীয় রাজগণ আপন সচিব লোককে অনুজ্ঞা ও বিধি ব্যবস্থা ক্রম দান। ইতি প্রথম ধারা। দ্বিতীয় ধারা সামান্য লেখা পড়া। সমান সমানীকে, লঘু গুরুকে, প্রভু কর্ম্মকরকে এবং অঙ্কমালা এই মতে পুস্তক লেখা যাইতেছে। ইহাতে অন্যান্য বিজ্ঞান লোকের স্থানে আমার এই আকাঙ্ক্ষা যদি আমার রচিত এই পুস্তকের মধ্যে কদাচিৎ ক্রমে কচিৎ দোষ হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক দৃষ্টি মাত্রে নিন্দামদে মত্ত না হয়েন। এ কারণ কোন লোক দোষ ভিন্ন হইতে পারেন না।"

পুস্তকের ৫ম পৃষ্ঠায় পুস্তক প্রকাশের সময় এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

"শকাদিত্য বসু বর্ষ পঞ্চ শ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ॥"

অর্থাৎ ১২০৮ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থ লিখিত হয়। গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থে পারস্য শব্দের যেমনি বাহুল্য দৃষ্ট হয়, এই গ্রন্থে পারস্য শব্দ তেমনি বিরল। ভূমিকার রচনা অপেক্ষা গ্রন্থের ভিতরের রচনায় আরও কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হইবে। একটু নমুনা উদ্ধৃত করা গেল।

"অন্যের দিগকে নীতিভ্যাসে ক্ষমতাপন্ন হওয়া নহে। বরং তাহাতেই অন্তে মরিবেক, এমত লোকেরদের পরিবারগণের নির্ব্বাহ নিষ্পত্তির মনোযোগ করিবা। নগরহাটের রাজা নীল মাধব বিধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য

করে অতএব তাহার সাহায্যার্থে অযুত তুরগারূঢ় প্রেরণ করিবা যাহাতে তাহার বৈরী দমন হয়। সেই এই খানের পুষ্টি।"

২২—কাশীদাসী মহাভারত—১৮০২ সনে প্রথম মুদ্রিত।

২৩—"কৃত্তিবাসী রামায়ণ" ১৮০৩ সনে প্রথম মুদ্রিত হয়। এই রামায়ণের প্রচ্ছদ পত্রে এইরূপ লেখা ছিল—"বাল্মীকি কৃত রামায়ণ মহাকাব্য কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালা ভাষায় রচিল। মূল্য দুই টাকা।" ইহার এক সংস্করণ ইটালীয় ভাষায় ও আর এক সংস্করণ ফ্রান্সের রাজধানী পারিশে মুদ্রিত হইয়াছিল।

২৪—'দাউদের গীত' গ্রন্থকারের নাম নাই। এক খানা খৃষ্টিয় ধর্ম্ম পুস্তক, ১৮০৩ সনে মুদ্রিত হয়।

২৫—"ঈসপের ও অন্যান্য গল্পের বঙ্গানুবাদ'। তারিণী চরণ মিত্র ও ডাঃ গিলক্রাইষ্ট কর্ত্তৃক অনুদিত। ইঁহারা দুইজনেই এই পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। পরে ডাঃ গিলক্রাইষ্ট উর্দ্দু, পারসি, আরবী প্রভৃতি নানা প্রাচ্য ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮০৩ সনে এই বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়।

২৬। ধর্ম্ম পুস্তক—খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে ডাঃ কেরি ও অন্যান্য মিশনারিদিগের লিখিত সুসমাচার পুস্তক। ১৮০১ হইতে ১৮০৫ অব্দ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরে মুদ্রিত।

২৭। বাঙ্গলার জাতিভেদ—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র হান্টার সাহেবের লিখিত একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তিকা। ১৮০৪ অব্দে লিখিত। ভাষার নমুনা প্রদত্ত হইল।

"হিন্দুলোকেরা যদিও আপন শাস্ত্রের নিশ্চয়েতে থাকে তবে অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার যদি ভালও হয় তবু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। যদি অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার দেখে কিম্বা শুনে তথাপি তুচ্ছ করিয়া আদর করে না। অতএব অন্য লোকের ব্যবহারেতে তাহাদের জ্ঞানলাভ হইতে পারিবে না।"

২৮। "ঠাকুরের বাঙ্গলা ও ইংরাজি শব্দাবলী"—Sanders Cones & Co কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কেরি সাহেবের উপদেশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী গ্রন্থরক্ষক এই অভিধান খানা সংগ্রহ করেন। ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব, শরীর বিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব প্রাকৃতিক ইতিহাস, গার্হস্থ্য নীতি, অর্থনীতি, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক বহু শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ও রোমক অক্ষরে ১৮০২ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের আকার ছোট—১৬৬ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা। ইহা তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৫২ অব্দে প্রকাশিত হয়।

২৯। "দায় রত্নাবলী"—পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অনুদিত আইন গ্রন্থ। সংস্কৃত দায়ভাগের বঙ্গানুবাদ, ১৮০৫ অব্দে মুদ্রিত।

৩০। "বর্জিলের ইনিয়দের প্রথম সর্গের বঙ্গানুবাদ"—অনুবাদক—J. Sargeant একজন সিভিলিয়ান ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র ছিলেন। পুস্তক ৬৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ও ১৮০৫ সনে মুদ্রিত।

৩১। "খৃষ্ট চরিত্র"—রাম বসু প্রণীত। ১৮০৫ অব্দে মুদ্রিত।

৩২। "রাজাবলী"—পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত ইতিহাস গ্রন্থ। ইহাতে "কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" প্রদত্ত হইয়াছে। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড্‌পণ্ডিত ছিলেন। পরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাহার নিবাস ছিল উড়িষ্যা প্রদেশে। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের জন্য অনেকগুলি পুস্তক লিখেন। ইহার ভাষা প্রথমে পারস্য শব্দবহুল ছিল। "রাজাবলী" হইতে তাহার নমুনা উদ্ধৃত করা গেল।

"মহারাজ দুর্ল্লভ রায় ও জাফরালী খাঁ প্রভৃতি সরদারদের সলাতে নবাবী সকল সৈন্যেরা দাদনির উজর করিল। ইহাতে নবাব সিরাজদ্দৌলা মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতিকে হুকুম দিলেন যে আমার বেগমদের নাকের নথ পর্য্যন্ত যত ধন আছে সে সকল ধন লইয়া যে যে সরদারেরা আপন আপন বিরাদারিদের দরমাহি যত বাকী বলে তাহাদিগকে তাহাই দেও, হিসাবের অপেক্ষা করিও না, পশ্চাৎ হিসাব হইবে, এইরূপে আজি দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সকল ফৌজদের বেবাক দাদনি

করিয়া সকল সর্দ্দারদিগকে হুকুম দেও যে চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে যেন সকলে আপন আপন বিরাদারি সমেত আসিয়া উপস্থিত হয়।"

এই গ্রন্থ ১৮০৮ অব্দে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে "লন্দন নগরে ছাপা" হইয়াছিল। কোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃতজ্ঞ হেড্ পণ্ডিতের এই রচনা তখন তেমন আদর লাভ না করায় তিনি তাহার বিদ্যাবত্তা দেখাইবার জন্য "প্রবোধ চন্দ্রিকা" গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই উৎকট সাধুভাষায় রচিত গ্রন্থ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর পর ১৮৩৩ অব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত হইয়াছিল তাহার নমুনা এইরূপ—

"কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছিকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

৩৩। "শব্দসিন্ধু"—পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত, ইহা সংস্কৃত অমরকোষের বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থের প্রচ্ছদ পত্রে লিখিত হইয়াছে—"ভগবান অমরসিংহ কৃত অভিধান—অকারাদি ক্রমে ভাষায় বিবরণ করিয়া শব্দসিন্ধু নাম রাখিয়া কলিকাতায় ছাপা হইল।" ১৮০৯ অব্দে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকারের নিবাস বালী উত্তরপাড়া। বড় বড় অক্ষরে ৪৮৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত।

৩৪। বাঙ্গলা অভিধান—রচয়িতার নাম নাই। হিন্দুস্থানী প্রেসে ১৮০৯ অব্দে মুদ্রিত। ইহাতে ৩৬০০ সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ আছে; ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

৩৬। সদর দেওয়ানি নিষ্পত্তি—আইন পুস্তক। ১৮১০ সনে মুদ্রিত।

৩৭। সতী সহমরণ সংবাদ—রামমোহন রায় প্রণীত। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বাদ প্রতিবাদ প্রবন্ধ ১৮১০ অব্দে মুদ্রিত। ভাষার নমুনা এইরূপ :—

"এ সকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে এবং এ সকল বচনের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক সহমরণ ও অনুমরণ করে তবে তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গভোগ হয় কিন্তু বিধবা ধর্ম্মে মনু প্রভৃতি যাহা কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর।"

৩৮। পুরুষ পরীক্ষা—বিদ্যাপতি প্রণীত সংস্কৃত পুরুষ-পরীক্ষা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ—একখানা হিতোপদেশ পূর্ণ গল্পগ্রন্থ। কোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের জন্য হরপ্রসাদ রায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার ভাষা সে কালের হিসাবে প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। রচনার নমুনা উদ্ধৃত করা গেল :—

"জয়ন্তী নগরীতে ধীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ যোগ্যতাতে ধন উপার্জ্জন করিয়া নির্ভীক ও বহুপুত্রযুক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করেন। এক রাত্রিতে রাজা খট্টাতে শয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে কোন স্ত্রীর রোদনের শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া ঐ শব্দানুসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে নগর প্রান্তে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নব যুবতী নানাভরণ ভূষিতা আর উত্তম বস্ত্র পরিধানা এমন এক স্ত্রীকে দেখিলেন।" ১৮১৪ অব্দে Day & Co এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মূল্য এক টাকা—পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৬। বিশপ টার্ণারের অনুরোধে মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ১৮৩০ অব্দে এই পুস্তকের একখানা ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

৩৯। "Carey's Dictionary" অর্থাৎ কেরি সাহেবের অভিধান। ইহা একখানা বিরাট কোষ-গ্রন্থ। ইহার সঙ্কলনে কেরি সাহেবের ত্রিশ বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮১৫ অব্দে তিনি এই ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। গ্রন্থ সুবৃহৎ চারি খণ্ডে সমাপ্ত, শব্দসংখ্যা প্রায় আশি হাজার। কেরি অনেক শব্দ নিজে প্রস্তুত করিয়াও ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য একশত কুড়ি টাকা। ১৮২৭ অব্দে মার্সম্যান সাহেব কেরির এই অভিধানের একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন।

৪০। ইতিহাসমালা—ইহা একখানা গল্প গ্রন্থ। সে কালে গল্পকেই সাধারণত ইতিহাস বলিত। কেরি সাহেব এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহাতে ১৫০টী ক্ষুদ্র গল্প আছে—১৮১২ সালে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বলিতে গেলে মহাত্মা কেরিই নানা উপায়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের জীবন দান করিয়াছিলেন। ইতিহাসমালা অনুবাদ গ্রন্থ নহে। কেরি বাঙ্গালীর ঠাকুরমার কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস

মালা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনার আদর্শ। নিম্নে একটী গল্প নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করা গেল।

"এক কৃষক লাঙ্গল চসিতে গিয়া কোন খালে গোটা চব্বিশেক মৎস্য ধরিয়া গৃহে আসিয়া আপন গৃহিণীকে পাক করিতে দিয়া আপনি পুনর্ব্বার চসিতে গেল। তাহার গৃহিণী সে মৎস্য কয়টী পাক করিয়া মনে বিবেচনা করিল যে মৎস্য পাক করিলাম কিন্তু কি প্রকার হইয়াছে চাখিয়া দেখি ইহা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ঝোল লইয়া খাইয়া দেখিল যে ঝোল সুরস হইয়াছে। পরে পুনর্ব্বার মনে ভাবিল মৎস্য কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিয়া দেখি, ইহা ভাবিয়া একটী মৎস্য খাইল। পুনর্ব্বার চিন্তা করিল ওটি কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিতে হয় ভাবিয়া সেটিও খাইল এইরূপে খাইতে খাইতে একটী মাত্র অবশিষ্ট রাখিল। পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটী আইলে তাহার গৃহিণী সেই মৎস্যটী আর অন্ন তাহাকে দিলে কৃষক কহিল যে, এ কি? চব্বিশটী মৎস্য আনিয়াছি, আর কি হইল। তখন তাহার স্ত্রী মৎস্যের হিসাব দিল।

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা,
চিলে নিল দুই গণ্ডা,
বাকী রহিল ষোল।
তাহা ধুইতে আটটী জলে পলাইল॥
তবে থাকিল আট।
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাঠ॥
তবে থাকিল ছয়।
প্রতিবাসীকে চারিটা দিতে হয়॥
তবে থাকিল দুই।
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুঁই॥
তবে থাকিল এক।
অই পাত পানে চাহিয়া দেখ॥
এখন হইস যদি মিনুসের পো।
তবে কাটা খান খাইয়া মাছখানা থো॥
আমি যেঁই মেয়ে
তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে॥

এইরূপে মৎস্যের হিসাবে কৃষকের প্রত্যয় জন্মাইল।"

৪১—বেদান্ত গ্রন্থ—রামমোহন রায় অনুদিত ও ১৭৩৭ শকাব্দে বা ১৮১৫ অব্দে মুদ্রিত। গ্রন্থের ভাষার নমুনা স্বরূপ ভূমিকার এক অংশ উদ্ধৃত হইল।

"বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্ম বাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে প্রতিপন্ন কর তবে সংস্কৃত শব্দে যে সকল শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্থৈর্য্য কোন মতে থাকে না যেহেতু ব্যুৎপত্তি বলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী দুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য অন্য বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া কোন শাস্ত্রের কি প্রকার তাৎপর্য্য তাহার নিশ্চয় হইতে পারে না।"

৪২—৪৩—তলবকার উপনিষৎ ও ঈশোপণিষৎ এই দুই খানা উপনিষদের বঙ্গানুবাদ ও রামমোহন রায়ের কৃত। ১৭৩৮ শকাব্দে বা ১৮১৬ অব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল।

৪৪—"শ্রীবিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা" গ্রন্থকার পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এই গ্রন্থ ১৮১৬ অব্দে বিলাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থের প্রচ্ছদ পত্রে লেখা ছিল—

শ্রী
বিক্রমাদিত্যের
বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ
বাঙ্গালা ভাষাতে
শ্রী
মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণ রচিত
লণ্ডন মহানগরে চাপা হইল
১৮১৬

৪৫—"লিপি ধারা"—ব র ক ধ ঝ এইরূপ অক্ষরের আকৃতি অনুসারে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের অক্ষর গুলি এক এক স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮১৬ অব্দে মুদ্রিত—১২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা।

৪৬—"জ্যোতিঃ সংগ্রহ"—রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাগীশ প্রণীত। ইহাই বাঙ্গালা প্রথম জ্যোতিষ গ্রন্থ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিবাস পালপাড়া। ১৮১৬ অব্দে মুদ্রিত। ভাষা সরল,—যথা—

"জন্ম মাসে পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু কন্যার বিবাহ প্রসস্ত হয়। আর অগ্রহায়ণ মাসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরও জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। ইহাতে বিশেষ জ্যৈষ্ঠ মাসেতেও প্রথম দশ দিন পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়।"

৪৭—ব্যাকরণ— গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রণীত— ১৮১৬ অব্দে মুদ্রিত হয়। ইহাই বাঙ্গালীর কৃত প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ।

৪৮—"বেঙ্গল গেজেট" গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, বাঙ্গলার প্রথম সাময়িক পত্র। লং সাহেব তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থ তালিকায় বেঙ্গল গেজেটকে সংবাদ পত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাহা সংবাদ পত্র ছিল না। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত এবং ইহাতে সম্পাদকের লিখিত "বিদ্যাসুন্দর, বেতাল পঁচিশ প্রভৃতি কাব্য সকল প্রতিকৃতি সহ মুদ্রিত হইত।" বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইহাই আদিম পথ প্রদর্শক। ১৮১৬ অব্দে বেঙ্গল গেজেট বাহির হয়। এবং বৎসর কাল মধ্যেই লীলা সম্বরণ করে।

৪৯—"জমিদারী হিসাব"—স্মিথ সাহেব প্রণীত। ইহা জমিদারী সংক্রান্ত হিসাব পত্র শিক্ষার পুস্তক, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ; ১৮১৭ অব্দে মুদ্রিত।

৫০—Lowson's Singhur Bibaran অর্থাৎ লাউসেন কৃত সিংহের বিবরণ। ১৮১৭ অব্দে মুদ্রিত।

৫১—জীব জন্তুর বিবরণ বা Natural History. অনুবাদ গ্রন্থ, ৪ ভাগে সম্পূর্ণ। ১৮১৭ অব্দে মুদ্রিত।

৫২—ধারাপাত (Arithmetical Table). ১৮১৭ অব্দে চুঁচুড়ার মে সাহেব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষার্থ ছাত্রদিগের জন্য বিলাতের উন্নত প্রণালীর সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া এই ধারাপাত প্রকাশ করেন।

৫৩—"সঙ্গীত পুস্তক"—ইহাই বাঙ্গালার প্রথম সঙ্গীত পুস্তক ১৮১৭ সনে মুদ্রিত।

৫৪—"ধাতু শব্দজ"—শ্রীরামপুর ভার্নিকুলার স্কুল বুক সোসাইটী কর্ত্তৃক ১৮১৭ অব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ধাতুকে কিরূপে শব্দে পরিণত করিতে হয় এই অভিধান খানায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় দশ হাজার শব্দ আছে।

৫৫—চানক্য শ্লোক—১০৮টী নীতি পূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ—১৮১৭ অব্দে মুদ্রিত হয়। ১৮৪০ অব্দে দিগম্বর রায় ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন, অতঃপর গ্রীক ও লাটীন ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

৫৬—"শিশুবোধক"—প্রথম শিক্ষার্থী বালকদিগের জন্য এই পুস্তক খানা ১৮১৭ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহাতে ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের নিকট পত্র লিখিবার ধারা পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। সে পত্রের ভাষা কিরূপ পাঠক তাহা পাঠ করুন।

স্ত্রীর পত্র—

"শিরোনামা—ঐহিক-পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদ পল্লবাশ্রয় প্রদানেষু।

"শ্রীচরণ সরসী দিবা নিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতী মঞ্জুরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদন ঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদ সরোরুহ স্মরণ মাত্র অত্র শুভবিশেষ। পরং মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কাল যাপন করিতেছেন। যে কালে এ দাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয় কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুই কালের সুখকর বিবেচনা করিবেন।

অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণ যুগলে স্থানং প্রদানং করু নিবেদন মিতি—

স্বামীর উত্তর—

"শিরোনামা—প্রাণাধিকা স্বধর্ম্মপ্রতিপালিকা শ্রীমতী মালতী মঞ্জুরী দেবী সাবিত্রী ধর্ম্মাশ্রিতেষু।

"পরম প্রণয়ার্ণব গভীরনীরতীরনিবসিত কলেবরাঙ্গ সম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেব শর্ম্মণঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকর কমলাঙ্কিত কমল পত্রী পঠিত মাত্র অত্র শুভ-

দ্বিশেষ। বহু দিবসাবধি প্রত্যাবধি নিরবধি প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ম্মক্লাস ব্যতিরিক্ত উত্তক্তান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছি। অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্ব্বদা একতাপূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুখোদ্ভব মুখারবিন্দ যথা যোগ্য মধুকরের ন্যায় মধুমাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রয়াস মীমাংসা প্রণেতা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্ব্বক কাল যাপন কর্ত্তব্য, বিত্তোপার্জ্জন তদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃক দুঃখিতা এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আপনামিতি।"

৫৮—শান্তিশতক—১৮১৭ অব্দে মুদ্রিত।

৫৯—গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ধারাতে সৃষ্ট্যাদির বিবরণ। ১৮১৭ অব্দে মালদহের নীলকর এলার্টন তাহার স্থাপিত বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি তাহার স্কুলের জন্য আরও অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত না হওয়ায় উল্লেখ করা গেল না।

১৮১৭ অব্দে আরও কতকগুলি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ সকল গ্রন্থের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই। প্রায় সকল গুলিই সংস্কৃতের অনুবাদ। নিম্নে পুস্তক গুলির নাম প্রদত্ত হইল।

৬০—শাস্ত্র পদ্ধতি। ৬১—রতিবিলাশ। ৬২—সম্ভোগ রত্নাকর। ৬৩—রমণীরঞ্জন। ৬৪—রসমঞ্জরী। ৬৫—রসসাগর। ৬৬—রসরসামৃত। ৬৭—রসতরঙ্গিনী। ৬৮—রসেন্দু-প্রেম-বিলাস ও ৬৯—রতিকেলি।

৭০—স্ত্রী শিক্ষা পুস্তক—গৌরমোহন কৃত। ইহাই বাঙ্গলার স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক প্রথম পুস্তক। ১৮১৮ অব্দে মুদ্রিত হয়।

৭১—নীতিকথা (প্রথম ভাগ) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক বিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য ইংরেজী ও আরবী ভাষা হইতে সংগৃহীত। T. C. Mitra নামক একব্যক্তি রাজা বাহাদুরকে ইহার অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করেন। ১৮১৮ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা এই পুস্তক প্রকাশ করেন। মূল্য এক আনা মাত্র।

৭২—"Vocabulary of the Bengalee Language" বা বাঙ্গালা শব্দাবলী রামচন্দ্র নামক কোন একব্যক্তির সংগৃহীত অভিধান পুস্তক; ১৮১৮ অব্দে মুদ্রিত।

৭৩—"Pearson's Tables" ১৮১৮ অব্দে মুদ্রিত।

৭৪—নীতিবাক্য ১ম ও ২য় খণ্ড। ১৮১৮ অব্দে শ্রীরামপুরের মিসনারিগণ তাহাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল সমূহের ছাত্রদিগের পাঠের জন্য বাইবেল হইতে কয়েকটী উপদেশ লইয়া এই পুস্তক প্রকাশ করেন।

৭৫—"বানান শিক্ষা" ষ্টুয়ার্ট সাহেব কৃত; মূল্য ছয় আনা। ১৮১৮ অব্দে মুদ্রিত হয়।

৭৬—বিদ্যাহারাবলী-কেরিসাহেব কৃত চিত্র সম্বলিত কোষ গ্রন্থ। ইংরেজী এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা হইতে এনাটমির বঙ্গানুবাদ করিয়া রেঃ কেরি এই গ্রন্থের শরীর ব্যবচ্ছেদ নামক ১ম খণ্ড ১৮১৮ অব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। অতঃপর ১৮২০ অব্দে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। মূল্য ছয় টাকা, পত্র সংখ্যা ৬৩৮।

৭৭—কলেরা চিকিৎসা ১৮১৬ অব্দে এদেশে কলেরা রোগ দেখা দেয়। ঐ রোগের চিকিৎসার জন্য ডাঃ রবিনসন ১৮১৮ সালে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করেন।

৭৮—বাঙ্গালা পত্রিকা—শ্রীরামপুর হইতে রামহরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাই প্রথম মুদ্রিত পত্রিকা। ১৮১৮ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

৭৯—মনোরঞ্জন ইতিহাস তারাচাঁদ দত্ত প্রণীত, বালকদিগের পাঠ্য পুস্তক। ১৮১৮ অব্দে ১ম সংস্করণে দুই হাজার পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল।

৮০—অস্থিবিদ্যা—কেরি সাহেবের সংগৃহীত অস্থিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ, ১৮১৮ অব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮১—ধর্ম্মগ্রন্থের চুম্বক—১৮১৮ সনে শ্রীরামপুর মিসনারিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৮২—"বর্ণমালা ও ব্যাকরণ" ১৮১৮ অব্দে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থ এই ব্যাকরণ খানি প্রণয়ন করেন।

৮৩—"দিগদর্শন" মাসিক পত্রিকা ১৮১৮ অব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর হইতে মিসনারিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা ২৬ মাসে ২৬ সংখ্যা মাত্র বাহির হইয়াছিল এবং ঐ ২৬ সংখ্যায় মোট ১০৬৭৬ খানা পত্রিকা মুদ্রিত হইয়াছিল।

প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা বেঙ্গল গেজেট অম-

গ্রহণ করিয়া কালকবলিত হইলে এক বৎসর কাল বাঙ্গলা ভাষায় আর কোন সাময়িক পত্রিকা বাহির হয় নাই। অতঃপর "দিগ্দর্শন" বাহির হয়। দিগ্দর্শনের সময় হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাঙ্গালায় বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকা চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং আমরা বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকার অবিচ্ছিন্ন যুগ-আরম্ভ কাল পর্য্যন্তের বাঙ্গলা মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইহার পর বাঙ্গলা সাহিত্য দিনে দিনে উন্নতির সোপান হইতে সোপানে আরোহন করিতেছিল ইহা বলাই বাহুল্য। *

তুমিই।

সাবাই যদি আপ্না লয়ে থাকে
　　তুমি তবু তোমায় নিয়ে থেকনা,
তোমায় যদি কেউনা কাছে ডাকে
　　তুমিই কেন সবায় কাছে ডাকনা।
সবাই যদি এড়ায় দুরে দুরে
তুমিই তবে বেড়াও কাছে ঘুরে,
তোমায় যদি কেউনা টানে বুকে
　　তুমিই কেন সবায় বুকে রাখনা!
তোমার ঘরে কেউনা আসে যদি
　　তুমিই ফেরো সবার ঘরে ঘরে গো,
তোমায় যদি হেসে সবাই ঠেলে
　　তুমিই কেঁদে মর সবার তরে গো!
তোমার ঘরে কেউনা দিলে আলো,
সবার ঘরে তুমিই আলো আলো,
তোমার আঁখি কেউনা মুছায় যদি
　　তুমিই নিও সবার অশ্রু হরেগো!

শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী।

ফলিত জ্যোতিষে যবন প্রভাব।

স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত এই ফলিত জ্যোতিষের মধ্যে অধুনা যে সব তাজিক গ্রন্থ দৃষ্ট হয় তাহা প্রণিধান যোগ্য। এই সমস্ত তাজিক গ্রন্থের আলোচনায় ফলিত জ্যোতিষে যবন সুধী বৃন্দেরা কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহাও অনুসন্ধেয়। আমি পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতদিগকে বারাণসী প্রভৃতি স্থানে এই সমস্ত তাজিক গ্রন্থের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা সম্পন্ন ও বিশ্বাসী দেখিয়াছি। এমন কি ঋষি প্রণীত জ্যোতিষ অপেক্ষাও এ সব যবন গ্রন্থ মূলক তাজিক গ্রন্থের "ইথশাল", "ইস্রাপ্", "দুফানি কুথ" প্রভৃতি শ্রুতি-কর্কশ শব্দাবলী সম্বলিত জটিল গণনা প্রণালীর পঠন পাঠনের বহুল প্রচলন দেখিয়াছি।

এখানেই একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে—যাহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে "ন বদেদ্ যাবনীং ভাষাং প্রাণকণ্ঠগতৈরপি" অর্থাৎ প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও যাবনিক ভাষা উচ্চারণ করিবেনা" এরূপ বিধান রহিয়াছে এবং সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত না থাকায় ধর্ম্মের গোড়ামী পূর্ণ মাত্রায় ছিল, তখন কেমন করিয়া যবন প্রণীত গ্রন্থের ম্লেচ্ছ ভাষা হইতে তাহা সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইল?

এই প্রশ্নটা যে সেই প্রাচীন যুগেও উঠিয়াছিল তাহা "হায়ন রত্ন" পাঠে অবগত হওয়া যায়। উক্ত হায়ন রত্নে উক্ত প্রশ্নের যেরূপ মীমাংসা হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তথাচ গর্গ :—

ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতং।
ঋষিবত্তেপি পূজ্যন্তে কিংপুন র্দৈববিদ্দ্বিজঃ॥

অর্থ—গর্গ বলিয়াছেন যবনগণ ম্লেচ্ছ হইলেও

---

* যে সকল পুস্তকের ভাষার নমুনা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার প্রায় অধিকাংশ পুস্তকই আমরা দেখিবার সুবিধা পাইয়াছি। অন্যান্য পুস্তকের তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। Descriptive Catalague of Bengali Books by Rev. J. Long, Calcutta Review, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ও সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত তালিকা, বাঙ্গালা ভাষার লেখক, Report of the Gl, Committee of Public Instruction of the Presidency of Fort William in Bengal (1838-39). বিশ্বকোষ প্রভৃতি।

তাহাদের দ্বারা শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত আছে তাঁহারাও ঋষিবৎ পূজিত হইয়াছেন সুতরাং ব্রাহ্মণ বংশজাত দৈববিৎ যে খুব পূজিত হইবেন-তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যাহারা ব্রাহ্মণদিগকে স্বার্থপর প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া প্রতি ধর্ম্মকর্ম্মে "ব্রাহ্মণায় নমঃ" দেখিয়া চটিয়া যান তাহারা এস্থলে মস্তক অবনত করিবেন সন্দেহ নাই। যাহারা "প্রানান্তেও যবন ভাষা উচ্চারণ করিবে না" এই নিষেধ বাক্য উপেক্ষ করিয়া গোঁড়ামীর দিনেও যবন গ্রন্থ হইতে অমূল্য রত্ন আহরণ করিয়া শাস্ত্রকে ভূষিত করিয়াছেন, "তেষু শাস্ত্র মিদং স্থিতং, ঋষিবত্তেপি পূজ্যন্তে" বলিয়া ম্লেচ্ছদিগকে ঋষিদিগের সহিত একাসনে পূজা দিয়াছেন তাহারা স্বার্থপর, গুণগ্রাহী নয় এ কথা আধুনিক ব্রাহ্মণ বিদ্বেষিগণ কেমন করিয়া রসনাগ্রে আনয়ন করেন জানিনা।

যাহা হউক 'হায়ণ রত্নে' এ সমস্ত আলোচনা করিয়া পরে বলিয়াছেন "তেন যবন জ্যোতিগ্রন্থানামধ্যয়নে দ্বিজানাং ন দোষঃ।

অর্থ—সুতরাং যবন জ্যোতিগ্রন্থ অধ্যয়নে ব্রাহ্মণের দোষ নাই।

নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা তাহা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

যেমন পঙ্কোদ্ভব পদ্মগ্রহণে পঙ্কশঙ্কা পরিত্যাগ করিতে হয়, সর্পের মস্তকস্থিত মণিগ্রহণেও দোষ থাকিতে পারে না সেইরূপ ব্রহ্মদ্বেষী তুরস্কদেশীয় পণ্ডিতদিগের প্রণীত শাস্ত্র পাঠেও দোষ নাই। (১)

তারপর প্রশ্ন উঠিয়াছিল যদি ম্লেচ্ছ প্রণীত শাস্ত্রপাঠে দোষ না থাকে তবে "নবদেদ্‌যাবনীং ভাষাং" এই শাস্ত্র-বাক্যের মর্য্যাদা থাকে কোথায়? ইহার প্রত্যুত্তরে উক্ত হায়ণরত্নে বলা হইয়াছে—

"নবদেৎ" ইত্যাদি নিষেধ বাক্য যবন ভাষায় গ্রথিত কাব্যালঙ্করাদি বিষয়ে প্রযুজ্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দদ্বারা উপনিবদ্ধ জ্যোতিঃশাস্ত্র যবন ভাষা মূলক হইলেও তাহা পাঠে দোষ নাই। (২)

কেবল যে যুক্তিতর্ক দ্বারা তাজিকগ্রন্থের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইয়াছেন এমন নয় ইহার মাহাত্ম্যও বিশেষরূপে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। জীর্ণতাজিকে লিখিত হইয়াছে—সত্যযুগে ব্রহ্মা প্রণীত, ত্রেতায় বাদরায়নি প্রণীত দ্বাপরে গর্গ প্রণীত এবং কলিযুগে ম্লেচ্ছ প্রণীত, তাজিকগ্রন্থই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া গ্রাহ্য। (৩)

যাহা হউক আমাদের দেশে সাধারণতঃ তাজিক গ্রন্থাদি সাধারণ জ্যোতিষীগণ তেমন আগ্রহসহকারে পঠনপাঠনাদি করেন না; বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে তাজিকগ্রন্থের আলোচনা খুবই কম। তাজিকগ্রন্থের গণনাপ্রণালীর জটিলতা বিশেষতঃ গণিতাংশের একান্ত কাঠিন্য এদেশের জ্যোতিষীগণের তাজিকগ্রন্থাদি আলোচনা না করার অন্যতম কারণ।

"বর্ষপ্রবেশ" নামক ব্যাপারটী সম্পূর্ণ এই তাজিক-গ্রন্থমূলক। আমাদের দেশে কোষ্ঠী-ঠিকুজীর যেমন বহুল প্রচলন, বর্ষপ্রবেশের তেমন বহুল প্রচলন নাই। পাঠকদিগের মধ্যে অনেকে বর্ষপ্রবেশ ব্যাপারটী হয়ত ধারণা করিতে পারিবেন না, এজন্য একটু বিস্তারিত বুঝান যাইতেছে।

কোষ্ঠী-ঠিকুজীতে যেমন জন্ম সময়ানুসারে লগ্নাদি স্থিরীকৃত হইয়া জাতকের সমগ্র জীবনের ফলাফল সূচিত হয়, ইহা সেরূপ নয়। ইহা মাত্র এক বৎসরের ফলাফল সূচনা করে। প্রতি নূতন বর্ষের প্রারম্ভ মুহূর্ত্তের লগ্নাদি অনুসারে ইহার ফলাফল গণিত হয়, যে মুহূর্ত্তে সেই বর্ষ আরম্ভ হয় সেই মুহূর্ত্তই ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহার নাম বর্ষপ্রবেশ। অর্থাৎ সেই সময়ই ইহার বর্ষ প্রবিষ্ট হয়। মনেকরুন যাহার বয়স এখন দশ বৎসর তাহার আগামী বর্ষের জন্য বর্ষপ্রবেশ করিতে হইলে

---

(১) যস্মাদ্ বৎসদসৎ কলং নিগদিতং সত্যং হিকিং পঙ্কজে
শঙ্কা পঙ্কভবা তথা কনি কনোৎপন্না মনৌ কিং দূষনং?
ব্রহ্ম দ্বেষি তুরস্ক সম্ভবমিদং তা জীয়িকং বর্ত্ততে।
শাস্ত্রং যত্তাপি সদ্দ্বিজৈ তথা পাঠেতু নহিং ভবেৎ॥

(২) নবদেদ্ যাবনীং ভাষাং প্রাণকণ্ঠ গতৈরপি ইতিতু যাবনীয় কাব্যালঙ্করাদি বিষয়কমিতি সিদ্ধান্তঃ। সংস্কৃত শব্দৈরুপনিবদ্ধং জ্যোতিঃ শাস্ত্রকেৎ পঠ্যতে তদা ন কোঽপি দোষঃ॥

(৩) কৃতে পৈতামহং শাস্ত্রং ত্রেতায়াং বাদরায়নিঃ।
গার্গীয়ং দ্বাপরে প্রোক্তং কলৌ তাজীয়িকং স্মৃতং॥

দশবৎসর শেষ হইয়া যে মুহূর্ত্তে একাদশ বর্ষ প্রবৃত্ত হইবে সেই মুহূর্ত্ত অবলম্বনে লগ্নাদি স্থিরপূর্ব্বক বর্ষপ্রবেশ অর্থাৎ এক বৎসরের শুভাশুভ স্থিরীকৃত হইবে।

যাহাহউক এই বর্ষপ্রবেশের প্রবর্ত্তক যবন সুধীবৃন্দ। তাঁহারাই এই জটিল গণনা সম্বলিত একান্ত দুরূহ গণিত সাপেক্ষ এই সূক্ষ্ম গণনাপ্রণালী আবিষ্কার ও প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

এই তাজিকগ্রন্থের গণনাপ্রণালী অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, কোন কোন অংশ ঋষি প্রণীত জ্যোতিষের সহিত বেশ মিলে, অধিকাংশ অংশই বিভিন্ন প্রকার, তাহা মিলে না। ঋষি প্রণীত গণনাপ্রণালী অপেক্ষা ইহার গণিতাংশ বেশী দুরূহ। বলাবাহুল্য যে ঐ গণনাপ্রণালী যবন গ্রন্থ হইতে ভাষান্তরিত হইয়া সংস্কৃতে প্রচারিত হইয়াছে। সাধারণতঃ নীলকণ্ঠী তাজক ও হায়নরত্ন নামক এই দুই গ্রন্থ অনুসারে বর্ষপ্রবেশ করা হয়। ইহা পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছেন। হায়নরত্নে উক্ত হইয়াছে—

যবনাচার্য্য প্রণীত পারস্য ভাষায় গ্রথিত জ্যোতিঃশাস্ত্রের একাংশ যাহা বার্ষিকাদি নানাবিধ ফলাদেশ সংযুক্ত তাহাই তাজিক নামে অভিহিত। তাহার পরবর্ত্তী সময়ে প্রাদুর্ভূত ব্রাহ্মণ ও ব্যাকরণজ্ঞ সমরসিংহ প্রভৃতি সেই তাজিকগ্রন্থ সংস্কৃত শব্দে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও তাজিক নামেই অভিহিত হইবে। এজন্যই তাঁহারা "ইক্কবাল" প্রভৃতি পারস্য উহাতে প্রবেশ করাইয়াছেন। (১)

উপরিউক্ত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে সমরসিংহ নামক কোন মহাত্মাই সর্ব্বপ্রথম এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তিনিই প্রথমে পারস্য ভাষা আয়ত্ত করিয়া উহা ভাষান্তরিত করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। এই মহাত্মা এই দুরূহ কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের কতখানি উপকার করিয়াছেন এবং কি বলিয়া ইহার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহার ভাষা খুজিয়া পাই না।

তাজিকগ্রন্থের প্রবর্ত্তকগণের নাম আলোচনায় হায়ণরত্নে লিখিত হইয়াছে। "খত্তখুত্ত, রোমক, হিল্লাজ, ধিষণ, দুর্ঘ্যাচার্য্য, ইহারা তাজিক শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। (ক) আবার রোমক সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে যে—ব্রহ্ম সূর্য্যকে এবং সূর্য্য যবনকে যাহা বলিয়াছিলেন, যবনাচার্য্য তাহাই তাজিক নামে প্রকাশ করিয়াছেন। (খ) পাঠক লক্ষ রাখিবেন ঋষিপ্রবর্ত্তিত জ্যোতিষজাতক নামে ও যবন প্রণীত জ্যোতিষ তাজিক নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। আঠার জন জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রবর্ত্তকের নাম যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেও যবনাচার্য্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। (গ)

যদিও মুসলমান প্রণীত গ্রন্থ হইতে ভাষান্তরিত করিয়া সংস্কৃতে হায়নরত্ন নীলকণ্ঠী তাজক প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছে তথাপি ইহার মধ্যে বহুল যাবনিক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ইক্কবাল, ইন্দুবার, ইত্থশাল, সহম, হদ্দা প্রভৃতি বহু যাবনিক শব্দ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই সমস্ত ইত্থশালাদি যোগাবলী অত্যন্ত জটিল হইলেও প্রশ্নগণনাদি অনেক কাজে পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার ব্যবহার খুব বেশী করেন। ইহাতে তাজিকের পঠনপাঠন ও গবেষণা খুব বেশী হইয়াছে। উক্ত প্রদেশে যাহারা ২।১ খানা জ্যোতিষের বই পড়েন তাহারাও উক্ত তাজিক গ্রন্থ আগ্রহসহকারে অনুশীলন করেন; ইহাতে উহা বেশী ফলপ্রদ মনে করিলে অন্যায় হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এসমস্ত তাজিক গ্রন্থে গণিতের এত আধিক্য ও এত জটিলতা

---

(১) যবনাচার্য্যেন পারস্য ভাষয়া প্রণীত জ্যোতিঃশাস্ত্রৈক দেশ রূপং বার্ষিকাদি নানাবিধ ফলাদেশ ফলকং শাস্ত্রং তাজিক শব্দ বাচ্যং। তদনন্তর সম্ভূতৈঃ সমরসিংহাদিভির্ব্বধীত ব্যাকরণৈ ব্রাহ্মণৈস্তদেব শাস্ত্রং সংস্কৃতোপ নিবদ্ধং তদপি তাজিক শব্দ বাচ্যমেব। অতএবৈস্তৈস্তাএব ইক্কবালাদয়ো যাবন্যঃ সংজ্ঞা উপনিবদ্ধাঃ।

(ক) খত্তখুত্তো রোমকশ্চ হিল্লাজো ধিষনাহ্বয়ঃ।
দুর্ঘ্যাচার্য্য ইত্যেতে তাজিকস্য প্রবর্ত্তকাঃ॥

(খ) ব্রাহ্মণাগদিতং ভানো ভাস্বনা যবনায়যৎ।
যবনেনচ যৎ প্রোক্তং তাজিকং তৎ প্রকাশিতং॥

(গ) সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্ঠোঽত্রি পরাশরঃ। কশ্যপো নারদো গর্গ মরীচির্ম্মনুরঙ্গিরাঃ। লোমশঃ পৌলিশশ্চৈব ভার্গবো যবনোগুরুঃ শৌনকোঽষ্টাদশশ্চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রবর্ত্তকাঃ॥

আছে যে মস্তক বিঘূর্ণিত হয়। ইহাতে সেই সুধীবৃন্দের পাণ্ডিত্য ও তাহাদের গণনা প্রণালীর অভিনবত্ব দেখিয়া শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়।

অনেকের ধারণা যে কেবল হিন্দুরাই বেশী অদৃষ্টবাদী; তাহারাই নিয়ত কোষ্ঠীঠিকুজী বেশী ব্যবহার করে, বস্তুতঃ তাহা নহে। এ সমস্ত গ্রন্থের আলোচনায় অবগত হওয়া যায় যে মুসলমান সম্রাট এবং নবাব প্রভৃতিরও স্থায়ী গণক ছিল, গণকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অধিকাংশ কাজ করা হইত। মৃগয়া প্রভৃতির গণনা পর্য্যন্ত ফলিত জ্যোতিষে স্থান পাইয়াছে। ফলিত জ্যোতিষের গণনার প্রকার কত রকম এবং তাহা তাৎকালিক সামাজিক ভাবের কিরূপ সাক্ষ্যপ্রদান করে তাহা বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

আমরা ফলিত জ্যোতিষে যবন প্রভাব আলোচনা করিতে যাইয়া আর একটী বিষয়ও লক্ষ্য করিতে পারি। পূর্ব্বে হিন্দুয়ানীর গোড়ামির মধ্যেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নির্ভীক ভাবে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষায় পরাঙ্মুখ হইতেন না; শাস্ত্রবাক্যের অর্থান্তর করিয়া দেশ-কালোপযোগী করিতে প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু আধুনিক সময়ে সেরূপ নির্ভীক সত্যপ্রচারক যদি শাস্ত্র বাক্যের অনুস্বার বিসর্গের অর্থান্তর করিয়া দেশকালোপযোগী করিতে যান, তবে তিনি কিরূপ বিড়ম্বিত হইবেন তাহা অনেক স্থানে প্রমাণিত হইয়াছে।

কোন কোন গ্রন্থকার যবনাচার্য্যকে শাপভ্রষ্ঠ মহাঋষি বলিয়া তাঁহার যাবনিক অপবাদ ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন তিনি পূর্ব্বজন্মে মহাঋষি ছিলেন পরে কোন কারণে শাপগ্রস্ত হইয়া যবনকুলে জন্মগ্রহণ করতঃ পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ এই জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যাহা হউক প্রায় প্রত্যেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সম্বন্ধেই এইরূপ জন্মান্তর রহস্যের বর্ণনা দুর্লভ নহে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন, জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

আলোচনা।

'বিশুদ্ধ ভাষা' বনাম 'প্রাদেশিক ভাষা'

আষাঢ় মাসের বিক্রমপুর পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্., এ, বার-এট্-ল মহোদয়ের "বিশুদ্ধ ভাষা বনাম প্রাদেশিক ভাষা" শীর্ষক দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয় তাহাতে নির্ব্বন্ধতা সহকারে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে দক্ষিণ পশ্চিম দেশের মৌখিক ভাষাই সাহিত্যে প্রচলন করা কর্ত্তব্য। তিনি না কি এবিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু কেহই সাধু ভাষার পক্ষ হইতে আজ পর্য্যন্ত যুক্তি তর্কের সাহায্যে সেই সকল প্রবন্ধের বিচার করাটা আবশ্যক বোধ করেন নাই বরং অনেকে তাঁহার প্রতি অসাধু ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন—এজন্য চৌধুরী মহাশয় আক্ষেপ করিয়াছেন।

বিক্রমপুর পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এবিষয়ে ভাষাতত্ত্বানুশীলনকারীদিগকে মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

প্রথমে চৌধুরী মহাশয়ের অভিযোগটারই সমালোচনা করা যাউক। যদি সত্য সত্যই কেহ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি অসাধু ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তদ্রূপ লেখকের সহিত কাহারই সহানুভূতি থাকিতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিকই কি কেহ সেরূপ অসাধু ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন? প্রধান প্রধান যতগুলি মাসিক পত্রিকা আছে তাহার একখানাতেও ত সেরূপ দেখি নাই। তবে একবার "সৌরভে" এবং আর একবার "ভারতীতে" প্রমথ বাবুর লেখার কিছু সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ইতিহাস এইরূপ। ভারতীতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটা প্রবন্ধে 'খেলুম' 'গেলুম' বা তদনুরূপ কোন পদ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঢাকারিভিউর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয় সেই প্রবন্ধ সমালোচনা করিবার সময়ে লিখিয়াছিলেন যে "যদি খেলুম গেলুমই লেখা যায় তাহা হইলে খেনু গেনু লিখিলে দোষ কি?" ইহার পর প্রমথ বাবু ভারতীতে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ভদ্র মহাশয়ের

লেখা সমালোচনা করার ব্যপদেশে কেবল যে ভদ্র মহাশয়কেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছিলেন—ভদ্র মহাশয় যথাস্থানে কর্ত্তৃপদের প্রয়োগ করেন নাই ইত্যাদি কত কি বলিয়াছিলেন—তাহা নহে, তিনি সাধু ভাষাকে বাবু বাংলা বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছিলেন এবং যাহারা সেই ভাষা ব্যবহার করে তাহাদিগকেও বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। "সাহিত্যিক" শব্দটাও তাঁহার উপহাসের বিষয় হইয়াছিল। "সৌরভে" তাঁহার সেই সমালোচনার সমালোচনা হইয়াছিল। তাহাতে ভদ্র মহাশয়ের মতের সমর্থন করা হইয়াছিল এবং চৌধুরী মহাশয়ের অনেক গুলি ভুল প্রদর্শন করা হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটা আমোদের কথাও ছিল।

চৌধুরী মহাশয়ের লেখার অপর সমালোচনার বিবরণ এইরূপ। তিনি সবুজ পত্রে এক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে বঙ্কিম বাবু এমন কতগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন যাহার প্রকৃত অর্থ তিনি (বঙ্কিম বাবু) জানিতেন না। ইহার প্রতিবাদে গত বৈশাখের ভারতীতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সেই শব্দ গুলির অর্থ প্রমথ বাবুই জানেন না; পরন্তু বঙ্কিম বাবুর কোন ভুল হয় নাই। এই গুলিকেই বোধ হয় চৌধুরী মহাশয় অসাধু কার্য্য বলিতেছেন!

চৌধুরী মহাশয়ের পত্রে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আরও একটা কথার বিচার করা উচিত বলিয়া মনে করি। পত্র দুই খানা যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তাহা কোথাকার ভাষা? যে অঞ্চলে চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত "হলুম" 'গেলুম' প্রভৃতি বলে সে অঞ্চলে চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত "পেয়েছি", "হয়েছে' ইত্যাদি বলে না। এ সকল শব্দ কি তাঁহার নিজের প্রস্তুত না কোন স্থানে ব্যবহৃত হয়? এইরূপ যতগুলি শব্দ এই দুই পত্রের মধ্যে আছে, তাহার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল এবং শব্দগুলির পার্শ্বে কলিকাতার উচ্চারণ লিখিত হইল। এবিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী বি, এ, কৃত "Bengali spoken and written" পুস্তক খানা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

প্রমথ বাবুর বানান	কলিকাতার উচ্চারণ
পেয়েছি	পেইচি অথবা পেয়িচি
হয়েছে	হোয়েচে
বলেছেন	বোলেচেন
করেছে	কোরেচে
পাচ্ছি	পাচ্চি
চোখের	চোকের
যাচ্ছে	যাচ্চে
হচ্ছে	হোচ্চে
লিখেছি	লিখিচি
তারথেকে	তাথেকে
করেছি	করিচি
দিচ্ছি	দিচ্চি
করলুম	কন্নুম
আসছে	আসচে
গিয়েছেন	গিয়েচেন

চৌধুরী মহাশয় "দক্ষিণ পশ্চিম" প্রদেশের অর্থাৎ কলিকাতার গ্রাম্য ভাষার এতই ভক্ত যে "হয় নাই" "নাই", "সম্মুখে", "ইচ্ছা" প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে কলিকাতার অতি গ্রাম্য শব্দ "হয় নি", "নেই" "সুমুখে", "ইচ্ছে" প্রভৃতি লিখিয়াছেন। অথচ তিনি উপরের তালিকা লিখিত শব্দগুলির বানান কলিকাতার উচ্চারণানুরূপ করেন নাই। ইহার হেতু এই বোধ হয় যে তিনি সেগুলির উচ্চারণ ঠিক্ ধরিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই যে কলিকাতার সমস্ত উচ্চারণ ঠিক্ ঠিক্ ধরা অন্য স্থানের লোকের পক্ষে সুসাধ্য নহে। চৌধুরী মহাশয় যে সেই শব্দগুলি ইচ্ছা করিয়া কিছু সংশোধন করিয়া লইয়াছেন অথবা অন্য স্থান হইতে নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাহাও বিশ্বাস হয় না, কেননা কলিকাতার ভাষাও যে কিছু সংশোধন করিয়া লেখা উচিত, চৌধুরী মহাশয়ের সে বিশ্বাস থাকিলে তিনি 'নাই' স্থলে 'নি' ও 'নেই', এবং 'ইচ্ছা' স্থলে 'ইচ্ছে' লিখিতেন না।

এখন 'বিক্রমপুর' সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে যাইয়া চৌধুরী মহাশয়ের মত সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিব। সাহিত্যে কলিকাতার

ভাষা গ্রহণ করা উচিত নহে তাহার কারণ এই যে (১) অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার মত কলিকাতার ভাষাও, যাহাকে ফ্রেঞ্চে পাতোআ (patois) বলে সেই গ্রাম্য ভাষা ব্যতীত কিছুই নহে। (২) কলিকাতার ভাষা আয়ত্ত করা অন্য স্থানের লোকের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন এবং বহুস্থলে অসম্ভব। (৩) কলিকাতার ভাষাকে সাহিত্যিক ভাষা হইতে দিতে অন্য সকল স্থানের লোকেরই স্বাভাবিক আপত্তি হইতে পারে। (৪) তাহাতে কেবল কলিকাতার লোকেরই সুবিধা, অন্য সকলেরই অসুবিধা। (৫) উচ্চ সভ্যতার লক্ষণ এই যে প্রায় কোন বস্তুই স্বাভাবিক বা প্রাকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না—সকল বস্তুকেই কৃত্রিম উপায়ে সংশোধন বা সংস্কৃত করিয়া লয়। কলিকাতার প্রাকৃত ভাষাও সংস্কৃত করিয়া লওয়া উচিত। তাহা হইলেই যাহাকে সাধু ভাষা বলে তাহাই হইল। (৬) সাধু ভাষায় লিখিত সাহিত্য দ্বারাই পুরুলিয়া হইতে কামরূপ ও চট্টগ্রাম এবং কুচবিহার হইতে বালেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত বঙ্গে একতা সাধিত হইতেছে এবং হইবে। হঠাৎ যদি কলিকাতার ভাষাই সাহিত্যে প্রচলিত হয়, তাহা হইলে আমরা একতার পথে যতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহা হইতে পঞ্চাশ বৎসর পিছাইয়া পড়িব।

কেহ যদি একবার একটা যুক্তি সঙ্গত ভাল মত প্রকাশ করিয়া পরে সেই মত পরিত্যাগ করিয়া যুক্তি-বিহীন মত অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহার যুক্তি-সঙ্গত পূর্ব্ব মতের গৌরব অক্ষুণ্ণই থাকে। স্যার রবীন্দ্র নাথ এখন মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি বিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন 'সমাজ বন্ধন যেমন মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক তেমনি ভাষাকে কলা বন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না।" সুতরাং কলিকাতার ভাষাটাও ঠিক্ যেমন আছে সাহিত্যে সেইরূপ গ্রহণ করা উচিত নহে।

Struggle for existence এবং survival of the fittest এর নিয়ম অনুসারে কলিকাতার ভাষার ক্রমেই প্রসার বাড়িতেছে একথা সম্পূর্ণ সত্য। ইহাও সত্য যে সাহিত্যিক ভাষার বানান ও ব্যাকরণ বহু পরিমাণে কলিকাতার ভাষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কিন্তু অন্য প্রাদেশিক ভাষার ন্যায় কলিকাতার ভাষার উপরও সাধু ভাষা শুভকর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। যথা, পূর্ব্বে কলিকাতার শিক্ষিত লোকের মুখেও 'নারকোল', 'নৌকো' শুনা যাইত কিন্তু এখন তাঁহারা নারকেল ও নৌকা বলেন। কালে হয়ত কলিকাতার ভাষা এবং সাধু ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া উভয়েরই একরূপ দাঁড়াইবে। কিন্তু তাহা সময় সাপেক্ষ। এখনই জোর জবরদস্তি করিয়া সাধু ভাষা উঠাইয়া দিয়া তৎস্থানে কলিকাতার অন্য ভাষা স্থাপন করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে।

এতৎসম্বন্ধে আমার এক বন্ধু আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছেন "চৌধুরী সাহেব বোধ হয় কলিকাতার ভাষাকেই প্রাদেশিক ভাষা বলেন। সকলে কলিকাতার ভাষা অনুকরণ করিবে কেন, ক'রিতে পারিবেই বা কেন? বিশেষত এ ভাষা কি সাধু ভাষারূপে স্কুলের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত হইবে? চৌধুরী সাহেব লিখিতে-ছেন, তিনিই লিখুন। অন্যকে কেন তিনি এই ভাষায় লেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন? তিনি লিখিয়াছেন 'চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র সকলেই একই প্রাদেশিক ভাষায় তাঁদের গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন।' ইহা একদেশদর্শীর কথা। পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের কবিরা কি "একই প্রাদেশিক ভাষায়" গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন? আমার মতে চলিত ভাষায় অনেক খেয়াল চলে, হাসি ঠাট্টা চলে, বৈঠকী গল্প চলে এবং তাহা বেশ শুনায়। কিন্তু তাহাতে গভীর ভাবের কথা জমাট বাঁধে না। চৌধুরী সাহেব একস্থানে লিখিয়াছেন—

'আমার বন্ধু বলেন যে "তুমি ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে এত কম জানো যে আমি ভেবে পাচ্ছিনে কি ভরসায় তুমি একাজ ক'রতে উদ্যত হয়েছ? আমি উত্তর করি—"এই ভরসায়—যে আমার শ্রোতৃ মণ্ডলী এ বিষয়ে আমার চাইতেও কম জানেন।"

এ অহমিকা—এরূপ ভাষায়ই শোভা পায়।

এইত গেল সাহিত্যে গ্রাম্য ভাষার প্রচলন সম্বন্ধে।

এখন চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত অন্য দুই একটা কথা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

তিনি লিখিয়াছেন "পূর্ব্ববঙ্গে তেমন কোন বড় লেখক ওঠেন নি।" প্রথমত জিজ্ঞাস্য এই যে ইহাকে কি বাঙ্গলা ভাষা বলে? দ্বিতীয়ত এই উক্তিটা কি ঠিক? পূর্ব্ববঙ্গে যে তেমন বড় লোকের আবির্ভাব বা উদয় হয় নাই আমি ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। এতৎসম্বন্ধে বিক্রমপুর সম্পাদক যাহা জানেন লিখিবেন।

চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন "সংস্কৃত এবং বাংলা, এই দুই ভাষার গঠন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতএব সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে বাংলা বাক্য বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ।" ইহার দুই একটা দৃষ্টান্ত না দিলে বুঝা যায় না।

চৌধুরী মহাশয় আবার লিখিতেছেন 'বাংলার অধিকাংশ লেখকদের সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে পরিচয় এত সামান্য যে তাঁহাদের ব্যবহৃত অনেক পদ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারেও অশুদ্ধ।" চৌধুরী মহাশয় ইহার অনেক উদাহরণ পূর্ব্বে দিয়াছেন বলিয়া নূতন উদাহরণ দিলেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের লেখায় উদাহরণের সম্পূর্ণ অভাব নাই। কেননা তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন "প্রধানতঃ ঐ কারণেই" ইত্যাদি। এখানে প্রধানত পদের বিসর্গ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ভুল, বাঙ্গলাতেও ভুল।

চৌধুরী মহাশয়ের মতে সাধুভাষা Idiom বর্জ্জিত। এবং কৃত্রিম বলিয়া উহাতে বাঙ্গলা Idiom খাপ খাওয়ান যায় না। এই সূত্রও বিনা টীকা ও বিনা উদাহরণে বুঝিতে পারিলাম না। Idiom শব্দ চৌধুরী মহাশয় কি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন জানি না; কেননা তিনি কখন কখন কোন কোন শব্দ অপূর্ব্ব অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমরা এই জানি যে কোন ভাষায় যদি ভাব ব্যক্ত করিবার এমন কোন রীতি থাকে যাহা ব্যাকরণ অথবা যুক্তির বহির্ভূত তাহা হইলে সেই রীতিকেই সেই ভাষার Idiom বলে। সংস্কৃতে—পলায়িতে চৌরে কিমু-সাবধানম্, লাটিনে Deo adjuvante non timendum, এই দুইটী বাক্যে চৌর শব্দ এবং Deus শব্দ যে অধিকরণ কারকের আকার ধারণ করিয়াছে কেন ইহা যুক্তি দ্বারা বুঝান যায় না। এইজন্য এইরূপ প্রয়োগ হইলে Idiom হয়। বাঙ্গলায় "আমাকে যাইতে হইবে" এই বাক্যের "আমাকে" শব্দ যুক্তি বা ব্যাকরণের অন্তর্গত নহে। সুতরাং ইহা Idiom. এরূপ বহু Idiomএর দৃষ্টান্ত একজন ইংরেজ সিবিলিয়ান স্ব প্রণীত বাঙ্গলা ব্যাকরণে দিয়াছেন। সুতরাং সাধুভাষায় Idiom নাই একথা বলিতে পারা যায় না। আর চলিত বাঙ্গলার কোন কোন Idiom যে সাধুভাষায় খাপ খাওয়ান যায় না তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না।

চৌধুরী মহাশয় আরও লিখিয়াছেন "লেখকের যত খুসি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিতে পারেন তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই যদি সেই সকল শব্দের অর্থ এবং প্রয়োগ কৌশল তাঁহাদের জানা থাকে। শব্দের অনর্থক এবং নিরর্থক প্রয়োগই আমাদের নিকট অসহ্য সে শব্দ সংস্কৃতই হোক আর বাংলাই হোক।"

ইহার সহজ অর্থ এই যে অন্যান্য লেখকেরা যত শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন সে সমস্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ তাঁহারা জানেন না। ইহার পরিচয়ও চৌধুরী মহাশয় বঙ্কিম বাবুর শব্দ প্রয়োগের ভুল ধরিতে গিয়া দিয়াছেন এবং নিজেও বাক্য অর্থে "পদ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রকৃত কথা এই যে ভ্রমশূন্য মনুষ্য নাই। যাহারা অতিশয় পণ্ডিত তাঁহাদের রচনায়ও আলঙ্কারিকেরা ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে সেই ভুলের জন্য গালাগালি দেন নাই। ভ্রম প্রদর্শন করিতে হইলে তাহা ভদ্রভাবেই করা উচিত। যাহারা অন্যের ভুল ধরিতে গিয়া অসাধু ভাষা প্রয়োগ করেন তাঁহারা অন্যের নিকট হইতে সম্পূর্ণ সাধুভাষা আশা করিতে পারেন না।

উপসংহারে আমরা বলিতেছি চৌধুরী মহাশয়ের লেখার প্রতি কাহারও অসাধু ভাষা প্রয়োগ করিবার কোন কারণ নাই। তাহার লেখা অর্থাৎ "বীরবলী ভাষা"ও বাঙ্গলা সাহিত্যের এক প্রকারের নমুনা।

বাঙ্গলা সাহিত্য যাঁহারা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যে বিদ্যাসাগরের মত বা কালীপ্রসন্ন ঘোষের মত লিখিতে পারিবেন, তাহা নহে। বিভিন্ন রুচি মানবের নিকট বিদ্যাসাগর, ও কালীপ্রসন্নের ভাষা যেমন সমাদর লাভ করিতেছে, আলালী এবং হুতোমী ভাষাও তেমনি একদিন সমাদর লাভ করিয়াছিল। সুতরাং বীরবলী ভাষাও চলিবে এবং টিকাইয়া রাখিবার লোক থাকিলে তাহা কিছুকাল টিকিয়াও থাকিতে পারে। কিন্তু এ ভাষা ভদ্রসমাজে সাধুভাষা রূপে চলিবে না এবং চালান যে লজ্জাজনক তাহা স্বয়ং চৌধুরী মহাশয়ের রাজসাহীর অভিভাষণেই প্রমাণিত হইবে। সে অভিভাষণটী বিশুদ্ধ সাধুভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তাহার কৈফিয়ত স্বরূপ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"যে দিন আমি এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হই সে দিন আমার কোন শুভার্থী বন্ধু আমাকে সতর্ক করিয়া দেন যে—এ সভাস্থলে "বীরবলী ঢং চলিবে না।" যে কোন সভাতেই হউক না কেন বিদুষকের আসন যে সভাপতির আসনের বহু নিম্নে সে জ্ঞান যে আমার আছে তাহা অবশ্য আমার বন্ধুর অবিদিত ছিল না। আসলে তিনি এ ক্ষেত্রে আমাকে বীরবলের ভাষা ত্যাগ করিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন—কেননা সে ভাষা আট পহরে—পোষাকি নয়। সভ্য সমাজে উপস্থিত হইতে হইলে সমাজ সম্মত ভদ্রবেশ ধারণ করাই সঙ্গত—ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সে বেশ যতই অনভ্যস্ত হউক না কেন। আমি তাহার পরামর্শ অনুসারে "পররুচি পরণা" এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এ যাত্রা সাধুভাষাই অঙ্গীকার করিয়াছি। কেননা সাধুভাষা যে ধোপদুরস্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

পাঠকগণ বোধ হয় তাঁহার এই কৈফিয়ত হইতেই সাধুভাষার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া লইতে পারিবেন। ইহার পরেও যদি কেহ চৌধুরী মহাশয়ের বীরবলী ভাষাকে বাঙ্গলা সাধু সাহিত্যের আসনে জোর করিয়া বসাইবার জন্ত জেদ করেন, তবে তাঁহার প্রতি চৌধুরী মহাশয়ের ভাষায়ই উপদেশ দেওয়াযাইতে পারে—"হুতোমি ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করা মূর্খতা এবং মহাভারতের ভাষায় সামাজিক নক্সা রচনা করা ছন্নতামাত্র।"

পঞ্জিকা সংস্কার।

বিগত বর্ষে শ্রীশ্রী৺ দুর্গাপূজা উপলক্ষে পঞ্জিকা বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। বোধন ও বিসর্জ্জন লইয়া মতভেদ ছিল; এবং তিথি, মান সংকীর্ণ হওয়াতে দেশভেদে ঐ দুই ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন দিনে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থারও প্রয়োজন পড়িয়াছিল।

এতদ্বিষয়ের বিচার বিতর্ক বহু হইয়া গিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে পুনরালোচনা সম্প্রতি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় অশুভ হইতেও ভগবদিচ্ছায় শুভ ফলের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই ব্যাপারেও তাহাই যেন ঘটিয়াছে। কেননা সমগ্র হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত মহোদয়গণের মধ্যেও যিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়ও পঞ্জিকা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রের বিগত আশ্বিন সংখ্যায় "বোধন ও বিসর্জ্জন" শীর্ষক তাহার যে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ সভা প্রসিদ্ধ পঞ্জিকা সমূহের গণকবৃন্দকে ১০ই ভাদ্র হইতে তিন দিন আহ্বান করিয়া তাহাদের বিচার ও সিদ্ধান্ত অবগত হন; তাহাতে অন্যের মনোভাব কিরূপ হইয়াছিল বলিতে পারি না, আমি ত হতবুদ্ধি হইয়াগিয়াছি।"

তিনি কি জন্য "হতবুদ্ধি" হইয়াছিলেন, তাহার হেতু কতকটা তদীয় প্রবন্ধ হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"পঞ্জিকায় যে তিথি মান আছে, তাহা কলিকাতা অঞ্চলের নহে, অথচ সেই মান অনুসারে কলিকাতা অঞ্চলবাসী আমরাই স্বয়ং একাদশী প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি; কিন্তু বহু সময়েই তাহা পণ্ড হইয়া থাকে, অতঃপরই বা কি কর্ত্তব্য, এই সব ভাবিয়া আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলাম। * * যাহা হউক এই সমস্ত আলোচনার ফলে আমার মনে হইতেছে এক্ষণে আমাদের যে পঞ্জিকা গণনা করা হয় তাহা অলীক কল্পনা মাত্র। প্রত্যক্ষের সহিত মিল নাই, অথচ প্রত্যক্ষ মিলনের জন্ত যে কল্পিত সংস্কার তাহা লওয়া হয়, দেশান্তর বলিয়া একটা কল্পিত পরিমাণ গ্রহণ

করা হয়; (গণনা) এইরূপ মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না রাখিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। * * "ধর্ম্মকার্য্যে এরূপ মিথ্যা অবলম্বন যে কত অধঃপতনের লক্ষণ তাহা ভাবিয়াই হতবুদ্ধি হইয়াছি। আমাদের ন্যায় পঞ্জিকাপেক্ষী মানব সম্প্রদায় জগতে আর দ্বিতীয় নাই, পঞ্জিকার অধঃপতনও বুঝি আমাদের ন্যায় আর কাহারও হয় নাই।"

অশেষ সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহোদয়ের এই সকল আক্ষেপোক্তি যখন পড়িয়াছিলাম তখন বাস্তবিক এই ভাবিয়া অন্তরে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, যে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী ও সমাজমান্য পণ্ডিতাগ্রগণ্যের মনে যখন পঞ্জিকা সংস্কারার্থ এইরূপ প্রবল কামনা হইয়াছে তখন আশা হয় ভগবদিচ্ছায় ইহা সত্বরই সম্পন্ন হইবে। অপর একটি আনন্দের হেতু এই যে পরম শ্রদ্ধাভাজন তর্করত্ন মহাশয় "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত" পঞ্জিকার প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাত পরায়ণ হইয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণনা নাবিক পঞ্জিকার অনুসারে হইয়া থাকে, কিন্তু "অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্ যাত্যহরহঃ শশী" ইত্যাদি শাস্ত্র বচনের সহিত সে গণনার মিল আছে এইরূপ প্রসিদ্ধি। গুপ্ত প্রেসের ভূতপূর্ব্ব জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য এবং বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণয়িতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম, এ, পঞ্জিকালোচনা সভাতে আসিয়া যেরূপ যুক্তিপূর্ণ কথা বলিলেন তাহাতে আমি আকৃষ্ট এবং কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছি; ইঁহাদের গণনা পদ্ধতিকে আমাদের শাস্ত্রও প্রাচীন উপায়ে সুসংবদ্ধ করিয়া লইতে পারিলে সত্যের আদর করা হয় এবং শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করা হয়।"

এতদুপলক্ষে একটা অবান্তর কথা বলিতে হইতেছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রবর্ত্তিত হইবার পর বৎসরেই (১২৯৮সালে) শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় রামনাথ তর্করত্ন ঢাকায় গিয়া ঐ পঞ্জিকার প্রচার ও প্রসারকল্পে আলোচনা করেন। তখন আমি সারস্বত সমাজের মুখপত্র 'সারস্বত পত্রে'র অস্থায়ী সম্পাদক ছিলাম। এই পঞ্জিকার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সারস্বত পত্রে যথাসাধ্য একটি প্রবন্ধ লিখি এবং আমাদের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন গুপ্ত এম, এ, মহোদয় দ্বারা একটী যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লেখাইয়া ঐ পত্রে প্রকাশ করি। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গে এই পঞ্জিকার কিঞ্চিৎ—যদিও তাহা অতীব সামান্য —কাটতি হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তখন পঞ্জিকা খানির প্রতি কলিকাতায় স্বধর্ম্মানুরাগী পত্রিকাসম্পাদকগণের অনুগ্রহ দৃষ্টি দূরে থাকুক, বরং যতদূর স্মরণ হয় কেহ কেহ বিরুদ্ধ মতই প্রচার করিয়াছিলেন। সে যাহাহউক এখন শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহোদয়ের ন্যায় পরম শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত যখন সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার প্রশংসাবাদ প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন তখন সমাজের সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিগণও ঐ পঞ্জিকার প্রতি যে আকৃষ্ট হইবেন তাঁহাতে সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ "বঙ্গবাসী" "হিতবাদী" প্রভৃতি সুপ্রচারিত পত্রে ৺পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে ইতোমধ্যেই সুফল ফলিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে বলিতে পারি যে শ্রীহট্ট করিমগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ পরিষদ ও বৈদিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সম্মিলিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর সমক্ষে পঞ্জিকা বিভ্রাট বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান পুরঃসর "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা" সকলেরই গ্রহণ করা উচিত, এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এবং শুনিতে পাই শ্রীহট্ট অঞ্চলে এবার ঐ পঞ্জিকার বেশ আদর হইতেছে।

আরও সুখের বিষয় যে পৌষ সংখ্যক 'ব্রাহ্মণ সমাজে' প্রকাশিত পঞ্জিকা সমিতির অধিবেশনে পরিগৃহীত মন্তব্যগুলিতে একবাক্যে পঞ্জিকা সংস্কারের এবং দৃগ্‌-গণিতৈক্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রকারান্তরে "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত" পঞ্জিকারই জয় হইল।

এস্থলে আমার একটি নিবেদন এই যে আগামী ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনেও যেন এই সর্ব্ব প্রয়োজনীয় বিষয়ে এতাদৃশ একটি নির্দ্ধারণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার প্রশংসাবাদ করিলেও, শ্রীযুক্ত

তর্করত্ন মহাশয় প্রবন্ধ শেষে উহা গ্রহণ না করিবার দুইটি কারণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত না হইলেও (১) এই গণনা মানিলে ভবিষ্যতে শাস্ত্র বিরোধের আশঙ্কা আছে এবং (২) নাবিক পঞ্জিকা না পাইলে এই মতে পঞ্জিকা গণনার উপায় নাই। এই দুই কারণে সহসা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিলম না।" আমি স্মৃতি কিংবা জ্যোতিষ উভয় বিষয়েই অনভিজ্ঞ, তাই সম্ভবতঃ সম্মান ভাজন তর্করত্ন মহাশয়ের এই যুক্তি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। "বর্ত্তমানে" যদি ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ না হয় তবে যতদিন বর্ত্তমান অবস্থা চলিবে ততদিন গ্রহণ করিলে দোষ কি? "নাবিক" পঞ্জিকা প্রাপ্তির আশু কোনও প্রতিবন্ধক ঘটিবে বলিয়াও আমাদের ধারণা হইতেছে না। নাবিক পঞ্জিকা অবশ্যই ইউরোপীয়গণের প্রচারিত; তাহা হইতে খাটি জিনিস গ্রহণ করিলে হানিই বা কি? "নীবাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং" নিবার উপদেশ বাল্যাবধি আমরা পাইয়া আসিতেছি। ঘটিকা যন্ত্র দৃষ্টে যদি আমরা মুহূর্ত্ত নির্ণয়াদি করিতে পারি তবে এখানেও আমাদের যখন সম্প্রতি গত্যন্তর নাই, নাবিক পঞ্জিকার গণনা গ্রহণ করাই আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তাই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাই এখন আমাদের অবলম্বনীয়; এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলে যে বস্তুগত্যা। তাহাই হইতেছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে এবিষয়ে আমার কথা এই যে অগত্যা পক্ষেই আমাদের বৈদেশিক জিনিস গ্রহনীয়—যে পর্য্যন্ত আমাদের নিজস্ব তাদৃশ কোনও কিছু না যুটে। নিজের জিনিসও এই সম্বন্ধে ভগবৎকৃপায় হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। 'ব্রাহ্মণ-সভা' তদ্বিষয়ে একটু তদন্ত করুণ।

বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক জ্যোতিষানুরাগী মহোদয় বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া বলেন যে বঙ্গদেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বড়ই দুরবস্থা ঘটিয়াছে—ইহার উন্নতি সাধনার্থে এবং পঞ্জিকা গণনা বিশুদ্ধির নিমিত্তে একটি মানমন্দির স্থাপন করা অতীব আবশ্যক। সভাস্থলে স্বধর্ম্মপরায়ণ বিদ্যোৎসাহীবদান্য মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন; কথাটা তাঁহার নিকটে সঙ্গত বোধ হইল। তাই এই বিষয়টা সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংসৃষ্ট না হইলেও শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর তাহার আলোচনা করিতে সমবেত সভ্যবর্গকে উৎসাহিত করেন। এবং নানাশাস্ত্রবিৎ শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয়কে এতদ্বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। অধ্যাপক যোগেশ বাবু তখন উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ চন্দ্রশেখর মহাপাত্র সহোদয় কিরূপ সামান্য সরঞ্জাম অবলম্বনে স্বয়ং গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ পুরঃসর তৎপ্রদেশে পঞ্জিকা সংস্কার সাধন করিয়াছেন তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেন। এবং বঙ্গদেশেও তাদৃশ সংস্কারসাধন করিতে হইলে একটি মানমন্দির আবশ্যক—তাহার কার্য্য পরিচালনার্থ মাসিক ২০০৲ আন্দাজ ব্যয় হইলেই চলিবে বলিয়া স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন। পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর তৎক্ষণাৎ সভাস্থলে প্রতিশ্রুত হন যে ঐ মানমন্দিরের ব্যয়ভার মাসিক ২০০৲ তিনিই বহন করিবেন। ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত কতদূর হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি। কিন্তু ব্রাহ্মণ সভা যখন 'পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি' গঠন করিয়াছেন—এবং সমাজের নেত্রী স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণেরও যখন তাহাতে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, তখন আশাকরি ব্রাহ্মণসভা দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ উক্ত মহারাজ বাহাদুরের সহায়তা গ্রহণপূর্ব্বক মানমন্দির স্থাপনের সত্বর উদ্যোগ করিবেন। তবেই ইউরোপীয় সহায়তা ব্যতিরেকেও শাস্ত্রের অবিরোধি ভাবে পঞ্জিকা গণিত ও প্রকাশিত হইতে পারে। পঞ্জিকার বিশুদ্ধির উপর যখন আমাদের ধর্ম্মকার্য্যের—কেবল ধর্ম্মকার্য্যেরই বলি কেন, সমস্ত কার্য্যেরই শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, তখন এই বিষয়টাতে 'ব্রাহ্মণ সভা' এবং 'ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন' বিশেষ ভাবে মনোযোগ প্রদান করুন, এই প্রার্থনা।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

উইলিয়ম কেরী।

শেষাংশ।

এই সময়ে লর্ড ওয়েলসলি গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি ইংরেজ সিভিলিয়ানদিগের জন্য "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" নামক একটী কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজে অন্যান্য ভাষা ব্যতীত বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা প্রদান করা হইত। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে কেরি ৫০০৲শত টাকা মাসিক বেতনে উক্ত কলেজে বঙ্গভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি "রাজা প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস" প্রণয়ন করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে শ্রীরামপুর যন্ত্রে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কেরি বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এবং ইহার কয়েক মাস পরে উহা মুদ্রিত করেন। তৎপরে তিনি কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক কর্ত্তৃক অনুবাদ করাইয়া "হিতোপদেশের" বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত করেন। এই সময়ে কেরি ঐকলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে মনস্থ করিলেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কেরি দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। গবর্ণমেণ্ট ইহার একশত পুস্তক ৬৪০ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করেন। স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্ কর্ত্তৃক ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার "এসিয়াটিক সোসাইটী" হইতে কেরি ইংরেজী ভাষায় বেদের অনুবাদ করিতে অনুরুদ্ধ হন। কেরি এই কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে ইহাতে তাঁহার বাইবেলের অনুবাদ কার্য্যের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে সুতরাং তিনি সে কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে কেরি গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির সম্মুখে সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইলেন। গবর্ণর জেনারেলের ভবনে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। ঐ সভায় দেশের রাজন্যবর্গ, সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমবেত হইলেন। লর্ড ওয়েলেসলি প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ এবং ইউরোপীয়গণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কেরি সংস্কৃত ভাষায় ওয়েলেসলির শাসন কালের ও তৎপ্রতিষ্ঠিত কলেজের ভূয়সী প্রশংসাসূচক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। কেরির বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া লর্ড ওয়েলেসলি সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন "মিঃ কেরির প্রকৃত মৌলিক এবং অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমি নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। ঈদৃশ উক্তি আমি উচ্চ আদালত এবং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার উচ্চ প্রশংসা অপেক্ষাও অধিকতর সম্মান জনক মনে করি।"

ওয়েলেসলির এদেশ ত্যাগ করিবার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কেরি ও মার্সমেন বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা প্রথমে রামায়ণ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রামায়ণের প্রথম খণ্ড অনুবাদ সমাপ্ত হইল। ইহা হইতে ইংলণ্ডের জনসাধারণ সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে স্থূল ধারণা করিতে সমর্থ হইল।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখে মিঃ কেরি সাহিত্য সেবার জন্য ইউনাইটেড্ ষ্টেটের ব্রাউন ইউনিভারসিটি কর্ত্তৃক ডকটার অব্ ডিভিনিটি (Doctor of Divinity) উপাধি প্রাপ্ত হন। একখানি পত্র হইতে ডাঃ কেরির তৎকালীন দৈনন্দিন কার্য্যাদির বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়। তিনি প্রত্যূষে পৌণে ছয়টার সময় শয্যাত্যাগ করিতেন। তৎপর হিব্রু বাইবেলের এক অধ্যায় অধ্যয়ন করিতেন এবং উপাসনা কার্য্যে ৭টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতেন। তৎপর তিনি ভৃত্যগণসহ বাঙ্গলাতে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। অতঃপর তিনি জনৈক মুন্সীর নিকট পার্শীভাষা শিক্ষা করিতেন। প্রাতরাশের পর বেলা ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিনি জনৈক পণ্ডিতের সহিত রামায়ণের অনুবাদ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তৎপর কলেজে গমন করিয়া ২টা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিতেন। তথা হইতে বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জনৈক বন্ধুর সহিত ভোজন করিতেন। ভোজনের পর কলেজের প্রধান পণ্ডিতের সহিত মেথু Mathew হইতে এক অধ্যায় সংস্কৃতে অনুবাদ করিতেন। অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার

সময় জনৈক তেলেগু পণ্ডিতের নিকট তেলেগু ভাষা শিক্ষা করিতেন। তৎপর গির্জ্জায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন; তথা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইস্কিকেলের বঙ্গানুবাদ করিতেন। রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য সমাপ্ত হইত; তৎপর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিতেন। একজন ইউরোপীয়ের পক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান প্রাচ্যদেশে এরূপভাবে কার্য্য করা কতদূর কঠোর পরিশ্রমজনক তাহা সহজেই অনুমেয়।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ডাঃ কেরির পত্নী বিয়োগ হইল; কিন্তু এই পারিবারিক দুর্ঘটনাতেও কেরি তাঁহার আরব্ধ সাহিত্য চর্চ্চা হইতে বিরত হইলেন না।

১৮০৮খৃষ্টাব্দে কেরি দ্বিতীয় পত্নীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার এই পত্নী অতি বিদুষী ছিলেন; তিনি অতি সুন্দররূপে ফরাসি, জার্ম্মেন, ডেনিস, ইংলিশ এবং ইটালীয় ভাষায় অনর্গল কথোপকথন করিতে সমর্থা ছিলেন। ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কল্পে তাঁহার অনুরাগ ছিল। সুতরাং ডাঃ কেরির ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে তিনিই উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ কার্য সমাপ্ত হইল। বাইবেল সমাপ্ত হওয়ার পরদিনই ডাঃ কেরি জ্বরে শয্যাগত কাতর হইলেন; তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। তিনি বিকারে প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে বারাকপুর সেনানিবাসের ডাক্তার ডার্লিং তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন। একদিন ডাঃ ডার্লিং সৈনিকের বেশে রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ডাঃ কেরির প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলে ডাঃ কেরি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন 'যোদ্ধবেশে' আপনি কিরূপে আমার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন?" ডাঃ ডার্লিং অবিলম্বে প্রস্থান করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করতঃ মার্সমেনের কোট পরিধান করিয়া ডাঃ কেরির সম্মুখীন হইলে তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। ডাঃ ডার্লিং এর চিকিৎসাগুণে ডাঃ কেরি সেবার আরোগ লাভ করিলেন।

ষোড়শ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ডাঃ কেরি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ বাইবেলের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ এতদ্দেশীয় গণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ বঙ্গভাষায় একখানা সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে ভারত গবর্ণমেণ্ট সাময়িক পত্রকে সন্দিগ্ধ নয়নে অবলোকন করিতেন। পত্রিকাগুলিকে তখন সেন্সরশিপ্ (censorship) এর আমলে আসিতে হইত। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গভাষায় সাময়িক পত্র প্রকাশার্থ মিশনারী মার্সমেন এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই সভায় এইরূপ অবধারিত হয় যে, এই নূতন পত্রিকায়—সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়, নূতন আবিষ্কার সংবাদ এবং জন সাধারণের চিত্ত আকর্ষণার্থ স্থানীয় সংবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হইবে। রাজনৈতিক আলোচনা অথবা গবর্ণমেণ্টের ভীতি উৎপাদক কোন কথা থাকিবে না।

তদনুসারে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে "দিগদর্শন" নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ পত্রিকা প্রচার সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ না হওয়ায় মিশনারীগণ উৎসাহিত হইয়া বঙ্গভাষায় আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশার্থ মনস্থ করিলেন। তৎকালীন ইংরেজী পত্রিকা সমূহে একপক্ষ কাল পর্য্যন্ত ইহার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল। মিশনারীগণ প্রতিদিন আশঙ্কা করিতেছিলেন হয়ত বা তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই পত্রিকা প্রচার বন্ধ করার আদেশ প্রাপ্ত হন। এরূপ কোন আদেশ প্রাপ্ত না হওয়ায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে শ্রীরামপুর হইতে "সমাচার দর্পণ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইল। প্রাচ্য ভাষায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম সংবাদ পত্র।

"সমাচার দর্পন" কলিকাতাবাসীর যথেষ্ট আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর সর্ব্বপ্রথম ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলেন। কিন্তু ইহার প্রচার রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ রহিল; ইহার কারণ এই সময় ডাকের বন্দোবস্তের সুবিধা না থাকায় ডাকে পাঠাইতে হইলে

ইহাতে অত্যধিক ডাক মাশুল প্রদান করিতে হইত।

সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণর জেনারল লর্ড হেষ্টীংশ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মিঃ মার্শমেন তাঁহার নিকট একখণ্ড "সমাচার দর্পণ" প্রেরণ করিলেন এবং এই সংবাদ পত্রের উদ্দেশ্যের বিষয় লিখিয়া যাহাতে স্বল্প মাশুলে দেশের সর্ব্বত্র "সমাচার দর্পণ" প্রচারিত হইতে পারে এই সুযোগ প্রদানের জন্য আবেদন করিলে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল বাহাদুর প্রচলিত হারের এক চতুর্থাংশ হারে "সমাচার দর্পণ" এদেশের সর্ব্বত্র ডাকে প্রেরিত হইতে পারিবে এই মর্ম্মে আদেশ প্রদান করেন।

ডাঃ কেরি তাঁহার সহযোগীগণ সহ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে প্রাচ্যসাহিত্য ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানে এশিয়াবাসী খৃষ্টান ও অন্যান্য যুবকগণকে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত একটী কলেজ" স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং কলেজের মোটব্যয় দুইলক্ষ মুদ্রার তিন চতুর্থাংশ অর্থ ডাঃ কেরি নিজে ও তাহার সহকর্ম্মীগণ প্রদান করিবেন স্থির করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন।

এই শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন কল্পে ডাঃ কেরি যে বিপুল উদ্যম ও অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি ডেন্মার্কের অধিপতি হইতে সুবর্ণ পদক ও প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইলেন।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে ডাঃ কেরির দ্বিতীয় পত্নী মানবলীলা সংবরণ করেন। কেরির দ্বিতীয় পত্নী ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত ডাঃ কেরির জীবন-সঙ্গিনী ছিলেন। সর্ব্বাংশে তিনি ডাঃ কেরির সহধর্ম্মিনীর উপযোগিনী ছিলেন। এরূপ শিক্ষিতা সহধর্ম্মিনীর বিয়োগে ডাঃ কেরি যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইলেন। এই সময় সম্রান্ত অধিবাসীবৃন্দ, উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ, এমন কি স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল লর্ড হেষ্টিংশ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সমবেদনা সূচক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ডাঃ কেরি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। ইনি যদিও কেরির পূর্ব্ব পত্নীর ন্যায় বিদুষী ছিলেন না, তথাপি ডাঃ কেরির ন্যায় ৬২ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গিনী হইবার উপযোগিনী ছিলেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ডাঃ কেরি গবর্ণমেন্টের বঙ্গ ভাষার অনুবাদক নিযুক্ত হন। তৎকালে ডাঃ কেরি অপেক্ষা ঐ পদের উপযুক্ত লোক ছিল না। এই সময়ে ডাঃ কেরি তাঁহার বিরাট বাঙ্গলা অভিধান প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে তিনি কলিকাতা হইতে নিশীথে শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিবার সময় তাঁহার পদস্খলন হইল; তিনি আর উঠিতে সমর্থ হইলেন না। মাঝিরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাসায় পঁহুছাইয়া দিল। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকান হইল; দেখা গেল তিনি জানুকের সংযোগস্থলে সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে এযাত্রা তিনি মৃত্যুর দ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু ছয়মাস কাল পর্য্যন্ত তিনি যষ্ঠি অবলম্বন ব্যতিরেকে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইলেন না।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ কেরি তাঁহার সুবৃহৎ ইংরেজী—বাঙ্গলা অভিধান তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ করিলেন। এই সময় কলিকাতার ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে দেউলিয়া হইবার ধুম পড়িয়া গেলে ডাঃ কেরি বৃদ্ধ বয়সে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজের ও মিসন কার্য্যের অর্থ সকলি তিনি কলিকাতার ব্যবসায়ীদিগের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই দেউলিয়া হইয়া গেল। এদিকে গবর্ণমেন্টের বঙ্গানুবাদকের পদও লুপ্ত হইল; সুতরাং কেরি নিরুপায় হইলেন। এই সময় তিনি যৎসামান্য পেনসন পাইতেন এবং তাহাতে কোন মতে পরিবার প্রতিপালন করিতেন। ইহার পর ইংলণ্ডের মিসন সোসাইটী তাহাকে অর্থ সাহায্য করিলে তাহার জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি মিসন কার্য্যেই ব্যয় করেন।

ডাঃ কেরি ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে ডাঃ কেরি তাহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করতঃ পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুকালে ডাঃ কেরি তাঁহার

মূল্যবান মিউজিয়মটী কলেজে দান করিয়া যান। তাঁহার লাইব্রেরী বিক্রয় লব্ধ অর্থ পত্নীকে প্রদান করিতে এবং মৃত্যুর পরে তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর সমাধির পার্শ্বে তাঁহার সমাধি স্থাপন করিতে আদেশ করিয়া যান।

ডাঃ কেরি মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় বহু বন্ধুবান্ধব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল পত্নী লেডী বেণ্টিঙ্ক মহোদয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে দেখিতে আগমন করিতেন।

ডাঃ কেরির মৃত্যুতে লণ্ডনের "বাইবেল সোসাইটী" কলিকাতার "এসিয়াটিক সোসাইটী" প্রভৃতি নানা সভা সমিতি হইতে সমবেদনা সূচক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। নবনিযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল স্যার চার্লস মেট্‌কাফ, ডাক্তার মার্সমেনের নিকট সমবেদনা সূচক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ডাঃ কেরি স্বীয় অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে, সামান্য অবস্থা হইতে পরিণামে অপরিসীম যশ ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ডাঃ কেরি তৎকালে কিরূপ প্রতিপত্তি শালী হইয়াছিলেন এবং তিনি কিরূপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতেই সহজে উপলব্ধি হইবে।

ডাঃ কেরির অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন গবর্ণার জেনারেল মার্কুইস হেষ্টিংস বারাকপুরে ডাঃ কেরিকে ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজ সভায় গবর্ণার জেনারেলের পারিষদ বর্গ ব্যতীত অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ কেরি যখন এক টেবিলে গবর্ণার জেনারলের সহিত আহারে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি গবর্ণার জেনারেলের জনৈক পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে ব্যক্তি গবর্ণার জেনারেলের সহিত একত্র ভোজন করিতেছেন, পূর্ব্বে তিনি চর্ম্মকার (Shoe maker) ছিলেন কি না? এই কথা শ্রবণ মাত্র কেরি অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "না মহাশয়, চর্ম্মকার নয়, তদপেক্ষাও অধম—জুতা মেরামত কারক (Cobbler) ছিলাম।

শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন।

অন্ধের দান।

(১)

দীনবন্ধু আর সতীশ দুইজন বাল্যাবধিই অন্তরঙ্গ বন্ধু। একজনের অদর্শন ক্লেশ অপরের অসহ্য হইয়া উঠিত। দুইজন বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসী হইলেও একই গ্রামে মাতুলালয়ে উভয়ের বাল্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রথম জীবনের সোনালী স্বপ্নের মধ্য দিয়া তাহাদের দিনগুলি নিরুদ্বেগে চলিয়া যাইতেছিল।

দুই বন্ধুই কিছু সংস্কৃত ও পার্শী শিখিয়া জীবনের ভবিষ্যৎ দিন গুলিকে সোনালী হল করা ঝালর দেওয়া বিলাস ভবনের মত দেখিতেছিল। উষাগমে দীনবন্ধু ললিত গাইত, সতীশ বাঁশের বাঁশীতে তান ধরিত। সন্ধ্যা বেলার মেদুর সমীরণে দুই বন্ধুর গান বাজানার মধুর রাগিনী বহু দূরে ছড়াইয়া পড়িত। পেটের চিন্তা সতীশের দীনবন্ধুর কাহারও ছিল না, সুতরাং একটা সৌখিন স্বপ্নের চিরস্থায়িত্ব তাহাদের হৃদয়ের প্রতিতন্ত্রীতে বিরাজ করিতেছিল।

(২)

দুই বন্ধু যখন জীবনের মধ্যপথে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের দিকে অত্যন্ত কৌতুহল পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিল; তখন উত্তর বঙ্গের উপর বিধাতার রক্ত চক্ষু হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল। জগদ্বিখ্যাত ইজারাদার দেবসিংহ তখন নিত্য নূতন অত্যাচারের অভিনয় করিয়া প্রজাকুলের ধনমান প্রাণ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত। প্রজাগণের ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদে গগন পরিপূর্ণ। দেবী সিংহের অতৃপ্ত অর্থ পিপাসার শান্তি করিতে কত শত নরনারী অনন্যুমেয় যাতনা ভোগ করিয়া জীবন মান সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহা এই দীর্ঘকাল পরেও ভাবিতে আমরা শিহরিয়া উঠি।

দেবী সিংহের অমানুষিক অত্যাচারে যখন দিনাজপুর বাসীরা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তখন কেশবচক্রবর্ত্তী সপরিবারে রঙ্গপুর জিলার এক প্রান্তে রহমৎপুরে বাল্যবন্ধু নরনারায়ণ মজুমদারের আশ্রয়ে আসিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। কুমীরের ভয়ে নদীর এককূল হইতে অপর

কূলে যাওয়ার মত নিরাপদ হইয়া কেশব চক্রবর্ত্তী আপনাকে কতকটা সুস্থ মনে করিলেন।

এই রহমৎপুরেই দীনবন্ধু ও সতীশের মাতুলালয়। সুতরাং সহজেই তাঁহারা চক্রবর্ত্তী পরিবারে পরিচিত এবং ক্রমে তাঁহাদের নিতান্ত আপনার হইয়া উঠিল।

(৩)

দীনু ভাবিয়াছিল কেশব চক্রবর্ত্তীর অনিন্দ্য সুন্দরী ষোড়শী বালিকা গঙ্গাময়ী তাহার মধুর সঙ্গীত ও কর্ম্ম-দক্ষতায় মুগ্ধ। সুতরাং সে তাহার অঙ্ক শায়িনী না হইয়া আর যায় না। অতএব সে ক্রমশঃ বিলাসিতা বৃদ্ধি করিতে মনোযোগী হইয়া পড়িল।

এদিকে সতীশও যথা সম্ভব সতর্কতার সহিত আপন বেশভূষা ও অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধনে যত্ন করিতে লাগিল এবং প্রতিদিন শেষ রাত্রিতে নদীর তীরে বসিয়া মধুর রাগিণীতে বাঁশরীযোগে সঙ্গীত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। সে স্থান হইতে মজুমদার ভবন একশত গজ মাত্র ব্যবধান।

উভয় বন্ধুর সর্ব্বদা একত্রে থাকিবার সুবিধা ক্রমেই কমিয়া যাইতে লাগিল। এবং উভয়েই পরস্পরের সাক্ষাৎ আর তেমন বাঞ্ছনীয় মনে করিল না। দেখা হইলে উভয়েই নিত্যনূতন রকমের অজুহাত দেখাইতে লাগিল।

দীনবন্ধু একদিন হঠাৎ একখানি কল্কাদার ধুতি পরিয়া সাজ গোজ করতঃ মজুমদার বাড়ী গিয়াছিল। সতীশ তাহা শুনিল। পরদিন সোনালী পাইরের ঢাকাই ধুতি চাদর, বুটাদার পঞ্জাবী এবং দিল্লীর নাগরায় সুশোভিত সতীশ গ্রাম ময় ভ্রমণ করিল।

দীনবন্ধু একদিন কেশব চক্রবর্ত্তীকে কতকগুলি ফল দিয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় শিবপূজায় সেই ফল উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং দীনবন্ধুকে প্রশংসার সহিত আশীর্ব্বাদ দিয়াছিলেন। কয়েকদিন পর সতীশ একরাশি উৎকৃষ্ট মালদহের আম মজুমদার গৃহে ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পাঠাইয়া দিল।

এদিকে কারণ ও অকারণে উভয় বন্ধুর দেখা শুনা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল এবং তাহাতে কেহই হৃষ্ট বই দুঃখিত হইল না। বরং উভয়েই সাক্ষাৎ না হওয়াটাকেই বেশী পছন্দ করিতে লাগিল।

(৪)

সতীশের সহিত গঙ্গাময়ীর বিবাহ হওয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্য্যান্বিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল—দীনবন্ধু। বংশ-মর্য্যাদার হিসাবে এবং সম্পত্তির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে দীনবন্ধু সতীশের চেয়ে অনেকখানি বড়। প্রজাপতি ঠাকুর এমন একটা অসঙ্গত কার্য্য কেন করিলেন, দীনু তাহা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না। সুতরাং সতীশের উপর সে বিষম চটিয়া, এবং মনে মনে একটা ভীষণ মতলব আঁটিয়া দেশত্যাগী হইয়া গেল।

সতীশ আপন শয়ন কক্ষ স্বহস্তাঙ্কিত সুরুচিসম্পন্ন চিত্রাবলীতে সাজাইয়া মনের সুখে দিন যাপন করিতে লাগিল। সে ভাবিল দীনুর মনে একটা ঘা লাগিয়াছে, তাই সে একটু দূরে আছে। শীগ্গীর আবার ফিরিয়া আসিবে। আর এই কার্য্যে সতীশের কোনো দোষই ছিল না। যখন কেশব চক্রবর্ত্তী দীনুর হাতে কন্যা-সম্প্রদানের বাসনা সতীশের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন,—সতীশ বন্ধুর হৃদয়ের দিকে চাহিয়া যত না হউক, গঙ্গা-ময়ীর সুখের জন্য—সে প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিল। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ছিল অন্যরূপ। কাজেই ঘটনাও অন্যরূপ দাঁড়াইল। এজন্য দোষী কে?

যাহাহউক, দীনবন্ধুর দেশত্যাগের কথা কেহই কিছু মনে করিল না। সতীশ সময় সময় ভাবিত মাত্র। তবে সুখের জোয়ারে পাল খাটাইয়া যাহারা যায়, তাহারা দুনিয়ার খবরের জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে চাহে না।

(৫)

অন্ধকার কারাগৃহের স্যাঁৎস্যেঁতে ভিত্তির উপর কয়েকটী মানব সন্তান চক্ষুর জলে আপনাদের দিন কাটাইতেছিল। সুখ দুঃখের অতীতের দিনগুলিই এখন তাহাদের প্রধান চিন্তনীয়, আর চিন্তনীয় ভবিষ্যতের দিন।

একটী রমণী বন্দিনী কাতর স্বরে কহিতেছিলেন—"ভগবান! কি অপরাধে আমাদের উপর এই অসহনীয় অত্যাচার? কি পাপ করিয়াছিলাম আমরা। দূর বন প্রান্তে ক্ষুদ্র কুটীরে থাকিয়া আপন সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছিলাম—আমাদের উপর কেন এ দণ্ডবিধান?

এ জীবনে ত কারো কোন অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, তবে এ নির্য্যাতন কেন ?"

পুরুষ কণ্ঠে উত্তর হইল—আমি আমার দুঃখকে কিছু মনে করি না। আমি তোমার আর এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথাই ভাবি। তোমাদের কি অপরাধ ? হায়, আজ আমার জীবনের বিনিময়েও যদি তোমাদের মুক্তি দিত—"

"ছিঃ অমন কথা বলিতে নাই। তোমায় ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না। তুমি বাঁচিয়া থাক—আমার জীবনের বিনিময়ে যদি তোমাদের প্রাণরক্ষা হয়,—তাই আমার স্বর্গ সুখ।"

"কে আমাদের এমন বন্ধু আছে যে এই যমালয় হইতে মুক্ত করিয়া দিবে? যদি মুক্তি পাইতাম—যে দেশে দেবীসিংহের অত্যাচার নাই, যে দেশে জীবিত মানুষের চামড়া তুলিয়া নিবার মানুষ নাই, যে দেশে মানুষে মানুষ খায় না—সেই দেশে গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতাম।'

ঝনঝনাৎ রবে কারাগৃহের লৌহকবাট উন্মুক্ত হইল। চারিজন যমদূতাকৃতি বিকট প্রহরী ভিতরে প্রবেশ করিয়া বন্দীগণকে টানিয়া লইয়া চলিল। স্ত্রী পুরুষ ভদ্র ইতর নির্ব্বিশেষে সমান লাঞ্ছনায় এই কারাগৃহে বাস করিতেছিল। এখন সমান ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াই পশুবৎ নীত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী।

(৬).

"বন্দী, তুমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—এই অপরাধে তুমি ধৃত ও কারারুদ্ধ। তোমার নিকট রাজস্বও বহুদিনের বাকী।"

মুখ তুলিয়া বন্দী নির্ভয়ে উত্তর করিল—"ষড়যন্ত্র কাকে বলে, জানি না। কখনো ষড়যন্ত্র করি নাই—করিবার আকাঙ্ক্ষাও নাই। আর আমার মত ক্ষুদ্রের পক্ষে প্রবল প্রতাপ দেবীসিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চিন্তা করাও উন্মত্ততা মাত্র। আর, রাজস্ব—আমি কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিয়াছি।"

"তুমি মিথ্যাবাদী—তহশীলদার তোমার নামে বাকী লিখিয়াছে।"

"আমি মিথ্যাবাদী নহি—তহশীলদার মিথ্যাবাদী। এই মিথ্যাবাদিতার ফলেই আজ দেশে অত্যাচার—অবিচার—বিষম ——"

পরুষকণ্ঠে দেবীসিংহ কহিলেন—"চুপ কর্ শয়তান তোর উপদেশ শুন্‌বার জন্য এখানে আনা হয় নাই। দেশে অত্যাচার—কে বলে ? শীতলদীন্—শীতলদীন্—"

এক বিরাট মূর্ত্তি হুঙ্কার করিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বন্দীগণ এই মূর্ত্তি দেখিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—তাহাদের বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল।

"শীতলদীন এই বদমাইশকে নিয়ে যাও খাজানা আদায় কর। আর এই মাগী তার স্ত্রী—শাসন কর।"

"শীতলদীন দৃঢ়মুষ্টিতে বন্দীর হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। বন্দিনী ক্রোড়স্থ শিশুকে লইয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার পশ্চাতে ছুটিল।

(৭)

দেবীসিংহের অত্যাচার কাহিনী জগদ্বিখ্যাত বক্তা এড্‌মাণ্ড্ বার্ক মহোদয় ইংলণ্ডের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে দাঁড়াইয়া জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

বেত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গের চামড়া তুলিয়া দেওয়া, হাত পায়ের নখের নীচে সূঁচ ফুটাইয়া দেওয়া, প্রখর সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিতে বাধ্য করা প্রভৃতি দেবীসিংহের প্রথম এবং সামান্য শাস্তি। খাজানা আদায়ের জন্য বহুবিধ নূতন এবং ভীষণ দণ্ডের পরিকল্পনা করিয়া দেবীসিংহ তাহার প্রয়োগ করিতেন এবং প্রজা ও ভূস্বামীর সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মনস্তুষ্টি সাধন করিতেন।

* * * *

বন্দীর সম্মুখে—চোখের উপর তাহার সদ্যোজাত শিশুপুত্রের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করা হইল। তীক্ষ্ণ লৌহ শলাকা-মালা একখানি তক্তার উপর বসান—ঐ সকল লৌহ শলাকার উপর শিশুটীকে শয়ন করাইয়া দেওয়ায়—তাহার পৃষ্ঠদেশে সেই তীক্ষ্ণ শলাকাগুলি বিঁধিয়া গেল। হতভাগ্য শিশু যাতনায় চীৎকার করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল আর সর্ব্বাঙ্গে ঐ সকল লৌহ কণ্টক ফুটিতে লাগিল। বন্দী আপন দেহের উপর যাতনা সহ্য করিতে একটী বারও মুখ বিকৃত করে

নাই—কিন্তু শিশুর উপর এই অত্যাচারে সে অধীর হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল। কুসুম কোমল বালকের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত ধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল। হস্তপদ বদ্ধ বন্দী ও বন্দিনী এই দৃশ্য দেখিতে বাধ্য হইল। নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকিবারও সাধ্য নাই। শিশুর প্রাণহীন দেহ যখন অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল—তখন বন্দিনী মূর্চ্ছিতা। কঠোর শাসনে তাহার মূর্চ্ছা অপনোদিত হইলে পাষণ্ড শীতলদীনের অনুচরেরা হত-ভাগিনীর মুখে ঐ বালকের রক্ত ছিটাইয়া দিতে লাগিল।

এদিকে পাপিষ্ঠেরা বন্দীকে উলঙ্গ করিয়া তাহার দুই পা ফাঁক করিয়া বাঁধিল। এই ফাঁকের নীচে অগ্নি কুণ্ড করিয়া বন্দীকে শাসন করিতে আরম্ভ করিল। কখন বা লৌহ সূচীর উপর হাত রাখিয়া হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। লোহা পোড়াইয়া ছেঁকা দিতে আরম্ভ করিল।

* * * *

স্বামীর উপর এই সকল অমানুষিক নির্য্যাতন—সম্মুখে শিশুপুত্রের শবদেহ—বন্দিনী আর সহ্য করিতে পারিল না। কি উপায়ে এই দৃশ্য না দেখিয়া থাকা যায় সেই চিন্তাই অভাগিনী করিতেছিল। এখন ক্ষিপ্রহস্তে মাটী হইতে একটা প্রেক তুলিয়া লইয়া বন্দিনী স্বেচ্ছায় উভয় চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলিল। তারপর চীৎকার করিয়া অচৈতন্য হইল।

(৮)

"দীনবন্ধু! ভাই দীনু! তুমি আসিয়াছ—দেখ কি অত্যাচার!"—কাতরকণ্ঠে বন্দী চীৎকার করিয়া উঠিল।

দীনবন্ধু মহার্ঘ্য বসনে সজ্জিত। তাহার সঙ্গে চোপদার, বরকন্দাজ সসম্ভ্রমে ধীর পদক্ষেপে আসিয়াছিল।

"সতীশ, মূঢ় সতীশ! গঙ্গাময়ীর প্রেমের মুখ আজ বুঝিয়া লও। আজ আমার প্রতিহিংসার নিবৃত্তি হইল। শীতল দীন্—এদেরে ছাড়িয়া দাও। যাও গঙ্গাময়ী, অন্ধের প্রতি আমার আর ভালবাসা নাই। তোমার স্মৃতি আজ ভস্মে আবৃত করিলাম।"

গঙ্গাময়ী স্থিরকণ্ঠে কহিল—"ধন্য তুমি, মনে রাখিও এর প্রতিশোধ আছে। ভগবান আছেন,—আছেন,—ইহলোক না হৌক, পরলোকে—"

সতীশ কহিল "চল গঙ্গা—ভগবানের বিচার! তিনিই প্রতিশোধ দিবেন। চল—এদেশের পায় প্রণাম! যাও দীনু—তোমার কাজ তুমি করিয়াছ।"

"আমি কি করিয়াছি? এ মহারাজ দেবীসিংহের বিচার।"

(৯)

হরিদ্বার কুশবর্ত্ত ঘাটের উপর একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে এক শীর্ণকায়া অন্ধ যুবতী দিনরাত্রি চক্ষু-জলে বক্ষ ভাসাইত, আর স্বামীকে প্রতিহিংসায় উত্তেজিত করিত। যুবতীর বয়স পঞ্চবিংশতির বেশী না হইলেও তাহাকে প্রায় প্রৌঢ়া বলিয়া ভ্রম জন্মিত।

গঙ্গা দিন রাত্রি দেবীসিংহ আর দীনবন্ধুর উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিত। পুত্রহত্যার প্রতিশোধের জন্য স্বামীকে উত্তেজিত করিত। জীর্ণ শীর্ণ সতীশ কখন কখন গঙ্গার কথায় প্রতিশোধ পিপাসু হইয়া উঠিত। কখন বা ক্ষমা করিতে বলিত। গঙ্গা কহিত—"ক্ষমা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক।" সতীশ কহিত—"ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। আর দেবীসিংহের কিম্বা দীনবন্ধুর কি অনিষ্ট আমি করিতে পারি?"

"চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই। প্রতি পলে আমার শিশু পুত্রের মৃত্যু যাতনা আমাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। তারপর সেই যাতনাক্লিষ্ট মুখ দিবানিশি আমার চক্ষুর উপর ভাসিয়া বেড়ায়।"

(১০)

কুম্ভমেলায় হরিদ্বার লোকে লোকারণ্য। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী পারত্রিক মঙ্গল লাভের আকাঙ্ক্ষায় কুম্ভ-মেলায় সমাগত হইয়াছে। কত রাজা মহারাজ, কত দীন দরিদ্র হরিদ্বারে "গঙ্গামায়ী কি জয়" বলিয়া 'স্বর্গা-রোহণ বৈজয়ন্তী' গঙ্গার জলে অবগাহন করিতেছে। হিমাদ্রির জনবিরল পাদপীঠ আজ লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানের জয়ধ্বনিতে মুখরিত।

একখানি বড় বাড়ীতে আজ নিরানন্দের স্রোত বহিতেছিল। কাহারো মুখে হাসি নাই। লোক জন

দাস দাসী সন্ত্রস্ত। কত জন উদ্বেগ আশঙ্কায় এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতেছে। নানাস্থানে ঘোষণা দেওয়া হইতেছে "মহারাজ দেবীসিংহের শিশুপুত্র বহু মূল্য রত্নাভরণসহ অপহৃত। যে ব্যক্তি এই শিশুকে জীবিত অবস্থায় আনিয়া দিবে, সে লক্ষমুদ্রা পুরস্কার পাইবে। অলঙ্কারাদি অপহৃত হইয়া থাকে, কিছুমাত্র দুঃখ নাই।"

দেবীসিংহের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ দীনবন্ধুর সঙ্গে কুমারের ধাত্রী প্রত্যূষে গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গিয়াছিল। আর ফিরে নাই।

পরুষকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া দেবীসিংহ কহিলেন—"দীনবন্ধু, শয়তান, পথের ভিখারীকে রাজপদ দিয়াছিলাম—এই তার প্রতিশোধ? অলঙ্কারের লোভে আমার পুত্র হত্যা করিয়াছিস। আজ তোর নিস্তার নাই।"

বন্দী দীনবন্ধু সজল-চক্ষে করযোড়ে কহিল—আপনি আমার পিতৃস্থানীয়, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি শিশুকে হত্যা করার বা অলঙ্কার অপহরণের চিন্তাও কখন করি নাই। ঝির কোলে শিশু ছিল—আমি গঙ্গায় অবগাহন জন্য দু পা অগ্রসর হইবামাত্র পা পিছলিয়া পড়িয়া যাই, তারপর স্রোতে কোথায় গিয়াছিলাম, জানি না। শুনিয়াছি, এক নাগা-সন্ন্যাসী আমায় উদ্ধার করিয়াছেন। তারপর আমি বন্দী হইয়া এখানে আসি—আর কিছুই জানি না।"

"মিথ্যাবাদী—তোর এ শপথকে সত্য বলিয়া কারো ভ্রম হবে না। বল সেই ধাত্রী কোথায়?—আর এমন অবস্থায় এত অগণিত লোকের ভিড়ে শিশু নিয়ে আমাদের অজ্ঞাতসারে তোদের যাইবার মতলব কি?"

(১১)

আজ ৫ দিন ধরিয়া হরিদ্বারময় তোলপাড়—কিন্তু কিছুতেই দেবীসিংহের পুত্রকে পাওয়া গেল না। অর্থের প্রলোভন, উচ্চ রাজপদের প্রলোভন কিছুতেই যখন একটা কিনারা হইল না, তখন দেবীসিংহের দৃঢ় ধারণা হইল দীনবন্ধু ধাত্রীকে হত্যা করিয়াই হউক বা ধাত্রীর সহায়তায়ই হোক কুমারকে অপহরণ করিয়াছে। সুতরাং দীনবন্ধুর শাস্তি বিধান জন্য আজ দরবার বসিয়াছে।

দেবীসিংহ পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায়। তিনি কঠোর কণ্ঠে আদেশ করিলেন—"দীনবন্ধুর সর্ব্বাঙ্গের চামড়া তুলিয়া ফেল্—তার পর হারামজাদাকে একটু একটু করিয়া পোড়াইয়া বধ কর্।"

দণ্ডের কথা শুনিয়া দীনবন্ধু চীৎকার করিয়া উঠিল।

চারি জন বিকটাকার ঘাতক দীনবন্ধুকে ধরিয়া তুলিল।

এমন সময় আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃতা এক রমণীকে ধরিয়া এক মলিন, শ্রীহীন পুরুষ ধীরে ধীরে সভাস্থলে উপনীত হইল। পুরুষের মাথায় আলুলায়িত দীর্ঘকেশ, মুখে অযত্নবর্দ্ধিত শ্রীহীন শ্মশ্রু।

উভয়ে সভাতলে দাঁড়াইলে পুরুষটী সবিনয়ে কহিল—"মহারাজ, আমরা বাঙ্গালী। আমার পত্নী রাজপদে উপহার দিতে এসেছেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আদেশ করিলে কৃতার্থ হই।

রমণীর বক্ষে বস্ত্রাবৃত কিছু যেন নড়িয়া উঠিল।

দেবীসিংহের মানসিক ভাব ভাল না থাকিলেও তিনি তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন।

রমণী দেবীসিংহের নিকট উপনীত হইয়া মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া দেবীসিংহ কহিল—"অন্ধ রমণী! তুমি কি আনিয়াছ?"

রমণী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করিল—নানালঙ্কার ভূষিত দেবীসিংহের ঘুমন্ত শিশু।

বিস্মিত দেবীসিংহ চীৎকার করিয়া আসন ত্যাগ করতঃ কুমারকে বুকে তুলিলেন। দীনবন্ধু ঘাড় ফিরাইয়া বিস্মিত আতঙ্কে দেখিল—সেই অন্ধ রমণী গঙ্গাময়ী।

আনন্দ কোলাহলের মধ্যে সতীশ পত্নীকে লইয়া প্রস্থান করিল। দীনবন্ধু মুক্তি পাইল। কৃতজ্ঞতায় তাহার প্রাণ সেই নির্য্যাতিত দম্পতির প্রতি অবনত হইয়া পড়িল।

বহু অনুসন্ধানেও দীনবন্ধু বা দেবীসিংহ আর সেই দম্পতির সাক্ষাৎ পাইলেন না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চতুর্থ বর্ষ } ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩২৩। { দ্বাদশ সংখ্যা।

আগমনী।

এখনো নিবিড় নিদ্-আলসে
স্বপন আবেশ ঘোরে ঢলিয়া,
কে আছ প্রাসাদ সুখ লালসে
কে আছ পথের তৃণ দলিয়া।
হেরগো আঁধার আসে মিলায়ে
পবন সুবাস গেল বিলায়ে
কাননে পাখীরা থাকি' থাকিয়া
উঠে ডাকিয়া।

পাখীরা চেতনা আনে আঁখিতে
ঘুমের আসন যাহে রচিত,
কবি ত তারেই চাহে আঁকিতে
অনলে অনলে করি' খচিত।
পাখীর নিকটে কবে আসি' গো
কবিরা শিখিয়াছিল বাঁশী গো।
গাওগো বিহগ—বাজ বাঁশরী,
দুঃখ নাশরি।

বরষা রজনী ভরা বরষি'
আঁখির আকুল জলধারা গো
স্মৃতিটি রাখিল ভরি' সরসী,
নদীরে করিল কূলহারা গো।
ধরারে বাহুর পাশে বাঁধিয়া
বিদায় নিল সে কাঁদি' কাঁদিয়া;
বেদনা বিজুলী বাতি জ্বালিয়া
গেছে চলিয়া।

ধরার আননে মধু হাসিটি,
এখনো ফোটেনি ভালো করিয়া।
তাহার পুলক কাঁপা বাঁশীটি
এখনো উঠেনি তান ধরিয়া।
সবুজ হাসির নীচে লুকায়ে
কি ব্যথা যায়নি যেতে শুকায়ে—
কি ব্যথা অযুত নীল নীহারে
আহা-আহারে।

জননী!
তবুও সজল তারি দরশ
তোমারি পথের পরে ছুটিছে।
নয়নে শিশির শীত-পরশ
অরুণ-আভাসে হেসে লুটিছে।
গগনে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে গো,
নীলিমা নীরবে তোমা' ডাকে গো!
শেফালি তোমারি পথ ভরিয়া
আছে ঝরিয়া।

আয়গো জননি, আজি আয়গো
বরষ বরষ যথা এসো মা!
তেমনি করিয়া ওগো হায় গো
তোমার হাসিটি তুমি হেসো মা!
আয়গো আঁখির ধারা মুছায়ে
আয়গো মেঘের ঘোর ঘুচায়ে।
বাতাসে ছড়ায়ে তোর বাহুর ই
মোহ মাধুরী।

আজিকে পরাণে উঠে ফুটি' রে
এ কোন্ অভয় ভরা ভরসা.—
জননি! এ আলো নিভিবে কিগো কুটীরে,
বাহিরে ঘনাবে কিগো বরষা?
লভিয়া অমর তব পরশ
অমর হবে না কি এ হরষ?
কাননে শেফালিগুলি ফুটিয়া—
যাবে লুটিয়া?

আমরা পারি গো শুধু কাঁদিতে
বিধির বিধান শিরে বহিয়া!
সমুখে চাহিয়া বুক বাঁধিতে,
মনেরে আশার কথা কহিয়া!
যে বুক ভাঙিবে তুমি তা'রে গো,
জুড়াতে এসো মা বারে বারে গো!
বরষ বরষ যেয়ো আসিয়া
ভালোবাসিয়া।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আমাদের রেলের কাজ তখন দিন দিন অগ্রসর হইতেছিল, তখন একদিন বড় সাহেব আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। গিয়া দেখি তাঁহার একদিকে দুইজন নূতন সাহেব ও অন্যদিকে আমাদের রতিকান্ত। আমি সাহেবদিগকে সেলাম করিবার পর বড় সাহেব বলিলেন, "সর্দ্দার! (আমি শিখ বলিয়া সাহেব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কখনও "খানসামা" বলিয়া ডাকিতেন না। "সর্দ্দার" বলিয়া সম্বোধন করিতেন) ইনি কাপ্তেন ন এবং উনি মিঃ, পি। সরকারি কাজে ইঁহারা ইউগণ্ডা যাইতেছেন। ইঁহাদের সঙ্গে ১২ জন সিপাহী যাইবে। রতিকান্ত ইঁহাদের বড় বাবু হইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা তুমিও তাঁহাদের সঙ্গে গমন কর। এখন যে বেতন পাইতেছ, তাহার আড়াই গুণ বেতন পাইবে; আহারাদিও সরকার হইতে পাইবে।" অমৃতে কাহার অরুচি? এমন সুযোগ কে ছাড়িতে যায়? আমি সাহেবকে সেলাম করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

পরে শুনিলাম, এই দলে দুই জন সাহেব, রতিকান্ত, আমি ১২ জন সিপাহী ও ৫ জন খিদ্‌মদ্‌গার যাইবে। আমাদের সকলকে ঘোড়ার উপর যাইতে হইবে, কারণ কাজ বিশেষ জরুরি—যত শীঘ্র সম্ভব ইউগণ্ডা পহুছিতে হইবে। আমাদের সঙ্গের দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য ছয়টা খচ্চর নিযুক্ত হইয়াছে। সিপাহীরা অবশ্য সকলেই সশস্ত্র থাকিবে। রতিকান্ত ও আমি এক একটা বন্দুক ও রিভলভার সঙ্গে লইতে পাইব। পথ অত্যন্ত দুর্গম, হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। অনেক স্থানে অসভ্য অধিবাসীরা সিংহ, ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভয়ানক। সেইজন্য এইরূপ দলবদ্ধভাবে যাইতে হইবে।

পরদিবস প্রত্যুষে আমরা সকলে রওনা হইলাম। আমাদের এই ভ্রমণ কাহিণী বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা আমাদের গন্তব্য পথ সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ করিব।

এডেন উপসাগরের কূল হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত ভারতমহাসাগরের উপকূলে যে সমতল ভূমি বিস্তৃত তাহা ইটালির অধীন। এই জন্য ইহার নাম Italian Somaliland। ইহার ঠিক উত্তরে এডেন উপসাগরের কূলে British Somaliland অবস্থিত। Italian Somalilandএর পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে ভারতমহাসাগর পর্য্যন্ত যে ভূভাগ অবস্থিত তাহার নাম British East Africa। ইহার ঠিক পশ্চিম দিকে ইউগণ্ডা প্রদেশ। রডলফ্ হ্রদ (Lake Rudlof) British East Africaকে Uganda হইতে পৃথক করিতেছে।

উপরে আমরা যে সকল স্থানের নাম উল্লেখ করিলাম তাহার সকলগুলিই সমতল ভূমি। উহাদের অধিকাংশ স্থান হয় গভীর জঙ্গলে বা দিগন্তব্যাপী মরুভূমিতে পরিপূর্ণ। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সুবিস্তৃত ভূভাগে কোনও উল্লেখযোগ্য নদী নাই। মধ্যে ২ ক্ষুদ্র ২ স্রোতস্বিনী দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা এত ছোট ও এত অল্প গভীর যে উহাদিগকে নদী বলা যায় না। এ সকল প্রদেশে নদী না থাকিবার কারণ এই যে,

এ স্থানে পর্ব্বতের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং বৃষ্টির পরিমাণ খুব কম।

British East Africaর ঠিক দক্ষিণে German East Africa ইহারও সর্ব্বত্র সমতল। এই উভয় আফ্রিকার ঠিক মধ্যস্থলে কিলিমনজরো পর্ব্বত অবস্থিত। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে অনৈক জারমান্ মিশনরি সর্ব্বপ্রথম এই পর্ব্বত আবিষ্কার করেন। সমগ্র আফিকা মহাদেশের মধ্যে ইহা সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার উচ্চতা প্রায় ২০,০০০ ফুট ইহার উপরের অংশ নিরবচ্ছিন্ন বরফে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া অধিবাসীদিগের বিশ্বাস—ইহা সমস্তই রৌপ্য এবং ইহা রক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন দানব ঐ স্থানে সর্ব্বদা বাস করে। British East Africaর মধ্যে কেনিয়া নামক এক পর্ব্বত আছে, উহার উচ্চতা প্রায় ১৯,০০০ ফুট।

এই দুই পর্ব্বত হইতে অনেকগুলি স্রোতস্বিনী বাহির হইয়া চারিদিকে প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু উহার অধিকাংশই কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যাইয়াই শেষ হইয়া গিয়াছে। টানা নদী কেনিয়া হইতে বাহির হইয়া British East Africaর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ২ ষ্টিমার উহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে বলিয়া রেল হইবার পূর্ব্বে সমস্ত বাণিজ্য কার্য্য ইহার সাহায্যে চলিত। ইহার দক্ষিণে সভাসি নামক আর একটী নদী। ইহার মধ্যে ষ্টিমার অধিক দূর যায় না বটে, কিন্তু বড় ২ নৌকা অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এই সকল স্থানের সহিত য়ুরোপীয় ও আরবদিগের বাণিজ্য কার্য্য চলিতেছে। যেখানে নদী আছে সেখানে অবশ্য যাতায়াতের কোনও গোল নাই। কিন্তু এ সকল দেশের অধিকাংশ স্থানই গভীর জঙ্গল বা মরুভূমিতে আচ্ছন্ন—প্রায়ই পথ ঘাট নাই. সওদাগরেরা এইজন্য এই সকলস্থান অতিক্রম করিতে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করে। কেহ অশ্বে কেহ খচ্চরে, কেহ বলদে, কেহবা ঘোড়ায় কেহবা গর্দ্দভের উপর দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া এই দুর্গম প্রদেশে গমনাগমন করে। কিন্তু এতদ্দেশীয় অধিবাসীদিগের পৃষ্ঠে বোঝাই করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সকল দেশী কুলি এক একজনে ২।২॥ মণ জিনিষ লইয়া অনায়াসে ৬।৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে যাইতে পারে। এইভাবে উহারা ৬০০।৭০০ মাইল অবধি যাতায়াত করে। ইহার জন্য এখন প্রত্যেক কুলিকে দৈনিক ॥০ আনা হইতে ॥৵ আনা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। সওদাগরেরা এ সকল প্রদেশে প্রায়ই দলবদ্ধ ভাবে যায়। এক একদলে ৪০০।৫০০ পর্য্যন্ত লোক থাকে। উপযুক্ত অস্ত্র ভিন্ন কেহই যায় না। তথাপি অনেক সময় কুলিদিগকে পর্য্যন্ত বন্দুক দেওয়া হয়। এই সব অসভ্য জাতিরা প্রায়ই বিশ্বাসী হয় কখনও যে অবিশ্বাসের কাজ করে না, তাহা বলা যায় না। তেমন স্থলেই ইহারা প্রথমে সমস্ত ঠিক করিয়া রাখে, এবং উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া মনিবকে আক্রমণ করে, এবং তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। কখনও ২ এমনও হয় যে, কিয়দ্দূর যাইবার পর সহসা কোনও কারণে ইহারা মনিবের সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করে। মনিব যদি খুব চতুর না হয়েন, তাহা হইলে এক রাত্রে ইহারা চুপে ২ প্রস্থান করে। যাইবার সময় অবশ্য ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে বিস্মৃত হয় না। এই সমস্ত কারণে এই সকল দেশে বাণিজ্য করা অত্যন্ত কঠিন। ইহা ছাড়া জঙ্গলের জন্য এখানে ম্যেলেরিয়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব। একবার ধরিলে আর শীঘ্র ছাড়িতে চায় না।

প্রথম পাঁচ দিন আমরা গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলাম। এক এক স্থানে ইহা এত ঘন যে, মধ্যে মধ্যে গাছ কাটিয়া তবে পথ বাহির করিতে হইত। নানা প্রকার পক্ষী, খরগোস্, শৃগাল, বন্যবিড়াল, ও হরিণ পথিমধ্যে বিস্তর দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সাহেবদের আদেশ অনুসারে আমরা গমন করিতে লাগিলাম, শীকার করিবার অবসর হইল না। ষষ্ঠ দিনে জঙ্গলের ভাগ হ্রাস পাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় আমরা এক খোলা ময়দানে তাঁবু খাটাইলাম। আমাদের সঙ্গে তিনটা তাঁবু ছিল। একটায় সাহেবরা, দ্বিতীয়টায় ৮ জন সিপাহী ও চাকরেরা, এবং তৃতীয়টায় অবশিষ্ট সিপাহীরা ও আমরা দুইজন বাস করিতাম। সন্ধ্যার পর প্রত্যেক তাঁবুর দ্বারের সম্মুখে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হইত। উহা সমস্ত রাত্রি জ্বলিত, এবং প্রত্যেক তাঁবুর সম্মুখে

একজন করিয়া সিপাহী পাহারা দিত। শুধু যে হিংস্র-জন্তুর ভয়ে আমরা এ প্রকার সাবধান থাকিতাম তাহা নয়। এ সকল স্থানের অধিবাসীরা ঘোর অসভ্য। তাহাদিগকে আমরা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিতাম না। আমাদের ন্যায় অল্প লোকজন বিশিষ্ট দলের উপর উহারা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখে। একটু অসাবধান পাইলেই উহারা আক্রমণ করে।

রাত্রি আটটার পর আমরা সকলে আহারাদি করিয়া আপনাপন তাঁবুর মধ্যে শয়ন করিলাম। কাঠের বড় বড় খণ্ড প্রত্যেক তাঁবুর সম্মুখে জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। সিপাহীরা পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি এগারটার পর হঠাৎ একটা চীৎকার শব্দে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখি, রতিকান্তও উঠিয়াছে। এই সময় আমাদের পাহারার সিপাহী উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "সের মালুক হোতা হ্যয়। উঠো।" আমরা দুজনে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখি, সাহেব দুজন এবং কয়েকজন সিপাহীও বাহির হইয়াছে।

বাহিরে আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল বটে কিন্তু কাট কাঁচা বলিয়া চারিদিক ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য বাহিরে আসিয়া আমরা প্রথমে বিশেষ কোনও নুতন ব্যাপার দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু যখন আমাদের প্রহরী সম্মুখ দিকে দেখাইয়া দিল, তখন দেখিলাম প্রায় ২০।২২ গজ দূরে একটা বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় একটা জানোয়ার জানু পাতিয়া বসিয়া আছে। উহা যে কি তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, তবে সাহেব দুজন, এবং একজন সিপাহী যখন বিশেষ জোর করিয়া বলিলেন যে, উহা সিংহ তখন অগত্যা আমাদিগকে উহা বিশ্বাস করিতে হইল। আমাদের সঙ্গে অনেকগুলা ঘোড়া ও খচ্চর ছিল। তাহাদিগকে রাখিবার আর কোনও ভাল জায়গা ছিল না বলিয়া তাঁবুর সম্মুখে বাঁধিয়া রাখা হইত। আজও তাহাই করা হইয়াছিল। বন্ধন অবস্থায় সিংহ ও ব্যাঘ্র অনেকে দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে জঙ্গলের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখা খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। স্বাধীন অবস্থায় ইহাদের গা হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয়। আমরা তাঁবুর দরজায় দাঁড়াইয়া উহার গায়ের বোট্‌কা গন্ধ বেশ ভাল করিয়াই অনুভব করিতে লাগিলাম। ঘোড়াগুলা আতঙ্কে বিলক্ষণ লম্ফঝম্ফ করিতেছিল। এক একটা এমন লাফাইতে লাগিল যে, বোধ হইল এখনই বুঝি দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে সমস্ত সিপাহী ও চাকরেরা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কাপ্তেন সাহেব হুকুম দিলেন যে সিপাহী ও চাকরেরা যেন ঘোড়া ও খচ্চরগুলার পাশে দাঁড়াইয়া থাকে। রতিকান্ত ও আমাকে বন্দুক হাতে লইয়া প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ গত হইল।

রাত্রি প্রায় বারটার সময় সিংহটা অদৃশ্য হইয়া গেল। ১৫।২০ মিনিট পরে আমরা সকলে নিজ নিজ স্থানে যাইয়া শয়ন করিলাম। ইহার বোধ হয় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে বাহিরের অতি কাতর অথচ তীব্র স্বরে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিলাম সাহেবদের তাঁবুর পাহারাওয়ালা সিপাহী অগ্নির সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। একটা প্রকাণ্ড সিংহ অগ্নির অপর পাড়ে গুড়ি করিয়া বসিয়া আছে। অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিলাম, সিংহকে দেখিয়া প্রহরী ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। অপর দুইজন প্রহরী চীৎকার করিতেছিল মাত্র, কিন্তু উহাকে বাঁচাইবার জন্য আর কোনও চেষ্টা করে নাই, কারণ উহারাও যথেষ্ট ভীত হইয়া পড়িয়াছিল।

আমার সঙ্গে সঙ্গে সাহেব দুইজনও তাঁবুর বাহিরে আসিয়াছিলেন। কাপ্তেন সাহেব চকিতের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন, এবং বন্দুক উঠাইয়া গুলি চালাইলেন। ঠিক এই সময়ে সিংহ লম্ফ দিয়াছিল বলিয়া গুলিটা তাঁহার লক্ষ্যস্থল মস্তকে না লাগিয়া সম্মুখের পায়ের উপর লাগিল। জানোয়ারটা পড়িয়া গেল, কিন্তু নিমেষের মধ্যে উঠিয়া সাহেবের দিকে ছুটিল। মিঃ, পি, একজন ডাক্তার। ভবিষ্যতে আমরা ইঁহাকে ডাক্তার সাহেব বলিয়া উল্লেখ করিব। ইনি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, এখন সিংহের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক চালাইলেন। সৌভাগ্যক্রমে, এক গুলিতেই সব শেষ হইয়া গেল। পরে দেখা গেল, জানোয়ারটা লম্বায় ৯ ফুট ৭ ইঞ্চি। সে রাত্রে আমাদের আর ভাল নিদ্রা হইল না।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

লেখার তারিফ্।

তখন শীতকাল। বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। সন্ধ্যা হইতেই কন্‌কনে উত্তরে বাতাস বহিতেছিল। রাত্রি প্রায় ৩ টার সময় আমি, আমার সাহেব, তাঁহার মেম, চাকর, পিয়ন, চাপরাশী প্রভৃতি সকলে গিয়া রেল-গাড়ীতে উঠিলাম। সে বার আমরা কিছু বেশী দিনের জন্য সফরে বাহির হইয়াছিলাম।

পরদিন ভোরে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। সাহেব আমাকে তাহার কিছু কিছু মাল-পত্র সহ একটা অপেক্ষাকৃত সুবিধা মত স্থানে রাখিয়া দূরে গিয়া আড্ডা স্থাপন করিলেন।

তখন আমার নুতন চাকুরি। সাহেব যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন গুদামের চাবি তোমার নিকটে থাকিল। আমি কোনও জিনিষ চাহিলে তুমি নিজে বাহির করিয়া দিবে।

(২)

তিনদিন হইল সাহেব তাহার নূতন আড্ডায় গিয়াছেন। আফিস সংক্রান্ত কাগজ পত্র ছাড়া, ইহার ভিতর আর কোনও কিছুর জন্য তিনি আমাকে চিঠি লেখেন নাই।

একদিন প্রাতে বসিয়া আমি কাজ করিতেছি, এমন সময় সাহেবের একখানা চিঠি পাইলাম। অনেক কষ্টে তাহা পাঠ করিয়া বুঝিলাম, প্রভুর কয়েকখানি Tarpaulin (ত্রিপালের) প্রয়োজন। তবে সাহেবের কিজন্য ত্রিপালের প্রয়োজন তাহাও একটু ভাবিতে হইল। মনে করিলাম, চাকর-বাকরদের ঘুমাইবার বোধ হয় অসুবিধা হইতেছে, তাই ত্রিপাল চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। যাহা হউক তৎক্ষণাৎ গুদাম হইতে কয়েকখানি ত্রিপাল বাহির করিয়া লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিলাম।

ভোর প্রায় ৯ টার সময় কুলীকে বিদায় দিয়াছি; বিকালবেলা প্রায় ২ টার সময় সেই কুলি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আসিয়া ধরাস্ করিয়া ত্রিপালের বোঝা আমার সম্মুখে ফেলাইয়া বলিল "লেও বাবু তুমরা তিরপাল লেও। সাহেব হামারা উপড় বহুৎ গোস্বা হুয়া হায়, অউর ড্যাম্ ফুল্ বোল্‌কে হামরা উপড় বহুৎ গালাগালি কিয়া হায়।"

একি আপদ! নুতন চাকুরী সুতরাং ঝনাৎ করিয়া মাথাটা ঘুরিয়া গেল। কি জানি, যদি চাকুরীটী এইবারে খোয়া যায়!! তাড়াতাড়ি কুলির কথায় বাধা দিয়া বলিলাম "আরে, সাহেব কাহে গোস্বা হুয়া হ্যায়।" কুলি মহা বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিল "সাহেব মাঙ্‌তা হ্যায় তারপিন্, আপ্ ভেজা হ্যায় তির্‌পাল।"

আমি ত একেবারে অবাক্! তৎক্ষণাৎ বাক্স হইতে সাহেবের চিঠিখানা আবার বাহির করিলাম। নিতান্ত মনোযোগের সহিত পুনরায় উহা দেখিতে লাগিলাম; তথাপি কথাটা টারপলিন (Tarpaulin) কি টারপেন্‌টাইন্ (Turpentine) বুঝিতেই পারিলাম না!

যাহ'ক সাহেব যখন নিজে বলিলেন তার্‌পিন, তখন নিতান্ত বেয়াকুবের মত ত্রিপালগুলি গুদামে রাখিয়া একটা শিশিতে কিছু তারপিন্ পুরিয়া সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

এরূপ বিভ্রাট প্রায়ই ঘটিত। এত চেষ্টা করিতাম, তবু তাহার লেখাগুলি ভাল বুঝিতে পারিতাম না।

একদিন সাহেবের চিঠি পাইলাম তাহাতে লেখা ছিল (আমি পাঠ করিলাম) "I want a turn table" আমি একখানি টার্ণ টেবিল চাহি।

টার্ণ টেবল! এ আবার কি? আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ক্যাম্প টেবিল, ফোল্ডিং টেবিল, ডাইনিং টেবিল প্রভৃতি নানা রকম টেবিলের নাম শুনিয়াছি বটে কিন্তু এরূপ টেবিলের নাম ত কখনও শুনি নাই। ইঞ্জিন ঘুরাইবার জন্য ষ্টেশনে একরূপ টার্ণ টেবিল থাকে বটে কিন্তু সেই সহস্র মণে বোঝা ইমারৎ প্রভৃতি সহ টার্ণ টেবিল লইয়া সাহেব কি করিবে! এ অনুমান যে বাতুলতা অপেক্ষাও অধিক!! কাজেই বহু চিন্তা এবং গবেষণা পূর্ব্বক স্থির করিলাম কথাটা কখনই টার্ণটেবিল হইতে পারে না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবার ধ্যানস্থ হইব মনে করিলাম। ধ্যানে বসিবার পূর্ব্বে একবার 'টাইম' দেখারও প্রয়োজন হইল কেননা ধ্যানে থাকিতে থাকিতে যদি সাহেবের ডাকের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলেও তো চাকুরি লইয়াই টানাটানি লাগিবে।

যেমন 'টাইম' দেখিবার কথা মনে পড়া—অমনি সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। কথাটা 'টাইম টেবল' নয়ত ? তখন দিব্য চক্ষে যেন স্পষ্ট পড়িতে লাগিলাম "I want a time table"

আমাদের সঙ্গে উহা ছিল না ; ভয়ে ভয়ে সাহেবকে উত্তর দিলাম। সে যাত্রায় সাহেবের উত্তর পাইয়া হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

(৩)

আমি প্রায়ই এইরূপ মুস্কিলে পড়িতাম। আর যখন বিপদে দিশেহারা হইয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিতাম না তখন কেবলি ডাকিতাম—হা ভগবান ! তুমি ইহাকে একটু শিক্ষা দাও !

একদিন তাহাই ঘটিল। তখন বড় দিনের ছুটী হইতে মাত্র ২।১ দিন বাকি। আমি যেখানে ছিলাম, সেখানকার বাঙ্গলায় মেম সাহেবকে রাখিয়া সাহেব একটু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন।

হঠাৎ মেম সাহেবের একখানি চিঠি পাইলাম— "আমার জন্য একখানি গরুর গাড়ীর প্রযোজন।" কেন প্রয়োজন, তাহা কিছুই লেখেন নাই।

যাহা হউক মেম সাহেবের জন্য একখানি গাড়ীর বন্দোবস্ত করিলাম। পরদিন ভোরের বেলায় দেখি, মেম সাহেব তাঁহার মাল পত্র লইয়া ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন। চাকর বাকর দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বড়দিনের উৎসবে আমাদের মেম সাহেব তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ী যাইতেছেন।

যেদিন মেম সাহেব চলিয়া গেলেন, সেইদিন বিকাল বেলা একখানি ভগ্নপ্রায় ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছিলাম সাহেবও যদি কোথায় যায়, তাহা হইলে আমিও এ কয়টা দিন একবার বাড়ী বেড়াইয়া আসিতাম। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও যেন দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া বাড়ীর দিকে উড়িয়া গেল। আমি যেন তখন ঘরে গিয়া পৌছিলাম। ঘরের কত কথাই আমার মনে পড়িতে লাগিল ; আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল স্বর্গীয় ডি, এল রায়ের সেই গানটা :—

"আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা রং হোক্ মিশমিশে বা ফিটফিটে ॥"

আমি কতক্ষণ বসিয়া এইরূপ ভাবিতে ছিলাম বলিতে পারি না হঠাৎ অশ্বপদ শব্দে আমার চমক্ ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখি, আমাদের প্রভু সশরীরে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বাঙ্গলায় আসিয়া হাজির !

চৌকিদার বেটা তখন তাহার ঘরে বসিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া চেঁচাইতেছিল :—

"আরে রামা হো—উঁহু বড় সুন্দর।"

প্রভু তাঁহার ঘর দরজা সব বন্ধ দেখিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে হাঁকিলেন "ব্যারা" সেই নির্ঘোষে চৌকিদার বেটা পুঁথী কম্বল ফেলাইয়া এক লম্ফে সাহেবের নিকট আসিয়া ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক এক লম্বা সেলাম ঠুকিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হইল। সাহেব বলিলেন "মেম সাহেব কাঁহা।" চৌ—"হুজুর আজ কাঁহা গিয়া হায় ; কেরানী বাবু জান্‌তা।"

সাহেব—"বোলাও কেরানী বাবু কো।"

আমার তলপ পড়িল। আমি গিয়া হাজির হইলাম। সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মেম সাহেব কোথায় গিয়াছেন ? আমিত অবাক্ ! আমি বলিলাম—না সাহেব, আমি এই মাত্র জানি তিনি বড় দিনের উৎসবে তাহার কোন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছেন।" সাহেব—"Nonsence ! কি বোকামি ! তোমার কাছে চাবি আছে ?"

আমি—"না সাহেব, আমার কাছে কোন চাবিই নাই।" সাহেবের মুখ মণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। মহাবিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিলেন "I worder what she meant ! আমি তাহাকে স্পষ্ট লিখিয়াছি—তুমি বোলপুরে থাকিবে আর সে আমাকে না বলিয়া না কহিয়া কোথায় চলিয়া গেল !"

আমি বলিলাম" মেম সাহেবের সহিত আমার দেখা হয় নাই, তবে চাকর বাকরদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই বলিলাম। সহিস এখানে আছে, তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলে হয়।"

সাহেব তৎক্ষণাৎ চৌকিদারকে হুকুম করিলেন "বোলাও সহিস্ কো।"

সহিস বেচারী তখন এক ছিলিম গঞ্জিকা সেবন করিয়া সবে চক্ষে সর্ষপ পুষ্প দেখিতেছিল, এমন সময় তাহার তলপ পড়িল। বেচারা কাঁপিতে কাঁপিতে আসিল। সাহেব তাহাকে এক ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেম সাহেব কাহা জানতা হায় ?"

সহিস—"নেহি হুজুর।"

সাহেব যেমনি গর্জ্জিয়া "কাহে নাহি জানতা" বলিতে গিয়াছেন, অমনি বেচারা চক্ষু উপরে তুলিয়া ডিগবাজি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। বেগতিক দেখিয়া আমি ধীরে ধীরে বলিলাম "এখনি Head quarter এ সদর আফিসে একখানা টেলিগ্রাম করিলে হয়।"

সাহেব উত্তর করিলেন "তুমি বাবু বুঝিতে পার নাই, মেম সাহেব নিশ্চই অন্য কোথাও গিয়াছে।"

আমি—"আপনি তাহাকে কি লিখিয়াছিলেন ?"

সাহেব—"আমার দুর্ভাগ্য তাহাকে লিখিয়াছিলাম, তুমি আমার অপেক্ষায় বোলনপুরে গিয়া থাকিবে। আমরা যে জায়গাটাতে ছিলাম, তাহার নামই বোলনপুর।" আমি পুনরায় বলিলাম "সাহেব আপনার ভাগলপুরে কোনও আত্মীয় আছে কি ?" সাহেব বক্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া উত্তর করিলেন—"কেন ?"

আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলাম "কি জানি সাহেব, মেম সাহেব যদি বোলনপুর পড়িতে ভাগলপুর পড়িয়া থাকেন।"

চক্ষু বড় বড় করিয়া ঘুরাইয়া সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ও তাহা নিশ্চয়ই হইতে পারে না! আমি কখনই এত অস্পষ্ট লিখিনা যে, মেম সাহেব তাহা পড়িতে পারিবে না!" আমি বলিলাম "কি জানি সাহেব, তবে যদি—" সাহেব তৎক্ষণাৎ আমাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন "না না—Never think so—Babu, এরূপ মনে করবেন না—'t is ridiculous.—

বেগতিক দেখিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সাহেব গস্ গস্ করিতে করিতে একখানি চেয়ার টানিয়া বাঙ্গলার বারন্দায় বসিলেন।

(৪)

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। গৃহস্থের গোয়াল স্থিত ঘুটের ধূম্ররাশী আর্দ্র মৃত্তিকার সংস্পর্শে আসিয়া চারিদিক অন্ধকার প্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। সাহেবের তখন রাগ কমিয়া গেলেও ক্লান্তির অপনোদন হয় নাই। সুযোগ বুঝিয়া আমি বলিলাম "আপনি খুব ক্লান্ত হইয়াছেন; আপনার জন্য এক পেয়ালা চা আনিতে পারি কি ?" সাহেব আমাকে খুব ধন্যবাদ দিয়া চা আনিতে বলিলেন। আমি তাড়াতাড়ি চা আনিতে গেলাম। আমি চা না খাইলেও আমার সহিত চা থাকিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন খুলিয়া দেখি চা গুলি প্রায় খারাপ হইয়া গিয়াছে। নিরুপায় হইয়া সামান্য একটু আদার রস দিয়া সাহেবের জন্য চা প্রস্তুত করিলাম। পিপাসার মুখে সাহেবের কাছে চা খুব ভালই লাগিল। সাহেব অপ্যায়িত ভাবে বলিলেন "Nice flavour of ginger—বেশ আদার গন্ধ পাইতেছি।"

আমি বলিলাম "আমরা গরীব লোক অনেক সময় আদার রস দিয়া চা খাই।"

সাহেব একটু হাসিলেন। সাহেবের চা খাইতে খাইতে একেবারে রাত্রি হইয়া গেল। তাঁহার তখন আর কোথাও থাকিবার উপায় ছিল না। বিশেষতঃ শীতকাল, যেখানে সেখানে রাত্রিবাস করাও সম্ভবপর নহে। অগত্যা সাহেবকে আমার ঘরে রাত্রিবাসের জন্য অনুরোধ করিতে মনস্থ করিলাম।

সাহেবও আর উপায়ন্তর না দেখিয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

যখন রাত্রিবাস; তখন যাহাতে হরিবাসর না হয়, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলাম। এত বড় সাহেব চাকুরে—একজন গরীব নেটিভের ঘরে আহার করিবে কি! সাত-পাঁচ ভাবিয়া কথায় কথায় সাহেবকে বলিয়া ফেলিলাম "যদি দোষ না নেন, একটী কথা বলিতে পারি কি ?"

সাহেবের মেজাজ তখন খুব ঠাণ্ডা ছিল। একটু হাসিয়া বলিলেন "কি কথা!"

আমি—"দয়া করিয়া যদি এই গরীবের ঘরে চারিটী আহার করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।" সাহেব

একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "তা বেস, আমরাও ত সময় সময় মুসুরির ডাল, ভাত ইত্যাদি খাইয়া থাকি।"

তখন মহাউৎসাহে সাহেবের ভোজনের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। কপির পাতার চচ্চড়ি; মুসুরির ডাল, আলুর বড়া, ঝাল চিংড়ি, প্রভৃতি যত্ন পূর্ব্বক রাধিয়া সাহেবের সম্মুখে আনিলাম। কাটা চামচের পরিবর্ত্তে তরকারি কাটা ছুড়ি এবং ডাল নাড়া হাতা (অবশ্য খুব ছোট মাপের) উহার উপড় সাজাইয়া দিলাম।

সাহেব তৃপ্তিপূর্ব্বক ঐ সব আহার করিলেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম।

ভোজনান্তে সাহেবকে শুইতে দিলাম। আমি যে তক্তপোষ খানিতে ঘুমাইতাম তাহা অত্যন্ত ভাঙ্গা ছিল। কোন রকমে তাহাতে ঘুমাইতাম। ঐ তক্তপোষ খানিই আমার "সবে ধন নীলমনি।" কাজেই সাহেবকে উহা ছাড়িয়া দিয়া আমি আমার চাকরের মাচার উপর গিয়া ঘুমাইলাম। আর চাকর বেটা, মেজের উপর খড় বিছাইয়া উত্তম এক গদী বিছানা প্রস্তুত করিল।

সাহেব আমার তক্তপোষ খানিতে শুইয়া যেমন একটু নড়িয়াছেন, অমনি উহা একবার কোঁ করিয়া উঠিল। সাহেব আরও একটু নড়িয়া শুইলেন; তক্তপোষ আবার কোঁ করিল। সাহেবি মেজাজ ইহাতে অত্যন্ত চটিয়া গেল। সাহেব রাগিয়া যেমন ২।১ বার এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন অমনি কোঁ কোঁ কোঁ শব্দে ধরাস্ করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন "My good God! Help me Babu help me what a nonsense charpoi it is! ধর বাবু আমায় ধর, তোমার একি পাগলা চৌকি। চৌকির কোঁ কোঁ শব্দে তখনও আমার ঘুম হয় নাই। ছুটিয়া আসিয়া বলিলাম "What is the matter. Sir, have you got any hurt? সাহেব কি হইল? ব্যাথা পাইলেন নাকি?" 'না—না" রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে সাহেব উত্তর করিলেন "তবে হাতের এই জায়গার ছাল্ টা গেল!

সাহেব তখন দস্তুর মতন রাগিয়া গিয়াছিলেন। মুখ কান সব লাল হইয়া গিয়াছিল। দুই পদাঘাতে তক্তপোষ খানিকে বাহিরে ঠিকরাইয়া ফেলিলেন। বিছানাটা টানিয়া মাটীতে ফেলাইয়া বলিয়া উঠিলেন "আমি মাটীতেই ঘুমাইব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তুমি কিরূপে এই তক্তপোষে ঘুমাইতে।"

আমি উত্তর করিলাম "কি করিব সাহেব, মফঃস্বলে ভাল তক্তপোষ কোথায় পাইব। আর (Camp cot) ক্যাম্পকট কিনিবার সামর্থও আমাদের নাই।"

আমিও তাঁহাকে কোনরূপে মশারি টানাইয়া দিয়া বাহিরে আসিলাম। সাহেব নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন।

(৫)

বোলনপুর হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন ছয় মাইল। পরদিন অতি প্রত্যুষেই সাহেব গুড্ মর্ণিং বলিয়া বিদায় হইয়া গেলেন। আমিও হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। দুই দিন পর সাহেবের নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম তাহাতে লেখা ছিল "মেম সাহেব নিতান্ত বোকামী করিয়া ভাগলপুরে গিয়াছেন। সেখানে তাহার ভাই চাকুরি করেন। আমি তাহাকে আনিবার জন্য অদ্যই সেখানে রওনা হইতেছি। তুমি ইচ্ছা করিলে ছুটীর কয়েক দিন অন্য কোথাও বেড়াইতে যাইতে পার।"

সাহেবের চিঠি পড়িয়া বাস্তবিকই আমি হাসিয়া ফেলিলাম। ইহাকেই বলে লেখার তারিফ্। তাহার লেখার গুণে আমি যে বেগ পাইতাম, মেম সাহেব এবার তাহাকে সেইরূপ বেগ পাওয়াইল। ইহা ভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই!

বড়দিনের বন্ধ কাটিয়া গেল। ছুটীর পর বাসায় আসিয়া দেখি আমার নামে কোনও সাহেবের বাড়ী হইতে একখানি রেলওয়ে রসিদ আসিয়াছে আর তাহার সঙ্গে একখানি পত্রে লেখা আছে :—

মিঃ—র আদেশ মত আপনার জন্য একখানি ক্যাম্পকট (Campcot) পাঠাইলাম। ইহার মূল্য আমরা পাইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ষ্টেশন হইতে উহা আনাইয়া লইবেন।"

তখন বুঝিতে পারিলাম এই লেখার তারিফের গুণেই আমার এই খট্টা লাভ!

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সেন।

নব যুগ।

(দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণে।)

সেকেলে ধরণ লাগেনা ভাল আমরা হয়েছি সভ্য,
নূতন যুগের নূতন ধরণে আমরা যুবক নব্য।
বাপ পিতামহের ব্যবহার করা যত অন্ধ বিশ্বাস,
কুতর্কের ঝড়ে উড়াইয়া দিতে লাগেনা এক নিশ্বাস।
সাগর লঙ্ঘিয়া বিদেশে যাইব, বিদ্যা শিখিব কত,
সমাজে ধর্ম্মে দেখাব রম্ভা, হইবে না শির নত।
পিড়িতে বসিয়া উদর ঠাঁসিয়া চাইনা খাইতে আর,
চেয়ার টেবিলে মুরগী মার্টন চলিয়াছে অনিবার।
খোলা চোখে আর দেখিনা কিছুই, চস্‌মা এটেছি নাকে,
মুখে সদা বোল্‌ 'এংলো বেঙ্গলী' 'কেয়ার' করিনা কাকে।
ধূতি ও চাদরে বেজায় ঘৃণা 'কোটপেণ্টালুন্‌ চাই,
শরীর দেখান বড় অসভ্যতা, গরমে ম'লেও ভাই!
নাম গুলি সব বিলাতি ছাঁচে গড়িয়া লয়েছি বেশ,
'সেইন' 'মিটার' 'রয়' 'ডে'—চলেছে জুড়িয়া দেশ।
কলেজে পড়িয়া 'নলেজ' পেয়েছি—'ওল্ডফুল' বুড়ো বাপ্‌,
বন্ধু মহলে বাজার সরকার দেই পরিচয় সাফ্‌।
প্রাদেশিক সভা, সাহিত্য সমিতি নবীন যুগের তন্ত্র,
পুরোহিত সেজে হই গে দাখিল, যদিও না জানি মন্ত্র।
ওদিকে আবার অন্দর মহলে নবীন যুগের ঢেউ,
খেলিছে বিষম লহরে লহরে রহিল না বাকী কেউ।
কোথা সেই সব লক্ষ্মী প্রতিমা দয়াময়ী অন্নপূর্ণা,
সরল পরাণে ভাবিত যাহারা 'নারীর কর্ত্তব্য রান্না'।
বিলাস-লালসা আলস্য উদাস জানিত না কারে কয়,
কথায় কথায় ধরিত না মাথা, ছিল না মূর্চ্ছার ভয়।
গিন্নীরা এখন কার্পেট বুনেন, 'কুক্‌ সার্ভেন্ট' হেঁশেলে,
কাটিতেছে দিন 'পিয়ানো' বাজায়ে কিম্বা নাটক নভেলে।
পৌরুষ ধরণে রমণীগণের কলুষমাখা শিক্ষা,
আনিয়া দিতেছে জেনানা মহলে বিলাসের নব দীক্ষা।
ভক্তি প্রীতি স্নেহ দয়া সরলতা রমণী সুলভ গুণ,
নবীন যুগের নবীন শিক্ষায় ক্রমেই হতেছে উন।
রোগীর শুশ্রূষা, অতিথি সৎকারে, মাথায় পড়িছে বাজ,
কতই নারাজ গৃহিণীরা আজ করিতে গৃহের কাজ।
এ সাম্যের দিনে হইতে তাহারা পুরুষের সমকক্ষ,
জেনানা মহলে 'স্বরাজ' প্রচারে যুঝিছে বাঁধিয়া বক্ষ।
নূতন যুগের নূতন হাওয়া বহিছে বাঙ্গলা ময়,
চুলোয় যাক্‌ সে সেকেলে ধরণ—নূতন যুগের জয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কালিদাস স্ত্রী ও পুরুষ।

(তাম্রলিপি আলোচনা।)

পূর্ব্ব কথা।

আমরা ৩য় বর্ষের প্রথম সংখ্যা সৌরভে "কালিদাস স্ত্রী কি পুরুষ"? শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া ইয়ুরোপ ও এসিয়ার বিভিন্ন দেশে কালিদাস স্ত্রী কি পুরুষ এ সম্বন্ধে যে ধারণা বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি। ঐ প্রবন্ধে আমরা "আমাদের যত্ন সংগৃহীত একখানা অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব প্রাচীনতম তাম্রলিপির আলোচনা দ্বারা উক্ত মহাকবির লিঙ্গ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব" বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। অদ্য বর্ষাধিক কাল পরে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলাম।

'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ'—যা রটে তা বটে। ইয়ুরোপ ও এসিয়ার সভ্য সমাজ জুড়িয়া এতদিন যে একটা প্রবাদ রটিয়া আসিতেছে তাহা যে একেবারেই না বটিয়া যাইবে এমন প্রত্যাশা করা ধৃষ্টতা না হইলেও উচিত নয়।

সম্প্রতি আমাদের অদম্য অধ্যবসায় ও গভীর গবেষণার ফলে আমরা যে একটী অমূল্য তাম্র পট্ট হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহার সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আমরা সাহস সহকারে বলিতেছি আমরা একটী চির বিবদমান অদ্ভুত সত্য সভ্য জগতের নিকট সপ্রমাণ করিয়া দিয়া সমাজকে চমৎকৃত করিয়া দিতে সমর্থ হইব। এবং যাঁহারা "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" কে একেবারে "প্রলাপ" বলিয়া অভিহিত করেন,তাঁহাদিগের এই অমূলক ধারণাকে প্রত্যাহার করাইতে সমর্থ হইব।

তাম্রফলকের বিবরণ।

আমরা যে তাম্র ফলকের উল্লেখ করিতেছি তাহার বিবরণ এইরূপ—বিগত ১৩২১ সালের ২১ বৈশাখ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অতঃপাতী বরেন্দ্র মণ্ডলে কালিদাস নামক গ্রামে এই তাম্র পট্টখানি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কালিদাস গ্রাম শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর মতে "শ্রীমদ্বিক্রমপুর সমবাসিত জয়স্কন্ধাবারের অধীন।" এই মত পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে।

সে দিন বৈশাখের নির্ম্মল প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ঢাকা মিউজিয়মের বার্ষিক রিপোর্টটা পড়িতে-ছিলাম এমন সময় আমার এক প্রতিবাসী আসিয়া আমাকে সংবাদ দিলেন যে কালীদাস নিবাসী জনৈক হালুয়াদাস-গৃহে একখানা ওজনী তামার পাত পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে অস্পষ্ট লেখার চিহ্নও বিদ্যমান। দাস নন্দন এতদিন এই তাম্রপট্ট খানাকে নাকি বিশেষ যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি অভাবে পড়িয়া বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

চারিদিগের প্রত্নতত্বের আবহাওয়ায়, এবং পত্রিকা সম্পাদকদিগের দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ কাতরুক্তিতে যখন আমিও সাবল কোদালের সহিত সখ্য সংস্থাপনে ব্যস্ত ছিলাম—ঠিক এই সময় আমার কর্ণে এই সংবাদটী যেন অমৃত সিঞ্চন করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ দ্বিরুক্তি না করিয়া আমি সেই তাম্রপট্টের আশায় দাস ভবনের দিকে যাত্রা করিলাম।

ফলক আবিষ্কার বিবরণ।

যথাসময়ে দাস ভবনে উপনীত হইয়া নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করা গেল।

দাস কুল-তিলক রামদাস যখন নিজ হস্তে কোদালী সংযোগে তাহার একখানা নবগৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন হটাৎ তাহার কোদালের আঘাতে তাম্রফলকখানা মৃদুমন্দ ধ্বনি করিয়া তাহার প্রাণে একটা অভাবনীয় আশার আলোক জাগাইয়া আত্মপ্রকাশ করে। রামদাস তাহা সতর্ক-যত্নে ও বিপুল উৎসাহে ভুমি গর্ভ হইতে টানিয়া তুলিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া যায়। ইহা কি? যাই হউক অবশেষে সে সকল প্রলোভন দমন করিয়া সুদিনের প্রতীক্ষায় ঐ তাম্রফলককে তাহার পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদ ও বাস্তুদেবতার দান বলিয়া এতকাল যত্নে রক্ষা ও তাহার নিয়মিত পূজা করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি অভাবের তাড়নায় সে তাহা বিক্রয় করিতে উদ্যত।

আমি তাম্র ফলক খানা দেখিয়া এতই উৎফুল্ল ও বিহ্বল হইয়া পড়িলাম যে "কার্কশ্য ক্রয় বিক্রয়ে" এই নীতি বচনটী ভুলিয়া গিয়া' "যত্র দাবি তত্র মূল্যেই" তাম্রলিপি খানা হস্তগত করিলাম।

তাম্র ফলকের আকার।

তাম্র ফলকখানা খুব বড় নহে। ৬ ইঞ্চি প্রস্থ ও ১২ ইঞ্চি দীর্ঘ। ⅛ ইঞ্চি পুরু, এক পৃষ্ঠা লেখা। উৎকীর্ণ অক্ষর গুলি ক্ষয় পাইয়াও স্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে। লেখা মাত্র ৫ পংক্তি। পংক্তি পাঁচটীর উপরে একটী গোল সিংহাসন স্থাপিত। সেইস্থানের উৎকীর্ণ লিপিঅর্দ্ধচন্দ্রাকারে বর্ত্তমান থাকিয়া উপরের দিকে একেবারে ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে। এই অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি অংশ হইতে সেখানে কতগুলি নগ্ন মূর্ত্তি ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। মূর্ত্তিগুলি যেন একটী সিংহাসনকে বহন করিতেছিল।

তাম্র লিপির পাঠ উদ্ধার।

আমি আর কখনও তাম্র শাসনের পাঠ উদ্ধার করি নাই। সুতরাং কি প্রকারে পাঠোদ্ধার করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া চিন্তিত হইলাম। শুনিয়াছিলাম চকের প্রলেপ দিয়া নাকি তাম্র শাসনের পাঠোদ্ধার করিতে হয় সুতরাং আমি চক গলাইয়া তাহা ঐ তাম্রফলকখানির উপর ঢালিয়া দিয়া তাহা একেবারে সাদা করিয়া ফেলিলাম; কেবল বাকী রহিল উপরের অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি স্থান টুকু। এমন সময় বেদতীর্থ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে বলিলেন—"যাহা করিয়াছেন তাহার আর উপায় নাই, এখন অঙ্গার লউন। আমরা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে এরূপ কত পাঠোদ্ধার করিয়াছি।" আমি অঙ্গার আনিয়া উপস্থিত করিলে তিনি অক্ষর গুলির উপরে অঙ্গার ঘসিয়া পুনরায় তাহা

কাল করিয়া লইলেন। তারপর তাহার সাহায্যে আমরা তাম্র শাসনের নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিলাম।

তাম্র লিপি।

১ম পংক্তি—কালীতে বনি তাহি দাস বিদুষী তদ্বিদ্যয়া
২য় পংক্তি—গৌরবিন্ তস্মাত্বাং নবরত্ন মধ্য মুকুটংপ্রীত্যা
৩য় পংক্তি—বিধাস্যাম্যহং সংযোজ্যে হ্চ সংজ্ঞয়া ত্বদভিধাংপ
৪র্থ পংক্তি—ত্ন্যাস্ত কাল্যসমং ঈ হ্রস্বস্তব দাস গৌরব ব
৫ম পংক্তি—শাত্তৎ কালিদাসঃ কবি ॥

পাঠোদ্ধার করিয়া উভয়ে অর্থ গ্রহণে যত্নবান হইলাম। দেখিলাম ইহা একটী চারি ছত্রের কবিতা। আমরা প্রথমতঃ তাহাকে কবিতাকারে কাগজে লিপিবদ্ধ করিলাম; তখন তাহার পাঠটী দাঁড়াইল এইরূপ :—

কালীতে বনিতাহি দাস বিদুষী তদ্বিদ্যয়া গৌরবিন্
তস্মাত্বাং নবরত্ন মধ্য মুকুটং প্রীত্যাবিধাস্যাম্যহং
সংযোজ্যেহ্চ সংজ্ঞয়া তদভিধাং পত্ন্যাস্ত কাল্যা সমং
ঈ হ্রস্বস্তব দাস গৌরববসাত্তৎ কালিদাসঃ কবি ॥

লিপির অর্থ গ্রহণ।

এই তাম্রলিপি খানা সেকালের একখানা উপাধি দান পত্র। তাহাতে দাতার নাম নাই কিন্তু উহার উপরের সিংহাসনাঙ্কিত মোহর দেখিয়া বুঝা যায় যে বত্রিশ পুত্তলিকা সম্বলিত সিংহাসনের অধীশ্বর শ্রীশ্রীশ্রী মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহার নবরত্ন সভার দাস নামক কবিকে তাঁহার স্ত্রী কালীর অসামান্য গুণবত্তার জন্য উক্ত সভার শ্রেষ্ঠ কবি করতঃ—তাঁহাকে "কালিদাস" উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া এই উপাধি পত্র প্রদান করিয়াছেন।

উপাধি পত্রের সরল বঙ্গানুবাদ এইরূপ —

হে দাস, তোমার ভার্য্যা কালী বিদুষী; তুমি তাঁহার বিদ্যায় গৌরবী, সেই জন্য প্রীতি বসতঃ আমি তোমার পত্নী কালীর নামের সহিত তোমার নাম যোগ করিয়া এই নবরত্ন সভার রত্ন-দিগের মধ্যে তোমাকে মুকুট তুল্য করিব। হে দাস তোমার গৌরব বসত (স্বামী হেতু) কালীর ঈ কার হ্রস্ব হইবে এবং তুমি—"কালিদাস" কবি বলিয়া পরিচিত থাকিবে।

এই তাম্রলিপি খানা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে মহাকবি কালিদাস স্ত্রী ও পুরুষ। সুতরাং উভয় লিঙ্গ এবং দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন শব্দ।

কবি কালিদাসের নিবাস।

এইক্ষণে এই তাম্র শাসনোক্ত কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের বাসস্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব।

তাম্র পট্টখানা যে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই গ্রামের নামও কালিদাস। এই কালিদাস গ্রাম ঢাকা ময়মনসিংহ রেল রাস্তার শ্রীপুর ষ্টেশন হইতে ফুলবাড়ীয়া যাইয়া তথা হইতে ডিঃ বোঃ রাস্তায় ৭ মাইল গেলে কালমেঘা গ্রাম। এই কালমেঘা হইতে পশ্চিম উত্তর কোণে ৫ মাইল দূরে কালিদাস গ্রাম বিদ্যমান। কাল মেঘার ১০।১২ মাইল দক্ষিণে রামগিরি। কেহ কেহ বলেন এই রামগিরিতে থাকিয়াই কবি তাঁহার "মেঘদূত" লিখিয়াছিলেন। রামগিরির সংলগ্ন গ্রামই "উত্তর মেঘা"। এই—রামগিরি, কালমেঘা, উত্তরমেঘা, প্রভৃতি গ্রামের একত্র অবস্থিতি হইতে সুস্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস এই ভূমি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সেটেলমেণ্ট জরিপের Revenue

Officerও তাঁহার রিপোর্টে এই কালিদাস গ্রাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

"It is said that the great poet Kalidas flourished here in the sixth century A.D." &c.

বোধ হয় অতঃপর যাঁহারা কালিদাসকে পেত্নীতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া গভীর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাদের পক্ষে আর কিছু বলিবার নাই।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী সঙ্গত আলোচনা।

কিছুদিন পরেই আমি এই তাম্রপট্ট খানা আমার কোন কালিকাতিক-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সঙ্গত ঐতিহাসিক বন্ধুর নিকট উপস্থিত করি। তিনি আমাকে নানারূপে প্রশ্ন করিয়া ইহার আবিষ্কার সম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর গম্ভীর ভাবে বলেন :—

"তাম্রপট্ট খানা বৈজ্ঞানিক প্রণালী সঙ্গত উপায়ের অনুকূলে আবিষ্কৃত হয় নাই। অথবা তুমি যে বিবরণ দিয়াছ, তাহা ঠিক নহে। যাই হউক ইহাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সঙ্গত করিয়া লইতে হইবে।"

আমি বলিলাম কি কি কারণে প্রণালী-সঙ্গত হয় নাই?

তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—

"১ম—তাম্র পট্ট খানা যত প্রাচীন, তাহা মৃত্তিকার তত নীচে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

২য়—পাঁচ ছয় হাত নীচে পাওয়া যাওয়ায় অক্ষরগুলি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর মত রহিয়া গিয়াছে। মৃত্তিকার যতই নিম্নে পাওয়া যাইত ততই অক্ষরগুলি প্রাচীন হইত, সময়ও পশ্চাতে যাইত।

৩য়—বৈজ্ঞানিকেরা বলেন প্রতি শতাব্দীতে তামা গড়ে দুই হাত ও লোহা চারি হাত ভূমি বিদীর্ণ করিয়া নীচে যাইয়া থাকে।

৪র্থ—তাম্রপট্ট খানির উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া থাকা উচিত ছিল এবং কোদালের আঘাতে ক্ষত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

আমি বলিলাম—কেন? তিনি হাসিয়া বলিলেন—তাম্রাকর্ষণ ও লৌহ সম্পর্ক—তোমরা Sanskrit Student বুঝিবে না। যাই হউক সেগুলি আমি দেখিব এবং যাহাতে ইহার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ বর্দ্ধমান সম্মিলনে পাঠ করিতে পারি, তাহা করিব।

বর্দ্ধমান সম্মিলনে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন—"ইতিহাস শাখায় বঙ্গীয় ও রাঢ়ীয় সাহিত্যিক-গণের বিদ্রোহ দমন জন্য অধ্যাপক সরকার Martial Law ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং এবার আর এই প্রবন্ধ পাঠ করা সঙ্গত মনে করিতেছি না। যশোহরেই এই প্রবন্ধ দ্বারা রাঢ়ের উপর কিস্তি দেওয়া যাইবে। তবে কৃষ্ণনগরে একবার যাইয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিয়া রাখিলেই হইবে যে 'কালিদাস বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।" তবেই নবদ্বীপের Tablet postponed থাকিবে।

যশোহরে সম্মিলন জমে নাই। ঐতিহাসিক বন্ধু বাঁকিপুরে এ বিষয় পৃথক ভাবে আলোচনা করিবার বন্দোবস্ত করিবেন ভরসা দিয়াছেন। আমরাও সুতরাং আমাদের বাকী মন্তব্য আরও কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখিলাম।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গোবর্দ্ধন বাবুর বক্তৃতা।

(শারদীয় সংখ্যা সৌরভের জন্য সংগৃহীত।)

"ভাষাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারি যে এই ভারতবর্ষ হইতেই লোক গিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাস করিয়াছিল। ইয়োরোপীয়েরা যে ভাবে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহা নানারূপে ভ্রান্তি সঙ্কুল। গ্রিম্ সাহেবের ভাষা তত্ত্বের নিয়ম একেবারে অলীক। তাহা তৎকৃত Fairy Tales এর ই সদৃশ।"

একজন শ্রোতা উঠিয়া বলিলেন "Grimm's Law প্রণেতা এবং Grimm's Fairy Tales প্রণেতা ত এক ব্যক্তি নহেন।"

গোবর্দ্ধন বাবু:—"আরে কি আপদ। আমার কথাটাই শুনুন। আপনারা Grimm's Law তে বিশ্বাস করিলে পদে পদে প্রতারিত হইবেন। আমি তাহা

তত্ত্ব বিদ্যার গূঢ় রহস্য সম্পূর্ণ অবগত হইয়াছি। আমার বক্তৃতা শুনিলে এই বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে আপনাদের অধিগত হইবে। অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই। একেবারে আমার বক্তব্য আরম্ভ করি।

"ইয়োরোপীয় ভাষা-তাত্ত্বিকদিগের পরস্পরের মধ্যে মতের মিল নাই। প্রথমে ইংরেজী Elephant শব্দটা ধরুন। কেহ কেহ বলেন যে এই শব্দটা সংস্কৃত পীলু শব্দ হইতে হইয়াছে। পীলু শব্দের অর্থ যে হস্তী ইহা সকলেই জানেন। পীলু হইতে পারসী পীল ও ফীল হয়, ইহাও বোধ হয় বঙ্গদেশের সর্ব্বজন বিদিত। যে হেতু সকলেই জানে যে হস্তিশালাকে পীলখানা এবং ফীল খানা বলে। আবার যাঁহারা দাবা খেলা জানেন তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে গজকে পীলও বলে ফীলও বলে। এই ফীল শব্দ আরবীতে আল্‌ফীল হয়। সংজ্ঞা মাত্রেরই পূর্ব্বে আরবীতে একটা আল্‌ বসিয়া থাকে। যথা আল্‌ কোরান, আল জেব্রা, আলিগেটর প্রভৃতি।"

একটী শ্রোতা—"আলিগেটর ত আরবী শব্দ নহে। উহা যে স্পেনীয় শব্দ।"

গোবর্দ্ধন বাবু:—"অরে কি আপদ। স্পেনীয়েরা হে আরবদিগের নিকট হইতেই আল্‌ গ্রহণ করিয়াছিল। সে যাহা হউক এই আল্‌ফীল শব্দ হইতেই গ্রীক এলিফাস এবং লাটিন এলিফাণ্টস হইয়াছে। এই ব্যুৎপত্তি ইয়োরোপের সকল ভাষাতত্ত্ব বিৎ স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বলেন যে পীলু হইতে Elephant হয় নাই কিন্তু ইভ হইতে হইয়াছে। সংস্কৃত ইভ শব্দও হস্তী বুঝায় ইহাও আপনারা সকলে অবশ্যই অবগত আছেন যেহেতু ইভ হইতেই ইংরেজী Ivory শব্দ হইয়াছে। ইভই আরবীতে আল্‌ইভা এবং আল্‌ইভা শব্দ হইতে গ্রীক ও লাটিন শব্দ পূর্ব্বোক্তরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আর একদল ভাষাতত্ত্ববিৎ বলেন যে Elephant শব্দ পারসী "আলেফ হিন্দী" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আলেফ্‌ হিন্দী শব্দের অর্থ "ভারতবর্ষীয় বৃষ।" অতএব আপনারা দেখিলেন যে ইয়োরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের মতের ঐক্য নাই। এই তিনটা ব্যুৎপত্তির যে একটাও প্রকৃত নহে তাহা আমি আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি। প্রথমেই তৃতীয় ব্যুৎপত্তিটার বিচার করুন। হাতীর মত একটা জন্তুকে বৃষ নাম কেবল বৃষেরাই দিতে পারে। বৃষেরা যদি কথা কহিতে পারিত তাহা হইলে তাহা সম্ভব হইত। কিন্তু তাহারা যখন কথা কহিতে পারে না তখন কোন বুদ্ধিমান্ জীবই বিশ্বাস করিতে পারে না যে আলেফ হিন্দীই Elephant এর জনক। তাহার পর প্রথম দুইটা ব্যুৎপত্তির কথা বলিতেছি। কোথায় পীলু, আর কোথায় ইভ! অর্থে এক হইলেও উচ্চারণের বৈশাদৃশ্যের কথা একবার মনে করিবেন। এই দুইটা ব্যুৎপত্তিই সত্য হইতে পারে না। কিন্তু আমি বলিতেছি যে ইহার একটাও সত্য নহে। পীলু বা ইভ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিলে ইংরেজী Elephant এবং লাটিন Elephantus শব্দের আণ্ট কোথা হইতে আসিল? আমি আপনাদিগকে Elephantএর প্রকৃত ব্যুৎপত্তির কথা বলিতেছি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে যাহারা জঙ্গলে গিয়া হাতী ধরে তাহাদিগকে ফাঁদী বলে। প্রত্যেক ধৃত হাতীই এক এক ফাঁদীর তত্ত্বাবধানে থাকিত। চন্দ্রগুপ্তের সভায় সেলিউকস্‌ দেখিতেন যে যখনই হাতীর প্রয়োজন হইত তখনই ফান্দীর ডাক পড়িত। সে হাতী লইয়া উপস্থিত হইলে সেলিউকস ভাবিতেন যে হাতীকেই ফান্দী বলে। তিনি তাহার পূর্ব্বে আল্‌ উপসর্গ লাগাইয়া কয়েকটা হাতী গ্রীসে পাঠাইবার সময়ে লিখিয়া দিলেন যে সেই জন্তুগুলিকে আল্‌ফান্দী বলে। সেই শব্দই ঈষৎ বিকৃত হইয়া Elephant হইয়াছে।"

একজন শ্রোতা উঠিয়া বলিলেন "গ্রীক ভাষায় কি শব্দের পূর্ব্বে আল্‌ বসিত? আল্‌ ত একটা সেমিটিক উপসর্গ।"

বক্তা—"আরে কি আপদ। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে সেকেন্দর বা ইস্কান্দর নাম গ্রীকে পরিবর্ত্তিত হইয়া আলেক্‌জান্দার হইবে কেন? আলেক্‌জন্দর শব্দ ইন্দ্র হইতে হইয়াছে। তাহা আমি আর একদিনের বক্তৃতায় বলিব। আমাকে আর বাধা দিবেন না।"

এই বলিয়া গোবর্দ্ধন বাবু পুনর্ব্বার বক্তৃতা ধরিলেন—

"পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে যখন এরূপ অনৈক্য তখন তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিলে যে কোন ফল হইবে না ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব আমি আমার নিজের আবিষ্কৃত ভাষাতত্ত্ব জ্ঞানই আপনাদিগের নিকট প্রকটিত করিয়া দেখাইব যে তৎসাহায্যে কেমন সহজেই প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষ হইতে লোক গিয়াই পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অধ্যুষিত করিয়াছে।

"আমাদের মহাশয় শব্দ হইতেই ফ্রেঞ্চ monseur এবং ইংরেজী mister শব্দের উদ্ভব। আমাদের দেশের বিখ্যাত তমসা নদীতীর হইতে একদল লোক গিয়া ইংলণ্ডে বাস করিয়া তথাকার একটা নদীকে Thames নাম দিয়াছে। আমাদের দেশের মদিরা, সুরা এবং বীরা নামক মদ্য হইতেই ইয়োরোপের Madeira, Sherry এবং Beer হইয়াছে। "আমাদের "শিব শিব হরে" হইতেই Hip hip hurrah হইয়াছে। আমাদের দেশের বসাক হইতে Bosekh এবং সদানন্দ হইতে Sudderland নামের উৎপত্তি। আমাদের দেশের বাতাপি রাক্ষসের বংশধরগণই দক্ষিণ সাগরের Batavia দ্বীপের নামকরণ করিয়াছে। সেখান হইতে Batavian orange অর্থাৎ বাতাবিলেবু অন্য দেশে গিয়াছে। আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়ানী শব্দ হইতেই ইয়োরোপের Catherine নাম হইয়াছে। আমাদের দেশের হরিবোল হইতেই ইংরেজী Horrible শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। Palestine এবং Pyramid যে ভারতবর্ষীয় পল্লীস্থান এবং পুরীমঠ শব্দের অপভ্রংশ তাহা ইয়োরোপের পণ্ডিতেরাও মানিয়া লইয়াছেন। আমাদের বেলঘরিয়া হইতে একদল লোক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই ইয়োরোপের সেই দেশকে Bulgaria বলে। কৃষ্ণনগরের একটা পল্লীর নাম নেদের পাড়া। সেই স্থানের নাম হইতেই যে Netherlands নাম হইয়াছে তাহা বুদ্ধিমান সকলেই বুঝিতে পারেন। আমেরিকার Guatemala যে গৌতমালয় শব্দের অপভ্রংশ তাহা বলাই বাহুল্য। আবার দেখুন আপনারা সকলেই জানেন যে আমেরিকাকেই আমাদের জ্যোতিঃশাস্ত্রে পাতাল বলে। আস্তীক মুনি সেই পাতালে থাকিতেন ইহা সকল পুরাণেই উক্ত আছে। আমেরিকার Aztec গণ তাঁহারই বংশসম্ভূত। সেই আমেরিকা বা পাতালেই বলির রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যকেই Bolivia বলে। আমেরিকার ব্রাজিল দেশে কুরুপুরী নামক একটা স্থান আছে।

'আবার দেখুন অষ্ট্রেলিয়াতেও ভারতবর্ষীয় নাম আছে। আপনারা অবশ্যই Bosisto's Rheumatic Oil এর বিজ্ঞাপন দেখিয়াছেন। সেই Bosisto অষ্ট্রেলিয়ার লোক এবং তিনি আমাদের বশিষ্ঠ মুনির অনন্তর বংশীয়। বশিষ্ঠ কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না— উহা একটা বংশের নাম। সেই বংশের লোক রামেরও পুরোহিত ছিলেন, কুরুদিগেরও পুরোহিত ছিলেন। একজন লোকের পক্ষে রামের পুরোহিত ও কুরুদিগের পুরোহিত হওয়া অসম্ভব। আবার গ্রীসের নিকটবর্ত্তী পিলপনিসসে একজনের নাম Nahus। তিনি যে ভারতবর্ষের রাজা নহুষের বংশীয় ইহা বলিয়া দিতে হয় না।"

একজন শ্রোতা—"কিন্তু নহুষ রাজার সন্তানেরাও কি নহুষ নামে পরিচিত হইতেন? যদি তাঁহাদের নাম নহুষ না হয় তবে গ্রীসের সেই লোকটীর নাম Nahus দৈবাৎ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। একজনের পূর্ব্ব পুরুষ যে আর একজন তাহার প্রমাণ কি?"

গোবর্দ্ধন বাবু—"আরে কি আপদ। নহুষের সন্তানদের নাম নহুষ ছিল না বটে কিন্তু গ্রীসদেশের একজন লোকের নাম যে হঠাৎ নহুষ হইয়া গেল ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে তিনি নহুষ বংশীয়। ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের আকৃতি অষ্টম হেন্‌রীর আকৃতির সদৃশ ছিল। অথচ সেই দুইজনের মধ্যবর্ত্তী কোন পুরুষের অবয়ব সেরূপ ছিল না। অষ্টম হেনরীর বংশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই সপ্তম এডোয়ার্ডের আকৃতি তাহার মত হইয়াছিল। অন্যথা হইলে তেমন সাদৃশ্য হইবে কেন? গ্রীসের Nahus যদি ভারতবর্ষীয় নহুষের অনন্তর বংশীয় না হইবেন তবে তাহার নাম নহুষ হইবে কেন? (বিষম করতালি)।

গোবর্দ্ধন বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন "বঙ্গদেশের গুপ্ত

এবং সেন বংশের প্রভাব অতি পূর্ব্বকাল হইতেই সমস্ত পৃথিবীতে কিরূপ ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। যাহাকে আপনারা ইজিপ্ট বলিয়া জানেন তাহার প্রকৃত উদাহরণ ইগুপ্ত। Wales দেশের y অক্ষরের যে উচ্চারণ, Egypt এর y অক্ষরেরও সেই উচ্চারণ অর্থাৎ উ; এবং Gর প্রকৃত উচ্চারণ যে গ তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। অতএব বঙ্গদেশের গুপ্তেরা গিয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করাতেই তাহার নাম হইয়াছে ই গুপ্ত। এবিষয়ে ইয়োরোপীয় ভাষা তত্ত্ববিদেরাই বলিয়া গিয়াছেন এজন্য আমি বিস্তারিত করিয়া কিছু বলিব না।" (করতালি)

একজন সভ্য উঠিয়া বলিলেন "এই সভায় দুইবার করতালি দেওয়া হইল। প্রশংসা করিবার জন্য করতালি দেওয়া আমাদের জাতীয় রীতি নহে। ভারতবর্ষে বিদ্রূপ করিবার জন্যই করতালি দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশে হিন্দু শ্রোতৃমণ্ডলী প্রসন্ন হইলে সাধু সাধু বলিয়া থাকে। মুসলমানেরা মারহাবা, শাবাশ, শাবাশ, ইয়ে ইয়ে বলিয়া থাকেন। আমাদের যদি আনন্দ ব্যঞ্জক কোন অঙ্গধ্বনি করিতেই হয় তাহা হইলে বালকেরা যেমন আহ্লাদিত হইলে বগল বাজাইয়া থাকে সেইরূপ করিলে আমাদের জাতীয় ভাব রক্ষা হয়।" (সভাস্থলে বগল বাদ্য ও সাধু সাধু ধ্বনি)

গোবর্দ্ধন বাবু বলিতে লাগিলেন "আর সেন দিগের প্রভাব দেখুন। বঙ্গের সেনেরা কোথায় নাই? ইয়োরোপে ডনসেকেন সেন, বেন সেন, নান্ সেন, ইব্‌সেন, দক্ষিনা পথে রামের কটকে সুসেন, চীনে আনন্দ সেন, সন্‌য়াৎ সেন, মুসলমানদের মধ্যে মহম্মদ হোসেন, লেয়াকৎ হোসেন।

বক্তার কথা শেষ করিতে না দিয়া একজন হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন "তোমাদের এখানে ত ভাষাতত্ত্বের আলোচনা নয়, জাতি বিদ্বেষ—

গোবর্দ্ধন বাবু:—"আরে কি আপদ্— তাহা কথনই নহে। কখনই নহে।

এই সময় একখণ্ড ছেঁড়া চটী জুতা দূর হইতে যাইয়া বক্তার মস্তকে পতিত হইল। গোবর্দ্ধন বাবু বেগতিক দেখিয়া চম্পট দিলেন। চারিদিক হইতে হৈ হৈ শব্দ হইতে লাগিল। তখন পুলিশ উপস্থিত। পুলিশ দেখিয়া সভার সমস্ত লোকের বেগে পলায়ন।

অন্তরায়।

পুরুষেরা তুচ্ছ ভাবেন মেয়েদেরে সর্ব্বদায়,
রমণীরা পুরুষদেরে ভাবেন তাদের অন্তরায়।
হিন্দুরা সব মুসলমানকে নেড়ে বলে আড়ে চায়,
কাফের বলে মুসলমান সব হিন্দুদেরে তেড়ে যায়।
বারেন্দ্রেরা রাঢ়ী দেখে করেন নাসা কুঞ্চিত,
বারেন্দ্র সব ঘৃণ্য বলে রাঢ়ীর মনে সঞ্চিত।
হাকিম ভাবেন উকীল মোক্তার অতি নিম্নশ্রেণীরপ্রাণী,
তাঁরাও ভাবেন --হাকিম! তোমার বিদ্যা বুদ্ধি সবই জানি।
কর্ত্তা ভাবেন চাকরগুলার অঙ্গ পাথর দিয়া গড়া,
চাকর ততই বেয়াড়া হয়, কর্ত্তার যতই মেজাজ চড়া।
শাশুড়ীরা শান্তবৌকে সদাই করেন উৎপীড়ন,
মুখফুটে যায় বৌ'মা গণের, ভক্তির—চির নির্ব্বাসন।
'বাঙ্গাল' বলে পূর্ব্ববঙ্গে 'সাওতালীরা' চোখরাঙায়,
কাচের বদল কাঞ্চন নিতে সবারই ভাই অভিপ্রায়।
এম্নি করে 'দীন দুনিয়ায়' সবাই কর্চ্ছে গণ্ডগোল,
সবার মনের অন্তরালে শান্তির বদল হট্টরোল।
এগুলো যার ঘুচ্‌বে না গো ভেদাভেদ যার এতই বাড়া,
"এদের জীবন দুখের ভবন"—সত্যিবল্‌ছেন সাধু যাঁরা।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নির্ব্বাসিতের আবেদন।

সে অনেক কালের আগেকার কথা। অতুলনীয় শক্তির অধিকারী মাতাপিতা হইতে আমরা চৌদ্দটী ভাই বোন্ জন্ম লাভ করিয়া সংসার ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। বাপ মা আমাদের সকলেরই অধিকার বণ্টন করিয়া দিয়া যথা সময়ে স্বর্গারোহণ করিলেন।

একই মাতা পিতার সকল সন্তান সন্ততির সমান শক্তি সমান প্রতিভা থাকে না। আমাদের মধ্যেও এক এক জন এক এক রকমের হইলাম। তার মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ হইল। আজকাল মাসিক পত্রে দেখা যায়, এক একটা মানুষ দুইটী মাথা বা চারিখানি হাত ইত্যাদি অদ্ভুত রকম দেহ বৈকল্য সহ জন্মলাভ করে। আমিও দুইটী মাথা লইয়া ভবধামে দর্শন দিলাম। সুতরাং জড়ভরতের মত আমার অবস্থা হইল। পঙ্গু অরুণকে তার ভাই গরুড় সূর্য্যরথে স্থাপন করিয়া একটু সোয়াস্তি দিয়াছিল, আমার যমজ ভাই আগে আগে চলিয়া গেল—আমার দিকে চাহিবার মত অবকাশ তাহার ছিল না। আমার দুরবস্থা দেখিয়া আমার বাপ মা আমার কাজের ভারও যথাসম্ভব লঘু করিয়া দিয়া ছিলেন। আমার ভাই বোনেরা পৈত্রিক সম্পত্তির উপর অধিকার বিস্তার করিয়া মজা করিত, আমি পঙ্গু—সুতরাং বাতব্যাধির রোগীর মত বসিয়া বসিয়া দিন গুজ্‌রাণ করিতে লাগিলাম।

কালী পূজায় বা তন্ত্রোক্ত পূজা ইত্যাদিতে আমি যাইতাম। সেইখানে আমার কদর ছিল—এখনো আছে। বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ হাতে কলমে আমার জয়গান করিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই। রায়গুণাকর ভরতচন্দ্র আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছেন।

যাহা হউক আমি আমার নিজের অবস্থা বুঝিয়াই দীনভাবে দিন কাটাইয়াছি। কাঁচের ঘরে থাকিয়া পরের ঘরে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবার মত প্রবৃত্তি আমার কোনো কালেই নাই। যথা সম্ভব নিরীহ ভাবে এক প্রান্তে পড়িয়া দিন গণনা করিয়া আসিতেছি—এমন সময় আমার মাথায় বজ্রাঘাতের সংবাদ পাইলাম। শুনিলাম—বঙ্গদেশ হইতে আমার চির নির্ব্বাসনের হুকুম প্রচার হইয়াছে। দোষাদোষ জানিনা, আত্ম পক্ষ সমর্থনের জন্য উকীল বা কৌন্সিলী নিযুক্ত করিতে অবসর পাইলাম না—আমার নির্ব্বাসন দণ্ড বহাল রহিল। অকর্ম্মার পক্ষে বসিয়া বসিয়া খাওয়া আইনের বিধানে লেখেনা—তাই কি আমার এই দণ্ড? বৃদ্ধ পশুর পিঞ্জরা পোলের ব্যবস্থা দেখিতে পাই—আমিত চিরদিনই প্রায় পিঞ্জরা পোলের আশ্রয়েই আছি, তাহাও সহিল না! এতবড় বঙ্গদেশে আমার মাথা রাখিবার একটু ঠাঁই হইল না—তাই নির্ব্বাসনের হুকুম! ইংরেজ রাজত্বে বিনা বিচারে দণ্ডের বিধান নাই—আমার প্রতি কেন এই জুলুম?

বঙ্গ ভাষাভাষী মনীষি বৃন্দের নিকট আমার নিবেদন, তাঁহারা আমার দোষাদোষ বিচার করুন। আমি যদি এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হই, তাহা হইলে যে সকল সেকেলে ধাতের তান্ত্রিক উপাসক আছে, তাহাদের জন্য কি সুবন্দোবস্ত হইবে? দেশের ধর্ম্মের উপর হাত দেওয়াটা দেশীয় লোকের পক্ষে কি ঠিক?

নিবেদক—শ্রী ঌ (দীর্ঘ ৯)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গলা বানান।

আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নবকুমার কবিরত্ন মহাশয় "স্বপ্নদর্শন" শীর্ষক একটী অতি উপাদেয় প্রবন্ধে সেই পত্রিকাতেই প্রকাশিত আমার "বাঙ্গলা" শব্দের বানান বিচারের এবং বাঙ্গলায় বিসর্গ বর্জ্জনের প্রস্তাবের এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বঙ্গভাষায় অতিচার" প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সমাবেশে কবিরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধটী বড়ই উপভোগ্য হইয়াছে। তিনি উচ্চারনানুযায়ী বানানের পক্ষপাতী। তাঁহার মত এই যে প্রাকৃতে যেমন সংস্কৃত বানানের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শিত হইত না বাঙ্গলাতেও

সেইরূপে সংস্কৃত বানানের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আমরা যেমন উচ্চারণ করি তেমনই বানান করা উচিত। কার্য্যত কিন্তু কবিরত্ন মহাশয় নিজে সেরূপ বানান করেন নাই—সঙেঙ না লিখিয়া সঙ্গে, শঙ্‌শ্‌কৃত না লিখিয়া সংস্কৃত, হাঙ্‌গামা না লিখিয়া হাঙ্গামা, ব্যাকরণ না লিখিয়া ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। আমার বোধ হয় প্রাকৃত বা হিন্দীর নিয়ম বাঙ্গলায় চলিবে না। হিন্দী ভাষীদিগের উচ্চারণ সর্ব্বত্র একরূপ কিন্তু বাঙ্গলা ভাষীর তাহা নহে। এই ঙ্গ অক্ষর টার উচ্চারণই দেখুন। কলিকাতায়, নবদ্বীপে, পূর্ব্ববঙ্গে, উত্তর বঙ্গে গঙ্গা, বঙ্গ, সঙ্গ প্রভৃতি শব্দ গঙ্‌গা, বঙ্‌ঙ, সঙ্‌ঙ রূপে উচ্চারিত হয় কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে সেই শব্দ কয়েকটীর গ উচ্চারিত হয়। এই জন্যই যেমন ইংরেজীতে তেমনই বাঙ্গলায় একটা আদর্শ (standard) বানান প্রচলিত হওয়া উচিত বোধ হয়। ঙ্গ অক্ষর টার বাঙ্গলায় তিনটা উচ্চারণ আছে। (১) ঙ্‌গ যথা হৃদয়ঙ্গম শব্দে, (২) ঙ্‌ঙ যথা সঙ্গ, ভঙ্গ ইত্যাদি শব্দে, (৩) ঙ্‌ যথা "বাঙ্গালী" শব্দে। ঙ্গ হসন্ত হইলে সর্ব্বদাই ঙ্‌ রূপে উচ্চারিত হয়। তাহা হইলে "বাঙ্গলা" শব্দটা যে সংস্কৃত হইতে হইয়াছে তাহার চিহ্ন স্বরূপ গ টা রাখায় দোষ কি? ইংরেজী would শব্দটার l উচ্চারিত হয় না অথচ শব্দটা will হইতে হইয়াছে বলিয়াই উহাতে l স্থান পাইয়াছে। সে যাহা হউক "বাঙলা" বানানে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু "বাংলা" হয় কোন্ হিসাবে? ভুল করিয়া আমরা অনুস্বারকে ঙ্‌র মত উচ্চারণ করি বলিয়াই কি?

কবিরত্ন মহাশয় বিসর্গ বর্জ্জন বিষয়ে আমার এক কাঠি উপর গিয়াছেন। আমি বলি যেখানে বিসর্গের উচ্চারণ ক, প, শ, ষ, স হয় সেখানে বিসর্গ থাকুক, কেবল যেখানে বিসর্গের কোনরূপ উচ্চারণই হয় না সেস্থানে মোটেই বিসর্গ লেখা উচিত নহে। এ বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের ও অনুমোদন আছে। কবিরত্ন মহাশয় প্রাকৃত ভাষার নিয়মানুসারে অনুচ্চারিত বিসর্গ স্থানে ওকার লিখিতে চাহেন। আমার বোধ হয় প্রাকৃতের নিয়ম বাঙ্গলায় খাটিবেনা। মনঃ, চক্ষুঃ, স্রোতঃ প্রভৃতি স্থলে আমরা কি মনো, চক্ষুও, স্রোতো লিখিব?

কবিরত্ন মহাশয় স্বপ্নাবেশে বৃহস্পতির মুখ দিয়া বিদ্যানিধি অধ্যাপক যোগেশ বাবুর প্রতি বলাইয়াছেন "তোমরা বর্ণমালা ঠিক্ মতে চেননা।" এই আমোদের কথাটা বাস্তবিকই উপভোগ্য। যোগেশ বাবুর মত সম্বন্ধে কবিরত্ন মহাশয়ের সমালোচনার সহিত আমার সমালোচনার প্রায় সম্পূর্ণ মিল আছে। সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার আর বক্তব্য নাই।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

ছদ্মনাম।

উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে শৈলেশ ষ্টার থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া পড়িলে তাহার চমক ভাঙ্গিল। থিয়েটারের বারান্দায় বিস্তর লোক জমিয়া গিয়াছে, সকলেরই দৃষ্টি প্লেকার্ডের উপর। আজ বঙ্গসাহিত্যের উদীয়মান নবীন নাট্যকার পার্ব্বতী বাবুর পঞ্চাঙ্ক নাটক "বিসর্জ্জন" অভিনীত হইবে। কলিকাতার মধ্যে এমন কেহ প্রায় ছিলনা, যে পার্ব্বতী বাবুর নাম শুনে নাই; তাঁহার বইগুলি অভিনয় করিয়া ষ্টার সকলের উপর টেক্কা মারিতেছিল, তাই আজ এত লোক।

হঠাৎ শৈলেশের দৃষ্টি একখানা সুসজ্জিত ব্রুহামের উপর পড়িল। গাড়ীখানা অতিকষ্টে ভিড় ঠেলিয়া স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশ দ্বার-পথে আসিয়া দাঁড়াইল। সহিস নামিয়া আসিয়া দ্বার খুলিলে একজন প্রৌঢ়, অনিন্দ্য সুন্দরী এক যুবতীর হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। শৈলেশ চাহিয়া দেখিল—ইহারা তাহার পরিচিত। যুবতী তাহার পিতৃবন্ধু বিজয় বাবুর অবিবাহিতা কন্যা, প্রৌঢ় তাঁহারই দূর সম্পর্কীয় একজন আত্মীয়। যুবতীর নাম স্নেহলতা। স্নেহলতার সঙ্গে শৈলেশের বিবাহের আলাপ চলিতেছিল কিন্তু স্নেহ তাহার অনুরাগিনী ছিলনা; তাহার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ।

একখানা ড্রেস সার্কেলের টিকিট লইয়া শৈলেশ থিয়েটার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ভিতরে লোক গমগম করিতেছে; গ্যালারীতে প্রায় মারামারি ধস্তাধস্তি, স্থানাভাবে অনেক লোক ফিরিয়া যাইতেছে।

উপরের দিকে চাহিয়া শৈলেশ দেখিল স্নেহলত ও তাহার আত্মীয়টী বক্সের দুখানা চেয়ারে বসিয়া আছে। তখন শৈলেশ তাহার টিকিট খানি বদলাইয়া বক্সের একখানা টিকিট লইল ও তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দোতলায় উঠিয়া তাহাদের পার্শ্বের একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিল। শৈলেশকে দেখিয়া স্নেহলতা বলিয়া উঠিল "কি শৈলেশ বাবু যে, আজ কদিন কোথায় ছিলেন? আমাদের যে সংবাদটীই লন না।"

শৈলেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিল "এই একটা কাজে ব্যস্ত ছিলুম বলে যেতে পারি নি।"

স্নেহলতা জানিত শৈলেশ ইদানীং একজন সাহিত্যিক হইবার জন্য বিফল চেষ্টা করিতেছে, তাই হাসিয়া বলিল ' ও বুঝিছি আপনার কি কাজ ছিল। আচ্ছা, শৈলেশ বাবু আপনি এই বাজে গল্প-টল্প লিখা ছেড়ে নাটক লিখতে সুরু করে দিন্ না; এই দেখুন দেখি পার্ব্বতী বাবু কয়দিনে কেমন নাম কিনে ফেলেচেন। আর আপনার ছাই ভস্ম লেখা গুলিতো কোন সম্পাদকই ছাপেন না।" এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়াই স্নেহলতা শৈলেশের পানে চাহিয়া দেখিল তাহার মুখ ক্রোধে ও লজ্জায় লাল হইয়া গিয়াছে। তখন সে বুঝিতে পারিল অনর্থক শৈলেশকে এই ঘা দিয়া ভাল করে নাই; সে অন্যকথা পাড়িল। "শৈলেশ বাবু পার্ব্বতী বাবুকে আপনি চেনেন্?" শৈলেশ লজ্জায় মলিন হইয়া গিয়া একটী ছোট খাট উত্তর দিল "না।"

স্নেহলতা। "এতবড় নামজাদা একজন নাট্যকার তাকে আপনি চেনেন না? আশ্চর্য্য আর কি!"
শৈলেশ। "হতে পারে।"

ঐক্যতান বাদ্যের পর যবনিকা উঠিল, হঠাৎ যেন কোন যাদুকরীর যাদুমন্ত্র প্রভাবে সেই অসীম জন-কোলাহল থামিয়া গেল, সকলের দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের দিকে ধাবিত হইল। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হইয়া যাইতে লাগিল, লোকগুলি মন্ত্র মুগ্ধের মত অভিনয় দেখিতে ও শুনিতে লাগিল। ক্রমে প্রথম অঙ্কের যবনিকা পড়িল।

স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করিল "কেমন দেখচেন?"
শৈলেশ। "বইখানা এক রকম মন্দ হয়নি।"

স্নেহলতা। "মন্দ হয় নি? এমন প্লে আমি আর কখন দেখিনি। পার্ব্বতী বাবু যদি আজ থিয়েটার দেখতে এসে থাকেন, তা'হলে তিনি কত সুখী।"
"বোধহয় এসেছেন" বলিতে শৈলেশের স্বর ঈষৎ কম্পিত হইল।

এর পর অনেক কথা হইল। প্রায় প্রতি কথায়ই স্নেহলতা শৈলেশকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাবে প্রশ্ন করিল। শৈলেশ এখন উঠিতে পারিলে বাঁচে। শৈলেশ "একটু কাজ আছে" বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

(২)

বিসর্জ্জনের অভিনয় শেষ হইয়াছে। এখন একটী প্রহসন আরম্ভ হইবে।

থিয়েটারের ম্যানেজার কি বলিতে লাগিলেন। সকলে শান্তভাবে শুনিতে লাগিল।

ম্যানেজার গম্ভীর ভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আজ কদিন যাবত যে বিসর্জ্জনের অভিনয় হইতেছে, ইহার লেখক উদীয়মান কবি পার্ব্বতী বাবুর পরিচয় লাভের জন্য এ কয়েকদিন যাবৎ অনেকেই আমাদিগের নিকট অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সাধারণে পরিচিত হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ লেখক-বন্ধুর আপত্তি ছিল বলিয়া আমরা এতদিন কাহাকেও তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে পারি নাই। আজ তাহা করিতেছি। এই শৈলেশ বাবুই বিসর্জ্জনের লেখক।"

ম্যানেজারের সহিত রঙ্গমঞ্চের উপর শৈলেশ নত মস্তকে দাঁড়াইয়া ছিল। সকলের দৃষ্টি গিয়া তাহার উপর পড়িল। ম্যানেজার তাহার পরিচয় প্রদান করিলে শৈলেশের অপরিচিতেরা তাহার প্রশংসা করিল; বন্ধুরা বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল।

* * * *

পরদিন সকালে শৈলেশ বিজয় বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া বরাবর স্নেহলতার কক্ষে উপনীত হইল। স্নেহ সবে মাত্র এই স্নান সারিয়া ভিজা চুলগুলা রৌদ্রে শুকাইবার জন্য খুলিয়া দিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। শৈলেশকে দেখিয়া সে মস্তক নত করিল, কিছু বলিল না। শৈলেশের চক্ষে সদ্যস্নাতা স্নেহলতাকে আজ

বড় সুন্দর দেখাইতেছিল; এমন সুন্দর বুঝি স্নেহকে আর কখনও সে দেখে নাই। তাহার বহুদিনের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। ভুলিয়া গেল—স্নেহলতার অনাদর, প্রত্যাখ্যান; ভুলিয়া গেল—তাহার পূর্ব্বের রূঢ় ব্যবহারও পূর্ব্ব রাত্রির তাচ্ছল্য ভাব। কম্পিতকণ্ঠে শৈলেশ ডাকিল "স্নে-হ লতা"—লতা ডাক আজ তাহার প্রথম।

আদরের ডাকে গলিয়া গিয়া স্নেহলতা বলিল "শৈলেশ আমায় ক্ষমা কর; না বুঝিয়া আমি তোমায় কষ্ট দিয়েছি"। আমার অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে, ভুলে যাও আমার পূর্ব্ব ব্যবহার। তা তুমি যে পার্ব্বতী বাবু এতদিন আমায় জানাও নি কেন?' "কি হবে ব'লে, তুমিত আমায় বিশ্বেস করবে না। তুমি কি আমায় ভালবাস?"

স্নেহলতা বুঝিল শৈলেশের অভিমান এখনও দূর হয় নাই। অভাগিনী কাঁদিয়া ফেলিল। শৈলেশের হৃদয় গলিয়া গেল, সে আর থাকিতে পারিলনা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল 'ছিঃ! কাঁদ্‌তে আছে? কি ছেলে মানুষী! আমি কি তোমায় পর ভাবি? তুমি যে আমার ধ্রুবতারা। তোমায় পাবার জন্যই আমার এই ছলনা। তুমি সাহিত্যিক ভালবাস, তাই আমার সাহিত্যিক সাজা"।

আজ স্নেহলতার বুক হইতে মস্ত একটা বোঝা নামিয়া গেল।

ব্রীড়াবনত মুখে বলিল "তাহ'লে তুমি আমায় গ্রহণ করবে?

শৈলেশ হাসিয়া বলিল "তা কি আর বল্‌তে হয়? অনেকদিন হতে যে এই প্রাণ ঐ রাঙ্গাচরণে বিক্রীত। এখন দেহিপদপল্লবমুদারম্।" অভিনয় ভঙ্গিসহকারে শৈলেশ স্নেহের পা ধরিতে গেল।

পা সরাইয়া নিয়া কৃত্রিম কোপসহকারে স্নেহলতা বলিল "যাও যাও এখন ঠাট্টা রাখ; ভারিত ঠাট্টা শিখেছ গো সাহিত্যিক মশায়"।

* * * * * * * * *

তারপর? তারপর, শুভদিনে দুটীপ্রাণ একত্র মিলিত হইল বৈ কি?

শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

চীনা চিকিৎসা

কথিত আছে চ্যু হ্যাং নামক চীন সম্রাট চীনা মুল্লুকে ঔষধ খাওয়াইবার প্রথা প্রচলন করেন। তিনি শতাধিক গাছ গাছড়া ঔষধার্থে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।

চীনা চিকিৎসায় দেবদেবীর প্রতিপত্তি বিশেষ। ইঁহারা জনে জনে বিভিন্ন রোগের ঘাড়ে চাপিয়া আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করেন চীনাদের এরূপ বিশ্বাস? এজন্য তাহারা ব্যারাম-পীড়ায় পড়িলে ইঁহাদের কাছে বলি দিয়া, মানত করিয়া, ধূপ পোড়াইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করে। ইহাছাড়া কতকগুলি অপদেবতা আছেন তাঁহারাও কোন কোন ব্যারামের কর্ত্তা। পুরোহিত মহাশয়েরা বই, বাতি, বাটি প্রভৃতি অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাদের কৃপাকণা লাভ করিবার জন্য কত রকমেই না কাঁদাকাটি করিয়া থাকেন।

চীনাদের বিশ্বাস, কঠিন ব্যারাম হইলে মানুষের আত্মা ধড় ছাড়িয়া শূন্যে শূন্যে তাঁহার খাঁচার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে ভুলাইয়া আনিয়া আবার খাঁচায় পুরিবার জন্য চীনারা এক অপূর্ব্ব ফন্দী আঁটিয়াছে। এরূপ স্থলে মাথায় কাঁচা পাতার ঝুটিওয়ালা একখানা বাঁশ জুটাইয়া তাহার সঙ্গে পাখী বসিবার একটী দাঁড়, লাল সুতায় বান্ধা একখানি দর্পণ ও রোগীর একটী জামা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। রোগীর কোন আত্মীয় বাঁশটী ঘাড়ে করিয়া বাহিরে ঘুরিতে থাকেন; আর একজন পুরোহিত তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবিরত মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে আত্মাপাখীকে পার্থিব পিঞ্জরে ফিরিয়া আসিবার জন্য কাকুতি মিনতি করিতে থাকেন। বাঁশটা হাতের মুঠার মধ্যে মোড় ঘুরিলেই বুঝা গেল কাজ হাসিল হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় চীনাদের অধিকাংশ চিকিৎসা অদ্যাপি যাদুগিরি ছাড়া আর কিছুই নহে।

চীনাদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে বুধ, শনি, মঙ্গল, শুক্র ও যুপিটার—এই পঞ্চ গ্রহ; পাকস্থলী, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও মূত্রকোষ এই পঞ্চশরীরাংশ; পঞ্চভূত যথা—পৃথিবী, কাঠ, আগুণ, ধাতু আর জল; পঞ্চবর্ণ যথা, পীত, হরিৎ, রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণ এবং পঞ্চরস যথা

তিক্ত, অম্ল, লবণ, ও তীক্ষ্ণ ইহাদের পরস্পরের সঙ্গে খুব বাঁধাবাধি সম্পর্ক আছে। হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, ফুসফুস ও মূত্রাশয় রসশ্লেষ্মার প্রকোপ স্থল; তদ্রূপ পাকাশয়ের ছয়টী অংশ বায়ুর প্রকোপ ভূমি।

ইহাদের সমবায়ে পরিচালিত জীবনী ক্রিয়া বারটী রাস্তা দিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে সঞ্চারিত হয়। মানুষ পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত। শরীরের যে অংশে তাহাদের যাহার প্রাধান্য সেই অংশের সহিত জগতের অপরাপর স্বজাতীয় ভৌতিকাংশের মিল আছে এবং একভূতের সহিত অপর ভূতের যখন তন্মাত্র সংশ্রব রহিয়াছে তখন ইহার ফলে দেখা যাইতেছে যে পঞ্চভূতে, তাহাদের পঞ্চগুণে পঞ্চরসে ও চার ঋতুতে এবং পঞ্চবর্ণে ও পঞ্চ শরীরের যন্ত্রাংশে একটা অন্যোন্যাপেক্ষ ঐক্য রহিয়াছে। বারটী রাস্তা দিয়া শরীরাংশে জীবনীশক্তির যে গতি তাহাই নাড়ীর স্পন্দন; এজন্য উহা শারীরিক সুস্থাসুস্থতার শ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশক।

এককালে রাজকীয় বিদ্যালয়ে ত্রয়োদশ বিভাগের মধ্যে মন্ত্র যোগে চিকিৎসা শিখাইবার একটা বিশেষ বিভাগ ছিল কিন্তু এতকালে উহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঝাড়া, ফুঁকা দিয়া চিকিৎসা করিবার প্রণালী সাধারণতঃ সহজ ধরণের; যেমন ভূতে ধরিলে আগুণ, বাতাস আর বজ্রের মন্ত্র কয়েকটা আওড়াইলেই হইল। এক কালে—শিশু কোন্‌বারে এবং কতটার সময় ব্যারামে পড়িয়াছে তাহা জানিতে পারিলেই স্বচ্ছন্দে তাহার চিকিৎসা করা চলিত; কারণ প্রত্যেকবার ও প্রত্যেক ঘণ্টার পৃথকরূপে বিভিন্ন ব্যাধি জন্মাইবার ও আরোগ্য করিবার শক্তি আছে, এগুলি লক্ষ্য রাখিলেই হইল। এক রকম উদ্ভট চিকিৎসা আছে তাহার প্রক্রিয়া এইরূপ—দুইটী দণ্ডের সহিত কয়েক খানা তলোয়ারের ধারাল মুখ উপরে রাখিয়া বাঁধিয়া মই প্রস্তত করা হয়। একজন পুরোহিত সেই মইয়ের উপর খাড়া হইয়া ব্যাধি শান্তিকল্পে স্বস্ত্যয়ন করেন। নিশ্চয়ই পুরোহিত মহাশয়ের প্রাণ ইহাতে ফাট ফাট হইয়া আসে, কিন্তু টাকার লোভ বড় লোভ! লোকের বিশ্বাস, মড়কগুলা পাঁচজন সম্রাটের হাতের কসরৎ। লালবর্ণ নাকি বসন্তরোগে বড় উপকারী।

চীনাদের চিকিৎসার উপকরণ এবং অনুপান বড় বিচিত্র। লবণ, পারা এবং রুবার্ব্ব গাছ শিশু চিকিৎসায় বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। একখানা চীনা পুঁথিতে ১০১২টী ঔষধের কথা আছে, তাহার ১০২টী ধাতু ও প্রস্তর ঘটিত; ৩১৮টী ঔদ্ভিজ্জ, ঘাস এবং শাক সবজীর মূল পাতা ফল ও ফুল হইতে; ১৭৭টী বৃক্ষের ছাল, কাঠ ইত্যাদি হইতে; ২০টী মানুষের শরীরের উপাদান জাত; ৯১টী স্তন্যপায়ী জন্তু, ৩৪টী পাখী, ৬৯টী ছারপোকা, কীট, সাপ, ঝিনুক, কাছিম, মাছি ইত্যাদি, ৪০টী ফল, ৩৮টী বীজ, ৬২টী কপি, শালগম, কাঁকুড় হইতে পাওয়া গিয়াছে। মানুষের দেহ হইতে লভ্য ভেষজের মধ্যে ভাল ছাঁটা হইলে চুল পুলটিস দিবার জন্য দেওয়া যায়। কোঁকড়ান চুল, মাইয়ের দুধ, চামড়া, দাঁত, কাণ, নখ, শরীর হইতে পরিত্যক্ত কোন কোন পদার্থের ভস্ম, কপালের হাড়, গোঁফ, রক্ত, ও পিত্ত ইত্যাদি ব্যাধি বিশেষে প্রযোজ্য। জান্তব ভেষজের মধ্যে ড্রাগনের হাড় (?) দাঁত ও শিং (?) কস্তুরী, ষাঁড়ের পাকস্থলী, গুটলী বাঁধা পাথুরীর ন্যায় পদার্থ, ভালুকের পিত্ত, হস্তিদন্ত কাল খচ্চরের চামড়া পোড়ান, শিরীষ, গরুর দুধ, দই, ননী, সাদা ঘোড়ার খুব, বলদের গোবর, ভেড়ার শিং, পিত্ত, ফুস্ ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড ইত্যাদির রস; হরিণের শিং (অগ্রভাগটা বিশেষ রক্ত বর্দ্ধক) গণ্ডারের শিং, বাঘের শিং (?), নখ ও চক্ষু, কুকুরের পিত্ত, হৃৎপিণ্ড, মগজ, দাঁত খুলি ও রক্ত ইত্যাদি। প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত আসামীর মাথা কাটিয়া ফেলিলে তাহার রক্ত দিয়া একটা খুব ভাল ঔষধ হয়; এক টুকুরা রুটি তাহার রক্তের মধ্যে ডুবাইয়া যাহার পেটে কিছু পড়িলেই উট্‌কি আসে তাহাদিগকে খাওয়াইলে বিশেষ ফল দেয়।

ক্যাণ্টন - ইউনিভারসিটীর মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক বিভাগের ডাক্তার উইলিয়ম কাডবারীর মতে চীনা চিকিৎসাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) কুসংস্কার মূলক মন্ত্রতন্ত্র, ঝাঁড়া ফুঁকার উপর ইহার স্থিতি। (২) চীনা চিকিৎসকেরা আধুনিক যে চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ক্যাণ্টন

সহরে এখনও আরোগ্যকারী দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির আছে। অজ্ঞ জনসাধারণ অত্যাপি ব্যাধি নিরাময়ার্থে সেখানে উপস্থিত হইয়া থাকে। অন্যান্য চিকিৎসকেরা অন্তর্ব্যাধি, বহির্ব্যাধি ও শিশুব্যাধি এই তিন ভাগে চিকিৎসা করেন। মানব শরীরকে তিন অংশে ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। (১) শিরোভাগ বা মস্তক (২) মধ্যদেশ বা বক্ষঃ (৩) অধোদেশ বা বক্ষের সমগ্র নিম্নার্দ্ধ।

মানুষের জীবন ইয়াং ও ইয়িন্ (yang—yin) এই দুইয়ের আড়া আড়িতে চলিতেছে। ইহাতেই নাড়ীর গতি। প্রথমটা উষ্ণ ধাতে সর্ব্বদা বহমান; ইহাকে প্রায়ই সূর্য্যের সহিত এবং দ্বিতীয়টী আর্দ্র প্রকৃতির বলিয়া তাহাকে ছায়ার সহিত রূপিত করা হয়।

ইয়াং-ইয়িন্ এই দুইয়ের সমতায় মানুষের শরীর সুস্থ থাকে। ইয়াং কুপিত হইয়া উঠিলে মানুষের বায়ু রুক্ষ হয়, ইয়িনের প্রকোপে মানুষ মিন্ মিনে মাইজ মরা হইয়া পড়ে। দুইটী ড্রাগন পরস্পরকে গিলিয়া খাইতে যাইতেছে এইরূপ মূর্ত্তি দ্বারা ইয়াং ইয়িনের সাম্যাবস্থার ধারণা করা হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড, যকৃত, ফুসফুস, প্লীহা, বাম মূত্রাশয়, মগজ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্ররাজী, পাকস্থলী, পিত্তকোষ, মূত্রকোষ, দক্ষিণ কিডনি এই দ্বাদশ স্থানের উপর ইয়াং-ইয়িনের প্রভাব, এতদুভয়ের পরস্পরের মধ্যে ব্যবহারের জন্য একটী পথ আছে।

জিহ্বার শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত বা কৃষ্ণ বর্ণভেদে ছত্রিশ প্রকার ব্যাধি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এবং মুখমণ্ডল ও নাকের আকৃতির বিকৃতি দেখিয়া ফুসফুসের অবস্থা বুঝিয়া লওয়া যায়। চক্ষু, ভ্রূ এবং চক্ষু গহ্বর পরীক্ষা করিয়া যকৃৎ রোগ নির্ণীত হয়। গণ্ডদেশ ও জিহ্বা হইতে হৃৎরোগের লক্ষণ বাছা যাইতে পারে। নাসিকার অগ্রভাগ পাকস্থলীর ব্যাধির পরিচয় স্থল।

রোগ নির্ণয় ব্যাপারে রোগীর বর্ণ পরীক্ষাও বিশেষ দরকার; কারণ শরীরের প্রত্যেক অংশেরই স্বকীয় একটী স্বাভাবিক বর্ণ আছে; যেমন ফুসফুস শ্বেত, হৃৎপিণ্ড লাল, পাকস্থলী এবং প্লীহা হরিদ্রা, যকৃৎ ও পিত্তকোষ কৃষ্ণ। ঋতুভেদে আবার বিভিন্ন শরীরাংশের প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যথা—হৃৎপিণ্ড বর্ণ লোহিত, ইহার মূল উপাদান অগ্নি. গ্রীষ্ম ইহার ঋতু এবং মধ্যাহ্ন ইহার কাল অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে হৃৎপিণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যক্ষম হয়।

চীনের হাতুড়ে চিকিৎসকেরা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য দর্শনীয় জীব। ইহাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়; কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ইহাদের বড় প্রখর। দেশীয় ভাষার শাস্ত্র গ্রন্থাদিতেও ইহাদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। কিছু জরি বুটি, পুরাতন দাঁত নখ ইত্যাদি লইয়া এবং তাহারা যে যে ব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞ তাহার নিদর্শন পত্র একটা নিশানে লটকাইয়া ইঁহারা হাটে বাজারে বেসাতি করিতে বসেন। বোল চাল ঝাড়িয়া নিজেদের মক্কেল জুটাইতে ইহাদের ধড়িবাজী অনন্য সাধারণ। চিকিৎসক মহাশয়দের অধিকাশ ঔষধই শুকনা শিকড়, ঝোঁপ হইতে কাটা গাছের ডাটা ও নানারকমের ঘাস পাতা।

সম্প্রতি একটা প্রদর্শনীতে চীনাদের ব্যবহৃত ঔষধের কতকগুলি একত্র করা হইয়াছিল। সেগুলির উল্লেখ সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইতে পারে মনে করিয়া নিম্নে দেওয়া গেল।—

(১) ব্যাঙের লালার পিঠা; ঔষধার্থে ব্যাঙ হইতে সংগৃহীত। শ্লেষ্মা রোগাধিকারে।

(২) এক রকম পোকা শুট্‌কি—গ্রহণী রোগাধিকারে, শিশুদের আক্ষেপেও প্রয়োজ্য।

(৩) এক রকম বিষাক্ত পোকা—বিস্ফোটকাদি অধিকারে।

(৪) বিছা, ইহার লেজে ছয়টা গাঁইট আছে; কামড় বড় যন্ত্রনাদায়ক; প্রায় ব্যাধিতেই অনুপানরূপে ব্যবহার করা যায়।

(৫) শৃঙ্গময় হরিণের শিং—স্নিগ্ধ। ফুসফুস ও যকৃৎতে ব্যবহার্য্য।

(৬) বুড়া হরিণের শিং—শিং হইতে আরক বাহির করা হইয়াছে, এইরূপ পরিত্যক্ত অংশগুলি পিসিয়া চাট্‌নি করা। উত্তেজক বলবর্দ্ধক শোধক ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট।

(৭) ভালুকের পিত্ত—তিক্ত ও মধুর স্রাণ যুক্ত। স্নিগ্ধ, মধুর, শোধক, রোধক, স্নায়ু পোষক ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট।

(৮) কাকজাতীয় পক্ষি বিশেষের বাসা ভস্ম। স্নায়বিক এবং ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগাধিকারে স্নিগ্ধ, মধুর ও বলবর্দ্ধক ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট। *

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

আমাদের স্বাস্থ্য ও সমাজ রক্ষার দুই একটী কথা।

আমাদের শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে শাস্ত্রকারেরা প্রায় সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থাতেই স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। বিবাহ বিধানেও এই স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি বিশেষ পরিস্ফুট। কিন্তু বহুকাল হইতেই ঐ বিষয়ে লক্ষ্য এক রকম উঠিয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বর্ত্তমান সময়ে কত বয়সে বিবাহ লওয়া উচিত, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য; কিন্তু বিবাহোচিত বয়স বিবেচনার পূর্ব্বে বর্ত্তমান বিবাহের ফল সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতে পারে।

এখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে বিবাহের অবিবেচনার ফলেই বহু হিন্দু পরিবার পথের ভিখারী হইতেছেন। ভবিষ্যতে খাওয়া পড়ার চিন্তা না করিয়া কেবল পুত্র বধুর মুখ দেখিবার ইচ্ছায় যে বিবাহ করান হয় তার জন্ত আপনা হইতেই লোকের আয় বাড়িয়া যায় না অথচ মা ষষ্ঠীর কৃপা অক্ষুণ্ণই থাকে অর্থাৎ "বেড়ে যায় ছেলে মেয়ে ধন দৌলত বাড়ে না।" ফলে অনেক সময় এই দাঁড়ায় যে পরিণেতা পিতা হইয়াও আপন সন্তানের ভরণপোষণেই অক্ষম।

আজকাল অর্থের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাতে মনে হয়—বিবাহ কন্যার সঙ্গে নহে, অর্থের সহিত। যে কন্যার দ্বারা বংশের গৌরব বৃদ্ধি পাইবার কথা সেই কন্যাকে আমরা টাকার লোভে অথবা টাকা খরচের ভয়ে নিজ হস্তে বলিদান করিতেছি।

পুত্র ও কন্যা উভয়ই সন্তান। উভয়কে পালন করিতেই পিতামাতার সমান যত্নের আবশ্যক হয়। যাহার "অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং" তিনিও যে বিবাহ করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কেবল অর্থ লালসা অথবা অর্থবলই তাহার একমাত্র না হইলেও প্রধান কারণ। বৃদ্ধার সঙ্গে কেহ ছেলের বিবাহ দেন না কিন্তু বৃদ্ধের হস্তে যে কি ভরসায় প্রাণপ্রিয় কন্যাগুলিকে সমর্পণ করেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

বিবাহের বয়স সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলা যায় যে উপযুক্ত না হইলে কাহারও বিবাহ করা সঙ্গত নহে। উপযুক্ত অর্থে আমরা অবস্থায়—স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনক্ষম ও বয়সে —পক্কাবস্থা (maturity) প্রাপ্তি বুঝি। অপক্কাবস্থার সন্তান যে অপক্ক হয়, তার দৃষ্টান্ত ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেও দেখা যায়। অপক্কাবস্থায় বিবাহ হইলে দম্পতীর স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর এই অবস্থায় সন্তান হইলে কেবল যে গর্ভধারিণীরই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এমন নয়; সন্তানও অপক্ক হইয়া থাকে। অবশ্য ঠিক কোন বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, তাহা এখনও অবিসংবাদিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে অভিভাবকগণের সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা উচিত যে সন্তান কোন প্রকারেই কুপথগামী না হয়।

বর্ত্তমানে সংযমের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হইতেছে। অনেকে নানা কারণে অল্প বয়সে বিবাহের পক্ষপাতী। কিন্তু পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ দিলে পাঠের হানি হয় এবং বিবাহ যে কি দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার তাহা দম্পতীর ধারণায় অনেক সময়ই আসে না।

বিবাহের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। রিপু পরবশ হইয়া লোক অসংযত না হইয়া যায়, কুসংসর্গে যাইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ না করে ও সমাজ রক্ষা হয় প্রধানতঃ এই তিন কারণে বিবাহ প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যতদূর দেখিতেছি বর্ত্তমানে এই তিনটীর একটীর প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য হইতেছে না।

অল্প বয়সের বিবাহের ফলে বালকগণ অধিকতর

* ওয়াসিংটন জেনারেল মিউজিয়ামের মিঃ R. I. Gecare প্রদত্ত Chinese Medicine সম্বন্ধীয় বক্তৃতা—Indian Medical Record হইতে অনূদিত।

অসংযত হইয়া যায়। তাহার ফল স্বাস্থ্যভঙ্গ। এই স্বাস্থ্যভঙ্গ ফল শুধু বিবাহিত দম্পতীতেই আবদ্ধ থাকে না। অপক্ক দম্পতীর সন্তান সন্ততিতেও তাহা ক্রমে সংক্রামিত হয়। এইরূপে সমাজ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

বাস্তবিকপক্ষে বঙ্গসমাজও সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বর্ত্তমান পণপ্রথাও ভবিষ্যৎ বংশের স্বাস্থ্যহানির একটী কারণ। আজকাল পণের প্রকোপে অনেক কন্যার পিতা পথে দাঁড়াইতেছেন। এইরূপ অবস্থায় পিতামাতাকে ভিখারী করিয়া আসিয়া কন্যা কখনই সুস্থ-মনে স্বামীগৃহে বাস করিতে পারে না। পরন্তু যে কন্যার পিতা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ সে পিতাও অর্থ-লোলুপ বৈবাহিকের অযথা অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিতে যাইয়া বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন—ফলে কন্যাকেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। মনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের নৈকট্য সম্বন্ধ। যখন মনে দুঃখ ঘৃণা ও ভয় থাকে, তখন শরীর সর্ব্বদাই দুর্ব্বল থাকে। শরীর দুর্ব্বল থাকিলে স্বাস্থ্য কখনই ভাল থাকিতে পারে না। মাতার রক্তেই ভ্রূণের পুষ্টিসাধন হয়। মাতার মন যদি খারাপ থাকে তবে সেই সন্তানও দুর্ব্বল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সুতরাং এইভাবে বধূর মন সর্ব্বদা ক্ষুন্ন থাকিলে তাহার সন্তানের অনিষ্ট হইবেই।

কেহ কেহ বলেন যে যদি সমাজে পণপ্রথা প্রচলিত না থাকে তবে কাল বা কুরূপা মেয়ের বিবাহ হইবে না। সংসারে কি সকলেই সুরূপা? কখনই নহে। বোধ হয় কুরূপার সংখ্যাই অধিক।

আমাদের ময়মনসিংহ জেলায় বল্লালী ছাড়া বারেন্দ্র ও রাঢ়ী সমাজে টাকার কোন কথাই হয় না, এ সমাজে কি সমস্তই সুরূপা? যদি তাহা না হয়, তবে এ সমাজে কেমন করিয়া সমস্ত মেয়েরই বিবাহ হইতেছে? বিশেষতঃ এই সমাজে মেয়ে দেখার পদ্ধতিও একেবারেই নাই। অনুসন্ধানেই সমস্ত বিষয় জানিতে হয়। এ সমাজের আদর্শ গ্রহণ করিলে বোধ হয় বল্লালী অভিমানী সমাজ রক্ষা পাইতে পারে।

সমাজে কন্যাপণ প্রথাও প্রচলিত আছে। ইহা শাস্ত্রে অত্যন্ত নিন্দনীয়। সেই সমাজেও টাকার লালসায় মেয়েকে বহু বৎসরব্যাপী অবিবাহিতা অবস্থায় রাখা হয়। যদিও আজকাল সেই সমাজে কন্যাপণ অনেকটা কমিয়াছে বটে কিন্তু যাহা আছে তাহাও লোকে দিয়া উঠিতে পারে না। বর পণের যে দোষ কন্যা পণেরও সেই দোষ, তবে কন্যা পণ গ্রহীতা লোক সমাজে কম।

গত বৎসর ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর চেষ্টায় বারেন্দ্র কুলীন সমাজে 'পঠী' সম্মিলন হইয়াছে এবং বর পণও ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার বিশ্বাস রাঢ়ী শ্রেণীতেও এই প্রকার হইয়াছে। এই প্রকার চেষ্টার উদ্দেশ্য কেবল কন্যাদায় গ্রস্ত পরিবার রক্ষা অর্থাৎ সমাজ রক্ষা করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে যাহারা শিক্ষিত তাহারাই সমাজের চক্ষে ধূলি দিয়া প্রকারান্তরে বহু পণ গ্রহণ করিতেছেন।

প্রত্যেক পিতাই নিজ কন্যাকে যথাশক্তি সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এখন যৌতুক ইত্যাদি যাহা দেওয়া হয় তাহা জামাতা বা কন্যা কেহই ভোগ করিতে পারেন না। যদিই বা জামাতা ভাগ্যক্রমে সামান্য কিছু ব্যবহার করিতে পারেন কিন্তু কন্যা বেচারী কিছুই পায় না; সমস্তই বর কর্ত্তা আত্মসাৎ করেন। বাস্তবিক পক্ষে যৌতুক এখন বর কর্ত্তাকেই দেওয়া হয়। এই যৌতুক ইত্যাদি উৎপীড়ন করিয়া না লইয়া যদি কন্যার নামে টাকা লইয়া Savings bankএ জমা রাখা যায়, তবেও বোধ হয় সময়ে কাজে লাগিতে পারে। পাঠের খরচ বাবদ যদি জামাতার জন্য কিছু নেওয়া হয়, তাহাও বোধ হয় অনেকে আহ্লাদের সহিত দিতে পারেন। পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণের এই কঠোর ভাব যেন উচ্চ শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই অধিকতর প্রসার লাভ করিতেছে। উচ্চ শিক্ষার এই প্রকার পরিণাম ফল দেখিয়া স্বতঃই লজ্জায় ঘৃণায় ও দুঃখে অভিভূত হইতে হয়।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
সুসঙ্গ।

সাহিত্য সংবাদ।

গো-ধন প্রণেতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নূতন সামাজিক উপন্যাস "রমা ও উমা" যন্ত্রস্থ। তাঁহার গো-ধন ও পুনর্মুদ্রিত হইতেছে।

* * *

প্রবীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চিন্তাপ্রসূত নানা বিষয়িনী প্রবন্ধ মালা মুদ্রিত হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পুস্তক প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

* *

স্থানীয় সারস্বত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের "সেকালের কথা" ছাপা হইতেছে। ঘোষ মহাশয়ের সেকালের কথার কিয়দংশ ইতঃপূর্ব্বে কোন কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

* *

"সৌরভ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের লিখিত "বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস" (প্রথম খণ্ড) মুদ্রা যন্ত্রের কবলে যাইতেছে। এই খণ্ডে প্রায় চারিশত পৃষ্ঠা হইবে।

* *

নীরব কবি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার মহাশয়ের কবিতা পুস্তক "শতদল" প্রকাশিত হইয়াছে।

* * *

শ্রীযুক্ত কণিভূষণ রায় "ঠাকুর মার চিঠি" নাম দিয়া একখানা স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছেন। পূজার পূর্ব্বেই "ঠাকুর মার চিঠি" নাতিনী দিগের হস্তগত হইবে ভরসা করা যাইতেছে।

* *

আগামী বড় দিনের ছুটিতে বাঁকিপুরে যে সাহিত্য সম্মিলন হইবে তাহার মূল বা সাধারণ সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন মাননীয় বিচারপতি ডাঃ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি, সাহিত্য শাখায় বসিবেন "নারায়ণ" সম্পাদক সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, ইতিহাস শাখায় বসিবেন কবি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বিজ্ঞান শাখায় বসিবেন বৃদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত শশধর রায় ও দর্শন শাখায় বসিবেন সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়।

বিষয় সূচী।

Printed by Satish Chandra Rai, at the Jagat Art Press, Dacca. Published by Kedarnath Majumdar, Mymensingh.